দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ] শনিবার, ৫ই ফাল্গুন ১৩৫১ সাল। Saturday, 17th February, 1945 [১৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ন্দী কংগ্রেস কর্মিগণ

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রশ্নের ত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব সেদিন ভারতের বিভিন্ন দেশে বন্দী এবং অন্তরীণে আবদ্ধ কংগ্রেস র্মিগণের একটি হিসাব প্রদান করিয়াছেন । হিসাব অনুসারে ইঁহাদের সংখ্যা গ া জানুয়ারীতে ১৩,২৩২ জন ছিল ঙলাদেশেই বন্দী কংগ্রেসকর্মীদের সং পেক্ষা অধিক। বাঙলায় ইহাদে খ্যা ৩,৯৯১ জন। এক্ষেত্রে ইহা বি ক্তব্য যে, এই সব কংগ্রেসকর্মী সক াশ্য আদালতের বিচারে দণ্ডিত ; বিনা বিচারে ইঁহাদের মধ্যে অনে ধীনতা হইতে বঞ্চিত করা হইয় তসচিব মিঃ আমেরী ামেণ্টে অসঙ্কোচে এই কথা ব - যে, কংগ্রেসী সভ্যেরা নিজেদের - াই স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইন; তু তাঁহার এই উক্তিতে ব্রিটিশ ার প্রতি মর্যাদাবুদ্ধি । কিংবা শের গণতান্ত্রিকতার প্রতি বিশ্বাস কের বৃদ্ধি পাইবে না। চিব াদয় কিছুদিন পূর্বে আ গকে এই াস প্রদান করিয়াছিলেন য, কংগ্রেস দের ক্রমিকভাবে মুক্তি নের নীতি ম্বন করা হইয়াছে। প্রধান ও আমাদিগকে এ সম্বন্ধ অনেক াস্তিপূর্ণ কথা শুনাইয়াছেন কিন্তু প অবস্থার বিশেষ ন পরিবর্তন নাই। শান্তি ও আইন ক্ষার তান্ত মামুলী অজুহাতে তের দেশ-প্র নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে কারাপ্রাচীরে ম অবরুদ্ধ রাখা হইতেছে। চর্বের

বিষয় এই যে, যাঁহারা জনমতকে এইরূপ নির্লজ্জভাবে বিদলিত করিয়া স্বেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহাদের সমর্থকগণই আবার অপর দেশের নীতির দোষ ধরিতে বসেন এবং অপর দেশের গবর্নমেণ্ট ঠিক গণতন্ত্রসম্মত নীতি ধরিয়া চলিতেছেন না এই বিচার করিবার জন্য তাঁহাদের মস্তিষ্কে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সেদিন বিলাতের পাদ্রীদের এক সভায় গ্লোসেস্টারের বিশপ এইরূপ মনোবৃত্তির বশে সোভিয়েট নীতির সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, রাশিয়ার অবলম্বিত কতকগুলি গণতন্ত্র-বিরোধী নীতির ফলে আমাদের সকলের সুনাম কলঙ্কিত হইল। গ্লোসেস্টারের পাদরী মহোদয় রুশিয়াকে গণতন্ত্র বিরোধিতার জন্য নিন্দা করিবার পূর্বে যদি নিজেদের ঘরের দিকে তাকাইতেন, তবেই তাঁহার পক্ষে সমধিক বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করা হইত বলিয়া আমরা মনে করি। ধর্মহীন রাশিয়ার প্রতি কটাক্ষপাত না করিয়া তিনি যদি ধর্মভীরু চার্চিল-আমেরীর দলকে কিঞ্চিৎ সদুপদেশ প্রদান করিতেন এবং ভারত শাসনে তাঁহারা যে স্বৈরাচারিতার পরিচয় দিতেছেন, তাহা হইতে তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেন, তবে মানব-সমাজ অনেক দুঃখ, কষ্ট এবং যাতনা-লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা পাইত।

জাতীয় পতাকার জন্য আতঙ্ক

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান দমন সম্পর্কে পুলিশ কর্তৃক গৃহীত জাতীয় পতাকা দিল্লীর কোন কোন আদালতে ঝাড়ুনের কাজে ব্যবহৃত হইয়াছে, আমরা কিছুদিন পূর্বে এইরূপ সংবাদ পাই; সম্প্রতি পাটনা হইতে এ সম্বন্ধে আরও একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখের 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকার চিত্র প্রকাশিত হয়। এই ছবি দেখিয়া পাটনার তিনজন বড় সাহেবের চিত্ত-বিকার ঘটিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, একজন বড়সাহেব কাগজ খুলিয়া এই ছবি দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া পড়েন এবং চাপরাসী ডাকিয়া সংবাদপত্রখানাকে আগুনে ভস্মীভূত করিবার জন্য হুকুম দেন। জাতীয় পতাকার ছবি দেখা সত্ত্বেও চাপরাসী কেন এই কাগজ লইয়াছে, সেজন্য তাহাকে এক টাকা জরিমানাও করা হয়। অপর দুইজন সাহেব তাহাদের চাপরাসী ডাকিয়া "হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড" পোড়াবার আদেশ দেন নাই বটে, কিন্তু এই মারাত্মক সংবাদ-পত্র যাহাতে তাহাদের পবিত্র প্রাঙ্গণে ভবিষ্যতে কোনক্রমে প্রবেশ করিতে না পারে, তাঁহারা এ সম্বন্ধে কড়া হুকুম জারী করিয়াছেন। আমরা সংবাদে দেখিলাম, সেদিন লণ্ডনে ভারতীয় সাংবাদিকগণের এক সভায় বিলাতের খ্যাতনামা সাংবাদিক মিঃ হানেন সোয়াফার ভারতীয় সংবাদপত্র-সমূহের সম্বন্ধে সরকারী আমলাদের দৃষ্টি-ভঙ্গীর তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি অবাধ এ সব দুষ্কৃত নিন্দনীয় সন্দেহ

নাই; কিন্তু তথাপি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সমান অংশীদার স্বরূপে অবস্থান করিলেই ভারতবাসীদের লাভ হইবে, সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন লাভ নাই। ভারতের জাতীয় পতাকাকে যাহারা এমনভাবে অবমানিত করিতে স্পর্ধিত হয়, তাহারাই যে ভারতে ব্রিটিশ বিদ্বেষ জ্বালাইয়া তুলিতেছে এবং ব্রিটিশের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার মনোভাব ভারতবাসীদের অন্তরে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে, আমরা আশা করি, মিঃ হানান সোয়াফারের ন্যায় ভারত বন্ধুগণ এই সত্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করিবেন। ভারতবাসীদের প্রতি মর্যাদাবুদ্ধি ব্রিটিশ জাতির মনে যতদিন পর্যন্ত জাগ্রত না হইবে, ততদিন মিলন মৈত্রীর কোন যুক্তিই বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকর হইতে পারে না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষাকল্পে নিখিল ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতি ভাণ্ডারের সভাপতি স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় দেশবাসীর নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়া আবেদন প্রচার করিয়াছেন। সম্প্রতি এই আবেদন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা বাঙলার যে সংস্কৃতিতে পুষ্ট হইয়াছি, মূলত রবীন্দ্রনাথই তাহার স্রষ্টা। কেবলমাত্র ভাবের দিক দিয়াই নয়, আধুনিক বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বাক্য-বিন্যাস, রচনা-শৈলী ইত্যাদিতে তিনি নব রূপায়ন আনিয়া দিয়াছেন। বিশ্ব-সাহিত্যে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের যে কৌলিন্যলাভ হইয়াছে, তাহাও প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভার ফলেই সম্ভবপর হইয়াছে। উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মত তিনি লীলা-চঞ্চল প্রকৃতিতে, জীবে ও জড়ে একই সঞ্চরমান প্রাণশক্তি লক্ষ্য করিয়াছেন এবং তাঁহার কাব্য-সাহিত্যে প্রাণময়ী প্রকৃতি আনন্দলোকের যে রসধারায় অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, বিশ্ব-সাহিত্যে তাহা দুর্লভ। এই জড়বাদী যুগে কেবলমাত্র বাঙলা সাহিত্যকেই নয়, বিশ্ব-সাহিত্যকেও তিনি অধ্যাত্ম-চেতনার আনন্দঘন অমৃত-নিস্যন্দী ঊর্ধ্বলোকের সন্ধান দিয়াছেন। ভারতের পরাধীনতা, এ দেশের দুঃখ, দৈন্য, লাঞ্ছনা, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা বেদনা-ক্ষুব্ধ অন্তরের যে অগ্নিময়ী বাণী কাব্য, সংগীত ও প্রবন্ধে মূর্ত হইয়া উঠি[…] মৃতপ্রায় জাতির অসাড় […] স্বাধীনতার বন্ধন ছেদনের বলি[…]নায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। কবি যি[…]ন চিন অমর। প্রদীপ্ত সূর্যের মত[…]পন প্রতিভার আলোকেই রবীন্দ্রনা[…]থ র-কাল মানবের মানস-লোকে […] সমুজ্জ্বল থাকিবেন। কিন্তু কবি তাঁহ[…]ার টি প্রতিভার যে দান দে[…]শবাসী উত্তরাধিকারস্বরূপ অর্পণ করিয়া [গি]য়াছে তজ্জন্য তাঁহার নিকট দেশবাসী[…]র অপরিশোধ্য। গগনচুম্বী স্ম[…]তি-সৌ[…] স্থাপন করিয়া নয়, পরন্তু কবির [..]জীব[ন]ব্যাপী সাধনার মূর্ত প্রকাশ শান্তি[নিকেত]নে তন[…] বিশ্বভারতীর স্থায়িত্ব বিধানের ভার[…] লইতে এবং কলিকাতার যে স্থানে কবির [..] জন্ম[…] যেথানে তাঁহার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের অনেক দিন কাটিয়াছে, তাহাকেও জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে যদি দেশবাসী সমর্থ হয়, তবেই সেই গুরু-ঋণ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হইবে। কবির প্রতি জাতির কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান রক্ষা ও পরিচালনাকল্পে নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতি-ভাণ্ডারের পক্ষ হইতে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় দেশবাসীকে সেই দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। এই কার্যে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এই কর্তব্যপালনে প্রত্যেক বাঙালীরই বিশেষ দায়িত্ব আছে। আগামী ২৫শে বৈশাখ কবির জন্মদিনের পূর্বেই যাহাতে স্মৃতি-রক্ষার যথাযোগ্য আয়োজন-অনুষ্ঠান হয়, তজ্জন্য এই স্মৃতি-ভাণ্ডারে অর্থসাহায্য প্রেরণ আবশ্যক। আশা করি, ভারতবাসী মাত্রেই, বিশেষ করিয়া বাঙলার জনসাধারণ তাঁহাদের গুরুদায়িত্ব স্মরণ করিয়া অবিলম্বে এ বিষয়ে উদ্যোগী হইবেন।

কলিকাতায় নূতন উপদ্রব

হাসপাতালসমূহে পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু, বিশেষ শ্রেণীর মোটর লরীর সহিত সংঘর্ষ-জনিত দুর্ঘটনার ফলে পথচারী ব্যক্তিগণের আহত ও নিহত হওয়ার সংবাদ যেমন প্রত্যহ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই আর একটি নূতন উপদ্রব কলিকাতায় প্রায় প্রত্যহই দেখা যাইতেছে। এই সমস্ত উপদ্রব অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ শ্রেণীর বৈদেশিকের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত বিশেষ শ্রেণীর 'বৈদেশিক' কাহারা আমেরিকার নিউইয়র্ক অথবা চিকাগো শহরে দুর্বৃত্তগণের চমকপ্রদ কার্যকলা[পের] বিবরণ আমরা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া[ছি]। এই ধরণের দুর্বৃত্তপনা নাটক-নভেলে পড়িতে কিংবা সিনেমার পর্দায় দেখিতে ভাল লাগিতে পারে; কিন্তু এইরূপ দুর্বৃত্তপনা ক্রমশই যেরূপভাবে দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িতেছে তাহাতে কলিকাতার অধিবাসিগণের শঙ্কিত হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। নিরীহ পথচারিগণকে লরীতে তুলিয়া, তাহার প[র] তাহাদের সর্বস্ব কাড়িয়া লইয়া পথিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাওয়া, রিক্সাওয়ালার গুরুতর শ্রমের দ্বারা সারাদিনের উপার্জিত যৎসামান্য অর্থ কাড়িয়া লওয়া, ট্যাক্সিওয়ালার নিকট হইতে তাহার টাকাপয়সা ছিনাইয়া লওয়া—ইত্যাদি ঘটনা প্রায়ই ঘটিতেছে। বাঙলার রাজধানীতে আজ রাজপথে নারীর সম্মানও নিরাপদ নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তগণ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিতেছে। গত সপ্তাহে হাওড়ায় জনৈক রিক্সাওয়ালাকে দুইজন 'বিদেশী' ছোরার দ্বারা আঘাত করে এবং তাহার ফলে তাহার মৃত্যু হয়। সম্প্রতি আর একটি সংবাদে প্রকাশ, কস্‌বা অঞ্চলে জনৈকা মহিলা তাঁহার স্বামীর সহিত রাত্রিতে থিয়েটার দেখিয়া ফিরিবার কালে কয়েকজন আগ্নেয়াস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত তাঁহার গহনাপত্র ছিনাইয়া লইতে চায়। তাঁহার স্বামীকে কয়েকটি গুলী করে। তাহার ফলে মেডিক্যাল কলেজে সেই ভদ্রলোকের মৃত্যু ঘটে। অথচ আমরা জানি, কলিকাতায় ব্ল্যাক্‌আউট চালু করার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য বহু গুণ্ডাকে বহিষ্কার করা হইয়াছে এবং কারাগারে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। তথাপি তো আমরা আমাদিগকে নিরাপদ মনে করিতে পারিতেছি না, বরং পথে চলিতে প্রতি পদে বিপদই আশঙ্কা হয়। দেখিতেছি, এই বিশেষ শ্রেণীর 'বৈদেশিকের' উপদ্রব চরম অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, অতএব কলিকাতাবাসী তাহাদের ধন-প্রাণ যে-কোন মুহূর্তেই বিপন্ন হইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তেরা ধরা পড়ে না, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। এ সম্বন্ধে পুলিশের দৃষ্টি অধিক প্রখর হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ সব দৌরাত্ম্য যাহাদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তারা যাহাতে অবিলম্বে দণ্ডিত হয় আমরা তাই চাই।

রাজি নয় বলে, দার্শনিকদের থামিয়ে দেবে এবং দার্শনিকরা ভাববেন মানুষের বোঝবার সময় এখনও আসেনি এবং তার জন্য অপেক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত।

হঠাৎ কোন একটা সুবিধার সন্ধান পেয়ে সমর গেল বিদেশে এবং যুদ্ধ-ঘোষণার পর যখন ন্যায়-অন্যায় থাকে না, তখন মাধবী গেল বাপের বাড়ী এবং সেখান থেকে অখিলদের সঙ্গে দার্জিলিং। শৈলশিখরের যাত্রীরা মাধবীকে সঙ্গে পেয়ে ধন্য হোলো। সেই মাধবী, যার প্রত্যাখ্যানে পুরুষেরা মর্মাহত হতো, যার ইশারায় ভাগ্যবানেরা অঘটন ঘটাতেও ইতস্তত করতো না, সে হস্তান্তরিতা হ'লেও দুর্লভ হয়নি দেখে অখিলের দল উল্লসিত হলো।

ওদিকে সমরের জীবনে কেবল ভ্রমণই সার হচ্ছে, কোনো বন্দরই সামনে এলো না। সমরের কখনো মনে হোতো, পরিবর্তন বুঝি একেবারে নিশ্চিত, আবার দেখতো, সেটা অনেক দূরে সরে গেছে।

এদিকে মাধবী চলেছে উঁচুনীচু পথে, অতীতকে অগ্রাহ্য করে, বর্তমান হাস্যমুখর দিনগুলোকে যত ভাবে উপভোগ করতে পারা যায়, তার কোনও সুযোগ নষ্ট হতে দিচ্ছে না। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এবং নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠ করবার মধ্যে যে বিভিন্নতা আছে, অধ্যয়নের মোহে মাধবী তাও বিচার করলো না।

উৎসবমুখর দিনে সমরকে তার মনে পড়ে না। চাঁদের আলোয় সঙ্গীদল নিয়ে উপত্যকার সমারোহে মাধবী যেন উছলে পড়ে, অমাবস্যায় অসমতল পথে হোঁচট্ খেতে খেতে, অনুপস্থিত কাকে যেন মাধবীর অভিশাপ দিতে ইচ্ছে করে।

বন্ধুরা বলে—পর্বত-পর্ব যখন শেষ হ'ল, তখন সমুদ্রকে বাকি রেখেই বা ফল কি! মাবধী ভাবলো, জীবনই নিষ্ফল সমুদ্র না দেখলে। কিন্তু যাত্রার যেন শেষ নেই! সমুদ্রতীর থেকে যখন সমুদ্র পার হবার কথা উঠলো, তখনই এলো সমস্যা এবং শোচনীয় পরিণতিতে তার সমাধান হোলো।

এতদিন ছিলো সদলবলে আনন্দের অনুসন্ধান, এখানে এলো বিশেষত্বের পরিকল্পনা। অখিল নামে যে ব্যক্তি দলকর্তা, যাকে লোকে তোষণ করে এবং পরিবর্তে যে এই দলটিকে পোষণ করে, তার আর্থিক সামর্থ্য, পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত নিরেট সোনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইংরাজ সওদাগরেরা এদেশে সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করবার সঙ্গে সঙ্গে অখিলের পূর্বপুরুষদের ভবিষ্যৎ বনিয়াদিত্বের বনিয়াদ স্থাপন করেন।

অখিলের মায়ের কাছে প্রতিবেশীরা তাঁর একমাত্র সন্তান অখিলের অপচয়ের কথা উল্লেখ করে আশঙ্কা প্রকাশ করতেন, অখিলের মা নাকি জবাব দিতেন এই বলে যে, সঞ্চয় যা আছে তা দু'হাত দিয়ে ছড়িয়ে গেলেও শেষ হবে না।

সেই অখিল প্রস্তাব করেছিলো মাধবীকে সমুদ্রপারে নিয়ে যাবার। সঙ্গে কেউ থাকবে না, কেবলমাত্র সে এবং মাধবী। কথাটা প্রস্তাবিত হয়েছিলো এই ভাবে।

রোমাঞ্চকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে গেলে আকাশের অবস্থা যা থাকে, তাই ছিলো। চাঁদ ছিলো, তারারও সংখ্যা ছিলো না। প্রমত্ত সঙ্গীদল দূরে চলে গেছলো, পাশাপাশি বসে ছিল দু'জনে। কথা হচ্ছিলো সমুদ্রের মাঝখানে যে লাইট্-হাউস থাকে, তার সম্বন্ধে। আলোচনা হচ্ছিলো লাইট্-হাউসের, তার অধিবাসীদের নিঃসঙ্গতার কথা। অখিল কথায় কথায় বলে ফেললো, সে ওই নিঃসঙ্গ জীবন পছন্দ করে যদি সে মাধবীকে সঙ্গে পায়। অনেক আনন্দের ঋণ আছে অখিলের কাছে, তাই মাধবী অপমানিত হলেও প্রতিবাদ করতে সাহস করলো না। নীরবতাকে প্রশ্রয় বলে ভুল করে অখিল অবশেষে প্রস্তাব করলো সমুদ্রপারে যাবার জন্যে, চিরদিনের মত। এর পর মাধবী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে, আবাসস্থলের দিকে চলতে গিয়ে প্রথম বাধা পেলো পায়ে এবং সেটা তারই হাতে গড়া বেলাভূমির বালি দিয়ে গড়া মন্দিরে। হোটেলে ফিরে এসে মাধবী অনেক কেঁদেছিলো এবং তখুনি জেদ ধরেছিলো বাড়ি ফিরে যাবার।

সঙ্গী দল আশ্চর্য হ'লো এবং ক্রমে সবই জানতে পারলো। সকলে ঘৃণায় লজ্জায় একেবারে মরে গেল।

অখিল ধনবানের সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করে এমন কিছু অন্যায় করেনি। ভুল করেছে অনেকখানি লেখাপড়া করে। কিন্তু সে যে অত্যন্ত অবিবেচক ছিলো, সে কথা সর্বৈব সত্য। অখিলের মা তাকে কোনদিন কোনো আনন্দে বাধা দেননি। নিজে তার সকল অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ করতেন। তাই, অত্যন্ত সস্তা একটা এ্যাসিড খেয়ে, ভারতবর্ষের অন্যতম সৌখীন হোটেলের একটা ঘরে অখিল যখন আত্মহত্যা করলো, বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে সাশ্রু নয়নে তার মা বললেন যে, এতে তিনি মোটেই আশ্চর্য হ'ননি, কারণ এ চেষ্টা তার নতুন নয়, আগেও কয়েকবার করেছে।

সাময়িকভাবে মাধবীকে লোকে ভুলেছিলো, কিন্তু মাধবী কিছুই ভোলে নি। মাঝ রাত্রে ঘুম ভাঙে তার দুঃস্বপ্ন দেখে। চওড়া সিঁড়ির ওপর রঙীন্ কার্পেট পাতা। চমৎকার পালিশ করা রেলিং ধরে একজন পুলিশ অফিসার নামছে। তার পেছনে স্ট্রেচারের ওপর অখিল শুয়ে আছে। বিষের ঝাঁঝে তার সমস্ত মুখখানা পুড়ে গেছে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রসাধন-প্রলেপে-মসৃণ-দেহ, নীল হয়ে গেছে।

রাত্রের শেষযামে, মাধবীর ঘুম ভেঙে যায়। অব্যক্ত যন্ত্রণায় গুমরে গুমরে কাঁদতে থাকে। মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে মাধবীর মা ভাবেন—মেয়ের আমার কী হোলো!" বাবার মন অনেক দূরে পিছিয়ে গিয়ে ভাবতে আরম্ভ করে।

এমনি করে দিন যায়। মাধবীর নীল চোখের কোল কালো হয়ে গেল অনিদ্রায়। যথাসময়ে সমর পত্র পেলো। অপরিবর্তিত মন এবং অবস্থা নিয়ে সমর মাধবীর কাছে তার উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করলো। কিন্তু দিনের আলোয় তাকে অস্বীকার করলেও রাতের স্বপন অভিসারকে সমর লজ্জিত হয়েও অগ্রাহ্য করতে পারেনি কোনদিন। মাধবীকে ভোলা যায় না কখনও, তার চোখের কোণে মানুষের মৃত্যু, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে মহাকাব্য, এতটুকু ইশারায় বিরাট পুরুষের অভিমান শিথিল হয়।

কিন্তু এমনি করে চিরদিন চললো না। পৃথিবীতে যুদ্ধ এলো। বিগত মহাযুদ্ধের সূচনায় জন্মাল সমর, আর একটা মহাযুদ্ধের প্রারম্ভেই নিজের পথ খুঁজে পেলো।

সংগ্রাম প্রস্তুতির জন্যে টাকা উড়তে লাগলো ভারতবর্ষের আকাশে, সমর ধরলো তার কিছুটা। হঠাৎ একদিন সমর দেখলো যে, সে দস্তুরমত বড়লোক হয়েছে। সে এখন লোকসংখ্যার শতকরা পাঁচজনের শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু মাধবীকে ভোলা যায় না। ভোলবার আগে মানুষ মরে যাবে, তবু ভুলবে না।

সমর যেদিন প্রথম মাধবীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, মাধবীর মা সেদিন তাকে কাঁদতে কাঁদতে ডেকে বললেন—"মাধবী, দেখ কে এসেছে।" মাধবী সবিস্ময়ে খানিকক্ষণ সমরের দিকে চেয়ে থেকে একজন বিখ্যাত অভিনেতার নাম করলো।

মাধবীর মা কপালে আঘাত করে কেঁদে উঠলেন। কিন্তু নির্জনে মাধবী সমরকে বললে—"জানো! সবাই বলছে আমি নাকি পাগল হয়ে গেছি!"

সমর বললে—ছিঃ, ওকথা বলতে নেই! শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে কি না, তাই মাথাটা একটু দুর্বল হয়েছে। ওষুধ খেলে সব সেরে যাবে।

মাধবী বললে—তুমি যেন আবার ওষুধ-পত্র কিনে পয়সা খরচ করে বোসো না? আমার এমনিই ভাল হয়ে যাবে। সমর বললে—দরকার হলে সবই করতে হবে! তুমি যে বেড়াতে যেতে চাইতে, চলো না কোথাও বেড়িয়ে আসি?

সশঙ্ক মাধবী জবাব দিলে—না, না না, ওসব কথা মনেও কোরো না। দু'জনের দেশ-বিদেশ বেড়াতে গেলে [illegible] খরচ

জানো! তা ছাড়া পাহাড়ও দেখেছি, সমুদ্রও দেখেছি, আমার আর কিছু ভাল লাগে না।

সমর আবার নতুন পরিস্থিতিতে নতুন ভাবে চিন্তা করতে আরম্ভ করলো। চিন্তা করা আজ তার সাজে কারণ চিন্তার শেষে তাকে কার্যকরী করবার জন্য অর্থের অভাব তার নেই।

দেশ-বিদেশের চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করেছে। মাধবীর অসুখ কখনো বেড়েছে, কখনো কমেছে। একেবারে কখনই সারেনি। তাকে নিয়ে আলাদা করে একান্তে ঘর বেঁধেছে, তাদের সুস্থ জীবনের পরিকল্পনা মত। মাধবী কখনো কখনো একেবারে স্বাভাবিক মানুষ হয়ে যায় আবার সময় সময় তিনতলা থেকে মহাশূন্যে ঝাঁপ দেবার প্রস্তাব করে বলে সমর তাকে ঘরে বন্ধ করে রাখে। তবুও সমর সমস্ত দিন সর্ব কার্যের মাঝখানে মাধবীকে মনে রাখে। সমর আর বিশ্বাস করে না যে মাধবী অপ্রকৃতিস্থ। অবসর মত মাধবীর মাথা বুকের ওপোর টেনে নিলে, সমর দেখেছে মাধবীর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির পরিবর্তে প্রথম প্রণয়ের কুণ্ঠা। সমর ভাবে, এই তার যথেষ্ট। নিজের হাতে তাকে স্নান করিয়ে দেয়, সর্বাঙ্গে প্রসাধন করে দেয়, মনের মত করে কাপড় জামা পড়িয়ে নিজের কাজে যাবার সময় মাধবী যখন সমরের গলা জড়িয়ে মুখের কাছে মুখ এনে আদর করে বলে—বাঃ রে! আজও ভুলে যাচ্ছো!

সমরের চোখে জল আসে। তাড়াতাড়ি চোখে রুমাল চাপা দিয়ে সে বেরিয়ে যায়। তবুও সে আজ সুখী এই ভেবে যে, চন্দনগন্ধা মাধবীকে আজ সে ইচ্ছামত, প্রয়োজন মত উপভোগ করতে পারে। সম্ভ্রম-ভীরু আধুনিক মেয়েদের কাছে প্রস্তাবনার মত অসহ্য পরীক্ষা আজ তাকে দিতে হয় না।

হঠাৎ এক সঙ্গে অনেকগুলো এরোপ্লেনের আওয়াজে সমরের ঘুম ভেঙে গেল। চোখ চেয়েই সমর দেখলো বারান্দায় অস্বাভাবিক আলো আসছে মাধবীর ঘর থেকে! তাড়াতাড়ি উঠে ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই শুনতে পেলো মাধবী গান গাইছে। সমস্ত জানলাগুলো খোলা। আলোর ঢাকনাগুলো• মাধবী টান দিয়ে খুলে ফেলেছে। তার অঙ্গের সমস্ত আবরণ যে খসে পড়েছে, তার দিকে তার লক্ষ্য নেই। ওদিকে এরোপ্লেনের আওয়াজ নিকটতম হয়ে এসেছে। অনভ্যস্থ আলোর সামনে দাঁড়িয়ে এক মিনিটের জন্যে সমরের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। এদিকে মাধবী যেই দেখলো সমর আলো নেভাতে যাচ্ছে তখনই সে তার পথ আটকালো। কিন্তু আলো সমর নিভিয়েই দিলো।

বুকের ওপর মাথা রেখে মাধবী গুণে গুণে করে কাঁদে—"কেন তুমি আলো নিভোলে?"

সমর তার পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে উত্তর দেয়—"আমি ইচ্ছে করে নেভাই নি মাধবী! ছিঃ! কাঁদে না, চুপ কর।"

কোন উত্তরেই সমরের অপরাধ মোচন হ'লো না। মাধবী কাঁদিতে কাঁদিতে অভিযোগ করেই চললা। অন্ধকারে তাকে দেখা যায় না। ঘরের বাইরে রাত শেষ হয়ে আসছে। প্রথম আলোর রেখা দেখবার আশায় সমর পূর্ব সীমান্তের দিকে চেয়ে রইলো।

শিশুমঙ্গল

শিশুর মনোবিকাশ

ডক্টর শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, এম-এ, পি এইচ-ডি

কল্পনা মানুষের ভাব ও ভাষাকে একদিকে যেমন সমৃদ্ধ ও সৌষ্ঠব-সম্পন্ন করে, অপরদিকে তেমনি তার বর্তমান জীবনের সঙ্গে অতীত ও ভবিষ্যতের যোগাযোগ সৃষ্টি করে দেয়। মেঘদূতে কালিদাস কল্পনায় যে মধুচক্র সৃষ্টি করে গেছেন তা শুধু সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও রসাপ্লুত করেনি, যুগে যুগে বিশ্বের কাব্যরস-পিপাসু সে মধুচক্র থেকে মধু আহরণ করে তৃপ্ত ও কৃতার্থ হচ্ছে। কল্পনায় আমরা আমাদের অতীত দিনের মধুময় দিনগুলো ফিরে পাই। ভবিষ্যতে কি করবো বা কি হবো কল্পনার চোখে আমরা তাই দেখি। একশো বছর পরে কোন্ কাব্যরসিক তাঁর কবিতা পড়ছে কবি কল্পনায় তাকে দেখে প্রীতি-সম্ভাষণ জানান। কল্পনা শুধু কাব্য সৃষ্টি করে না, আমাদের জীবনের আদর্শ ও ভাবী জীবনের সম্ভাবনাকে কল্পনাই সামনে ধরে আমাদিগকে পরিচালিত করে। বস্তুতঃ মানুষের কৃষ্টি, সভ্যতা ও প্রগতির অনেকটা দর্শন আমরা পাই তাদের শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সাহিত্য প্রভৃতিতে, [illegible] যেখানে যতখানি উৎকর্ষ ও পূর্ণতা লাভ করেছে।

শিশুকাল থেকে আমাদের কল্পনাশক্তি যাতে উদ্বুদ্ধ হয় সে চেষ্টা করা তাই একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু একটা কথা এখানে মনে রাখা প্রয়োজন। কল্পনা সুসংযত ও সুসংলগ্ন না হলে কাব্য সৃষ্টি না হয়ে হয়ে যায় বাতুলের প্রলাপ; অলীক কল্পনা সৃষ্টি না করে করে অনাসৃষ্টি। শিশু-জীবনে অসংযত ও অলীক কল্পনা কতখানি ক্ষতি সংগঠন করতে পারে এ প্রবন্ধে তাই আলোচনা করব। মনের পূর্ণতর অভিব্যক্তি যেমন সুসংযত কল্পনার ভেতর দিয়ে হওয়া সম্ভব; অসংযত ও অলীক কল্পনা তেমনি জীবনের স্বাভাবিক বিকাশকে বিকৃত ও পঙ্গু করে দেয়। বাস্তবকে অতিক্রম ও তুচ্ছ করে যে কল্পনা প্রাধান্য লাভ করে, জীবনের সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতির পক্ষে তা কখনও অনুকূল হতে পারে না। শিশুর কল্পনাশক্তি কিভাবে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করলে তার মনের স্বাভাবিক বিকাশ অক্ষুণ্ণ ও সাবলীল হতে পারে এবং পরিণত বয়সে তা সৃজনী শক্তির উৎসরূপে ক্রিয়া করতে পারে প্রথমতঃ সাধারণভাবে তাই বলবার চেষ্টা করব। তারপর অলীক ও অসংযত কল্পনা দ্বারা মনের স্বাভাবিক স্ফূর্তি কতখানি পঙ্গু ও বিকারগ্রস্ত হবার আশংকা আছে তাই আলোচনা করব।

শিশুদের মন স্বভাবতঃই কোমল ও নমনীয়। শিশুরা যেমন কাল্পনিক একটা কিছুকে অতি সহজেই সত্য বলে বিশ্বাস করে নিতে সক্ষম, তেমনি বস্তুবিশেষ তাদের মনে অতি অল্প সময়েই গভীর রেখাপাত করতে পারে। যুক্তিতর্ক দিয়ে বিচার করবার মত যোগ্যতা তাদের নেই বলে বর্ণিত বিষয় বা বস্তু শিশুর চিত্তে বাস্তবরূপে সহজেই প্রতিভাত হয়। শিশু-চিত্তের এই স্বাভাবিক নমনীয়তা ও বিশ্বাসপ্রবণতা স্মরণ রেখে তাদের কাছে নানাভাবের গল্প ও কাহিনী সবিস্তারে এবং হৃদয়গ্রাহী করে বর্ণনা করলে শিশু বর্ণনা করবার কৌশল ও কৃতিত্ব ক্রমে আয়ত্ত করতে শিখবে। মাঝে মাঝে তাদেরে মনোহর বস্তু বা ঘটনা বর্ণনা করবার জন্যে বলে স্থলবিশেষে যোগ্য শব্দ ও উপমাদ্বারা সাহায্য করে তাদের বর্ণনাকে চিত্তগ্রাহী করবার চেষ্টা করা যেতে পারে। এতে শিশুর বর্ণনাশক্তি ক্রমে বৃদ্ধি পাবে। বর্ণনাকালে লক্ষ্য রাখতে হবে শিশু যেন

অবান্তর বিষয়ের অবতারণা না করে কিংবা বাস্তব জগৎ থেকে দূরে সরে না যায়। এভাবে চেষ্টা করলে শিশুর কল্পনাশক্তি ক্রমে সুসংযত হতে পারবে।

খেলাধূলোর ভেতর দিয়ে কল্পনাশক্তি উদ্বুদ্ধ ও বিকাশ করা যতখানি সহজ অন্য উপায়ে হয়ত ততখানি করা সম্ভব নয়। কল্পনাশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর জ্ঞানেরও সম্প্রসারণ অজ্ঞাতে হয়ে যায়। লাঠিকে ঘোড়া কল্পনা করে দৌড়ায়নি এমন সুস্থ শিশু হয়ত খুব অল্পই আছে। ইঁট বা দেশলাইয়ের বাক্স পর পর সাজিয়ে গাড়ী চালাবার চেষ্টা করতে বহু শিশুকেই দেখা যায়। পুতুলকে নিয়ে ঘরকন্না, মাই খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো ইত্যাদি করতে বালিকাদের সচরাচর দেখা যায়। শিশু-শিক্ষার পক্ষে এ সমস্ত ছোটখাটো বিষয়-গুলো কত মূল্যবান বিজ্ঞ শিক্ষকেরা আজ তা বুঝতে পেরেছেন। বই পড়িয়ে শেখাতে হলে যে শিক্ষা পনের দিন অথবা এক মাস সময় নেবে উপরিউক্ত "ছেলেমানষির" ভেতর দিয়ে শুধু তাদের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে অতি অল্প সময়েই তা শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হতে পারে। দেশলাইয়ের বাক্স সাজিয়ে শিশু যখন খেলছে, তাকে জিজ্ঞেস করা যাক, কিরে কি করছিস? শিশু জবাব দিলে গাড়ি চালাচ্ছি। গাড়ি চালাচ্ছিস! তো গাড়ি টানবে কে? শিশুকে এবার ইঞ্জিনের কল্পনা করতে হলো। তারপর সমস্যা এলো ইঞ্জিন চলবে কি করে। এল চালক, কয়লা, জল, এলো লোহার লাইনের চিন্তা। এভাবে চলল একটার পর একটা নতুন বিষয়। কথাবার্তার ভেতর অল্প সময়ে এবং খেলাধূলোর ভেতর দিয়ে নিজের অজ্ঞাতে শিশু কত কি শিখে ফেলল। এরূপ ক্ষেত্রে পিতামাতা এবং শিক্ষক যদি শিশুর খেলার সাথী হতে পারেন, তবেই শিশু শিক্ষার বহু জটিল সমস্যা অনায়াসে সমাধান করে নিতে পারেন। শিশুর মানসিক স্ফূর্তি কল্পনার ফুরফুরে হাওয়ায় স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল গতিতে চলতে থাকে।

এবার অসংযত কল্পনার কথা বলছি এবং তা একবার প্রশ্রয় পেলে কি অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি করার আশংকা আছে তাই বলছি। শিশুচিত্তের স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসপ্রবণতার কথা পূর্বে বলেছি। কাল্পনিক বস্তু বা ঘটনাকে সত্য বলে ধরে নেওয়া শিশুর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। অসংযত এবং অলীক কল্পনা যদি বাস্তবকে ডিঙিয়ে যায়, তবে শিশুর জীবনে কতক-গুলো অবাঞ্ছিত বিকৃত অবস্থা দেখা দেয়, যেগুলো তার জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ ও গতিকে ব্যাহত করে দেয়। বাস্তবকে রূপায়িত ও মনোহর করবার জন্যে কল্পনার প্রয়োজন। কিন্তু কল্পনা যে স্থলে বাস্তবকে ডিঙিয়ে চলে যায়, সে স্থলে বাতুলতা প্রকাশ পায়। বিশ্বাসপ্রবণ স্বচ্ছ শিশুচিত্ত অতি সহজেই কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করে নেয়। ফলে বাস্তব জগতে থেকেও শিশু কল্পনার রাজ্যে বাস করে। এরূপ শিশুর জগৎ বাস্তব জগতের বাইরে কল্পনার রাজ্যে। তাদের জগৎ যেন একটা স্বপ্নের জগৎ। জেগে থেকেও তারা যেন স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে যেমন আমরা দৃষ্ট জগৎকে মিথ্যা বলে মনে করি না; পক্ষান্তরে, স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুকে সত্য বলে মনে করে তদ্বৎ ব্যবহার করি, তেমনি এবম্বিধ শিশুও কাল্পনিক জগৎকে নিয়ে হর্ষবিষাদ ইত্যাদি উপভোগ করে। স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর আমরা আবার বাস্তব জগতে ফিরে আসি এবং স্বাপ্নিক জগতের অসারতা উপলব্ধি করি। কিন্তু যে শিশু সর্বদা কাল্পনিক জগতে বাস করে সে কখনও বাস্তব জগতে ফিরে আসতে পারে না। কারণ তার পক্ষে কাল্পনিক জগৎই বাস্তব জগৎ। অসংযত কল্পনা বিলাসের এরূপ বিকৃত ও অস্বাভাবিক পরিণাম শিশুর পক্ষে কখনই কল্যাণজনক হতে পারে না। তাই বলছি-লাম, শিশুর কল্পনাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে একথা লক্ষ্য রাখতে হবে শিশু বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন আছে কিনা। অসংযত কল্পনাবিলাসের কোন লক্ষণ প্রকাশ পেলে গোড়াতেই সে অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। এরূপ কল্পনাবিলাসকে সাধারণতঃ 'দিবাস্বপ্ন' বলা হয়। কিন্তু স্বপ্নের সঙ্গে এর তফাৎ এই যে স্বপ্ন জাগ্রত অবস্থায় থাকতে পারে না এবং স্বপ্ন ভেঙে গেলে তার অলীকতা ধরা পড়ে। কিন্তু এরূপ কল্পনাবিলাস জাগ্রত অবস্থায় থাকে বলেই একে 'স্বপ্ন' বলা ঠিক হতে পারে না। এটা একটা অস্বাস্থ্যকর বিকৃত অবস্থা, যার জন্যে বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্বাভাবিক অবস্থায় শিশু পরিবারের স্নেহময় নীড়ে এবং পারিপার্শ্বিক অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে বর্ধিত হবে। শিশু যদি পরিবার ও পারি-পার্শ্বিক বস্তু থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করে আপনার কল্পনার ঘূর্ণিপাকে আবর্তিত হতে থাকে, তবে তার চিত্তের কোন সহজ বৃত্তিই বিকাশ পাবার সুযোগ পেতে পারে না। কাজেই এরূপ শিশুর জীবন পক্ষাঘাত-গ্রস্ত রোগীর ন্যায় চিরদিনের জন্য পঙ্গু অথবা বিকল হয়ে থাকে। এ অবস্থায় শিশু সাধারণত অন্যের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলে এবং সর্বদা নির্জনতা ভালবাসে। দৃশ্যত এবং বস্তুত একা থাকলেও এরূপ শিশু নির্জন স্থানে কাল্পনিক সঙ্গীর সান্নিধ্য অনুভব করে ও কাল্পনিক সঙ্গীর সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করে। বলা বাহুল্য, এ উপায়ে শিশুর সহজ হৃদয়বৃত্তির আংশিক বিকাশ হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে পরস্পরের সক্রিয় ব্যবহারের ভেতর দিয়ে একে অন্যকে বোঝ-বার এবং ভাবের আদান-প্রদানের যে সম্ভাবনা আছে, নির্বাক ও নির্লিপ্ত কাল্পনিক সঙ্গীর সান্নিধ্যে তা হতে পারে না। তাই এ আংশিক বিকাশকে কখনও অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক বলা যায় না।

বাস্তবকে তুচ্ছ করে কল্পনা প্রাধান্যলাভ করলে অথবা কাল্পনিককে বাস্তব বলে ধরে নিলে উপরিউক্ত বিকৃত অবস্থা ছাড়া আরও যেসব অবাঞ্ছিত অসুস্থ অবস্থার উদ্ভব হতে পারে "নৈশ-ভীতি" তাদের অন্যতম। পরবর্তী প্রবন্ধে শিশুর নৈশ-ভীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।

ক্রমশ

অবসরে

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

শীতের রাত্রি, শাদা পর্দায় আকাশ ঢাকা,
বিশাল শূন্যে আবছা আলোক মেলেছে পাখা
নিচের পৃথিবী ঝিমায়ে পড়েছে নিঝুমে নীল,
মনের আকাশ তার মাঝে যেন পেয়েছে মিল।

এমন রাতেও পৃথিবীরে চিনি—ঝিমানো ভাষা
আমার মনের প্রচ্ছদপটে—সুখের আশা।
সেথা শুধু নয় মূক মাটি, মোর চোখের কোণে
শত মানুষের সুরমূর্ছনা রাগিণী বোনে।

শীতের হিমেল কঠিন হাওয়ায় জমেনি তারা
ঝরণার মত শিরায় আমার বহে সে ধারা।
শাদা কুয়াসায় আশার স্বপন পড়েনি ঢাকা;
আবছা আলোকে পৃথিবীর প্রাণ মেলেছে পাখা।

চিনেছি মানুষ মাঠে হাটে পথে নানান কাজে—
একতান তার মোর অনুভবে ছন্দে বাজে।
যুগে যুগে তারা কঠিন বাহুতে কাহিনী বোনে—
তাই নেমে আসে আজ অবসরে চোখের কোণে।

জনপ্রবাহ ও বাস্তব সভ্যতা

ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

সংক্ষেপে জনতত্ত্ব ও ভাষা প্রসংগ লইয়া বাঙালীর গোড়া পত্তনের কথা বলা হইল। এইবার বাস্তব সভ্যতার উপাদান উপকরণ এবং তাহার সংগে বাঙালীর ও বাংলা দেশের সম্বন্ধের একটা দিগ্‌দর্শন করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ। এই কৃষিই আমাদের প্রধান ধনসম্বল; এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদ পর্যন্ত যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা আমাদের দেশে চলিয়া আসিয়াছে তাহাকে যদি একান্তভাবে কৃষি সভ্যতা ও সংস্কৃতি আখ্যা দেওয়া যায় তাহা হইলে খুব অন্যায় হয় না। বারি-বহুল নদনদীবহুল সমতল প্রধান বাংলা দেশে উত্তর ভারতের অন্য প্রদেশাপেক্ষা কৃষির এক সমৃদ্ধতর রূপ দেখা যায়। এই কৃষি কার্য যে অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয় লোকেরাই আমাদের দেশে প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করিবার কারণ আছে। প্র্শিলুস্কি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, 'লাঙ্গল' কথাটাই অস্ট্রিক্ গোষ্ঠীর ভাষা হইতে গৃহীত। আনামীয় ভাষায় এই 'লাঙগল' শব্দের মূলের অর্থ 'চাষ করা' এবং 'চাষ করিবার যন্ত্র' দুই বস্তুকেই বুঝায়। খুব প্রাচীনকালেই 'লাঙগল', শব্দটি আর্যভাষায় গৃহীত হইয়াছিল। ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে, আর্য-ভাষীরা চাষ কার্য জানিতেন না এবং সেই-হেতু যে যন্ত্র দ্বারা চাষ করা হয় সে-যন্ত্রের সংগেও তাঁহাদের পরিচয় ছিল না। এই দুইই তাঁহারা শিখিয়াছিলেন মূলত অস্ট্রিক্ ভাষাভাষী লোকদের নিকট হইতে। তীক্ষ্ণ মুখ কাষ্ঠ-দণ্ড যন্ত্রের সাহায্যে প্রধানতঃ যে বস্তুর চাষ এই অস্ট্রিক্ ভাষী লোকেরা করিত তাহার নাম ধান বা ধান্য, এবং এই ধানই ছিল তাহাদের প্রধান খাদ্য-বস্তু। অস্ট্রিক্ ভাষী লোকেদের ভিতর যে-কৃষি-সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, সমতলভূমিতে ও স্তরে স্তরে পাহাড়ের গা কাটিয়া চাষের ব্যবস্থা করিয়া তাহারা বন্য ধানকে লোকালয়ের কৃষিবস্তু করিয়া লইয়াছিল এবং তাহাই ছিল তাহাদের প্রধান উপজীব্য। অস্ট্রিক্‌ভাষী লোকেদের বিস্তৃতি ভারতবর্ষে যে যে স্থানে ছিল সর্বত্রই এই ধান চাষেরও প্রচলন হইয়াছিল; তবে বারিবহুল নদনদী-বহুল সমতলভূমিতেই যে ধান বেশী জন্মাইত, ইহা ত খুবই স্বাভাবিক। সেই-জন্যই আসামে, বাংলা দেশে, উড়িষ্যায়, গুলিতে তাহার প্রসার লাভ করিয়াছিল বেশী; উত্তর ভারতে তত নয়। এখনও তাহাই। পরবর্তীকালে দ্রাবিড় ভাষী দীর্ঘমুণ্ড লোকেরা ভারতবর্ষে যব ও গম চাষের প্রচলন করে এবং যব ও গম উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ বিহার পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। যব ও গম ধানের মত তত বারি-নির্ভর নয়; উত্তর-ভারতে এই দুই বস্তুর চাষের বিস্তৃতি অনেকটা সেই কারণেই। জন-বিস্তৃতি ও জলবায়ুর কারণ দুটি একত্র করিলেই বুঝা যাইবে, উত্তর ভারতের লোকেরা কেন আজ পর্যন্তও সাধারণত রুটিভুক্ এবং বাংলা-আসাম-উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রশায়ী সমতলভূমির লোকেরা কেন ভাত-ভুক্।

ধান ছাড়া অস্ট্রিক্ ভাষী লোকেরা কলা, বেগুন, লাউ, লেবু, পান (বর), নারিকেল, জাম্বুরা (বাতাপী লেবু), কামরাঙ্গা, ডুমুর, হলুদ, সুপারি, ডালিম ইত্যাদিরও চাষ করিত। এই কৃষিদ্রব্যের প্রত্যেকটিই মূলত অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা হইতে গৃহীত, এবং ইহার প্রত্যেকটিই বাঙালীর প্রিয় খাদ্যবস্তু। এই সব শব্দের সংস্কৃত-প্রাকৃত অপভ্রংশ ও বাংলা রূপ লইয়া যেসব সুবিস্তৃত বিচার ও গবেষণা হইয়াছে তাহার মধ্যে ইতিহাসের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। আমি সেই শব্দতাত্ত্বিক বিস্তৃত পুনরুক্তির অবতারণা এখানে আর করিলাম না। কিন্তু চাষ বাসের সংগে ইহাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইলেও গো-পালন ইহারা জানিত বলিয়া মনে হয় না। বস্তুত, অস্ট্রিকভাষী লোকেদের মধ্যে আজও গো-পালনের প্রচলন কম; যাহাদের মধ্যে আছে তাহারা পরবর্তী কালে আর্যভাষীদের নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। যতদূর সম্ভব, গো-পালন আর্যভাষীদের সংগে জড়িত।

তবে, তুলার কাপড়ের ব্যবহার অস্ট্রিক্-ভাষীদেরই দান। কর্পাস (কার্পাস) শব্দটিই মূলত অস্ট্রিক। তাঁতী বা তন্তুবায়েরা যে প্রাচীন ও বর্তমান বাঙালী সমাজের নিম্নতর কারণ নির্দিষ্ট? পট (পট্ট বস্ত্র, বাঙলা পট্ট, পাট), কর্পট (=পট্টবস্ত্র) এই দুটি শব্দও মূলত অস্ট্রিক ভাষা হইতে গৃহীত। মেড়া বা ভেঁড়ার সংগে ইহারা পরিচিত ছিল, তাহা আগেই দেখিয়াছি। ভেড়ার লোম কি ইহারা কাজে লাগাইত? 'কম্বল' কথাটি কিন্তু মূলত অস্ট্রিক, এবং আমরা যে-অর্থে কথাটি ব্যবহার করি, সেই অর্থেই এই ভাষাভাষী লোকেরাও করে।

বুঝা গেল, অস্ট্রিক্‌ভাষী আদি অস্ট্রেলীয়েরা ছিল মূলত কৃষিজীবী। কিন্তু ইহাদের সবারই জীবিকা ছিল কৃষিকার্য একথা বলা যায় না। কতকগুলি শাখা অরণ্যচারীও ছিল। এই অরণ্যচারী নিষাদ ও ভীল, কোল শ্রেণীর শবর, মুণ্ডা গদব, হো, সাঁওতাল প্রভৃতিরা প্রধানত ছিল পশু-শিকারজীবী এবং পশু-শিকারে ধনুর্বাণই ছিল তাহাদের প্রধান অস্ত্রোপকরণ। বাণ, ধনু বা ধনুক, পীণাক এই সব কটি শব্দই মূলত অস্ট্রিক। যেসব পশু-শিকার করিত, অনুমান করা যায়, তাহাদের মধ্যে হাতী, মেড়া (ভেড়া), কাক, কর্কট (কাঁকড়া) এবং কপোতের (যাহার অর্থ শুধু পায়রাই নয়, যে কোনও পক্ষীও) নাম করা যাইতে পারে। গজ, মাতংগ, গণ্ডার (হস্তী অর্থে) এবং কপোত মূলত অস্ট্রিক্ ভাষা হইতে গৃহীত। অন্যান্য অস্ত্রোপকরণের মধ্যে দা' ও করাতের নামোল্লেখ করা যায়; ইহারাও অস্ট্রিক্ গোষ্ঠীর ভাষালব্ধ বলিয়া শব্দতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন।

সমুদ্রতীরশায়ী দেশ, দ্বীপ ও উপ-দ্বীপবাসী অস্ট্রিক্‌ভাষী মেলানেশীয়, পলিনেশীয় প্রভৃতি লোকেরা জলপথে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য গুঁড়ি-কাঠের একপ্রকার লম্বা ডোঙ্গা (এই কথাটিও অস্ট্রিক্) এবং লম্বা লম্বা খণ্ড খণ্ড গুঁড়ি কাঠ একত্র করিয়া ভাসমান ভেলার আকারে বড় বড় নৌকা তৈয়ারী করিত এ তথ্য জনতত্ত্ববিদেরা আবিষ্কার করিয়াছেন। গুঁড়ি কাঠের তৈরী ডিঙ্গা, ছোট নৌকা এখনও নদীখালবিলবহুল নিম্ন, পূর্ব ও উত্তর বংগে বহুল প্রচলিত। যাহাই হউক, এই সব ডোঙ্গা, ডিঙ্গা ও ভেলায় চড়িয়াই প্রাচীন অস্ট্রিক্‌ভাষী লোকেরা নদী ও সমুদ্র পথে যাতায়াত করিত এবং এইভাবেই তাহারা একটা বৃহৎ সামুদ্রিক বাণিজ্যও গড়িয়া তুলিয়াছিল।

বস্তুত বাংলা তথা ভারতীয় সভ্যতা ও

ত প্রাচুর্য দেখিয়াই লেভি সাহেব বলিয়াছিলেন,—

"We must know whether the legends, the religion and the philosophical thoughts of India do not owe anything to this past. India has been too exclusively examined from the Indo-European standpoint. It ought to be remembered that India is a great maritime country ....the movement which carried the Indian colonisation [in historical times] towards the Far East..was far from inaugurating a new route ..Adventurers, traffickers and missionaries profited by the technical progress of navigation and followed under better conditions of comfort and efficiency, the way traced from time immemorial, by the mariners of another race, whom Aryan or Aryanised India despised as savages." *

নির্মলকুমার বসু মহাশয় আর একটি জনগত তথ্যের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ অযৌক্তিক নয়। আসামে, বাংলাদেশে, উড়িষ্যায়, দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে সকল স্থানেই লোকেরা সাধারণত রান্নার কাজে সরিষা, নারিকেল, অথবা তিল তৈলের ব্যবহার করিয়া থাকে; সেলাইবিহীন উত্তর ও নিম্নবাস, সাধারণত ধুতি, চাদর, উড়্নি, উত্তরীয় ইত্যাদির ব্যবহারই এইসব দেশের জনসাধারণের পরিধেয়; আর যে-পাদুকার ব্যবহার ইহারা করে তাহার পশ্চাদ্ভাগ উন্মুক্ত। বিহারের পশ্চিম প্রান্ত হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত ভূখণ্ডের অধিবাসীরা কিন্তু পরিবর্তে ব্যবহার করে ঘৃত, সেলাই করা জামা কাপড় এবং বন্ধ-গোড়ালি পাদুকা। এই পার্থক্যের মধ্যে জন-পার্থক্যের ইঙ্গিত যে আছে তাহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না, কারণ, জলবায়ুর পার্থক্য দ্বারা ইহার সবটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

এ পর্যন্ত অস্ট্রিক্‌ভাষী আদি-অস্ট্রেলীয়দের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, ইহাদের মধ্যে যে সব শ্রেণী সভ্য তাহারা যে বাস্তব সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা গ্রামীণ, একান্ত ভাবে গ্রামকেন্দ্রিক। কৃষিজীবী বলিয়া খাদ্যাভাব ইহাদের মধ্যে বড় একটা ছিল না এবং লোক বৃদ্ধিও যথেষ্ট ছিল এ অনুমান করা যাইতে পারে। বর্তমান অস্ট্রিকভাষী লোকদের সাক্ষ্য যদি প্রামাণ্য হয় তাহলে স্বীকার করিতে হয় যে, ইহাদের কোনও কোনও প্রাগ্রসর শাখার সমাজবন্ধন নিজেদের গ্রাম অতিক্রম করিয়াও বিস্তৃত হইত। মুণ্ডাদের মধ্যে কয়েকটি গ্রাম মিলিয়া গ্রামসঙ্ঘের মত একটা সমাজবন্ধন এখনও দেখা যায়। শরৎকুমার রায় মহাশয় ত মনে করেন, "পঞ্চায়ত প্রথা সম্ভবত ভারতে প্রথম ইহাদেরই প্রবর্তিত। পঞ্চায়তকে ইহারা সত্য সত্যই ধর্মাধিকরণ জ্ঞানে মান্য করে। এখনও আদালতে সাক্ষ্য দিবার পূর্বে কোনও মুণ্ডা সাক্ষী তাহার জাতি-প্রথা অনুসারে 'পঞ্চের' নাম লইয়া এই বলিয়া শপথ করে, 'সিরমারে-সিঙ্গ-বোঙ্গা ওতেরে পঞ্চ', অর্থাৎ—আকাশে সূর্য দেবতা, পৃথিবীতে পঞ্চায়ত।" তিনি একথাও বলেন যে, "ইহাদের মধ্যে কোন কোন জাতির কিংবদন্তী আছে যে, এক সময়ে ভারতে ইহাদের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গণ-তন্ত্র (?) রাজ্য ছিল। রাজশক্তির চিহ্ন-স্বরূপ মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি জাতির প্রত্যেক গ্রামসঙ্ঘ ও গ্রামে এখনও বিভিন্ন চিহ্ন অঙ্কিত পতাকা সযত্নে ও সসম্মানে রক্ষিত হয়। মধ্যপ্রদেশে দ্রাবিড় [ভাষী] পূর্বে গন্দ জাতির শক্তিশালী সমৃদ্ধ রাজ্য আধুনিককাল পর্যন্ত ছিল। গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় রাজ্যাধিকারের কিংবদন্তী মুণ্ডা প্রভৃতি কয়েকটি জাতির মধ্যে এখনও বর্তমান।"*

অস্ট্রিক্‌ ভাষাভাষী লোকেদের বাস্তব সভ্যতার কিছুটা আভাস পাওয়া গেল এবং সে-সভ্যতা বাংলাদেশে কতখানি বিস্তৃতি-লাভ করিয়াছিল তাহারও খানিকটা ধারণা ইহার ভিতর পাওয়া গেল। দীর্ঘমুণ্ড দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোকেদের বাস্তব সভ্যতার উপাদান উপকরণ আরও প্রচুর। মিশর হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের উত্তর ও দক্ষিণ পর্যন্ত এক দীর্ঘমুণ্ড জন এবং পরবর্তীকালে ভূমধ্য জন-সংপৃক্ত আর এক দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠী এই দুই জনের রক্তধারার সংমিশ্রণে ভারতবর্ষে সিন্ধুনদের উপত্যকা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত পর্যন্ত এবং উত্তর ভারতেও প্রায় সর্বত্রই এক বিরাট নরগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের কোনও কোনও স্থানে, উত্তর ভারতের ২।৩টি স্থানে আকস্মিক আবিষ্কারে, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ কাহিনীতে, কিন্তু বিশেষ-ভাবে হরপ্পা, মহেন্‌-জো-দাড়ো এবং নাল প্রভৃতি নিম্ন সিন্ধু উপত্যকার একাধিক স্থানের প্রাচীনতম ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এই নরগোষ্ঠীর বাস্তব সভ্যতার যে-চিত্র আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়াছে তাহা আজ সর্বজনবিদিত। সাম্প্রতিককালে এ সম্বন্ধে আলোচনা-গবেষণাও হইয়াছে প্রচুর। তাহার বিস্তৃত আলোচনার স্থান এখানে নয়, প্রয়োজনও কিছু নাই। তবু এই নরগোষ্ঠীর সভ্যতার উপাদান উপকরণের মোটামুটি একটু পরিচয় লইলে ভারতবর্ষের এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের সভ্যতার অন্যতম মূল সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করা যাইবে।

নব্য প্রস্তর যুগের এই দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোকেরাই ভারতবর্ষের নাগর-সভ্যতার সৃষ্টিকর্তা। আর্যভাষায় 'উর', 'পুর', 'কুট' প্রভৃতি নগর-জ্ঞাপক যে-সব শব্দ আছে সেগুলি প্রায় সবই দ্রাবিড় ভাষা হইতে উদ্ভূত। রামায়ণে স্বর্ণলঙ্কার বিবরণ, মহাভারতে ময়দানবের গল্প, মহেন্‌-জো-দাড়োর নগরবিন্যাসের উন্নত ও সমৃদ্ধরূপ, ভারতের বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ সমস্তই প্রাক্‌-আর্যভাষী দীর্ঘমুণ্ড দ্রাবিড় ভাষাভাষী নরগোষ্ঠীর নগর-নির্ভর সভ্যতার দিকে ইঙ্গিত করে, একথা কতকটা নিঃসংশয়ে অনুমান করা চলে। নগর-নির্ভর সভ্যতা জটিল; এবং এই সভ্যতার উপাদান উপকরণ বহুল এবং জটিল হইতে বাধ্য। বিচিত্র খনিজবস্তুর ব্যবহার তাহার অন্যতম প্রমাণ। এই গোষ্ঠীর লোকেরা সোনা, রূপা, সীসা, ব্রোঞ্জ ও টীনের ব্যবহার জানিত; শিলাজতু, নানাপ্রকারের পাথর, জান্তব হাড়, পোড়ামাটি, ও নানাপ্রকার খনিজ ও সামুদ্রিক দ্রব্য ইত্যাদি নিজেদের বিচিত্র প্রয়োজনে অলংকরণে বিচিত্ররূপে ও রচনায় ব্যবহার করিত। বর্শা, ছুরি, খড়্গ, কুঠার, তীর, ধনুক, মুষল, বাঁটুল, তরবারি, তীরের ফলা ইত্যাদি ছিল ইহাদের অস্ত্রোপকরণ। পাথরের হলমুখ, চক্‌মকি পাথরের ছুরি ও কুঠার, নানাপ্রকার ধাতু ও মাটির থালাবাটি ইত্যাদি বিচিত্ররূপের নিত্যব্যবহার্য গৃহোপকরণ, মাটীর তৈয়ারি নানাপ্রকারের খেলনা, তামা ও ব্রোঞ্জের দেহসজ্জা-উপকরণ, খেলার জন্য গুটি, গুলি ও পাশা ইত্যাদি অসংখ্য, বিভিন্ন ও বিচিত্র উপাদান এই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। গরুর গাড়িও এই সভ্যতারই দান বলিয়া মনে হয়। সুতোকাটা, কাপড় বোনা ত ইহারা জানিতই। যব ও গম, মাছ, মেষ, শূকর ও কুক্কুট মাংস ছিল ইহাদের প্রিয় খাদ্যবস্তু; বৃহৎ বৃষ (কুকুদ্মান), গরু, মহিষ, মেষ, হাতী, উট, শূকর, ছাগল, কুক্কুট বা মুরগী, কুকুর ও ঘোড়া ছিল ইহাদের গৃহপালিত জন্তু। ইহাদের বিলাস দ্রব্যের প্রাচুর্য এবং আরাম উপভোগের উপকরণের যে-পরিচয়, নানাপ্রকার হস্ত ও কারুশিল্পের যে-পরিচয় সিন্ধু উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষে এবং রামায়ণ-মহাভারতের অসংখ্য বিবরণের মধ্যে পাওয়া যায় তাহাতেও এক সমৃদ্ধ নগর-নির্ভর সভ্যতার দিকে ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। তাম্র-প্রস্তরযুগের চিত্রকলার, জ্যামিতিক রেখাঙ্কন এবং অলঙ্করণের, মাটীর পুতুল ও খেলনায় চারুকলার যে-রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত তাহাও এই দ্রাবিড়ভাষী দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠীরই সৃষ্টি একথা মনে করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। ছোট বড় রাস্তা, জলনিঃসরণের প্রণালী, বড় ছোট একাধিক তলবিশিষ্ট ইটকাঠের বাড়ি, দুর্গ, সিঁড়ি, খিলান

* Pre-Aryan and [illegible]

প্রভৃতি নগর-বিন্যাসের যাহা কিছু অত্যাবশ্যক উপাদান, তাম্র-প্রস্তরযুগীয় দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠীর রচিত বাস্তব সভ্যতায় তাহার কিছুরই যে অভাব ছিল না হরপ্পা ও মহেন্-জো-দাড়োর ধ্বংসাবশেষে তাহা প্রমাণ করিয়াছে।

তামা, লোহা, ব্রোঞ্জ, সোনা, কাঠ ইত্যাদির ব্যবহার এবং এসব বস্তুর সাহায্যে কারুশিল্প যে ইহারা জানিত তাহার একটু অপরোক্ষ প্রমাণ ভাষাতত্ত্বের মধ্যেও পাওয়া যায়। বাংলা কামার, পরবর্তী সংস্কৃত কর্মকার ত দ্রাবিড় ভাষার 'কর্মার' শব্দ হইতেই গৃহীত। চারুশিল্পের সঙ্গে পরিচয়ের প্রমাণ 'রূপ' ও 'কলা' এই দুইটি দ্রাবিড় শব্দে। মৃৎপাত্র যে তৈরি করিত তাহার নাম হইতেছে 'কুলাল'; বানর, গণ্ডার ও ময়ূরের সঙ্গে পরিচয়ের প্রমাণ 'কপি', 'মর্কট', 'খড়্গ' (জন্তু অর্থে) ও 'ময়ূর প্রভৃতি দ্রাবিড় শব্দ। চালের যে কটি শব্দ আছে সংস্কৃতভাষায়, তাহার মধ্যে অন্তত দুইটি, 'তণ্ডুল' ও 'ব্রীহি', দ্রাবিড়-ভাষা হইতে গৃহীত। লক্ষণীয় ইহাই যে এই প্রত্যেকটি শব্দই ঋগ্বেদ ও ব্রাহ্মণ হইতে আহৃত। আর্য সভ্যতার প্রথম স্তরের ইতিহাসেই দ্রাবিড় সভ্যতার বাস্তব উপকরণ-গত এইরূপ অনেক শব্দ ঢুকিয়া পড়িয়াছে। পরবর্তীকালে সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে বস্তু-বাচক আরও কত অসংখ্য শব্দ যে ঢুকিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এইসব বস্তুর সঙ্গে যদি পূর্ব হইতেই আর্যভাষীদের পরিচয় থাকিত তাহা হইলে হয়ত তাহাদের ভাষায় সেইসব বস্তুর নামও থাকিত; ছিল না বলিয়াই হয়ত এমন ভাষাভাষী লোকেদের নিকট হইতে তাহা ধার করিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইতে হইয়াছে যাহাদের মধ্যে সেইসব বস্তু ছিল এবং সেইহেতু তাহাদের নামও ছিল, এবং যাহাদের সঙ্গে আর্যভাষীদের পাশাপাশি বাস করিতে হইয়াছে, কখনও শত্রুভাবে, কখনও মিত্র-ভাবে। এইসব বস্তুবাচক অসংখ্য শব্দের ইতিহাসের মধ্যে দ্রাবিড় ভাষাভাষীর উন্নত বাস্তব সভ্যতার ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট।*

দ্রাবিড় ভাষাভাষী বিভিন্ন দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠীর রক্তপ্রবাহ বাংলাদেশে কতখানি সঞ্চারিত হইয়াছে বা হয় নাই তাহার ইঙ্গিত আগেই করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের ভাষা ও বাস্তব সভ্যতার চলমান প্রবাহ যে বাংলার ভাষা ও সভ্যতার প্রবাহে স্রোত-ধারা সঞ্চার করিয়াছে এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার উপায় নাই। এই ভাষা-প্রভাব ও সভ্যতার বাহক কিন্তু যতদূর অনুমান করা যায়, দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোকেরা নিজেরা ততটা নয় যতটা আর্যভাষীরা নিজেরা। বাংলা দেশের 'আর্যীকরণের' আগে অ্যালপো-দীনারীয় ও নর্ডিক লোকেরা যতটা দ্রাবিড় ভাষীদের ভাষা ও বাস্তব সভ্যতা আত্মসাৎ করিয়াছিল, তাহারই অনেকখানি অংশ আর্যীকরণের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা দেশে সঞ্চারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তবে প্রত্যক্ষ স্পর্শ যে লাগে নাই তাহা জোর করিয়া বলা যায় না; বাংলা ভাষার কিছু কিছু শব্দ ও পদরচনা রীতি এবং ব্যাকরণ পদ্ধতিতে যে দ্রাবিড় প্রভাব সুস্পষ্ট তাহা ত আগেই বলা হইয়াছে; বাস্তব সভ্যতায় এই দ্রাবিড় ভাষাভাষী নরগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ প্রভাব এতটা সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র না হইলেও সাধারণভাবে ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র না হইবার কারণ আর্যভাষী অ্যালপো-দীনারীয় ও আদি নর্ডিক লোকেরা সেই প্রভাবকে একান্তভাবে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিল এবং আজ আমরা তাহাকে আর্যভাষী লোকের সভ্যতার অঙ্গীভূত করিয়াই দেখি। তবু মনে হয়, বাঙালীর টাটকা ও শুকনা মৎস্যাহারে অনুরাগ, মৃৎশিল্প ও অন্যান্য কারুশিল্পে দক্ষতা, চারুশিল্পের অনেক জ্যামিতিক নক্সা ও পরিকল্পনা, নগর সভ্যতার যতটুকু সে পাইয়াছে তাহার অভ্যাস ও বিকাশ, বিলাসোপকরণের অনেক সামগ্রী, জলসেচনে উন্নততর চাষের অভ্যাস প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষাভাষী নরগোষ্ঠী প্রবাহেরই ফল। মহেন্-জো-দাড়োর ও হরপ্পার দীর্ঘমুণ্ড লোকেরা যে মৎস্যাহারী ছিল তাহার প্রমাণ সুবিদিত; বৈদিক আর্যেরা ছিলেন মাংসাহারী; কিন্তু পরবর্তী কালে নানাকারণে, বিশেষতঃ বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর অহিংসাবাদের অভ্যুদয়ে, প্রাণী হত্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে মাংসাহারের এবং মৎস্যাহারের প্রতি একটা বিরাগ আর্য ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে এবং আর্য-সংস্কৃতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দ্রাবিড়ভাষী লোকদের দেশেও তাহা সংক্রামিত হয়। বাংলা দেশে এই সংস্কৃতির বিস্তার অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছিল বলিয়া এদেশে মৎস্যাহারের প্রতি বিরাগ উৎপাদন ততটা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য, এদেশের নদনদী বহুল জলবায়ু এবং মাছের সহজলভ্যতা এই অনুরাগের আর একটি প্রধান কারণ, একথাও অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া, আগে হইতেই অস্ট্রিক ভাষাভাষী লোকেদের ভিতরও মৎস্যাহারের প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়।

অ্যালপো-দীনারীয় নরগোষ্ঠীর বাস্তব-সভ্যতার রূপ যে কি ছিল, তাহা বলিবার কিছু উপায় নাই। নানা কারণে মনে হয় বৈদিক আর্যভাষীদের ভাষা ও সভ্যতা হইতে তাহার এক পৃথক অস্তিত্ব ছিল পূর্ব ভারতের অ্যালপো-দীনারীয় অবৈদিক আর্যভাষীদিগকে বৈদিক আর্যভাষীরা ঘৃণার চক্ষেই দেখিত এবং তাহাদের অভিহিত করিত "ব্রাত্য" বলিয়া। এই "ব্রাত্য" অবৈদিক আর্যদের ভিতর হইতেই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সূচনা বলিয়া অনুমান করিলে ইতিহাস-অসম্মত কিছু বলা হয় না। আর যেহেতু ইঁহারাও ছিলেন আর্যভাষী, সেই-হেতু ইঁহারা যে নিজেদের ধর্মানুশাসন-গুলিকে বলিতেন, 'আর্যসত্য' তাহাতে কিছু অন্যায় হয় নাই। "ব্রাত্যষ্টোম" যজ্ঞ করিয়া ইঁহাদের শুদ্ধিসাধন করিয়া নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিবার একটা কৌশল বৈদিক আর্যেরা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহারা যে (বৈদিক ভাবে ও ধ্যানে, অর্থাৎ ধর্মে) "অদীক্ষিত" তাহা বলিতেও ছাড়েন নাই। এই তথ্য হইতে মনে হয়, এই অ্যালপো-দীনারীয় অবৈদিক আর্যভাষীদের স্বতন্ত্র একটা বাস্তব-সভ্যতার রূপও ছিল; কিন্তু তাহা অনুমান করিবার উপায় আজ আর কিছু অবশিষ্ট নাই।

বৈদিক আর্যভাষীদের বাস্তব সভ্যতা ছিল একান্তই প্রাথমিক স্তরের। খড় বাঁশ লতা-পাতার স্বল্পকালস্থায়ী কুঁড়েঘরে ইহারা বাস করিত, গো-পালন জানিত, পশুমাংস পোড়াইয়া তাহাই আহার করিত এবং দলবদ্ধ হইয়া এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইত। যাযাবরত্ব ত্যাগ করিয়া এদেশে আসিয়া স্থিতিলাভ করিবার পর পূর্ববর্তী অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোকদের সংস্পর্শে আসিয়া যথাক্রমে কৃষি অর্থাৎ গ্রামীণ সভ্যতা এবং নাগর-সভ্যতার সঙ্গে ধীরে ধীরে তাহাদের পরিচয় ঘটিল এবং ক্রমে তাহারা দুই সভ্যতাকেই একান্তভাবে আত্মসাৎ করিয়া নিজস্ব এক নূতন সভ্যতা গড়িয়া তুলিল। এই সভ্যতার বাহন হইল আর্যভাষা। এই দুই সভ্যতার সমন্বিত আর্যীকরণই হইল আর্যভাষীদের বিরাট কীর্তি; অথচ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে তাহাদের একান্ত নিজস্ব কিছু তাহাতে বিশেষ নাই।

বাংলা দেশ ও বাঙালীর বাস্তব সভ্যতার রূপ শুধু প্রাচীনকালেই নয়, ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত একান্তভাবেই গ্রামীণ, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। দ্রাবিড় ভাষা-ভাষী লোকদের উদ্ভূত নাগর-সভ্যতার স্পর্শ বাংলা দেশে খুব কমই লাগিয়াছে; সেইজন্যই সুদীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী বাংলার ইতিহাসে নগরের প্রাধান্য নাই বলিলেই চলে। উত্তর ভারতে রাজগৃহ, পাটলীপুত্র, সাকেত, শ্রাবস্তী, হাস্তিনপুর, পুরুষপুর, শকলপুর, অহিচ্ছত্রা

*Caldwell, Comparative Grammar of Dravidian, Pp. 565ff.; Konow, Notes on Dravidian Philology, Ind. Ant. 1903, Pp. 449—458; Ling. Sur. Ind. Vol. IV, Pp. 276 ff.; K. Amrita Row, Dravidian elements in the Prakrits. Ind. Ant., Feb., 1917, P. 33—36. Note on the non-Aryan elements in Hindi Speech. Ind. Ant. Jan. 1916, P. 16. Mazumdar, বাঙলা-ভাষায় দ্রাবিড়ী উপাদান, পৌষ, সা-প-পত্রিকা, ১৩২০।

কান্যকুব্জ, 'তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, বিদিশা, কৌশাম্বী প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের অসংখ্য সামুদ্রিক বাণিজ্যের বন্দর ও পুর, নগর প্রভৃতি ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, বাংলা দেশে বাংলার ইতিহাসে নগর-নগরী সে-স্থান অধিকার করিয়া নাই। বস্তুত বাংলাদেশে নগরের সংখ্যাও কম এবং সমাজবিন্যাসে নগরের প্রাধান্যও কম। একথা অন্যত্র আরও পরিষ্কার করিয়া বলিবার সুযোগ হইয়াছে; এখানে এইটুকু বলিলেই চলিতে পারে যে, নাগর-সভ্যতার স্পর্শ বাংলা দেশে যে যথেষ্ট লাগে নাই, তাহার কারণ বাংলা দেশ চিরকালই ভারতের এক-প্রান্তে নিজের কৃষি ও গ্রামীণ সভ্যতা লইয়া পড়িয়া থাকিয়াছে; সর্বভারতীয় প্রাণ-কেন্দ্রের সংগে তাহার যোগ আর্যভাষা ও আর্য-সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে অবলম্বন করিয়াই এবং সেই সূত্রে সে দ্রাবিড় ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির যতটুকু প্রবাহ-স্পর্শ পাইয়াছে, তাহাই বোধ হয় তাহার দ্রাবিড়ী উপাদান এবং সে উপাদান তাহার মূল অস্ট্রিক্-উপাদানকে একান্তভাবে বিলোপ করিতে পারে নাই। ঐতিহাসিক কালেও দক্ষিণ হইতে নানা সমরাভিযান এবং আদান-প্রদানের ফলে বাংলা দেশে কিছু কিছু দক্ষিণী দ্রাবিড়-প্রভাব আসিয়াছে, সন্দেহ নাই; বাংলাদেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসে তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায় ভাষায়, বাস্তব সভ্যতার কিছু কিছু উপাদান উপকরণে এবং মানস-সংস্কৃতিতে। তাহা স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার স্থান এখানে নয়।

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

প্রোটিনের জন্য সোয়াবিন

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য ডি-টি-এম্

জীবনীশক্তি আর স্বাস্থ্যসম্পদ মানুষের শরীরে যতটা থাকা উচিত, আমাদের দেশের লোকের পক্ষে যে তার চেয়ে অনেক কম রয়েছে এটা আমরা কেবল আজই কিছু কিছু বুঝতে পারছি। বিগত সায়ান্স কংগ্রেসে ডাক্তার হারদিকার এ বিষয়ে কতকগুলি দামী কথা বলেছেন। প্রকৃত স্বাস্থ্যযুক্ত জীবন আর রোগশূন্য জীবন, এই দুটি ঠিক এক জিনিস নয়। রীতিমত স্বাস্থ্যবান হ'য়ে থাকা আর রীতিমত অসুস্থ হওয়া, এই দুইয়ের মধ্যে অনেক রকম স্তরের অবাঞ্ছিত অবস্থা আছে। আপাত সুস্থ দেখালেও অনেক ক্ষেত্রে তাকে ঠিক স্বাস্থ্যের অবস্থা বলা চলে না, স্পষ্ট রোগ না হ'লেও সেগুলিকে অস্বাস্থ্যই বলতে হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক এই অবস্থাতে প্রায় সারা জীবন কাটায়। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য যার আছে সে নির্ভয়ে খেতে পারবে, অক্লেশে খাটতে পারবে, আবার তার পরেও বাহুল্য স্বরূপ খেলাধুলায় বা ইচ্ছামত অন্যান্য কাজে যোগ দিয়ে স্ফূর্তিতে জীবন কাটাতে পারবে—আর এই উদ্বৃত্ত জীবনীশক্তির বহর দেখেই বলা যেতে পারবে, কার কতখানি স্বাস্থ্যের মাত্রা। এই হলো প্রকৃত স্বাস্থ্যের মাপকাঠি, আর এই মাপকাঠি দিয়ে একটি মানুষের স্বাস্থ্যকেও যেমন মাপা যায়, একটি জাতির স্বাস্থ্যকেও তেমনি মাপা যায়। সেই অনুসারে বর্তমানকালে যুদ্ধরত জাতিদের কার্যকলাপ দেখে বলা যেতে পারে যে, তারা প্রকৃতই স্বাস্থ্যবান্। তার প্রমাণ-স্বরূপ ব্রিটিশ জাতির সম্বন্ধেই দেখা যায় যে, কয়েক বছর যাবৎ সমানে যুদ্ধ ক'রেও এখনও তারা উৎসাহশূন্য হয়নি, তাদের জীবনের কোনো আনন্দই এই যুদ্ধের বিভ্রাটে ব্যাহত হয়নি, এমনকি যুদ্ধান্তর-কালে জগতের কোথায় কি সংস্কার বা উন্নতি করতে হবে, সে বিষয় নিয়ে যুদ্ধের মধ্যেও মাথা ঘামাবার মতো উদ্যম এবং অবসর তাদের যথেষ্টই রয়েছে। অনুরূপ কোনো বিভ্রাটের অবস্থায় পড়লে আমাদের দেশের বর্তমানকালের লোকেরা কেমন-ভাবে তাকে গ্রহণ করতে পারতো, সেটা অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে যে, ওদের তুলনায় আমাদের জীবনীশক্তি আর স্বাস্থ্য-সম্পদের মাত্রা কত কম। এমনিতে আমরা কায়ক্লেশে জীবনধারণ ক'রে আছি বটে, কিন্তু তার চেয়ে বাহুল্যস্বরূপ কিছু করতে গেলেই আমরা অবিলম্বে ভেঙে পড়বো। শুধু তাই নয়, ওদের চেয়ে আমাদের জীবনী-শক্তি যে কত কম, তা দুই জাতের পরমায়ু-তালিকা তুলনা ক'রে দেখলেই আরো স্পষ্ট বোঝা যাবে। ইংলণ্ডের বাৎসরিক জন্মসংখ্যা হাজারকরা ১৫, ভারতবর্ষের জন্মসংখ্যা ঠিক তার দ্বিগুণ। কিন্তু এদিকে ইংলণ্ডে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা হাজারকরা ৭২, সেই জায়গায় আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ২৫০—প্রায় চতুর্গুণ। ইংলণ্ডে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষ বেঁচে থাকে হাজারকরা ৭৪৭ জন, আমাদের দেশে ঐ বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে হাজারকরা মাত্র ২৪০ জন। ইংলণ্ডে পঁচাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে আছে হাজারকরা ২৯৬ জন, আর আমাদের দেশে ঐ বয়স পর্যন্ত বেঁচে আছে হাজারকরা মাত্র ৪০ জন। ওদের তুলনায় আমাদের পরমায়ু কত কম। অবশ্য, নানা-রকম রোগেই আমাদের অনেক অকালমৃত্যু ঘটায়, কিন্তু সেই রোগগুলিও একেবারে অনিবার্য নয়। আর তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধশক্তিও খুব অল্প। আমরা যেন সেই গাছে জন্মেছি, যা প্রতি বৎসর ফল দেয় প্রচুর, কিন্তু অধিকাংশ ফলই পাকতে পায় না, কাঁচা থাকতে থাকতেই ঝরে পড়ে।

আমাদের দেশের লোকের এমন স্বল্পায়ু জীবন আর রোগপ্রবণতা ঘট্‌বার কারণ কি? ডাক্তার হারদিকার সে বিষয়েও একটা যুক্তি-পূর্ণ ইঙ্গিত করেছেন। তিনি অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে, ভারতবর্ষের গরীব লোকদের মধ্যে প্রায়ই যে উদরীরোগ দেখা যায়, অনেক স্থলে তার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। যারা কেবল ভাত খেয়েই পেট ভরায়, অর্থাৎ ভাত ছাড়া অন্য কোনো রকমের খাদ্য যাদের-ভাগ্যে জোটে না, তাদের মধ্যেই এই রোগটা প্রায় দেখা যায়। দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যের অভাব ঘট্‌লে যেমন প্রায়ই লোকের হাতে পায়ে জল জমে, এও অনেকটা তারই সামিল। প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের অভাবেই এটা হয়। কেবল উদরী নয়, অন্যান্য অনেক রকমের অসুস্থতা এই জাতীয় খাদ্যের অভাবে ঘট্‌তে পারে। তিনি বলেন যে আর কিছু নয়, ভাত ছাড়াও যদি কেবল একটু দুধ খাবার ব্যবস্থা করতে পারা যায়, তাহ'লে এই সব রোগ ঘট্‌তে পারে না।

খাদ্যই শরীরকে খাট্‌বার শক্তি দেয়, আবার খাদ্যই শরীরের আয়ুরক্ষা করে। কিন্তু যে-কোনো এক রকমের খাদ্যের দ্বারাই এই দুই রকমের কাজ সম্ভব হবে, এমন কথা মনে করা উচিত নয়। কতকগুলো খাদ্য আছে, যা কেবল শক্তিদানই করতে পারে (energy-giving food), আর কতকগুলো আছে যা শরীরকে রক্ষা কর

পারে (protective food)। দুই রকমই খাওয়া চাই। দুবেলা পেট ভরে কেবল ভাত খেয়ে গেলেই যে শরীরের সর্বাঙ্গীণ পুষ্টির ব্যবস্থা হয়ে গেল, এমন কথা মনে করা ভুল। ভাত-রুটির যতটুকু ক্ষমতা, ততটুকুই সে করবে, তার বেশি করবার সাধ্য নেই। ভাত-রুটি প্রভৃতি হচ্ছে কেবল শক্তিদায়ক খাদ্য, আর প্রোটিন হচ্ছে রক্ষাকারী খাদ্য। তাই ভাত-রুটি ছাড়াও কিছু প্রোটিন খাওয়া নিতান্তই দরকার, প্রত্যেকেরই পক্ষে। স্বয়ং প্রোটিন ছাড়া প্রোটিনের ঐ বিশিষ্ট কাজটি আর কোনো খাদ্যের দ্বারাই সম্ভব হবে না। প্রোটিনের কাজ হচ্ছে শরীরকে গঠন দেওয়া, শরীরকে পুষ্ট রাখা, শরীরকে আয়ু দান করা। প্রোটিনজাতীয় পদার্থ কিসে কিসে আছে, তা বলতে হ'লে অনেক রকম খাদ্যেরই নাম করা যায়, কিন্তু সবগুলি সমান কাজের নয়। সার্থকনামা প্রোটিন বলতে বোঝায় মাংস, মাছ, ডিম, দুধ। ভাত-রুটি ছাড়াও এর মধ্যে কিছু না কিছু প্রত্যহ আমাদের প্রত্যেকেরই খাওয়া চাই। ব্রিটিশজাতি শীত-প্রধান দেশে থাকে, তারা সকলেই দৈনিক কিছু মাংস খায় এবং ডিমও খায়, তাছাড়া দুধ ছানাও খায়; সুতরাং তাদের সম্বন্ধে কিছুই বলবার নেই। আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক, সাধারণত মাংসাশী নই, যদিও খাই তো কালেভদ্রে। প্রত্যহ মাংস কিংবা ডিম আমাদের দেশের খুব কম লোকেই খায়। বাঙালীদের একটা বিশেষত্ব আছে, তারা প্রত্যহ মাংসাদি না খেলেও প্রত্যহ কিছু কিছু মাছ খায়। কিন্তু তার মধ্যেও আবার অনেক নিরামিষাশীর দল আছে। আর ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশের লোকই নিষ্ঠাপূর্বক নিরামিষাশী, তারা মাছ মাংস ডিম প্রভৃতি স্পর্শও করে না। সুতরাং তাদের পক্ষে প্রোটিন-খাদ্যরূপে সম্বল কেবল দুধ। দুধই অবশ্য সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রোটিন এবং সেই হিসাবে মাংসের চেয়েও ভালো। যাদের দৈনিক দুধ খাবার সামর্থ্য আছে, তারা অবশ্য দুধই খাবে, সুতরাং তাদের সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই। কিন্তু এ সামর্থ্য আমাদের দেশে ক'জন লোকের আছে? আগেকার দিনে তবু দুধ কিছু সুলভ ছিল, ঘরে ঘরে গরু পুষে দুধ খাবার ব্যবস্থা ছিল, অনেকের পক্ষেই দুধ খাওয়া কোনোরকমে সম্ভব ছিল। পশ্চিম দেশের কুলি-মজুর চাষারাও ঘটি ভরে দুধ খেয়ে কাজে বেরুতো। কিন্তু এখন দুধ সর্বত্রই অত্যন্ত দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে উঠেছে, অধিকাংশ লোকের পক্ষেই জোটানো অসম্ভব। সাধারণ গৃহস্থ লোকের পক্ষে এখন গরু পোষাও সহজে সম্ভব নয়। মাঠে মাঠে আর তেমন ঘাস পাওয়া যায় না, গরুর খাদ্য সুলভে মেলে না, বিচালি প্রভৃতি আগের চেয়ে অনেক দুর্মূল্য। যেজন্য গরু পোষা দুঃসাধ্য। সুতরাং যারা মাছও খায় না, মাংসও খায় না এবং সামর্থ্যে কুলায় না ব'লে দুধও খেতে পারে না, তারা বিনা প্রোটিনেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে বাধ্য হয় এবং তাদের জীবন স্বভাবতই স্বল্পায়ু আর রোগপ্রবণ হয়। অনেকে বলেন, ডালে প্রোটিন আছে, মটর কলাই ছোলা গম প্রভৃতির মধ্যেও প্রোটিন আছে। রাসায়নিক হিসাবমত আরো অনেক খাদ্যেই প্রোটিন আছে, কিন্তু সে খুব উঁচুদরের প্রোটিন নয়, অর্থাৎ তার মধ্যে যতটুকু প্রকৃত প্রোটিনের গুণ আছে, তাতে অনেক পরিমাণে সেগুলি খেলেও আমাদের প্রয়োজন পুরোপুরি মেটে না। প্রোটিনের অভাব রীতিমত পূরণ করতে হলে হয় আমাদের দুধ খাওয়া চাই, নয়তো ইউরোপীয়দের মতো মাছ মাংস খাওয়া চাই। কিন্তু যেখানে এর কোনোটাই সম্ভব নয়, সেখানে উপায় কি?

এই সমস্যা সমাধানের জন্য বর্তমানকালের বৈজ্ঞানিকেরা একটি নতুন ধরণের উদ্ভিজ্জ খাদ্যবস্তুর নাম করছেন এবং তার চাষ করবার জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত করছেন, আমরা সেই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এই বস্তুটির নাম সোয়াবিন। বিন অর্থে বরবটি, কিন্তু এ আমাদের সাধারণ বরবটি অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের জিনিস। দেখতে এগুলো অনেকটা বরবটির অনুরূপ, তার মধ্যে গোল গোল দানা থাকে। সেই দানাগুলো যখন পেকে শুকিয়ে যায়, তখন তাই নানাভাবে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। যদিও এই সোয়াবিন অনেকটা বরবটি ধরণের জিনিস, কিন্তু এর পুষ্টিগুণ অতি অসাধারণ। এর মধ্যে শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ উৎকৃষ্ট প্রোটিন থাকে। (যেস্থলে দুধের মধ্যে শতকরা প্রোটিনের পরিমাণ ৪ থেকে ৫ এবং মাংসের মধ্যে শতকরা ১৭ থেকে ২০।) এর মধ্যে যে প্রোটিন আছে, তা তুলনায় মাংসের চেয়েও বেশি এবং গরুর দুধের চেয়ে প্রায় দশগুণ বেশি। অথচ তা ডাল প্রভৃতির প্রোটিনের মতো নিকৃষ্ট ধরণের প্রোটিন নয়, দুধের কেজিনের মতো অত্যন্ত উঁচুদরের প্রোটিন। খাদ্যরূপে এই প্রোটিনের শতকরা ৯০ ভাগ সহজেই হজম হ'য়ে যায় এবং শরীর গঠনের কাজে লাগে। এমন কি সোয়াবিন থেকে একরকম দুধ প্রস্তুত করা যায়, যা গরুর দুধের সঙ্গে সমান, সেই দুধ গরুর দুধের পরিবর্তে শিশুদের পর্যন্ত অনায়াসে খাওয়ানো চলে এবং সেই দুধ কাটিয়ে ছানা এবং দই পর্যন্ত করা যেতে পারে। মাংস কিংবা দুধ খেলে যে কাজ হয়; সোয়াবিন খেলেও সেই কাজ হয়, অথচ এটি সম্পূর্ণ নিরামিষ খাদ্য, অনায়াসে এর চাষ করা যায়, দামেও অনেক সস্তা এবং সকলের পক্ষেই সুলভ হ'তে পারে। সোয়াবিনের মধ্যে যে কার্বোহাইড্রেট থাকে তাতে শ্বেতসার নেই এবং তা শরীরের মধ্যে গিয়ে চিনি জন্মায় না; সুতরাং যাদের ডায়েবিটিস আছে, তাদের পক্ষেও খাওয়া চলে। তা'ছাড়া এর মধ্যে যথেষ্ট তেল থাকে, যন্ত্রের ঘানিতে পিষে সেই তেল মাখনের পরিবর্তে ও ভাজাভুজির জন্য সরিষার তেলের পরিবর্তে ব্যবহার করা চলে, আবার সেই তেল নানাবিধ ব্যবসার কাজেও নিয়োগ করা চলে। এই তেল সহজেই হজম হয় এবং খেতেও সুস্বাদু। সোয়াবিনে তেলের পরিমাণ এত বেশি যে, পিষে বের ক'রে নিলেও তার শুষ্ক খইলের মধ্যে শতকরা ৭ ভাগ তেল অবশিষ্ট থাকে। সোয়াবিনের মধ্যে লবণও আছে এবং তার ফস্ফরাস পটাসিয়াম, লোহা এবং ক্যালসিয়ামের পরিমাণ গম অপেক্ষা বেশি। সোয়াবিনের মধ্যে ভিটামিন 'এ' থাকে এবং সেই হিসাবে এর দুধ মায়ের দুধের সঙ্গে সমান। তাছাড় এর মধ্যে প্রচুর ভিটামিন 'বি' আছে, তা পরিমাণ সাধারণ ময়দা অপেক্ষা প্রায় দশগু বেশি। সুতরাং সর্বপ্রকারে পোষ্টাই খাদ্য হিসাবে ডাল প্রভৃতি কোনো জিনিসের এ সঙ্গে তুলনাই করা চলে না।

সোয়াবিন নতুন আবিষ্কার নয়। খৃস জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে থেকেই চীন দেশে এটি খাদ্যরূপে ব্যবহৃ হ'য়ে আসছে। ওখানকার লোকেরা ব প্রাচীন চৈনিক সভ্যতার যুগে পাঁ খাদ্য হিসাবে যে পাঁচটি শস্যের ন উল্লেখ করা যেতে পারে, সোয়াবিন ত মধ্যে একটি। জাপানীরাও এটা প্রা ব্যবহার ক'রে থাকে। কিন্তু এতাবৎ ক বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ি সাধারণতঃ চীন দেশের লোকের সোয়াবিনের প্রচুর চাষ করতো, এর থে নানারকম খাদ্য প্রস্তুত করতো এবং কে এই সোয়াবিনের দুধ খাইয়েই শিশু বাঁচিয়ে রাখতো। চীন দেশের লোকে অধিকাংশই অতি গরীব, শিশুদের খাও জন্য গরুর দুধ তাদের আদৌ জোটে ঐ সোয়াবিনের দুধই তাদের সম্ব পূর্বকালে চীন ও জাপানের লোকেরা দুধচিনির সঙ্গে সরবত করে খে'তো। বিগত শতাব্দীর শেষভাগে সভ্যজগ দৃষ্টি এর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ইউরে ও আমেরিকায় এর চাষ করা শুরু অল্পকালের মধ্যেই এর অদ্ভুত গুণের জানতে পারা যায় এবং সকল দেশেই প্রচলন বাড়তে থাকে। বর্তমানে জার্মান এর খুবই আদর। মাংস এখন সে খুবই দুষ্প্রাপ্য, মাংসের পরিবর্তে সোয়াবিন থেকে প্রস্তুত Erstaz খাদ্য ব্যবহার করে। সোয়াবিন থেকে এক রকম ময়দা প্রস্তুত করে, তার Edelsoja,—এর থেকে তারা নান সুপ বানায়, রুটি-বিস্কুট মাকারোনি প্রভৃতি বানায় এবং জ

সৈনিকরা মাংসের অভাবে তাই খেয়ে লড়াই করে। বিলেতেও দুই ভাগ গমের ময়দার সংগে এক ভাগ সোয়াবিনের ময়দা মিশিয়ে সোয়া-ময়দা নামে সকলকে সরবরাহ করা হয়। সুইজারল্যাণ্ডে এবং রাশিয়াতে সোয়াবিন পুড়িয়ে এবং গুড়ো ক'রে ঠিক কফির মতো ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমেরিকায় সোয়াবিনের চাষ এবং ব্যবহার সকলের চেয়ে বেশী। সেখানে প্রতি বছরে প্রায় পনেরো কোটি বুশেল (এক বুশেলের ওজন প্রায় ত্রিশ সের) সোয়াবিন উৎপন্ন হয়। এই সোয়াবিনের গাছপালা থেকে তারা গরুর খাদ্য এবং জমির সার তৈরী করে। সোয়াবিনের দানা থেকে তেল পিষে বের ক'রে তারা মাখন ও স্যালাড অয়েলের পরিবর্তে ব্যবহার করে এবং এই তেল থেকে তারা সাবান, রবার, সেলুলয়েড, মোমবাতি, ছাপার কালি, রং, ওয়াটার প্রুফ, মোটর গাড়ির সরঞ্জাম প্রভৃতি বহুবিধ জিনিস প্রস্তুত করে। শুষ্ক সোয়াবিনকে গুড়ো ক'রে তারা ময়দা প্রভৃতি প্রস্তুত তো করেই, তা ছাড়াও একে তারা সুপের সংগে, তরকারীর সংগে ও কফির বদলে ব্যবহার করে এবং সোয়াবিনের দুধ থেকে তারা দই, ছানা, কনডেন্সড মিল্ক, আইসক্রীম, শিশু খাদ্য, ও নানারকমের মিষ্টান্ন দ্রব্য প্রস্তুত করে।

কাঁচা অবস্থায় সোয়াবিন মটরশুঁটির মতো সিদ্ধ ক'রে খাওয়া চলে, কিন্তু শুষ্ক সোয়াবিনের দানা অতি কঠিন, সহজে সিদ্ধ হয় না বা নরম হয় না। সুতরাং অখণ্ড অবস্থায় তরকারীর সংগে সিদ্ধ ক'রে একে খাওয়া চলে না। আস্ত গমকে যেমন পিষে গুড়ো ক'রে নিয়ে আটা বা ময়দা প্রস্তুত ক'রে তবে ব্যবহার করতে হয়, সোয়াবিন সম্বন্ধেও সেই কথা। শুষ্ক সোয়াবিনের দানা গমের চেয়েও কঠিন, সুতরাং তাকে ভাঙবার জন্য কলের জাঁতা চাই। কলে ভেংগে সোয়াবিনকে আটা বা ময়দারূপেই লোকে সচরাচর ব্যবহার করে। দুই রকমভাবে সোয়াবিনের ময়দা প্রস্তুত করা যেতে পারে। প্রথমতঃ সোয়াবিন পিষে তার তেল বের ক'রে নেবার পরে যা অবশিষ্ট থাকে সেগুলোকে ভেংগেও ময়দা করা যায়, আবার তেল সমেত সোয়াবিন ভেংগেও ময়দা করা যায়। পোষ্টাই হিসাবে এর কোনোটাই নিকৃষ্ট নয়। এই ময়দা বস্তায় ভরে গুদামে রাখলেও শীঘ্র নষ্ট হয় না এবং গমের ময়দার মতো একে সহজেই বাজারে সরবরাহ করা চলে। তবে এই সোয়াবিনের ময়দাতে গ্লুটেন নেই, সুতরাং এর থেকে রুটি, লুচি প্রভৃতি প্রস্তুত করা চলে না। তা করতে হ'লে এর সংগে কিছু গ্লুটেন মেশানো উচিত, অথবা দুই ভাগ গমের ময়দার সংগে এক ভাগ সোয়াবিনের ময়দা মিশিয়ে ঐ সকল খাদ্য প্রস্তুত করা উচিত। সাধারণতঃ ঐরূপভাবেই এর থেকে বিস্কুট প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়।

সোয়াবিনের ময়দা জলে গুলে সিদ্ধ ক'রে নিয়ে তার সংগে টোমাটোর শাঁস বা অন্যান্য জিনিস মিশিয়ে এবং আদা-বাটা পেঁয়াজ বাটা প্রভৃতি দিয়ে চমৎকার সুপ বা ঝোল প্রস্তুত করা চলে এবং তা খেতে অতি উপাদেয় হয়।

সোয়াবিনের ময়দা না পাওয়া গেলে শুষ্ক সোয়াবিন থেকেও নানারকম খাদ্য প্রস্তুত করা সম্ভব। তা করতে হ'লে প্রথমত সোয়াবিনগুলিকে তিন ঘণ্টা থেকে পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত জলে ভিজিয়ে রাখা চাই। তাতে সেগুলি কিছু নরম হয়। তারপরে খানিকটা জলে কিছু লবণ দিয়ে সেই জলে সোয়াবিনগুলিকে অন্তত তিন ঘণ্টাকাল যাবৎ সিদ্ধ করা দরকার। লবণের জলে সোয়াবিন একটু শীঘ্র সুসিদ্ধ হয়। সোয়াবিনকে কুকারে বাষ্পের চাপে সিদ্ধ করাই সর্বাপেক্ষা উত্তম, যেখানে তা সম্ভব নয় সেখানে মাটির হাঁড়িতে লবণ জল ও সোয়াবিন দিয়ে তার মুখ বন্ধ ক'রে সেই হাঁড়ি কোনো ফুটন্ত জলের পাত্রের মধ্যে রেখে তিন ঘণ্টা যাবৎ ফোটাতে থাকলে ভিতরকার সোয়াবিন সুসিদ্ধ হ'য়ে যায় এবং তখন তা খাওয়া চলে।

চালের সংগে মিশিয়ে সোয়াবিনের খিচুড়ি প্রস্তুত করা চলে। তার জন্য আগে সোয়াবিনগুলিকে তিন ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখা চাই। অতঃপর সেগুলিকে আধ-বাটার মত করে বেটে নেওয়া চাই। তারপরে জলের মধ্যে চাল দিয়ে এবং কিছু লবণ দিয়ে তার সংগে এই সোয়াবিন মিশিয়ে এক সংগে ফোটাতে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত জলটা না মরে যায়।

জলে ভিজানো সোয়াবিনকে উত্তমরূপে বেটে নিয়ে তার থেকেও নানারূপ সুপ প্রস্তুত করা চলে। তা করতে হ'লে এই বাটা সোয়াবিনকে জলের সংগে মিশিয়ে আগে কিছুক্ষণ সিদ্ধ করা উচিত তার পরে অন্যান্য উপকরণ তার মধ্যে ফেলে দিয়ে আরো কিছুক্ষণ সিদ্ধ করা উচিত, পরে যথারীতি সাঁতলে নেওয়া উচিত।

বাটা সোয়াবিন দিয়ে তরকারীও প্রস্তুত করা যেতে পারে। অল্প ঘিয়ে যথারীতি ফোড়ন দিয়ে কিছু পেঁয়াজ ভেজে নিয়ে তার মধ্যে ঐ সোয়াবিন, স্কোয়াশ, রাঙা আলু প্রভৃতি আনাজ ফেলে দিয়ে জল ঢেলে কিছুক্ষণ সিদ্ধ করতে হয়, তার পরে তাতে কিছু নারিকেলের দুধ এবং মশলা প্রভৃতি দিয়ে আরো কিছুক্ষণ ফোটালেই উপাদেয় তরকারী প্রস্তুত হয়।

সোয়াবিন থেকে দুধ প্রস্তুত করবার প্রণালী একটু স্বতন্ত্র রকম। আগে সোয়াবিনগুলিকে ১২ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপরে সেগুলিকে ভারী পাথরের জাঁতাকলে পিষতে হয় এবং তার মধ্যে অল্প অল্প জল ঢালতে হয়। যতটা পরিমাণ সোয়াবিন আছে তার প্রায় পাঁচ গুণ জল ঐ পিষ্ট সোয়াবিনের সংগে অল্পে অল্পে মিশিয়ে দিতে হয়। ঐ সোয়াবিন জলের সংগে পিষ্ট হওয়াতে এক রকম দুগ্ধবৎ তরল পদার্থ জাঁতার থেকে নির্গত হ'য়ে আসে। সেই তরল পদার্থটিকে সঞ্চয় ক'রে সেটি এক ঘণ্টাকাল আগুনে সিদ্ধ করতে হয়, তারপরে সেটি সূক্ষ্ম কাপড় দিয়ে (Cheesecloth) উত্তমরূপে ছেঁকে নিতে হয়। এই হলো সোয়াবিনের দুধ। এই দুধ এমনিই খাওয়া যায়, আবার এর থেকে কনডেন্সড মিল্ক এবং গুঁড়া দুধও প্রস্তুত করা যায়। এর থেকে ছানাও হয়। চীনারা এর থেকে এক প্রকার দই প্রস্তুত করে, তার নাম টকুয়া। এটা খুব সস্তা দামে বাজারে বিক্রীত হয়। একে তারা বলে—'গরীবের খাবার মাংস'। চীন এবং জাপানে সোয়াবিনের দুধ প্রস্তুত করবার জন্য অনেক বড়ো বড়ো ফ্যাক্টরী আছে।

বর্তমানকালের কৃষি বৈজ্ঞানিকদের অভিমত এই যে, সোয়াবিনের চাষ করা চাষীদের পক্ষে সর্ববিষয়ে লাভজনক,—অবশ্য যদি সাধারণে খাদ্য হিসাবে একে গ্রহণ করে এবং এর থেকে ময়দা ও তেল প্রস্তুত করার জন্য ব্যবসায়ীরা কল খোলে। এর থেকে বহু প্রকারের পণ্যদ্রব্য প্রস্তুতেরও সম্ভাবনা আছে। আমেরিকার কৃষি-বিভাগ বলে যে সোয়াবিন থেকে যে মানুষের কত রকমের উপকার হ'তে পারে, তার এখনও কোনো ধারণা নেই, আমরা এর উপকারিতার কথা সামান্য মাত্রই জানতে পেরেছি।

সোয়াবিনের বোটানিক্যাল নাম Glucine max। এর চাষ করা কিছুই কঠিন নয়, ভারতের সকল প্রদেশেই এর চাষ অনায়াসে সম্ভব। একবার সোয়াবিনের চারা জন্মে গেলে কোনো পোকায় বা বীজাণুতে একে নষ্ট করতে পারে না, কেবল খরগোসই এর একমাত্র শত্রু। ভারতের মধ্যপ্রদেশে, বরোদায় এবং হায়দরাবাদে এর চাষ রীতিমত শুরু হয়ে গেছে। এর একটা বিশেষ গুণ এই যে, কোনো জমিতে একবার সোয়াবিনের চাষ করলে সেই জমির উর্বরতা অনেকগুণে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং যে জমির উর্বরতা কমে গেছে বা যে জমি পতিত রয়েছে সেখানে এর চাষ করা চলতে পারে। সমতল ভূমিতে এবং পাহাড়ে জমিতেও এর চাষ হতে পারে, আবার জলা জায়গাতেও এর চাষ করা সম্ভব। সাধারণত তিন চারবার লাঙ্গল দিয়ে নিলেই সেই জমি সোয়াবিন চাষের উপযুক্ত হয়। জমিতে কিছু গোবরের সার দিয়ে নিলে তাতে আরো উত্তম ফসল পাওয়া যায়। বর্ষা পড়বার সংগে সংগেই সোয়াবিনের বীজরোপণ করা দরকার।

মাটির প্রায় দুই ইঞ্চি গভীরে এর বীজ দুই ফুট অন্তর সারে সারে পুঁতে দিতে হয়, প্রত্যেকটি প্রায় ছয় আঙুল থেকে বারো আঙুল ব্যবধানে। তারপর বর্ষায় যে বারিপাত হয় তাই এর উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট। ছয় সাত মাস পরেই এর পাকা ফসল পাওয়া যায়, অর্থাৎ আষাঢ়ে বীজ-বপন করলে পৌষ মাস নাগাদ খাদ্যোপযোগী সোয়াবিন উৎপন্ন হয়। প্রতি একরে ৫০০ থেকে ১০০০ পাউণ্ড সোয়াবিন পাওয়া যেতে পারে। বীজ পাকবার পরে এবং তার পূর্বেও লতাপাতাগুলি কেটে নিয়ে গরুর খাদ্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। উৎকৃষ্ট ধরণের সোয়াবিনের বীজ মাত্র ৫৲ টাকা মণ দরে কাশ্মীরের কৃষি বিভাগ থেকে বিক্রীত হয়। দেশে যথেষ্ট সোয়াবিনের চাষ হলে চালের চেয়েও তার দর সস্তা হবে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এর প্রচুর চাষ হয়, সেখানে এর দর চালের চেয়েও সস্তা। সেখানে পরীক্ষাস্বরূপ শতকরা ৮০ ভাগ চাল ও ২০ ভাগ সোয়াবিনের মিশ্রিত রেশন সরবরাহ করা হয়েছিল, তাতে দেখা গেছে যে, মাছ মাংস প্রভৃতি না দিলেও তাতে কারো পুষ্টির হানি হয়নি।

প্রোটিন খাদ্যের ব্যবস্থা করা এবং তার মাত্রা বাড়ানো আমাদের পক্ষে নিতান্তই দরকার, যদি আমরা বাঁচতে চাই এবং উন্নত হতে চাই। আমেরিকার কোনো বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গবেষণা করে দেখা গেছে, যে জাতি যত প্রোটিন বেশী খায় এবং ভাত-রুটি প্রভৃতি শ্বেতসার খাদ্য কম খায়, সেই জাতি তত উন্নত ও সমৃদ্ধিবান। আমেরিকা, বৃটেন, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া—এইসব দেশের লোকে শ্বেতসার খাদ্য শতকরা ৪০ ভাগেরও কম খায়। জাপানের লোকে এই খাদ্য বেশি খেলেও শতকরা ৭০ ভাগের চেয়েও কম। কেবল ভারতবর্ষ, চীন, জাভা, রুমানিয়া, সিংহল প্রভৃতি দেশের লোকে শ্বেতসার খাদ্য খায় শতকরা ৮০ ভাগের চেয়ে বেশি। অতএব আমাদের উচিত প্রোটিনের ভাগ বাড়িয়ে শ্বেতসারের ভাগ কমানো। এর প্রকৃষ্ট উপায় সোয়াবিনকে আমাদের খাদ্যরূপে গ্রহণ করা এবং সাধারণের মধ্যে এর প্রচলন করা। মানুষের কথা ছেড়ে দিয়ে জন্তুদের মধ্যেও এক্স্‌পেরিমেণ্ট করে দেখা গেছে যে, তাদের কেবল গমের আটার রুটি খেতে দিলে তারা যেমন অবস্থায় থাকে, তিন ভাগ আটার সঙ্গে এক ভাগ সোয়াবিনের আটা মিশিয়ে খেতে দিলে তার চেয়ে তাদের অনেক বেশি পুষ্টি হয় এবং তাড়াতাড়ি ওজন বেড়ে যায়। অনেকে হয়তো বলবেন, গ্রাম্য চাষীদের এই নূতন জিনিস উৎপাদনে প্রেরণা দেওয়া সহজ কথা নয়। কিন্তু এককালে আলু এবং মাঠকড়াই (চীনা-বাদাম) আমাদের কাছে বিজাতীয় জিনিস ছিল। আলু তখন আমাদের খাদ্যই ছিল না এবং ঐ জিনিস যে এত জনপ্রিয় হবে তা কেউ কল্পনাই করতে পারেনি। কিন্তু আলু নইলে এখন আমাদের এক বেলা চলে না। সুতরাং আশা করা যায় যে, সোয়াবিনের উপকারিতা বুঝতে পারলে ক্রমে ক্রমে এটাও তেমনি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

যে জিনিসের মধ্যে একাধারে তেল এবং আটা দুই প্রকার খাদ্যই পাওয়া যাবে, যার থেকে দুধ প্রস্তুত করাও সম্ভব হবে এবং সেই দুধ খাইয়ে শিশুদের পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে, যার দাম চাল-ডালের চেয়েও সস্তা হবে এবং গরীবেরাও অনায়াসে কিনে খেতে পারবে, যা নিরামিষ হয়েও মাংস খাবার মতো কাজ দেবে এবং শরীরে যথেষ্ট পুষ্টি দেবে, যা ডায়েবিটিস রোগীর পক্ষেও খাওয়া চলে আবার মাতৃহারা শিশুর পক্ষেও খাওয়া চলে, যার চাষ করলে জমির উর্বরতা বেড়ে যায় এবং গরুর খাদ্যও জুটে যায়, যার থেকে অনেক রকমের পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হতে পারে এবং ব্যবসা করবার নানা পথ খুলে যেতে পারে,—যার মধ্যে একাধারে এত রকমের গুণ বর্তমান তার আদর আমাদের দেশে একদিন না একদিন নিশ্চয়ই হবে।

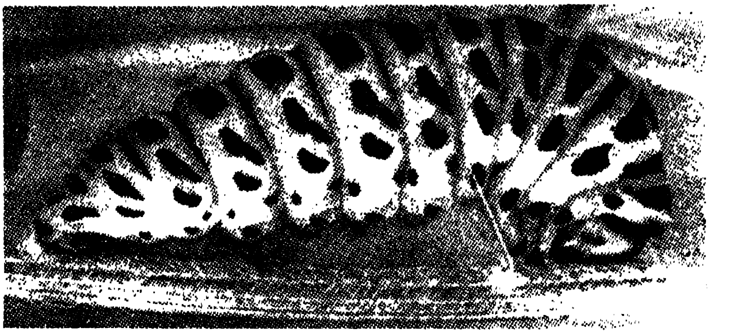
এই প্রবন্ধটি লেখার জন্য খ্যাতনামা চিকিৎসক শ্রীযুত অমূল্যচরণ উকিলের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। তিনি সোয়াবিন সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন এবং সেই-গুলি দিয়ে আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। এই অবসরে আমি তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

বিজ্ঞানের কথা

ঝিঙেপুচ্ছ প্রজাপতির জন্মরহস্য

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

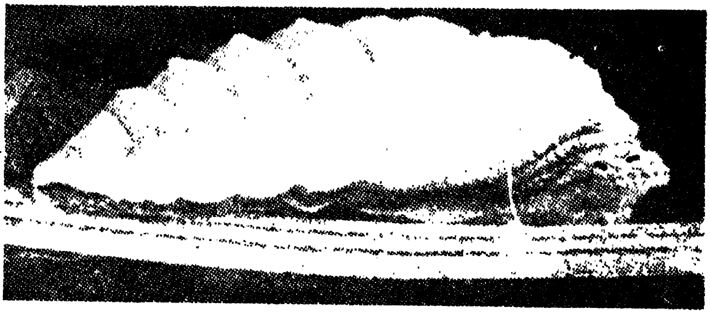
পদার্থমাত্রেরই আকৃতি নিয়ত পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই পরিবর্তনের গতি কাহারও দ্রুত, কাহারও-বা মন্থর। দ্রুত পরিবর্তন সহজেই আমাদের নজরে পড়ে; কিন্তু দেখিতে দেখিতে চোখ অভ্যস্ত হইয়া যায় বলিয়া মন্থর-পরিবর্তন সহজে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। উদ্ভিদ্-জগৎ ও প্রাণী-জগতের আকৃতি পরিবর্তন অতি সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আমাদের চোখের সম্মুখে অহরহই ইহা ঘটিতেছে। যে কোন একটি মানুষের ভ্রূণাবস্থা হইতে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য ইত্যাদি ইহাদের শৈশব অবস্থার আকৃতির সহিত কৈশোর অবস্থার অথবা কৈশোর অবস্থার আকৃতির সহিত যৌবনাবস্থার আকৃতির কোনই সামঞ্জস্য বিদ্যমান নাই। মশা, মাছি ফড়িং, প্রজাপতি প্রভৃতি প্রাণীদের রূপান্তর পরিগ্রহণের ব্যাপার এই জন্যই অতীব বিস্ময়কর এবং কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া মনে হয়। এই কারণে পূর্বে কিছু কিছু আলোচনা করিয়া থাকিলেও এস্থলে আমাদের দেশীয় কালো রঙের সুদৃশ্য ঝিঙে-পুচ্ছ প্রজাপতির জন্মরহস্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।



প্যাপিলিও ম্যাকাওন নামক ঝিঙেপুচ্ছ প্রজাপতির শুঁয়া-পোকা পুত্তলীরূপ ধারণ করিবার উপক্রম করিয়াছে।

ডানার নিম্নাংশকে অনেকটা ফিঙে পাখীর দ্বিখণ্ডিত লেজের মত দেখায়। নীচের ডানার প্রান্তভাগ কতকগুলি রক্তবর্ণ ফোঁটায় বিচিত্রিত। বুকের পর হইতে শরীরের পশ্চাদ্ভাগের রং টকটকে লাল। ইহারা মধু পান করিবার জন্য সারা দিন ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়ায় এবং সন্ধ্যার পূর্বেই কোন লতাপাতা বা ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকে। মানুষ, পশুপক্ষী অথবা গাছপালা প্রভৃতি যেমন খাদ্যবস্তু গ্রহণ করিয়া ক্রমশ আয়তনে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ মধু পান করিলেও প্রজাপতির দৈহিক আকৃতি বা আয়তনের কিন্তু তেমন কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না। প্রাণ-ধারণ বা শরীরের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্যই ইহারা খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে; শরীর বৃদ্ধির জন্য নহে। শোঁয়াপোকা বা ক্যাটারপিলার অবস্থায়ই সম্পূর্ণরূপে দেহ-পুষ্টি করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য উদরস্থ করিয়া থাকে। অনেকে মনে করিতে পারেন—জন্মগ্রহণের সময় প্রজাপতি আকারে খুবই ছোট থাকে এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমশ বড় হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার মোটেই সেরূপ নহে। প্রজাপতি রূপ ধারণ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ইহাদের আকৃতি বা আয়তনের

বিভিন্ন অবস্থার বিষয় চিন্তা করিলে দেখা যাইবে—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাহার দৈহিক আকৃতির কতখানি পরিবর্তন ঘটিয়াছে। উদ্ভিদ্-জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এইরূপ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। প্রাণী-জগতের বিবর্তনের ধারা অনুসারে পশু, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীরা অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরের অন্তর্ভুক্ত। উন্নত স্তরের এই সকল প্রাণীদের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে অতি ধীরে ধীরে, অথচ বিরামহীন একটানাভাবে। কাজেই মন্থর গতি এবং নিত্য পরিচয়ের ফলে ইহাদের বিভিন্ন অবস্থার দৈহিক পরিবর্তন সহসা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। এই জন্যই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে এই পরিবর্তন চোখে পড়িতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর কীট-পতঙ্গের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদের দৈহিক আকৃতির পরিবর্তন ঘটে ধাপে ধাপে এবং আকস্মিকভাবে। শৈশব, কৈশোর, যৌবন ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থায় ইহারা এমন অদ্ভুত রূপান্তর পরিগ্রহণ করে যে, পূর্ব হইতে জানা না থাকিলে ইহারা যে একই প্রাণীর বিভিন্ন অবস্থার রূপ—একথা কেহই বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। কারণ,

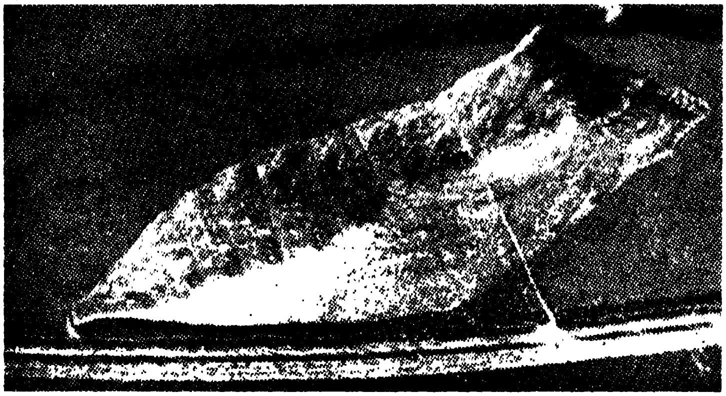


শোঁয়া-পোকা খোলস পরিত্যাগ করিয়া পুত্তলীর রূপ ধারণ করিয়াছে।

ঝিঙে-পুচ্ছ শ্রেণীর মধ্যে নীল, হলুদে, সবুজ, কালো প্রভৃতি রকমারি প্রজাপতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সকলের রূপান্তর গ্রহণের রীতি প্রায় একই রকমের। ইহাদের যে কোন একটির কথা জানা থাকিলে এই জাতীয় প্রত্যেককেই বিভিন্ন রূপান্তরিত অবস্থায় চিনিতে কোন অসুবিধা হইবে না। কলিকাতা এবং তাহার আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চলে কালো রঙের একপ্রকার বড় বড় প্রজাপতি দেখিতে পাওয়া যায়। পাশাপাশিভাবে প্রসারিত ডানার মাপ সাড়ে তিন ইঞ্চিরও বেশী হইয়া থাকে। কোনই পরিবর্তন ঘটে না। স্ত্রী-পুরুষ ভেদে প্রজাপতির শরীরের আয়তনের কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। পুরুষ-প্রজাপতিরা স্ত্রী-প্রজাপতি অপেক্ষা কিছু ছোট হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে বর্ণবৈচিত্র্যেও যথেষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

এক দিন একটা বাগানের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা গাছের গুঁড়ির উপর লম্বা পাওয়ালা মশার অপূর্ব নৃত্যভঙ্গী পর্যবেক্ষণ করিতেছিলাম। আমার একটু অসতর্ক অঙ্গসঞ্চালনে ভয় পাইয়া মশাটা উড়িয়া গিয়া বেড়ার গায়ে

ছোট্ট একটা ঝোপের উপর বসিল। সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই বেড়ার গায়ে একটা অপূর্ব পদার্থ দেখিতে পাইলাম। কিন্তু পদার্থটা কি—তাহা দূর হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছিলাম না। মনে হইল—হয়তো বা অদ্ভুত ধরণের একটা মৃত শামুকের খোলা হইতে পারে,—বেড়ার গায়ে কোন রকমে আটকাইয়া রহিয়াছে। শামুকের খোলার মত কোন বাজে জিনিষ মনে করিয়াই ওই দিকে মনোযোগ দেই নাই; মশার ব্যাপারটা দেখিবার জন্যই উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলাম বেশী। কিছুটা অগ্রসর হইতেই ঝোপের মধ্যে টুনটুনি পাখীকে বাসা বাঁধিতে দেখিয়া বিশেষভাবে উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম। তাহাদের কার্যকলাপ দেখিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ইতিমধ্যে এক ফাঁকে শামুকের খোলার মত পদার্থটার নিকটে গিয়া দেখিলাম—জিনিষটা শামুকের খোলা নহে, লম্বাটে ধরণের গাঁট-কড়ির মত একটা অদ্ভুত বস্তু। একটা গাঁট-কড়িকে চিৎভাবে কোন কিছুর সঙ্গে আটকাইয়া রাখিলে যেমন হয় এই অজ্ঞাত বস্তুটিকেও সেরূপ দেখাইতেছিল। সম্মুখের দিকে রং কতকটা শাদা এবং কচ্ছপের খোলার মত পিঠের উঁচু দিকটার রং বাদামী। আরও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম—পদার্থটা উভয় পার্শ্ব হইতে ঠিক চুলের মত দুইটি শক্ত সুতা দ্বারা বেড়ার খুঁটিটার সহিত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে। ইহার দিকে চাহিলেই কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণার ভাব জাগে। তথাপি কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া তুলিয়া আনিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সুতার বাঁধন এমন দৃঢ় যে, জোর করিয়া টানিলে পদার্থটার একাংশ ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। একটু জোর করিয়া টানিবামাত্রই একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম—হাড়ের মত সেই শক্ত পদার্থটার একাংশ যেন খট্‌খট্‌ করিয়া নড়িয়া উঠিল। ইহাতেই বুঝিতে পারিলাম—ইহা কোন মৃত বা অজৈব পদার্থ নহে। যাহা হউক, কাঁচি দিয়া সুতার বাঁধন কাটিয়া পদার্থটাকে সন্তর্পণে তুলিয়া লইয়া উত্তাপ নিয়ন্ত্রিত কাচের কুঠুরীতে রাখিয়া দিলাম। ছয় দিন পরে দেখিলাম—কাচের কুঠুরীতে কালো রংএর ডানায় রক্তবর্ণের ফোঁটায় বিচিত্রিত অতি সুদৃশ্য একটি প্রজাপতি বাহিরে আসিবার জন্য ঝাপটা ঝাপটি করিতেছে। গাঁট-কড়ির মত পদার্থটা শূন্যগর্ভ একটি পাতলা খোলার মত এক পাশে পড়িয়া রহিয়াছে। তখন বুঝিতে বাকী রহিল না যে, গাঁট-কড়ির মত অদ্ভুত পদার্থটা ছিল এই প্রজাপতির গুটি বা পুত্তলী।



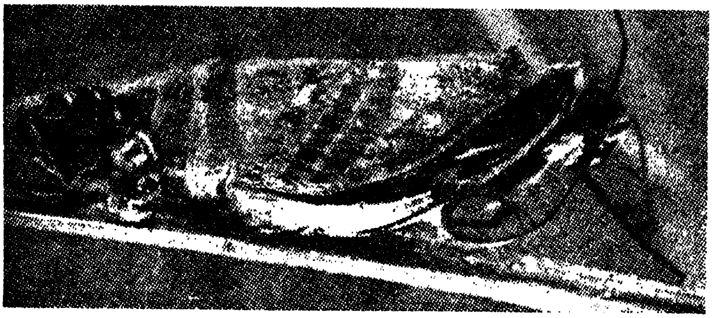
পুত্তলির দেহের উপরিভাগ একপ্রকার শক্ত আবরণ ধারণ করিয়াছে।



পুত্তলি অবস্থার সমস্ত পরিবর্তন শেষ হইলে পর পুত্তলির দেহের উপরিভাগের শক্ত খোলসে ফাট ধরিয়াছে।

যাহা হউক, এই ঘটনা হইতে ইহারা কিরূপে শৈশবাবস্থা হইতে পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতির রূপ পরিগ্রহণ করে, তাহা জানিবার জন্য বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উঠিলাম। অনেক দিন ব্যর্থ চেষ্টার পর একবার এই কালো রংএর ফিঙে-পুচ্ছ প্রজাপতির যৌন-মিলন প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইলাম। যৌন-মিলনের পূর্বে তাহাদের লুকোচুরি, ছুটাছুটি এবং সর্বশেষে ডানা কাঁপাইয়া একস্থানে স্থিরভাবে উড়িবার দৃশ্যগুলি অতীব বিস্ময়কর। মিলিত অবস্থায় জালের সাহায্যে প্রজাপতি দুটিকে ধরিয়া পরীক্ষাগারের চতুর্দিক আবদ্ধ প্রশস্ত 'গ্রীণ-হাউসে' ছাড়িয়া দিলাম। পরে দেখিলাম—'গ্রীণ-হাউসে'র মধ্যে ঐ জাতীয় অপর একটি স্ত্রী প্রজাপতি রহিয়াছে। 'গ্রীণ-হাউসে' নানা জাতীয় বৃক্ষলতাদির মধ্যে একদিকে একটি ঈশার-মূলের লতা ঝাঁপিয়া উঠিয়াছিল। পরের দিন দুপুর বেলা দেখিতে পাইলাম—একটা স্ত্রী প্রজাপতি উড়িয়া উড়িয়া এক-একটা ঈশারমূলের পাতার উপর এক-একটি করিয়া ডিম পাড়িয়া যাইতেছে। ডিমগুলি খুবই ছোট অথচ লম্বাটে ধরণের। প্রায় ঘণ্টাখানেক সময়ের মধ্যে প্রজাপতিটাকে ১৩টি ডিম পাড়িতে দেখিলাম। সতর্কতার সহিত ডিম সমেত পাতাগুলিকে সংগ্রহ করিয়া বোঁটা জলে ডুবাইয়া উত্তাপ নিয়ন্ত্রিত কাচের কুঠুরীতে রাখিয়া দিলাম। পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই প্রত্যেকটি ডিম ফুটিয়া প্রায় তিন চার মিলিমিটার পরিমিত ছোট ছোট শোঁয়াপোকা বাহির হইল এবং পাতার উপরের সবুজ পদার্থ কুরিয়া কুরিয়া খাইতে লাগিল। তাহাদের খাওয়ার আর বিরাম নাই। ৫।৭ দিনের মধ্যেই বাচ্চাগুলি প্রায় আধ ইঞ্চিরও বেশী লম্বা হইয়া উঠিল। এই সময়ে তাহাদের দৈহিক গঠন খোলা চোখেই পরিষ্কার বুঝা যাইতেছিল। শরীরের রং লাল কিন্তু কালোর মিশ্রণ রহিয়াছে। ঘাড়ের কাছে অঙ্গুরীর মত একটা শাদা বন্ধনী। সাধারণত যে সকল শোঁয়াপোকা আমাদের নজরে পড়ে তাহাদের সর্বশরীর বিষাক্ত শোঁয়ায় আবৃত। কিন্তু ইহাদের শরীরে সেরূপ কোন শোঁয়ার অস্তিত্ব নাই। শোঁয়ার পরিবর্তে কাঁটার মত খাড়াখাড়া কতকগুলি পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫।১৬ দিনের মধ্যেই বাচ্চাগুলি পাতা খাইয়া প্রায় দেড় ইঞ্চি হইতে পৌনে দুই ইঞ্চি লম্বা হইয়া উঠিল। খাওয়া ছাড়া ইহাদের আর কোন কাজ নাই। শরীর স্পর্শ করিয়া একটু উত্ত্যক্ত করিলেই ইহারা লেজের দিকটা ঈষৎ উত্তোলন করিয়া হলুদ রংএর ব্রাসের মত দুইটি অপূর্ব পদার্থ বাহির করিয়া দেয়। শরীরের পশ্চাদ্ভাগ হইতে এই অপূর্ব

পদার্থ দুইটা ঠেলিয়া বাহিরে আসিবামাত্রই ঠিক ফুলের মত ছড়াইয়া পড়ে। ভিতরে ঢুকিবার সময়ই আবার সংকুচিত হইয়া যায়। আততায়ীকে ভয় দেখাইবার ইহাই তাহাদের প্রধান অস্ত্র। ইহাদের গায়ের কাঁটা, অদ্ভুত রং এবং হলুদে ফুলের মত পদার্থ দুটি দেখিলে প্রত্যেকের মনেই ভয়ের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইবার পর ইহারা খাওয়া বন্ধ করিয়া লতাপাতার শক্ত ডাঁটার উপর চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। খাওয়া বন্ধ করিবার কিছুকাল বাদে চুলের মত দুইগাছি কালো শক্ত সুতা বুনিয়া শরীরটাকে আশ্রয়স্থলের সহিত শক্তভাবে জুড়িয়া দেয়। অন্যান্য দিনচর প্রজাপতির বাচ্চাগুলি রূপান্তর গ্রহণ করিবার পূর্বে বোঁটার আকারে সুতা বুনিয়া তাহার সহিত ফলের মত ঝুলিয়া থাকে। কিন্তু ফিঙে-পুচ্ছ প্রজাপতির বাচ্চাগুলি রূপান্তর গ্রহণ করিবার পূর্বে উপরের দিকে মুখ করিয়া খাড়া অবলম্বনের সহিত তির্যকভাবে অবস্থান করে। দুই একদিন এরূপ নিশ্চলভাবে অবস্থান করিবার পর পিঠের চামড়াটা লম্বালম্বি ফাটিয়া যায় এবং ভিতর হইতে বাদামী বা গোলাপী রংএর একটা পদার্থ ঠেলিয়া বাহির হইতে থাকে। ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই মাকুর মত উভয় দিক সুঁচালো একটা পদার্থ সম্পূর্ণরূপে বাহির হইয়া আসে। মাকুর মত পদার্থটা কিছুকাল পর্যন্ত নানাভাবে মোচড় খাইতে থাকে। শোঁয়াপোকার সেই ভীষণ দর্শন উপরের চামড়াটা কুচকাইয়া সামান্য একটু ঝুলের মত পিছনের দিকে লাগিয়া থাকে। কিন্তু পূর্বেকার সুতার বন্ধন যেমন ছিল তেমনই থাকিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে সেই স্পন্দনশীল মাকুর মত পদার্থটা আবার ক্রমশঃ নিস্পন্দভাব ধারণ করে এবং অতি দ্রুত আকৃতি পরিবর্তিত হইতে থাকে। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শরীরের উভয় পার্শ্বে পাখনার মত কয়েকটি পদার্থ আত্মপ্রকাশ করে এবং পূর্বে গুটী বা পুত্তলির যেরূপ বর্ণনা দিয়াছি, ঠিক সেইরূপ আকৃতি ধারণ করে। ইতিমধ্যে শরীরের রংও বদলাইয়া যায়। প্রায় ঘণ্টা দুই সময়ের মধ্যেই স্পন্দনশীল কোমল পদার্থটা শামুকের খোলার মত সম্পূর্ণরূপে শক্ত হইয়া উঠে। ইহাই প্রজাপতির গুটী বা পুত্তলী অবস্থা। ইংরাজীতে যাহাকে পিউপা বা ক্রাইস্যালিস বলে তাহাকেই গুটী বা পুত্তলি বলিয়াছি। কিন্তু রেশম পোকার গুটী ও পুত্তলী অবস্থাতেই নির্মিত হইয়া থাকে। রেশমের গুটী এবং প্রজাপতির গুটীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, রেশমের গুটীর ডিম্বাকার বহিরাবরণের অভ্যন্তরে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে 'মথে'র পুত্তলী অবস্থান করে; কিন্তু প্রজাপতির পুত্তলী অবস্থায় এরূপ কোন বহিরাবরণ থাকে না। 'মথে'র পুত্তলী ডিম্বাকার আবরণীর মধ্যেই মথ-রূপে ধারণ করিয়া গুটী কাটিয়া উড়িয়া যায়; কিন্তু প্রজাপতি একবারেই খোলস পরিত্যাগ করিয়া বাহির হয়। মথের বাচ্চাগুলি প্রচুর পরিমাণ সুতা বুনিয়া আবরণ তৈরী করে, কিন্তু প্রজাপতির বাচ্চাগুলি পুত্তলী অবস্থায় আটকাইয়া বা ঝুলিয়া থাকিবার জন্য অতি সামান্য সুতা বুনিয়া থাকে মাত্র।



পুত্তলির খোলস হইতে সবেমাত্র প্রজাপতির মুখ বাহির হইয়াছে।

শোঁয়াপোকা পুত্তলীর আকার ধারণ করিবার পর শরীরের অভ্যন্তরস্থ পদার্থসমূহ দ্রবীভূত হইয়া ঘনীভূত একপ্রকার তরল বস্তুতে পরিণত হয়। তাহার পর ধীরে ধীরে পুনরায় নূতন রকমের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠিত হইতে থাকে। পুত্তলী সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থান করে। আপাতদৃষ্টিতে কোনরকমেই ইহাকে জীবিত পদার্থ বলিয়া মনে হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহাদের শরীরের রং অথবা বর্ণবৈচিত্র্য পারিপার্শ্বিক অবস্থায় এমন হুবহু মিলিয়া যায় যে, তেমন সন্ধানী চোখও সহজে ইহাদের অস্তিত্ব টের পায় না। প্রায় পনর ষোল দিনের মধ্যেই পুত্তলীর অভ্যন্তরে প্রজাপতির আকৃতি গঠিত হইয়া যায়। এই সময় অনেক ক্ষেত্রে বাহিরের অর্ধস্বচ্ছ আবরণের ভিতর দিয়া ভিতরের প্রজাপতির অপরিপুষ্ট ডানার বর্ণবৈচিত্র্য অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় অকস্মাৎ একসময়ে নিশ্চল পদার্থটা ঈষৎ স্পন্দিত হইয়া উঠে। একটু একটু করিয়া ক্রমশই স্পন্দনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এবং কিছুক্ষণ পরেই কড়াইশুটী যেমন করিয়া ফাটে, ঠিক সেইরূপভাবেই পুত্তলীর উপরের দিকের সম্মুখের অংশটা চিড় খাইয়া ফাটিয়া যায়। দুই তিন মিনিটের মধ্যেই সেই ফাটল দিয়া প্রজাপতির শুঁড় দুইটা বাহির হইয়া আসে। ক্রমে ক্রমে পা, মাথা, বুক প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাহির হইতে থাকে। প্রায় দশ বার মিনিট সময়ের মধ্যেই প্রজাপতিটা সম্পূর্ণরূপে খোলসমুক্ত হইয়া যায়। যেরূপ অবস্থায় প্রজাপতিকে আমরা উড়িয়া বেড়াইতে দেখি খোলসমুক্ত হইবার সময় ঠিক সেরূপ অবস্থায় থাকে না। খোলসমুক্ত হইবার পর প্রজাপতির লেজ ও ডানাগুলি থাকে খুবই ছোট আর মোটা। এই সময় অপরিণত ছোট ছোট ডানাগুলি তক্‌তকে পুরু চামড়ার মত দেখায়। প্রথমত প্রজাপতিটা পরিত্যক্ত খোলসটাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া থাকে এবং অতি দ্রুতগতিতে শ্বাসপ্রশ্বাস প্রক্রিয়া চালাইয়া বারংবার মূত্র ত্যাগ করে। অতি অল্পসময়ের মধ্যেই ডানা



পূর্ণাঙ্গ ফিঙে পুচ্ছ প্রজাপতি

ও লেজ তর্‌তর্‌ করিয়া বাড়িয়া উঠে। সম্পূর্ণরূপে বাড়িবার পর প্রজাপতি ডানা মুড়িয়া এবং প্রসারিত করিয়া বার বার পরখ করিয়া দেখে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ডানা শক্ত হইয়া গেলে উড়িয়া বেড়াইতে শুরু করে। ইহাই প্রজাপতির যৌবনাবস্থা। কয়েক দিন পরেই ইহাদের যৌন-মিলন সংঘটিত হয়। ডিম পাড়িবার পর প্রজাপতি আর তাহাদের তদারক করে না। তবে এমন স্থানে ডিম পাড়ে যেখানে বাচ্চাগুলির মোটেই খাদ্য বস্তুর অভাব ঘটিতে পারে না। ডিমগুলিকে পাতার সহিত একপ্রকার আঠালো পদার্থের সাহায্যে আটকাইয়া দেয়। ডিম পাড়িবার কিছুকাল পরে প্রজাপতি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রধানত বংশ-বিস্তারের উদ্দেশ্যেই যে শোঁয়াপোকা যৌবনাবস্থায় প্রজাপতির রূপ ধারণ করিয়া থাকে ইহা মনে করিবার কতকগুলি সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। এমন কতকগুলি মথ জাতীয় প্রজাপতি দেখা যায়, যাহাদের স্ত্রী প্রাণীগুলির ডানা গজায় না; অথবা গজাইলেও তাহা এত ক্ষুদ্র যে সহজে নজরেই পড়ে না। অথচ তাহাদের শরীরটা হয় অসম্ভব রকমের মোটা এবং বৃহৎ; কতকটা যেন উইপোকার রাণীর মত। এই মথগুলি খোলস পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইবামাত্র একটা অদ্ভুত অনুভূতির সাহায্যে পুরুষ প্রজাপতিরা আসিয়া তাহার চতুর্দিকে ভিড় জমাইতে থাকে। অবশেষে কোন একটির সহিত যৌন-মিলন ঘটিবার পর দুই এক-দিনের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণ ডিম পাড়িয়া স্ত্রী প্রজাপতিটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। এস্থলে 'ন্যাচারেল হিস্ট্রি ম্যাগাজিন' হইতে গৃহীত একজাতীয় ফিঙে পুচ্ছ প্রজাপতির ছবি হইতে এই জাতীয় অন্যান্য প্রজাপতির রূপান্তরিত বিভিন্ন অবস্থার বিষয় সম্যক উপলব্ধি হইবে।

"আমরা আজ যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া দেখিতেছি না,—জানিতে পারিতেছি না, ইংরেজি ইস্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্জাহীন আভাসমাত্র চোখে পড়িতেই আমরা লাল হইয়া মুখ ফিরাইতেছি, তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ, তাহা আমাদের বাগ্মীদের বিলাতি পটহতালে সভায় সভায় নৃত্য করিয়া বেড়ায় না,—তাহা আমাদের নদীতীরে রুদ্ররৌদ্রবিকীর্ণ বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীন বস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন হইয়া বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠ-ভীষণ, তাহা দারুণ সহিষ্ণু, উপবাস ব্রতধারী—তাহার কৃশ পঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত অশোক অভয় হোমাগ্নি এখনো জ্বলিতেছে। আর আজিকার দিনের বহু আড়ম্বর, আস্ফালন, করতালি, মিথ্যাবাক্য, যাহা আমাদের স্বরচিত, যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র সত্য, একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্বেলিত পশ্চিম-সমুদ্রের উদ্‌গীর্ণ ফেনরাশি—তাহা, যদি কখনো ঝড় আসে, দশ দিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইবে।"

—রবীন্দ্রনাথ।

অনুবাদসাহিত্য

পারত্যক্ত

(অনুবাদ গল্প)

শোলোম অ্যাশ্

[ইহুদী সাহিত্যের সত্যিকারের উদ্ভব ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে বলা যায়। কিন্তু এরই মধ্যে এ-সাহিত্য অভাবনীয় উন্নতিলাভ করেছে। শোলোম অ্যাশের জন্ম পোলাণ্ডে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে। এ-যুগের শ্রেষ্ঠ ইহুদী-লেখকদের মধ্যে ইনি অন্যতম। নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্প-লেখক হিসাবে ইহুদী-সাহিত্যে এ'র একটা দান আছে। বর্তমান গল্পটি এ'র রচনা-শক্তির একটি বিশেষ নিদর্শন।]

ঘুম ভেঙে বুরী শুনতে পেলো শিশুটির কান্না। চোখ বুজেই স্ত্রীর উদ্দেশে সে বলে উঠল—'গোণ্ডা, বাচ্চাটা কাঁদছে যে!'

উত্তর এলো না। চারিদিকে চেয়ে লক্ষ্য করল স্ত্রী ঘরে নেই। ঈষৎ বিস্মিত হলো নিশ্চয়ই, কিন্তু ভাবল মুখ ধুতে গেছে খুব সম্ভব। একটুকরো কাপড় নিয়ে বাচ্চাটার মুখে গুঁজে দিল, যাতে বন্ধ হয় কান্না। তারপর উঠে শুরু করলে পোষাক পরা। পরতে পরতে মনে মনে আঁচ করতে লাগল, সেদিন যে রুপোর প্রদীপ-দান কয়টি মেরে নিয়ে এলো, তার দাম কতো তুলতে পারবে। চিন্তার প্রেরণাতেই এক সময়ে থামের মাথার ওপর উঠে দেখতে গেল মালগুলি কেমন। কিন্তু সেগুলি নেই! সমস্ত জায়গাতেই খুঁজে খুঁজে দেখতে লাগল—নেই!

ঘরের কোণে স্ত্রীর জিনিসপত্র যেখানে থাকে, তাড়াতাড়ি সেখানে এসে দেখল, সেগুলোও নেই!...ধীরে ধীরে আশঙ্কাটা স্বচ্ছ হয়ে আসতে লাগল মনে.... গোণ্ডা পালিয়েছে!

কিন্তু কার সঙ্গে? শ্লোমার? শ্লোব্ ? "যাক্...পালাক...মরুক গে!... ভারী বয়ে গেছে আমার!" নিজের মনেই বলতে লাগল ঃ—"মজাটা মন্দ নয়, হাঃ—হাঃ—হাঃ! শিশুর দিকে তাকালো।"

"কিন্তু এটাকে নিয়ে আমি এখন কি করি?"...বিড় বিড়িয়ে উঠল সে,—"ও কোথায় আছে একবার যদি জানতে পারতাম, এটাকে ফেলে দিয়ে আসতাম দরজার সামনে...নে' একে...এ' তোর!"

অকস্মাৎ একটা ভয়াবহ বুদ্ধি ঝিলিক দিয়ে উঠল মনে, বিবর্ণ হয়ে উঠল মুখ, হাত দুখানি উঠল কেঁপে; উপরের ঠোঁট সজোরে কামড়ে ধরল।...এগিয়ে গেল বাচ্চাটার কাছে। খোলা অবস্থায় পড়ে আছে, ক্ষুদ্র পায়ের ধাক্কায় ময়লা ছেঁড়া কম্বলটা একপাশে গেছে সরে। ছোট্ট মুঠিদুটি মুখে পুরবার চেষ্টা করতে করতে মুখে অর্থহীন হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলছে শূন্যের দিকে চেয়ে!...এর মুখের গড়নটা কাউকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে না কী?...যেন পুরানো কোনো চেনা-চেনা লোক নয় কী? ঠিক মনে করা যাচ্ছে না?......

কাছ থেকে সরে গেল, তাড়াতাড়ি টুপিটা মাথায় দিয়েই পড়ল বেরিয়ে, দরজায় দিল তালা বন্ধ করে। চলতে লাগল উদ্দেশ্যহীন কিন্তু মনে স্বাচ্ছন্দ্য নেই।...বাচ্চাটার কান্না কানে এসে এখনও যেন থেকে থেকে বাজছে, যেন ডাকছে তাকেই।...চোখ বুজলেই দেখতে পায় সেই ক্ষুদ্র জীবন্ত মাংসপিণ্ড-টাকে,—ছোট ছোট পা দুখানি অস্থির ভাবে ছুঁড়ছে, আর কেঁদে উঠছে থেকে থেকে।... না, ফিরতেই হবে তাকে। ......

"ওঃ! একবার যদি সেই বজ্জাত মেয়ে মানুষটাকে সামনে পেতাম",—মনে মনেই বকতে লাগল সে,—"গলাটা টিপে ধরতাম। টিপে ধরতাম সজোরে, যতক্ষণ দম বন্ধ হয়ে না তার জিভ্ বেরিয়ে আস্ত! যা মাগী গোল্লায় যা।"...

একটা রুটির দোকানে গিয়ে ঢুকল সে এতক্ষণে। একটা রুটি কিনে ফিরে এলো বাড়ি। বাচ্চাটা সেই ভাবেই শুয়ে আছে, সেই খোলা অবস্থাতেই,—মুখে সেই নির্বোধ হাসির রেখা! "বারে মজা, এ দেখি বেশ আছে, ব্যাটা ক্ষুদে ডাকাত!"...আবার বাড়ির বাইরে এলো। কিন্তু এমনই দুর্দৈব, স্বচ্ছন্দে বেড়াবে তারও উপায় নেই।... সর্বক্ষণেই চোখের সামনে ভেসে উঠছে। বাচ্চাটার মুখ, আকুল হয়ে কাঁদছে! না, পারা গেল না, অন্তরের নিভৃত কোণে কী যেন বেদনা মোচড় দিয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি তাকে ফিরে আসতে হলো বাড়ি।...বাচ্চাটা তখন সত্যিই আকুল হয়ে কাঁদছে,—"মাম্ ম—ম—ম...মাম্—ম-ম-ম!"..."তোর মা, কেমন? বেটাচ্ছেলে!...যা না, তোর সেই মহামূল্যবান মা রত্নটিকে খুঁজে নিয়ে আয়! মাগীর ওলাউঠা হোক্।"

শিশুটিকে দুহাতের মধ্যে তুলে নিলো। নিদারুণ আগ্রহে বাচ্চাটা ঘন হয়ে আসতে চাইল তার কাছে, ক্ষুদ্র দুটি ঠোঁট ব্যাকুল হয়ে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে!......

"সাতজন্ম নরকে পচে মরুক মাগীটা!" শাপান্ত করতে লাগল সে পলাতকার উদ্দেশে। তারপর অসহায় দুর্বল শিশুটিকে ঈষৎ দোলা দিয়ে আদর করে করে বলতে লাগল, "ও খোকন...ও...ও...কাঁদে না... কাঁদে না...ও...ও...লক্ষ্মী খোকন...সোনা খোকন...ও...ও...!"

শিশুটির আগ্রহান্বিত ব্যাকুল ঠোঁট দুটি তখনও কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে, নাড়ছে অস্থির দুটি হাত, নাড়ছে মাথা, কী একটা অব্যক্ত বেদনা যেন ব্যক্ত করতে চায়!... নিবিড় মমতায় বেচারীকে বুকে চেপে ধরে ইতস্তত খুঁজে দেখতে লাগল একটু দুধ কোথাও পড়ে আছে কি না। দেখা গেল ষ্টোভের মাথায় ক্ষুদ্র কড়া চাপানো, তার মধ্যে সামান্য একটু পড়ে আছে। ঐটুকু দুধেই রুটির টুকরো ভিজিয়ে নিয়ে চামচে করে বাচ্চাটার মুখের কাছে ধরল, যাতে করে সে চুষে নিতে পারে। মমতা গলানো মৃদু কণ্ঠে বলতে লাগল,—"খাও, খোকন খাও।...লক্ষ্মী খোকন...ও...! তোমার মা... মাগী জাহান্নামে যাক্...তোমাকে ফেলে গেছে...। সামান্য কুকুরও তার বাচ্চাকে ফেলে যায় না...মাগী কুকুরেরও বেহদ্দ!...ও ...ও...না...না...কাঁদে না...কাঁদে না...ও... ও...আমি তোমাকে ফেলে যাবো না...না... কিছুতেই না...ও...ও...লক্ষ্মী খোকন!"...

খাওয়া দাওয়ার পর শিশুটি যখন শান্ত হলো, সে তখন তাকে ভালো করে একটা কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো একেবারে রাস্তায়।

বাজারের ভিতর আসতেই তাকে ঘিরে একটা রীতিমত হৈ চৈ পড়ে গেল। বুরী গুণ্ডাটার কোলে একটা শিশু...ক্রাড্নিক তার আড্ডা থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "ওহে ভায়া, এ বাচ্চাটাকে আবার কোথা থেকে পেলে?"

ক্রাড্নিকের বৌ ত উত্তেজনায় সব কাজ ফেলে একপ্রকার ছুটেই এলো বলা যায়।

"তোমার ছেলে! তোমার? দেখি দেখি? বা! বা! ক্ষুদে চোখ দুটোর দিকে চেয়ে দেখ! দেখতে অবিকল যদি মারিনার মত না হয়ে থাকে ত কী বলেছি! ঐ নাক! একে-বারে অবিকল! কী চমৎকার ছেলে! দাও... দাও...আমার কোলে একবার দাও!...তার কাছ থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে বৌটি দুহাতে ধরে নিবিড় স্নেহে দোলাতে লাগল,—"কী খোকন...কাদের খোকন...দুষ্টু খোকন!"...

বুড়ো ক্রাড্নিক্...সমগ্র তস্কর ও গুণ্ডা পল্লীর একচ্ছত্র সর্দার...আস্তে আস্তে উঠে কাছে এলো, ভালো করে দেখলো বাচ্চাটাকে, তারপরে বুরীর পিঠে উৎসাহে মারল এক চাপড়।

"বেড়ে বাচ্চাটি তো ভায়া!...কালক্রমে এক-

কেউ একজন মুখ খুললো..



আর অতি প্রয়োজনীয় দামী ওষুধের চালান ডুবল সমুদ্রের তলায়

বাংলা ও আসামে হয়তো ম্যালেরিয়া মহামারী রূপে দেখা দিয়েছে ; হাজার হাজার মানুষ এই মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়েছে। বহু টন প্রাণরক্ষাকারী ওষুধ তাড়াতাড়ি ভারতবর্ষে পাঠাবার বিশেষ ব্যবস্থা হল। কিন্তু যে জাহাজে ওষুধ আসছিল সেটি টর্পেডোর আঘাতে জলমগ্ন হল। তিরিশ জন কি চল্লিশ জন সাহসী নাবিক জলে ডুবে প্রাণ হারাল। মহামারী অঞ্চলে হাজার হাজার লোকের বাঁচবার ভরসা রইল না।

কেউ একজন মুখ খুলেছিল—

কেউ একজন, সম্ভবতঃ কোনো সম্ভ্রান্ত নাগরিক, সেই চরম ইঙ্গিতটি জানিয়ে দিলেন, যেটুকু জানতে পারায় শত্রুর পক্ষে জাহাজটিকে বাধা দেবার জন্য ঠিক স্থানে ডুবোজাহাজ পাঠানো সম্ভব হল। চিন্তা না করে অসাবধানে উচ্চারিত একটি মাত্র শব্দের জন্য এই দুর্ঘটনা ঘটল।

এমনি ভাবে বিপদ ঘটে। বিশেষ কিছু না বলবার সঙ্কল্প করলে পর্যন্ত চলবে না—একেবারে কিছুই বলবেন না। আমাদের যারা শত্রু তাদের এসব সুযোগ থেকে বঞ্চিত করুন। চিঠি লেখার এবং টেলিফোনে কথা বলার সময় বিশেষ ভাবে সতর্ক হবেন। শত্রু সর্বক্ষণ চোখকান পেতে আছে। তাদের গোপন অস্ত্র হল ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট এবং টেলিফোনের লাইনের সঙ্গে অন্য লাইনের সংযোগ।

আপনার জন্য যেন বিপদ না ঘটে



জাহাজ, অস্ত্রসম্ভার, সৈনিকদের গতিবিধি, কিংবা যুদ্ধ সংক্রান্ত কারখানার কাজ যা আপনি দেখেছেন সে বিষয়ে কিছু বলা বা লেখা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকবেন। বহু প্রাণ বাঁচাতে এবং সাধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আমদানি বজায় রাখতে হলে—কিছুই বলবেন না।

ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট কর্তৃক প্রচারিত

AAA 1338

দিন অনায়াসেই বড়ো বড়ো বাড়ীর সিলিং-য়ে উঠতে পারবে চুপিসারে, কী বলো?... তারপর এর মা-টি কে হে?"

"এর মা পুড়ে মরুক আগুনে! জানেন, সে মাগী পালিয়েছে, আর সেই প্রদীপ-দান-গুলোও বাট্‌পাড়ি করে নিয়ে গেছে!"

"বাচ্চাটাকেও ফেলে গেছে!"

"আর বলেন কেন!"

"কী ভয়ানক কথা!"

বুড়ো সর্দার সমবেদনায় নুয়ে পড়ল। ক্লাড্‌নিক-পত্র যুবক ক্লাড্‌নিক ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে, সে বললে, "মন্দ কী!... আমার মনে হয়, এবার তোমাকে ব্যবসা ছাড়তে হলো, ওস্তাদ,—বাচ্চাটার জন্য তোমাকে রীতিমত একটি নার্স বনে যেতে হবে!...তোমার স্ত্রী কিন্তু দিব্যি চাল্‌টি চেলে দিয়ে গেল, কী বলো?"......

"হয়েছে! আমার সম্বন্ধে ভেবে ভেবে আর তোমাকে মাথা খারাপ করতে হবে না...আমি কে, রক্ষক হচ্ছেন ভগবান।... গুণ্ডা চিরকালই গুণ্ডা,—বুঝলে হে!"...

শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে ক্ষুদ্র শহরটা এবার পার হয়ে যেতে লাগল বুরী। মনে হচ্ছিল, শহরশুদ্ধ লোক তার দিকে আঙুল দেখাচ্ছে আর কৌতুকে হেসে উঠছে!...ক্রমে ক্রমে পার হলো নগর। নগরপ্রান্তে বনভূমির মধ্যে প্রবেশ করে একটা বড়ো পাথরের ওপর বসল সে।

চারিদিকে জনপ্রাণীটি নেই। ঝরবার পাতা ঝরাতে ঝরাতে তরুশাখা বিষাদে মর্মরিত হয়ে উঠতে লাগল। দূর থেকে একটা অস্পষ্ট কল্লোল ভেসে আসছে কোনো উপল-মুখরা ঝর্ণার।

বাচ্চাটাকে কাছেই নামিয়ে রাখল। কেমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্যকর বিরক্তি আসছিল ওর প্রতি।...ও' তখন নিঃশব্দে চেয়ে আছে তার দিকে,—চুষছে আঙুল, এমন ওর তাকানোর ভঙ্গী, যেন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। বুরী ভেবে পাচ্ছিল না ওকে নিয়ে সে কী করবে। মুহূর্তের জন্য মনে হলো সে-ও ওকে ফেলে পালাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে-ভাবটা চলে গেল, যখন ভাবলে, এ তারই রক্ত-মাংস,—যখন ভাবলে, কী নিদারুণ অসহায় এই ক্ষুদ্র শিশু! আবার ওকে সে সস্নেহে কোলে তুলে নিলে, বুকে চেপে ধরলা, নির্ণিমেষ চোখে দেখতে লাগল। মনে হলো, ওর মধ্যে সে যেন নিজেকেই দেখতে পেয়েছে; আর কথাটা মনে হতেই একটা আনন্দের স্রোত বয়ে গেল সমস্ত শরীরের ওপর দিয়ে!

"ক্ষুদে গুণ্ডা!"—বাচ্চাটার দিকে চেয়ে চেয়ে সে বলতে লাগল,—"ঠিক, তুমি একটি ক্ষুদে চোর আর গুণ্ডাই বটে। বড়ো হলে পাকা ওস্তাদটি হয়ে উঠবে তুমি, এ আমি বলতে পারি। অনায়াসেই উঠতে পারবে বড়ো বড়ো বাড়ীর সিলিং-এ, গলতে পারবে বাতাস চলাচলের ফাঁক দিয়ে, গলতে পারবে জানালা দিয়ে, ভাঙতে পারবে তালা, মেরে আনতে পারবে দামী নতুন চামড়া মুচীদের আস্তানা থেকে, কী বলো? আর তারপরে তোমারও হবে ছেলেপিলে, এমনি করে তাদের মা-ও তাদের ফেলে পালাবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তখন তুমিও কি এমনি ছেলে কোলে নিয়ে দোরে দোরে খাবার ভিক্ষা করে বেড়াতে পারবে?...... তুমি কী?...গুণ্ডা।... আমারই মত গুণ্ডা আর চোর।...হ্যাঁ...তুমি...আমারই মত...।"

শিশুটিকে নদীর ধারে গিয়ে নামিয়ে রাখ্‌ল সে। তারপরে অদূরের একটা গাছের পেছনে এসে দাঁড়ালো, বাচ্চাটা কী করে দেখবার জন্য। ক্ষুদ্র পা' দুটি ছুঁড়ছে, চুষছে হাত, আর কেঁদে উঠছে—"মা...ম...ম্‌...আ...মা...ম...ম...আ!"

আরেকটু দূরে গাছের আড়ালে স'রে গেল বুরী, কিন্তু তখনও শুনতে পাচ্ছে ওর কান্না। এই ভেবে সে দূরে সরে যেতে লাগল, যতক্ষণ না সে কিছুই দেখতে পায় কিছুই শুনতে পায়।...তারপর দিলো ছুট্‌। পালাচ্ছে কিন্তু তখনো কানে লেগে আছে বাচ্চাটার কান্না।...হঠাৎ মনে হলো, বাচ্চাটা নদীতে গিয়ে গড়িয়ে পড়েনি তো?...সমস্ত শরীরে খেলে গেল বিদ্যুৎ, অন্তর-প্রদেশে একটা বেদনা মোচড় দিয়ে উঠ্‌ল। তখনো ছুট্‌ছিল সে। কিন্তু ফিরে দাঁড়ালো, তারপরে যত দ্রুত পারা যায় নদীর দিকে ছুটে চল্‌ল।

আকুল হয়ে বাচ্চাটা কাঁদছে। পরম স্নেহে, মমতায় ও আগ্রহে ওকে কোলে তুলে নিলো সে, তারপর বনপ্রান্তের কুটীরগুলির দিকে অগ্রসর হলো। দুয়ার থেকে দুয়ারে ঘুরতে লাগল। তার ভাঙ্গা করুণ কণ্ঠ জানালো আবেদন,—"এই মা-বাপ-মরা অসহায় অনাথ শিশুটিকে তোমরা একটু দুধ ভিক্ষা দাও......একটু দুধ দাও!"

অনুবাদক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



আবার ধোপা কাপড় ছিঁড়েছে!
—আর কাপড়ের যা দাম

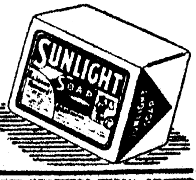
আজকের দুর্মূল্যের বাজারে ধোপাকে কিছুতেই কাপড় আছ্ড়ে কুটি-কুটি করতে দেবেন না। এর চেয়ে কাপড় ধোওয়ার কোনও মোলায়েম উপায় আবিষ্কার করা চাই, যাতে প্রত্যেকটি পোষাকই যতদিন সম্ভব টেঁকে। নিজের বাড়ীতে সান্‌লাইটের "সাবান-মেখে-বাঁচানোর" পন্থায় কাপড় কাচ্‌তে আরম্ভ করবার এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। কাপড় কাচ্‌বার এই মোলায়েম পন্থা ধোপার আছ্‌ড়ানোর চাইতে সব হিসাবেই ভাল এ তার চেয়ে ঢের সহজ; এতে কাপড় অনেক বেশী পরিষ্কারও হয়, এবং একটি সুতোও নষ্ট হয় না। সান্‌লাইটের স্বয়ং-ক্রিয় ফেনা নোংরা কাপড় থেকে ময়লা সহজে এবং সম্পূর্ণভাবে বার করে দেয়, এবং তার জন্যে কাপড় আছ্‌ড়াতেও হয় না, বা জোরে ঘস্‌তেও হয় না। কাপড়ও, যেন কৃতজ্ঞতার খাতিরেই, ঢের পরিষ্কার হয় এবং বেশীদিন টেঁকে। আপনার চাকরকে আজই সান্‌লাইটের এই "সাবান-মেখে-বাঁচানোর" উপায় বুঝিয়ে দিন।

আপনার চাকরকে সান্‌লাইটের "সাবান-মেখে-বাঁচানোর" উপায় শিখিয়ে দিন



১। কাপড় খুব ভিজিয়ে নিন, যাতে সাবান মাখ্‌তে সুবিধা হয়। ২। কাপড়ে সান্‌লাইট্‌ ঘসে নিন। বেশী নোংরা জায়গাগুলিতে বেশী করে সাবান দিন। ৩। মোলায়েমভাবে নিংড়ে নিন, যাতে সাবান সারা কাপড়ে মেখে যায়। আছাড় মারবার কোনই দরকার নেই। সান্‌লাইটের স্বয়ং-ক্রিয় ফেনা কাপড় থেকে সব ময়লা ছাড়িয়ে নিয়ে, আঁক্‌ড়ে ধরে থাকবে। ৪। বেশ করে ধুয়ে নিন — সমস্ত ফেনা ধুয়ে ফেলা চাই, কারণ এখন সব ময়লা ফেনার মধ্যে চলে গেছে। খুব বেশীরকম ময়লা কাপড়ে দু'বার সাবান মাখাতে হতে পারে।

সান্‌লাইট্‌ সাবান কাপড় বাঁচায়



LEVER BROTHERS (INDIA) LIMITED

—বাঙলা ভাষায়—

—বিশ্বসাহিত্যের সেরা বই—

কারমেন ১, কার্ল য়্যাণ্ড আন্না ১,

প্রেম ও প্রিয়া ২॥০

টুর্গেনিভের ছোট গল্প ২॥০

গোর্কির ছোট গল্প ২॥০

গোর্কির ডায়েরী ২॥০

রেজারেকসান ২॥০

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

ইউ, এন্, ধর য়্যাণ্ড সন্স্ লিঃ,

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

সকল সময়ে ব্যাংক অফ্ কমার্স নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

হেড অফিস

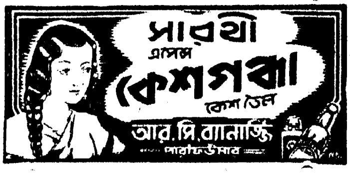
১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

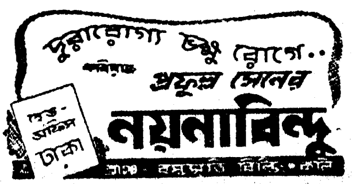
এবং শাখাসমূহ

ডাক্তার পালের খাঁটী পদ্মমধু



ব্যবহারে চক্ষের ছানি, চক্ষু লাল হওয়া ও জল পড়া, চক্ষু করকর করা ইত্যাদি সর্বপ্রকার চক্ষুরোগ সম্পূর্ণ স্থায়ীভাবে আরোগ্য হয়। ইহা ব্যবহারে অতি আশ্চর্য ও স্থায়ী ফল পাইবেন। মূল্য এক ড্রাম শিশি ১॥০, দুই ড্রাম শিশি ২॥০। প্রাপ্তিস্থানঃ—**এস পাল এণ্ড কোং,** ৪নং হসপিট্যাল ষ্ট্রীট, ধর্মতলা, কলিকাতা। **এল, এম, মুখার্জি এণ্ড সন্স, লিঃ**—১৬৭নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। **যমুনাদাস এণ্ড কোং, চাঁদনীচক,** দিল্লী। অন্যান্য ঔষধালয়েও পাওয়া যায়।





ফরাসী দার্শনিক প্যাস্ক্যাল্ (Blaise Pascal) বলিয়াছিলেন, ক্লিওপ্যাট্রার নাকটা আরেকটু ছোট হইলে পৃথিবীর চেহারা অন্য রকম হইত। বাঙালী ভাবুক আমি নাক লইয়া অতটা বাড়াবাড়ি করি নাই, শুধু "প্রেম ও নাক" নামে একটি ছোট গল্প লিখিয়াছিলাম। নায়ক নায়িকা পরমসুন্দর পরমাসুন্দরী। বিবাহের দলিল পাকা না হইলেও বিবাহ হইবে বলিয়াই দু পক্ষ মনে মনে জানে, এমন সময় নায়িকা নায়কের ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে হাওয়া বদলে গেল। নায়ক নায়িকা দুজনেরি চোখে জল ঝরিল, কিন্তু মনে মনে দুজনেই খুশি হইয়া ভাবিল বিরহের পর মিলনটা জমিবে ভাল।

নায়িকা সুদূরে নূতন হাওয়া খাইতেছে, এমন সময় নায়ক এদিকে এক কাণ্ড করিয়া বসিল—যদিও ইচ্ছা করিয়া নয়। বন্ধুর সঙ্গে সখের তলোয়ার খেলা খেলিতে খেলিতে নাকের ডগাটা খোয়াইয়া বসিল। ডাক্তার আসিয়া রক্ত থামাইল, নাকের ছিন্ন টুক্রাটাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল, কিন্তু কাটা নাকটুকু আর কিছুতেই যথাস্থানে জোড়া লাগানো গেল না।

নায়িকার "ফিরিয়া আসিতেছি" চিঠি পাইয়া নায়ক দুশ্চিন্তায় দিনে দিনে শুকাইতে লাগিল। "এবারে ফিরিয়া গিয়াই আমার জীবন এবং তোমার জীব কালের সমুদ্রে একই ভেলায়" ইত্যাদি পাড়ি সে আরও চিন্তিত হইয়া উঠিল। এ মঙ্গল ভোরে পৌঁছিয়াই নায়িকা নায়ককে আহবান লিপি পাঠাইল। বলা বাহুল্য, প্রিয়ামিলনোদ্দেশ্যে গেল না, দিনের কাটা নাক লইয়া বেচারা প্রিয়া-সন্দর্শনে কি করিয়া? উতলা নায়িকা পাছে নিজেই কোথায় উপস্থিত হয়, এই ভয়ে সে সারাদি মত হইতে পলাইয়া থাকিয়া অবশেষে নিতা শের টানে সন্ধ্যাবেলা কাটা নাক রুমা কয়া নায়িকার সঙ্গে দেখা করি রিয়া বিলম্বের কৈফিয়ৎ স্বরূপে কহিল, "দোঁবিজয়লক্ষ্মী কত বিরহ সহ্য করিতে পারি।" নারনীধর গিরী রুমালের কৈফিয়ৎ দিল "ও কি প্রেসিডেন্ট নাকে একটু সর্দি লাগিয়াছে।" জনে কত কথা! শেষকালে "খুব কোট আমি" বলিতে বলিতে নায়িকা ন করিয়াছেন আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে হাত ক ঘরোয়া ব্যাহই" বলিবার আগেই নায়ক দিতে অনিচ বেশী আত্মহারা হইয়া পড়ার বলিলেন যোক হইতে রুমালটা খসিয়া নিকট মোচা হইতে হাত ফিরাইয়া নিয়া প্রণালী শিএ কি?" নায়ক তাড়াতাড়ি দৈনিক ছয় য়া ফেলিয়া কি যেন বলিতে কাচ্চাবাচ্চা লা......বৃথা! ততক্ষণে যাহা অলৌকিক য গিয়াছে।

বিজয়লক্ষ্মী বিবাহ করিল কি না করিল না করুন, বে নায়ক সম্বন্ধেও রহস্যজনক- বিজয়লক্ষ্মী গিয়াছিলাম। শুধু গল্পের নাটিগুলি প্রেকরুণ ভাষায় বর্ণনা করিয়া- যাইবে! সা, এই কাঁদা ক্ষুর-সম্পর্ক-উন্মাদকে পথে পথে বেড়াইতে দেখা ও শুনা

এই লাইসে প্রেম শুধু এতটুকু এক-চলিতে......হায় রে হায়!"

"সোনাদানার ব * *

সরকার শেষ ডুবার সৌভাগ্য লাভ করেন জন্যেও লাইসেন পারিবেন না, ছোট হাসির শিল্পী। গল্পটি এমন

লেখু-ওেক

অ·কৃ·র

যে পড়িয়া ইচ্ছা করিলে হাসিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে কাঁদিতেও পারেন। কিন্তু আমার নিজের কথা থাক। নাকের কথাই বলি। নাক যে একটা সোজা (অর্থাৎ সহজ) জিনিষ নয়, তাহা গোড়াতে ফরাসী দার্শনিকের উক্তি হইতে এবং পরে আমার বর্ণিত গল্পের সারাংশেই টের পাইয়াছেন। তাছাড়া দেখুন, নাক দিয়া আমরা অর্ধভোজন করি (ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম্) এবং ঘৃণা ও অবজ্ঞায় নাক সিঁট্কাই। পরের ব্যাপারে সুযোগ পাইলেই নাক ঢুকাই। নাক না থাকিলে এ সব ব্যাপার করিতাম কি দিয়া?

* * * *

নাকের সমালোচনা করিয়া নাকের মালিককে চটানো বা খুশি করা যায়। যদি বলি আপনার নাক ভোঁতা তাহা হইলে আপনি যত চটিবেন ভোঁতা বুদ্ধি বলিলেও হয় তো তাহার চেয়ে বেশী চটিবেন না। কিন্তু "ভদ্রলোকের নাকটি কিন্তু—যাই বলো না কেন—বাঁশীর মতো" একথা আপনার আড়ালে গোপনে বলিবার ভাণ করিয়া নাকের মালিক আপনাকে শুনাইতে পারিলে আপনাকে দিয়া অনেক কাজ করাইয়া নিতে পারা যাইবারই সম্ভাবনা বেশী।

কিন্তু "বাঁশীর মত নাক" বলিলে বাঁশীর সঙ্গে নাকের দৈর্ঘ্যগত সাদৃশ্য না বুঝাইয়া ধ্বনিগত সাদৃশ্যও বুঝাইতে পারে; নাকটি বাঁশীর মত বাজে, অর্থাৎ সোজা ভাষায় নাক ডাকে।

লণ্ডনে জনৈকা মহিলা তাঁহার স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করিয়াছিলেন এই অজুহাতে যে, রাত্রে ভদ্রলোকের নাক ডাকিত। মামলার ফলে ভদ্রমহিলা আবার কুমারী হইয়াছিলেন। তখন এদেশী ছিছি-বাগীশদের মত আমারও মনে হইয়াছিল "ছিছি, কি তুচ্ছ কারণেই না ওদেশে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা আনা হয়!"

কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম, মেম সাহেবের বিবাহ-বিচ্ছেদ কামনার কারণটি তুচ্ছ নহে, বরং তিনি যে এই মামলা আনার চেয়েও মারাত্মক কিছু করেন নাই ইহাতেই তাঁহার আশ্চর্য সংযমের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

* * * * *

আমার নিজের একটি করুণ অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছি। অনেক বছর আগেকার কথা। স্কুল ছাড়িয়া সবেমাত্র কলেজে ঢুকিয়াছি। এই সময় বাড়িতে দূর সম্পর্কের জনৈক আত্মীয় অতিথি হইলেন। চমৎকার ভদ্রলোক। সারাটা দিন গল্প গুজবে গান বাজনায় সারাটা বাড়ি মাতাইয়া রাখিলেন। হায়, তখন কল্পনাও করিতে পারি নাই পরে কি আসিতেছে।

রাত্রে আমার ঘরে তাঁহার বিছানা করিয়া দেওয়া হইল। ঘুমাইবার কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাগেশ্রী, বেহাগ, জয়জয়ন্তী প্রভৃতি রাগ-রাগিণীর চমৎকার আলাপ গুণ গুণ করিয়া গাহিয়া শুনাইলেন। তারপর "আচ্ছা, এবারে ঘুমুনো যাক" বলিয়া তিনি চুপ করিয়া গেলেন বটে, কিন্তু—সম্ভবত তাঁহার নিদ্রিত অবস্থার সুযোগ নিয়াই—তাঁহার নাক উচ্চৈঃস্বরে নানা বিচিত্র রকমের আওয়াজ করিতে সুরু করিল। বুঝিলাম ভদ্রলোক এইভাবেই সারারাত আরামে ঘুমাইবেন এবং আমাকে তাঁহার নাকের বাঁশী সারারাত জাগাইয়া রাখিবে। মেজাজ অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিল। জোরে জানালার আওয়াজ করিয়া তাঁহার ঘুম ভাঙাইয়া দিলাম। নাক ডাকা থামিয়া গেল। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "কি হলো?" কহিলাম, "ও কিছু নয়, এম্নি।" শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আবার তিনি দ্রুতবেগে ঘুমাইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার নাকটি আবার আগের মত বিশ্রীরকম আওয়াজ করিতে লাগিল। সে রাতটা পুরাপুরি জাগিয়াই কাটাইতে বাধ্য হইলাম। বহুবার ভদ্রলোককে খুন করিয়া তাঁহার নাকের বাঁশীটি চিরদিনের জন্যই বন্ধ করিয়া দিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, ভয় হইয়াছিল, শেষ পর্যন্ত নিজেকে কিছুতেই সাম্লাইতে পারিব না।

বহুকষ্টে শেষ পর্যন্ত নিজেকে সাম্লাইয়া রাখিয়াছিলাম। ভদ্রলোকের তিন চারদিন থাকার কথা ছিল। কিন্তু বিশেষ জরুরী কাজে পরদিন দুপুরবেলাই তাঁহাকে বিদায় নিয়া চলিয়া যাইতে হইল, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম।

* * * * *

আমার এই অপ্রিয় অভিজ্ঞতাটিতে একটি শিক্ষার বিষয় আছে। হে পাঠক! হে পাঠিকা! দিনের আলোয় যাহাকে পরম প্রিয় বলিয়া ভাবিতেছেন, রাতের অন্ধকারে তাহাকেই পরম অপ্রিয় বলিয়া মনে হওয়াটা কিছু অসম্ভব নয়। সুতরাং কাহাকেও দিনের আলোতে দেখিয়াই তাহার সম্বন্ধে চূড়ান্ত ধারণা করিয়া ফেলিবেন না।

ট্রামে-বাসে

স•। Nichols-এর সঙ্গে দেখা করিবার সময় কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "The British must realise that they have no friend in India. Not a friend." এই উক্তিটির উপর টীকা করিয়া গ্রন্থকার তাঁর কুখ্যাত "Verdict on India" বইতে লিখিয়াছেন—A Hindu politician would have said it at the top of his voice and with delight. Jinnah said it quietly, with regret". সত্যি সত্যি হিন্দু



রাজনৈতিক কথাটা কিভাবে বলিতেন তা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বিচার করা শক্ত, যদিও আমরা জানি বিবেক বুদ্ধি মতে যে মতবাদে হিন্দুরা বিশ্বাস করেন তা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে দ্বিধা করেন না। কায়েদে আজম শুধু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চীৎকার করার কসরৎই আয়ত্ত করিয়াছেন, অন্য কোন সুর তাঁর গলায় বড় খোলে না!

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীকে শেষ পর্যন্ত আমেরিকার শ্বেতালয়ে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ানো হইয়াছে। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট নাকি বলিয়াছেন যে, প্রেসিডেণ্ট পত্নী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নাকি খুব কৌতূহলী হইয়া অনেক প্রশ্নই করিয়াছেন। কিন্তু আলোচনাগুলি নেহাৎ ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়া তিনি বিশদ বিবরণ দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। বিশু খুড়ো বলিলেন যে, প্রেসিডেণ্ট পত্নী বিজয়লক্ষ্মীর নিকট মোচাঘণ্ট ও কুমড়ার ছক্কা প্রস্তুতের প্রণালী শিখিয়া নিয়াছেন এবং ঐ সঙ্গে দৈনিক ছয় পয়সা আয় দিয়া কি করিয়া কাচ্চাবাচ্চা লইয়া সংসার করা যায় সেই সব অলৌকিক কায়দাগুলিও নাকি শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী তাঁহাকে শিখাইয়াছেন। ভগবান না করুন, কোন দুর্দিন সমুপস্থিত হইলে বিজয়লক্ষ্মী প্রদত্ত ঘর-সংসারের এই খুঁটি-নাটিগুলি প্রেসিডেণ্ট পত্নীর কাজে লাগিয়া যাইবে!

এই লাইসেন্স প্রসঙ্গেরই আলোচনা চলিতেছিল। বিশু খুড়ো বলিলেন—"সোনাদানার কথা ভাবিনে। কিন্তু বাঙলা সরকার শেষ পর্যন্ত বালতির দোকানের জন্যেও লাইসেন্স চেয়ে বসলেন এইটে বড়ই দুঃখের কথা।" অনুরূপ মর্মে কোন আদেশ জারী করা হইয়াছে বলিয়া জানা না থাকায় খুড়োর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইলাম। খুড়ো ৩১শে জানুয়ারীর 'আজাদ' কাগজখানা দেখাইয়া দিলেন। কোন একটি বালতির দোকানের সংবাদ পাইয়া পুলিশ নাকি হেষ্টিংস এলাকায় এক জায়গায় গিয়া হানা দেয় এইরূপ একটি সংবাদ এই কাগজে প্রকাশিত হয়। সংবাদটি পড়িয়া বুঝিলাম ইহা ইংরেজী "Bucket shop"-এর অত্যাধুনিক বাঙলা অনুবাদ। খুড়োকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলে খুড়ো বোকার মত তাকাইয়া রহিলেন। আজাদকে ধন্যবাদ, খুড়োকে বোধ হয় এই প্রথম বোকা বনিতে দেখিলাম!

লাইসেন্স ব্যতীত পাঁচ তোলার বেশী সোণা ক্রয়-বিক্রয় করা যাইবে না, মজুত রাখা যাইবে না এই মর্মে আসামের গবর্ণর বাহাদুর একটি আদেশ জারী করিয়াছেন। বাঙলার গবর্ণর, অনুরূপ একটি আদেশ জারী করিলে অনেক কন্যার পিতাই বাঁচিয়া যাইতেন এবং অনেক অকৃতী



স্বামীও স্ত্রীর কাছে মুখ দেখাইবার একটি অজুহাত পাইতেন। আমরা কার্যত বহু-দিন আগেই Off gold standard হইয়া আছি, এখন আইনত হইলেই আর কোন দুঃখ থাকিত না। আসামবাসীর ভাগ্যে ঈর্ষা বোধ করিতেছি!

আমরা সম্প্রতি একটি বিবাহ বাতিলের সংবাদ পাইয়াছি। বিবাহের সমস্তই ঠিক হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ যখন খবর পাওয়া গেল যে, পাত্রী একজন সত্যাগ্রহীর ভ্রাতুষ্পুত্রী, তখন বরের পিতা জানাইয়া দিলেন যে, যেহেতু তিনি একজন মিলিটারী কনট্রাকটার সেই হেতু তিনি সত্যাগ্রহীর ভ্রাতুষ্পুত্রীকে পুত্রবধূরূপে তাঁর ঘরে আনিতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল। কয়েকটি যাত্রার দলের লোক এক জমিদার বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছেন। খাওয়ার শেষের দিকে



যখন দই পরিবেশন করা হয় তখন দুইজন বলিলেন—"আমাদের দই দেবেন না।" কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন যে, তাঁরা যাত্রার দলের জুড়ি গায়ক অর্থাৎ গলার স্বর অটুট রাখার জন্য তাঁরা কোন অম্লরস আহার করেন না। তৃতীয় ব্যক্তিকে দই পরিবেশন করিতে গেলে তিনিও তা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনিও জুড়ি কিনা জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দিলেন—"আজ্ঞে না, আমি মন্দিরা বাজাই।" মিলিটারী কনট্রাকটারের এই উৎকট আভিজাত্যে সেই মন্দিরা বাদকের কথাই মনে পড়িয়া গেল।

"MORNING NEWS"-এর ষষ্ঠ-কলামী "caractacus" জানাইতেছেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশন 'স্বাধীনতা দিবসে'র তামাসা দেখাইতে গিয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু টিকা দেওয়ার প্রশ্ন উঠিলে অর্থাভাবের অজুহাত দেখান। কর্পোরেশনের অর্থদৈন্য অবশ্যই দুঃখের কথা এবং অর্থ সঞ্চিত রাখিয়া টিকা দেওয়ার ব্যাপারে গাফিলতি সত্যই নিন্দার্হ। কিন্তু 'স্বাধীনতা দিবসের তামাসা' দেখাইবারও প্রয়োজন আছে। City fathers-এর কর্তব্যের দিক হইতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের শিক্ষার জন্য স্বাধীনতা দিবসের তামাসা খেলা তাঁরা দেখাইতেছেন। "Caractacus" বয়স এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারিবেন যে, এই "তামাসার" প্রয়োজন ছিল!

এক ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীতে সর্বত্রই নাকি স্বামীর দুর্ভিক্ষ চলিতেছে। ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ভারতবর্ষ চির-কালই তার অফুরন্ত সম্পদ দিয়া বিদেশীর প্রয়োজন মিটাইয়াছে। সুতরাং স্বামী সম্পদ দান করিতেও ভারত কুণ্ঠিত হইবে না; কিন্তু Blood Bank-এর ব্যাপারে যে ভারতীয় রক্ত অতিশয় কার্যকরী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে বৈবাহিক অনুষ্ঠানে সেই রক্ত বিদেশিনীর পক্ষে একবারেই অচল। সুতরাং দুর্ভিক্ষ কবলিত অঞ্চলের কুমারী-দের বেদনায় নীরবে দীর্ঘশ্বাস মোচন ছাড়া আমাদের আর কিই-বা করিবার আছে!

বিধাতার ক্ষমা চাই

শিবরাম চক্রবর্তী

যে সব সূর্য আলো নিলো নাকো আলো দিতে হবে বলে',
অন্ধ রহিল অন্ধকারের কোলে;
যে সব ভবিষ্যৎ,
অবর্তমান অতীত রহিল, পেল না নিজের পথ;
'ধরার সবাই পূর্ণ না হলে কি করে' পূর্ণ হই'—
যাহাদের মনে চিরদিন পীড়া দিল এই প্রশ্নই;
ক্ষীরের পয়োধি সম্মুখে পেয়ে করিলো না ক্ষীর পান,
অমৃত লভিতে কুণ্ঠিত হোলো পেয়ে তার সন্ধান;
চারি ধারে দীনহীন,
তার মাঝখানে কি করে দুহাতে নেব বিধাতার ঋণ—
অমেয় প্রাচুর্যতা?
অতিরিক্তের সামনে তাদের তাই অতি রিক্ততা।

একটি প্রদীপ জ্বলে তো প্রথমে আর সকলের আগে,
নিজের খাতিরে না হলেও, শুধু আলোকেরই অনুরাগে?
তার জ্বলন্ত শিখার ছোঁয়াচে আর প্রদীপেরা জ্বলে,
দীপান্তর না হলে আলোকের ফাঁসি হয়ে যাওয়া বলে!
হায়, অপরের অন্ধকারের জ্বালা
বেশি করে' পেয়ে হোল্লো না যাদের নিজের প্রদীপ জ্বালা;
যে সব নতুন মৈত্রেয়ী মনে নবতর স্বার্থই—
'অপরে অমৃত না হলে কী সুখে নিজে অমৃত হই?'
তারা যেন এটা জানে,
অমৃতকে তারা ক্ষুধিত রেখেছে আপনার অজ্ঞানে।

জীবন ক্ষণস্থায়ী;
তবু যেন তারা এটা জেনে যায় তারাই কেবল দায়ী—
এত যে দুঃখ, এই ব্যর্থতা, বঞ্চনা, হানাহানি,
মিথ্যা আঁধারে আপন অন্যারে নাচেনার যত গ্লানি,
এ সবের মূলে তারাই রয়েছে—পেয়েছিলো যারা আলো,
দুঃখ এই যে, মানুষকে তারা বেসেছিলো এত ভালো,
সে আলো তাহারা নিজেরা নিলো না, দিলো না পরের হাতে।

অন্ধ খুনের যে পালা জমেছে—অন্ধকারের রাতে,—
যারা খুন্ হয়, যারা খুন্ করে, তারা নয়, তারা নয়,—
তারা নয়, যারা দুঃখ দিচ্ছে, পাচ্ছে বিস্ময়,—
তারা নির্দোষ, তাদের জন্যে আছে বিধাতার ক্ষমা।
শুধু তারা—যারা পূর্ণিমা হতে গিয়ে রয়ে গেল অমা,
প্রতিপদে বাধা মানি' আপনার মনে,
আলোকের কলাকৌশল জিনি' দিলনা সর্বজনে;
সেই সব ভগীরথ,
গঙ্গার যারা সন্ধান পেল, কাট্‌লনা তবু পথ;
ওখানে অমৃত উন্মুখ, হেথা ভস্মরা প্রাণ মাগে,
মাঝখানে যারা ছিল ভগীরথ, এগুলোনা তারা আগে।
মুক্তিকে পেতে হবে যে প্রথমে একলা, তাহার ক্ষোভে
যাদের শঙ্খ বাজ্‌ল না মোটে; অমৃতের নির্লোভে
নিজে বঞ্চিত থেকে করে' গেলো সবারে বঞ্চনাই—
বিধাতার কাছে তাহাদের ক্ষমা চাই॥

মাসফল

কানাই সামন্ত

সখি, বড় নিদারুণ শুনি মাসফল—
এ ফাগুনে নাই মোর গানের ফসল।
তুই যদি আঁখি তুলে চাস,
নয়নে অধরে হয় হাসির বিকাশ,
তোর আঁখি তারাভাতি জাগিবে কেবল—
কী করিবে গগনের গ্রহতারাদল,
বল্ মোরে বল্॥

আষাঢ়ে মনে কি পড়ে চ'ড়ে রেলগাড়ি,
নিদয়ে, মুঙ্গেরে যবে দিয়েছিলে পাড়ি
নবযুগে নব মেঘদূতী
রচনার আশা ভাষা গর্ব আকূতি
দূরে হল। তুমি যদি চ'লে গেলে ছাড়ি
কোথা পাব মেঘভার বিদ্যুৎ বারি
বলাকার সারি?

নিরজন নিস্তব্ধ রুদ্ধ কপাটে—
আমি রব জানালায়, তুমি রবে খাটে।
এলায়িত কেশঘন কালো,
কটাক্ষে ক্ষণে ক্ষণে চপলার আলো—
পাঠাব আমার দূত, দূর ঘাটে ঘাটে
খুঁজিবে প্রিয়ারে চির গূঢ় প্রাণপাটে
দিন যার কাটে॥

দাস হবে কালিদাস নতুন যুগের
এ আশায় হানি বাজ না গেলে মুঙ্গের,
কী জানি, কী ছিল মহাক্ষতি!
যা হোক ফিরেছ, ফিরে এল সম্প্রতি
ধরাতলে মধুমাস। দুর্ভাগ্যের
অবধি হোক-না, সখি, মুক এ প্রাণের
নির্ভাষণে॥

জীর্ণ জরার বুকে এল ফাল্গুনে;
পলাশে শিমুলে জ্বলে রঙের আগুনে;
নবরবিকিরণমদিরা
ভরে দেহে এ দেহের শিরা উপশিরা;
কোকিল পাপিয়া শ্যামা ডেকে ডেকে খুনে।
মাসফলে আমি বোবা? এ কি নিদারুণ
ভাগ্য বিগুণ॥

শোন্, সখি, শোন্ মোর এক নিবেদন—
গ্রহতারাদের ষড়যন্ত্রভেদন
হেসে চাক্ আঁখিতারা দুটি,
ফুল্ল অধরফুলে গৌরবে ফুটি
ঢেলে দিক্ প্রণয়ের গন্ধবেদন—
প্রাণেতে লাগুক্ নব গীতযৌবন,
নবজাগরণ॥

"দেশ-হিতৈষীরা কেহ বলেন, দেশের উন্নতির জন্য জিম্‌ন্যাস্টিক্ কর, কেহ বলেন সভা কর, আন্দোলন কর, ভারত-সঙ্গীত গান কর, কেহ বলেন মিথ্যা বল, মিথ্যা প্রচার কর, কিন্তু কেহ বলিতেছেন না যে, সত্য কথা বল ও সত্যানুষ্ঠান কর। উপরিউক্ত সকল কটার মধ্যে এইটেই সকলের চেয়ে বলা সহজ এবং সকলের চেয়ে করা শক্ত, এইটেই সকলের চেয়ে আবশ্যক বেশি, এবং সকলের চেয়ে অধিক উপেক্ষিত। সত্য সকলের গোড়ায় এবং সত্য সকলের শেষে। আরম্ভে সত্যবীজ রোপণ করিলে শেষে সত্য ফল পাওয়া যায়, মিথ্যায় যাহার আরম্ভ মিথ্যায় তাহার শেষ।" —রবীন্দ্রনাথ



বম্বের চলচ্চিত্র মহলের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট কোন পাঠক আমাদের জানাচ্ছেন যে, নীতিন বসু একখানি ছবি তোলার জন্যে ফিল্মিস্তানের কাছে এক লক্ষ টাকা পাবেন ব'লে আমরা যে সংবাদ কিছুকাল আগে প্রকাশ করেছি তা সত্যি নয়। তিনি পত্রে জানাচ্ছেন যে, "নীতিনবাবু এখানকার Supreme নামক একটি চিত্র প্রতিষ্ঠানের মাহিনা করা (বা অন্যভাবে চুক্তিবদ্ধ) ডিরেক্টর। সম্প্রতি এই supremeএর সহিত ফিল্মিস্তানের contract হইয়াছে, যাহার ফলে ফিল্মিস্তান supremeকে একটি ছবি তৈয়ার করিয়া দিবেন: সর্ত এই যে,



ডিলুক্স পিকচার্সের আগামী আকর্ষণ 'সংসার' চিত্রে কাননবালা ও ছবি বিশ্বাস

supremeএর পক্ষ হইতে নীতিন বসু ডিরেক্টর থাকিবেন, কিন্তু ছবির গল্প হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বিষয়ের control ফিল্মিস্তানের প্রযোজক শ্রীশশধর মুখোপাধ্যায়ের হাতে থাকিবে। ফিল্মিস্তানের নামযশ এবং শশধরবাবুর কৃতিত্বের সহায়তা লইবার জন্যই supreme এর কর্তৃপক্ষ এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এস্থলে ফিল্মিস্তান এক লাখ টাকা দিয়া নীতিনবাবুকে ডিরেক্টর নিযুক্ত করিয়াছেন এরূপ কোনও কথাই উঠিতে পারে না; বরং নীতিনবাবুর কর্তৃপক্ষই ফিল্মিস্তানকে ছবি তৈয়ার করার জন্য টাকা দিবেন।...নীতিনবাবু এই সূত্রে বাঙলাদেশে নিজের দাম বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন কি-না জানি না—তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষও হইতে পারেন।"

এ সম্পর্কে আমাদের বলবার কথা হ'চ্ছে নীতিনবাবুর লাখ টাকা পাওয়া বিষয়ে যে সংবাদ আমরা প্রকাশ করি তা বিশ্বস্তসূত্রেই পাওয়া এবং শুধু 'দেশ'-এতেই নয়, সমগ্র ভারতের এমন কোন চলচ্চিত্র পত্র-পত্রিকা আমাদের নজরে পড়েনি যাতে এ সংবাদটি বাদ পড়েছে। অথচ, নীতিনবাবু, ফিল্মিস্তান বা সুপ্রীম কারুর তরফ থেকেই আজও কোন প্রতিবাদ আসেনি—এর মানে তাহ'লে কি বুঝতে হবে? এমনও তো হ'তে পারে, এ ছবিখানির জন্যে নীতিনবাবু সুপ্রীমের তরফ থেকেই যে টাকা পাবেন তার পরিমাণ লাখ টাকা—এইটেই হয়তো ফিল্মিস্তানের নামে জড়িয়ে গেছে? মূলে নিশ্চয়ই কোন সত্য আছে যা অচিরেই জানা যাবে।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

প্রভাত ও ম্যাজেস্টিক সিনেমায় এই সপ্তাহে মুক্তিলাভ ক'রছে সিলভার ফিল্মসের 'বড়ে নবাব সাহেব'। উত্তর ভারতে এই জমকালো মুসলিম সামাজিক চিত্রখানি বেশ নাম করেছে। এর ভূমিকায় আছেন চন্দ্রমোহন, পাহাড়ী, প্রমীলা, বিব্বো প্রভৃতি।

*

এ সপ্তাহে আর একটি নতুন আকর্ষণ সেন্ট্রালে মিনার্ভা মুভীটোনের 'ডাঃ কুমার'। এর বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন বলবন্ত সিংহ, সংকঠাপ্রসাদ, ছোট খুরসীদ, লতিকা ও নাজমা।

*

রূপবাণীতে কালী ফিল্মসের 'অভি[নয়] নয়'-এর মুক্তি-তারিখ খুব কাছে এগি[য়ে] এসেছে। শৈলজানন্দের পরিচালনা ব'[লে] লোকের ঔৎসুক্য বেশ দেখা যাচ্ছে।

পরলোকে বিশ্বনাথ ভাদ্ড়ী

এ সপ্তাহের একটি দুঃখের সংবাদ হচ্ছে প্রথিতযশা অভিনেতা বিশ্বনাথ ভাদ্ড়ীর অকালমৃত্যু—শনিবার অপরাহ্ন ৪-৫০ ঘটিকায় অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে বিশ্বনাথ ভাদ্ড়ীর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৮ বৎসর। শিশিরকুমারের কনিষ্ঠ হিসেবেই নয় নিজস্ব প্রতিভার জোরেও তিনি সুধীসমাজে অসাধারণ কৃতিত্বসম্পন্ন গুণী শিল্পী ব'লে পরিচিত ছিলেন। প্রথম তিনি পাদপ্রদীপের সামনে আসেন ২৮ বছর বয়সে কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে ডি এল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চন্দ্রকেতুর ভূমিকায়, পরে লক্ষ্মণের ভূমিকায় 'সীতা' নাটকে তিনি প্রকৃত খ্যাতি অর্জন করেন। সেই থেকে তাঁর শেষ নাট্যাভিনয় শ্রীরঙ্গমে 'বিপ্রদাস' ও 'তাইতো' এবং শেষ চিত্রাভিনয় 'উদয়ের পথে' পর্যন্ত মঞ্চ, পর্দা, বেতার ও রেকর্ড জগতে সব সময়েই নিজের ব্যক্তিত্ব ও গুণের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে ছিলেন। গত মহাযুদ্ধে বিশ্বনাথ সৈন্যদলে যোগদান করেন এবং মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত গিয়েছিলেন দ্বিতীয়বার তিনি ভারতের বাইরে যান শিশিরকুমারের সঙ্গে আমেরিকাতে। লড়াই থেকে ফিরে আসার পর বিশ্বনাথ এক বীমা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন এবং পরে কিছুদিন খড়্গপুরে এক মাদক-দ্রব্যের দোকান খোলেন। মঞ্চ ও পর্দায় যোগদানের পর বীমা বা মাদক-দ্রব্যের ব্যবসা ত্যাগ ক'রলেও ভাগ্যচক্রে আবার ইদানীং এই দুটি ব্যবসায়ে হাত দিয়েছিলেন। বিশ্বনাথের মৃত্যুতে বাঙলার প্রমোদজগত সত্যিই এক গুণী শিল্পীকে অকালে হারালো।

বিবিধ

নীতিন বসু ফিল্মিস্তানে যে ছবিখানি তুলছেন তাতে অশোককুমার, নাসীম ও একটি নতুন অভিনেত্রীর অংশ গ্রহণ করার কথা হয়েছে।

*

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘের বার্ষিক বিচার প্রকাশিত না হ'তেই বম্বের ষ্ট্যাণ্ডার্ড পিকচার্স তাদের আগামী ছবি 'বৈরাম খাঁ'-র প্রচারকার্যে পরিচালক জাগীরদারকে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘ কর্তৃক ১৯৪৪ সালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও পরিচালক ব'লে ঘোষণা ক'রছে। সত্যিই অভিনব প্রচার!

*

শান্তারামের রাজকমল কলামন্দির যে তিনখানি ছবি তৈরী ক'রেছে তার সব ক'খানিই একসঙ্গে বম্বেতে প্রদর্শিত হচ্ছে—'শকুন্তলা' ৭৬ সপ্তাহে, 'মালি' ৪৩ এবং 'পর্বত পে আপনা ডেরা' ২৪ সপ্তাহে—আর কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত এ গৌরব অর্জন ক'রতে পারেনি।

*

'ডাঃ কোটনিশ'-এর ইংরাজি সংস্করণখানি পরিচালনা করাবার জন্যে শান্তারাম হলিউড থেকে আলেকজাণ্ডার কোর্ডাকে আনাচ্ছেন ব'লে বম্বের এক গুজরাটি পত্রিকা খবর রটিয়েছে।

খেলাধূলা

ক্রিকেট—

ভারতের ক্রিকেট স্ট্যাণ্ডার্ড আরও উন্নততর করিবার উপায় হিসাবে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের ভূতপূর্ব সহ সভাপতি মিঃ এ এস ডি'মেলো যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের খুব সমর্থন আছে। তিনি বলিয়াছেন, "ভারত হইতে প্রতি বৎসর একজন বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়কে ইংল্যাণ্ডে ক্রিকেট খেলা শিক্ষা সম্পর্কে যে সমস্ত স্কুল বা প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাতে প্রেরণ করা আবশ্যক। এই খেলোয়াড় অনায়াসে ভারতের ক্রিকেট মরশুম শেষ করিয়া ইংল্যাণ্ডে যাইতে পারে, কারণ ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট খেলার সময় ভারতের পরে। সুতরাং যদি তাঁহার ভারতীয় দলে ভারতে খেলিবার প্রয়োজন হয়, তিনি অনায়াসে পরবর্তী বৎসরে পুনরায় ভারতে ফিরিয়া আসিতে পারেন। এমন কি ইংল্যাণ্ডে "ফকনার্স স্কুল অফ ইণ্ডোর ক্রিকেট" বলিয়া যে প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাতে ক্রিকেট মরশুমের পরেও খেলার কৌশল শিক্ষা করিতে পারেন। এই জন্য মাত্র বৎসরে ছয় হাজার টাকার বেশী অর্থের প্রয়োজন হইবে না। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড এই টাকা প্রতি বৎসর বৃত্তি হিসাবে কোন না কোন খেলোয়াড়কে প্রদান করিতে পারেন।" ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড এই সম্পর্কে কি করিবেন জানি না, তবে মিঃ ডি'মেলোর প্রস্তাব কার্যকরী করা খুব শক্ত বলিয়া আমরা মনে করি না। বিশেষ করিয়া এই ক্রিকেট খেলার জন্য ভারতের অনেক রাজা মহারাজই প্রতি বৎসর বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদের একজন কেহ একটু দৃষ্টি এই দিকে দিলেই কণ্ট্রোল বোর্ডকে এই টাকা সংগ্রহ করিবার কথা চিন্তা করিতে হয় না। কুচবিহারের মহারাজা ক্রিকেট খেলায় একজন বিশেষ উৎসাহী, তিনি কি মিঃ ডি'মেলোর এই প্রস্তাব একেবারে উপেক্ষা করিবেন? সামান্য ত্যাগ স্বীকারে ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে, বাঙলার ক্রিকেট খেলোয়াড়গণও গর্ব করিয়া বলিতে পারিবেন, বাঙলা ক্রিকেট খেলায় নূতন এক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।" ইহা কি তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন না?

হকি—

বাঙলার হকি খেলার মরশুম সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে; ইহার পূর্বে শীতকালীন হকি খেলার যে ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহাতে বাঙলার হকি খেলোয়াড়গণ বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই। ফলে কোনরূপে ঐ অবস্থায় খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও কোন খেলায় উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শিত হয় নাই। অথচ শীঘ্রই আন্তঃপ্রাদেশিক হকি খেলা আরম্ভ হইবে। সেইজন্য আশঙ্কা হয়, বাঙলা প্রতিযোগিতায় ভাল ফল প্রদর্শন করিতে পারিবেন কি না? বাঙলার হকি পরিচালকগণ বাঙলার দল গঠন উপলক্ষে বিভিন্ন অনুশীলন খেলার ব্যবস্থা করিতেছেন সত্য কিন্তু বিশেষ ভাল ফল হইতেছে বলিয়া দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, এই সকল খেলোয়াড় বাছাই খেলায় বাঙালী খেলোয়াড়গণকে অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। যাঁহারা ট্রায়াল খেলায় স্থান পাইতেছেন, তাঁহাদেরও প্রাণহীন খেলার অবতারণা করিতে দেখা যাইতেছে। বাঙলা দেশে বাঙালী হকি খেলোয়াড়দের জন্য যতদিন না উপযুক্ত শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হইতেছে, ততদিন বাঙালী খেলোয়াড়গণ বাঙলার দলেও অতি অল্পসংখ্যায় স্থান পাইবেন। কেবল এই বৎসরই যে বাঙালী হকি খেলোয়াড়দের এইরূপ শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তাহা নহে, দীর্ঘকাল ধরিয়াই এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে বাঙালী হকি খেলোয়াড়গণ বৎসরের পর বৎসর উপেক্ষিত ও অপমানিত হইয়াও ইহার প্রতিকারের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠেন না। তাঁহারা এতই নির্জীব ও প্রাণহীন যে তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে অবাঙালী খেলোয়াড়গণকে লইয়া বিশিষ্ট হকি ক্লাব দল গঠন করা হইতেছে দেখিয়াও প্রতিবাদ করেন না। একবারও মনে জাগে না যে অবাঙালী খেলোয়াড়টি বা খেলোয়াড়রা তাঁহাদের সুযোগ সুবিধা ও উন্নতির পথে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছেন। বাঙালী হকি খেলোয়াড়দের কি কোনদিন জ্ঞান সঞ্চার হইবে না?



মারণ যজ্ঞ

এ্যাথলেটিকস

বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন পরিচালিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক চ্যাম্পিয়ানসিপ স্পোর্টস গত কয়েক বৎসর হইতে যেভাবে বৈদেশিক এ্যাথলিটদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতেছে এই বৎসরেও তাহারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। অন্যান্য বৎসর ভারতীয়, তথা বাঙালী এ্যাথলিটগণকে যে সংখ্যায় যোগদান করিতে দেখা যাইত এই বৎসর তাহার অপেক্ষাও কম দেখা গিয়াছে। এই বৎসরের অনুষ্ঠান দেখিতে দেখিতে অনেক সময়েই মনে হইয়াছে, "বাঙলাদেশে আছি কোথা?" অনুসন্ধান করিলে পরিচালকগণ বলেন, "এ্যাথলিট আছে কোথায় যে যোগদান করবে।" জিজ্ঞাসা করা হইল ইহার কারণ কি? উত্তর আসিল, "বৈদেশিক এ্যাথলিটদের সঙ্গে পারবে না বলেই যোগদান করে নি।" আরও আশ্চর্য হইতে হয়, যখন এই সকল পরিচলাকগণ উদ্ভাসিত মুখে গর্বের সঙ্গে বলেন, "এই বৎসরের অনুষ্ঠান অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। বহু নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" মাঠ ভর্তি হইল বিদেশীদের দ্বারা, রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হইল। বৈদেশিক এ্যাথলিটদের দ্বারা—ইহা যে কত দুঃখের বিষয় তাহা উপলব্ধি করিলেন না পরিচালকগণ। দুর্ভাগ্য বাঙলার যে এই ধরণের সমস্ত লোক এখনও পর্যন্ত বাঙলার মাঠে পরিচালনা করিবার অধিকার লাভ করে। বাঙলার এ্যাথলিটগণ কিছুদিন হইল ইউনিয়ান গঠন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। সেই ইউনিয়ান বা কি করিতেছে? তাঁহারা কি চিরকাল উপেক্ষা ও অনাদরের মধ্যে বাস করিতে চাহেন?

ভারোত্তোলন

বঙ্গীয় ভারোত্তোলন-সঙ্ঘের পরিচালকগণ ভারোত্তোলন-বিষয়ে বাঙালী ব্যায়ামবীরগণ যাহাতে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন, তাহার জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হয় নাই, তাহা এই বৎসরের প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার তালিকা হইতেই প্রমাণিত হয়। আরও আনন্দের বিষয় যে, তাঁহারা ভারোত্তোলনের প্রত্যেকটি বিষয়ের নিখুঁত বর্ণনা করিয়া একটি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। অনেক সময়েই দেখা গিয়াছে, ব্যায়ামবীর বিচারকের নির্দেশে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কিন্তু পুস্তকখানি পাঠ করিলে, ভার তুলিবার সময় কত দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয় এবং সামান্য ভুল যে কতখানি পরিশ্রমকে ব্যর্থ করে তাহা উপলব্ধি করিতে কোনরূপ কষ্ট হইবে না। এই পুস্তকে—যাঁহারা ভারোত্তোলন-বিষয় জানেন প্রতিযোগিতায় যোগদান দান করেন অথবা প্রতিযোগিতা পরিচালনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। কিন্তু প্রথম শিক্ষার্থীকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবে না। সেইজন্য মনে হয় বঙ্গীয় ভারোত্তোলন-সঙ্ঘ যদি একখানি পুস্তক প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকাশ করেন, তাহা হইলে খুবই ভাল হয়। বাঙলা এখনও পর্যন্ত ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারোত্তোলন-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা চিরস্থায়ী করিতে হইলে শিক্ষার্থীদের প্রথম হইতেই নিখুঁত বৈজ্ঞানিক কৌশলসমূহ শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমরা আশা করি আমাদের এই অনুরোধ ব্যর্থ হইবে না।

বিজ্ঞানের খুচরা খবর

ম্যালেরিয়ার ঔষধ সম্বন্ধে গবেষণা

এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকা সংবাদ দিয়াছেন, ইলিনয়েজ রাষ্ট্রীয় দণ্ড ও সংশোধনাগারের (Illinois State Penitentiary) ৪০০ কয়েদী মানুষের উপর অপ্রযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করিয়া রোগ, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করিতে স্বেচ্ছায় সম্মত হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার জ্বরের একটি ফলপ্রদ ঔষধ বাহির করিবার জন্য যে অনুসন্ধান কার্য চলিতেছে, তাহাতে সাহায্য করিবার জন্যই তাহারা ঐ ঔষধগুলি ব্যবহার করিতে রাজি হইয়াছে। ওয়ার্ডেন জোসেফ র‍্যাজেনের নিকট হইতে এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

এই সংবাদে প্রকাশ, ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে গবেষণার সংযুক্ত বোর্ডের (Board for coordination of Malarial studies) নির্দেশ অনুসারে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেষজ-বিভাগ এই গবেষণা করিতেছে এবং সংযুক্ত বোর্ডে সৈন্য ও নৌবিভাগ, জনস্বাস্থ্য-বিভাগ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নতি কার্যালয় (office of scientifi research and Dvmt.) এবং জাতীয় গবেষণা পরিষদের প্রতিনিধিরাও আছেন।

এসোসিয়েটেড প্রেস বলিয়াছেন—"ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার জন্য কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে পারে, এমন একটি ঔষধ সম্বন্ধে অনুসন্ধান পার্ল হারবারের বিপর্যয়ের পর হইতেই করা হইতেছে। মিশ্র রাসায়নিক ঔষধ অ্যাটাব্রিন স্বভাবজাত কুইনাইন অপেক্ষাও ম্যালেরিয়া দমনে অধিকতর ফলপ্রদ বলিয়া প্রমাণিত হয়। কিন্তু ইহাদের কোনটি রোগ স্থায়ীভাবে আরোগ্য করিতে পারে না।

"এই নূতন ঔষধগুলি প্রয়োগ করিলে কি বিষক্রিয়া হয়, তাহা দেখিবার জন্য যেসব পরীক্ষা করা হইয়াছে, কয়েদীরা তাহা সহ্য করিয়াছে। এখন তাহাদের দেহে ম্যালেরিয়ার বীজ সংক্রামণে সম্মত হইতে তাহাদিগকে বলা হইবে। বাটান করেজিডরে আমাদের চরম দুর্দিনে যে ম্যালেরিয়া জ্বর আমাদের সৈন্যদের মধ্যে ভয়ঙ্কর অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছিল, ইহাদের শরীরে সেই ম্যালেরিয়া জ্বরের বীজাণু সংক্রামিত করা হইবে।

"নিউগিনি হইতে ম্যালেরিয়ার বিজাণুদুষ্ট যেসব জীবন্ত মশা আনা হইয়াছে, কয়েদীদের দেহে ম্যালেরিয়ার বীজ সংক্রামণে সেই সব মশা ব্যবহার করা হইবে।

"র‍্যাজেন বলেন যে, যেসব ঔষধ লইয়া পরীক্ষা কার্য চালানো হইতেছে, তাহাদের মধ্যে যদি ম্যালেরিয়া জ্বরনাশী এমন শক্তি [illegible] তাহা হইলে এই সব কয়েদীর অনেককেই পুনঃ পুনঃ ম্যালেরিয়ার আক্রমণে ভুগিতে হইবে।

"দণ্ড ও সংশোধনাগারের দালানের একটা সমগ্র তলা এই কাজের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত কয়েদীরা সেখানে গ্রীবামণ্ডলের অত্যন্ত অসহনীয় রোগ ভোগ করিবে। বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত সামরিক চিকিৎসকগণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞগণ ঔষধের কি ফল হয়, তাহা খুব সাবধানে পর্যবেক্ষণ করিবেন এবং রাসায়নিক পরীক্ষা ও রক্ত পরীক্ষা করিবেন। রোগাক্রান্ত কয়েদীদের তত্ত্বাবধানের জন্য বিশেষ চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারী নিযুক্ত করা হইবে।

—মার্কিনবার্তা।

পুস্তক পরিচয়

কাজলী (উপন্যাস)—শ্রীঅনিলচন্দ্র রায় প্রণীত। প্রকাশক—সুধীরচন্দ্র সরকার; এম সি সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

কাজলী পড়লুম। সত্যের মত সুন্দর লাগল। যেন দেখা জিনিসকে রূপ দিয়েছে। সময়ের সংগে পরিচয় ও সুপ্রস্ফুটিত। গল্প বলে একবারও মনে হল না। লেখা সার্থক হয়েছে। সহজ, সরল এবং সুলিখিত।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

লিখি ইতিহাস (কবিতা-সংগ্রহ)—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। এরিয়ান প্রেস এণ্ড পাবলিসিটি লিঃ, ১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত; মূল্য দুই টাকা।

কতকগুলি আধুনিক কবিতা আলোচ্য গ্রন্থখানিতে স্থান পাইয়াছে। কবিতাগুলির আলম্বন, ছন্দ, ভাষা—সমস্তই আধুনিক। আধুনিক যুগের নানা সমস্যা, অনিশ্চয়তা, দুর্নিবার লোভ আর স্বার্থের সংঘাত, মূঢ়তা ও নির্লজ্জ শাঠ্যের দ্বন্দ্ব এই গ্রন্থখানিতে কাব্যরূপ গ্রহণ করিয়াছে। এদিক দিয়া কাব্য গ্রন্থখানির নাম—'লিখি ইতিহাস' সার্থক হইয়াছে। মাঝে মাঝে আড়ষ্টতা পরিলক্ষিত হইলেও মোটের উপর কবিতাগুলি সুখপাঠ্য, ভাষা বলিষ্ঠ, ছন্দ সাবলীল। আধুনিক কবিতা রচনা করিয়া যাঁহারা খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, এই কাব্যগ্রন্থখানির কবিও তাঁহাদের মধ্যে যথাযোগ্য স্থান লাভ করিবেন। দুর্মূল্যের বাজারেও গ্রন্থখানির কাগজ, বাঁধাই, ছাপা চমৎকার।

সর্বংসহা (উপন্যাস)—শ্রীসুমনাথ ঘোষ প্রণীত, বুক্ ইণ্ডাস্ট্রীজ্, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত; মূল্য তিন টাকা।

শ্রীযুক্ত সুমথনাথ ঘোষ সাহিত্যক্ষেত্রে ইতিপূর্বেই পরিচয় লাভ করিয়াছেন।

যুদ্ধের সূচনা হইতে এ পর্যন্ত এদেশে যত কিছু সমস্যা ও বিপর্যয় দেখা দিয়াছে, লেখক সুকৌশলে এবং নিপুণতার সংগে উপন্যাস খানির পরিমিত পরিসরে তাহা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, অথচ মূল কাহিনী কোথাও অনাবশ্যকরূপে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে নাই।

এক একটি সমস্যাকে রূপ দেওয়ার জন্য গ্রন্থকার বাছিয়া লইয়াছেন, চরিত্রের এক একটি বিশিষ্ট 'টাইপ'। গ্রামত্যাগী, পল্লী-জীবন সম্বন্ধে হীন ধারণা সম্পন্ন, নাগরিক সভ্যতায় ও ভোগবিলাসে পটু, স্বার্থপর রাজেশ্বর, তাঁহার ভাই পল্লীবাসী, শিক্ষিত অথচ সহজ সরল জীবনযাপনকারী সর্বেশ্বর, রাজেশ্বরের কন্যা শিক্ষিতা, গর্বিতা, অতিরিক্ত স্বাধীনতাপ্রাপ্তা চেরী, সরল, কর্তব্যপরায়ণ, স্বল্পশিক্ষিত, পরোপকারী রামরূপ পাণ্ডিত, বেকার জীবনে বিতৃষ্ণ, পরিশেষে মিলিটারী চাকুরিতে যোগদানকারী কানাই, কমরেড সদানন্দ, বিমল সবিতা, দৈনিক কাগজের প্রতাপশালী সহকারী সম্পাদক উমেশ ভট্টাচার্য—প্রভৃতি চরিত্রগুলির সাক্ষাৎ পাই আমরা উপন্যাসখানিতে। গ্রন্থখানিতে এদের আবির্ভাব আকস্মিক নয়,—এদের সকলেরই যেন প্রয়োজন ছিল কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণে। ইহারা সকলই আমাদের পরিচিত। আমাদেরই চারিপাশে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আমরা তাহাদের লক্ষ্য করিতেছি। এই কারণেই গ্রন্থখানির কোথাও কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই। বোমার আতঙ্ক, সাইরেন, বন্যা ও দুর্ভিক্ষের মর্মন্তুদ দৃশ্য, কণ্ট্রোলের দোকানের নিশ্ছদ্র সারিবন্ধ নিরুপায় নরনারীর জনতা, চোরাবাজার, মিলিটারী অফিসারের সঙ্গিনীরূপিনী, আধুনিক শিক্ষিতা, সর্বসংস্কারমুক্তা চেরীর মত তরুণী—একে একে সবই ফুটিয়া উঠিয়াছে গ্রন্থখানির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। ছোটখাটো সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রু, সফলতা-বিফলতা নয়, একটা বিস্তৃত পটভূমিতে অঙ্কিত হইয়াছে চরিত্র ও সমস্যাগুলি।

আধুনিক প্রগতিবাদের শেষ কোথায়, তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন গ্রন্থকার। অঙ্গুলীসংকেতে শহর হইতে শান্ত গ্রামের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন। লেখকের ভাষা, বর্ণনাভঙ্গী প্রশংসনীয়। বর্তমান কাগজের দুর্ভিক্ষের দিনেও কাগজ, ছাপা, প্রচ্ছদ উচ্চশ্রেণীর।

এমন একখানি সুলিখিত, পরিপাটীরূপে মুদ্রিত গ্রন্থে মাঝে মাঝে ছাপা ও বানানের ভুল পীড়াদায়ক। কর্মদাতার পাশে মোটরে ভগ্নীকে চড়াইয়া পূর্ববঙ্গীয় যুবকের চাকুরি বাগানোর কুৎসিত ইঙ্গিতটুকু এড়াইয়া গেলেই গ্রন্থকারের পক্ষে শোভন হইত।

মডার্ণ শকুন্তলা—শ্রীযামিনীমোহন কর প্রণীত। রসচক্র সাহিত্য সংসদ, ২১-এ, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চার আনা।

ইহা একখানি প্রহসন-নাটিকা। কালিদাসের শকুন্তলা উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এই প্রহসনখানি রচিত হইয়াছে। অতি আধুনিক সমাজজীবনে পাশ্চাত্যের অনুকরণের প্রতি শ্লেষাত্মক এই প্রহসন। পরিহাস রসের স্বচ্ছতার মধ্যে যে সৌষ্ঠব থাকা প্রয়োজন, তাহার অভাবে রস কষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

রূপ হইতে রূপে—(উপন্যাস) শ্রীশিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত। রসচক্র সাহিত্য সংসদ, ২১-এ, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯২।

বর্তমান যুগের সামাজিক, জাতীয় রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিক সমস্যা এবং সাম্প্রদায়িক ও ধর্মগত দ্বন্দ্বকে ভিত্তি করিয়া নরনারীর জীবনে যাহা চিরন্তন সত্য, আলোচ্য উপন্যাসখানির বিভিন্ন চরিত্রের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া তাহাই ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। ঢাকার হিন্দু-মুসলমানের একটি দাঙ্গাকে এই উপন্যাসের পটভূমিকাস্বরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। সর্বপ্রকার আনুষ্ঠানিক ধর্মমতের উপর নরনারীর চিরন্তন হৃদয়ধর্মের বিজয় অবশ্যম্ভাবী, লেখকের মতে এই সকল তথ্যও উপন্যাসের প্রতিপাদ্য নয়, ইহা আখ্যানভাগের উপাদান মাত্র। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই যে, উপাদান নির্বাচনে গ্রন্থকার সাহসের পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহার সাধনা অনেকাংশে যে রসোত্তীর্ণ হইয়াছে, একথাও বলা যায়।

ভাষণ—কবিতার বই। শ্রীসুবোধরঞ্জন রায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীপ্রভাসরঞ্জন রায়। **'প্রাণ্ডিক'—কৈলিসহর, চরগ্রাম। মূল্য দেড়** টাকা।

কবিতাগুলি আমাদের ভালো লাগিয়াছে। এগুলিতে বেশ একটু নূতনত্ব এবং **সঞ্জীবতার পরিচয় পাওয়া যায়। কবি মনের গহনে গোপন** নিত্য-নবীনের সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহার সুরে সুর মিলাইয়া আমরাও প্রার্থনা করি—
"এ যুগের **নীলকণ্ঠ দুর্গম পথের যাত্রিদল হে দুশ্চর তপশ্চারী—তোমাদের যজ্ঞ-হোমানল** ভস্মীভূত করে দিক মানুষের পুঞ্জীভূত পাপ, কলঙ্কিত শতাব্দীর ধর্মার্থনাশা অভিশাপ। কালে কালে যুগে যুগে যে মহামানব নানা বেশে দেখা দেয়, তারে করো উদ্বোধিত—নির্জীব দেশে। তোমাদের অনির্বাণ ঊর্ধ্ব শিখদীপশিখা হতে, জ্বালায় অন্তরদীপ চলিলাম দূরযাত্রা-পথে।"

তোমাদের বন্ধু লেনিন—অনুবাদক গিরীন চক্রবর্তী। পূরবী পাবলিশার্স ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। দাম দুই টাকা। ভাল বাঁধাই, সুন্দর ছাপা।

গ্রন্থখানি এ কোনোপোভের স্টোরিজ এবাউট লেনিন নামক পুস্তকের অনুবাদ। এ অনুবাদ ছোট ছেলেদের পক্ষে বেশ উপযোগী হইয়াছে। লেখা বেশ সহজ, সরল এবং চিত্তাকর্ষক কয়েকখানি সুন্দর চিত্রে পুস্তকখানি ছোটদের পক্ষে আরও লোভনীয় করা হইয়াছে।

শ্রীকান্ত—প্রথম পর্বের ভূমিকা। আলোচনী গ্রন্থ। শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায় এম এ, পি আর এস। পাইওনিয়ার বুক কোং ১৮নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

গ্রন্থকার বিজ্ঞপ্তিতে বলিয়াছেন—"আঙ্গিক আদর্শের প্রতি শিল্পিমনের সহজাত আকর্ষণ ও নিষ্ঠা 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসখানিতে বিশেষ করিয়া—ইহার প্রথম পর্বে বেশ অনুধাবন করা যায়। ভ্রমণকাহিনীর ঘরোয়া পরিকল্পনা লইয়া যাহার আরম্ভ তাহা যেন স্মৃতিনিষ্ঠ আঙ্গিক আদর্শের স্বতঃ প্রেরণায় উপন্যাসের প্রকাশ ধর্মের স্বকীয়তা ও সৌন্দর্যে নিঃসংশয় হইয়া উঠিয়াছে।" স্মৃতিকে রূপে রসে দীপ্ত করিয়া তোলাতেই মননের সার্থকতা। শরৎচন্দ্রের লেখনী স্মৃতিকে উদ্দীপ্ত করিয়া মানব মনের সে গোপন বাণী কেমনভাবে ব্যক্ত করিয়াছে, গ্রন্থকার তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনায় রসধর্মের মর্মানুভূতিমূলক সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। 'শ্রীকান্তে'র প্রথম পর্বের রস আস্বাদনে এই আলোচনা বিশেষভাবে সাহায্য করিবে।

উত্তর শঙ্খ—কবিতার বই। পুষ্পিতানাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী, ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

পুষ্পিতানাথ নবীন কবি। আমরা তাঁহার লেখায় কবি-মনের পরিচয় পাইয়াছি। তিনি কতকগুলি সাজানো গোছানো কথাই বলেন নাই, ব্যথার দোলে তিনি বলিয়াছেন, এজন্য তাঁহার ব্যঞ্জনাভঙ্গিতে অন্তরস্পর্শী অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায় এবং এজন্যই তাঁহার কবিতাগুলি অভিব্যক্তির নূতনত্বে ভাষার লালিত্যে এবং অনুপম উপমার প্রভাবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।





সময়ের প্রসঙ্গ

ত্রি-শক্তির গুপ্ত বৈঠকের স্থান, আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত এত দিন পরে জানা গেল। ক্রিমিয়ার অন্তর্গত ইয়াল্টাতে এই বৈঠক বসেছিল—জার দ্বিতীয় নিকোলাসের লিভাডিয়ার গ্রীষ্মাবাসের প্রাসাদে। ৮ দিন ধরে এই বৈঠকের অধিবেশন হয়েছে।

এই বৈঠক সম্বন্ধে ত্রি-রাষ্ট্রনেতার স্বাক্ষরিত যে বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, এই ত্রয়ী সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয়ই ছিল জার্মানি। তাছাড়া পোলাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, শত্রু কবলমুক্ত ইউরোপ, মুক্ত বন্দীদের সম্বন্ধেও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

জার্মানি সম্বন্ধে তাঁরা যে সিদ্ধান্তে এসেছেন, তার মোটামুটি মর্ম হল এই যে, জার্মানি পরাজিত হলে জার্মানিকে তিন ভাগে ভাগ করে ত্রি-রাষ্ট্রের প্রত্যেকে এক এক ভাগ দখল করবে। ফ্রান্স যদি রাজী হয়, তাহলে জার্মানিকে চার ভাগে বিভক্ত করে ফ্রান্সকেও এক ভাগ দেওয়া হবে। এই শক্তিবর্গের প্রধান সেনাপতিদের নিয়ে বার্লিনে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠিত হবে। সেই কমিশনই যুক্তভাবে শাসন ও নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দেবেন। তা ছাড়া জার্মানির সমগ্র সেনা বাহিনীকে নিরস্ত্র ও ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হবে; জার্মান সেনাপতি-মণ্ডলীকে ভেঙ্গে দেওয়া হবে; জার্মান সমরসজ্জা অপসারিত করা হবে বা ধ্বংস করা হবে; জার্মানির যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান সমরোপকরণ উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে পারে, তার উচ্ছেদ করা হবে বা নিয়ন্ত্রণ করা হবে; যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে তাড়াতাড়ি সাজা দেওয়া হবে; নাৎসী দল, নাৎসী আইন, নাৎসী প্রতিষ্ঠান নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হবে; সমস্ত সরকারী ও জনপ্রতিষ্ঠান থেকে এবং জার্মাণ জনসাধারণের সাংস্কৃতিক ও অর্থনীতিক জীবন থেকে নাৎসী ও সমরবাদের প্রভাব মুছে ফেলা হবে এবং এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আরও যেসব ব্যবস্থা করা প্রয়োজন তা অবলম্বন করা হবে। তা ছাড়া জার্মানি মিত্রশক্তিবর্গের যে ক্ষতি করেছে, তা নির্ণয় করবার জন্য একটা কমিশন নিযুক্ত করা হবে। সেই কমিশনের উপদিষ্ট উপায়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ জার্মানিব কাছ থেকে আদায় করা হবে। অবশ্য এর পরে তাঁরা আশা দিয়েছেন, জার্মান জনসাধারণকে ধ্বংস করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে নাৎসীবাদ ও সমরবাদের যখন সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ হবে, তখনই কেবল জার্মানরা ভদ্র জীবনযাপনের উপযোগী হবে এবং পৃথিবী রাষ্ট্রসমূহের সমাজে পাংক্তেয় হবে।

পোল্যাণ্ড সম্বন্ধে এই বৈঠকে স্থির হয়েছে যে, পোলাণ্ডে বর্তমানে যে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট রয়েছে বিস্তৃততর গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে তাকে পুনর্গঠন করা হবে এবং পোলাণ্ডের মধ্যে ও বাইরে যে সব গণতান্ত্রিক নেতা আছেন, তাঁদের এই গভর্নমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে। পরে যথাসম্ভব শীঘ্র ব্যালটপ্রথায় সার্বজনীন ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন হয়ে গভর্নমেণ্ট গঠিত করতে হবে। পোল্যাণ্ডের পূর্ব সীমান্ত কার্জন লাইন পর্যন্ত থাকবে, দু-একস্থানে সামান্য পরিবর্তন করা হবে। উত্তরে ও পশ্চিমে তাহার সীমা শান্তি বৈঠকে নির্ধারিত হবে।

মার্শাল টিটো ও ডক্টর সুবাসিকের চুক্তি-নামার ভিত্তিতে নূতন যুগোশ্লাভ গভর্নমেণ্ট গঠন করার জন্য ত্রি-রাষ্ট্রনেতা সুপারিশ করেছেন।

এছাড়া বল্কানের অন্যান্য সমস্যা, যুদ্ধ-বন্দীদের সমস্যা এবং আরও ছোটখাট দু'একটা সমস্যা বৈঠকে আলোচিত হয়েছে। জার্মানীর সশস্ত্র প্রতিরোধের অবসান ঘটানোর পরে তাদের বিনাসর্তে আত্ম-সমর্পণের যেসব দাবী তার ওপর চাপান হবে, সে সম্বন্ধেও মিঃ রুজভেল্ট, মার্শাল স্টালিন ও মিঃ চার্চিল একমত হয়েছেন এবং যেভাবে শত্রুকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা হবে, সেই সামরিক পরিকল্পনা সম্বন্ধেও তাঁদের মতৈক্য হয়েছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন। তবে উক্ত সর্ত বা পরিকল্পনার স্বরূপ বর্তমানে কিছুই জানানো হয়নি। শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত এই বৈঠকে হয়েছে। সে সম্বন্ধে কর্মপন্থা স্থির করার জন্য আগামী ২৫শে এপ্রিল সান্ ফ্রান্সিস্কোতে সম্মিলিত জাতি-সমূহের সম্মেলন হবে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

এই সম্মেলনে প্রাচ্যের যুদ্ধ সম্বন্ধে বা জাপান সম্বন্ধে কিছুই আলোচিত হয়নি বলে মনে হচ্ছে। অন্তত ত্রি-রাষ্ট্রনেতার যুক্ত-বিবৃতিতে তার কোন উল্লেখ নেই।

আট্লাণ্টিক সনদ স্বাক্ষরিত হয়নি বলে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করা সত্ত্বেও এই তিন নেতা মিলে পুনঃ পুনঃ আট্লাণ্টিক সনদের দোহাই দিয়েছেন।

ত্রি-রাষ্ট্রনেতার জার্মানী সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত আমাদের বছর পঁচিশেক পূর্বেকার আর এক সিদ্ধান্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তা' হল ভার্সাইয়ের সিদ্ধান্ত। সে ব্যাপারেও ত্রি-শক্তিরই খেলা আমরা দেখেছি। সে ত্রি-শক্তির দুটি শক্তি আজকার ব্যাপারেরও নায়ক। তারা হল ব্রিটেন ও আমেরিকা। রুশিয়া তখন অপাংক্তেয়। রুশিয়ার স্থানে তখন ছিল ফ্রান্স। আজকার আমেরিকার মত সেদিনের আমেরিকা সিদ্ধান্ত-নিয়ন্ত্রণে কর্তৃত্ব করতে পারেনি। সেদিনের কর্তৃত্ব ছিল ব্রিটেন ও ফ্রান্সের হাতে। তখনও জার্মানীকে এমনি করে নানা দিক দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধার এবং হীনবল [illegible] আর তার খবরদারি করবার জন্য এমনি এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানও গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিভাবে জার্মানী সে নাগপাশ ছিন্ন করে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছিল, সে ইতিহাস আজ সকলেরই বিদিত। তবে জার্মানীর সে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতি পর্যায়েই দেখা গেছে যে, যাঁরা তার হাতে বন্ধনরজ্জু পরিয়েছিলেন, তাঁদেরই কেউ না কেউ সে বন্ধন খুলে দেওয়ার সময় এগিয়ে এসেছেন। আর কিছুদিন আগে পর্যন্তও পৃথিবীর বড় বড় রাজনীতি-বিদ্‌দের মুখেই শুনে এসেছি যে, ভার্সাইয়ে যে বীজ বপন করা হয়েছিল, তারই পরি-বর্ধিত রূপ বর্তমান মহাযুদ্ধ।

ত্রি-রাষ্ট্র নেতার বর্তমান বিবৃতির মধ্যেও আমরা সেই ভার্সাইয়ের পুনরাবৃত্তিরই আভাস পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি—মার্শাল স্টালিন ১৯৪২ সালে যে বলেছিলেন—জার্মানীকে ধ্বংস করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কারণ জার্মানীকে ধ্বংস করা অসম্ভব, যেমন অসম্ভব রাশিয়াকে ধ্বংস করা—প্রতিহিংসার উন্মাদনায় সেকথা আজ তিনি ভুলে গেছেন। ব্রিটেন ও আমেরিকাও জার্মানীকে দাবিয়ে রাখবার পুনঃ পুনঃ বিফলতার ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করেননি। সাময়িক উত্তেজনা এবং রণোন্মত্ততাই ইতিহাসের ইঙ্গিতের উপর জয়ী হয়েছে; ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ও বিশ্ব-কল্যাণের শুভবুদ্ধি সাময়িক ভ্যান্সিটার্টী আস্ফালনের নীচে চাপা পড়ে গেছে। কিছুদিন পূর্বেও মার্শাল স্টালিন সমগ্র জার্মান জাতিকে আক্রমণকারী জাতি হিসাবে চিহ্নিত করে তার শাস্তিবিধানের কথা বলেছিলেন। রণবিধ্বস্ত যুদ্ধোত্তর রুশিয়ার পুনর্গঠনে মিত্রশক্তির সাহায্য প্রতিশ্রুতি কি তাকে মত পরিবর্তনের মূল্যে ক্রয় করতে হয়েছে? বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাণ্ডারে যার দান অতুলনীয়, কতিপয়ের অপরাধে সমগ্র-ভাবে এমন একটা বৃহৎ জাতিকে লাঞ্ছিত করা ও তাকে রুদ্ধশ্বাস করে রাখার প্রচেষ্টা সফল হবে কি না, সেকথা আপাতত না তুলে, মানব-কল্যাণের দিক দিয়ে তা সমীচীন হবে কি না, সেই প্রশ্নই আজ আমরা তুল্‌বো। আজ যে ক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে, তার মধ্যেই যদি ভবিষ্যৎ মহাযুদ্ধের বীজ অঙ্কুরিত ও পরিবর্ধিত হবার সুযোগ থাকে, তাহলে মানুষ গত ছয় বৎসর ধরে যে ত্যাগ, জীবনদান, দুঃখকষ্ট ভোগ করে এসেছে তা নিতান্তই ব্যর্থ হয়েছে, একথা বলতেই হবে। গত মহাযুদ্ধের অবসানে তদানীন্তন ফরাসী প্রধানমন্ত্রী ক্লেমাঁসো ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জকে বলেছিলেন,—

বিজয়ী তার জয়ের মধ্যেই বন্দী হয়ে পড়ে; এই হ'ল বিজিত জাতির প্রতিশোধ গ্রহণ।

মিত্রশক্তিবর্গ তাঁদের বিজয়ের মুখে এই কথাগুলো স্মরণ করলে লাভবান্ হবেন।

আই. এ. এফ.-এর জন্য
ADMINISTRATIVE ASSTSTANT এর
জরুরী প্রয়োজন

নন্-কমিশনড্ অফিসারদের জন্য আই. এ. এফ.-এ একটা নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। এই বিভাগের কাজে যে চমৎকার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় তার সাহায্যে বেসামরিক জীবনে ভালো প্রতিষ্ঠা সহজেই পাওয়া যাবে। ভারতীয় বৈমানিকদের সুখসুবিধের প্রতি লক্ষ্য রাখতে এবং তাদের পরিচালিত করতে কমাণ্ডিং অফিসারদের সাহায্য করাই administrative assistantদের কাজ। যুদ্ধের পর যাঁরা আই. এ. এফ.-এ. থাকবেন না তাঁদের সরকারী কাজ পাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকবে, কারণ যুদ্ধের কাজ যাঁরা করছেন তাঁদের জন্য গভর্নমেণ্ট অনেক চাকরি হাতে রেখেছেন।

যোগ্যতা

শিক্ষা : যে কোনো ভারতীয় য়ুনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট হওয়া চাই। **বয়স :** ২০ থেকে ৩৮ বছর। **স্বাস্থ্য :** রোগমুক্ত ও পরিশ্রমের উপযুক্ত হওয়া চাই। **পদমর্যাদা :** প্রার্থীদের ২য় শ্রেণীর এয়ারক্রাফ্ট্‌স্‌ম্যান হিসেবে ভর্তি করা হবে এবং শিক্ষাকালে অ্যাকটিং সার্জেণ্টের পদে উন্নীত করা হবে, মাইনেও সার্জেণ্টদের সমান দেওয়া হবে। **বেতনের হার :** অ্যাকটিং সার্জেণ্ট—মাসিক ১১৫৲ টাকা। ফ্লাইট সার্জেণ্ট—মাসিক ১৩০৲ টাকা। ওয়ারেণ্ট অফিসার—মাসিক ২০০৲ টাকা। **অন্যান্য সুবিধা :** সকল administrative assistantsরাই বিনাখরচে খাদ্য, পরিচ্ছদ, বাসস্থান ও চিকিৎসার সুবিধে পায় : এ ছাড়া-ও ভারতীয় বিমান বাহিনীর অন্য অফিসারদের সমান নানা রকমের এলাওয়েন্স ও সুবিধে পায়।

আবেদনের নিয়ম

আপনার কাছাকাছি রিক্রুটিং অফিসে খোঁজ করুন কিংবা লিখুন। নিচে একটা তালিকা দেওয়া হল :—

১। কলিকাতা (হেডকোয়ার্টার্স) ১নং মে রোড, হেস্টিংস সাউথ।
২। ঢাকা—৪২নং নবাব কাটরা রোড, নিমতলি।
৩। সিলেট—আম্বারখানা।
৪। তেজপুর, আসাম—কালিবাড়ী।
৫। কটক—গিরিশ ধিয়ান; কাজিবাজার।



(১৫)

মাতাল ভজুর লাঠিতে ও চীৎকারে যে গর্বের আস্ফালন ছিল, কেশব ভট-চাযের গম্ভীর স্বরে তার চেয়ে কিছু কম আস্ফালন ছিল না। মান্দার গাঁয়ের সকল মাঙ্গলিকের পুরোহিত, সকল শিক্ষাদীক্ষার মাস্টার মশাই, সকল উদ্যম আর ষড়যন্ত্রের মোড়ল কেশব ভটচায যেন পাঁচ বছর পরে ঠিক প্রয়োজন বুঝে অকুস্থলে দেখা দিয়েছে। একটি ধমক দিয়ে ভজুকে সরিয়ে দিতে পারে, ভজুর সব মাতলামি শান্ত হয়ে যেতে পারে, এমন ক্ষমতা যদি কারও থাকে, তা কেশব ভট্চাযেরই আছে। মাতাল ভজুকে সবাই ভয় করে, তার কারণ অমাতাল শান্ত সুসাধ্য দিনমজুর ভজুকে সবাই অনায়াসে তুচ্ছ করে। সারাদিন ধরে দুয়ারে দুয়ারে কাজের ধর্না দিয়ে ভজু যে অবজ্ঞা, কৃপণ কৃপা, ধমক ও চোখ রাঙানী সহ্য করে বেড়ায়, এক আধ বোতল মদের সাহায্যে তারই যেন সে প্রতিশোধ নেয়। মান্দার গাঁয়ের শুদ্ধ বুদ্ধ ভদ্রলোকেরাও যেন মাতাল ভজুর সকল গালিগালাজ হাসি-মুখে সহ্য করে, নিজেদেরই হীনতার প্রায়শ্চিত্ত করে। এই ভয় দিয়েই সবাই ভজুর ঋণ শোধ করে। ভজুর মজুরীর দু'পয়সা যারা ঠকাতে পারে, তারা ভজুর থেকে দুটো কুকথার আঘাত চুপ করেই সহ্য করবে। আজও সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে ভজুর হুংকার ও ধিক্কার সহ্য করছিল।

কিন্তু এইবার কেশব ভট্চায সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, আর কেউ নয়। তিন তিনটে ফৌজদারীর আসামী কেশব ভট্চায। এমন দিন ছিল, এই ধরণের ভজুর মত এক একটা গুণ্ডামীকে কান ধরে গাঁয়ের সীমানা পার করে দিয়েছে কেশব ভটচায। সে কোন দিন কারও ধার ধারে না, ভজু কোন্ ছার।

জনতা সাগ্রহে তাকিয়াছিল, ভজু এইবার কত হুংকার দিতে পারে দেখা যাবে।

ভজু সত্যিই লাঠির আস্ফালন থামিয়ে তর্জন গর্জন বন্ধ করে, ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি তুলে কিছুক্ষণের জন্য কেশব ভট্চাযের মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইল। কেশব ভট্চাযের চোখের দৃষ্টিটা তীব্র হয়ে জ্বলছিল। একটি আহত ভলান্টিয়ারের আর্তনাদ তখনো আস্তে আস্তে জনতার কলরব ভেদ করে শোনা যাচ্ছিল। কেশবের মনেও বিস্ময়ের অবধি ছিল না। কোথা থেকে ভজু পেয়েছে এই দুঃসাহস? শত লোকের ভীড়ের বিরক্তি আর ঘৃণাকে তুচ্ছ করে শত লোকের এক পবিত্র সংগ্রামের আয়োজনকে অবজ্ঞা করে, বীভৎস অভিশাপের দূতের মত দেখা দিয়েছে ভজু। আরও আশ্চর্য, ভজুকে বাধা দেবার মত কোন শক্তি নেই কারও। যেন কারও অধিকার নেই। সবাই দাঁড়িয়ে দেখছে।

কেশব ভট্চায কঠোরভাবে ডাক দিল—এদিকে উঠে এস ভজু, বড় বেশী বাড়া-বাড়ি হচ্ছে, সাবধান।

ভজু উত্তর দিল—চুপ রও ঠাকুর, সরে পড়।

ভজুর ঘোলাটে চোখে যেন হঠাৎ রক্ত ফুটে উঠলো। ভজুর ভাঙা গলার স্বরে একটা বিদ্রূপ আর উপেক্ষার স্পর্শ ছিল।

জনতা একটু আশ্চর্য হয়েই বুঝতে পারলো, আজকের ঘটনাটা যেন নিয়মের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। কেশব ভট্চায আর সেই কেশব নেই, ভজুও আর সেই ভজু নয়। কেশব ভট্চাযের এই শাণিত সাবধান বাণী উপেক্ষা করে পাল্টা হুংকার দিতে পারে, ভজু যেন সব পার্থিব নিয়মের বাইরে চলে গেছে।

ভজুর মাতলামির উচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়নি। বরং স্তব্ধ হয়ে গেল কেশব ভট্চায। এই আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিল না কেশব। চিরদিনের যে আশ্বাসের কঠিন মাটীর চরের ওপর সে দাঁড়িয়েছিল, সেই ঠাঁই যেন চোরাবালির মত শিথিল হয়ে জলের নীচে তলিয়ে যাচ্ছে। তার কঠোর গলার স্বরে আজ আর কেউ চমকে ওঠে না, তার হাঁকে আজ আর কেউ সাড়া দেয় না। তার নেতৃত্বের সৌধ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, মান্দার গাঁয়ের মাটীতে তার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। পাঁচ বছরের অন্তর্ধানের সুযোগে নানা নতুন ঝড় এসে সেই ধূলোটুকু পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

ভজু আবার নিজের বীভৎস আত্মার প্রেরণায় যেন উৎসাহে প্রমত্ত হয়ে উঠলো। লাঠি ঘুরিয়ে অঙ্গভঙ্গী করে, সমবেত জনতাকে যেন শ্লেষবিদ্ধ করে তুললো।—আমি শালা তো মরতেই আছি, কিন্তু তুদিগে মেরে তবে মরবো। তোর স্বদেশীর মাথায় লাঠি!

গাঁজার দোকানের রেলিংয়ের আড়ালে বসে ভেণ্ডার রামচরণ উচ্চস্বরে হেসে উঠলো।

সারা জনতার গায়ে যেন একটু একটু করে অপমানের কাঁটা বিঁধছে। যারা নিস্পৃহভাবে দৃশ্যটা উপভোগ করছিল, তাদের মধ্যে একটা অস্বস্তি জেগে উঠছিল। মাথা হেঁট করে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল মাধুরী। জনতা যেন সমবেদনা দিয়ে মাধুরীর অপমান ও লজ্জা বুঝতে পারছিল। স্বদেশী করতে এসে বেচারী হতভম্ব হয়ে গেছে।

কেশব ভট্চাযের মুখের দিকে তাকিয়ে তার একটু একটু করুণা হচ্ছিল। বেচারা ভজুর মত ছোটলোকের একটা ধমকে কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

উদ্ধব সামন্ত বলছিল—না হে, আর বেশী সহ্য করা উচিত নয়। বড় বাড় বেড়েছে ভজুর। এস বেটার ঘাড় ধরে সরিয়ে দিই।

হরি গোঁসাই বললো—কিন্তু ক্যানে ও এমন করছে? কে ওকে শিখায়ে দিল? প্রেসিডেণ্ট চাটুয্যা ওকে কিছু শিখায়ে দিয়েছে, নিশ্চয়।

শতু মাহাতো বললো— না হে না, ওর নিজের জেদ। কেউ ওকে শিখায় নাই, কেউ ওকে গুণ্ডামি করতে ভাড়া লাগায় নাই। বেটা নিজেই হাড়পাজী বদমাস।

কান্ত তেলি ফিস ফিস করে বললো—না হে, একটা ব্যবস্থা করতে হয়। ভজুকে এদিকে ডেকে নিয়ে এস, একটা টাকা হাতে ধরিয়ে দাও। এখানে হাঙ্গামা না করে, অন্য গাঁয়ে গিয়ে করুক।

ভিখু পোদ্দার বললো—না, ওকে ক্ষমা করে লাভ নাই। তিন তিনজনের মাথা ফাটিয়েছে, চল থানায় ডায়েরী করিয়ে আসি।

ভিখুর কথার গম্ভীর জনতার মুখে যেন হাসির ঝড় মেতে উঠলো। কেউ বা ঠাট্টা করে উত্তর দিল—সাবাস্ ভিখু, এতক্ষণে একটা কথার মত কথা বলেছ।

দোকানের রেলিংয়ের আড়াল থেকে ভেণ্ডার রামচরণ ইসারা করে ভজুকে ডাকলো। এগিয়ে চললো ভজু।

মুহূর্তের মধ্যে একটা লাফ দিয়ে এসে কেশব ভট্চায ভজুর পথরোধ করে দাঁড়ালো। ভজু চীৎকার করে বললো—তুমি সামনে এস না ঠাকুর। এখানে তুমিও সি ক্লাস। আমিও সি ক্লাস। তুমি আমার পথ বাঁধার কে হে ভট্চায?

কেশব—না, তুমি গাঁজা কিনতে পারবে ।, কিছুতেই না।

ভজু—বেশ, তবে তুমিই কিনে দাও।

আবার জনতার মধ্যে একটা হাসির ঝড় জেগে উঠলো।

কেশব—আমার কথা শোন ভজু।

ভজু—কি যে বল ঠাকুর, তোমার কথা নে আমি কি শেষে প্রাণটা হারাবো?

কেশব—না, তোমার প্রাণ হারাবে না?

ভজু যেন বিড় বিড় করে বললো—আর তামার কথায় কোন বিশ্বাস নাই ঠাকুর। মি ভয়ানক চালাক লোক। তোমাকে শ্বাস তো করেছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে মারতে এসেছিলে।

ভজুর ক্লেদাক্ত লাল চোখটাও কেমন যেন রুণ হয়ে উঠছিল।

কেশব একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো—মি ভুল বুঝেছ ভজু।

ভজু—থাক্ থাক্, ঐ সব কথা এখানে াল লাগে না ঠাকুরমশাই।

কেশব—তুমি ভেবে দেখ, কি অন্যায় কাজ ছো।

ভজু যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে হঠাৎ কটা অদ্ভুত বিস্ময়ে বিকৃত স্বরে উত্তর দল—অন্যায়? আমি?

কেশব—হ্যাঁ।

ভজু—আমি কি অন্যায় করলুম ঠাকুর?

কেশব—তুমি সত্যাগ্রহী ছেলেদের মাথা ঘাটিয়ে দিয়েছ। এরা তোমার গায়ে হাত দয় নাই, তবু তুমি......।

ভজু চারদিকে তাকিয়ে বললো—ত্যাগ্রহী? কে উহারা? কোথায়?

কেশব আহত ভলান্টিয়ার কয়টির দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল—ঐ তো।

ভজুর মাতলামি যেন আবার উগ্র কমের খোঁচা খেয়ে লাফিয়ে উঠলো। ীৎকার করে ভজু বললো—ফাজিলগুলোকে কন মারবো নাই ঠাকুর? আমি ওদের বাবার য়সী, আমার সংগে রং করতে এসেছে?

জনতা আবার হেসে উঠলো। কেশবের ধৈর্যও ফুরিয়ে আসছিল। আজ হঠাৎ যেন ানের ভুলে এখানে চলে এসেছে কেশব। াধুরী এখানে আছে, এ সংবাদ জানা ছিল া কেশবের। জানা থাকলে, নিশ্চয় সে আসতো না। কিন্তু সকাল থেকে লোকমুখে একটা হাঙ্গামার কথা শুনে আসছে কেশব। াঁয়ের হাঙ্গামায় কোন দিন যে দূরে সরে থাকেনি, যে আজও দূরে সরে থাকতে পারেনি। কেশব এসেছিল, শুধু তার আবির্ভাবকে মান্দার গাঁয়ের জীবনে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য। লোকে জানুক্, কেশব ভট্‌চায মরে যায়নি। সে আজও অক্ষয় অটুট, হয়ে আছে। সুদিনের শিথিল অবসরের প্রগল্‌ভতায় যাকে সবাই ভুলে গেছে, আবার এক দুর্দিনের জ্বালায় সবাই তাকে মনে করতে বাধ্য হবে। সে সুযোগ আসবেই। কেশব যেন সেই সুযোগের প্রতীক্ষায় ধৈর্য ধরে বসেছিল।

আজ সেই সুযোগ এসেছে। মাত্র একটী সাধারণ ঘটনার আক্রমণে বিমূঢ় হয়ে গেছে মান্দার গাঁ। ভজুর মত নগণ্য এক দুর্বৃত্তের বাধায় মান্দার গাঁয়ের স্বদেশী, মান্দার গাঁয়ের নতুন জাগৃতি থমকে গেছে, ভাবতে হাসিও পাচ্ছিল কেশবের।

কিন্তু ঘটনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আর হাসি পাচ্ছে না কেশবের।

ভজু লাঠি তুলে ইঙ্গিতে যেন একটি ভলান্টিয়ারের পরিচয় চিনিয়ে দিয়ে বললো—ঐ, ও হলো পূর্ণ স্যাকরার ব্যাটা। ওর বিয়েতে আমাকে বলদের মত খাটিয়ে নিয়েছে ঠাকুর মশাই। মাটী কেটেছি, জল তুলেছি, বোঝা বয়েছি—চারটী দিন লাগ খেটেছি। কিন্তু, আজ পর্যন্ত একটী পয়সাও দিলে নাই গো স্যাকরার গুষ্টি। কী অধর্ম! দু'বেলা দুটা ভাত খেতে দিয়েছে, তারপর বলে কি না, আর কত লিবি?

ভজু একটু চুপ করে হাঁপাতে লাগলো। ভজুর মূর্তিটাও পাগলের মত দেখাচ্ছিল। কেমন বেয়াড়া খাপছাড়া সব কথা। কখনো হুংকার, কখনো কান্নার মত আক্ষেপ কখনো বা কঠোর হিংসার নিক্কনের মত টুক্‌রো টুক্‌রো প্রতিজ্ঞা, প্রতিশোধের কথা। ক্লান্তভাবে লাঠি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কেশবের দিকে তাকিয়ে যেন অবসন্নের মত চুপ করে রইল ভজু। পর মুহূর্তে আর তারা সারা অন্তঃকরণ একটু গাঁজার ধোঁয়ার আনন্দের জন্য ছট্‌ফট করে ওঠে। ভজু আবার হুল্লোড় সৃষ্টি করে।

আর একটী ভলান্টিয়ারের দিকে তাকিয়ে ভজু চীৎকার করে বললো—কট্‌কট্ করে কি দেখছিসরে শিবু নাপিতের বেটা, জুয়োচোর। দে আমার ছাগলের দাম। আমার পাঁচ টাকার ছাগল তুকে তিন টাকায় দিয়েছি, তাও দামটা আজও দিলি নাই কেন রে ঠগ? তোর কান ছিঁড়বো না তো, কার কান ছিঁড়বো।

ভজুর প্রমত্ত প্রলাপের অর্থ খুবই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছিল। কেশব শুধু দু'কান দিয়ে শুনে হতস্তম্ভ হয়ে যাচ্ছিল। মান্দার গাঁয়ের স্বদেশী ব্রত পণ্ড করতে ভজু হঠাৎ আকাশ থেকে অভিশাপের মত নেমে আসে নি। মান্দার গাঁয়ের পাপের স্তূপ ভেদ করে ভজু আজ ফুঁড়ে উঠেছে। কেশবের ভাবনায় ক্ষণে ক্ষণে ভুল হয়ে যাচ্ছিল। এ কোন্ সখের সত্যাগ্রহ? কে সত্যাগ্রহী? ভজুর নির্যাতিত জীবনের বীভৎসতা আজ এই সত্যাগ্রহের ছদ্মবেশকে রূঢ় হাতে ছিঁড়ে দিতে উদ্যত হয়েছে। ভজুর প্রতিদিনের সাধুশ্রমের প্রাপ্যকে প্রবঞ্চনায় ভরে দিয়েছে যারা, আজ তারা কোন্ মহৎ আদর্শের অজুহাতে ভজুর পথে সত্যের আবেদন নিয়ে দাঁড়াতে সাহস করে? এ যে নিছক মিথ্যার আগ্রহ। ভজু এতে ভুলবে না। জীবনের জয় দিয়ে নয়, জীবনের ক্ষয় দিয়ে ভজু যে সত্যকে চিনতে পেরেছে, তাকে ধোঁকা দিয়ে ভোলাতে এসেছে আজকের জয়ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি আর সত্যাগ্রহ।

মাতাল ভজুকেই মাঝে মাঝে প্রকৃত সত্যাগ্রহীর মত দেখাচ্ছিল। তাকে ঘিরে শত লোকের জনতা দাঁড়িয়ে আছে। এই জনতার ঘৃণা ও ধিক্কার আর ভ্রূকুটির কোন শংকা রাখে না ভজু। এই জনতা এই মুহূর্তে ইচ্ছা করলে ভজুর জীর্ণ শরীরটাকে চূর্ণ করে দিতে পারে। কিন্তু সকল জনতার শক্তি দম্ভ আর ভয়াবহতাকে তুচ্ছ করে ভজু তার চণ্ডালী সাধনায় গর্বে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেও আজ প্রস্তুত। মার কাট, লুপ্ত করে দাও—তবু সে নড়বে না।

অদ্ভুত এক ঘটনায় সংকটে পড়ে কেশব তার কর্তব্যের খেই খুঁজে পাচ্ছিল না। কি করা উচিত? কি করে ভজুকে বাধা দেওয়া যায়? ধমকে কোন ফল নেই। ধমক দেবার অধিকারও কারও নেই। মিষ্টি কথায় অনুরোধের ফাঁকিতে ভজু আজ ভুলবে না।

ভজু শেষ পর্যন্ত কেশবের দিকে তাকিয়েই বললো—তুমিই বা কি ঠাকুর? তোমাকেও চিনে নিয়েছি। যাও, সর এইবার, পথ ছাড়।

পথ ছেড়ে সরে গেল কেশব। ভজুকে শান্ত করবার, ভজুর হৃদয়কে আপন করে অন্তরঙ্গ আশ্বাসে কাছে টেনে আনবার কোন কৌশল জানে না কেশব।

হ্যাঁ, একটি কাজ সে করতে পারে। ভজুর হাতের লাঠি কেড়ে নিয়ে এই মুহূর্তে......। হ্যাঁ সে তা করতে পারে। সেই রাত্রে অন্ধকারে ভজুকে এইভাবেই স্তব্ধ করে দিয়েছিল কেশব। কিন্তু আজ দিনের আলোকে সেই অন্ধকারের জীব ভজু কী রুদ্ররূপে দেখা দিয়েছে! তবু কেশব এই মুহূর্তে ভজুর জীর্ণ রুক্ষ মূর্তির মায়াটা একটি আঘাতে দুভাগ করে দিতে পারে, একবার গলা টিপে ধরলে ভজুর ঐ প্রকট পাঁজরার হাড়গুলির স্পন্দন এখুনি থেমে যাবে। এই নির্মম দুঃসাহস কেশব ভট্টাচার্যের আছে।

কিন্তু ভাবতে গিয়ে শিউরে ওঠে কেশব। সকল দুঃসাহস শীতল হয়ে যায়। শহীদ হয়ে যাবে ভজু। তা'হলে ভজুর মৃত্যু মহনীয় হয়ে উঠবে, সকল বীভৎসতার ঊর্ধ্বে এক মুহূর্তে ভজুর আত্মা পরম রূপময় লোকে চলে যাবে অনন্তকালের জন্য। ভজুর হার হবে না। ওভাবে ভজুকে পরাভূত করা যায় না।

—(ক্রমশঃ)

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৬ই ফেব্রুয়ারী—হাওড়া উইমেন্স ভলান্টারী সার্ভিসের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার ফলে হাওড়ায় শীঘ্রই একটি দরিদ্রাবাস স্থাপিত হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে এ পর্যন্ত এক লক্ষ ২৬ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

ভূতপূর্ব সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুখেন্দু-মোহন সিংহ তাঁহার পত্নীকে হত্যা করিবার চেষ্টার অপরাধে মুঙ্গেরের দায়রা জজ কর্তৃক যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

নয়াদিল্লী কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, দিল্লীর কোন কোন আদালতে কংগ্রেস পতাকা ঝাড়ন হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে।

গুজরাটের ছাত্ররা সর্বপ্রথমে মহাত্মা গান্ধীর চৌদ্দ দফা গঠনমূলক কার্যপন্থা কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা করিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

গত ৩রা ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মুর্শিদাবাদ জেলার প্রথম কংগ্রেস সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন বহরমপুরে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

৭ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য প্রাতে শত্রুপক্ষের একখানি বিমান পূর্ববঙ্গে দুইটি বোমা নিক্ষেপ করে এবং কামান হইতে গোলাবর্ষণ করে। কেহ হতাহত হয় নাই।

আল্লাবক্স হত্যা মামলার বিচারকারী শিকারপুরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট খান বাহাদুর খুরো, তাঁহার ভ্রাতা এবং অপর তিনব্যক্তিকে দায়রায় সোপর্দ করিয়াছেন।

নাগপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মাউদা থানা আক্রমণের মামলায় "হিন্দুস্থান লালফৌজের" নেতা বলিয়া বর্ণিত মগনলাল বাগদী এবং তাহার সহকর্মী মালু কোষ্টিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। এই মামলা ১৯৪২ সালের আগস্ট হাঙ্গামার জের।

৮ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই দিন শ্রীযুত অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার পাব্লিক একাউন্টস কমিটির রিপোর্ট সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্টরূপে বাঙ্গলা সরকার বঞ্চনা নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া প্রায় তিন কোটি টাকা অপব্যয় করিয়াছেন।"

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য এবং সরকার পক্ষের প্রধান হুইপ মিঃ ফজলুর রহমানকে সভাপতি করিয়া বাঙ্গলা সরকার একটি কারিগরী (টেকনিক্যাল) শিক্ষা কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করিয়াছেন।

৯ই ফেব্রুয়ারী—কলিকাতার দুইজন অসামরিক অধিবাসীকে মারাত্মক অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিবার অভিযোগে জনৈক মার্কিন সৈন্য সামরিক আদালতের বিচারে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত এবং সেনাবাহিনী হইতে বিতাড়িত হইয়াছে।

গতকল্য মধ্যরাত্রে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত কসবায় এক গুলীবর্ষণ ঘটনায় শ্রীযুত সন্ন্যাসীচরণ ধর তাঁহার স্ত্রীকে রক্ষা করিতে গিয়া নিহত হইয়াছেন।

দক্ষিণ-আফ্রিকার গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনে অসমর্থ হওয়ায় ভারত গভর্নমেণ্টের কার্যের নিন্দাসূচক এক প্রস্তাব অদ্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিনা ডিভিসনে গৃহীত হয়।

অদ্য চীফ একজিকিউটিভ অফিসার কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট পেশ করেন। বাজেটে ১৯৪৫-৪৬ সালে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ ১৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা অধিক দেখান হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার জন্য দেশবাসীর নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়া নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারের সভাপতি স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু ও সম্পাদক শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন।

১০ই **ফেব্রুয়ারী**—সংবাদের শিরোনামা নিয়ন্ত্রণাদেশ অদ্য হইতে বাঙলার গভর্নর রদ করিয়াছেন।

অদ্য বালীগঞ্জে এক ব্যক্তি কর্তৃক ইতস্তত গুলী চালনার ফলে একজন নেপালী দ্বারোয়ান নিহত, একজন রিক্সাচালক গুরুতর আহত এবং একজন বাঙালী তরুণী আহত হয়।

বিহারে ন্যাশনাল সেভিং সার্টিফিকেট ক্রয়ের জন্য জনসাধারণের উপর বলপ্রয়োগ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে উত্থাপিত এক মুলতুবী প্রস্তাব ৪৭—৪০ ভোটে গৃহীত হয়।

কেন্দ্রীয় পরিষদে স্বরাষ্ট্র সচিব জানান যে, গত ১লা জানুয়ারী ভারতরক্ষা আইনে দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীর সংখ্যা ছিল ৫৭০৮ এবং ১৯৪৪ সালের ৩নং অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী বন্দী ছিল ৭৫৭৪ জন। অর্ডিন্যান্স বন্দীর সংখ্যা বাঙলায়ই সর্বাপেক্ষা বেশী—৩৬১৪ জন।

কারারুদ্ধ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কেন্দ্রীয় পরিষদে সরকার পক্ষের এক বিবৃতিতে জানা গিয়াছে যে, গ্রেপ্তারের পর হইতে মৌলানা আজাদের ৪১ পাউণ্ড, পণ্ডিত পন্থের ১৫ পাউণ্ড, পণ্ডিত নেহরুর ১৪ পাউণ্ড, মিঃ আসফ আলীর ৯ পাউণ্ড এবং ডাঃ সীতারামীয়ার ৬ পাউণ্ড ওজন কমিয়াছে।

১১ই ফেব্রুয়ারী—বাঙলার আদি কবি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি শান্তিপুরের অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামে তাঁহার বাৎসরিক স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

যুক্তপ্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার বাবু পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ওয়ার্ধায় কস্তুরবার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সমবেত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী বলেন, "সেবকের মনোভাব লইয়া গ্রামে যাও এবং গ্রামসেবায় আত্মনিয়োগ কর।"

১২ই ফেব্রুয়ারী—কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারতীয় চা-নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন বিল গৃহীত হয়।

বিদেশী সংবাদ

৬ই ফেব্রুয়ারী—লণ্ডনে বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। এইদিন নিঃ ভাঃ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধি মিঃ ডাঙ্গে এবং ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবারের প্রতিনিধি মিঃ এ কে মুখার্জির মধ্যে বচসা হয়।

৭ই ফেব্রুয়ারী—কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে ত্রি-নেতৃ (প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, মিঃ চার্চিল এবং মার্শাল স্ট্যালিন) সম্মেলন সুরু হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিলের দলবলকে লইয়া ত্রি-নেতৃ সম্মেলনের স্থানের দিকে যাইবার কালে একখানা বিমান ভ্যাঙ্গায়। [illegible] নিহত হন।

৮ই ফেব্রুয়ারী—পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন—ওডারতটে কুনেরসডর্ফ লালফৌজ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

পশ্চিম ইউরোপীয় রণাঙ্গন—মিত্রবাহিনী রোয়ে বাঁধ এলাকায় অবস্থিত সীগফ্রীড লাইনের সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত অংশে অবস্থিত স্মিডত দুর্গ অধিকার করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গন—সমগ্র উত্তর ম্যানিলা ও কুইজন শহর হইতে জাপ সৈন্যদলকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করা হইয়াছে।

৯ই ফেব্রুয়ারী—পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন—লালফৌজ পূর্ব প্রুশিয়ায় কোনিগসবের্গের দক্ষিণে ক্রয়েৎসবুর্গ এবং আরও কতকগুলি লোকালয় দখল করিয়াছে।

পশ্চিম ইউরোপীয় রণাঙ্গন—দক্ষিণ আলসাসে রাইন নদীর পশ্চিম তীরে জার্মাণদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের অবসান হইয়াছে।

১০ই ফেব্রুয়ারী—পশ্চিম ইউরোপীয় রণাঙ্গন—বৃটিশ কানাডিয়ান বাহিনী রাইখভল্ড অরণ্যের উত্তর পার্শ্বভাগে অবস্থিত ক্লেভের পশ্চিমে সীগফ্রীড লাইনের প্রধান ব্যূহ ভেদ করিয়াছে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গন—১৫শ ভারতীয় কোর রামরী শহর অধিকার করিয়াছে।

১১ই ফেব্রুয়ারী—পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন—লালফৌজ ব্রেসলাউয়ের উত্তর-পশ্চিমে ওডার নদী অতিক্রম করিয়াছে। ব্রেসলাউয়ের ৩৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমস্থ গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগকেন্দ্র লিগনিৎস লালফৌজ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

পশ্চিম ইউরোপীয় রণাঙ্গন—ইতিহাস প্রসিদ্ধ ক্লেভ নগরীর চতুষ্পার্শ্ববর্তী এলাকায় ও নগরীর অভ্যন্তরে ঘোরতর সংগ্রাম চলে। ইহা রাইনতটগামী সীগফ্রীড লাইনের একটি প্রধান রক্ষাঘাঁটি।

১২ই ফেব্রুয়ারী—লণ্ডনে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, ত্রি-নেতৃ সম্মেলন ক্রিমিয়ার অন্তর্গত ইয়ালতায় জার দ্বিতীয় নিকোলাসের প্রাসাদে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নাৎসী জার্মানীর উপর যে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের দাবী অনা হইবে, তাহা কার্যকরী করিবার জন্য সম্মিলিত নীতি ও পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, ত্রিশক্তির প্রত্যেকে জার্মানীর ভিন্ন ভিন্ন অংশ অধিকার করিবে।

পোল্যাণ্ড সম্পর্কে বোঝাপড়া হইয়াছে যে, বর্তমানে পোল্যাণ্ডে যে অস্থায়ী গবর্নমেণ্ট আছে, তাহা পুনর্গঠিত হইবে। পোল্যাণ্ডের পূর্ব সীমান্ত মূলত কার্জন লাইন বরাবরই হইবে এবং অন্যদিকে পোল্যাণ্ড নূতন এলাকা পাইবে। যুগোশ্লাভিয়া সম্পর্কেও তিতো-সুবাসিক চুক্তি অবিলম্বে কার্যকরী করা হইবে।

পশ্চিম ইউরোপীয় রণাঙ্গন—ওডার তীরে মার্শাল জুকভ বার্লিন হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে আছেন। মার্শাল কোনিয়েভের সৈন্যরা বার্লিনের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ১০০ মাইলের মধ্যে পৌঁছিয়াছে। বার্লিন-ব্রেসলাউ পথ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গন—অগ্রবর্তী বৃটিশ টহলদার সৈন্যগণ এক্ষণে মান্দালয়ের ১০ মাইলের মধ্যে পৌঁছিয়াছে।

পশ্চিম ইউরোপীয় রণাঙ্গন—কানাডিয়া সৈন্যদল কর্তৃক ক্লেভ অধিকৃত হইয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী আকিলভ্যান আকেরের নেতৃত্বে বেলজিয়ামে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—লালফৌজ হাঙ্গেরীর রাজধানী বুডাপেস্ট দখল করিয়াছে।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ] শনিবার, ১২ই ফাল্গুন, ১৩৫১ সাল। Saturday, 24th February, 1945. [১৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কংগ্রেস দলনে নূতন উদ্যম

দীর্ঘকাল নীরব থাকিবার পর মহাত্মা গান্ধী গভর্নমেন্টের বর্তমান কার্যকলাপের আলোচনা করিয়া সম্প্রতি একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। অধুনা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নূতন উদ্যমে কংগ্রেস কর্মীদিগকে গ্রেপ্তার ও আটকের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে বিহারের ৫ জন বিশিষ্ট কংগ্রেসনেতার উপর অন্তরীণের আদেশ জারী করা হয়। পরে এই আদেশ কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে বটে; তবে প্রত্যাহৃত হয় নাই। ইহার পর কোন্ কারণে জানা যায় না, গোরক্ষপুরে যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসনেতা শ্রীযুত পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনকে গ্রেপ্তার করা হয়। অবশ্য পরে তাঁহাকেও মুক্তি দান করা হইয়াছে। অতঃপর এই নীতি সিন্ধু প্রদেশে সম্প্রসারিত হইবার সংবাদ আসিয়াছে। সিন্ধুর বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত সিন্ধ এবং কয়েকজন কংগ্রেসসেবীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে। এই সঙ্গে উড়িষ্যার খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত গোপবন্ধু চৌধুরীর গ্রেপ্তারও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহাত্মাজী তাঁহার বিবৃতিতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গভর্নমেণ্টের যুগপৎভাবে অনুসৃত এই দমন নীতির সমালোচনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কর্তৃপক্ষ কি সুপরিজ্ঞাত এবং অপরিজ্ঞাত সকল ভারতবাসীকেই কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন? কংগ্রেস-কর্মীরা দেশের সর্বত্র স্বাধীনতা-বাণী প্রচার করিবে এবং তাহার ফলে অহিংস আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হইবে, এই আশঙ্কায় গভর্নমেণ্ট বিচলিত হইতেছেন কি? মহাত্মাজী তাঁহার কর্মসূচীর উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে আপত্তি করিবার মত কোন সঙ্গত কারণ নাই। তিনি বলেন, সর্বজনীনভাবে যদি এই কর্মসূচী গৃহীত হয়, তবে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন না চালাইয়া অথবা আইনসভা দখল না করিয়াও পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া যাইবে। উক্ত দুইটির কোনটিরই প্রয়োজন হইবে না। ইংরেজ তখন ভারতে থাকিয়া ভারত শাসন নিরর্থক মনে করিবে। নেহাৎ তখনও যদি সে থাকে, তবে নাগরিক হিসাবেই থাকিবে। ১৯৪২ সালের ভাষায় বলিতে হয় শাসক হিসাবে তাহাদের ভারত ত্যাগ করিতে হইবে। কেননা, তাহাদের সৈন্য বেকার হইয়া পড়িবে এবং ব্যবসা নিরর্থক হইবে। মহাত্মাজী তাঁহার গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির দূরপ্রসারী এই সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরা সে বিষয়ে কোন অলোচনা এখানে উত্থাপন করিব না, তবে গভর্নমেণ্টের মতিগতি হইতে স্পষ্টরূপেই ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কোনভাবে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে ইহা তাঁহারা চাহেন না। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারত শাসন এবং সেই সূত্রে শোষণের সুবিধা নিজেদের হাতে অটুট রাখিতেই একান্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। স্যার জাফরুল্লা খাঁ ভারত গভর্নমেণ্টের নীতিরই একজন ধারক, বাহক এবং পোষক। কিন্তু তিনিও লণ্ডনের সাম্রাজ্য মন্ত্রণা পরিষদে সে কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতবাসীদের সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদ তাহাদের স্বাধীনতা লাভের অন্তরায়—এই যুক্তি উপস্থিত করা হইয়া থাকে; কিন্তু চীনে কমিউনিস্ট এবং কুয়োমিণ্টাং দলের মধ্যে কি তদপেক্ষা বেশী ভেদ বিভেদ নাই? স্যার জাফরুল্লার উক্তির তাৎপর্য এই যে, ভারতবাসীদের মধ্যে যে ভেদ-বিভেদ আছে, তাহা তাহাদের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে অন্তরায় হইতে পারে না। জগতে এমন কোন দেশ নাই যেখানে সমগ্র জাতির মধ্যে মতের কোন রকম ভেদ বিভেদ না আছে। প্রকৃত সত্য এই যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে উচ্ছুক নহেন। স্যার কৈলাসনারায়ণ কাটজুও সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে একথাটা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, গত ৪ বৎসরের ঘটনা পরম্পরা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতারূপ অভীষ্ট লাভ করিবার জন্য কংগ্রেস বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছে। প্রতীয়মান ব্যর্থতা সত্ত্বেও কংগ্রেস তাহার সেই সাধনা হইতে বিচলিত হয় নাই এবং সে তাহার পতাকা নমিত করে নাই। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মনোভাব অন্যরূপ। যদি স্বাধীনতা না দিলে চলে, তবে তাঁহারা কিছুতেই ভারতবর্ষকে তাহা দিবেন না। ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের বিলোপ-সাধনের জন্য যেসব রাজনীতিক দল চেষ্টা করিবে, তাহারা তাহাদের সকল উদ্যম দমন-নীতি প্রয়োগে ব্যর্থ করিবার জন্যই সমুদ্যত হইয়াছেন। ব্রিটিশ ভারতে চিরন্তনভাবে কর্তৃত্ব চালাইবে ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। আমরাও দেখিতেছি ব্রিটিশের এই অভিপ্রায় সকল সন্দেহের অতীত অবস্থায় আজ একান্ত সত্য-স্বরূপে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই সত্যকে স্বীকার করিয়াই ভারতের স্বাধীনতাকামী সন্তানদিগকে তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধির দুর্গমপথে অভিযান করিতে হইবে।

বাঙলার বাজেট

বিগত ১৬ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী বাঙলা সরকারের ১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন। গত দুই বৎসরের ন্যায় এই বাজেট সমভাবেই নৈরাশ্যজনক। বাজেটের হিসাব অনুসারে ১৯৪৫ সালে ৩১শে মার্চ বাঙলা গভর্নমেন্টের ঘাটতির পরিমাণ ১১ কোটি টাকা দাঁড়াইবে, পরবর্তী বৎসরে তাহা বাড়িয়া ১৯ কোটি টাকা হইবে। অর্থসচিবের মতে যুদ্ধজনিত অস্বাভাবিক অবস্থা বাঙলা সরকারের এই আর্থিক সংকটের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। তিনি বলেন, তাঁহারা বাজেটের ঘাটতির এই সমস্যা সমাধানের জন্য কর বৃদ্ধির কোন চেষ্টাই বাকী রাখেন নাই। অধুনা তিনি সরাসরি কর বৃদ্ধির কোন প্রস্তাব উত্থাপন না করিলেও ভবিষ্যতে যে গভর্নমেন্ট কর বৃদ্ধি সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন না এরূপ আশ্বাস তিনি দিতে পারেন নাই। বাজেট আলোচনায় দেখা যায় বাঙলা গভর্নমেন্টের এই আর্থিক সমস্যা একমাত্র ভারত গভর্নমেন্টের অর্থ সাহায্যেই মিটিতে পারে এবং বাঙলা গভর্নমেন্ট প্রধানত সেই দিকেই তাকাইয়া আছেন। ১৯৪৪ সালে বাঙলায় পুনরায় দুর্ভিক্ষ হয় নাই। মন্ত্রি-মণ্ডলী এই দুর্দৈব নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া অর্থসচিব গৌরব বোধ করিয়াছেন; কিন্তু আমরা তাঁহাদের এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিবার উপযুক্ত কোন কারণ দেখিতে পাইতেছি না। দেশের লোকের এখন যথেষ্ট অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, সর্বত্র জীবন ধারণের অত্যাবশ্যক সকল দ্রব্য উত্তরোত্তর মহার্ঘ হইয়া উঠিতেছে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে অগণিত নরনারী ব্যাধির মুখে পতিত হইতেছে। এই তো অবস্থা; অথচ বাজেটের বরাদ্দ-গুলি বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, মন্ত্রিমণ্ডলী কোনরূপে গতানুগতিক শাসনকার্যই মাত্র বজায় রাখিয়া চলিতে-ছেন। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ এবং তার পরবর্তী মহামারীতে বাঙলার যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহার আশু প্রতিকারকল্পে যাহা করা প্রয়োজন ছিল, তাহার সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বনে তাঁহারা স্পষ্টভাবেই পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। দুর্ভিক্ষে যাহারা নিঃস্ব হইয়াছে, তাহাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বাজেটে মাত্র ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে; প্রয়োজনের অনুপাতে ইহা কিছুই নয়। জনস্বাস্থ্যের খাতেও ব্যয় ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা হইতে হ্রাস করিয়া ৯৫ লক্ষ টাকা করা হইয়াছে। বাঙলার বর্তমান অবস্থায় এসব ক্ষেত্রে এমন কার্পণ্য প্রদর্শন করা যে-কোন গভর্নমেন্টের পক্ষে লজ্জার কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহার পর যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা এবং তৎসম্পর্কিত ভবিষ্যৎ রহিয়াছে। অর্থসচিব মহাশয় এই প্রসঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতের অপরাপর প্রধান প্রধান প্রদেশ এবং সামন্ত রাজ্যগুলি যুদ্ধোত্তর সংগঠনে যেরূপ আশ্বস্তি সহকারে অগ্রসর হইবে, এবং এজন্য তাহারা যে সংস্থান লাভ করিয়াছে, আমাদের সেগুলির কিছুই নাই। এই চিন্তা অদ্যকার অপরাহ্নে আমার অন্তর ক্লিষ্ট করিতেছে। অর্থসচিবের এই পরিতাপের সঙ্গে তাঁহার এবং তাঁহার সতীর্থ মন্ত্রিমণ্ডলীর কর্তব্য উদ্‌যাপনের জন্য আত্মশ্লাঘার ভাব সমগ্র বাজেট আলোচনায় অত্যন্ত বিসদৃশ হইয়া উঠিয়াছে।

রেলওয়ে বাজেট

ভারতের ব্যবস্থা পরিষদে সম্প্রতি উপস্থাপিত রেলওয়ে বাজেটে গত কয়েক বৎসরের ন্যায় এবৎসরও প্রচুর উদ্বৃত্ত দেখা যায়। কিন্তু রেলওয়েসমূহের এই বহুল পরিমাণ বাড়তি আয়ের দিকে তাকাইয়া জনসাধারণের কোনরূপ সান্ত্বনা লাভ করিবার কারণ নাই। মালচলাচলের দরুন আয়ের অংক বাদ দিলে রেলওয়ে-সমূহের যে আয়ের পরিমাণ হয়, তাহার অধিকাংশই দিয়া থাকে মধ্যম ও বিশেষ করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা। কিন্তু এই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণের সুখ সুবিধা তো দূরে স্থান, তাহারা রেলপথে যাতায়াত করিতে পারে, সেদিকে রেলওয়ে কর্তৃ-পক্ষের লক্ষ্য মাত্র নাই। এদেশের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কামরাগুলির ব্যবস্থা যেরূপ নিকৃষ্ট, কোন সভ্য দেশে সেরূপ ব্যবস্থা আছে বলিয়া ধারণা হয় না। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণের অসুবিধা ও দুঃখ-দুর্ভোগ এদেশে চিরদিনই অবর্ণনীয়। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধকালে মানুষের সহনশীলতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। তথাপি নিতান্ত প্রয়োজনেই এই দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ স্বীকার করিয়া যেরূপভাবে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে হইতেছে, জানোয়ারকেও সেরূপভাবে রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় ঠাসিয়া বন্ধ করিয়া লইয়া যাওয়া হয় না। অথচ সর্বাপেক্ষা ক্ষোভের ও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রেলওয়ে-সমূহের প্রচুর বাড়তি আয় সত্ত্বেও তৃতীয় শ্রেণীর কোনরূপ উন্নতি বিধানের চেষ্টা হয় নাই এবং এখনও সেরূপ কোন ব্যবস্থার আশা লক্ষিত হইতেছে না। গত বৎসর ভাড়ার হার বৃদ্ধি করিয়া, সেই অতিরিক্ত আয়ের দ্বারা এক তহবিল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রেলওয়ে বাজেটে করা হয়। ঐ তহবিলের অর্থ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুবিধার ব্যবস্থায় ব্যয় করা হইবে, এইরূপ আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ভাড়ার হ্রাস বৃদ্ধির [illegible] জনমতের বিরুদ্ধে ঐ প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে গভর্নমেন্ট সাহসী হন নাই। মালের অথবা যাত্রিগণের ভাড়া বৃদ্ধি করা হইবে না বলিয়া স্যার এডোয়ার্ড বেন্থল এ বৎসরও আশ্বাস দিয়াছেন। ইহা দরিদ্র জনগণের পক্ষে সান্ত্বনার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল রেলওয়েসমূহের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় মাথা না ঘামাইয়া, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রি-গণের দুঃখ দুর্ভোগ নিবারণ-উদ্দেশ্যে গভর্নমেন্ট কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে-ছেন, তাহা স্যার এডোয়ার্ড বেন্থল জানাইবেন কি? রেলের উদ্বৃত্ত আয়ের তহবিল হইতে অর্থ লইয়া তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণের সুবিধার জন্য একটি তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হয় না কেন?

পরলোকে স্যার উইলিয়ম রোদেনস্টাইন



গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী স্যার উইলিয়ম রোদেনস্টাইন পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৩ বৎসর হইয়াছিল। রোদেনস্টাইন কেবলমাত্র চিত্রশিল্পী ছিলেন না। সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁহার দান উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচিত "অক্সফোর্ড ক্যারেক্টারস্" "মেন অ্যান্ড মেমরিজ্" প্রভৃতি গ্রন্থ সমাদর লাভ করিয়াছে। ভারতীয় শিল্প ও চিত্রকলার প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁহার প্রধান প্রধান চিত্রের মধ্যে "Morning at Benares" ("ভোরবেলার বারাণসীর দৃশ্য") চিত্রখানি বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। ১৯২৫ সালে তিনি "প্রাচীন ভারত" নামক পুস্তকখানি প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। ১৯১২ সালে "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় প্রকাশিত ভগিনী নিবেদিতা কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত রবীন্দ্রনাথের "কাবুলিওয়ালা" গল্প পড়িয়া তিনি মুগ্ধ হন এবং রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর রচনা আরও আছে কিনা জানিতে চাহেন। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ইংরেজী গীতাঞ্জলি রোদেন-স্টাইনকে উৎসর্গ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে পাশ্চাত্যের চিত্রকলার যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হইল এবং আমরা কবিগুরুর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও ভারতীয় সংস্কৃতির একজন অনুরাগী শুভানুধ্যায়ী গুণী ব্যক্তিকে হারাইলাম।

দেশের কথা

ত্রিশক্তির সিদ্ধান্ত

ক্রিমিয়ার অন্তর্গত কৃষ্ণসাগর উপকূলবর্তী ইয়ালটা বন্দরে রুশিয়ার জারের গ্রীষ্মকালীন আবাসে চার্চিল, রুজভেল্ট এবং স্ট্যালিনের মধ্যে বৈঠক হইয়া গেল। বৈঠকের পর ইঁহারা মিলিতভাবে যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন—

উদ্দেশ্য ও কার্যের মধ্যে মতের যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠার ফলে সম্মিলিত জাতির পক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভবপর ও নিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, ক্রিমিয়ায় অনুষ্ঠিত আমাদের এই সম্মেলন ভাবী শান্তি প্রতিষ্ঠার সময়ও আমাদের সেই সাধারণ মতৈক্য রক্ষা করিবে এবং তাহা অধিকতর দৃঢ় করিবে। আমাদের স্ব-স্ব রাষ্ট্রের জনসাধারণ ও পৃথিবীর সাধারণ লোকের নিকট আমাদের গভর্নমেণ্টসমূহের যে বাধ্য-বাধকতা রহিয়াছে এতদ্দ্বারা তাহা পালিত হইল বলিয়া আমরা মনে করি। আমাদের তিনটি রাষ্ট্র ও সমুদয় শান্তিপ্রিয় জাতির মধ্যে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা ও হৃদ্যতা অব্যাহত থাকিলেই শুধু চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইতে পারে। আটলাণ্টিক সনদের ভাষায় বলা যায় যে, ইহার ফলে দুনিয়ার সমস্ত দেশের জনসাধারণ ভয় ও অভাব হইতে মুক্ত হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার আশ্বাস পাইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, আটলাণ্টিক সনদ মরিয়া বাঁচিয়া উঠিল আবার; কিন্তু এবার নূতন মূর্তিতে এবং চার্চিলী রীতিতে নিজের গতি পরিবর্তিত করিয়া প্রকট হইয়াছে। এ সম্বন্ধে রুজভেল্ট ও স্ট্যালিন এতদিনে সকলের সন্দেহের নিরসন করিয়া চার্চিলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিয়াছেন—

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী, গ্রেট ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট তাঁহাদের দেশের এবং ইউরোপের জার্মান কবলমুক্ত দেশগুলির জনসাধারণের স্বার্থের কথা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করিয়াছেন। মুক্ত ইউরোপের সাময়িক অনিশ্চিত অবস্থার সময় জার্মানী এবং ভূতপূর্ব এক্সিস প্রভাবাধীন রাষ্ট্রগুলির জনসাধারণ যাহাতে তাহাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে করিতে সমর্থ হয়, তজ্জন্য ত্রিশক্তির সাহায্য প্রয়োজন হইবে। ঐসব রাষ্ট্রের লোকেরা যাহাতে নাৎসীবাদ ও ফাসিস্তবাদের মূলোৎপাটন করিয়া নিজেদের অভিপ্রায় অনুযায়ী নিজেদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া তুলিতে পারে আটলাণ্টিক সনদের ইহাই নীতি। যাহারা যে গভর্নমেণ্টের অধীনে থাকিবে, তাহাদিগকে সেই গভর্নমেণ্ট গঠনে অধিকার দেওয়া। যেসব দেশের লোকদিগকে পররাজ্যগ্রাসী জাতিসমূহ তাহাদের অধিকার হইতে জোর করিয়া বঞ্চিত করিয়াছে, পুনরায় তাহাদের সার্বভৌম অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করাই সে নীতির উদ্দেশ্য। মুক্ত জনসাধারণ যাহাতে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, তজ্জন্য অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই তিন গভর্নমেণ্ট যেখানে যেভাবে প্রয়োজন ইউরোপের যে কোন এক্সিস কবলমুক্ত রাষ্ট্রের বা পূর্বে এক্সিস শক্তির অধীনে ছিল, এমন রাষ্ট্রের জনসাধারণকে যুক্তভাবে সাহায্য করিবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে আটলাণ্টিক সনদের নীতি-নির্দেশে এশিয়ার কথা বিশেষ বিবেচনা সহকারেই এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে। ভারতের কোন প্রসঙ্গ তো ইহাদের ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে নাই।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন এশিয়ার সম্বন্ধে বিবেচনাটা যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য রহিয়াছে; অবস্থার চাপে পড়িয়া তখন আটলাণ্টিক সনদের ভাষ্য অন্য আকার ধারণ করিতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ত্রিশক্তির গণতান্ত্রিকতার প্রতি মর্যাদাবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং শক্তির কাছে নীতির যুক্তিই বড় হইয়া দাঁড়ায়। আপাতত ত্রিশক্তির নেতৃবর্গ যে তেমন দৃষ্টি লইয়াই চলিতেছেন এবং সাম্রাজ্যবাদমূলক স্বার্থেই সায় যোগাইতেছেন ইহা সুস্পষ্ট। এশিয়াবাসীর মন হইতে তাহাদের সমরনীতি সম্বন্ধে এ ধারণা দূর হইবার নয়। মিঃ স্পেন্সার কেয়ার্ড বহুদিন চীন ও ফিলিপাইনে অধ্যাপকের কার্য করিয়া কাটাইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি এ সম্বন্ধে আমেরিকা হইতে প্রকাশিত 'এশিয়া' পত্রে লিখিয়াছেন,

গ্রেট ব্রিটেন যদি অবিলম্বে ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে, তবেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হইতে এশিয়া যে মুক্ত হইল, ইহা সর্বতোভাবে প্রতিপন্ন করা হইবে। এখন আমাদের কথা কেহ সরল বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করিতেছে না। আমরা ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা দান করিব, এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছি; কিন্তু জাপানীরা এই কথা প্রচার করিতেছে যে, যুদ্ধের চাপে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া আমরা শুধু বিপদ কাটাইবার জন্য ঐ কথা বলিয়াছি। ইহা ছাড়া, ফিলিপাইন শাসনে মার্কিনের অপরিমিত কৃতিত্বও এশিয়াবাসীর মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ভারত যদি স্বাধীনতা লাভ করিত, তবে ইহা সর্বাপেক্ষা কার্যকররূপে প্রতিপন্ন হইত। ভারতবর্ষে বহু যোগ্যতাসম্পন্ন নেতা আছেন, তবু এখনও ভারত পরাধীন। ভারতবর্ষ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তির সমান আসন লাভ করিতে পারে, কিন্তু ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের এমন সম্ভাবনা নাই। স্বাধীন ভারতই আমাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠার পক্ষে সব চেয়ে বড় যুক্তি। এতদ্দ্বারা আমরা জগতের কৃষ্ণাঙ্গ জাতিসমূহকে বলিতে পারি যে, তাহাদের সম্মুখে নূতন যুগ আসিতেছে। আমাদের তেমন মনোভাবে সুস্পষ্ট পরিচয় না জানাইলে এই সব জাতি উত্তরোত্তর সোভিয়েট ইউনিয়নের দিকে সাহায্যের জন্য তাকাইবে।"

সেদিন শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বোস্টন শহরে এক বক্তৃতায় বর্তমান আন্তর্জাতিক সমস্যায় ভারতের এই গুরুত্বের উপর জোর দিয়াছেন। তিনি বলেন—

"এই যুদ্ধের নৈতিক আদর্শের সম্বন্ধে যে সব বড় বড় কথা বলা হইয়াছে, ভারতবর্ষই সেগুলির পরীক্ষাকেন্দ্র হইবে। ভারতের স্বাধীনতার উপর জগতের সমস্যা সমাধানের আশা নির্ভর করিতেছে। স্বাধীন ভারত প্রাচ্য দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার শক্তিস্বরূপে প্রতিপন্ন হইবে। অসন্তুষ্ট ভারত বলিতে এশিয়ার অসন্তোষই বোঝায়। মানব স্বাধীনতার স্বীকৃতি ব্যতীত স্থায়ী শান্তি সম্ভব নয়। জগতে যে সব দেশ এখনও পরাধীন রহিয়াছে, প্রথমে তাহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করাই এ পক্ষে শ্রেষ্ঠ উপায়। যদি তাহা করা না হয়, তবে পৃথিবীব্যাপী এই সংগ্রাম পশুবলের প্রাধান্যের জন্য সঙ্ঘর্ষ বলিয়াই প্রমাণিত হইবে এবং ইহার পিছনে নৈতিক কোন যুক্তিই থাকিবে না। এক্ষেত্রে শুধু বিবৃতি প্রদান করাই যথেষ্ট নয়, সদিচ্ছার মূলে যদি কার্য করিবার প্রেরণা না থাকে, তবে তাহা ধাপ্পা বাজীতেই দাঁড়ায়। বাস্তবক্ষেত্রে কাজই সমস্যার সমাধানে সাহায্য করিবে, কিন্তু সম্মিলিত শক্তিনিচয় এ পর্যন্ত তেমন কিছু করেন নাই। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাসমূহে যদি বলের উপরই জোর দেওয়া হয় এবং দুর্বলতর জাতিসমূহের উপর বলপ্রয়োগে নিরাপত্তার ক্ষেত্র সৃষ্টির যুক্তিই বড় হয়, তবে উহা ব্যর্থ হইবে। এশিয়া এবং আফ্রিকার বহু প্রাচীন সংস্কৃতি রহিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার সংস্কৃতি যেরূপ জগতের পক্ষে প্রয়োজন সেইরূপ এশিয়া ও আফ্রিকার সংস্কৃতির অবদানও উপেক্ষণীয় নহে।

কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদমূলক স্বার্থের উৎখাত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার পক্ষে এশিয়া ও আফ্রিকার সংস্কৃতিকে সমান মর্যাদা প্রদান করা সম্ভব নয়। নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের একটা সংস্কার কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি না করিলে কোন জাতিকে অধীন রাখা কার্যত সম্ভব হয় না এবং তাহাকে শোষণ করাও চলে না। সম্প্রতি লণ্ডনে নিখিল বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের এক সভায় ডাক্তার সি এ স্মিথ এ সম্বন্ধে বলেন—

আজ আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় যে বর্ণবৈষম্য লক্ষ্য করিতেছি তাহা সাম্রাজ্যবাদেরই ফল। সাম্রাজ্যবাদ যেখানে আছে, সেখানে এই বিদ্বেষ দেখা দিতে বাধ্য। সুতরাং বর্ণবৈষম্যের নিরসন করিতে হইলে সর্বপ্রথমে সাম্রাজ্যবাদের নিরসন করা প্রয়োজন। ভারতীয়দের সম্বন্ধে এই বর্ণবৈষম্যের মূলে ভারতবর্ষে ভারতবাসীদের পরাধীন অবস্থাই কাজ করিতেছে। ভারতের ৪০ কোটি নরনারী যেদিন স্বাধীনতা লাভ করিবে সেই মুহূর্তে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি ব্যবহার ভিন্ন আকার ধারণ করিবে।

ইহা মনস্তাত্ত্বিক সত্য। ভারতবর্ষ যতদিন পরাধীন থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত ভারতবাসীদের প্রতি বড় জোর দুই একজন সহানুভূতিসম্পন্ন শ্বেতাঙ্গ নরনারী উদার দৃষ্টির চশমা পরিয়া ভারতবাসীদের

দিকে তাকাইতে পারেন কিন্তু ভারতীয়-দিগকে সম-মর্যাদায় দেখিবার সামর্থ্য তাঁহারা লাভ করিবেন না।

দৃষ্টির মূলে মনস্তাত্ত্বিক সংকট

ভারত গভর্নমেণ্টের মার্কিন সম্পর্ক বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ স্যার এভলিন রেঞ্চ সেদিন লণ্ডনের ইস্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনে একটি বক্তৃতায় এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

গত আড়াই বৎসরকাল ভারতবর্ষে থাকিয়া তথাকার বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আমার মনে কতকগুলি ধারণা জন্মিয়াছে। ইহার মধ্যে একটি এই যে, ব্রিটিশ নারীরা ভারতবাসী-দিগকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা শুধু নিজেদের দেশের মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করেন। ভারত নারী এবং ব্রিটিশ নারীর মধ্যে সামাজিক হৃদ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় না। সকল শ্রেণীর ভারতবাসীদের নিকট হইতে আমি এজন্য সমালোচনা শুনিয়াছি। উভয়-পক্ষেই দোষ-ত্রুটি থাকিতে পারে; কিন্তু ভারতে গিয়া এইসব বিদেশী শুধু নিজেদের চিন্তাতেই থাকিবেন, দেশের সমাজ জীবনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিবেন না, ইহা ভাল বলিতে পারি না।

কিন্তু ভাল মন্দ ও নৈতিক গবেষণা বাস্তব স্বার্থ বিচারের কাছে টিঁকে না। অথচ এমন দৃষ্টি যে বর্তমান জগতে গ্রেট বৃটেন ও আমেরিকার বাস্তব স্বার্থের দিক হইতেও নিরাপদ নয় সেদিন ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী লণ্ডনের একটি বক্তৃতায় সুস্পষ্ট করিয়াছেন। তিনি বলেন—

আমরা আজ শ্বেতাঙ্গ জাতিসমূহকে তাহাদের এই বৈষম্যমূলক দৃষ্টি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছি। তাঁহারা এশিয়া-বাসীর প্রতি এমন দৃষ্টি লইয়া চলিয়া আগুন লইয়া খেলিতেছেন। এতদ্দ্বারা তাঁহারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতেছেন যাহার ফলে অপর একটি যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিবে। ভারত-বাসীদের মধ্যেই এমন দৃষ্টির প্রতিক্রিয়া নিবদ্ধ থাকিবে না, ইহা একটি বর্ণগত যুদ্ধের ভূমি প্রস্তুত করিতেছে। যদি আপনারা চাহেন এই আশঙ্কা এখনও কাটাইতে পারেন। পক্ষান্তরে এই সংকট বৃদ্ধি করিতেও পারেন, সেক্ষেত্রে উহা সত্য যে, আপনাদের তথাকথিত গণ-তান্ত্রিকতার নৌকা এই বর্ণবৈষম্যের চড়ায় লাগিয়া ভরাডুবি হইবে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সত্যই বলিয়াছেন যে, সাম্রাজ্যবাদ যে ক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্যকে ভিত্তি করিয়া প্রশ্রয় পায়, সেক্ষেত্রে তাহা যত সত্বর ধ্বংস হয়, জগতের পক্ষে ততই মঙ্গল।

আমরা দেখিতেছি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্বর্তী বর্ণ-বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে জগতের সমস্ত স্থানের কৃষ্ণাঙ্গ সমাজে ইতিমধ্যে বিশেষ বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে। লণ্ডনের স্বরাজ হাউসে ত্রিনিদাদের বিখ্যাত নিগ্রো সাহিত্যিক মিঃ জর্জ প্যাডমোর এ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতায় বলেন,—

আমরা নিগ্রোরা ভারতবাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাহাদিগকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। নিজেরা নিজেদের সুবিধাও এক্ষেত্রে তুচ্ছ করিয়া থাকি। কিছুদিন পূর্বে ত্রিনিদাদের গভর্নমেণ্ট আমাদিগকে সর্বজনীন ভোটাধিকারের সুবিধাদান করিবেন এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবাসীরা ইংরেজী বলিতে পারে না, এই অজুহাতে তাহাদিগকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। ভারতবাসীদিগকে এইভাবে বঞ্চিত করাতে আমরা নিগ্রো নেতারা ঐক্যবদ্ধ হইয়া এই সুবিধা প্রত্যাখ্যান করিয়াছি।

কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন, এ বিক্ষোভে ফল ফলিবে এবং যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ জার্মানী পরাজিত হইবার পর জাপানের সঙ্গে সব শক্তির সমবেত সংগ্রাম প্রচেষ্টার যখন প্রশ্ন উঠিবে তখন ত্রিশক্তিকে দায়ে পড়িয়া আটলাণ্টিক সনদের পরিপূরক অন্যরূপ ভাষ্য করিতে হইবে। ইউরোপে নিজের শক্তি পাকা করিয়া রুশিয়া তখন এশিয়ার প্রশ্ন সম্পর্কে ইংলণ্ড ও আমেরিকার উপর বেশী চাপ দিতে সমর্থ হইবে। এই প্রসঙ্গে রুশিয়া অতঃপর জাপানের সঙ্গে যোগ দিবে কিনা এই প্রশ্নও উঠে। শুনিতেছি ক্রিমিয়ার বৈঠকে জাপানের সম্বন্ধে কোন কথাই উঠে নাই। রুশিয়া বর্তমানে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে রত নয়, এজন্যই স্ট্যালিন তাহা উত্থাপন করিতে দেন নাই বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন; কিন্তু তাই বলিয়া অতঃপর জাপানের সম্বন্ধে যে রুশিয়ার মনোভাবের পরিবর্তন না ঘটিতে পারে, এমন নয়। রুশিয়ার সঙ্গে জাপানের পাঁচ বৎসরের মেয়াদে যে চুক্তি হইয়াছে, আগামী ২৫শে এপ্রিল কিংবা তাহার দুই দিন আগে পিছে, ঐ চুক্তির মেয়াদ শেষ হইবে। অনেকের ধারণা ইহা বিবেচনা করিয়াই ২৫শে এপ্রিল সান-ফ্রান্সিস্কোতে ত্রিশক্তির পরবর্তী বৈঠকের দিন ধার্য করা হইয়াছে।

সোভিয়েটের ভবিষ্যৎ নীতি

ইতিমধ্যে সাংবাদিক মহলে এইরূপ জল্পনাকল্পনা চলিতেছে যে, ইংলণ্ড ও আমেরিকার সঙ্গে জার্মানীর যাহাতে অবিলম্বে সন্ধির আলোচনা আরম্ভ হয় সেজন্য জাপান ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই-ভাবে জাপান একদিকে সোভিয়েট-বিরোধী একটি শক্তিসঙ্ঘ গঠন করিবার চেষ্টায় আছে, অপর দিকে সে রুশিয়াকে ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে যে, জার্মানী ও জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হইলে ইংরেজ ও আমেরিকা মিলিতভাবে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, এইরূপ মতলবে আছে। 'বিলাতের নিউ লিডার' এই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে ইংরেজ ও মার্কিন গভর্ন-মেণ্ট রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে সেনা সংগ্রহের বিধান প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইবেন। এ বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে এডওয়ার্ড [illegible] নামক খ্যাতনামা শ্রমিক নেতা বলেন—

তৃতীয় যুদ্ধের এইরূপ প্রচেষ্টা যদি সত্যই হয়, তবে তাহা অঙ্কুরে বিনষ্ট করিবার জন্য রাশিয়া ব্যবস্থা অবলম্বনে কোন ত্রুটি রাখিবে না। এই উদ্দেশ্য সন্ধির জন্য জার্মানী পরাজিত হইবার পর এবং জাপানের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিবার আগে এসিয়া এবং আফ্রিকার পরাধীন জাতি-সমূহের উপর নিজের প্রভাব যাহাতে সুদৃঢ় হয়, রুশিয়া তজ্জন্য চেষ্টা করিবে।

এ সম্বন্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেরও যে ইতিমধ্যেই টনক না নড়িয়াছে, এমন নয়। তাঁহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহিমা কীর্তনের জন্য আমেরিকায় কিভাবে প্রচারকার্য চালাইতেছেন, নানা সূত্রেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সেদিন ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে ভারত গভর্নমেণ্ট হইতে আমেরিকায় এই ধরণের প্রচারকার্য চালানো হয় কিনা, এই বিষয়ে একটি প্রশ্নের উত্তরে সরকারের পক্ষ হইতে স্যার মহম্মদ ওসমান উত্তেজিত ভাষায় বলেন—

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের ন্যায় ব্যক্তিরা আমেরিকায় গিয়া এই ধরণের প্রচারকার্য চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে ধর্ম সম্প্রদায়গত কোন বিরোধ নাই এবং ব্রিটিশই ভারতবাসীদের মধ্যে ভেদ বৈষম্যের সৃষ্টি করিতেছে। তাঁহারা আরও বলিতেছেন যে, ভারতীয় সৈন্যেরা উদারান্নের দায়ে লড়াই করে। এমন অবস্থায় ভারতের সম্বন্ধে মার্কিনবাসী-দিগকে খাঁটি খবর জানাইবার যে প্রয়োজন আছে ইহা অস্বীকার করা চলে কি?

ভারত গভর্নমেণ্টের পররাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটারী স্পষ্ট ভাষাতেই একথা স্বীকার করেন যে, ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে মার্কিনস্থ ভারতের এজেণ্ট জেনারেল প্রচারকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। এই প্রচার সূত্রে ভারতের সম্বন্ধে কিরূপ সত্য বিবরণ প্রদান করা হয়, স্বর্গীয় কস্তুরবার সম্বন্ধে স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ীর প্রদত্ত বিবৃতিতেই আমরা সে পরিচয় কিঞ্চিৎ পাইয়াছি।

'হিন্দুস্থান টাইমস' পত্রের নিজস্ব সংবাদদাতা সম্প্রতি স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ীর এই প্রচারকার্যের স্বরূপ কিছু মুক্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

আমি ভারত গভর্নমেণ্টের আমেরিকাস্থ এজেণ্ট-জেনারেল স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তাঁহার মত একজন শিক্ষিত এবং প্রতিভাবান ব্যক্তি কিভাবে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত বিবৃতিপূর্ণ পুস্তক ও ইস্তাহারসমূহ প্রকাশ করিতে সম্মত হন? তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলেন,—আমি কোন বই-ই পড়িয়া দেখি নাই অথবা প্রচারমূলক কোন পুস্তক-পুস্তিকার তথ্য বিচার করি নাই। আমি শুধু বিলে সহি দিয়াছি মাত্র। গবর্নর জেনারেল শাসন পরিষদের এই ভূতপূর্ব সদস্যমহাশয়ের কিভাবে নিজের নির্দোষিতা প্রতিপন্ন করিতে-ছেন, পাঠকগণ বুঝিতেই পারিবেন। তাঁহাকে কি শুধু সহি দিবার জন্য বেতন দেওয়া হয়?

তিনি চোখ বুজিয়া এমনভাবে সহি করেন কেন? বাজপেয়ী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ভারতের বিরুদ্ধে এবং ভারতের নেতাদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার পৃষ্ঠাপূর্ণ কাগজপত্র ভারতীয় করদাতাদের পয়সায় বিলি করা হইতেছে।

বাঙলাদেশের সম্বন্ধে আমেরিকায় কিরূপ প্রচারকার্য চালানো হইতেছে, সে বিষয়ে সংবাদদাতা বলেন—

বাজপেয়ীর আমলে সব চেয়ে বড় কাজ হইল তাঁহার কানাডা পরিদর্শন। সেখানে গিয়া তিনি কানাডার প্রধান মন্ত্রীর নিকট বলেন যে, ভারতে প্রকৃতপক্ষে খাদ্যাভাব ঘটে নাই এবং ভারতের মজুতদারেরাই সেখানকার দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী, নতুবা সেখানে যথেষ্ট খাদ্যই ছিল। কানাডার গভর্নমেণ্ট ভারতের জন্য খাদ্য সাহায্য পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন, এইভাবে প্রচারকার্যের দ্বারা বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করা হয়। কালিফোর্ণিয়ার পাঞ্জাবী কৃষকদের এক সভায় বাজপেয়ী মহাশয় বলেন, বাঙালীরা চিরকালই দুর্ভিক্ষে মরে; বাঙলার দুর্ভিক্ষ একটা অসাধারণ কিছু নয়। তিনি ধিক্কৃত হইয়াছিলেন; বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সভা হইতে পলায়ন করিতে হয়।

উক্ত সংবাদদাতা বলেন, ভারতের বিরুদ্ধে এই শ্রেণীর মূল্যবান প্রচারকার্য চালাইবার উদ্দেশ্যে স্যার গিরিজাশংকরকে বৎসরে প্রায় দুই লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়া থাকে। এই টাকার জন্য তাঁহাকে ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয় না। স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী ওয়াশিংটনের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম প্রাসাদোপম বাড়িতে অবস্থান করেন। এই বাড়িতে শর্মা মিশনের সদস্যদের মত ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সমর্থক বন্ধু-বান্ধবদিগের খানা দিবার জন্য হাজার হাজার টাকা ব্যয় করা হয়।'

স্যার গিরিজাশংকরের এই নবাবী চালের পক্ষে যুক্তিস্বরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচার করা হয় যে, তিনি ভারতের একজন প্রসিদ্ধ ধনী ব্যক্তি। সম্প্রতি ওয়াশিংটনের 'ডেলি নিউজ' পত্র তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

কলিকাতার কাছে স্যার গিরিজাশঙ্করের প্রাসাদ আছে। এমন সুন্দর বাড়ি ভারতে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার উদ্যানে ৫০ হাজারের বেশী গোলাপের কুঞ্জ আছে, বহু বিঘা জমির উপর প্রস্ফুটিত স্থলকমলদল শোভা বিস্তার করিতেছে। এই উদ্যানের কুসুমনিচয়ের সৌরভ ওমর খৈয়ামকেও উদ্দীপ্ত করিবে। ভবিষ্যতে ভারত ভ্রমণে যাঁহারা যাইবেন, তাঁহারা এই স্বপ্নপুরী দেখিতে ভুলিবেন না।

সেদিন মিসেস রুজভেল্ট মার্কিন জাতিকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন, মার্কিন জাতি তাহাদের প্রেসিডেণ্টের জন্য প্রার্থনা করে, কিন্তু শুধু তাহা না করিয়া শাসন বিভাগে যাহারা প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহাদের সকলের জন্য কেন প্রার্থনা করে না? তাঁহারা মানব স্বভাবসুলভ অনেক প্রলোভনের কারণের মধ্যে থাকিয়াও গুরুতর ভার বহন করিতেছেন। সকল প্রলোভনের ঊর্ধ্বে উঠিয়া দেশের জন্য কর্তব্যপালন করিবেন, তাহাদিগের নিকট হইতে এই আশা করা যাইতেছে। অধিকাংশ মানুষের পক্ষে ইহা সম্ভব নয়। আসুন, আমরা তাঁহাদিগকে সাহায্য করি এবং তাঁহাদের জন্য প্রার্থনা করি।'

স্যার গিরিজাশঙ্কর প্রভৃতির জন্য আজ আমাদের অন্তর চিরিয়া এই প্রার্থনা উত্থিত হইতেছে।

এম এন রায়ের আয়

কিন্তু শুধু প্রার্থনাই নয়। দেহধারী জীব আমরা, কামনাও কিছু মনে জাগে। ওয়াশিংটনের 'ডেলী নিউজ' বিদেশী বিশিষ্ট ভাগ্যবানদিগকে স্যার গিরিজাশঙ্করের স্বপ্নপুরী পরিদর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। অথচ আমরা এই কলিকাতা সহরে থাকিয়া এদিকে ওদিকে তাকাইতেছি এবং সেই স্বপ্নরাজ্যে উড়িয়া যাইবার জন্য আমাদের ন্যায় হতভাগ্যদেরও সাধ হইতেছে। সরকারী প্রচার কার্যের এমনই মহিমা! নিজেদের কাজ বাগাইবার উদ্দেশ্যে দেশের জনমতের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করিবার আর এক কৌশল এম এন রায়ের দলকে অর্থ সাহায্য প্রদান প্রসঙ্গ হইতে ব্যক্ত হইয়াছে। ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস হইতে সম্প্রতি এম এন রায়ের দলের দুইজনের নাম খারিজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের পরিবর্তে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দুইজন সদস্যকে লওয়া হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিলাতের শ্রমিক দলও রায়ের দলের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন, জগতে পরাধীন কোন দেশেই শ্রমিক দলের প্রতিনিধিস্থানীয় কোন প্রতিষ্ঠান সরকার হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করেন না। মিঃ এম এন রায় সরকার হইতে কত সাহায্য পান, 'ন্যাশনালিস্টে'র দিল্লীর সংবাদদাতা তাহার একটা হিসাব দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, মিঃ এম এন রায়ের আয় সম্ভবত ভারতবর্ষের বড়লাটের চেয়েও বেশী। বাজেটের বরাদ্দ অনুসারে বড়লাট বার্ষিক ২,৫০,৮০০ টাকা বেতন পান; পক্ষান্তরে মিঃ রায়ের আয় বার্ষিক ২,৭৫,০০০ টাকা বলিয়া মনে হয়। মিঃ রায়ের আয়ের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত হিসাব পাওয়া গিয়াছে,—ভারত গভর্নমেণ্ট হইতে প্রদত্ত আর্থিক সাহায্য মাসিক ১৩০০০ টাকা, যুক্তপ্রদেশের গভর্নমেণ্ট কর্তৃক আয় মাসিক ৭ হাজার টাকা এবং অন্যান্য সর্বত্র আয় মাসিক ২৫০০ টাকা—সর্বসাকুল্যে আয় বার্ষিক ২,৭৫০০০ টাকা মাত্র।

বিশ্ব মানবের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিকতার সাধনায় ভারত গভর্নমেণ্টের এ হেন তৎপরতা দেখিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহিমায় কোন মূঢ় অনুপ্রাণিত না হইবে?

দারিদ্র্যের সমস্যা

কিন্তু অন্নচিন্তা চমৎকারা; ইহার উপর বস্ত্র ও ইন্ধনের চিন্তায় চোখে অন্ধকার সৃষ্টি হইতেছে; সুতরাং আমরা গিরিজাশংকরের উদ্যানের ফুলকুলের সৌরভ কিম্বা মানবেন্দ্র রায়ের সৌভাগ্যের গৌরব [illegible] করিব কেমন করিয়া। কয়লাকে 'কালোমাণিক' বলিয়া পূর্বে গৌরবাখ্যা প্রদান করা হইত; এখন কলিকাতা শহরের ধনিকদের কাছেও কয়লা মাণিকের চেয়েও বেশী আদরের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। শুনিতেছি শহরে এই কয়লা অভাবের জন্য মালগাড়ির অভাবই আংশিকভাবে দায়ী। অথচ সেদিন ভারত সরকারের ওয়ার ট্রান্সপোর্ট সদস্য স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল রেলওয়ে বাজেট উপস্থিত করিতে গিয়া আমাদিগকে দম্ভভরে এই কথা শুনাইয়াছিলেন যে, যানবাহনের এমন সুব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, ১৯৪৪ সালের পরে এ দিকের ত্রুটির জন্য কোন লোককে আবশ্যক জিনিসপত্রের অভাবে কষ্ট পাইতে হয় নাই। সত্যের অপলাপ ইহা অপেক্ষা অধিকতর হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি না। ইহার পর কাপড়ের সঙ্কট। সে কথা না তোলাই ভাল। কাপড়ের চোরাবাজার দমনে সরকারী বহু হুঁসিয়ারীর পর এখন সহর ও মফঃস্বল সর্বত্র বাজার হইতে সর্বপ্রকার মিলের কাপড় উধাও হইয়াছে। চোরাবাজার ছাড়া কাপড় মিলিতেছে না। শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে স্যার আজিজুল হকও চোরাবাজারী এই বাহাদুরীতে বাঙলার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। চোরাবাজার সবল ও সচল এবং সরকারী সকল চেষ্টাই এক্ষেত্রে বিফল দেখা যাইতেছে। এমন কি সরকারী নির্দিষ্ট দোকানেও কাপড়ের অভাব—ক্বচিৎ কোথায় যদি মিলে জীবন বাঁচাইয়া তাহা দোকান হইতে সংগ্রহ করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব হয় না। এই সব দেখিয়া সত্যই মনে হয় যে, ক্রীতদাসের জীবনে সুখশান্তি বিধান করিবার সামর্থ্য কোন সদাশয় প্রভুশক্তিরও নাই। এক্ষেত্রে আমাদের দুঃখ প্রশমনকল্পে সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি প্রদানের আয়াস সরকার যদি স্বীকার না করেন, তবেই ভাল হয়। তথাপি প্রতিশ্রুতি আসিতেছে। সেদিন নিউইয়র্কে বক্তৃতাকালে ওয়াশিংটনস্থ ব্রিটিশ দূত মিঃ হ্যারল্ড বাটলার বলিয়াছেন যে, যুদ্ধান্তে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিবার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, তাহা অবশ্যই প্রতিপালিত হইবে। —"হনোজ দিল্লী দূর অস্ত্"। দিল্লী এখনও বহু দূরে।

কলিকাতায় কংগ্রেসমণ্ডপী চিত্রাবলী প্রদর্শনী

হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধী যখন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু মহাশয়কে প্রদর্শনীমণ্ডপ সজ্জার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, তখন কোনো কোনো শিল্পরসিক ইহাকে 'একই ভাবে ভারতের শিল্প ও ভারতের আধুনিক শিল্পপ্রতিভার অপমান' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, 'কংগ্রেসের রাংচিত্তিরের বেড়া চিত্রিত করিবার মজুরিতে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রতিভাকে জুড়িয়া দেওয়া হইল, ইহাতে আমাদের বিবেকবুদ্ধিতে বাধিল না; কংগ্রেসের বেড়া চিত্রিত করিবার ডাক দেশের শিল্পীর উপর দেশবাসীর চরম পেট্রনেজ !'

বস্তুত, শিল্পসাধকদের সম্বন্ধে দেশবাসীর তথা দেশনায়কদিগের ঔদাসীন্যের বেদনায় ও অভিমানে দৃষ্টি আচ্ছন্ন না হইলে তিনি বুঝিতে পারিতেন, দেশের শ্রেষ্ঠ অধিনায়ক কর্তৃক দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর প্রতি এই আহবান, ভারতের আধুনিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় ঘটনা এবং মহত্তর সম্ভাবনার প্রথম সূচনা। দেশের মুক্তিকামী নেতা শিল্পীর নিকট সহযোগিতা প্রার্থনা করিলেন—চরখা কাটিবার বা খদ্দর ফেরি করিবার জন্য নহে, শিল্পীর আপন ক্ষেত্রেই এই সহকারিতার প্রার্থনা; যে লোকোত্তর প্রতিভা তাঁহার, জনজাগরণের আয়োজনে তাহাই পরিবেষণ করিবার জন্য এই আহবান। ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রে শিল্পীর যে সম্মানের আসন রচিত হইবে, এই আমন্ত্রণের মধ্যে তাহারই সূচনা দেখিয়া শিল্পী ও শিল্পরসিকদের আনন্দিত হইবার কারণ আছে।

সুখের বিষয়, অন্যে ভুল বুঝিলেও *নন্দলাল স্বয়ং ভুল বুঝেন নাই, এই ডাকে তিনি যথোচিত সাড়া দিয়াছিলেন।* বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থায়, চিত্রকলা ধনী বা বিদগ্ধ মুষ্টিমেয় কয়েকজনেরই ভোগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একথা যদিও কার্যত তাঁহাকেও মানিয়া লইতে হইয়াছে, তবু তিনি জানেন সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শিল্পকলা দৃঢ়মূল ও দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না; জনগণের সহিত যোগ স্থাপনের এই উপায়কে তিনি উপেক্ষা করিলেন না—অল্পকালের মধ্যে বহু বহু চিত্র আঁকিয়া কংগ্রেস মণ্ডপ সাজাইয়া দিলেন; তাহারই পঞ্চাশখানি কলিকাতায় এই প্রদর্শনীতে দেখানো হইতেছে।

বলা বাহুল্য, এই চিত্রগুলিই যে নন্দলালের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এমন নহে—যে মণ্ডপসজ্জার উদ্দেশ্যে এই চিত্রগুলি লিখিত হয় তাহাতে সুশিক্ষিত মনের আয়ত্তগম্য প্রতিভার নিদর্শন দিতে গেলে উদ্দেশ্যই বিফল হইতে পারিত। এই চিত্রগুলিতে সর্বাপেক্ষা *যাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, তাহা শিল্পীর উল্লাস;* নানা শিল্পরীতি নানা টেকনিকের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে কিন্তু সে-সকল চাতুরী প্রয়োগের স্থান এ নহে; তুলির গতিমুখে, রেখার বঙ্কিমগতিতে বলিষ্ঠতায় এই উল্লাস









যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, নৃত্য করিয়া উঠিয়াছে: চিরকাল ধরিয়া লোকশিল্পের যে ধারা জনমনকে আনন্দ দিয়াছে প্রধানত সেই ধারাই এই চিত্রগুলির মূলে; কংগ্রেসক্ষেত্রে সমবেত বিশাল জনসমুদ্রকে কল্পনা করিয়া, জনগণের জীবনযাত্রার সুপরিচিত দৃশ্যগুলিকে এই চিত্রাবলীতে তিনি সমাহরণ করিয়াছেন—সংগীতমত্ত গ্রামের বাউল; বাদ্যনিরত খোলন্দাজ; ঢেঁকিশালে গ্রামবধূ; সূতা কাটিতে নিরত রমণী; মন্দিরদ্বারে প্রণতা নারী—এইরূপ কত দৃশ্য! লোকশিল্পের বহিরঙ্গকে গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত অতি আধুনিক য়ুরোপীয় চিত্রভঙ্গীর মিশল দিয়া রচিত দুর্বোধ্য ছবি এগুলি নয়, দুর্বোধ্য হইলে এই-গুলি রচনার কোন সার্থকতা থাকিত না। —শ্রী

প্রদর্শনীক্ষেত্র: ২৩, ওয়েলিংটন. স্ট্রীট, কলিকাতা। **সময়:** আরম্ভ ২২ ফেব্রুয়ারী, সন্ধ্যা ৬টা; ২৩ ফেব্রুয়ারী হইতে ২৮ ফেব্রুয়ারী। প্রত্যহ বেলা ২টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত।





মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও হরটীকালচার

হেমেন্দ্রলাল গুহ (টাটা গার্ডেনস্)

ভারতবর্ষে অন্যান্য অনেক যুদ্ধরত দেশের ন্যায় যুদ্ধোত্তরকালীন সংগঠন নীতি, প্রণালী ও ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা ও পরিকল্পনা সুরু হয়েছে। বাঙলা সরকারের কৃষি ও উন্নয়ন কমিশনার রায় বাহাদুর এন সি সেন এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও ধনকুবের মিঃ জে আর ডি টাটা, স্যার পুরুষোত্তম দাস প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দের বক্তৃতা ও প্রকাশিত প্রবন্ধ ইত্যাদি হতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ভারতবর্ষও অন্যান্য অনেক যুদ্ধরত দেশের ন্যায় যুদ্ধপরবর্তীকালীন সংগঠন নীতি, প্রণালী ও ব্যবস্থা বিষয়ে চিন্তাশীল ও আগ্রহান্বিত। এদের পরিকল্পনা কার্যকরী হলে খাদ্যশস্যের অল্পতা দূরীভূত হয়ে কৃষির প্রায় দ্বিগুণ ও শিল্পের পাঁচগুণ উন্নতি সম্ভবপর হবে। কৃষক ও কারখানার শ্রমিক ও কারিগরদের মাঝে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কথা এরা যেন ইচ্ছা করেই চিন্তার বাইরে রেখেছেন। অথচ এদের উপযুক্ত কার্যসংস্থানের ব্যাপার নিয়ে দেশীয় নেতৃবৃন্দের ও রাজনীতিবিশারদদের পক্ষে কিছুদিন যাবৎ একটা বিপজ্জনক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বর্তমান যুদ্ধে তার একটা সাময়িক সমাধান হলেও যুদ্ধোত্তরকালে এদের অবস্থা কি দাঁড়াবে সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় কি?

এটা নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে যে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই দেশের ক্রমবর্ধমান উন্নত চিন্তাধারার ধারক ও বাহক। কাজেই যুদ্ধপরবর্তীকালীন কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বিধায়ক যে কোন কর্মপন্থাই এদের দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়ে পারে না। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারী গবেষণাগারসমূহের অনুসন্ধিৎসাজাত ও গবেষণামূলক কার্যাদির ফলসমূহ এদের ভেতর দিয়েই সাধারণ ও নিরক্ষর চাষীদের বোধগম্য ও কার্যকরী করাতে হবে। কাজেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে এদিকে আকৃষ্ট করা দরকার। এবং তা করতে হলে হরটিকালচার দ্বারাই সম্ভব। যে বুদ্ধিবত্তা, জ্ঞান, ধৈর্য, অধ্যবসায় ও কার্যকুশলতার দ্বারা একে সাফল্যমণ্ডিত করা চলে তা এদের ভেতরেই আশা করা যায়।

যে কোন সভ্য, স্বাধীন ও উন্নতিশীল জাতীয় খাদ্যতালিকার দিকে লক্ষ্য রাখলে এটা বিশেষ করে প্রতীয়মান হবে যে ফল ব্যতিরেকে কোন সম্পূর্ণ ও সমতামূলক খাদ্যতালিকা প্রস্তুত হতে পারে না। কারণ, ইহা ব্যক্তিগত সাধারণ স্বাস্থ্য ও ক্রমবর্ধমান দেহ গঠনে সাহায্য তথা জাতীয় স্বাস্থ্য উন্নততর করে। ইহা অর্থকরী এবং আনন্দদায়কও বটে। সব দিক থেকে বিবেচনা করলে মধ্যবিত্ত সম্পদায়ভুক্ত যুবকদের একে জীবিকা (profession) হিসাবে গ্রহণ করা বিশেষভাবে যুক্তিসহ বলে মনে হয়। সরকার এ বিষয়ে কিছুটা আগ্রহশীল হয়ে তার কৃষি বিভাগের মারফৎ সমস্ত কিছু সুযোগসুবিধা নিয়ে উপস্থিত হলে শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় আশা করি সানন্দে একে অভ্যর্থনা করে নেবেন এবং নিজের জীবনকে অঙ্গাঙ্গী ও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলতে দ্বিধাবোধ করবে না।

হরটিকালচার দু প্রকারে কার্যকরী করা হয়, বাগিচা ও চাষ প্রথায়। কর্মীর কার্যক্ষমতার সঙ্গে কয়েক বিঘা জমি ও সামান্য পুঁজি প্রথম প্রথম কার্যকরী করতে প্রয়োজন কিন্তু, পরবর্তীটির জন্য বৃহৎ ভূমিখণ্ড, নানা প্রকার যন্ত্রপাতি, অধিক মূলধন এবং বিশেষ করে শিক্ষিত কর্মীবৃন্দ আবশ্যক। ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ একর কর্ষণোপযোগী জমি ভারতে পতিতাবস্থায় এখনও আছে। যার একটা বৃহদংশ এই ব্যবস্থায় উদ্ধার করে দেশের শিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধান তথা জাতীয়-অর্থের উন্নতি বিধান হ'তে পারে। কিন্তু, প্রত্যেক গ্রামে কিছু না কিছু অযত্নেপালিত জঙ্গলা পতিত জমি আছে যা প্রত্যেক পরিবারে তথা গ্রামের স্বার্থে বাগিচায় পরিণত করা বিশেষভাবে দরকার হ'য়ে পড়েছে।

জনসাধারণের ভেতর একটা ভুল ধারণা বদ্ধমূল আছে যে ফলচাষে রোজগার আসে বড় দেরীতে। কিন্তু, এটা ভুললে চলবে না যে অনেক ফল আছে যার চাষে ৬ থেকে ১৮ মাসে ঘরে টাকা তোলা যেতে পারে যেমন—তরমুজ, ফুটি, খরমুজ, খিরাই, শশা, টমেটো, পেঁপে, আনারস, কলা ইত্যাদি। অনেক ফল ৩।৪ বছরে তৈরী হয়, যেমন—কুল—দিশী ও বিলাতি, আতা, নোনা, পেয়ারা, নেবু, পাতি, কাগজী, কলম্বাক, জাম্বুরা—বাতাবী ইত্যাদি; আম, কমলা, লিচু, নারিকেল, পিচ, বিলিতি গাব, গোলাপ জাম, জামরুল, জাম, কদবেল, সফেটা ইত্যাদি। যে সকল গাছ লাগাবার অনেক দিন পরে ফলপ্রসূ হয় তাদেরকেও আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞান সাহায্যে নিম্নলিখিত উপায়ে ৩।৪ বছরে ফলপ্রসূ ও অর্থকরী করে তোলা যায়। যেমন কলম জোড়কলম গুটিকলম বাডিং লেয়ারিং ইনুসারটিং ইত্যাদি এবং বারংবার স্থানান্তরিত করণ দ্বারা।

এটা যখন সত্য যে বহুল পরিমাণে নানা জাতীয় ফল সহরের জন্য প্রয়োজন তখন এর চাষ সহরের কয়েক মাইলের মধ্যে গড়ে ওঠাই বাঞ্ছনীয় এবং তাতে করে সহরবাসী সহজে ও শীঘ্র প্রয়োজনানুযায়ী তাজা ও টাটকা সরবরাহ পাবেন।

বৃহদাকারে বিস্তৃত জমিতে ফলের চাষ করতে গেলে সহর থেকে দূরে করাই যুক্তিসংগত। তবে মাল পাঠাবার জন্য রেল নদী বা ভাল রাস্তার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

ফলের চাষ দু একর অথবা তদূর্ধ্ব পরিমাণ জমিতে সুরু করা চলে। উপরোক্ত যেকোন প্রথায়ই করা হোক না কেন প্রথম কাজ হচ্ছে জমিটাকে উত্তমরূপে ঘেরা। একাজের জন্য দেশী ও বিদেশী বেড়া-গাছের (hedgeplants) অভাব নেই। জন্তু জানোয়ার এমন কি মানুষের দিক থেকে এইভাবে প্রস্তুত হয়ে জলের ব্যবস্থা কুয়া ইন্দারা ইত্যাদি জমির এখানে ওখানে আবশ্যকানুযায়ী খনন দ্বারা সমাধান প্রয়োজন। কলম চারা লাগাবার পূর্বে কোন কৃষিবিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ বিশেষভাবে যুক্তিসংগত। তিনি মাটীর প্রকৃতি, জমির অবস্থান, আবহাওয়া ইত্যাদি বিবেচনা করে যে বা যে যে ফলের চাষের পরামর্শ দেন তাহা গ্রহণ করা কর্তব্য। অনেকে হয়ত মনে করবেন জায়গা যখন সামান্য তখন যত বেশী গাছ লাগান যায় ততই ভাল, কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে, গাছপালাও মানুষের ন্যায় আলো হাওয়া জল যথেষ্ট জায়গা ইত্যাদি অর্থাৎ সমস্ত রকমের সুখ-সুবিধা সুস্থভাবে বাঁচবার ও বিশেষ করে বৃদ্ধি পাবার জন্য দরকার করে। অল্প জায়গায় বেশী গাছ লাগালে যে ফল পাওয়া যাবে তার থেকে প্রত্যেক গাছকে যুক্তিসংগতরূপ স্থান উভয় দিকে (গাছ থেকে গাছ ও লাইন থেকে লাইন) ছেড়ে দিলে প্রতি গাছে অধিক ফলন ত' হবেই অধিকন্তু চারাগাছ কেনবার খরচাও বাঁচবে। সার প্রয়োগ ব্যাপারটা কেউ যেন বাজে খরচ মনে না করেন। বিশেষ জাতীয় গাছের জন্য উপযুক্ত ও প্রয়োজনানুরূপ সার ব্যবহার না করে উপযুক্ত পরিমাণ ফল আশা করা ঠিক অনেকটা তেমনিধারা কথা হবে যেমন অনেক ভাববিলাসী আজীবন অর্ধাহারী (কাজে কাজেই জীবনীশক্তিহীন) ভারতীয় কৃষকের পূর্ণাহারের ব্যবস্থা না করে তার কাছ থেকে ষোল আনা কাজের আশা রাখেন এবং স্বাধীন দেশের কৃষকদের সঙ্গে তুলনামূলক সমালোচনা করে মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, সে কর্মবিমুখ

আলস্যপরায়ণ ফাঁকিবাজ ইত্যাদি এমনতর আরো অনেক কিছু। মানুষের দেবতা এই জ্ঞান-পাপীদের অর্থাৎ এই জেনেও না-জানাদের জন্য অভিসম্পাত না আশীর্বাদ বুক (book) করে রাখছেন তা তিনিই জানেন! তবে গাছপালা জগতের অতি-সামান্য অভিজ্ঞতা থাকায় যাঁরা উৎসাহী ও আগ্রহশীল তাঁদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি এভুল বা দুরাশা যেন তাঁরা না করেন। উৎসাহী কর্মীর নিজের বাগানকে সুন্দর সুশোভিত ও ষোলআনা ফলপ্রসূ করে তোলবার জন্য উপরোক্ত বিষয়সমূহ ব্যাতিরেকে আর কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। মাঝে মাঝে লাঙ্গল বা কোদাল দ্বারা চাষ, ঘাস আগাছা ইত্যাদি পরিষ্কার, প্রতি গাছের ওপর সন্দেহ-দৃষ্টি অর্থাৎ পোকামাকড় ইত্যাদির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে কিনা লক্ষ্য করা এবং তেমন কিছু দৃষ্টিগোচর বা সন্দেহ হলে নিজের বুদ্ধিবিদ্যায় না কুলালে জেলার কৃষি অফিসারের সঙ্গে আলাপআলোচনা করা ও সত্বর প্রতিকার ব্যবস্থা করা।

অনেকের কাছে হয়ত ফসল বিক্রী-করা (marketing) ব্যাপারটা আর একটা সমস্যা ব'লে প্রতীয়মান হ'তে পারে। কিন্তু যারা, এ বিষয়ে একটু খোঁজ খবর নেন বা রাখেন অর্থাৎ বাগান থেকে ফল সংগ্রহ করা থেকে জাতি বর্ণ ওজন ইত্যাদি অনুযায়ী গুণানুসারে চুপড়ি-বন্দীকরণ ও সহরে আনয়ন অবধি তাদের চিন্তিত হবার কোন কারণ থাকতে পারে না। এক সম্প্রদায়ের লোক আছে যাদের "ব্যাপারী" বলা হয় তাদের জীবিকাই এই। ঋতু অনুযায়ী ফলের গাছ পুষ্পিত হবার সঙ্গে মধুমক্ষিকা প্রজাপতি ইত্যাদির দল যেমন কর্মব্যস্ত হয়ে ওঠে, তেমনিধারা "ব্যাপারীর" দলেও প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয় ফলন্ত বাগান ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে। এমন কি তারা আগামমূল্য দিয়ে শেষ ফলটি অবধি সংগ্রহ করে নিজেদের লোক পাহারাদার নিযুক্ত করে পক্ষীকুল ও দুষ্ট প্রকৃতি লোকের বিরুদ্ধে।

বিজ্ঞানের কথা

ডি-ডি-টী ও এরোসল

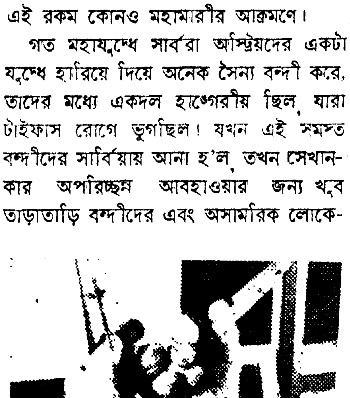
শ্রীঅমরজ্যোতি সেন

কতকগুলি বিশেষ প্রকারের রোগ আছে যাদের বলা হয় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ব্যাধি (Tropical Disease), যেমন ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, পীতজ্বর, প্লেগ, ফাইলেরিয়া, কুষ্ঠ, টাইফাস, ঘুমন্ত রোগ, আমাশয় ইত্যাদি। এই সমস্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় পৃথিবীর গ্রীষ্মপ্রধান দেশে। এই সব দেশের স্বকীয় জলবায়ু ব্যতীত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, অপরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যব্যবস্থা এইসব পীড়ার জন্য দায়ী। এই পীড়াগুলির বাহক হল এমন সব পোকামাকড়, যারা সব সময়েই আমাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, যেমন—মশা, মাছি, উকুন, ছারপোকা আরও কত কি। একা মশা যত লোক মারতে পারে, এত লোক বোধ হয় খুব কম যুদ্ধেই মারা যায়। আমাদের বাঙলা দেশেই শুধু লক্ষ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় মারা যায়। ম্যালেরিয়ার বাহক স্ত্রী অ্যানোফিলিস ইতিহাসের পাতায় কত অলিখিত কাহিনী রেখে গেছে।

পুরাকালে আসীরিয়ার রাজা সেনাচেরিব যখন জেরুসালেম আক্রমণ করেন, তখন পথে জর্ডন নদীর উপত্যকায় এক রাত্রে তাঁর কয়েক সহস্র সৈন্য মারা যায়। তখনকার লোকেরা অবশ্য ভগবানের দূতকেই এর জন্য দায়ী করেছিল; কিন্তু ভগবানের দূত যে কে তার উত্তর পাওয়া গেল বহু বৎসর পরে গত মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৭ সালে ঐ জেরুসালেম শহরেই। এক রাত্রে কয়েকশত সৈন্য ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় মারা যায়। শোনা যায় নেপোলিয়ন এই ম্যালেরিয়ার জন্যই ইজিপ্ট এবং প্যালেস্টাইন জয় করতে পারেন নি। ম্যালেরিয়াই তাঁর জয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পানামা খাল খননের সময় কত হাজার লোক ম্যালেরিয়া এবং পীতজ্বরে মারা যায় তার হিসেব দেওয়া শক্ত, কেউ বলে বিশ হাজার, কেউ বলে পঞ্চাশ। সগর রাজার যে ষাট হাজার পুত্র মারা গিয়েছিল সে বোধহয় এই রকম কোনও মহামারীর আক্রমণে।

গত মহাযুদ্ধে সার্বরা অস্ট্রিয়দের একটা যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে অনেক সৈন্য বন্দী করে, তাদের মধ্যে একদল হাঙ্গেরীয় ছিল, যারা টাইফাস রোগে ভুগছিল। যখন এই সমস্ত বন্দীদের সার্বিয়ায় আনা হ'ল, তখন সেখানকার অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়ার জন্য খুব তাড়াতাড়ি বন্দীদের এবং অসামরিক লোকে-



বাঁ হাতে ডিডিটির এরোসল দেওয়া হয়েছে, কোনো মশা বসেনি

দের মধ্যে টাইফাস ছড়িয়ে পড়ে ও এক ভীতিজনক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল।

বর্তমান সেনাপতিরা কিন্তু তাদের সৈন্যদের এমন কুকুর বেড়ালের মতো মরতে দিতে রাজি নয়, তাই রক্তাধানের এমন চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের সুখাদ্য খাওয়াবার, পরিচ্ছন্ন রাখবার আর সর্বদা তাদের মারাত্মক ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করবার।

বর্তমান যুদ্ধ চলেছে পৃথিবীর এমন কতকগুলি দেশে যেগুলি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ব্যাধির ডিপো, যেমন আসামের ও বর্মার জঙ্গল, নিউগিনি, সলোমন দ্বীপ, ফিলিপাইনস্, উত্তর আফ্রিকা এবং আরও কত দেশ। উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব হলে এই সব দেশে যুদ্ধে যত লোক না মরবে তার চেয়ে অনেক বেশী লোক মরবে রোগের আক্রমণে। অথচ এই রকমভাবে সৈন্যক্ষয় মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। ম্যালেরিয়ার যে দু'টি প্রধান শত্রু কুইনিন ও অ্যাটেব্রিন দুটিই শত্রুর আয়ত্তে এবং যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ফলে তা বন্ধ হ'ল। পাইরিথ্রাম ফুল যা ফ্লিটের মতো স্প্রে অথবা মশার ধূপ তৈয়ারী করার উপাদান তাও আবার হয় জাপান এবং তারই অধিকৃত চীনদেশের কতকগুলি অঞ্চলে। এখন অবশ্য আফ্রিকার কেনিয়া প্রদেশে এবং আমাদের ভারতবর্ষেও পাইরিথ্রাম (চন্দ্রমল্লিকার সমজাতীয়) ফুলের চাষ হচ্ছে।

অবস্থা যখন এই রকম তখন আমেরিকান বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফলে মশা ও তার কতকগুলি অনুচরদের ধ্বংস করবার ঔষধ পাওয়া গেল যার মধ্যে প্রধান হল ডি ডি টি এবং "এরোসল।"

সালফানিলঅ্যামাইড অথবা পেনিসিলিনের আবিষ্কারের সঙ্গে সমান কৃতিত্ব দেওয়া যায় ডি ডি টি'র আবিষ্কারকে; কারণ এর সাহায্যে আমরা আমাদের দৈনন্দিন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়াও কতকগুলি মারাত্মক ব্যাধির হাত থেকে আমাদের নিশ্চিত বাঁচাতে পারব।

ডি ডি টি'র আসল রাসায়নিক নাম হ'ল ডাইক্লোরো ডাইফিনাইল ট্রাইক্লোরোইথেন; কিন্তু অতবড় নাম সহজে অথবা চট্ করে বলা যায় না ব'লে এর ডাকনাম দেওয়া হয়েছে D D T। প্রায় সত্তর বৎসর আগে



তাঁবু থেকে ছারপোকা তাড়াবার জন্য এরোসল বোমা থেকে এরোসল প্রয়োগ করা হচ্ছে।

একজন জার্মান রাসায়নিক প্রথম ডি ডি টি বিশ্লেষিত করেন। কিন্তু সম্ভবত তিনি আবিষ্কারের মূল্য এবং প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন নি। ১৯০৯ সালে সুইটজারল্যান্ডের একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কীটনাশক হিসাবে ডি ডি টি বিক্রয় করতেও আরম্ভ করে।

ডি ডি টিকে নতুন করে' আবিষ্কার করলেন, পার্লহারবার ঘটনার পর আমেরিকা যুক্তরাজ্যের সমর বিভাগের সার্জন জেনারেল ও কৃষি বিভাগ। এই আবিষ্কারের ফলে বাস্তবিকই তাঁরা সৈন্যদের অনেক প্রকার ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। 'এখন আমেরিকার ডু পণ্ট প্রচুর পরিমাণে ডি ডি টি পাউডার তৈয়ারী করছে।

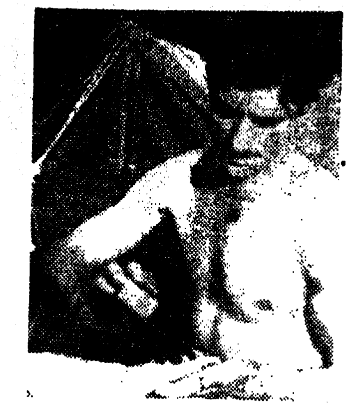
অনেক দিন স্নান না করলে, চুল না আঁচড়ালে অথবা কাপড় না কাচার ফলে ময়লা হ'লে গায়ে এবং জামা কাপড়ে উকুন হয়। সৈন্যদের প্রায়ই এই অবস্থায় পড়তে হয়। গায়ে উকুন হওয়া মানে টাইফাস রোগকে ডেকে আনা; কিন্তু ডি ডি টি জামা কাপড়ের ভেতরে ছড়িয়ে দিলে উকুন অথবা অন্যান্য কীটের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। একটি তরল রসায়নের সাহায্যে ডি ডি টি জামা কাপড়ের ওপর প্রয়োগ করলে দু' মাসের জন্য পোকামাকড়ের হাত থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, যদিও সেই দু' মাসের মধ্যে সেই জামা কাপড়গুলি সপ্তাহে অন্তত একবার করেও কাচা যায়।

ডি ডি টি'র "এরোসল" ঘরের দেওয়ালগুলিকে তিন মাসের জন্য মাছিদের পক্ষে বিষাক্ত করে' রাখতে পারে এবং ছারপোকা কোনও ফাঁকে বাসা বাঁধতে পারে না। "এরোসল" হ'ল একটি পেটেণ্ট করা কথা যার মানে হ'ল বায়ুস্তরে অথবা গ্যাসে ভাসমান সূক্ষ্ম কণাসমূহ। লাইল ডি গুড-হিউ ও উইলিয়ম এন সালিভান এরোসল আবিষ্কার করেছেন। পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হ'ল যে, আমরা যে সমস্ত স্প্রে ব্যবহার করি, তাতে ব্যবহৃত তেল অথবা তার বাষ্প বায়ুস্তরে বেশীক্ষণ ভেসে থাকতে পারে না আর খুব সূক্ষ্ম লুকনো জায়গায় প্রবেশ করে পোকা মারতে পারে না।

কতকগুলি কীটঘ্ন যেমন ডি ডি টি, প্যারাডাইক্লোরবেঞ্জিন (P D B), পাইরিথ্রিন, নিকোটিন, এগুলি সাধারণভাবে প্রয়োগ করা অপেক্ষা অনেক বেশী কার্যকরী হয়, যখন এগুলির এরোসল ব্যবহৃত হয়।

"এরোসল" ছাড়া হয় "এরোসল বোমা" থেকে, সাধারণত ধাতুর তৈয়ারী, কালো রং করা পাইট বোতল আকারের একটি আধার। একটি চাবি ঘুরিয়ে দিলে তার ভেতরে এরোসল বেরিয়ে এসে পাতলা কুয়াসায় ঘর ভর্তি করে দেয়, এবং সেই কুয়াসা পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত থাকতে পারে। বড় বড় বাড়ি, সিনেমা হাউস ইত্যাদি ঠাণ্ডা রাখবার জন্য এয়ার কুলিং সিস্টেমে ফ্রিয়ন বলে অ্যামোনিয়ার মতো একরকম গ্যাস ব্যবহার করা হয়। বেশী চাপে সেই ফ্রিয়নকে তরল অবস্থায় রেখে তাইতে ডি ডি টি, পি ডি বি, পাইরিথ্রিন অথবা নিকোটিনকে গলিয়ে এরোসল করা হয়। এই এরোসল বর্ণহীন, অদাহ্য এবং মানুষের কোনোই ক্ষতি করে না। এক হাজার কিউবিক ফিটের সমস্ত মশাকে এরোসল চার সেকেণ্ডের মধ্যে মেরে ফেলতে পারে। এই রকম দশটি ঘরকে পঞ্চাশ ঘণ্টার জন্য মশকহীন রাখতে একটি এরোসল বোমাই যথেষ্ট। দু' কোটি সত্তর লক্ষ কিউবিক ফিটের একটি কারখানার সমস্ত রকম পোকা মারতে সময় লেগেছিল মাত্র কুড়ি মিনিট এবং কিছুদিন আর কোনও পোকার উপদ্রব হয় নি।

আমরা যে মশার ধূপ জ্বালাই অথবা যে স্প্রে ব্যবহার করি' তাতে পাইরিথ্রিন থাকে; কিন্তু এভাবে পাইরিথ্রিন ব্যবহার করার চেয়ে পাইরিথ্রিনের এরোসল অনেক বেশী শক্তিশালী ও ফলদায়ক। মাত্র পাঁচ মিলিগ্রাম পাইরিথ্রিন একটি বার ফিট চৌকো ঘরের সমস্ত মশা মেরে ফেলতে পারে। প্যারাডাইক্লোরবেঞ্জিনের এরোসল গরম জামা কাপড় অথবা বইএর আলমারীতে একবার প্রয়োগ করলে এক বৎসরের জন্য নিশ্চিন্ত অথচ কোনও দুর্গন্ধ হয় না।



একজন সৈন্য তার পোষাকে ডিডিটির গুড়ো ছড়াচ্ছে

কাপড়ের অথবা বই-এর আলমারীতে পি ডি বি'র দানা রেখে দিলে কিছুদিন পরে কর্পূরের মতো উবে যায় এবং পুনরায় পোকার উপদ্রব হয়। ন্যাপথেলিন, সিট্রোনেলা অথবা ক্রিয়োজট রাখলেও কাজ হয়, তবে তার গন্ধ অনেকেই পছন্দ করেন না এবং এরোসলের মতো এমন কার্যকরী নয়। আমেরিকার কোনও একটি ব্যবসায়ী সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী পি ডি বি'র এরোসল বিক্রয় করছেন।

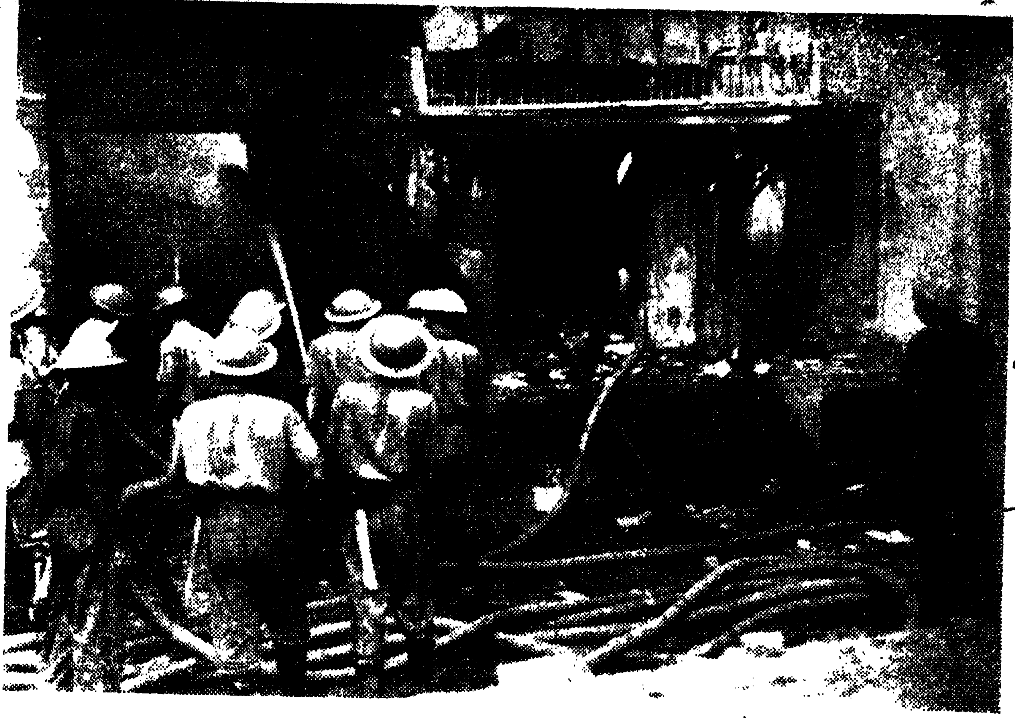
গাছপালায় যে সমস্ত কীটপতঙ্গের উপদ্রব হয় সেগুলি বিনষ্ট করা শক্ত, কারণ অনেক সময় দেখা যায়, তাদের মারবার জন্য যা ব্যবহার করা হয়, শুধুই যে গাছের ক্ষতি করে তা নয়, অনেক সময় গাছের পক্ষে উপকারী পতঙ্গাদি যেমন মৌমাছি, প্রজাপতি, এদেরও মেরে ফেলে। এ সমস্যার সমাধান করেছে নিকোটিনের এরোসল। ডেয়ারী অথবা গোশালাতেও নিকোটিনের এরোসল ব্যবহার করা হচ্ছে।

পোকা মারবার আরও একটি ঔষধ হ'ল মিথাইল ব্রোমাইড। সুতীর কাপড়ে যে পোকার উৎপাত হয়, সেগুলিকে মিথাইল ব্রোমাইডের ধোঁয়া খুব কম সময়েই মেরে ফেলে।

ডি ডি টি ও এরোসল নিয়ে এখনও খুব গবেষণা চলছে যাতে যুদ্ধের পর সর্বসাধারণের জন্য এগুলি সহজলভ্য হয়।

বর্তমান যুদ্ধের ১৯৪৩ সালে অক্টোবর মাসে ইটালীর নেপলস শহরে টাইফাস রোগের মহামারী দেখা দেয়, তখন এই ডি ডি টি'র সাহায্যে ঐ ব্যাধিটিকে আয়ত্তে আনা হয়। আমাদের দেশের কোনও একটি রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান ভারতে উৎপন্ন কাঁচামাল থেকে ডি ডি টি প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছেন এবং শীঘ্র বাজারে দেবেন বলে বিজ্ঞাপনও দিয়েছেন।

চিৎপুর রোডে বিস্ফোরণের ফলে অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য



অগ্নি নির্বাপনরত 'ফায়ার ব্রিগেড'-দল



প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে বিধ্বস্ত অট্টালিকার অংশবিশেষ

ব্যবসা বাণিজ্য

আমাদের করের বোঝা

শ্রীঅনিলকুমার বসু

ভারত সরকারের দপ্তর হইতে কয়েক মাস পূর্বে ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্বন্ধীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় ভাগ বাহির হইয়াছে। উক্ত বিবরণে উল্লিখিত আছে যে, ভারতের ন্যায় একটি বিরাট দেশের উন্নয়নকল্পে প্রণীত পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন এবং উক্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে হইলে সরকারকে একদিকে যেমন বিবিধ কর বসাইতে হইবে, অপর দিকে ঋণ গ্রহণ করিতেও হইবে। ইহারই অব্যবহিত পরে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর লর্ড ওয়াভেল একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, ভারত সম্পর্কীয় যে বিরাট পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে, তাহা ফলপ্রসূ করিবার জন্য বর্তমান যুদ্ধকালীন যে গুরুকরভার লোককে বহন করিতে হইয়াছে, তাহা যুদ্ধাবসানেও আরও অনেক দিন বহন করিতে হইবে। অর্থাৎ উক্ত পরিকল্পনার মূলধন জোগাইবার নিমিত্ত ভারতবাসীকে আরও গুরু করভারে পিষ্ট হইতে হইবে। বড়লাট বাহাদুর এমন পর্যন্ত মন্তব্য করিয়াছেন যে, বর্তমান যুদ্ধে জনবল, অর্থবল ও সম্পত্তির দিক হইতে ভারত ক্ষতিগ্রস্ত ত হয়ই নাই বরং লাভবানই হইয়াছে। এ মন্তব্যের পাশে জেনারেল অচিনলেকের অভিমত প্রণিধান করিলেই পূর্বোক্ত মন্তব্যের অযৌক্তিকতা প্রমাণিত হইবে। জেনারেল আচিনলেক বলিয়াছেন যে, অনেকের এমন ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, এই যুদ্ধে ভারত অল্পই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কিন্তু একটু বিচার করিলেই বোঝা যাইবে যে, এরূপ ধারণা কতখানি ভুল. তিনি মনে করেন যে, বর্তমান যুদ্ধে অতি দীনতম ভারতবাসী পর্যন্ত অপরিসীম দুঃখকষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। তাহারাও যুদ্ধের ব্যয়ভার বহুলাংশে বহন করিতেছে। অন্য দেশবাসী যাহারা আছেন, তাহারা কল্পনা করিতে পারিবেন না যে, কতটুকু সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করিয়া দরিদ্র ভারতবাসীকে কোন প্রকারে জীবনধারণ করিতে হয়। ভারতের কৃষকরা অধিকাংশই নিরন্ন ও বস্ত্রহীন। যুদ্ধজনিত মূল্য বৃদ্ধির জন্য তাহাদের লজ্জা নিবারণোপযোগী কয়েক খণ্ড বস্ত্র ক্রয় করিবার মতও অর্থ সামর্থ্য নাই। জীবনধারণোপযোগী অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিবার ক্ষমতাশূন্য জনমণ্ডলীর যে কিরূপ অপরিমিত ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইতেছে তাহার তুলনা প্রত্যক্ষ যুদ্ধরত দেশগুলিতেও মিলে না। এমন কি অর্থসচিব স্যার জেরেমি রাইসম্যান গত বৎসর বাজেট বক্তৃতাতে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, ভারতের উপর যদি যুদ্ধজনিত ব্যয়ভার আর বেশী চাপান হয়, তবে তাহার আর্থিক অবনতি অবধারিত। এরূপ অতি গুরু ব্যয়ভার চাপান সত্ত্বেও যদি লর্ড ওয়াভেল মনে করেন যে, ভারতকে বর্তমান বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪৫ সালে আরও অধিক দুঃখকষ্ট ও দুর্ভোগ স্বীকার করিতে হইবে, তাহা হইলে গুরু করভারে নিপীড়িত জনসাধারণের যে অবর্ণনীয় শোচনীয় পরিণাম হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এরূপ বলার ইঙ্গিতই হইল যে, আমাদিগকে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার মূলধন জোগাইবার জন্য আরও বেশী করিয়া ট্যাক্স বা কর দান করিতে হইবে। এইদিকে লক্ষ্য রাখিলে মনে হয়, স্যার এ আর দালাল আমাদের শিল্পোন্নয়ন ও বাণিজ্য সংরক্ষণকল্পে যে লঘুকরভার ও সংরক্ষণ শুল্কের আশ্বাস দিয়াছেন তাহা কোন লোকভোলান শ্রুতিমধুর বাক্যবিন্যাস-সর্বস্ব। সরকারের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয়, তাহারা যুদ্ধোত্তরকালে আরও বেশী করিয়া ট্যাক্স বসাইবে। বাস্তবিকই যদি এরূপ নীতি অনুসৃত হয়, তবে তাহার পরিণাম হইল ভারতের পৃষ্ঠ ভঙ্গ।

বর্তমান যুদ্ধের ব্যয়ভার নীতি পর্যালোচনা করিলে এরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হইবে যে, সরকারী ঋণ গ্রহণের (Public borrowing) চাইতে কর চাপান নীতির উপরই ভারতের অর্থসচিব বেশী নির্ভর করিয়াছেন। বর্তমানে সমগ্র ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশই ট্যাক্স মারফৎ সরকারী তহবিলে আসিতেছে এবং এরূপ কর চাপাইয়া যে পরিমিত অর্থ সংগৃহীত হইতেছে, তাহার শতকরা ৭০ ভাগ আয় কর (Income-tax) হইতে উঠিতেছে। এরূপ আয়কর হার বৃদ্ধির দ্বারা আর্থিক অসামঞ্জস্য কিছুটা নিবারিত হয় বটে, কিন্তু ভারতের আয়কর নীতি সমালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, উক্ত করভার ২০০০ ও ৫০০০ হাজার আয়সম্পন্ন লোকদের উপরই বেশী করিয়া পড়ে। পক্ষান্তরে ২৫০০০ ও তদূর্ধ্ব আয়বিশিষ্ট তথাকথিত সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা অল্পতেই বাঁচিয়া যায়। হিসাবদৃষ্টে দেখা যায় যে, ৫০,০০০ হাজার পরিমিত আয়ের উপর কর হইতে ১৬·১% আসে এবং ৭৫,০০০ হাজার আয় হইতে কর বাবদ মাত্র শতকরা ১৫·৪ ভাগ আসে। অধিক আয়সম্পন্ন ব্যক্তিরা যদি সামর্থ্য অনুপাতে অল্প আয়কর দেয়, তবে স্তরভেদে আর্থিক অসামঞ্জস্য নিবারিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ইংলণ্ডের সহিত তুলনা করিলেও দেখা যাইবে যে, ভারতে অধিক আয়বিশিষ্ট শ্রেণী সামর্থ্য অনুপাতে কম কর দেয় এবং এই দিক দিয়া সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের উপর আরও উচ্চহারে কর চাপান উচিত।

বাৎসরিক আয় টাকা	ভারতবর্ষ শতকরা	ইংলণ্ড শতকরা
১৬,৮০০	৫	১৩
১৫,২০০	৫·৬	১৪·৪
২৫,২০০	১১·০	১৭·৪
৩৮,৪০০	১৫·২	২২·৭
৪৮,০০০	১৭·৮	২৫·৭৫

সব দিক বিবেচনা করিলে ভারতীয় আয়কর নীতি দ্বারা অধিক আয়সম্পন্ন ব্যক্তিদের তুলনায় অল্প আয়সম্পন্ন ব্যক্তিরাই বেশী নিপীড়িত হয়। আয়কর নীতি বর্ধিষ্ণু (Progressive) করিতে হইলে, কৃষিআয়, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি আয়ের ও অনুপার্জিত আয়ের (Unearned Income) উপর কর চাপান উচিত। সুখের বিষয় অনেক প্রদেশেই কৃষি আয়ের উপর বর্তমানে কর চাপান হইয়াছে এবং মৃত্যুকর (Death Duty) বিবেচনাধীন আছে। এই সঙ্গে অল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয়কর হইতে একেবারে অব্যাহতি দেওয়াও প্রয়োজন। বর্তমান পরিস্থিতিতে যেখানে বাজারদর প্রায় শতকরা ২৫৮ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে, সেমত অবস্থায় নির্দিষ্ট আয়বিশিষ্ট (fixed income) ব্যক্তি শ্রেণীর দুরবস্থা অনুমেয়। তাহারাই দর বৃদ্ধির জন্য সর্বাধিক দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছে। বর্তমানে ২০০০ টাকা আয় সম্পন্ন লোকদের কোন আয়কর দিতে হয় না। বর্তমান অবস্থায় যাহাতে ৫০০০ টাকা আয়বিশিষ্ট

ব্যক্তিরা উক্ত কর হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে, সেইরূপ নীতি অবলম্বন করা বিধেয় এবং ৬০০০ ও তদূর্ধ্ব আয়ের উপর কর হার আরও বাড়াইয়া দেওয়া সমীচীন। এই প্রসংগে ইহাও বলা প্রয়োজন যে, জীবন-বীমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেন্সন ফান্ড প্রভৃতিতে যে পরিমিত অর্থ দান করিতে হয়, তাহা বাদ দিয়া তারপর আয়কর নিরূপিত করা উচিত। বর্তমানে এই সকল বাবদ মোট আয়ের এক-ষষ্ঠাংশ আয়-কর হইতে বাদ দেওয়া হয়। ইহা বাড়াইয়া অন্তত এক-চতুর্থাংশে উঠান উচিত। নতুবা লোকের টাকা জমান স্পৃহা একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। আয়কর নিরূপণকালে পারিবারিক অবস্থাও বিবেচনীয়। যৌথ পরিবার প্রথা এখন পর্যন্ত বলবৎ থাকায়, একজন উপার্জনশীল ব্যক্তিকে বহু পোষ্য প্রতিপালন করিতে হয়, এই ক্ষেত্রে পারিবারিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া আয়কর ধার্য করা বিধেয়।

যেহেতু আমরা বর্ধিষ্ণু আয়কর নীতির (Progressive taxation) পক্ষপাতী, সেইহেতু কেহ যেন না মনে করেন যে, আমরা বর্তমানে অনুসৃত উচ্চকর নীতিরও পক্ষপাতী, বরং আমরা যুদ্ধকালীন উচ্চ কর নীতির বর্তমান অবস্থায় বিরোধিতা করিতেছি। যুদ্ধাবসানেও যদি এইরূপ উচ্চ কর নীতি অনুসৃত হয়, তবে ব্যবসায় বাণিজ্যের উপর যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে, তাহাতে মন্দারই সূচনা করিবে। যুদ্ধাবসানে যাহাতে মন্দার বিরাট গহ্বরে এই দেশ পুনঃ পতিত না হয়, সেই ব্যবস্থাই সরকারের এখন হইতে অবলম্বন করা উচিত। উচ্চ কর নীতির ফলে মানুষের মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হইল এই যে, সরকারকে কর দেওয়ার চাইতে তাহা ব্যয় করিব। ইহার অর্থ এই যে, মানুষ সঞ্চয় না করিয়া ব্যয়ই বেশী করিবে। ফলে ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, সঞ্চিত অর্থ না থাকায়, কমই নিয়োজিত হইবে। এই প্রসংগে অধ্যাপক পিগুর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, যেই মুহূর্তেই মানুষ জানে যে, তার উপার্জিত অর্থের মোটা ভাগ ট্যাক্স বাবদ সরকারের হাতে অর্পণ করিতে হইবে, সেই মুহূর্তেই দেশপ্রিয়তার মহান আদর্শ থাকা সত্ত্বেও সে তার পরিশ্রম কমাইয়া দিবে। গত মহাযুদ্ধের যে ব্যয় সরকারী ঋণ গ্রহণে মিটান হইয়াছিল, তাহা যদি লোকের উপর কর চাপাইয়া আদায় করিতে হইত, তাহা হইলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেখা যাইত যে, সেই দেশ আর্থিক দুর্দশার চরম পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। ইংলণ্ডেই যদি এইরূপ অবস্থার সম্ভাবনা হইয়া থাকে, তবে ভারতের কথা কোন ছার। কাজেই আর অধিক ট্যাক্স বসাইলে যে ভারতের অবস্থা কিরূপ দুর্বিসহ হইবে তাহার কতকটা অনুমান করা যায়।

ভারত সরকার অনুমান করেন যে, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা চালু করিতে হইলে ১৯৪৭-৪৮ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম পাঁচ বৎসর আনুমানিক ১০০০ কোটি পরিমিত অর্থ রাজস্ব উদ্বৃত্ত বাবদ ও সরকারী ঋণ গ্রহণ বাবদ পাওয়া যাইবে। এই সংগে জনসাধারণের নিজস্ব তহবিল হইতে ৫০০ কোটি টাকা উঠিলে মোট ১৫০০ কোটি টাকা তোলা যাইবে। এই হিসাবে বৎসরে ৩০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা সম্ভবপর এবং বৎসরে ১০০ কোটি টাকা রাজস্ব উদ্বৃত্ত বাবদ আসিবে। রাজস্ব উদ্বৃত্ত অর্থ তুলিতে হইলেই আরও অধিক ট্যাক্স বসাইতে হইবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ভুলিয়া যান যে, বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির কল্যাণে যে পরিমিত কর দান ক্ষমতা জনসাধারণের বাড়িয়াছে, যুদ্ধাবসানে মুদ্রা-সংকুচিত করিলেই তাহা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যাইবে। সেই সময় অধিক করভার বহন করিবার মত ক্ষমতা জনসাধারণের একেবারেই বিলুপ্ত হইবে। কাজেই অধিক কর চাপান নীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণামই হইল মন্দা ডাকিয়া আনা। যুদ্ধাবসানে যখন সরকারের অবশ্য কর্তব্য হইল মূল্য মান উচ্চ রাখিয়া যে কোন মন্দার সম্ভাবনাকে অংকুরে বিনাশ করা, সেই সময় লোকের উপর অধিক ট্যাক্স বসাইলেই ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবে, তাহার ফলে মূল্য মান নিম্নাভিমুখী হইয়া মন্দার উপসর্গ দেখা দিবে।

কর বাবদ ভারতে যে রাজস্ব ১৯৪৩-৪৪ সালে আদায় করা হইয়াছে, তাহার শতকরা ৫৮ ভাগ প্রত্যক্ষ কর (direct taxes) এবং শতকরা ৪২ ভাগ পরোক্ষ কর (indirect taxes) হইতে উদ্ভূত, অপর পক্ষে ১৯৩৮-৩৯ সালে উহা যথাক্রমে ছিল শতকরা ২৮ ও ৭৮ ভাগ। এই কয় বৎসরের মধ্যে প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া অর্থ বণ্টন ব্যাপারে যে অসামঞ্জস্য ছিল তাহার কতকটা প্রতিকার হইলেও, যুদ্ধকালে পরোক্ষ করের বৃদ্ধির দরুন গরীব দুঃস্থের অসহনীয় দুর্ভোগ বহন করিতে হইয়াছে। কারণ পরোক্ষ কর বৃদ্ধি হেতু কেরোসিন তেল, ম্যাচ, চিনি, বনস্পতি ঘি, তামাক, চা প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইতেছে। যুদ্ধের প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের উপর এখনও কোন কর চাপান না হয়, তবে ভারতের মত দরিদ্র দেশে এই সকল জিনিসের উপর কেনই বা কর বসান হইল তাহা বিতর্কের বিষয়। ইংলণ্ডে যেখানে গড়পড়তা বার্ষিক আয় ৯৮০, সেখানেই যদি উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইয়া থাকে, তবে ভারতের মত দেশে যেখানে বার্ষিক আয়ের পরিমাণ মাত্র ৬৫, সেখানেই বা এত উচ্চ কর নীতি গৃহীত হইবেই বা কেন? ইহা ছাড়া রেল ভাড়ার যে শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিয়াই কত সমালোচনা হইয়া গিয়াছে। স্টেট্‌স্‌ম্যানের মত কাগজ পর্যন্ত এমন মন্তব্য করিয়াছেন যে, বর্তমানের মত অব্যবস্থার মধ্যে রেল ভাড়ার অত্যধিক বৃদ্ধি মোটেই সমর্থন-যোগ্য নয়। এত অধিক মূল্যেও যদি এত খারাপ ব্যবস্থা হইয়া থাকে, তবে ইহা একটি দুরপনেয় কলঙ্ক বলিতে হইবে। ইংলণ্ডের মত উন্নত দেশে এখন পর্যন্ত যদি মোট রাজস্বের শতকরা ৫৬ ভাগ কর বাবদ সংগৃহীত হয়, তবে ভারতের মত অনুন্নত ও দরিদ্র দেশে কর বাবদ সংগৃহীত অর্থের শতকরা ৬৬ ভাগ অধিক বলিতে হইবে বৈকি। যুদ্ধ ব্যয়-ভার মিটাইতে কর ছাড়া সরকারী ঋণেরও ব্যবস্থা আছে। এই স্থানে বিশেষ বিবেচনার বিষয় যে, যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী ঋণ ১৬,৪০৩ কোটি টাকার প্রায় তিন গুণ বাড়িয়া ৪৫,২১০ কোটি টাকায় উপনীত হইয়াছে, ইংলণ্ডে ১০,৩৭৩ কোটি টাকা হইতে দ্বিগুণে বৃদ্ধি পাইয়া ২০,৮২৭ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। জাপানে ১৯৩৯ সালে যেখানে সরকারী ঋণের পরিমাণ ছিল ১,৩৯৮ কোটি টাকা তাহা ১৯৪৩ সালের জুন মাসে ৩,৫৫৭ কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯ সালে ডিসেম্বর মাসে জার্মানীতে সরকারী ঋণ যুদ্ধ বাধিবার পূর্বেকার

বিনিময় হার অনুসারে ছিল ৫,০৬২ কোটি টাকা এবং উহাই ১৯৪২ সালে ডিসেম্বর মাসে চতুর্গুণ বাড়িয়া ২২,৭২০ কোটি টাকায় উন্নীত হইয়াছে। এই তুলনায় ভারতে সরকারী ঋণ ১,২০০ কোটি টাকা হইতে মাত্র ১,৪৩৯ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্য দেশের অনুপাতে ২৩৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি অকিঞ্চিৎকর। ইহা হইতে বোঝা যায়, বর্তমান যুদ্ধের ব্যয়ভার মিটাইতে সরকার ঋণ গ্রহণ চাইতে কর বসানর উপরই বেশী নির্ভর করিয়াছেন এবং এই নীতির জন্য ভারতের দরিদ্র দেশবাসীকে অশেষ ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া দুর্ভর করভার বহন করিতে হইতেছে। তাহা ছাড়া আয় কর ও অতিরিক্ত লাভকর শতকরা ৯৪ হারে ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির উপর যেভাবে চাপান হইয়াছে তাহাতে যুদ্ধ অবসানে ঐ সকল শিল্পের পুনর্গঠন ও পুনঃসংস্কারের জন্য কোন মজুত অর্থই উহাদের অবশিষ্ট থাকিবে না। বর্তমানে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে তাহাদের কলকব্জা, যন্ত্রপাতিগুলি এত অত্যধিকভাবে খাটাইতে হইতেছে যে, যুদ্ধাবসানে তাহাদের মেরামত একেবারে অবশ্যম্ভাবী। অতিরিক্ত লাভ করের দরুণ ঐ সকল খরচ মিটাইবার মত উপযুক্ত অর্থ ঐ সকল শিল্পগুলির হাতে থাকিবে কিনা সন্দেহের বিষয়। ইহা ছাড়া নূতন নূতন কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে কিনিবার ব্যয়-ভারের কথা ত ছাড়িয়াই দিলাম। যুদ্ধোত্তর-কালে ভারতীয় শিল্পগুলিকে বৈদেশিক শিল্পের দারুণ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে। ইতিমধ্যেই তথাকথিত "ইণ্ডিয়া লিমিটেড" নামধেয় কতগুলি বিদেশীয় শিল্প প্রচুর মূলধন সংযোগে—আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাজেই ভিতর হইতেই আমাদিগকে কঠোর প্রতিযোগিতার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। এই সকল বৈদেশিক প্রতি-যোগিতায় সফলকাম হইতে হইলে আমাদের শিল্পগুলিকে প্রচুর মজুত তহবিল (Reserve Fund) সৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্তু লাভের শতকরা ৯৪ ভাগই যদি কর বাবদ গভর্নমেণ্টকে অর্পণ করিতে হয় তবে এই মজুত তহবিলই বা সৃষ্ট হইবে কি করিয়া? অতএব করের বোঝা এখন হইতেই লঘু করা প্রয়োজন। করের বোঝা ভারি না করিয়া বরং সরকারের ঋণের পরিমাণ একটু বাড়াইয়াও ভারতের শিল্পগুলিকে বাঁচিবার মত অন্তত উপায় করিয়া দেওয়া উচিত। গ্রেট ব্রিটেনে যেখানে জীবনযাত্রার ব্যয়-বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৩৩ ভাগ মাত্র, ভারতে সেইখানে শতকরা ২৫৮ ভাগ। অপর দিকে সেই তুলনায় আমাদের পারিশ্রমিক মাত্র শতকরা ৫০ ভাগ মাত্র বাড়িয়াছে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, আমরা কতখানি অসহনীয় ক্লেশ ভোগ করিতেছি এবং দিন দিন দরিদ্রতর হইয়া পড়িতেছি। কাজেই আমাদের উপর আর কর চাপানর অর্থ ভারতকে অর্থনৈতিক হিসাবে একেবারে পঙ্গু করা। ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন পরিকল্পনা ফলপ্রসূ করিবার জন্য সরকারের উচিত জনমণ্ডলী বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির উপর আর ট্যাক্স না বসাইয়া সরকারী দীর্ঘদিন মেয়াদী ঋণ গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী অর্থ সংগ্রহ করা।

অনুবাদসাহিত্য

খেঁকশিয়ালকে ভয় ক'রো

(অনুবাদ-গল্প)

উইনিফ্রেড্ লেট্‌স

লম্বা ঘাসের মধ্যে হাঁসটি দাঁড়িয়েছিল। চারিদিকে টিমথি এবং ফক্সটেল ঘাস—জুন মাসের শ্যামল শ্রীতে উজ্জ্বল। তার আর কোন দিকে নজর নেই—শুধু সে ঘাসের ডগার মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল বোতামের মত চোখ দিয়ে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, সে পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে ডাকছিল, 'প্যাঁক! প্যাঁক!' আবার যেন প্রশ্নের স্বরে ডাকল—'প্যাঁক?' 'প্যাঁক?' এর অর্থ: "হে আমার পত্নীরা, তোমরা কোথায়? তোমরা কেন তাড়াতাড়ি করে আমার কাছে আসছ না?" সে নিবিষ্ট মনে শুনছিল—প্রত্যেকটি পালক থেকে শুরু করে তার সুলতান-সুলভ গর্বসূচক কুঞ্চিত পায়ের লোমগুলি পর্যন্ত যেন উন্মুখ। তার মাথার উপর বহু বর্ণের মেঘ-শোভিত জুন মাসের আকাশের বিশাল ঔদাসীন্য। অধোগামী সূর্যের পশ্চিমমুখী গতির ফলে বড় বড় এলম গাছের ছায়াগুলো পড়েছে তাদের সম্মুখে—মাঠের বুকে এবং বাটার-কাপ, অক্স-আই এবং হুক-উইড ফুলের প্রত্যেকটির মাথার চারিদিকেই অস্তগামী সূর্যের আলোক-চক্র।

কয়েকটি পাখীর শব্দ ছাড়া এই গ্রীষ্ম-সন্ধ্যায় আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। আর কোন প্যাঁক প্যাঁক ধ্বনি প্রত্যুত্তর দিয়ে তাকে আশ্বস্ত দিল না। কাজেই সে ধীরে ধীরে পাম্পটি ছাড়িয়ে সেই খড়ে-ছাওয়া ঘরটির সম্মুখের গলিতে এল। দরজা বন্ধ, প্রাণের কোন সাড়া-শব্দ নেই। সে কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। সবই ঠিক আগের মত আছে: দুপুরবেলা ঘাসের উপর আরামে শুয়ে শুয়ে হংসীরা রোদ পোয়াত—সেখানে তখনও শাদা পালক পড়ে। সেখানেই তারা সযত্নে নিজেদের পরিপাটি করত, আর সেখানেই সে তার শ্বেতকায়া পত্নীদের সঙ্গ-সুখ উপভোগ করত—কত উষ্ণ, কত নরম, আর তার নেতৃত্বে তারা কত সঙ্ঘবদ্ধ ছিল! নিরাপত্তার সেই স্থায়ী আশ্বস্তি-অভ্যাস এবং গার্হস্থ্য জীবন তার সুখ গড়ে তুলেছিল—যদিও সবুজ-নীল হাঁসটির চকচকে মাথায় এরূপ যুক্তি ছিল না।

শুধু অনিশ্চিত অস্বস্তির মধ্যেই তার কষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তার মাথা ঘুরছিল। বর্তুলাকার চোখ দুটি বন্ধ কুটীর-দ্বারের দিকে তাকাচ্ছিল। তারপর সে বেড়ার উপর দিয়ে ভিতরে বাগানের দিকে তাকালো—সেখানে পুরনো গোলাপ ঝাড়ের মধ্যে মধ্যে রকেট, কলাম্বাইন প্রভৃতি ফুলের গাছ, নানারকম ওষধি এবং বাঁধাকপি। সে ছাপানো বহিরাবরণ-পরা একটি মূর্তির খোঁজ করছিল, সে 'ডিলি, ডিলি' বলে ডাক শোনার অপেক্ষায় ছিল। সে পুরানো বাটিতে এবং ঘাসের উপর যে খাবার ঢেলে দেয়, তারই অপেক্ষা করছিল। যদিও চার দিন আগে সে চোখের উপর একটি দৃশ্যের অভিনয় দেখেছিল, তবু হংসীগুলো এবং তাদের নেতার কাছে তার কোন অর্থ ছিল না। নীল রঙের ছাপানো বহিরাবরণের পরিবর্তে যে একটি কোট এসেছে, তাতে সে একটুও বিস্মিত হয়নি। তার উপকারিণী রোজ রবিবার দিন যেমন পোষাক পরে গির্জায় যেত, তেমনই পোষাকে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার অবশ্য মনে পড়েনি যে, সেটা মঙ্গলবার। রোজ যে সেদিন সকালে তাদের খাইয়েছিল, সেইটাই যথেষ্ট। অভ্যাসমতই সে হাঁসটির সঙ্গে কথা বলেছিল: 'দেখ বাপু, নিজের দিকে তাকাও। ওই লোভীগুলোকে সব খেতে দিও না। এটি হচ্ছে হাঁস—দেখতে সুন্দর নয়কি?' —শেষের কথাটি বলেছিল তার পাশে দাঁড়িয়ে যে যুবকটি বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়েছিল, তাকে উদ্দেশ্য করে।

সে যুবকটির বাঁকানো বাদামী রঙের খালি বাহুটার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ফিরে দাঁড়াল। সে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে বলল: 'ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, খেঁকশিয়াল যেন ওদের নাগাল না পায়। প্রত্যেক রাতে যথাসময়ে ওদের ঘরে বন্ধ করে রাখার কথা মনে রেখো। ওই বুড়ো খেঁকশিয়ালটা ভয়ঙ্কর। সে কখন আসবে টের পাবে না......সে এত চালাক। যখন নিরাপদ মনে করা যায়, তখনই সে হয়ত গুঁড়ি মেরে মেরে আসে!' তার স্বামী কোন জবাব দিল না এবং সে গিয়ে পরিষ্কার ছোট রান্না ঘরটিতে ঢুকল। টেবিলের উপর বাঁধা পেট-মোটা একটা সস্তা সুটকেস। সে চীনা মাটির বাসনে সাজানো ঘরটিতে ঢুকল।

'তোমার জন্যে ডিম থাকল, ক্রিস্টি আর আমি তোমার জন্যে যে বড় সোডা কেক ভেজেছিলাম, সেটাও রইল এবং ঐ-বাটির নীচে মাখন রইল। দেখো, ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করো। বোকার মত চা আর রুটি খেয়ে থেকো না যেন!'

সে হাসতে লাগল এবং চোখে জল আসছিল বলে মাথাটি ঘুরিয়ে নিল।

যুবকটির বিবর্ণ মুখে কিন্তু পরিবর্তন নেই।

'রোজ, তুমি হয়ত শনিবারের মধ্যেই ফিরে আসবে। ডাবলিনের ডাক্তার তোমাকে ভাল এক বোতল ওষুধ দেবে। ওখানকার ডাক্তাররা যত জানে, এখানকার ডাক্তাররা তত জানে না।'

'সে ত নিশ্চয়ই দেবে। তবে এই সব বড় বড় হাসপাতালে ওরা যে পর্যন্ত রোগীর দিকে তাকানোর অবসর না পায়, সে পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হয়। আমার হয়ত কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হতে পারে।'

'তারা বেড চাইবে, তারা তোমাকে চাইবে না', লোকটা প্রায় রেগেই প্রতিবাদ করল। 'আমার নিজের মনে হয় যে, তোমার ডাবলিন যাবার কোন দরকারই নেই। তুমি কি যথেষ্ট সুস্থ নও? তুমি ত রোগীদের মত বিছানায় পড়ে নেই এবং তুমি উঠে বাগানেও যেতে পার। হয়ত তুমি কিছু রোগা হয়ে গেছ—সে ত এক বোতলেই ঠিক হয়ে যাবে। প্রতিবেশীরা সবাই তোমায় উপদেশ দিয়েছে—ডাক্তার দেখাও। আমি ওদের বিশ্বাস করি না—ওরা তোমায় কাটতে চায়, কিন্তু আমি তা চাই না.........মনে রেখ, আমি তা চাই না।'

লোকটার গলার স্বর গর্জনের মত এবং সে টেবিলের উপর একটা ঘুসি মারল।

তার স্ত্রী রোজ দাঁড়িয়ে থেকে কালো চোখে তার দিকে তাকালো। 'তোমার মাথায় এমন ধারণা কি করে এল?' সে সানন্দে প্রশ্ন করল, কিন্তু তার চোখে হাসি ফুটল না।

সে চঞ্চল হয়ে উঠল। 'লোকে কি সব বলে! তারা সবাই যেন অন্যের কাজের খবর রাখে। 'ওর অস্ত্রোপচার দরকার', তারা বলে। আমি তোমাকে কাটতে দেব না। তুমি আমার মতই সুস্থ। ওরা কোথা থেকে এরূপ কথার খোরাক পায়, তা আমি জানি না!'

রোজ ছোট আয়নাটার সামনে সযত্নে তার সবচেয়ে ভাল টুপিটা পরল। 'তুমি সহজ মনে থেকো। আমি খুব দেরি হলে

সোমবারের মধ্যে ফিরে আসব। কিন্তু আমার কথা শোন, হাঁসগুলোকে খাওয়ানোর কথা ভুলো না। খাবারের পরিত্যক্ত টুকরো, কিছু ওট এবং কয়েক ফোঁটা দুধ দিও। আর খেঁকশিয়াল সম্বন্ধে সাবধান!'

সে কান পেতে শুনল যে, দরজায় একটা মোটর গাড়ির শব্দ। সে সুটকেসটা তুলে নিল। সে এক মুহূর্তের জন্য ফিরে দাঁড়াল, তাঁর ঠোঁট দুটি কাঁপছিল। 'ভগবান তোমার মঙ্গল করুন ক্রিস্টি, আমি একটা চিঠি লিখব। ভগবান যদি দয়া করেন, আমি সোমবার দিন ফিরে আসব।'

হংস-পরিবারটি এই বিদায়-দৃশ্যে ততটা মন দেয়নি, তারা ঘাসের ক্ষেতে যাবার জন্যে গাড়ির চাকার আগে আগে দৌড়াল--তারপর গেল শিকারের খোঁজে।

দু-একদিন সবই ভাল চলল। দিনে এবং রাতে লোকটা তাদের ডাকত, ঘাসের উপর সোডা ব্রেডের টুকরোগুলো ফেলে দিত এবং রাত্রিবেলা তাদের খোঁয়াড়ে তালাবন্ধ করে রেখে দিত। হাঁস-ঘরের আশেপাশে অন্ধকারে কি যেন ঘুরে বেড়ায়, গন্ধ শোঁকে কি যেন একটা ভয়, অন্ধকারে ঘাসের খস-খস শব্দ—তারপর চেস্টনাট গাছের গভীর নীল ছায়ায় শব্দটা মিলিয়ে গেল।

পরের রাতে একটা শাদা হংসীকে খুঁজে পাওয়া গেল না, কিন্তু তখনও দুটি হংসী ডাকে সাড়া দিচ্ছিল। খাবার পাওয়া যাচ্ছিল না। খড়ে-ছাওয়া কুটির থেকে আরও অধিক খাবার পাওয়া যেতে পারে এই অস্পষ্ট আশায় হাঁস এবং বাকী হাঁসী দুটি দুপুর বেলা কুটিরে ফিরে এসেছিল।

যে ক্রিস্টির উপর তাদের সকল আশা ভরসা নিবদ্ধ ছিল, সে ছিল দরজায় দাঁড়িয়ে। কিন্তু সে তাদের দিকে মনোযোগ দিল না। গলিপথে বাইসিক্লে যে লোকটা আসছিল, সে তার দিকে তাকিয়ে-ছিল। লোকটার হাতে ছিল একটা সবুজ খাম। সে বাইসিক্ল থেকে নেমে খামটা ক্রিস্টির হাতে দিল। সে যখন বিশ্রী ময়লা আঙ্গুলে খামটা ছিঁড়ে কুঞ্চিত-ভ্রূ হয়ে চিঠির বাণী বোঝার চেষ্টা করছিল, লোকটা তখন সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল। পাড়াগাঁয়ে লেখাপড়া না জানাটা অপরাধের বিষয় নয়।

"ক্রিস্টি, চিঠিটা কি আমি তোমায় পড়ে শোনাব?"

যুবক চিঠিটা লোকটার হাতে ফিরিয়ে দিল। "তুমি-ই এটা পড়ে দাও। আমি কোন অর্থ বুঝতে পারলাম না।"

"চিঠিতে বলছে"—পাঠক থামল, "অস্ত্রোপচার হয়ে গেছে। অবস্থা গুরুতর। অবিলম্বে চলে এস!"

"কে এটা পাঠিয়েছে?" ক্রিস্টি প্রশ্ন করল।

"নিশ্চয়ই হাসপাতাল থেকে এটা এসেছে। হয় ডাক্তার কিংবা মেট্রন। ওহে, তোমার তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত। তুমি যদি বাইসিক্লে করে রওনা হও, তবে বিকালের ট্রেনটা ধরতে পারবে। খাবার খেয়েছ ত?" ক্রিস্টি অস্পষ্ট চোখে ওর দিকে তাকাল।

"আমি একথা জানতাম," সে বলল, "এই এক বছর কিংবা তারও বেশীদিন ধরে এ ভয়টা আমার ছিল। আমি আগেই বলেছিলাম যে, এসব বাজে। কিন্তু তুমি ত ভয়কে গলা টিপে মারতে পার না। ও যাক—এ ইচ্ছা আমার কখনও ছিল না। আমার ওকে ধরে রাখার অধিকার ছিল। এই ডাক্তারগুলো ছুরি ব্যবহার না করা পর্যন্ত শান্তি পায় না। হায় ভগবান! সর্বদাই এ ভয় আমার মনে ছিল।"

"ওহে শোন! এখন ধৈর্য ধর। লোকেরা কি বলে নি যে, এ ছাড়া তার আর আশা নেই? একথাটা আমার মনেও এসেছিল। বাড়ির কোণায় বসে খড়ের গাদার পিছনে পালিয়ে তুমি ত তোমার ভয়কে ঠেকাতে পার না! এখন যাও। আমি কি তোমাকে সাহায্য করব? টাকাপয়সা আছে ত?...... আর শহরের জন্যে তোমার একটা পরিষ্কার সার্ট এবং টাই-এর দরকার হবে!"

ক্রিস্টি যখন পাগলের মত ড্রয়ারের মধ্যে জিনিষপত্র খুঁজছিল, তখন তার কানে এসে বাজছিল সেই পরিচিত স্বর—"আমি যদি না-ই ফিরে আসতে পারি, সেজন্যে তোমার রবিবারের শার্টটি পরিষ্কার করে রেখে গেলাম। তোমার টাইও ইস্ত্রি করে রেখে গেলাম।"

দশ মিনিটের মধ্যে সে সাইক্লে চড়ে গলির উঁচু-নীচু পথ বেয়ে চলল এবং সংবাদদাতাও সাইক্লে চড়ার জন্যে তৈরী হচ্ছিল।

"ভগবান ওর সহায় হোন!" সে সবিস্ময়ে বলল এবং হাঁসগুলোর দিকে এমনি একবার তাকাল।

মাঠ পেরিয়ে এসে একটা লোক তার উদ্দেশে চীৎকার করে বললঃ "ওহে, মিক! ব্যাপার কি?"

"ওর বৌর ব্যাপার আর কি! ওকে ডেকে পাঠিয়েছে—অবস্থা খারাপ বলে মনে হয়। আমার মনে হয় যে, এতক্ষণ হয়ত সে মরেই গেছে।"

"বেচারী রোজ! ভগবান তার মঙ্গল করুন, সত্যই দুঃখের বিষয়, সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দরিদ্র নারী। বহুদিন থেকেই তার চোখে মুখে মৃত্যুর ভাব ফুটে বেরিয়েছিল—কিন্তু ওর স্বামীটা কি চোখে দেখে! ও লোকটার মাথায় চোখই নেই!"

"কতকগুলো লোক আছে, যারা যা দেখতে ভয় পায়, তা তারা দেখে না!"

সংবাদদাতা বেড়ার উপর দিয়ে রকেট গাছগুলোর দিকে তাকাল। "তার বাগানের উপর খুব যত্ন ছিল," সে বলল এবং তার-পর সহানুভূতির সঙ্গে উচ্চারণ করলঃ "বেচারী!" তারপর সে এবং অপর লোকটি গলিপথে বিপরীত দিকে চলে গেল।

ছায়ায় মৃদু-মন্দ ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে সন্ধ্যা এল। কিছুটা উন্মুখ হয়েই হাঁসটা এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াল—কারণ সে কথাবার্তার কিছুই বুঝতে পারে নি। ক্ষুধা এবং অভ্যাস তাকে কুটির-দরজার দিকে টেনে আনল। দরজা ঈষৎ খোলা ছিল—সে কোনরূপে ভিতরে ঢুকে বাগানে শামুকের সন্ধান করতে লাগল। সে বারবার প্রশ্নসূচক ভঙ্গিতে ডাকতে লাগলঃ প্যাঁক? কিন্তু কোন উত্তর এল না। একটা চেস্টনাট শাখায় বসে একটা থ্রাস পাখী মধুর স্বরে গান গাইছিল এবং বাগানে অলস পাখী ব্ল্যাকবার্ড বাজাচ্ছিল ক্লারিওনেট। আকাশ-জোড়া গৃহমুখী পাখীর দল—দাঁড়কাক এবং সী-গাল। পূব দিকের আকাশ ইতি-মধ্যেই নীল এবং ঈষৎ রক্তবর্ণ—আর পাহাড়ের বুকের উপর দিয়ে পশ্চিমের আকাশে জাফ্রান রঙের লীলা।

আকাশের বর্ণসমারোহ মিলাতে না মিলাতেই বাতাসে পাওয়া গেল রকেট ফুলের মৃদু সুরভি। একটা তারা উঠল এবং কুটিরের চারদিকে একটা বাদুড় পাখা ঝটপট করে উড়ে বেড়াতে লাগল। জুনের শ্যামলশ্রী হয়ে গেল কালো—নীল আকাশে শুধু পুঞ্জীভূত অন্ধকার এবং এরোপ্লেন। হাঁসটাকে ঘরে বন্ধ করার জন্যে কেউ এল না। সে পরিচিত ঘরটায় ঢুকল—পালকপূর্ণ, অপরিষ্কার, কত নিস্তব্ধ এবং প্রাণহীন। সে ঘুমের জন্যে বসে পড়ল। হাঁস-ঘরটার চারদিকে অন্ধকার ঘন হয়ে এল। চোর কিন্তু ভালভাবে সবই দেখতে পেল। সে পথ শুঁকে শুঁকে চোরের মত খোলা দরজায় এল। শিকার অতি সহজলভ্য। হাঁসটির গোল চোখের সঙ্গে খেঁকশিয়ালের সবুজ চোখের দৃষ্টি-বিনিময় হল। খেঁকশিয়াল গুটিশুটি মেরে বসে পড়ে লাফ দিল। *

অনুবাদক—শ্রীগোপাল ভৌমিক

---

* আইরিশ লেখক উইনিফ্রেড লেটসের (Winifred Letts) Fear the Fox গল্পের অনুবাদ।

ছাত্রদের মানসিক বয়ঃক্রম ও বর্গীকরণ

অধ্যাপক শ্রীতনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ

["শিক্ষাসত্র" বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতনের শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত একটি আদর্শ পল্লীবিদ্যালয়। রবীন্দ্রনাথ-প্রদর্শিত আদর্শে এবং বীরভূম পল্লী-জীবনের বাস্তব সমস্যার সংঘাতে এই বিদ্যালয় নানা পরীক্ষার সাহায্যে পল্লী-বালকদের শিক্ষার বহু নূতন উপায় সন্ধান করেছে দীর্ঘকাল ধরে। বর্তমান প্রবন্ধের লেখকেরও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষার অভিজ্ঞতা সুদীর্ঘকালের। "শিক্ষা-সত্রে"র কার্যপদ্ধতির, বিশেষ করে ছাত্রদের "বর্গীকরণের" (grouping) পদ্ধতির যে সূক্ষ্ম বিচার ও আলোচনা তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে করেছেন, তার কয়েকটি অংশ আমরা "দেশে" প্রকাশ করলাম। শিক্ষাদান যাঁদের জীবনের সাধনা, তাঁরা বাঙলার তথা ভারতের যে-বিদ্যালয়েই নিযুক্ত থাকুন না কেন, এই রচনা থেকে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রস্তাব লাভ করবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। "শিক্ষাসত্রে"র পূর্ণতর পরিচয় বারান্তরে "দেশে"র অন্য কোন সংখ্যায় প্রকাশ করার ইচ্ছা আমাদের রইল। —সম্পাদক, 'দেশ'।

বিদ্যালয়ে বর্গীকরণ ব্যাপারটা সুসম্পন্ন করতে হলে প্রত্যেকটি ছেলেকে বিশেষ যত্নের সংগে পরীক্ষা করতে হবে। সে পরীক্ষার রীতি কি হবে সে-সম্বন্ধে আমাদের যা ধরণা তা আমরা খানিকটা বলতে চেষ্টা করব। কিন্তু তারও পূর্বে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম বৎসর, দ্বিতীয় বৎসর, তৃতীয় বৎসর, ইত্যাদি ক্রমে ছেলে-দের মানসিক বয়ঃক্রম অনুসারে সম্পাদ্য কাজের একটা খসড়া প্রস্তুত করা নিতান্ত প্রয়োজন। সেই খসড়ার সংগে মিলিয়ে প্রত্যেক ছেলের মান নির্ণয় করা হ'লে পরবর্তীকালে সে কতটুকু অগ্রসর হচ্ছে তা জানা সম্ভব হবে। এই খসড়া তৈরি করতে গিয়ে মনে রাখা দরকার হবে যে বিশেষ ক'রে শিক্ষাসত্রের বালকদের প্রয়োজন মেটানোই আমাদের উদ্দেশ্য।

পরীক্ষা সম্বন্ধে এক একটি বিষয় ধরে চলাই সঙ্গত।

প্রথম—বাঙলা ভাষা।

সর্বনিম্ন বর্গ গঠন করতে গিয়ে অনেক-গুলি পাঠ্যাংশ নির্বাচিত রেখে, বংশী, শ্রীদাম, সুবল, বলরাম, অমল ও অমূল্য—এদের প্রত্যেককে দিয়ে সেই পাঠ্যাংশগুলি পড়িয়ে দেখা প্রথম কাজ। এই পাঠ্যাংশ-গুলি পর্যায়ক্রমে প্রস্তুত থাকবে। প্রথম পর্যায়ে যুক্তাক্ষর বর্জিত শব্দই থাকবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবে এমন পাঠ্য অংশ যাতে অপেক্ষাকৃত সহজ যুক্তাক্ষর-সম্বলিত বাক্যই আছে। তৃতীয় পর্যায়ে থাকবে সকল প্রকার যুক্তাক্ষর মেশানো পাঠ্যাংশ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অথবা রামানন্দবাবুর দ্বিতীয় ভাগ মিলিয়ে সকল রকম যুক্ত অক্ষর নিঃশেষ করা হয়েছে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় এমন করে পাঠ্যাংশ নির্বাচন করতে হবে; প্রয়োজন বোধ করলে পাঠ্যাংশ নিজেরা প্রস্তুত করেও নিতে হবে। যুক্তাক্ষর পাঠে অপটু ছাত্র সর্বনিম্নবর্গে থাকবে এবং তাদের যুক্তাক্ষর পাঠের জ্ঞান সম্পূর্ণ করবার ব্যবস্থা করে তাদের প্রতি কর্তব্য পালন সুনির্দিষ্ট করে রাখতে হবে, যাতে কিছুকাল পরে পরীক্ষা ক'রে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এরা পরবর্তী বর্গের উপযুক্ত হয়েছে। অক্ষর পরিচয়ের পরীক্ষা ভালো করে করা হ'লে যদি দেখা যায় যে, সকল রকম যুক্তাক্ষর পড়ার বিদ্যা সকলেরই আয়ত্ত হয়ে আছে তাহলে নিম্নতম বর্গ গঠন করতে গিয়ে লেখার বিদ্যা কার কতটা আয়ত্ত হয়েছে তাই দিয়ে বিচার ক'রে নিতে হবে। লেখা সম্বন্ধে এই প্রসংগে একটা কথা বলবার দরকার আছে। সকল দিক দিয়ে বাঙলা ভাষার পরীক্ষা শেষ করে যখন বর্গ গঠন হ'য়ে যাবে তখনও লেখা সম্বন্ধে একটা পরীক্ষা করে জেনে নেওয়া ভালো হবে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ছাত্রই সকল প্রকার যুক্তাক্ষর সহজে লিখতে পারে কিনা। আমাদের আশঙ্কা আছে সকল বর্গেই কিছু ছাত্র পাওয়া যাবে যাদের কোনো কোনো যুক্তাক্ষর লেখায় ভ্রম বা ত্রুটি আছে। সকল প্রকার যুক্তাক্ষরই লিখবার প্রয়োজন হবে এমন কতকগুলি বাক্য রচনা করে রেখে সেগুলি মাঝে মাঝে শ্রুতলিপির জন্য ব্যবহার করলে পরীক্ষার কাজ সুসম্পন্ন হতে পারবে। যুক্তাক্ষর লেখার অজ্ঞতা ইদানীং এত বেড়ে গেছে যে এ-বিষয়ে আমাদের সমাহিত হবার প্রয়োজন খুব বেশী।

পড়া ও লেখা ছাড়া বাঙলা ভাষায় জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের জন্য আরও নানা-বিধ বিষয়ে যে মনোযোগ দিতে হবে সে তো বলাই বাহুল্য। আমরা উপস্থিত মতো কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ ক'রে রাখছি। কার্যক্ষেত্রে আবশ্যকমতো এ তালিকার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে নিতেই হবে। নিচে যে বিষয়গুলির তালিকা দেওয়া হ'ল এর কোন্‌টা কোন বর্গে কি ক্রমে শেখাতে হবে তার যথাযথ নির্দেশ দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, আর তার প্রয়োজনও নেই। অধ্যাপকরা তাঁদের বিবেচনায় যে পর্যায়ে যা শেখাতে হবে স্থির ক'রে নেবেন। এইবারে বিষয়গুলির নাম করা যাক্‌—

১। পঠিত বিষয়ের মর্ম গ্রহণ—পরবর্তী সোপানের তো কথাই নাই, এমন কি দ্বিতীয় ভাগ (রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ') পড়বার সময়ও শুধু পাঠচর্চার উৎকর্ষই একমাত্র লক্ষ্য না হয়ে পড়ে। যাই পড়া হোক্‌ না কেন, তার সম্বন্ধে আলোচনা নিতান্ত আবশ্যক। শিক্ষার্থীর সংগে বইয়ের সম্বন্ধ জ্ঞান বিস্তারের সম্বন্ধ, শুধু অভ্যাসগত যান্ত্রিক ক্রিয়ায় যেন সে-সম্বন্ধের সমাধি না হয়। সাত আট বছরের একটি ছেলে তার জীবনের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে যে-সকল তথ্য আহরণ করে, তার পরিধি তুচ্ছ করবার মতো নয়। নানাপ্রসংগে পাঠ্য-পুস্তকে যে-সব তথ্য বা তত্ত্বের কথা এসে পড়ে তার সংগে শিক্ষার্থীর পূর্বলব্ধ জ্ঞানের সংযোগ ঘটিয়ে জ্ঞানের পরিসর ও গভীরতা বৃদ্ধির সুযোগ অপর্যাপ্ত। এ সুযোগের উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারলে প্রথম লাভ হবে এই যে, শিক্ষার্থী বইকে তার জীবনের ধারার সংগে যুক্ত দেখতে পেয়ে তাকে আত্মীয় জ্ঞানে আশ্রয় করবে; দ্বিতীয় লাভ হবে, শিক্ষককে শিক্ষার্থী বই ও তার নিজের মধ্যে অবস্থিত সেতুর মতো মনে করে তাঁর প্রতিও বিশ্বাসবান ও আকৃষ্ট হবে। তৃতীয় লাভ হবে, কোনো বিষয় সম্বন্ধে প্রাসংগিক দু'চার কথা গুছিয়ে বলবার শক্তি বৃদ্ধি পাবে। অবশ্য পাঠ্যপুস্তকের যে-অধ্যায় যখন পড়া হবে শিক্ষক মহাশয়কে সেই অধ্যায় সংক্রান্ত প্রশ্ন সুকৌশলে প্রণয়ন করে রাখতে হবে। সুচিন্তিত প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া শিক্ষাব্যবসায়ীর কাজে সিদ্ধিলাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

২। বর্ণবিন্যাস—যুক্তাক্ষর পড়তে ও লিখতে পারা সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে এ প্রসংগেও তা খাটে। ইদানীং বর্ণবিন্যাসে অশুদ্ধি আমাদের অন্যায় রকম চোখসওয়া হয়ে গেছে। প্রয়োগের প্রয়োজনক্রমে আমাদের ভাষার শব্দগুলি তিন-চার পর্বে বিভক্ত করে তিন-চারটি তালিকা প্রস্তুত ক'রে রাখা যেতে পারে। প্রথমবর্গের উপযোগী তালিকার সকল শব্দের বর্ণ-বিন্যাস যাতে পরবর্তী বর্গে উত্তীর্ণ হবার আগে শিক্ষার্থীরা [illegible]

সে-বিষয়ে সাবধান হওয়া চলে। এমনি করে ক্রমান্বয়ে নির্বাচিত শব্দের তালিকাগুলি নিঃশেষ করে তবে যেন কোনো শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের শেষ সোপান অতিক্রম করে—এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া খুবই সম্ভব।

৩। শব্দার্থ—বাঙলা ভাষায় প্রচলিত শব্দের গুরুত্বক্রমে চার-পাঁচটি তালিকা প্রস্তুত করা এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম কর্তব্য। ছ-সাত বৎসর বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হলে যেসব শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তাদের তাৎপর্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয়েছে, এ বিষয়েও নিশ্চিত হওয়া এ প্রণালীতে সুসাধ্য।

৪। লিখিত বাঙলা রচনার যতিবোধ—এ বোধের জন্ম হয় পাঠ-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে। এক একটা বাক্য যে কোনো বিষয়ে কিছু বলতে গিয়ে আকার নেয়, এ কথাটা গোড়া থেকেই শিক্ষার্থীদের মনে মুদ্রিত হবার দরকার হয়। পড়তে গেলেই এ-বিষয়ে তারা যাতে সচেতন হয়, সেদিকে শিক্ষকমহাশয়দের দৃষ্টি থাকলে, সহজেই যতিবোধ জন্মগ্রহণ করবে। পরবর্তীকালে যখন কোনো বিষয়ে কোনো শিক্ষার্থী কিছু লিখবার চেষ্টা করবে, তখন এই বোধ যাতে কতকগুলি চিহ্নকে আশ্রয় করে পরিণতি লাভ করে, সে-বিষয়ে শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের লেখা যে-কোনো রচনায় দৃষ্টিপাত ক'রে তাদের কোথায় কোন্ চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে, তা জানিয়ে দিলে কিছুদিন পরেই দেখা যাবে যে, লিখিত রচনা সহজেই পড়া চলে ও বোঝা যায়। **হস্তলিপি** সম্বন্ধে যেটুকু বক্তব্য, তাও এই প্রসঙ্গে ব'লে রাখা ভলো। কিছু লিখলে তা অনায়াসে পাঠ্য হবার প্রয়োজন আছে। অতএব অক্ষর সুগঠিত করা প্রত্যেক শব্দের পর যথাযোগ্য ব্যবধান রক্ষা করা এবং পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে নিয়মিত ব্যবধান রাখা, এই তিনটি বিষয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্গে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দুঃসাধ্য নয়। দু-বৎসরকাল কম নয়, শিক্ষকমহাশয়দের দৃষ্টির একাগ্রতা থাকলে তৃতীয় বর্গে উত্তীর্ণ কোনো ছাত্রের পক্ষে হস্তলিপির অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা একেবারেই বর্জন করা অতিশয় সুসাধ্য।

৫। ব্যাকরণ জ্ঞান—

বাঙালীর পক্ষে বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ শেখা স্বভাবতই ভাষা-পরিচয়ের আনুষঙ্গিক একটা ব্যাপার। আলাদা ক'রে ব্যাকরণের সূত্র আয়ত্ত করবার প্রচেষ্টা ৬।৭ বছর থেকে ১৩।১৪ বছরের কোনো ছেলের পক্ষে একরকম নিষ্প্রয়োজন বললেও অযৌক্তিক কিছু বলা হয় না। ব্যাকরণের যতটুকু বিদ্যা অনধিগত থাকলে স্বকৃত লিখিত বা মৌখিক ভাষাপ্রয়োগে অথবা অপরের লিখিত বা মৌখিক ভাষার যথাযথ তাৎপর্য গ্রহণে অপরিণতজ্ঞান হ'য়ে থাকবার আশঙ্কা আছে, ততটুকু বিদ্যা শিখিয়ে দেবার আয়োজন করলেই যথেষ্ট। সে বিদ্যার পরিধি যত সঙ্কীর্ণ ক'রে রাখা যায় ততই মঙ্গল। তবে অবশ্য-জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি সুবিবেচনার সঙ্গে নির্ণয় ক'রে নিয়ে শিখিয়ে দেবার ব্যবস্থা রাখতেই হবে। যে সোপানে যে তথ্য সহজে অধিগম্য, সে সোপানের জন্য সে তথ্য আগে থাকতেই সুনিশ্চিত ক'রে রাখা প্রয়োজন।

৬। এ পরিচ্ছেদে যে-সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হবে, সেগুলি সবই ভাষার মর্মগত উৎকর্ষ সম্পর্কীয়। পঠিত অংশের মৌখিক ও লিখিত পুনরাবৃত্তি, নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ অথবা অনায়াসমাহৃত জ্ঞানের মৌখিক ও লিখিত নিবেদন. স্বরচিত প্রবন্ধে সংগত চিন্তার ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং সব শেষে ভাষা ও সাহিত্যজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার ধারাকে বিস্তারে ও গভীরতায় পরিপুষ্ট ক'রে তোলা—এ সকলই বাঙলা ভাষা শিক্ষার অঙ্গীভূত। শেষোক্ত বিষয়টি মুখ্যতঃ শেষের দুই বৎসরের জন্য স্থগিত রেখে, অপর তিন বিষয়ে প্রথম থেকেই শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। যে-কোনো বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রকাশে ছাত্ররা যাতে সাবধান হয় এবং সুনির্ধারিত নির্দেশ মেনে তারা যাতে প্রকাশভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রিত করতে অভ্যস্ত হয়, শিক্ষকমহাশয়দের সেদিকে দৃষ্টি না রাখা যে পূর্ববর্তী সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ ও অন্তঃসারহীন ক'রে ফেলে, একথা বলাই বাহুল্য। নানা বস্তু ও নানা বিষয় সম্বন্ধে নির্বাচিত প্রবন্ধ নিয়ে দেখিয়ে দেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে যে, মনের কথা প্রকাশ করা হয় যে ভাষার সাহায্যে, সে ভাষার বস্তু বা বিষয় বা ক্ষেত্রভেদে বিশেষ বিশেষ গুণযুক্ত হ'তে হয় এবং তা না হ'লে প্রকাশ-ক্রিয়ার সার্থকতা ক্ষুণ্ণ হয়।

বাঙলা ভাষার কথা বলা হ'ল। এইবারে অন্যান্য বিষয়গুলির কথা পাড়বার সময় হ'য়েছে। তবে বিষয়ান্তরে যাবার পূর্বে আমাদের বক্তব্য এই যে, শিক্ষাসত্রের সকল ছেলেরই উপরে—নির্দিষ্ট বাঙলা ভাষার নানা দিকে কতখানি উন্নতি হয়েছে, তার একটা হিসাব নিয়ে বৎসরের পরবর্তী অংশের কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে।

দ্বিতীয়—গণিত।

ক্রম অনুসারে শিক্ষণীয় বস্তুর জ্ঞান পরীক্ষা গণিতের বেলায় বাঙলা ভাষার চেয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রত্যেক বর্গের কার্য কোন্ সীমায় পৌঁছবে, তা নির্দিষ্ট করে নিয়ে গণিতসংক্রান্ত প্রত্যেক নিয়মের কতকগুলি প্রশ্ন দিয়ে প্রত্যেক ছাত্রকে পরীক্ষা করার দরকার হবে। একই নিয়মের পাঁচটি অঙ্ক কষতে গিয়ে যদি কারও অন্ততপক্ষে তিন-চারটি নির্ভুল হয়, তবেই মনে করতে হবে যে সে-নিয়ম আয়ত্ত হয়েছে। আমাদের পক্ষে এ-রকমভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তত সময় আমাদের হাতে ছিল না।

গণিত সম্বন্ধে সাধারণভাবে গুটিকতক কথা ব'লে আমাদের বক্তব্য শেষ করব। শিক্ষা-সত্রের শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে শিক্ষার্থী গ্রামে ফিরে যাবে এটা আমাদের ধ'রে নিতে হবে। গ্রামে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে গিয়ে সাধারণত যে-সকল হিসাব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, সে-সবই শিখতে হবে। এই গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথাটা উপরি-উপরি শুনলে মনে হবে এর গুরুত্ব নেই, কিন্তু আমাদের মনে হয়, এর গুরুত্ব প্রথমটির চাইতেও বেশি। কথাটা এই—গণিতশাস্ত্রে কতকগুলি নিয়ম আছে যার সাহায্যে কয়েকটি প্রক্রিয়া সম্পাদন করা যায়। এ-রকম প্রক্রিয়াগুলি নির্ভুলভাবে সম্পাদন করতে পারলে গণিতের সেই অংশে কারও নিপুণতা জন্মেছে বলা যায়। অপর কতকগুলি প্রক্রিয়া আছে, যেখানে কোন্ কোন্ নিয়মের প্রয়োগ করতে হবে, প্রশ্নে তার কোনো নির্দেশ থাকে না। বিচার ক'রে স্থির করতে হয় কোন্ কোন্ নিয়মের প্রয়োগ করলে সমস্যার সমাধান হবে। এই বিচারবুদ্ধির উন্মেষসাধন আমাদের মতে গণিতের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রথম সোপান থেকেই নিতান্ত প্রয়োজন। প্রথম চারটি প্রক্রিয়া—যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ—শুধু অভ্যাসক্রমে করানোর আগে, নানারূপ বাস্তব অবস্থার কল্পনা ক'রে বাস্তব জীবনের ছোটোখাটো হিসাব নানারূপ বস্তুকে কল্পিত আখ্যায় আখ্যাত ক'রে শিখিয়ে নেওয়া খুবই ফলপ্রদ হয়। শুধু অঙ্কের রাশি অর্থহীন ও অবাস্তব এবং সেইজন্যেই অপরিণত মনে অত্যন্ত দুরধিগম্য। এ-বিষয়ে কোনো দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা এ প্রস্তাবে অনাবশ্যক। মোট কথা, বস্তুজগতে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চোখের উপর হাতের চালাচালিতে যে ফল ফলায় কাগজের উপর বহু কৃত্রিম সংখ্যাবিন্যাসের কষ্ট অতিক্রম ক'রে সে ফল ফলাতে বিড়ম্বনার অবধি থাকে না।

তৃতীয়—ইতিহাস ও ভূগোল

ইতিহাস ও ভূগোল আমরা একই পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিচ্ছি, তার কারণ উল্লেখ করা এ আসরে বাহুল্য। তবে এটুকু বলে রাখাই ভালো যে, সাধারণত বিদ্যালয়ে এ-দুটি বিষয় অবিচ্ছেদ্য হ'লেও এত পরস্পর-বিচ্ছিন্নভাবে এদের চর্চা করানো হয় যে, দুই বিদ্যারই অধিকার সঙ্কীর্ণ এবং অধিকাংশক্ষেত্রেই ভ্রমসঙ্কুল হয়ে থাকে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ইতিহাসের তথ্য বা তত্ত্ব প্রত্যক্ষ জ্ঞানগোচর নয়, মনোজগতের নানাবিধ শক্তির কল্পনা, স্মৃতি, তুলনা ইত্যাদি প্রয়োগে অভ্যস্ত হ'লে ইতিহাসের কথা রূপ ও আকার নেয়। ছেলেদের বুদ্ধি-গ্রাহ্য হ'তে গেলে ইতিহাসকে ভূগোলের পরিচ্ছদে প্রকাশিত করা দরকার। কোনো

জাতির ইতিহাস কোনো একটি বা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহু দেশের ঘটনাপরম্পরায় অগ্রসর হ'য়ে থাকে। কাজেই, দেশের নানাবিধ বিবরণের আলোকপাতেই জাতির ইতিহাস পরিপুষ্ট হয়। সুতরাং নানা দেশের মানচিত্র যেমন ভৌগোলিক জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়, ইতিহাসের জ্ঞানবিকাশেও মানচিত্র তেমনিই প্রয়োজনীয়। মানচিত্রের অন্তরালে ভূপৃষ্ঠের যে বাস্তবরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে, তা সহজভাবে জ্ঞানগোচর হ'তে যে দৃষ্টিশক্তির উন্মেষ নিতান্ত আবশ্যক, তার চর্চা করানো ইতিহাস ও ভূগোলের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রথম সোপান। সুতরাং প্রচলিত ধারাক্রমে ইতিহাস শিক্ষা আরম্ভ করবার আগে ছেলেদের ভৌগোলিক নানা তথ্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটানোই সংগত। এ পরিচয়ের পরিধি কতদূর বিস্তৃত হবে এবং কি রকম ক্রম অনুসরণ ক'রে এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে, তার কোনো নির্দেশ দেওয়া আমাদের কর্তব্য নয়। তবে শিক্ষাসত্রের ছেলেদের কথা মনে রেখে ভূগোল ও ইতিহাস শিক্ষার মূলসূত্র অনুসন্ধানের একটু চেষ্টা করা যেতে পারে। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তার সম্বন্ধে সব ছেলের মনে এ ধারণাটা স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, আজকের দিনের পৃথিবীর এক অংশ অপর অংশের সঙ্গে নানা সম্বন্ধের বন্ধনে আবদ্ধ। পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষের জীবনযাত্রা এমন পথ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে যে, সে পথে চলতে গিয়ে পৃথিবীর নানা দেশের ও নানা জাতির বিবিধ প্রকারের কর্মপ্রবৃত্তির সঙ্গে পরিচয় ঘটা অবশ্যম্ভাবী। ছেলেরা যাতে এ বিষয়ে সচেতন হয়ে বাস করতে শেখে এবং রোজকার জীবনযাত্রায় এই জ্ঞানের প্রভাব যাতে তাদের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণের বুদ্ধিকে উজ্জীবিত করে—এই চেষ্টাই যেন ভূগোল-শিক্ষার মূলসূত্র হ'তে পারে। ইতিহাস-শিক্ষার মূলসূত্র খুঁজে দেখতে গেলে, প্রথমেই মনে পড়ে মানুষের পৃথিবীর পৃষ্ঠে আনাগোনার কথা। এখন যারা যেখানে আছে, তারা যে এককালে সেখানে ছিল না; আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, শাসনপদ্ধতি—এসব ব্যাপারেই যে এক দেশ বা এক জাতি, অপর দেশ বা অপর জাতির দ্বারা কালের নানা যুগে এবং মানবসমাজের নানা অবস্থা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে, কত প্রভাবান্বিত হ'য়েছে, সেদিকে দৃষ্টি খুলে দেওয়াই বোধ হয় ইতিহাস শিক্ষার মূলসূত্র হ'তে পারে। এই মূলসূত্র অবলম্বন ক'রে পৃথিবীর ইতিহাসের কতখানি শিক্ষাসত্রের ছেলেদের জ্ঞানগোচর করা দরকার, তার সীমা নির্দেশ করা আমাদের এখানকার কাজ নয়। সে সীমা ঠিক ক'রে নিতে হবে পাঠ্যবস্তুর তালিকা প্রণয়নের সময়, জ্ঞাতব্য তথ্যগুলির শিক্ষাক্রম নির্ধারণের কাজও সেই সঙ্গেই করতে হবে। কেবল উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার রাখবার জন্যেই মূলসূত্র বিচারের প্রয়োজন হ'ল। উপযুক্ত সীমায় ঘিরে নিয়ে ইতিহাসের যতটুকু জ্ঞানই ছেলেদের দেওয়া হবে, তার ফলে যেন তারা এ কথাটা বোঝে যে, পৃথিবীর নানা অংশে যেসব জাতি বাস করছে, তারা অনেক অংশে যেমন পরস্পর থেকে পৃথক্, আবার অনেক অংশে তেমনি সমভাবাপন্ন। নানা সময়ে যেমন নানা জাতির মধ্যে সংঘর্ষ ঘটেছে, নানাসূত্রে আবার তেমনি সংস্কৃতিগত পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতাও ঘটেছে। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস নিয়ে কথা পাড়তে গেলে আলোচনা এত ব্যাপক হয়ে ওঠে যে, শিক্ষাসত্রের ছেলেদের পক্ষে তা দুরধিগম্য হবার আশঙ্কা আছে। সেইজন্যে প্রথম আরম্ভের পক্ষে বোধ হয় ভালো হয় পারিপার্শ্বিক গ্রামের ও সমাজের লোকদের কালক্রমে অবস্থা ও ব্যবস্থার পরিবর্তনের ধারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করানো এবং তারপর এই সব পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত নিয়ামক শক্তিগুলির প্রয়োগ বিস্তৃততর ক্ষেত্রে কিছু কিছু দেখিয়ে দেওয়া, যাতে ক'রে বুদ্ধির পরিণতিলাভের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস থেকে পাওয়া জ্ঞান জীবনের নানা ক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করে।

ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধে এতখানি কথা বলার দরকার হ'ল বিশেষ ক'রে এইজন্যে যে, এ দুই বিষয়েই ছেলেদের অর্জিত জ্ঞান বিদ্যালয় পরিত্যাগের কিছুদিন পরই একেবারে নিরর্থক হয়ে যায়। অথচ গ্রামের লোকের পক্ষেই এই দুই বিষয়ের জ্ঞান এক হিসেবে সবচেয়ে দরকারী। বর্তমান যুগে শিক্ষাভিমানী সম্প্রদায়ের নানাবিধ উন্নতি করবার চেষ্টার প্রশস্ত ক্ষেত্র হয়ে ওঠে গ্রাম। অপরপক্ষে শাসক সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক হয়ে উঠবার চেষ্টাও গ্রামে গিয়ে মুহুর্মুহু হানা দেয়। এরকম অবস্থায় স্থিরচিত্তে সকল পক্ষের বক্তব্য বিচার ক'রে দেখবার শক্তিবৃদ্ধি করা আর কিছুর জন্যে না হ'লেও অন্তত নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে বিশেষ দরকার। পৃথিবী এখন বাঙলাদেশের পল্লীগ্রামেও যখন তখন ঢুকে পড়ছে, সুতরাং তার দুরকম সত্যিকার পরিচয়ই, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক, বাঙালী গ্রামবাসীর পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। বর্গনির্ণয় কার্যে ইতিহাস ও ভূগোলের পরীক্ষা কেমন ক'রে সম্পন্ন করতে হবে সে সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে এখন কিছু বলা শক্ত। কোন্ বর্গে কতখানি জানা দরকার তা ঠিক না ক'রে বর্গীকরণের জন্য পরীক্ষা করা অর্থহীন।

বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধেও এই মন্তব্য খাটবে। ঐ দুই বিষয়ে মূলসূত্রের কিছু ইঙ্গিত করবার চেষ্টা পরে করা হচ্ছে। এখন ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা সাধারণ কথা ব'লে রাখছি। সমস্ত শিক্ষাসত্রের ছাত্রদের পরীক্ষা ক'রে যা আমরা বুঝেছি তাতে আমাদের মনে হয় বাঙলা, অঙ্ক, এবং বয়সোপযোগী সাধারণ জ্ঞানের বহর দেখেই বর্তমানে বর্গ নির্ণয় করা ছাড়া অন্য গতি নেই। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যতত্ত্বের জ্ঞাতব্য তথ্যগুলির সীমা ও ক্রমনির্দেশ কার্য শেষ করা হয়ে গেলে, একবার এসব বিষয়ের পরীক্ষা করা যেতে পারবে। তখন আপাতত কাজ চালানো গোছের বর্গীকরণ ব্যাপারের একটু-আধটু অদল-বদল দরকার হ'লে করে নেওয়া যেতে পারে।

এইবারে বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যতত্ত্বের সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ ক'রে আমাদের মন্তব্য শেষ করব।

চতুর্থ—বিজ্ঞান

বিজ্ঞান বলতে আজকাল যে সকল বিদ্যার কথা মনে পড়ে তার সংখ্যা এত বেশী যে, কোনো ছেলে বিজ্ঞান শিখছে শুনলে তার শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিধি নির্দিষ্ট রকম জানবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে ওঠে। প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য অথবা উচ্চ বিদ্যালয়গুলির বিভিন্ন সোপানের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যবস্তুর তালিকা পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের মনে হয় শিক্ষাসত্রের ছেলেদের বিজ্ঞানে অধিকার সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের হওয়া উচিত। বিজ্ঞানের কোন্ শাখায় কি পরিমাণ বিদ্যা অর্জন করা উচিত তা যখন ঠিক করা হবে তখন এই কথাই সব চাইতে বেশি মনে রাখতে হবে যে, ছেলেদের প্রত্যেকের জীবনযাত্রায় তারা যেন এমন দৃষ্টিসম্পন্ন হ'য়ে চলতে পারে যে, যত কিছু ঘটনা ঘটে তার ভিতর সব সময়েই যে কার্যকারণ সম্বন্ধের অস্তিত্ব আছে এ বিষয়ে বিশ্বাস অটল থাকে। এ দৃষ্টি খুলে দেওয়া খুবই কঠিন কাজ। নানারকম সংস্কারের জালে জড়িত বিশ্বাসের বেলায় ও-রকম দৃষ্টিরশ্মির প্রবেশ দুষ্কর। তবে এরকম সংস্কারাচ্ছন্ন পরিস্থিতি যখন পৃথিবীর সর্বত্রই তখন দুষ্কর হ'লেও একাজে লেগে থাকবার উপযোগী অনুকূল আবহাওয়া একেবারে নেই ব'লে হতাশ হবারও কোনো কারণ দেখা যায় না। যে কারণে ইতিহাস ও ভূগোলের যথাযথ জ্ঞানের এত গুরুত্ব, ঠিক সেই কারণেই বিজ্ঞানের গুরুত্ব আরও বেশি। ইতিহাস ও ভূগোল যেমন পৃথিবীর সঙ্গে একরকম পরিচয়ের ভিতর দিয়ে মানুষকে তার ব্যক্তিগত অবস্থানের দায়িত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে, বিজ্ঞান তেমনি তাকে সতর্ক করে তার জীবন ব্যাপারে প্রতি তুচ্ছ ঘটনা যে কার্যকারণের শৃঙ্খলে গ্রথিত—এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে। যখনই কেউ কোনো কাজ করছে তখনই যে তার একটা নতুন দায়িত্ব জন্মগ্রহণ করছে এ বোধ একবার হ'লে কোনো মানুষের সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু

ভাববার থাকে না। এরকম বিজ্ঞান শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক কেমন হবে তার সুনির্দিষ্ট ধারণা আমরা দিতে পারব না, তবে এইটুকু বলতে পারা যায় যে, শুধু বই পড়িয়ে হবে না, প্রতিদিনকার নানা কাজের ক্ষেত্রে এবং নানা বিষয় ও বস্তুর সঙ্গে পরিচয়ে অসংখ্য বৈজ্ঞানিক তথ্যের গা ঘেঁষে আমরা চলছি, সেইগুলি জানিয়ে দিয়ে ছেলেদের জানবার ইচ্ছেটাকে যতদূর সম্ভব তীব্র করে দিতে পারলে সময়মতো তারা নিজেরাই বইপত্র ঘেঁটে নতুন নতুন প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিতে চাইবে। মোটকথা বিজ্ঞান শুধু বিদ্যায় পর্যবসিত হবে না, জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে তার প্রভাব কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করবে। এর প্রয়োজন খুব বেশি, আর এরকমভাবে ছেলেবেলা থেকে তৈরি হওয়ার সুযোগেরও অভাব নেই। শুধু উপযুক্ত আবহাওয়া তৈরি করে নিতে পারলেই শিক্ষক ও সমাজের কর্তব্য সম্পন্ন হ'ল বলা যেতে পারে।

পঞ্চম—স্বাস্থ্যতত্ত্ব

স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়-গুলি প্রচলিত যে-কোনো বইয়ে পাওয়া যায়। তাতেই অনেকখানি অভাব মিটবে। বিজ্ঞানের সঙ্গে স্বাস্থ্যতত্ত্বের শিক্ষার বিষয় হিসেবে তুলনা ক'রে আমাদের মনে হয়েছে যে, স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিত বইগুলি যতটা গ্রামের অবস্থা মনে রেখেছে বিজ্ঞানের বই তা রাখেনি। সুতরাং শিক্ষাসত্রের জন্য পাঠ্যবস্তু ও তার ক্রমনির্ধারণে বইগুলি খানিকটা সহায় হবে। স্বাস্থ্যতত্ত্বের শিক্ষায় মূল-সূত্রের নির্দেশ করতে গেলে একটা মুস্কিল হচ্ছে এই যে, এমন একটা সত্যের উল্লেখ করতে হয় যা অতি পরিচিত ব'লে অবজ্ঞাত, এবং প্রায় অসত্যের পর্যায়ভুক্ত। কথাটা এই—স্বাস্থ্যতত্ত্বের তত্ত্ব প্রয়োগ করবার ক্ষেত্র যখন প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিকটতম সত্ত্বা, তখন তত্ত্বগুলি প্রয়োগের অভাবে যেন অসত্য ও অবাস্তব হয়ে না থাকে। ছেলেদের নিজ দেহ, বাসগৃহ ও পরিবেশ সর্বত্রই যে তত্ত্বান্বেষীর, ও তত্ত্ব-দর্শীর দৃষ্টি পড়ছে এ যেন বুঝতে কারও বেগ পেতে না হয়।

আমাদের মন্তব্যগুলি এবারে শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু বিশেষ করে বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের একটু কথা বলবার আছে। অন্য সব পাঠ্য বিষয় থেকে এদের একটু আলাদা ক'রে দেখবার দরকার আছে। বাঙলা ভাষার ব্যবহারে পটুতা না থাকলে, গণিতে বিশেষ অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হ'লে, ইতিহাস ও ভূগোলের জ্ঞানলাভ ক'রে পৃথিবীতে নিজের অবস্থান সুনিশ্চিতরূপে জেনে চলবার সুযোগ না ঘটলে, ব্যক্তিবিশেষের যতটা ক্ষতি, বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যতত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় এবং ঐ দুটি শাস্ত্রে উদ্ঘাটিত সত্যের প্রতি ব্যবহারিক জীবনে নিষ্ঠা না থাকলে তার চাইতে অনেক বেশি ক্ষতি। সেইজন্যে আমাদের মনে হয় যে, বর্তমান শিক্ষা ব্যাপারে এ দুটি বিষয় পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যদি অশ্রদ্ধার ভাব কাটিয়ে উঠতে না পারে ও তার ছোঁয়াচ শিক্ষাসত্রেও যদি লাগে তবে এসত্রে এসে গ্রামের ছেলেরা যা নিয়ে যাবে তাতে তাদের সত্যিকার শক্তিবৃদ্ধি না হয়ে বরং ছোঁয়াচে রোগের প্রাদুর্ভাবে নানারূপে শক্তি-ক্ষয় হবে। আমাদের শিক্ষার আয়োজনে এই দুইটি বিদ্যার আগমন হয়েছে পরে, কিন্তু এদের গুরুত্ব কারও চাইতে কম নয়। আমাদের এই সত্যে বিশ্বাস জীবন্ত হলে তবেই ভবিষ্যতে দেখা যাবে যে, এই দুই বিদ্যায় বিদ্বান হ'লে, ও এদের প্রভাবে কর্ম-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করলে, শিক্ষাব্রতী সকল সম্প্রদায়েরই পরম সম্পদ লাভ হ'য়েছে।

জীবন-সাহারা

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

সবিনয় নিবেদন,

গত সংখ্যায় শ্রীনিরঙ্কুশ চট্টোরাজের "জীবন-সাহারা" গল্পটি ছাপিয়াছি বলিয়া আপনি একসঙ্গে দুঃখিত এবং রাগান্বিত হইয়া আমাকে যে পত্রাঘাত করিয়াছেন, তাহার জবাবে লিখিতেছি: আপনি লিখিয়াছেন আমার অতুলনীয় মাসিকের মূল্যবান পাঁচটি পৃষ্ঠা অমন জঘন্য গল্প, বিশেষ করিয়া এই কাগজ-দুর্ভিক্ষের দিনে ছাপিয়া নষ্ট করিয়া আমি যে অমার্জনীয় অপরাধ করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত শাস্তির বিধান পেনাল কোডে নাই, কিন্তু থাকা উচিত ছিল। লিখিয়াছেন, "গল্পটি অশ্লীল নহে যে, গোপনে পড়িয়া উপভোগ করিয়া প্রকাশ্যে না পড়িয়া নিন্দা করিব; হাসির নহে যে, হাসিব; করুণ নহে যে, কাঁদিয়া চোখের জলে রুমাল ভিজাইব। চট্টোরাজ মহাশয় গল্পটি কেন লিখিয়াছেন, তাহা যদি বা বুঝিতে পারি, আপনি কি কারণে তাহা আপনার কাগজে ছাপিলেন, তাহা বুঝিতে পারার সাধ্য আমার নাই। গাধা না হয় নিজের গান রেকর্ড করাইতে গ্রামোফোন কোম্পানীতে গেল; তাই বলিয়া কি গ্রামোফোন কোম্পানী তাহার গান সযত্নে রেকর্ড করিয়া বাজারে ছাড়িবে?..........."

আপনি আরো অনেক কিছুই লিখিয়াছেন, যাহাতে আমি মনে বড় ব্যথা পাইয়াছি—আমার নিজের জন্য নহে, চট্টোরাজ মহাশয়ের জন্য। আমি সম্পাদক মানুষ, বহু লেখকের গালি, অভিশাপ প্রভৃতি বাধ্য হইয়াই সহ্য করিয়াছি। একবার এক হতাশ লেখকের নিক্ষিপ্ত ইষ্টকখণ্ডে আমার মাথাটী দ্বিখণ্ডিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এখনও আমার মাথার বাহিরে ও ভিতরে রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং আমার নিজের জন্য আমি কোন দুঃখ করি না। কিন্তু আপনি আমার নামে লেখা চিঠিতে লেখক চট্টোরাজের প্রতি যে চোখা চোখা বিষাক্ত বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে চট্টোরাজের কিছু না হইলেও আমি যাতনায় জর্জর হইয়াছি।

আপনি, আপনি না হইয়া অপর কেহ হইলে এমন করিয়া জবাব লিখিতে বসিতাম না। আপনি বলিয়াই বসিলাম। আমার পুরাতনতম গ্রাহক হিসাবে আপনার কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়া কর্তব্য মনে করিতেছি। চট্টোরাজের প্রতি আপনার যে জ্বলন্ত আক্রোশ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা প্রকাশিত না হইলে তাঁহার আত্মার হয়তো শান্তি হইবে না। তিনি আর ইহজগতে নাই।

আপনি লিখিয়াছেন, নিরঙ্কুশবাবুর গল্পটি সাহারা বিশেষ। জবাবে বলি গল্পটির বিশেষত্বই ঐখানে। নিরঙ্কুশবাবুর জীবনী আমি জানি, বলিয়াই বলিতেছি, তাঁহার জীবনটাই ছিলো একটি সাহারা বিশেষ এবং তাঁহার জীবনের সাহারাত্বই তাঁহার রচিত গল্পে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। "জীবন-সাহারা" গল্পটি একটি সার্থক রচনা এইজন্য যে, প্রকৃতপক্ষে ইহা লেখকের জীবনেরই একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিচ্ছবি মাত্র। আপনি যে লিখিয়াছেন—গল্পটির কোন অর্থ আপনি খুঁজিয়া পান নাই, তাহাও খুবই স্বাভাবিক; কেন না নিরঙ্কুশ চট্টোরাজ মহাশয়ও তাঁহার জীবনের অর্থ খুঁজিয়া পান নাই।

আপনি চিঠিতে স্পষ্ট করিয়া না লিখিলেও আমার সন্দেহ হইতেছে, আপনি হয়তো সন্দেহ করিতেছেন — চট্টোরাজ মহাশয়ের সহিত বৈবাহিকসূত্রে আমার কোন সম্বন্ধ আছে অথবা তাঁহার নিকট হইতে আমি আর্থিক বা অন্য কোন প্রকার ঘুষ পাইয়াছি। আমার মাসিক পত্রিকার দোহাই, বিশ্বাস করুন, আমি ঐ জাতীয় কোন কারণে গল্পটি ছাপি নাই। অবশ্য সাময়িক পত্রিকাদির সম্পাদকগণের মধ্যে এরূপ ব্যাপার কেহই যে করেন না তাহা নহে। আমি একটি মাসিক পত্রিকার কথা জানি, যাহাতে এমন জনৈক লেখকের গল্প নিয়মিত বাহির হইয়া থাকে, যাহার গল্প অন্য কোন কাগজে অনিয়মিতভাবেও কখনো বাহির হয় নাই। ভদ্রলোক তাঁহার গল্প ছাপাইবার জন্যই অনেক কায়দা করিয়া সম্পাদকের সহিত একটা মধুর সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন; ঐ সম্পর্কটি তুলিয়া বাংলা, হিন্দুস্থানী ও উর্দু এই তিন ভাষাতেই গালি দেওয়ার রেওয়াজ আছে বলিয়া সম্পর্কটির উল্লেখ করিলাম না। ইঙ্গিতে বুঝিয়া লইবেন। কয়েকটি সাপ্তাহিক কাগজের কেলেঙ্কারিও জানি। ইঁহাদের অবিবেকী সংকীর্ণচেতা সম্পাদকগণ কয়েকজন লেখকের নিকট কালোবাজারের মাল সাদা দরে নিয়মিত পাইয়া থাকেন এবং তাহারই প্রতিদানে তাঁহাদের গল্প প্রায় নিয়মিতভাবেই ছাপিয়া থাকেন। তাঁহাদের বরাতে কি আপনার মত একজনও গ্রাহক বা পাঠক জোটে না?

এই জাতীয় আরও অনেক সম্পাদকী গুপ্তকথা আমি জানি। আপনিও হয়তো আভাষে ইঙ্গিতে কিছু কিছু জানিয়াছেন। এবং জানিয়াছেন বলিয়াই আমার উপরও আপনার সন্দেহ হইয়াছে।

আপনি ইঙ্গিত দিয়াছেন এরূপ ব্যাপার ভবিষ্যতে আবার কখনো হইলে আপনি আর আমার কাগজের মুখদর্শন করিবেন না এবং আমারও আর আপনার বার্ষিক চাঁদার মুখ দর্শন করার সৌভাগ্য হইবে না। ইহাতে আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছি, আপনার চাঁদার টাকার জন্য নহে, আন্তরিক কারণে। আপনিই আমার কাগজের প্রথম গ্রাহক বলিয়া আপনার চেহারা না দেখিলেও আপনার প্রতি আমার অন্তরের একটা টান রহিয়াছে। আপনার সহিত আমার এই সংযোগ-সূত্র ছিন্ন হইলে আমি যে কী মর্মান্তিক ব্যথা পাইব, তাহা আপনাকে বুঝাইয়া বলিবার ভাষা আমার নাই। আমি বরাবরই ভাবিয়া আসিয়াছি, আপনি আমার আগে মরিলে আপনার সচিত্র শোক-সংবাদ আমার মাসিকে ছাপিব এবং আমি আপনার আগে মরিলে শেষ মুহূর্তে পরমপিতার কাছে এই প্রার্থনা করিয়া যাইব,—"আমার কাগজের যখন একটিও গ্রাহক ছিল না, সেই দুর্দিনে যে দরদী মহাত্মা আমার কাগজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত জানিয়াও একসঙ্গে ছয় মাসের চাঁদা আগাম দিয়া গ্রাহক হইয়াছিলেন এবং সেই হইতে আজ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে গ্রাহকত্ব করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাকে হে ঈশ্বর, তুমি দীর্ঘজীবী কর। পুত্র, কন্যা, কলত্র ইত্যাদি সহ তিনি সুখে কালাতিপাত করিতেছেন সন্দেহ নাই; এই নিদারুণ যুদ্ধের বাজারে, হে ঈশ্বর, তাঁহার পুত্রকন্যার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার ব্যয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিও না।"

অতএব আমার কাগজ আর থাকিবে না—ইহা বরং আমার সহ্য হইবে, কিন্তু আপনি আর গ্রাহক থাকিবেন না, ইহা আমি সহিতে পারিব না। চট্টোরাজ মহাশয় তাঁহার রচিত আর একটি গল্প আমার কাছে রাখিয়া গিয়াছেন, এটিও যেন আমার কাগজে ছাপি, ইহাই ছিল তাঁহার অন্তিম অনুরোধ। আমি তাঁহার অনুরোধ শুনিয়া ছল্‌ছল চোখে মৌন ছিলাম। আমার মৌনতাকে তিনি সম্মতির লক্ষণ মনে করিয়াই তাঁহার গল্পটি ছাপা সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া চোখ বুজিয়াছিলেন কি না এবং ঐরূপ করিয়া থাকিলে গল্পটি আমার কাগজে ছাপিতে ধর্মত আমি বাধ্য আছি কি না জানি না। কিন্তু আপনি যেরূপ শাসাইয়াছেন, তাহাতে বাধ্য হইয়া

আপনাকে কথা দিতেছি, আপনার জীবদ্দশায় গল্পটি আমি ছাপিব না। মরণান্তে আত্মার অস্তিত্বে যে আমি বিশ্বাস করি, একথা আপনার জীবদ্দশায় আমাকে বাধ্য হইয়াই ভুলিয়া থাকিতে হইলে আপনার পরলোকগমনান্তে নিরঙ্কুশ চট্টোরাজ মহাশয়ের আত্মার তৃপ্তির জন্য গল্পটি আমাকে ছাপিতেই হইবে।

এইবার সংক্ষেপে বলি, "জীবন-সাহারা" গল্পটি কেন ছাপিলাম। গল্পটির লেখক নিরঙ্কুশ চট্টোরাজ ছিলেন আমার ছাপাখানার প্রধান কম্পোজিটার। ভদ্রলোক যৌবনে কম্পোজিটারী সুরু করিয়া নানা ছাপাখানা ঘুরিয়া প্রায় প্রৌঢ় বয়সে আমার ছাপাখানায় আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। অর্থাৎ আমিই তাঁহাকে অন্যত্র বিয়োগ দিয়া আমার এখানে যোগ দেওয়াইয়াছিলাম। গড়ানে পাথরের কপালে শ্যাওলা জোটে না বলিয়া একটা প্রবাদ আছে বটে, কিন্তু প্রবাদটির দুই গালে চূণকালি মাখাইয়া নিরঙ্কুশ পাথর মহাশয় এক ছাপাখানা হইতে অন্য ছাপাখানায় গড়াইয়া কপালে প্রচুর মূল্যবান্ অভিজ্ঞতার শ্যাওলা জুটাইয়াছিলেন, যাহা শেষকালে আমার ছাপাখানার প্রচুর উপকার করিয়াছিল। যাঁহারা নিরঙ্কুশবাবুকে দেখেন নাই তাঁহারা ধারণা করিতে পারিবেন না তিনি কি ছিলেন। আমার বিশ্বাস বিগত কয়েক জন্ম ধরিয়া তিনি ক্রমাগত কম্পোজিটারী করিয়া আসিতেছিলেন। নতুবা মাত্র দুই এক জন্মের সাধনায় অমন আশ্চর্য সিদ্ধি কল্পনাও করা যায় না।

নিরঙ্কুশবাবু নিরতিশয় গম্ভীর ছিলেন, নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কথা কহিতেন না, এবং ইসারায় সারিতে পারিলে আর আওয়াজ খরচ করিতেন না। কম্পোজিং ছাড়া তিনি আর কিছু জানিতেন বা জানা প্রয়োজন মনে করিতেন বলিয়াও মনে হইত না। ছাপাখানার মধ্যস্থতায় তাঁহার সহিত আমার সম্পর্ক নেহাৎ অল্পদিনের নয়, কিন্তু একদিনও আমার মনে হয় নাই যে তিনিও স্বামী হইতে পারেন, পিতা হওয়াও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে, জীবনের বিচিত্র সুখ দুঃখ তাঁহার মনকেও দোলা দিতে পারে, আকাশের তারা মর্ত্যের ফুল তাঁহার জন্যও ফোটে, সিনেমা-থিয়েটার বা গানের জলসায়ও তাঁহাকে দেখা যাইতে পারে...... অর্থাৎ তাঁহার সম্বন্ধে মাত্র একটি কথাই মনে হইত যে তিনি একজন পাকা কম্পোজিটার অন্যরূপে তাঁহাকে কোনোদিন কল্পনা করিবারই অবকাশ ঘটে নাই।

এহেন নিরঙ্কুশবাবু যেদিন মুখ (এবং মন) খুলিলেন তখন স্বাভাবিক কারণেই অবাক্ হইলাম। ছাপাখানার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে; অন্যান্য সবাই চলিয়া গিয়াছে, বসিয়া আছেন চুপচাপ্ একা একা নিরঙ্কুশবাবু। কহিলাম "সন্ধ্যা হয়ে এলো নিরঙ্কুশবাবু। বাড়ি ফির্‌বেন না?" "বেলা যায়" শুনিয়া লালাবাবুর যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে, নিরঙ্কুশবাবুর বোধ করি অনেকটা সেই অবস্থাই হইল। তিনি চম্‌কাইয়া উঠিয়া কহিলেন "সন্ধ্যা হয়ে এলো? তাইতো। বাড়ি-? হ্যাঁ, তাও তো ফির্‌তে হবে।" যে ক্ষেত্রে মাথা নাড়িয়া ইসারাতেই জবাব দেওয়া যাইতে পারিত সে ক্ষেত্রে তাঁহাকে একসঙ্গে এতগুলি কথা বলিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। পরে বুঝিয়াছি আমার আচম্‌কা প্রশ্নে তাঁহার ভিতরকার সুপ্ত দার্শনিকটি জাগিয়া উঠার ফলেই তাঁহার মনের এবং মুখের দুয়ার খুলিয়া গিয়াছিল।

একটা চেয়ার টানিয়া নিরঙ্কুশবাবুর পাশেই বসিলাম। নিরঙ্কুশবাবুও নিরঙ্কুশভাবেই কহিতে লাগিলেন "সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, খেয়ালই করিনি অ্যাদ্দিন। রাত যখন হবে, তখন অন্ধকারে পথ চিনে বাড়ি যেতে পার্‌বো কি? কে জানে? হয়তো পার্‌বো। হয়তো পথকে আমার চেনা দরকার হবে না পথই আমাকে চিনে নেবে।"

এ ধরণের দার্শনিক কথা আমার ভাল লাগিল না। বুঝিলাম ইঙ্গিতটি বড় সুবিধার নয়, ভদ্রলোক কাজ হইতে অবসর নিবার মতলব করিতেছেন। তাঁহার জায়গা কোনদিন খালি হইতে পারে এরূপ কল্পনাও কোনোদিন আমার মনে স্থান পায় নাই। নিরঙ্কুশবাবু বিদায় নিলে তাঁহার মত নির্ভরযোগ্য পাকা কম্পোজিটার তো পাইবই না, পরন্তু এ বাজারে নিরঙ্কুশবাবুকে যাহা দিই তাহার দ্বিগুণ দিয়াও একটা ভাল কম্পোজিটার পাওয়া যাইবে না। চিন্তিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম "আপনার শরীর খারাপ হয়েছে নাকি নিরঙ্কুশবাবু?"

নিরঙ্কুশবাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন "যা ছিলো তার চাইতে আর কি খারাপ হবে? শরীরের একটা চক্ষুলজ্জা তো আছে? তবে মনটা একটু উদাস উদাস লাগ্‌ছে বটে।"

সর্বনাশ! ছাপাখানার প্রধান কম্পোজিটারের মন উদাস!

চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করিলাম,—"বাড়িতে অসুখ নাকি কারো?"

নিরঙ্কুশবাবু কহিলেন, "বাড়িতে কেউ থাক্‌লে তো অসুখ কর্‌বে। আমার বল্‌তে দুনিয়ায় আমিই আছি সবেধন নীলমণি। ছিলো অবশ্য সবই এককালে—স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে। একে একে সব গেছে। আপনার এখানে যখন এলুম তখন আমি সর্বহারা।" তাহার শেষের কথাটিতে শুনিতে পাইলাম তাঁহার ব্যথিত চিত্তের হাহাকার। সেই প্রথম জানিলাম পৃথিবীতে নিরঙ্কুশ চট্টোরাজ একা, সর্বহারা। ভয় হইল তাহার এতদিনের চাপিয়া রাখা বৈরাগ্য এবারে ফাটিয়া বাহির হইয়া আমার ছাপাখানাকে না কানা করে। কেমন করিয়া ভদ্রলোকের মনের গতি বৈরাগ্য হইতে অন্যদিকে ঘুরাইয়া দিব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। মনের আবেগ ভাষা পাইলে মনটা অনেকটা হাল্‌কা হইয়া যাইবে এই আশায় নিরঙ্কুশবাবুকে অনর্গল কথা কহিয়া যাইবার সুযোগ দিয়া নীরবে শুনিতে লাগিলাম।

নিরঙ্কুশবাবু কহিতে লাগিলেন "আজ সন্ধ্যাবেলায় ভাব্‌ছি জীবনটা কি করে কাটালুম। ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারের মতো শুধু পরের সম্পদ নেড়ে চেড়েই গেলুম। অন্যের লেখা টাইপে সাজিয়ে দিই, তাই থেকে কাগজে ছাপা হয়। লোকে পড়ে আর বাহবা দেয় লেখককে। কিন্তু যে লোকটা এত মেহনৎ করে কম্পোজ করে দিলো, যা না হলে ছাপাই হতো না, তার কথা ভাব্‌লো না কেউ, তার নাম জান্‌লো না কেউ কত জাঁদ্‌রেল জাঁদ্‌রেল লেখককে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেল এই নিরঙ্কুশ চট্টোরাজ, অথচ সে মরে গেলে কেউ মনে রাখ্‌বে না তার নাম। লক্ষ লক্ষ লোক মরে যেভাবে তলিয়ে যাচ্ছে, সেও যাবে সেভাবেই তলিয়ে।"

বুঝিলাম তাঁহার অন্তরের ব্যথা। এত লোককে বিখ্যাত করিয়া দিয়া তিনি নিজে অখ্যাত থাকিয়া যাইবেন এ কল্পনাটা তাঁহার অসহ্য লাগিতেছিল।

কহিলাম "তলিয়ে গেলেই হলো? আমি আপনাকে তলিয়ে যেতে দেবো কেন? ভগবান না করুন—আপনি যদি স্বর্গেই চলে যান তাহলে, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, এই ঘরে আপনার একখানা ছবি এনলার্জ করিয়ে আমি ঝুলিয়ে রাখ্‌বো। তার নীচে বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকবে আপনার নাম। এ ছাপাখানার আপনি যে কি ছিলেন এ যার মুখস্থ না থাক্‌বে তার চাক্‌রী এখানে চল্‌বে না। অর্থাৎ আমি যদ্দিন আছি তদ্দিন আপনি এখানে অমর থাক্‌বেনই।"

কিন্তু ইহাতেও ভদ্রলোক খুশি হইলেন না। সম্ভবত আমি চিরদিন থাকিব না একথা মনে ভাবিয়াই।

কহিলেন "বংশে বাতি দেবার কেউ রইল না যে আমি মরে গিয়েও তার মধ্যে বেঁচে থাক্‌বো।"

কম্পোজিটারের মুখে এরূপ ভাষা শুনিয়া আপনি হয়তো অবাক হইতেন, কিন্তু আমি হইলাম না। যে কম্পোজিটার জীবন ভরিয়া এত সাহিত্যিকের লেখা কম্পোজ করিল তাহার পক্ষে বিভিন্ন সাহিত্যিকের রচনা হইতে ধার করিয়া এরূপ গদ্য-কবিতায় কথা বলা কিছুই আশ্চর্য নয়।

বুঝিলাম নির্বংশ হইয়া তিনি মরিতে চান না, অথবা মরিয়া নির্বংশ হইতে চান না। মরিবার পূর্বে এমন একজন প্রতিনিধিকে তিনি পৃথিবীতে রাখিয়া যাইতে চান যাহার মধ্যে তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন। কহিলাম "কেউ থাকবে না কেন নিরঙ্কুশবাবু? থাকে যাতে সে ব্যবস্থা আমি করে দেবো'খন। আপনার যে বয়স হয়েছে তাতে বংশধর লাভ করা এখনো অসম্ভব নয়।"

নিরঙ্কুশবাবু ম্লান হাসিয়া কহিলেন "দেহের বংশধর নয়—ওতো জানোয়ারেরও থাকে। আমি রেখে যেতে চাই মনের বংশধর। কিছু অবদান দিয়ে যেতে চাই সাহিত্যে যারা আমার দেহটা ফুরিয়ে গেলেও আমার স্মৃতিকে অমর করে রাখবে।"

এইভাবে কথা সুরু করিয়া ধীরে ধীরে আমাকে সম্মোহিত করিয়া এক দুর্বল মুহূর্তে তিনি আমাকে শপথ করাইয়া নিলেন আমার মাসিকের আগামী সংখ্যায় তাঁহার রচিত একটি গল্প থাকিবে। পরের সংখ্যাতেই তাহার রচিত এবং স্বহস্ত কম্পোজিত রচনা "জীবন সাহারা" বাহির হইল। গল্পটি না বাহির করিয়া উপায় ছিল না, কারণ—বিশ্বাস করুন—গল্পটি আমার অতুলনীয় মাসিকে বাহির না করিলে নিরঙ্কুশবাবু আমার ছাপাখানা হইতে বাহির হইয়া গিয়া আর ফিরিতেন না।

নিরঙ্কুশবাবুর এই প্রথম অবদানটির অর্থ আমি বুঝিতে না পারিলেও নিরঙ্কুশবাবুর কাছে বুঝিয়া নিতে চেষ্টা করি নাই। ভয় ছিল তিনি পাছে অর্থটি পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিয়া আমাকে লজ্জা দেন অথবা বুঝাইতে না পারিয়া নিজে লজ্জা পান। পাঠক মহলে ও গল্পটি সম্বন্ধে কোনরকম উচ্চবাচ্য শুনি নাই, সম্ভবতঃ কেহই গল্পটির অর্থ বুঝিতে না পারার কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়া ফেলিতে রাজি নহেন। আপনি যে স্বীকার করিয়াছেন তাহা ঠিক আপনার উপযুক্তই হইয়াছে। কোন কোন পাঠক ও পাঠিকা জীবন-সাহারা গল্পটির খুব প্রশংসাও করিয়াছেন, সম্ভবত বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই। আমার তো মনে হয় পৃথিবীর অধিকাংশ প্রশংসাই এই জাতীয় না বুঝিয়া প্রশংসা।

প্রথম অবদানটি ছাপা হইবার পরই নিরঙ্কুশবাবু অসুখে পড়িলেন। মনে হইল যেন শুধু অবদানটি ছাপা হইবার জন্যই তিনি অপেক্ষা করিয়া ছিলেন।

অসুখ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। আমি তাহাকে নিজের বাড়িতে রাখিয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলাম। কিন্তু নিরঙ্কুশবাবু যখন বারবার কহিতে লাগিলেন ভগবানের ডাক আসিয়াছে তখন বুঝিলাম তাঁহাকে আর বাঁচানো যাইবে না। তবু মনে এই সান্ত্বনাটুকু পাইলাম যে, তাহার শেষ ইচ্ছাটা আমার মাসিকের পাতায় পূর্ণ হইয়াছে। আজকাল তো এমন লেখকের কিছু কমতি নাই যাহারা লেখক না হইয়া কম্পোজিটার হইলে সমাজের ও সাহিত্যের পক্ষে ভাল হইত। সে তুলনায় একজন পাকা কম্পোজিটার যদি লেখক হয় তাহাতে সমাজ ও সাহিত্যের এমন কি ক্ষতি?

ইহার পর নিরঙ্কুশবাবু আর বেশীদিন টিকিলেন না। টিকিবার ইচ্ছাও আর তাঁহার ছিলো না, যদিও আমার একান্তই ইচ্ছা ছিল তাঁহাকে টিকাইবার। তাঁহার বিদায়ের লগ্ন যখন ঘনাইল তখন গোধূলি বেলা, পশ্চিম আকাশে নানারকমের নাম জানা এবং নাম না জানা রঙের খেলা চলিয়াছে, দখিনা হাওয়ায় ভাসিয়া আসিতেছে হাসনুহানার মৃদু গন্ধ। এধারে দেয়ালের গায়ে একটা ক্যালেণ্ডার দুলিতেছে।

নিরঙ্কুশবাবুর অন্তিমবাণী যতদূর সম্ভব অপরিবর্তিত এবং অকর্তিতভাবে তুলিয়া দিতেছে ঃ

"ঐ যে সূয্যি ডুবে যাচ্ছে, আমিও এবারে ডুববো। আমার জীবনের কাজ ফুরিয়ে গেছে। ভগবানের আশীর্বাদে অনেকগুলো লেখক দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেলুম এই দুটি হাতে। ছোট-গপ্পো লিখিয়ে পুণ্ডরীক চাটুয্যে, বিরিঞ্চি বটব্যাল, অকিঞ্চন ঘোষ—এঁদের প্রত্যেকটি গপ্পোই এ কাগজে আমার কম্পোজ করা। জানিয়ে দেবেন এঁদের আমি চলে গেলে, যে জীবন-সাহারার লেখক নিরঙ্কুশ চট্টোরাজই নিজে হাতে কম্পোজ করে করে তাঁদের সাহিত্য জগতে ঠেলে তুলে দিয়ে গেল। আর ঐ যে আপনার গিয়ে উপন্যাস লিখিয়ে বৈকুণ্ঠ চম্পটি, লেখেন ভালো ভদ্রলোক; ভালো লেখেন, কিন্তু ওঁর হাতের লেখা আমি বলেই বুঝতে পেরেছি। এইবারে একটু বেগ পেতে হবে। আর সৌভাগ্যশালিনী মিত্তির, দিব্বি কবিতা লেখে মেয়েটি—আমারি হাতের তৈরী। এদের সকলকে আমার বিদায় জানাবেন, আমার শুভেচ্ছা জানাবেন। এরা যেন আমি মরেছি বলেই থেমে না গিয়ে লেখে লেখে, আরো লেখে, আরো আরো লেখে।

আমার জীবনটা প্রায় সাহারার মতই কাটলো, তার ভেতরে এই কটি ফুলবাগান। .....বাঃ বাঃ জানালাটা আরো খুলে দিন। দেখি আকাশে কত রং। কিন্তু একটা কথা বাকী রয়ে গেল। এই যে এই গল্পটা। আমার দুনম্বর অবদান, আমার শেষ অবদান —জীবন-সাহারার দ্বিতীয় খণ্ড, কম্পোজ করলে সাড়ে চার পৃষ্ঠার বেশী হবে না। এটা—এটা আমি চলে গেলে পর যেন ছাপা হয়, আমি ওপার থেকে দেখবো। কিন্তু বেচুকে যেন কম্পোজ করতে দেবেন না, ও ছোঁড়া মানুষ ভালো হলে কি হবে, কম্পোজিটার তত ভালো নয়। আমার শেষ অবদানটা কম্পোজ করতে দেবেন রামচাঁদকে, আর প্রুফটা যেন আপনিই দেখে দ্যান্ দয়া করে। আমার শেষ অবদানে যেন ছাপার ভুল না থাকে।

ছাপাখানার সবাইকে আমার আশীর্বাদ জানাবেন। প্রার্থনা করি ওরা সবাই দিনে দিনে আরো বেশী ভালো কাজ করে' যেন ছাপাখানার সুনাম বাড়ায়। কিন্তু ঐ বেচুকে একটু দেখবেন, ওর প্রুফগুলোর ওপর একটু বেশী নজর দিতে হবে। মনে করুন সেই সেবারে শিশু-সাহিত্যকের জায়গায় পশু-সাহিত্যিক কম্পোজ করে কি কেলেঙ্কারীই না বাঁধিয়েছিল!

ধন্যবাদ আপনাকে দেওয়া মানেই দেবতাকে দেওয়া। অনেক ভাগ্যে আপনার মতো মনিব পেয়েছিলুম। মাইনে পেতে মাঝে মাঝে একটু আধটু দেরী হয়েছে বটে; কিন্তু ও তেমন ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

ভগবান? তাঁকে ডেকে আর কি হবে? তিনিই যে আমায় ডাকছেন। তাঁর ডাকে চেঁচিয়ে সাড়া দিতে হয় না, মনে মনে সাড়া দিয়েছি। যাই। এবারে যাই। কিন্তু......আমার জীবন সাহারা দ্বিতীয় খণ্ড......আমি মরে গেলে যেন ছাপা......"

"হয়" বলার পূর্বেই তাঁহার প্রাণপক্ষী দেহ-পিঞ্জর পিছনে ফেলিয়া পলাইয়া গেল। "জীবন-সাহারা"-র দ্বিতীয় খণ্ড হাতে লইয়া কিছুক্ষণ আমি নিশ্চল প্রস্তর মূর্তির মত নিরঙ্কুশ চট্টোরাজের প্রাণহীন দেহের পানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। স্বর্গে ছাপাখানা আছে কি না জানি না; কিন্তু পৃথিবী একজন কম্পোজিটারের মত কম্পোজিটার হারাইল।

সমস্তই আপনাকে খুলিয়া লিখিলাম। বিশ্বাস করুন; কিছুই আমার জ্ঞাতসারে গোপন করি নাই। শুধু নিরঙ্কুশবাবুর শেষ কথাগুলি তিনি যেরূপ হাঁফাইতে হাঁফাইতে থামিয়া থামিয়া টানিয়া টানিয়া বলিয়াছিলেন, লিখিবার বেলায় কাগজ বাঁচাইবার জন্যই সেরূপ টানিয়া টানিয়া না লিখিয়া একটানা লিখিয়া গিয়াছি। আমার একান্ত অনুরোধ আপনি আমার এই পত্রখানি আদ্যোপান্ত মনোযোগ সহকারে—প্রয়োজন বোধ করিলে একাধিকবার—পাঠ করিয়া আপনার মতামত জানাইবেন। আপনাকে অকপটে যে সত্য বর্ণনা দিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া কোন পাষাণহৃদয়ও না গলিয়া থাকিতে পারে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না।

আপনার সহৃদয় জবাব যথাসময়ে পাইলে অনুগৃহীত বোধ করিব এবং আপনার মতামত জ্ঞাত হইয়া নিরঙ্কুশবাবুর "জীবন-সাহারা"-র দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধে আমার কর্তব্য স্থির করিব। ইতি।



[১৩]

(দ্বিতীয় পর্যায়)

শান্তিনিকেতন ও লেখকতার প্রারম্ভ

দাদা যখন কলকাতার বাইরে নিজের ঘর সংসার করতে গেলেন আমি তখন মার কাছে একা রইলুম। তখন থেকে মার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হল। বিলেত যাওয়ার আগে পর্যন্ত দাদাও ছিলেন, কিন্তু দাদা ব্যাটাছেলে তাঁর বহির্মুখী জীবন। তাঁর সখ অনুসারে তাঁকে আরবী ঘোড়া কিনে দেওয়া হয়েছিল। ভোরে উঠে ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে আসা, বিকেলে হয় সুরেনদের বাড়ি যাওয়া নয় নিজেদের বাড়িতে তাকে ও অন্যদের এনে খেলাধুলা, সন্ধ্যায় মাঝে মাঝে বাগানের গর্ত থেকে বেরোন শেয়াল শিকার করা—এই সব তাঁর মুখ্য কাজ ছিল। পড়াশুনাটা গোণ। সেই সময় 'সখা' নামে বালকবালিকাদের জন্যে মাসিক পত্রিকায় একটা কবিতা প্রতিযোগিতা ঘোষিত হল। মা উৎসাহ দেওয়ায় আমি সেই প্রতিযোগিতার জন্যে দাঁড়ালুম। নির্দিষ্ট বিষয়ে কবিতা রচনা করে সখা-অফিসে পাঠিয়ে দিলুম। ফার্স্ট আমিই হলুম, প্রাইজ পেলুম একখানা ইংরেজী 'ক্লাসিকাল ডিক্‌শনারী', যত প্রাচীন গ্রীক ও রোমান মাইথলজির গল্প। প্রকাশ্যে রচনায় এই আমার হাতে খড়ি। লিখতে আরম্ভ করেছিলুম কিন্তু কয়েক বছর আগেই। আমাদের শৈশবে সেই সময় একবার সপরিবারে বোলপুর যাওয়া হয়। সেকালের শান্তিনিকেতন সত্যিই শান্তিনিকেতন ছিল, ছেলেবুড়ো সকলেরই মনোমোহন। কর্মকোলাহল ও জনকোলাহলশূন্য, শুধু শান্ত মৌন প্রকৃতির অবাধ রাজত্বের বিস্তার।

শান্তিনিকেতন বাড়িটির গাড়ি-বারান্দার কার্নিসের উপর অনেকগুলি বড় বড় সমুদ্র শামুক সাজান ছিল। এমন শামুক এর আগে আমরা কখনও দেখিনি, কি রহস্যময় মনে হত। তার ছিদ্রের ভিতর কান পাতলে এমন একটা শব্দ পাওয়া যেত ঠিক যেন সমুদ্র কল্লোল। সমুদ্র নিজের তরঙ্গঘন চিত্ত যেন চিরদিনের মত তার ভিতর রুদ্ধ করে রেখেছে। 'সমুদ্র' নামটাই তখন আমাদের পক্ষে রহস্যময় ছিল। কর্তা দাদামশায়ের চীন ভ্রমণে যাত্রার বার্তার সঙ্গেই সে নামটি আমাদের পরিচিত হয়েছিল। হয়ত সেই সময়ই তাঁর সংগৃহীত এই শামুকগুলি। আর রহস্যময় ছিল বোলপুরের খোয়াই পাহাড় ও তাদের মধ্যে দিয়ে বালির ভিতর থেকে ঝির ঝির করে বেরোন জলের ছোট ছোট ধারাগুলি। ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ আরম্ভ হল আমাদের এখানকার প্রকৃতির ক্রোড়ে। প্রত্যেক বিজ্ঞানশাস্ত্রই মানুষের চিন্তারাজ্য প্রসারিত করে দেয়, কিন্তু ভূতত্ত্ব আর গ্রহনক্ষত্রতত্ত্ব এই দুটির মত মনকে সুদূরগামী, বুদ্ধিকে প্রশস্ত করার সহায়ক বিজ্ঞান আর নেই। দেশের ও কালের গভীর থেকে গভীরতর স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ভূতত্ত্ব, আর উচ্চ থেকে উচ্চস্তরে উঠানর জন্যে গ্রহনক্ষত্রতত্ত্ব। আকাশ, আকাশ, আকাশ! ফাঁক ফাঁক ফাঁক। কি অন্তহীন ফাঁকা! যেদিকে চাও সেই দিকেই ফাঁকা! কোথাও কিছুতে আটকান নয়। মনকে একেবারে অনন্তের ধারণায় পাকা করে দেয়। কিন্তু অনন্ত খালি শূন্যতায় ভরলে পর্যাপ্ত হয় না, তার ভিতর একটি পূর্ণতার ভাবও চাই। তাই ল্যান্ডস্কেপ পেন্টররা বলেন সুবিস্তৃত ফাঁকার মধ্যে একটু জীবনের চিহ্ন থাকলেই তবে তার সৌন্দর্যের সম্পূর্ণতা হয়—সুদূরে একটি পাখী, একটি জানোয়ার বা একটি মানুষ। নয়ত অনন্ত একঘেয়ে ও শ্রান্তিকর হয়ে পড়ে। জীবশরীরবৎ শরীরে আবদ্ধ জীবনের ধারণা না হলেও চলে বোধ হয়। শুধু জীবন্ততার একটি ধারণা চাই। যে অনন্ত অসীম প্রাণ সান্ত সীমাবান সকল প্রাণীর প্রাণের উৎস সেই এক অদ্বিতীয় প্রাণময়কে যদি এই ফাঁকায় ধরতে পারি তবেই আমার অনন্ত শূন্যতা অনন্ত পূর্ণতায় ভরে থাকে। তাই হয়েছিল আমার যখন আমি একবার হিমালয়ে কুলু পাহাড়ে যাচ্ছিলুম আমার পাঁচ বছরের পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে। তখন সেই অবাধ ফাঁকে ছিলুম শুধু আমরা দুটি ও সারা আকাশব্যাপী জীবন্ত ভগবান। কেমন ভগবান আমার? সুপ্ত নয়, জাগ্রত। অপানিপাদ নয়, সর্বতো চক্ষু সর্বত্র শ্রুতিমান গতিবান ব্যাপ্তিবান অন্তর ও বাহিরের আকাশে। আমাদের একটা চোখের জ্যোতি নয়, এমন সহস্র চক্ষের জ্যোতি তাঁর চোখে, একটা কাণের শ্রবণ শক্তি নয়, এমন সহস্র কাণের শক্তি। সেই চোখে আমাদের প্রতি নির্ণিমেষে চেয়ে আছেন, সেই কাণে প্রতি কথাটি শুনছেন। প্রাণময় প্রেমময় তিনি, মৃত নন, কালা কাণা হাবা নন—মননময় বিজ্ঞানজ্ঞানাময়, জ্ঞানময় সদা সচেতন সদাজীবন্ততাময়। এই অনুভূতিটি আমি তখন আমার এক ইংরেজ বান্ধবীকে বর্ণনা করেছিলুম। তাঁর মনে ঐ বর্ণনাটি একটি গভীর রেখা কেটেছিল। বার বার সেটি ফিরে ফিরে আওড়াতেন।

আমাদের সঙ্গে বোলপুর যাত্রার পার্টিতে সেবার অনেক লোক ছিলেন। আমাদের প্রায় সমবয়সী, আমাদের চেয়ে অনেক বড় সব রকমের। নতুনমামী, সরোজা দিদি, মোহিনীবাবু, এটর্নি কবি অক্ষয় চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী—মায়ের সঙ্গে পাতান নাম যাঁর "বিহঙ্গিনী"—এঁদের মনে পড়ে। বোলপুরের ছোট ছোট স্রোতস্বতীর ধারে মাঝে মাঝে এক একটি সুন্দর নুড়ি পাওয়া যেত। আমাদের কে একজন বিজ্ঞ লোকে বলেছিলেন একদিন—"এই যে সব নুড়ি দেখছ, এরা এককালে কোন ফল-ফুল ছিল, এখন জলের তলায় পড়ে থেকে জমে জমে পাথর হয়ে গেছে। এদের বলে ফসিল।" তাই শুনে জায়গাটা চিহ্নিত করে আমরা এক একটা আমলকী পুঁতে পুঁতে রাখতে লাগলুম। একদিন অন্তর বালি খুঁড়ে খুঁড়ে দেখি সেটা কতদূর প্রস্তরায়িত হয়েছে। কে একজন বল্লেন—"আরে মূর্খরা অমন করে থেকে থেকে বালির থেকে বের করলে ও কি কখন পাথর হবে? চুপ করে পড়ে থাকতে দাও এখন। পঞ্চাশ বছর পরে এলে দেখবে আমলকী আর নেই,

একটা নুড়ি পড়ে আছে ঐ জায়গাতে।" আমরা সেই পঞ্চাশ বছরের পরে ফিরে এসে নুড়ি দেখার আশায় আপাত চেষ্টা ছেড়ে দিলুম। পঞ্চাশ বছর যথাসময়েই অতিক্রান্ত হল, সে নুড়ির খোঁজে বেরুতে কিন্তু আর মনেও রইল না, বেরোইওনি কেউ। সে খোয়াইয়ের স্তূপ, সে বালির বাঁধ, সে জলের ধারা কোথা দিয়ে কোথায় সরে গেছে কেউ নির্ধারিত করেনি। সারা সকালটা বেড়িয়ে ঘুরে ফিরে খাবার ঘরে লম্বা টেবিলের ধারে বসে সকলে মিলে স্তুপাকৃত লুচি তরকারী ও বোলপুরের প্রসিদ্ধ পাতক্ষীরের প্রতি সদাচরণ করে খানিকক্ষণ ধরে বিশ্রাম করতুম সবাই।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে। আমার পিতৃদেবের অশুচ জাতিদের বিনা আড়ম্বরে শুচি করে নেওয়া, তাদের হাতে খাওয়া দাওয়া ও সব রকম ভৃত্যগিরিতে তাদের নিযুক্ত করা। প্রায় বিশ বছর পরে পঞ্জাবের আর্য্য সমাজের সংস্পর্শে এসে অছুত উদ্ধার মহাঘটার সঙ্গে সম্পন্ন হতে দেখেছি—কিন্তু বোলপুরে বাবামহাশয় বিনা বাক্য ব্যয়ে ডোম বরকন্দাজ 'স্বরূপ সর্দারের পুত্রকে নিজের খানসামা নিযুক্ত করে, ট্রেণিং দিয়ে দিব্যি উপযুক্ত চাকর তৈরি করে নিলেন। সেই টেবিলে আমাদের সবাইকে খাওয়াত, দরকার, হলে লুচি ভাজা মাংস রোষ্ট প্রভৃতিও সেই করত। এতে উপস্থিত দলের কারো কোন আপত্তি হল না।

শান্তিনিকেতনে এই সময় আমায় সব প্রথম লেখা পেয়ে বসল। 'সখা' আমাদের সত্যিকার সখা ছিল তখন। দুপুর বেলা ঘরের ভিতর বিশ্রাম করতে করতে তার সব রচনা পড়ে পড়ে আমায় রচনা চাপল। দুতিন দিন ধরে অন্যদের লুকিয়ে দু' একটা ছোট গল্প লিখলুম। সরোজা দিদি একদিন ধরে ফেল্লেন। আমার খাতা কেড়ে নিয়ে সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে ঠাট্টা করে করে বলতে লাগলেন—"লেখিকা হবেন সরলা! গল্প লেখা হয়েছে! কাগজে বেরুবে নাকি?"

বড়দের ঠাট্টা বিদ্রূপ ছোটদের মর্মবিদারক হয়, তাঁর ঠাট্টায় আমার লেখবার প্রবৃত্তি বন্ধ হয়ে গেল। তার অনেক পরে মায়ের উৎসাহে 'সখা'তে কবিতা প্রতিযোগিতায় কবিতা পাঠালুম। লেখার স্রোতটা কিন্তু ধারাবাহিকভাবে তখন থেকে চলল যে তা নয়। তখন আমি বেশী নিযুক্ত থাকতুম পড়তে। স্কুলের পড়া বলছিনে—বাঙলা সাহিত্য, বিশেষ করে পুরোণ ভারতী। একেবারে মগ্ন হয়ে থাকতুম তার ভিতর। ঈলিয়াডের অনুকল্পে 'রামিয়াড' প্রভৃতি নতুন মামার কৌতুক রচনা হাসিগত উচ্চ সাহিত্য রসে আমায় একেবারে ভরপুর রাখত। তখন ভারতীতে প্রতি মাহে হাস্য প্রধান 'নক্সা' বেরত। আমি একবার বিনা নামে একটা নক্সা লিখলুম। মা ভারতীতে বের করলেন। চলে গেল বড়দেরই কারো লেখা বলে। সেই পর্যন্ত নিজের উপর একটা ভরসা এল—লিখতে পারি। বহু বর্ষ পরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান যখন আমার কর্ণকুহরে এল—সেগুলো আর মজলিসী আমোদ প্রমোদের কোটরে পড়ে থাকতে পেল না। মহীশূর প্রবাসের অব্যবহিত পূর্বে সেগুলি সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে 'ভারতীতে' একটি প্রবন্ধ পাঠালুম—'বাঙলায় হাসির গান ও তার কবি'। সাহিত্যের সমুচ্চস্তরে তাদের আসন পাতা হয়ে গেল। দ্বিজু রায় শেষ পর্যন্ত আমার সে বন্ধুকৃত্যটি ভোলেন নি।

'সখা'য় কবিতার পর 'বালক'-এ আমার দু একটা রচনা বেরয়। গিরীন্দ্রমোহিনীর সঙ্গে মার তখন ভাব হয়েছে ও 'মিলন' পাতান হয়েছে। তাঁর দেবর অক্রূর দত্ত পরিবারের গোবিন্দ দত্ত রবিমামার বন্ধু ও সাহিত্য রসিক। 'বালকে' প্রকাশিত আমার একটি লেখার তিনি খুব রসগ্রাহী হলেন ও রবিমামাকে সে বিষয়ে লিখে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন—"একদিন এই নবীন লেখনী বঙ্গ সাহিত্যে প্রবীণতায় নিজের স্থান নেবে।" রবিমামাই তাঁর চিঠি আমায় পড়ে শোনালেন একটু হাসতে হাসতে। সে হাসি ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর অনুমোদনে বা সন্দিহানে জানিনে। তখন আমার বয়স বার বছর।

ইতিমধ্যে আমার এণ্ট্রান্সের টেস্ট পরীক্ষার দিন কাছাকাছি এল। মা শুনে না ভেবে চিন্তেই একটা মন্তব্য করে ফেললেন—"নিশ্চয়ই ফার্স্ট হবি।" আমার শুনে হাসি পেল। এমন অদ্ভুত কথা মা কি করে বল্লেন? হেমপ্রভা থাকতে আমি ফার্স্ট হব। কিন্তু আশ্চর্য এই যে মাতৃবচনই সত্য হল। শুধু টেস্টে যে ক্লাসে প্রথম হলুম তা নয়, সেবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় আমিই পাশ হলুম এবং স্কলার্শিপও পেলুম—আর হেমপ্রভা বেচারী কোন্ একটা বিষয়ে কম নম্বর পাওয়ায় সব-শুদ্ধ একবারে ফেল হয়ে গেল। এই আঘাতে তার Brain fever হল। দু'বছর ধরে তার পড়া বন্ধ রইল।

এবারকার এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ইতিহাসের কাগজ পড়েছিল এন ঘোষ, ব্যারিস্টারের হাতে। তিনি সেকালের ইংলিশ পাঠ্য পুস্তকের একজন 'নোট' লেখক ও 'ইণ্ডিয়ান নেশন' সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদক। সেবার ইতিহাসের প্রশ্নাবলীর মধ্যে মেকলের 'লর্ড ক্লাইভ' নামক পাঠ্যপুস্তকের উপর ভিত্তি ক'রে ক্লাইভের বঙ্গবিজয় সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন ছিল। তাতে খুব বেশী নম্বর নির্ধারিত ছিল। আমি মেকলের প্রতিপাদ্য বাঙালী চরিত্রের হেয়তার প্রতিবাদ করে পাঠ্য পুস্তকের লিখিত মন্তব্যের বিপরীত নিজের মন্তব্যপূর্ণ উত্তর দিয়েছিলুম। পরম্পরায় কাণে এল মিস্টর এন ঘোষ তার দরুণ আমার নম্বর না কেটে আমায় খুব ভাল নম্বরই দিয়েছিলেন, আর খোঁজ করেছিলেন এ মেয়েটি কে? কাদের বাড়ির? ইতিহাসের কাগজে নাকি আমি সেবার প্রথম হয়েছিলুম। তখন আমার বয়স তের বছর। বাঙালী জাতি সম্বন্ধে আমার আত্মাভিমান তখনই মাথা খাড়া করেছিল। এরই পূর্ণ বিকাশ দেখা দিলে বছর দশ বারো পরে কিপলিং-এর একখানা ছোট গল্পের বইয়ের একটা গল্পে বাঙালী জাতিকে ভীষণভাবে অবমানিত পেয়ে তার প্রতিবিধানকল্পে আমি যে দেশ ও জাতিব্যাপী প্রচেষ্টা আরম্ভ করলুম তাতে। সে বিষয়ে বিস্তারিত কথা যথাসময়ে আসবে। ইতিমধ্যে আমার বাঙালী জাত্যাভিমানের মধ্য-বিকাশ হল প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বঙ্গবীরদের স্মৃতি উদ্বোধক উৎসবের প্রবর্তনায়।

আমি যখন এণ্ট্রান্স পাশ করলুম ফণীদাদা তখন রাজসাহী কলেজে প্রোফেসর। মাকে দিদি সেখানে নিজের কাছে কয়েক মাসের জন্যে নিয়ে যাবার আয়োজন করলেন। সেবার এলাহাবাদে বোধ হয় প্রথম কংগ্রেসের অনুষ্ঠান চলছে। বাবামশায় সেখানে। আমি তাদের স্টেশনে পৌঁছে দিতে গেলুম। গাড়ি যখন ছাড়ে ছাড়ে আমার হঠাৎ কান্না পেল, আমি খুব কাঁদতে লাগলুম। মায়ের দয়া হল। তখনো সময় আছে, তাড়াতাড়ি আমার জন্যেও টিকিট নেওয়া হল। আমার কাপড়-চোপড় পরের ট্রেনে পাঠানর বন্দোবস্ত হল। আমি চল্লুম তাঁদের সঙ্গে। সেই প্রথম কলকাতা থেকে দূরে বাঙলার অভ্যন্তরে যাওয়া আমার।

সেদিন কেঁদে আমি জিতে গেলুম। কিন্তু ঐ বয়সে কান্নাটা আমার স্বভাবসিদ্ধ ছিল না—হাসিটাই আমার প্রকৃতিগত ছিল। কথায় কথায় কারণে অকারণে আমার হাসি পেত। ক্লাসে বসে প্রোফেসারের কাছে পড়ছি, হঠাৎ দক্ষিণের বারান্দার কার্নিসে বসে কাক কা কা করে ডেকে উঠলে হাসি সামলাতে পারতুম না। সর্বদা হাসিখুশীর ও গল্প জমান স্বভাবের দরুণই বোধ হয় আমি স্কুলে ছোট বড় সকলের লোকপ্রিয় ও বন্ধু ছিলুম।

রাজসাহীতে স্যার তারকনাথ পালিতের পুত্র সিভিলিয়ান, লোকেন পালিত এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের অনেক দিনের পারিবারিক বন্ধুত্ব। আমরা গিয়ে অবধি দিদির বাড়িতে তাঁর প্রায় সারাদিন কাটত। একবার করে

কোর্টে যাওয়া ছাড়া। তাঁর পিতার মত তিনিও ভারী গপ্পুড়ে ছিলেন, আর কি চিত্তহারক সব গল্প করতেন তাঁর কেম্ব্রিজের বন্ধুদের। তাঁর এক একজন বন্ধু নাম ধাম গুণ ও কর্মে আমাদের এত পরিচিত হয়ে পড়েছিলেন ঠিক যেন আমাদেরই ব্যক্তিগত বন্ধু। লোকেন ছিলেন অত্যন্ত 'intellectual', ইংরেজী কাব্য ও সাহিত্যে গভীরভাবে প্রবিষ্ট, তাঁর সংগে নানা কথার আলোচনায় সুখ ছিল। তিনি বল্লেন একদিন—"এত যে ভাব ছিল আমার ইংরেজ ও স্কচ সহপাঠীদের সংগে নিজেদের মধ্যে কোন পার্থক্য বোধই আসত না—তবু যেদিন একদিন তাঁদের গান শুনলুম,

Rule Britania! Britania rules the waves. Britons ne-ver will be slaves!

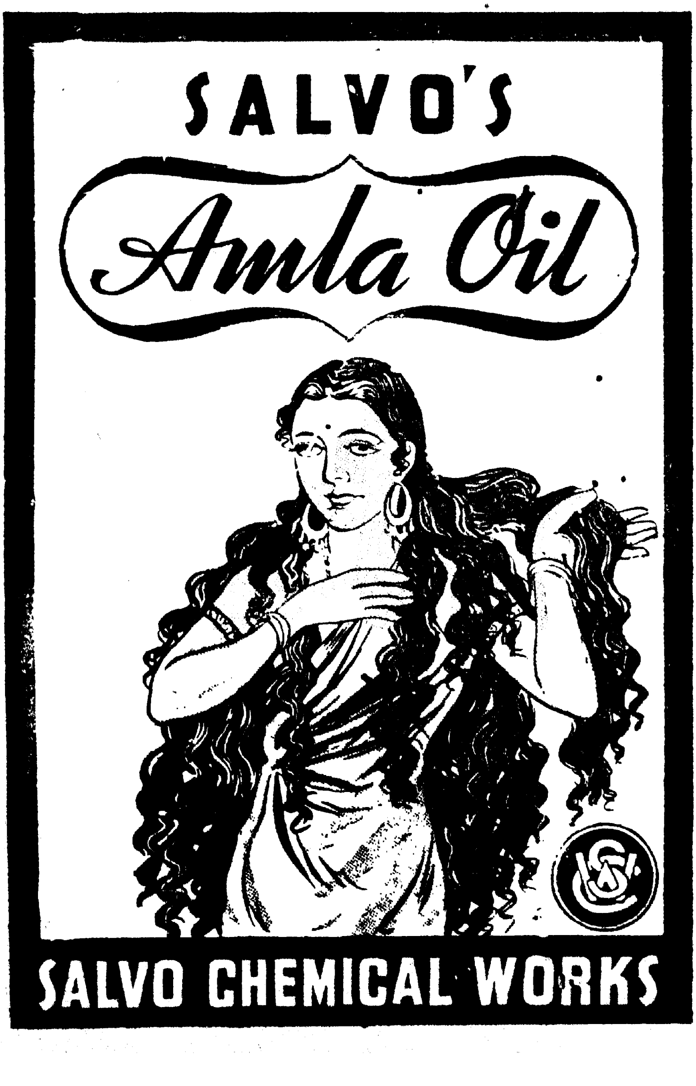
—সেদিন অন্তরের গভীরতম স্তর থেকে অনুভব করলুম—আমি কত দূরে ওদের থেকে, কত পর ওদের।"

সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক আলোচনায়, আহারে, বিহারে, আমোদে-প্রমোদে সবতাতেই লোকেন অমাদের সংগী ছিলেন। একবার দিদিকে ও আমাকে ইংরেজিতে একটি প্রবন্ধ রচনার প্রতিযোগিতা দিলেন, "Love & Friendship," —আমি যা লিখেছিলুম, তার একটা সেণ্টেন্স আমার মনে পড়ে—"Friendship is love without its wings"—নিশ্চয়ই কোন ইংরেজ লেখকের লেখা থেকে ভাবটা পাওয়া—নয়ত ও বিষয়ে ওরিজিন্যাল গবেষণা তখন আমার মাথায় আসা সম্ভব নয়। সে সময় জর্জ ইলিয়ট প্রভৃতির বই খুব পড়তুম। যা হোক লোকেন জানালে প্রতিযোগিতায় আমার জিৎ হয়েছে এবং নির্ধারিত প্রাইজটি আমায় দিলে। দিদি রেগে গেলেন, বল্লেন লোকেন পক্ষপাতিতা করেছে, আগে থাকতে ঠিক করা ছিল ওর যে আমাকেই প্রাইজ দেবে—তার প্রমাণ এই যে, জিনিসটার উপর আগে থাকতেই আমার নাম লিখে রেখেছিল। জিনিসটা হচ্ছে প্রায় একশখানা ছবি সমেত একটা spectroscope, যার দুভাগে দুখানা একই রকম ছবি রাখলে focus হয়ে একখানা অতি সুস্পষ্ট বড় ছবি দেখা যায়।

লোকেনের কৈফিয়ৎ তলব হ'ল। সে বল্লে, তার জানাই ছিল—আমি বেশী ভাল করে লিখতে পারব। দিদির রাগ তাতে কমল না, আমি কিন্তু ওঁদের দুজনের ঝগড়া শুনে হেসে কুটিকুটি হলুম। চিরকালই আমার এই স্বভাব — আমায় বা আমার সম্পর্কে কেউ রেগে কিছু বললে আমি হাসি।

বিকেলে আমরা সবাই হেঁটে বেড়াতে বেরোতুম। রাজসাহীর একটা দিকে তখন খুব জঙ্গল ছিল। একদিন জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়া স্থির হ'ল। অনেকে ভয় দেখালে —ও জংগলে এখনও বাঘ থাকে। সাবধান করলে—সবাই একসংগে কাছাকাছি থাকি যেন, আগে-পিছে না হই, জোরে জোরে শব্দ করে কথা কহিতে কইতে আর হাততালি দিতে দিতে যাই যেন, আর সন্ধ্যা হবার আগেই যেন ফিরে আসি। শহুরে মেয়ে আমরা, বাঘ বেরোনর ব্যাপারটা একটা কাল্পনিক কথা মাত্র, তার সত্যতায় বিশ্বাস নেই। সুতরাং তার ভয়াবহতাও আমার মনে বসল না। বরঞ্চ হাততালি দিয়ে চলতে হবে শুনে ভারি মজা লাগল। চিড়িয়াখানায় পিঁজরের ভিতর দেখা বন্ধ বাঘ যে জলজ্যান্ত খোলা বাঘ হয়ে আমাদের সামনে আসতে পারে, এমন অভূতপূর্ব অবস্থা হাস্যকরই ঠেকল। আমি একটা বোকা-ন্যাকার মত বললুম— "বাঘ বেরোলে যদি তাকে দেখে আমার হাসি পায়। ও'র সবতাতেই হাসি পায়!" দিদি বল্লেন—"আহামরি—শিশু! লোকেন বল্লে—হ্যাঁ তাই বটে! বাঘ বে[...]লে হাসি পাবে না আরও কিছু।"

চিত্ত তখন একেবারে লঘু, ভয় ভাবনার ধার ধারিনে, সবই মজার বিষয় হাসির বিষয়! ভয়ের ভয়ংকরতা জানা না থাকার দরুণই নির্ভীক হয় মানুষ। কিন্তু যখন জানলুম তখনও ভয়কে দুঃখকে চোখরাঙানি [...] দিয়ে বঞ্চিত করার স্বভাব আমার [...] গেল; গভীর রাজনৈতিক বিপদের [...]নেও। মহাত্মা গান্ধী তাই একবার বলেছিলেন আমায়—"Your Laughter is National Asset! Laugh away!" জীবনে কাঁদিনি তা নয়,—সে লুকোপুটি খেয়ে অন্তরের অন্তঃপুরে অনেকবার— লোকের সামনে নয়। বৌদ্ধ ত্রিপিটকে একটা গল্পে আছে; একজন বোধিসত্ত্ব বলছেন— "জনমে জনমে যত কান্না কেঁদেছি, তাতে অনেকানেক অশ্রুর সমুদ্র রচিত হয়েছে!" আমাদেরও একটা জন্মেরই কান্না জড় করলেও তাই হয়। ক্রমশ



দেখু-শুনে

অ · কৃ · ব

রাত্রি গভীর। পাশের বাড়ির দরজায় ধাক্কার আওয়াজে মন খুশি হইয়া উঠিল। এবারে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমানো যাইবে।

রোজই গভীর রাত্রে পাশের বাড়ির দরজায় বাহির হইতে ধাক্কা পড়ে। প্রতি রাত্রে এই ধাক্কার অপেক্ষায় অন্তত দুইটি প্রাণী উৎকর্ণ হইয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকে—একটি ঐ পাশের বাড়ির বধূ, অপরটি এ বাড়ির আমি। প্রতীক্ষার ঐকান্তিকতা বোধ করি একই রকম, যদিও উদ্দেশ্য বা কারণ আলাদা। বধূটি প্রতীক্ষা করিয়া থাকে পতি-দেবতা ফিরিয়া আসিয়া দরজায় ধাক্কা দিলে দরজা খুলিয়া দিবে এবং তাঁহার আহারের ব্যবস্থা করিবে। আমি প্রতীক্ষা করিয়া থাকি (বাধ্য হইয়াই) ভদ্রলোক ফিরিয়া আসিয়া দরজায় ধাক্কা দিলে আজিকার রাত্রির মত ধাক্কার পালা শেষ হইল জানিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইবার ব্যবস্থা করিব। এই ধাক্কাটি না শোনা পর্যন্ত কখন ধাক্কা শুরু হইবে এই উদ্বেগেই ঘুমাইতে পারি না।

পাড়ায় কানাঘুষা শুনি ভদ্রলোকের নাকি চরিত্র খারাপ এবং প্রতি রাত্রেই দেরীতে ফেরা (এমন কি কোনও কোনও রাত্রে একেবারেই না ফেরা) তাহার চরিত্রের খারাপত্বের পরম প্রমাণ। গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরিলেই চরিত্র খারাপ হয় কিনা, অথবা চরিত্র খারাপ হইলেই লোক গভীর রাত্রে বাড়ি ফেরে কিনা, এ বিষয়ে কখনও মাথা ঘামাই নাই, কিন্তু প্রায়ই ভদ্রলোককে বাহির হইবার সময় প্রশ্ন করিয়া জানিয়া রাখিতে ইচ্ছা হইয়াছে, রাত্রে তিনি বাড়ি ফিরিবেন কিনা। নেহাৎ চক্ষুলজ্জায় ও অন্যান্য কারণেই জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। একদিন তিনি রাত্রে বাড়ি ফেরেন নাই এবং এই না ফেরার দরুণ সারা রাত্রি আমাকে জাগিয়া কাটাইতে হইয়াছিল, দরজায় ধাক্কা কখন শুরু হইবে এই উদ্বেগে। তাহার পর হইতেই আমার নৈশ উদ্বেগ শত-গুণে বাড়িয়া গিয়াছে এবং দরজা ধাক্কার পালা শেষ হইয়া গেলে অবর্ণনীয় স্বস্তি বোধ করিয়া থাকি। অনিশ্চিত প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা যে কি মর্মান্তিক তাহা যাঁহারা সেরূপ প্রতীক্ষা করেন নাই তাঁহারা বুঝিবেন না।

আমার দুঃখ, আমার উদ্বেগ কম নহে, কিন্তু আমার নিজের চেয়ে বধূটির দুঃখের কথাই আমি বেশী চিন্তা করি। শ্রীরামচন্দ্রের জন্য শবরীর প্রতীক্ষা কাব্যে অমর হইয়া আছে, শবরীর প্রশংসার অন্ত নাই। কিন্তু শবরী নিশ্চিত জানিত, শ্রীরামচন্দ্র আসিবেন; পাশের বাড়ির বধূটি কোন রাত্রেই নিশ্চিত জানে না স্বামী দেবতা রাত্রে ফিরিবেন কি ফিরিবেন না। ভদ্রলোক রাত্রে না ফিরিলে আমার শুধু ঘুম হইবে না, কিন্তু বধূ বেচারার ঘুমও হইবে না, খাওয়াও হইবে না। সতী-সাধ্বী সে, স্বামীর আগে অন্নগ্রহণ করিলে তাহার সতীত্ব কলঙ্কিত হইবে।

তাই দরজায় ধাক্কা শুনিয়া এবারে ঘুমাইতে পারিব জানিয়াই যে আনন্দিত হই তাহা নহে, বধূটির যে প্রতীক্ষার অবসান হইল ইহাতেও মন খুশী হয়। আহা বেচারা! এইবার স্বামীকে খাওয়াইয়া নিজে তাহার পাতেই হয়তো খাইতে বসিবে।

* * * *

বৌটি নিশ্চয়ই অত্যন্ত সতী এবং অত্যন্ত লক্ষ্মী। রাত্রির পর রাত্রি এই একই রকম গভীর রাত্রে দরজা খোলার (এবং কোন কোন রাত্রে না খোলার) অভিজ্ঞতা চলিতেছে, তবু তাহার কোন নালিশ নাই, প্রতিবাদ নাই। থাকিলে একটু আধটু নিশ্চয়ই কানে আসিত। হয়তো কোনো রাত্রে রাগ বা অভিমান করিয়া দরজা খুলিত না অথবা অনেক দেরী করিয়া খুলিত। ইহার কোনোটাই হয় না। দরজা ধাক্কার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলিয়া যায় এবং ভদ্রলোক (?) ভিতরে ঢুকিয়া গিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দেন। তাহার পর আর কিছু শুনিতে পাই না।

অতএব বৌটির দিক হইতে কোনো প্রতিবাদ নাই এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এমন কি আমার মনে হয় বৌটি হয়তো কাহিনী বিখ্যাত লক্ষহীরাসক্ত কুষ্ঠরোগীর সতী স্ত্রীর মতই প্রতি রাত্রে গোপনে প্রার্থনা করে, "হে ভগবান্, আমার দেহ সুস্থ রাখ, যেন প্রয়োজন হইলে পতিদেবতাকে স্কন্ধে বহন করিয়া তাঁহার প্রেমিকা বারাঙ্গনার গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে পারি।"

* * * *

ভদ্রলোক যতক্ষণ বাড়ির বাহিরে থাকেন ততক্ষণ দরজাটি যে কেবল, ভিতর হইতেই খিল বন্ধ করা থাকে তাহা নহে, বাহির হইতেও তালাবন্ধ করা থাকে। বলা বাহুল্য ভদ্রলোকই বন্ধ করিয়া যান। "স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ" যে "বিশ্বাসো নৈব কর্তব্য" এ বিষয়ে তিনি চাণক্য পণ্ডিতের সহিত একমত। তিনি যখন চলিয়া যান তখন স্ত্রীকে পাহারা দেবার বা তাহার উপর নজর রাখিবার কেহই বাড়িতে থাকে না। মেয়ে-মানুষের কখন কি মতি হয় বলা তো যায় না! অতএব বাহির হইতে তাহাকে তালাবন্দিনী করিয়া ও পথ একেবারে বন্ধ করিয়া যাওয়াই নিরাপদ। স্ত্রীর সতীত্বে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক স্পর্শ করিতে দিতে ভদ্রলোক রাজী নহেন।

সমাজের নীতি রক্ষা করিতেছে এই দরজা, বাহির হইতে ভিতরে এবং ভিতর হইতে বাহিরে—এই দুই রকমের গতি বন্ধ করিয়া। ভদ্রলোকের অনুপস্থিতিকালে তাঁহার সমাজ-দত্ত অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে অন্য কেহ তাহার গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে না, বন্ধ দরজা তাহাকে বাধা দিবে; তাঁহার স্ত্রীও সেই অধিকার অন্য কাহাকেও দিতে বাহিরে অভিযান করিতে পারিবে না, বন্ধ দরজা তাহাকেও বাধা দিবে।

কিন্তু ভাবিতেছি দরজার এই বাধা শুধু ঐ বৌ বেচারীর উপর কেন? ভদ্রলোকটির অন্তর্মুখী বা বহির্মুখী কোন গতিকেই তো সে বাধা দিতে পারিতেছে না! তাঁহার নিয়মিত নৈশ অভিযানের বদলে বৌটি বড় জোর নৈশ অভিমান করিতে পারে, কিন্তু তাহার ফলাফল সম্পূর্ণ ভদ্রলোকের হাতে। ভদ্রলোকের বাহিরের প্রীতি যেরূপ প্রবল দেখিতেছি তাহাতে বৌটির অভিমানে বড় তাহার পক্ষে বড় বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া তো মনে হয় না।

দরজার আড়ালে বৌটির অবস্থা দেখিয়া বিদেশী শাসন-দরজার আড়ালে [illegible]দের অবস্থার কথা মনে [illegible]তেছে। বন্ধ দরজা আমাদের নি[illegible]দের আড়ালে র[illegible]য়াছে বটে, কিন্তু যে আধিকারের বিনিময়ে, নি[illegible] মূল্য তাহার মূল্যের সমান নহে।

* * * *

হে দরজা! মানুষের প্রতি মানুষের অবিশ্বাসের প্রতীক তুমি। সম্ভবত অন[illegible] ব্যক্তির অনধিকার প্রবেশ বন্ধ করিবার [illegible] প্রথম তোমার সৃষ্টি হইয়াছিল। অন[illegible] প্রবেশের সুযোগ পাইলে কেহ তাহার সদ্[illegible] করিবে না ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পা[illegible] না বলিয়াই দরজার এবং দরজা বন্ধ [illegible]রিবার প্রয়োজন হয়। যদি নিশ্চিত জানিতাম প্রত্যেকেই কোথাও প্রবেশ করিবার পূর্বে গভীর-ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবে প্রবেশের অধিকার তাহার আছে কিনা, তাহা হইলে গৃহ সর্বদাই অবারিতদ্বার রাখিতে কোন আপত্তি থাকিত না, এবং যে দ্বার অবারিত রাখিতে কোন আপত্তির কারণ নাই সে দ্বার একেবারে বাদ দিতেও হয়তো বিশেষ কোন আপত্তি হইত না। কিন্তু নিশ্চিত এরূপ জানা তো দূরের কথা, বরং নিশ্চিত জানি যে সামান্যতম সুযোগ পাইলেই আমার গৃহে অনধিকার প্রবেশ করিবার এবং আমার দ্রব্য না বলিয়া গোপনে অথবা জানাইয়াই গায়ের জোরে নিয়া যাইবার লোকের অভাব নাই। এই জন্যই হে দরজা, [illegible] অপরিহার্য।

কিন্তু শুধু প্রবেশ বন্ধ করিতেই নয়, বহির্গমন বন্ধ করার জন্যও তোমার প্রয়োজন। এই কদর্য রূপটিকে, হে দরজা, আমি ঘৃণা করি। তুমি ভিতরের পথ আটকাইয়া বাহিরে রাখ তাহা বরং ভাল, কিন্তু বাহিরের পথ বন্ধ করিয়া ভিতরে আটকাইয়া রাখ ইহা ভাল নয়। তোমার এই দ্বিতীয় রূপটি পৃথিবীর বুকে বহু রক্ত ঝরাইয়াছে, আরও কত ঝরাইবে কে জানে?

ভিতরের লোককে যখন বাহিরের আলো ডাকে, ডাকে আকাশ-বাতাস, ডাকে বাহিরের বিপুল সম্ভাবনাময় কর্ম-জগৎ, তখন, হে দরজা, কোন অধিকারে তুমি তাহাকে ভিতরে বন্দী করিয়া রাখ?

কিন্তু ভাবিয়া দেখ, এককালে তুমি অন্যরূপ ছিলে, একটি গাছের অংশে মিশিয়া। গাছটি একদিন এক নির্মম ব্যবসাদারের খপ্পরে পড়িয়া তক্তায় পরিণত হইল। সেই তক্তা হইতেই তোমার আবির্ভাব হইল এবং সেই হইতেই তুমি হইলে মানুষে মানুষে প্রীতি ও বিশ্বাসের মধ্যবর্তী ব্যবধান। চিন্তা করিয়া দেখ কি ছিলে আর কি হইলে!

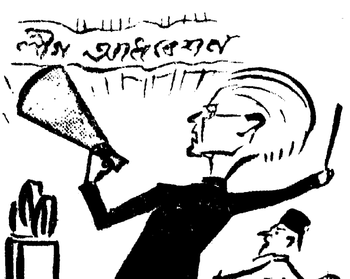
* * * *

কল্পনার পথ বাহিয়া চলিয়াছি, দুই ধারে সারি সারি বাড়ির পরে বাড়ি আমার পিছনে চলিয়া যাইতেছে, একটিতেও দরজা নাই। যে কোনো বাড়িতে ইচ্ছা করিলেই যখন খুশী ঢোকা যায়, কিন্তু কেহই সেরূপভাবে ঢুকিতেছে না। বিনা অধিকারে কেহই ঢুকিতে রাজী নয়। যাহার যখন খুশী বাহিরে আসিতেছে, বাধা দিবার দরজা নাই। আমি স্বপ্নবিলাসী, তাই দরজা-বিহীন মনুষ্যসমাজের স্বপ্ন দেখিতেছি।

ট্রামে-বাসে

নওয়াবজাদা লিয়াকৎ আলি খান সেকেন্দ্রাবাদে একটি চমকপ্রদ বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলন অসম্ভব, কেননা মায়ের কোল হইতে আরম্ভ করিয়া সমাধি পর্যন্ত হিন্দু এবং মুসলমানের জীবনধারার মধ্যে কোন রকম সামঞ্জস্য নাই। হিন্দুরা মৃতদেহ দাহ করে এবং মুসলমানেরা কবর দেয়। মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্বন্ধেও দুই সম্প্রদায়ের ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক্; সুতরাং ইত্যাদি, ইত্যাদি। বক্তৃতা শুনিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী নিশ্চয়ই "পরিষ্কার, অতি পরিষ্কার" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি বক্তৃতাটি আরও পরিষ্কার হইত যদি নওয়াবজাদা আরও একটু কষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেন যে,—হিন্দুরা পরাধীন ভারতবর্ষে বাস করে, আর মুসলমানেরা বাস করে স্বাধীন পাকিস্থানে সুতরাং ইত্যাদি ইত্যাদি!

লাহোরের একটি সংবাদে প্রকাশ, মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনের ফিল্ম তোলা হইবে। প্রচার সাব কমিটির চেয়ারম্যান নওয়াবজাদা রশীদ আলি বৈদেশিক সাংবাদিকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সংবাদটির ভাষ্য করিয়া বিশুখুড়ো বলিলেন যে,—এই ফিল্ম পরিচালনা করিবেন স্বয়ং কায়েদে আজম, সঙ্গীতাংশের পরিচালনা অর্থাৎ পোঁ ধরিবার ভার পড়িয়াছে নওয়াবজাদা লিয়াকৎ আলি খানের উপর। অন্যান্য ভূমিকা বণ্টন এখনও হয় নাই। ছবিটির নাম "কংগ্রেসের কবর" বা "লীগের



পথে" (উদয়ের পথের অনুকরণে) হইতে পারে। আমরা মুক্তি প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া রহিলাম।

*

"**শূ**দ্রদের ভরণপোষণ কি দিয়া হইবে সেই কথা কেহ ভাবে না, তাদের শিক্ষাদীক্ষার অর্থ কোথা হইতে আসিবে সেই নিয়া কাহারও মাথা ব্যথা নাই, শুধু সংখ্যা বৃদ্ধির আনন্দেই হিন্দু এবং মুসলমানরা সন্তান উৎপাদন করিয়া যাইতেছেন; [illegible], তাহারা বিশ্বাস করেন যে, তাহাতেই বিষ্ণু এবং আল্লা প্রীত হইয়া থাকেন!"

এই মূল্যবান তত্ত্বটি মিস্টার বিভারলি নিকলস্ তাঁর "Verdict on India" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কায়েদে আজম গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বলিয়াছেন যে—Beverly Nichols has not hesitated to call a spade a spade.

এবং আরও বলিয়াছেন যে—হিন্দুরা এই সত্যের তিক্ততা উপভোগ করিতে পারিতেছেন না। কায়েদে আজম "Verdict on India"র এই ধরণের সত্যগুলি উপভোগ করিতে পারিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। সত্যই প্রকৃত প্রচারের অভাবে পাকিস্থানের মহান উদ্দেশ্যের অর্থ কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না!

অতঃপর খবরের কাগজে বড় বড় হরফে শিরোনামা ছাপা যাইবে সংবাদে আনন্দিত হইলাম। আমরা একজনে কাগজ



ক্রয় করি, আর দশজনে ক্রেতার পাশ হইতে বা ঘাড়ের উপর উঁকিঝুঁকি মারিয়া শুধু সংবাদের শিরোনামা দেখিয়া সারাদিনের সংবাদ আলোচনার রসদ সংগ্রহ করি। এই কতক দিন ছোট হরফে শিরোনামা ছাপায় আমাদের এই ধরণের সংবাদ সংগ্রহে বড়ই অসুবিধা হইতেছিল। অবশ্য বড় হরফে শিরোনামা ছাপায় গলদও আছে। এই সেই দিন বড় বড় হরফে "সহরে আলোক ব্যবস্থা" শিরোনামা পাঠ করিয়া আনন্দে প্রায় লাফাইয়া উঠিয়াছিলাম। সংবাদটি পাঠ করিয়া দেখিলাম ব্যবস্থাটা যুদ্ধোত্তরকালের জন্য অর্থাৎ আলো এখনও আমাদের কাছে আলেয়া হইয়াই আছে।

পোস্টারে একটি নৃত্যানুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে গিয়া স্বনামখ্যাতা নর্তকী শ্রীমতী সাধনা বসু প্রয়োজনাতিরিক্ত কাগজ ব্যবহারের অভিযোগে ভারতরক্ষা আইনে অভিযুক্তা হইয়াছেন। শ্রীমতী অতঃপর মনে



রাখিলে ভাল করিবেন যে, ভারতরক্ষা আইন বড়ই কাঠখোট্টা ভরত নাট্যের প্রতি তার এতটুকু আকর্ষণও নাই।

দিল্লির একটি সংবাদে প্রকাশ যে, কাপড়-কাচার মালমসলার ব্যবস্থা করিয়া না দেওয়ায় প্রায় দুই হাজার ধোপা ধর্মঘট করিয়াছে। বিশুখুড়ো কিন্তু সংবাদটি বিশ্বাস করেন নাই। তিনি বলিলেন—"Imperial Cityতে সামান্য ধোপার মালমসলার অভাব অত্যন্ত বাজে কথা। দিল্লিতে কোন কোন কাচারীতে 'জাতীয় পতাকা' ঝাড়নরূপে ব্যবহার করার সংবাদ [illegible] বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্যে ধোপারা ধর্মঘট করেছে।" কথাটা সত্যি হইলে ধোপাদের অভিনন্দন জানাইতেছি। জাতীয় পতাকাকে এইভাবে নোংরা করিয়া যে সব ধোপদুরস্ত সরকারী কর্মচারী নোংরামির পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নোংরা করিয়া রাখাই হইবে সমুচিত প্রত্যুত্তর! কিন্তু ব্যাপারটাকে আরও গড়াইতে দিলে পরিষদের অধিবেশনে সদস্যদের নোংরা জামা কাপড়ের গন্ধে জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে।

বিগত যুগের মোগল রাজধানী দিল্লির পরই বাঙলার মোগল রাজধানী জাহাঙ্গীরাবাদ অর্থাৎ ঢাকার সংবাদ। দেবা ন জানন্তি কারণে যে সব চানা ঢাকাতে গুদামজাত করিয়া পচান হইয়াছে এবং পরে যাহা মানুষের অখাদ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে—সেই সব চানাই আবার দেবা না জানন্তি কারণে আড়াই টাকা মণ দরে বিক্রয় করা হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, হালুইকরেরা নাকি সেই সব অখাদ্য চানা হইতে লাড্ডু তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করিতেছে! দিল্লির লাড্ডুর সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে যে উহা —খাইয়াও পস্তাইতে হয়, না খাইয়াও পস্তাইতে হয়। ঢাকার লাড্ডু যাঁহারা খাইয়াছে, তাহারাই শুধু পস্তাইতেছে আর যাহারা খায় নাই তাহারা বাঁচিয়া গিয়াছে বলিয়া ধেই নৃত্য করিতেছে।

আমাদের রঙ্গজগৎ সম্পর্কে একটা বিষয় নিশ্চয়ই প্রত্যেক রসিক লোকে লক্ষ্য করে আসছেন। এটা হচ্ছে কোন দিকে কোন রকম পরিবর্তনের অভাব। প্রমোদের যে কোন উপাদানটাকেই তুলে ধরুন, ১৫।২০ বছর আগে তার যে রূপ, যে আকৃতি ও প্রকৃতি ছিল আজও ঠিক তা-ই আছে। যেন এমন একটা চক্রের মধ্যে এসে ঘুরপাক খাচ্ছে যা থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভ করে একটা কোন নতুন পথ ধরতে পারছে না। কথা উঠলো—নতুন সব লোক চাই; অভাব হলো না তার, শিল্পীও এলো অনেক, অনেক কলাকুশলীও, কিন্তু কিছুই



লক্ষ্মী প্রডাকসন্সের 'ভাগ্যলক্ষ্মী' চিত্রে শান্তা আপ্তে

লাভ হলো না। প্রমোদ উপাদানগুলিকে চিরচরিত ধারা থেকে মোড় ঘুরিয়ে প্রগতির রাস্তাটা ধরিয়ে দেওয়া কারুর দ্বারাই হয়ে উঠচে না। কি তাহলে লোকের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কোনখানে এসে আটকে যাচ্ছে সবাই?

এর মধ্যে একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করে আসচি: তা হচ্ছে—নতুন শিল্পী ও কলাকুশলী দলে দলে আমদানী হলেও খুব উজ্জ্বল প্রতিভাসম্পন্ন তো একজনকেও দেখা গেল না! এর মানে কি? কারুর আন্তরিকতা সম্পর্কে আমরা প্রশ্নই তুলছি না, কারণ একথা আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রমোদ জগতে যারা এসে প্রবেশ করে, তাদের টাকার লোভ যত বেশীই হোক, একটা কীর্তি স্থাপন করার দিকে ঝোঁক থাকে সবায়েরই। আর এই ঝোঁকটা থাকে বলেই কখনো কখনো এক আধজনের মধ্যে

রঙ্গ জগৎ

সাধারণের চেয়ে কিছু বেশী ব্যক্তিগত কৃতিত্বের ঝলক দেখতে পাওয়া যায়, অবশ্য সেটাকে আকস্মিক বলেই ধরে নিতে হবে। কিন্তু এ অবস্থাটা কোন একটা ইণ্ডাস্ট্রির শুভ ভবিষ্যতের আভাস বলে ধরা যায় না।

উদ্যম ও অনুপ্রেরণার কেন এত অভাব হবে? সমগ্র দেশ বাঙলার দিকে চেয়ে আছে আর এইখানেই যত রাজ্যের জড়তা আর হতাশ এসে জমাট বাঁধতে আরম্ভ করেছে। প্রতিভার এমনি দেউলিয়া অবস্থা প্রমোদ জগতের ভিতটাই আলগা করে রেখেছে। আজ না হয় লড়াইয়ের জন্যে প্রমোদ-ব্যবসায় দু পয়সা আমদানী হচ্ছে, কিন্তু লড়াই চলে গেলেও এ আমদানী যে থাকবে, এমন ভরসা প্রমোদ ব্যবসায়ীদের কেউই করতে পারছে না। কারণ লোকের মেজাজকে আঁকড়ে রাখার মত জিনিস প্রমোদ উপাদান-গুলি আর দিয়ে উঠতে পারছে না কিছুতেই।

এর প্রতিকার রীতিমত তালিমের ব্যবস্থা না হলে হবে না। অনুশীলন আর চর্চা না থাকলে কোন জিনিসই দাঁড়াতে পারে না, প্রতিভাও সৃষ্টি করা যায় না। ভুঁইফোড় ওস্তাদে আজ প্রমোদজগত ছেয়ে গিয়েছে—স্বভাবের চাকচিক্য, মুখের চটক আর তদ্বিরের জোর এইটেই হয়ে দাঁড়িয়েছে 'কোয়ালিফিকেশন্', কিন্তু তা ছাড়া গুণী বাছার উপায়ও তো নেই। যুদ্ধোত্তর সংগঠন ব্যবস্থার কত কথাই তো উঠছে কিন্তু লোককে গুণী তৈরী করার কোন ব্যবস্থার কথাই তো শোনা যায় না, অথচ গুণী লোক যথেষ্ট পরিমাণে না থাকলে শিল্পটিকে প্রসারিত করার কোন পরিকল্পনাই কি কার্যত টিকে থাকতে পারবে?

পরলোকে মনোময় বন্দ্যোপাধ্যায়

এ সপ্তাহের একটি দুঃসংবাদ হচ্ছে প্রথম বাঙালী প্রদর্শনব্যবসায়ী মনোময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরোলোকগমন। গত বুধবার সকাল ৭টা ১৮ মিনিটের সময় ১৪নং মল্লিক লেনস্থ নিজ বাটীতে দুই পুত্র শরদিন্দুশেখর ও শশাঙ্কশেখর (তুলসীবাবু) এবং একটি কন্যা ও বহু আত্মীয়পরিজন বন্ধুবান্ধব রেখে পরোলোক-গমন ক'রেছেন।

১৮৭৬ খৃঃ ১৭ই জুন তেলিনীপাড়া জমিদার বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর কর্মক্ষেত্রে ... ১৫ বছর তেলিনীপাড়া ভদ্রেশ্বর স্কুলের সেক্রেটারী ... কাটিয়ে দেন; ভদ্রেশ্বর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং হুগলীর অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটও হন। তারপর পাটের ব্যবসা ক'রে ব্যবসাক্ষেত্রে ... লাভ করেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে রসা রোডে ... থিয়েটার নাম দিয়ে প্যারিস সিনেমা ও ভ্যারাইটিজ নামক একটি প্রতিষ্ঠানের সহযোগে বাঙালীর প্রথম চিত্রগৃহ স্থাপিত করেন। পরে উক্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ হ'তে



মিনার্ভা মুভীটোনের 'ডাঃ কুমার' চিত্রে লতিকা

১৯২৬ সালে মনোময়বাবু নিজেই প্রমোদ-গৃহটির পরিচালন ভার গ্রহণ করেন এবং পরোলোকগত পুত্রের নামানুসারে এর নাম 'পূর্ণ থিয়েটার' রাখেন। এছাড়া চিত্র-প্রযোজনায়ও তাঁর উৎসাহ কম ছিল না। গ্রাফিক আর্টস নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং নির্বাক 'বঙ্গবালা', 'বিগ্রহ' ও 'অভিষেক' এই তিনখানি ছবি তোলেন।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

বহুদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে রূপবাণীতে আগামী সপ্তাহে 'অভিনয় নয়' মুক্তিলাভ করার কথা শোনা যাচ্ছে। আগামী সপ্তাহে আর একটা বড় আকর্ষণ আসছে—শান্তারাম পরিচালিত 'পর্বত পে আপ্‌না ডেরা'। দুখানি ছবিই এবছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ বলে ধরে নেওয়া যায়।

নূতন ছবির পরিচয়

ডাঃ কুমার (মিনার্ভা মুভীটোন)—চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা ঃ কিশোর শর্মা, আলোক-চিত্রঃ সুরপোটদার, শব্দনিয়ন্ত্রণ ঃ এডলজী সুরযোজনা ঃ সরস্বতী দেবী। ভূমিকায় ঃ বজ্রবন্ত সিং, পরেশ ব্যানার্জি, সংখটাপ্রসাদ, খুরসীদ (ছোট), নজমা, লতিকা, মীরা ও রাজকুমারী শুক্লা।

এম্পায়ার টকীর পরিবেশনে ১৭ই থেকে সেন্ট্রালে দেখানো হচ্ছে।

ডাঃ কুমার গভর্ণমেণ্টের প্রচারকার্যে সহায়তায় মিনার্ভা মুভিটোনের 'কোটা'। 'ব্লাড ব্যাঙ্ক', 'ন্যাশনাল সেভিং' আর খাদ্য মজুত এই নিয়ে কাহিনীটি গড়ে উঠেছে, তবে কাহিনীটিকে মনোগ্রাহী করার জন্য প্রেম ও অন্যান্য বিষয়েরও সমাবেশ আছে। ডাঃ কুমার গ্রামে এসে ডাক্তারখানা খোলার পর মুস্কিলে পড়ে গেল। সে ভালবাসে চিত্রাকে অথচ চিত্রার পিতা শেঠ রামদাস ডাঃ কুমারের পালক পিতা নন্দলালের পুরুষানুক্রমে শত্রু। ওদিকে নন্দলালের কন্যা রেখা ভালবাসে রামদাসের পুত্র রমেশকে। রামদাস জানতে পেরে রমেশকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলে; ডাঃ কুমারের সঙ্গে অভিসারে ধরা পড়ায় চিত্রাও রামদাসের শাসনের কোপে পড়লো; চিত্রাও গেল ঘর ছেড়ে। দুটি সন্তানকে হারাবার পর রামদাসের হুঁস এলো। তারপর, বলা বাহুল্য সর্বজনের শুভ মিলন।

প্রচারচিত্র হলেও ছবিখানি নিতান্ত অনুপভোগ্য নয়, প্রধানতঃ সংলাপের জন্যেই তা হ'য়েছে। গতিও বেশ আছে যার জন্যে কোথাও একঘেয়েমী ভাব ফোটে না। উঁচুদরের কিছুই নেই ছবিখানিতে তবুও সময় মন্দ কাটে না। গানগুলো জমতে পারতো শব্দগ্রহণ পরিষ্কার হ'লে। অভিনয় কারুরই চলনসৈ পর্যায়ের চেয়ে ওপরের স্তরের নয়।

বিবিধ

বিদ্যাপতি, সওয়াল ও লেডী ডাক্তার-এর প্রযোজক লক্ষ্মীদাস আনন্দের পরবর্তী চিত্র 'কৃষ্ণলীলা'তে অভিনয় করার জন্য শ্রীমতী কাননের সঙ্গে দু'লক্ষ টাকার চুক্তি সম্পন্ন হ'য়েছে বলে বম্বেতে খবর রটেছে।

*

ফণী মজুমদারের এ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন হওয়ায় রোহিনী পিকচার্সের 'জাস্টিস' ছবির কাজ তার সহকারীরা চালিয়ে যাচ্ছেন।

*

মেহতাব কি আবার বিবাহ ক'রবে নাকি?—পরিচালক সাদিকের সঙ্গে তাদের বিবাহের একটা গুজব রটে আর একটা বিবাতে ... হ'চ্ছে মী... ক ...থেকে ... দেবার ...র আবার মীনা বিবাহের জন্য তৎপর ... এই নিয়ে মিনার হবে চতুর্থপক্ষ।

যুদ্ধের পর শান্তারামের একটা বিরাট পরিকল্পনা রয়েছে। ভারতের মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং সব... তিনিই তৈরী ক'রতে চান। সে ... থাকবে বারোটি শব্দমঞ্চ, আটটি রসা রঙীন ছবি তোলার জন্য বিশেষ এবং তৎসংশ্লিষ্ট রসায়নাগার। ... শান্তারাম এইজন্যে বম্বের শহ... প্রশস্ত জমি ...নে রেখেছেন এ... পাতির অর্ডারও পাঠিয়ে দি... আমেরিকাতে। এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের ... রাজকমলনগর।

*

মাত্র সপ্তাহ দুই আগে রা... বিবাহের সংবাদ পেয়েছিলুম ... সপ্তাহে খবর এলো রাগিনী একটি সন্তানের জন্ম দিয়ে মাতৃত্বের গৌ... ক'রেছে।

*

এ সপ্তাহে সিটি ও প্যারামাউণ্ট সানরাইজ পিকচার্সের 'মা-বাপ' ...নের রজতজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যা... করেছে। অবশ্য দুটো চিত্রগৃহ ...য়ে রজতজয়ন্তীর মধ্যে গৌরব আর ... তবু সিটি বা প্যারামাউণ্টের মত চিত্রগৃহের পক্ষে কৃতিত্ব সত্যই।

আচ্ছা বলুন তো?

১। কবে, কোথায় এবং কোন্ যু... জাহাজের উপর প্রথম টর্পেডো আঘাত হানা হয়েছিল?

২। আমেরিকার যে প্রথম প্রেসিডেণ্ট বেতারে বক্তৃতা করেন, তাঁর নাম কি?

৩। রামধনুকে কি কখনও সম্পূর্ণ বৃত্তাকারে দেখা যায়?

৪। কোন্ পাখী ঘোড়ার মতো ছুটতে পারে, সিংহের মত গর্জন করে, কিন্তু উড়তে পারে না?

৫। সাধারণতঃ পাখীরা সামনের দিকেই উড়ে চলে, কিন্তু কোনো পাখী কি পিছনের দিকেও উড়ে যেতে পারে?

৬। কুকুরের শরীরের কোন্ কোন্ অংশ ঘামে?

৭। জনৈক ব্যক্তির একটি ঘড়ি ছিল। সেই ঘড়িতে ঘণ্টা ও আধ-ঘণ্টাগুলি বাজতো। একদিন সে রাত্রিতে একটু দেরি করে' বাড়ীতে ফিরল। দরজা খুলতে খুলতে ঘড়ির একটা বাজনার আওয়াজ তার কানে এল। তার আধ-ঘণ্টা পর আর একটা, তার আধ-ঘণ্টা পর আর একটা এবং তার আধ-ঘণ্টা পর আর একটা বাজার আওয়াজ সে শুনতে পেল। সে ঠিক কটার সময় বাড়ীতে ফিরেছিল?

৮। জনৈক শিকারী তার তাঁবু থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে গেল এবং সেখানে সে গুলী করে' একটা ভালুক শিকার করল। সেখান থেকে সে তিন মাইল পশ্চিমে গিয়ে দেখতে পেল যে, সেখান থেকে তার তাঁবুর যতটা দূরত্ব আর যেখানে সে ভালুক শিকার করেছিল, সে জায়গা থেকেও তাঁবুর ঠিক ততটাই দূরত্ব। ভালুকটার কি রং ছিল?

(উত্তর আগামী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)

পুস্তক পরিচয়

রণ ও রাষ্ট্র—শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কমলা বুক ডিপো, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য চারি টাকা।

যুদ্ধ সম্বন্ধে বাঙলা ভাষায় যে কয়েকখানি পুস্তক জনসমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছে, তন্মধ্যে দিগিন্দ্রবাবুর 'রণ ও রাষ্ট্র' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় সংস্করণ অধিকতর আকর্ষণীয় হইয়াছে। পুস্তকের প্রথম দিকে খ্যাতনামা সাংবাদিক গ্রন্থকার রাষ্ট্রজীবনে রণনীতি বিকাশের ধারা মনোজ্ঞ ভাষায় বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই ক্রমাভিব্যক্তির সূত্র ধরিয়া স্থল, জল ও বিমানযুদ্ধের রীতিনীতি এবং কৌশল বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনায় বর্তমান যুদ্ধের অতি আধুনিক কৌশলসমূহও স্থান পাইয়াছে। হিটলারের ব্লিৎস্ নীতি এবং তাহার ট্যাঙ্ক বাহিনীর চমকপ্রদ আক্রমণের কৌশল কেন ব্যর্থ হইল তথ্যসমূহের সাহায্যে তিনি তাহা সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। বিমান বাহিত বাহিনীর ইতিহাস চিত্তাকর্ষক। প্রসঙ্গক্রমে এই পুস্তকে ভারতের যুদ্ধ-বিগ্রহাদির কারণ ও পরিণতি সম্বন্ধে অনেক বিষয় আলোচিত হইয়াছে। বহু চিত্রের সাহায্যে পাঠ্য বিষয় সর্বত্র পরিস্ফুট করা হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ সুন্দর। এই পুস্তক বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

"দেশ"-এর

নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১৩, ষাণ্মাসিক—৬॥

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপঃ—

সাধারণ পৃষ্ঠা—এক বৎসরের চুক্তিতে

১০০" ও তদূর্ধ্ব ... ৩, প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার
৫০"—৯৯" ... ৩।০ " " " "

সাময়িক বিজ্ঞাপন

৪, টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জানা যাইবে।

সম্পাদক—"দেশ"
১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

(সি ১২৩০৯)



ক্রিকেট—

রণজি ক্রিকেট প্রতি[illegible] ফাইনালে বোম্বাই ও হোলকার দল প্রতি[illegible]দ্বন্দ্বিতা করিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। এই দুইটি দল যে ফাইনালে উঠিবে সেই বিষয় কেহ কেহ সন্দেহ করিলেও আমরা করি নাই। ফাইনাল খেলাটি দর্শনযোগ্য ও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হইবে বলিয়া মনে হয়। উভয় দলই সমশক্তি সম্পন্ন। ব্যাটিং বা বোলিং বিষয় অপূর্ব নৈপুণ্য প্রকাশ করিবার মত খেলোয়াড়ের উভয় দলে অভাব হইবে না। সারা ভারতের ক্রিকেট খেলোয়াড় এই দুটি দলের খেলার ফলাফল জানিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া বসিয়া থাকিবেন, এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার দুইটি সেমি-ফাইনাল খেলার মধ্যে একটি মাদ্রাজে ও অপরটি বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজের খেলায় হোলকার দলের সহিত মাদ্রাজ দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং বোম্বাইর খেলায় উত্তর ভারত দলকে বোম্বাই দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। খেলা হিসাবে বোম্বাইর খেলাটি বিশেষ দর্শন-যোগ্য হয়। এই খেলায় বোম্বাই দলের আর এস মোদী ও ইউ মার্চেণ্ট এবং উত্তর ভারত দলের আব্দুল হাফিজ শতাধিক রাণ করেন। পঞ্চম দিনে খেলার নিষ্পত্তি হয়। হোলকার বনাম মাদ্রাজের খেলাটি চতুর্থ দিনেই শেষ হয়। এই খেলায় উদীয়মান খেলোয়াড় সারভাতে ব্যাটিং ও বোলিং উভয় বিষয়ে অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। তিনি মাদ্রাজের প্রথম ইনিংসে ৯০ রাণে ৬টি ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৬০ রাণে ৭টি উইকেট দখল করেন। একরূপ বলিতে গেলে বলিতে হয় সারভাতেই উক্ত সেমি ফাইনাল খেলায় হোলকার দলকে বিজয়ীর সম্মান দান করিয়াছেন। আমরা ইঁহার দীর্ঘজীবন ও উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

হোলকার দল সেমিফাইনাল খেলায় মাদ্রাজ দলকে ১০ উইকেটে পরাজিত করিয়াছে। মাদ্রাজ দল টসে জয়ী হইয়া প্রথম ব্যাটিং গ্রহণ করে। কিন্তু সারভাতের মারাত্মক বোলিংয়ের জন্য ২৫৪ রাণে প্রথম ইনিংস শেষ করে। সি পি জনষ্টন ব্যতীত কেহই পঞ্চাশের অধিক রাণ করিতে পারেন নাই। পরে হোলকার দল খেলিয়া ৪০৩ রাণে প্রথম ইনিংস শেষ করে। কম্পটন ও সারভাতে ব্যাটিংয়ে সাফল্য লাভ করেন। রঙ্গচারী ১১০ রাণে ৭টি উইকেট দখল করেন। মাদ্রাজ দল ১৪৯ রাণে পশ্চাতে পড়িয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন। এইবারেও সারভাতের বোলিং মাদ্রাজ দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। ফলে মাদ্রাজ দল দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৫৮ রাণ করিতে সক্ষম হয়। ফলে হোলকার দল সহজেই ১০ উইকেটে জয়লাভ করে। খেলার ফলাফলঃ

মাদ্রাজ প্রথম ইনিংসঃ—২৫৪ (সি পি জনষ্টন ৬৪, বি সি আলভা ৪০, রাম সিং ৩৪, সি টি সারভাতের ৯০ রাণে ৬টি উইকেট লাভ।

হোলকার প্রথম ইনিংসঃ—৪০৩ রাণ (ডেনিস কম্পটন ৮১, সারভাতে ৭৪, সি কে নাইডু ৭৪, ভায়া ৩৬, রঙ্গচারী ১১০ রাণে ৭টি ও রামসিং ১৪৯ রাণে ৩টি উইকেট পান)।

মাদ্রাজ দলের দ্বিতীয় ইনিংসঃ—১৫৮ রাণ সি পি জনষ্টন ৩৮, রিচার্ডসন ৪৪, এ জি রামসিং ২৭, সারভাতে ৬০ রাণে ৭টি ও সি এস নাইডু ৪৬ রাণে ২টি উইকেট লাভ করেন)

হোলকার দ্বিতীয় ইনিংসঃ—২২ রাণ কো আউট না হইয়া।

বোম্বাই দলও সেমিফাইনাল খেলায় উত্তর ভারত দলকে ১০ উইকেটে পরাজিত করিয়াছে। এই খেলাতেও বিজিত দল প্রথম ব্যাটিং করিবার সৌভাগ্য লাভ করেও প্রথম ইনিংস ৩৬৩ রাণে শেষ করে। বামহাতের খেলোয়াড় আব্দুল হাফিজ একা ১৪৫ রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। বোম্বাই দল ইহার প্রত্যুত্তরে প্রথম ইনিংসে ৬২০ রাণ করে। আর এস মোদী ও ইউ মার্চেণ্ট উভয়ে শতাধিক রাণ করেন। ইহা ছাড়া আর এস কুপার ও কে সি ইব্রাহিমের ব্যাটিং প্রশংসনীয় হয়। উত্তর ভারত ২৫৭ রাণ পশ্চাতে পড়িয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। প্রথম খেলোয়াড়দ্বয় নজর মহম্মদ



সারভাতে

ও মণিলাল অপূর্ব দৃঢ়তার সহিত খেলা আরম্ভ করেন। এমন কি ইঁহারা উভয়ে একত্রে ১২৩ রাণ সংগ্রহ করেন। ইহাতে মনে হয় উত্তর ভারত দল অধিক রাণ তুলিতে পারিবেন। ইঁহাদের পরে রামপ্রকাশও রাণ তুলিবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন; কিন্তু সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। উত্তর ভারত দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩১২ রাণে শেষ হয়। বোম্বাই দলের পক্ষে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রাণ তুলিতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। কেহ আউট না হইয়া প্রয়োজনীয় রাণ সংগ্রহ করে ও ১০ উইকেটে জয়লাভ করে। নিম্নে ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

উত্তর ভারত প্রথম ইনিংসঃ—৩৬৩ রাণ (হাফিজ ১৪৫, ভাইদ ৬০ নট আউট, ইমতিয়াজ আমেদ ৫৫, ফাদকার ৬১ রাণে ৩টি ও পালওঙ্কার ৩০ রাণে ২টি উইকেট পান)।

বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংসঃ—৬২০ রাণ (ইব্রাহিম ৬৭, আর এস কুপার ৬৮, আর এস মোদী ১১৩, ইউ মার্চেণ্ট ১৪৩, ফাদকার ৭৩, তারাপোর ৪১, হাফিজ ১৫৭ রাণে ৩টি ও আসলাম ৯৬ রাণে ২টি উইকেট পান)।

[illegible]াণ ৫৫, রুক্ [illegible] [illegible]ণে ৪টি ও এম [illegible]টি পান।

[illegible]দলের দ্বিতীয় ইনিংসঃ—৫৬

কুস্তি

বঙ্গীয় অপেশাদার কুস্তি সঙ্ঘ পরি[illegible] প্রাদেশিক কুস্তি প্রতিযোগিতা আরম্ভ হই[illegible] এই প্রতিযোগিতায় বাঙলার বিভিন্ন অ[illegible] বহু মল্লবীর যোগদান করিয়াছেন। ভা[illegible] প্রথায় মল্লযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইলেও দর্শ[illegible] প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহা[illegible] কোনরূপ দ্বিধা বোধ হইতেছে না। কুস্তি করিলে বাঙালী যুবক ও বালকগ[illegible] সুন্দর নিটোল দেহ লাভ করিতে পা[illegible] প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই অনুষ্ঠানে দেখা যাইতেছে।

হকি

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতি[illegible] ফেব্রুয়ারী গোরক্ষপুরে আরম্ভ[illegible] ১৩টি প্রাদেশিক দল [illegible] যোগদান করিয়াছে। প্রতিযোগিতায় যোগদান [illegible]বে। এই দলের জন্য বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী ১৫জন খেলোয়াড়কে মনোনীত করিয়াছেন। নিম্নে নির্বাচিত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইলঃ—শিলং (বি জি প্রেস), ডেভিড (বি এন আর), সি টাপসেল (বি এন আর), মিড (পোর্ট কমিশনার), হজেস (কাষ্টমস), এস লাস্ডী (ইষ্টবেঙ্গল), বি কাপুর (পোর্ট কমিশনার্স), জে গ্যালিবার্ডী (বি এন আর), ডালুজ (মেসারার্স), এ মিত্র (গ্রীয়ার), চিরঞ্জিৎ রায় (মোহনবাগান), কার (বি এন আর), ক্যাপ্টেন জানসেন (বি এন আর), সাইমস (রেঞ্জার্স), রেচ (বি এন আর)।

দোল উৎসবে রঙ্ খেলা

কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ার্স এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীঅরুণকুমার সরকার একটি আবেদনে জানাইতেছেনঃ—

বর্তমানে বস্ত্রের দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার জন্য হিন্দু ভাই-ভগিনীগণের প্রতি আমাদের অনুরোধ যে, আগামী "দোল" উৎসবের সময় তাঁহারা পিচকারীতে করিয়া কাপড়ে রঙ না দিয়া কেবলমাত্র আবীর-কুঙ্কুম-সাহায্যে উৎসব আনন্দ সম্পন্ন করিবেন।

বার্ষিক দোলপূর্ণি (১৩৫১) স

আনন্দবাজা

সমরপ

পূর্ব রণাঙ্গন—দীর্ঘকাল প্রায় একটানা সাফল্যের পরে পূর্ব রণাঙ্গনে রুশ বাহিনীকে প্রবল জার্মান প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে। চেকোস্লোভাকিয়ায় দানিয়ুব নদীতীরে জার্মানদের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে রুশ সৈন্যেরা হটে যেতে বাধ্য হয়েছে। পূর্ব প্রুশিয়ায় মেলসাকের কাছে জার্মান রিজার্ভ সৈন্যদল রুশদের অগ্রগতি রুদ্ধ করেছে। কেনিগস্‌বার্গের পশ্চিমে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলছে। নীস ও ববার নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে জার্মানরা সোমারফেল্ড ও সোড়াউ পুনরধিকার করেছে এবং সাগানে পুনরায় প্রবেশ করেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানিয়েছেন পোমারানিয়া থেকে কার্পাথিয়ান পর্বতের দক্ষিণ পাদদেশ পর্যন্ত ৪০০ মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে জার্মান সৈন্যদলের আক্রমণের তীব্রতা খুব বেশী। এইসব স্থানে যে যুদ্ধ হচ্ছে তার প্রচণ্ডতা স্ট্যালিনগ্রাড, বুদাপেস্ট আর ওয়ারস'র যুদ্ধের সঙ্গে তুলনীয়। রয়টারের সংবাদ থেকেই আরও জানা গেছে যে, রুশ সৈন্যের অগ্রগতিরোধের জন্য নূতন নূতন জার্মান রিজার্ভ বাহিনী প্রযুক্ত হচ্ছে। রয়টার মন্তব্য করেছেন যে, জার্মানদের এই প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ কিছুকালের জন্য যুদ্ধের গতির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

এক মাসেরও আগে জার্মানদের বিরুদ্ধে রুশদের এই ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ হয়। এই দীর্ঘকালের মধ্যে জার্মানদের তেমন কোন প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন রুশ সৈন্যদের হতে হয়নি। বর্তমানের তোড়জোড় দেখে মনে হচ্ছে জার্মানরা এইবার সত্য সত্যই প্রবলভাবে প্রতিরোধ করতে বদ্ধপরিকর। জার্মানরা পূর্বে প্রতিরোধ না করে এত বিলম্বে তার নিজের দেশের মধ্যে শত্রুকে প্রবেশ করতে দিয়ে তারপর প্রতিরোধে উদ্যোগী হয়েছে কেন, সে সম্বন্ধে অনুমান মাত্র করা চলে। আমরা পূর্বে বলেছি একটা কারণ রাজনৈতিক, মিত্রপক্ষের মধ্যে একটা বিভেদ ঘটাবার বা সুবিধাজনক সর্তে সন্ধি করতে বাধ্য করবার একটা শেষ প্রচেষ্টা। আর দ্বিতীয় কারণ হল, রুশ বাহিনীর সরবরাহ পথকে অত্যন্ত দীর্ঘ করে দ্রুত সরবরাহের অসুবিধার সুযোগ গ্রহণ করা। সে যাই হোক, জার্মানদের এই আক্রমণের ফল কি দাঁড়াবে এত আগে থেকে সে সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভবপর নয়। তবে এ বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, ত্রিরাষ্ট্র-নেতার বিবৃতিতে জার্মানী সম্বন্ধে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আভাস রয়েছে, তাতে জার্মানী বাধ্য হয়েই মরিয়া হয়ে লড়াই করবে। জার্মান বাহিনীর আঘাত হানবার যে শক্তির পরিচয় আমরা এখনও বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাচ্ছি এবং বিভিন্ন সংবাদদাতার মারফৎ জার্মান সৈন্যদের যে মনোবলের বিবরণ আমরা জেনেছি তাতে জার্মানী মরিয়া হয়ে লড়াই করলে শীঘ্র ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। আর জার্মান বাহিনীর আক্রমণের ফলে যদি রুশ বাহিনী হটে যেতে বাধ্য হয় তা হলে যুদ্ধ দীর্ঘতর হতে বাধ্য। জার্মানদের এ প্রতিরোধ ব্যর্থ হলে জার্মানীর পতনের সম্ভাবনা যে দ্রুততর হবে তাতেও সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই।

পশ্চিম রণাঙ্গন—পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের অগ্রগতি পূর্ব রণাঙ্গনের তুলনায় ধীর ও মন্থর। তারা রাইন ও মাস নদীর মধ্যবর্তী সীগফ্রীড লাইনের প্রধান ঘাঁটি গক শহরে প্রবেশ করেছে এবং পথে পথে তীব্র সংগ্রাম চলেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া এসতারনেথের কাছে মিত্র-সৈন্যেরা জার্মানীর অভ্যন্তরে ৫ মাইল ঢুকে পড়েছে। জার্মানরা যখন পূর্ব রণাঙ্গনে পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করেছে তখন পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণের চাপ বৃদ্ধি পাবে বলে মনে হয়। অন্তত জার্মানীকে কাবু করে ফেলা উদ্দেশ্য হলে উভয় রণাঙ্গনেই সমভাবে চাপ দেওয়া রণনীতিসম্মত হবে।

প্রশান্তমহাসাগরীয় রণাঙ্গন—এ রণাঙ্গনের যুদ্ধের এ সপ্তাহের বড় সংবাদ হল আমেরিকান সৈন্যদের আইওজিমা দ্বীপে অবতরণ। আইওজিমা প্রশান্ত মহাসাগরের ভলক্যানো দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত একটি দ্বীপ। টোকিও থেকে ৭৫০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। জাপানীরা মরিয়া হয়ে মার্কিন সৈন্যদের বাধা দিচ্ছে। মার্কিন সৈন্যেরা এই দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে স্থিত একটা বিমানক্ষেত্র দখল করেছে এবং সুরিবাচিয়ামার সুদৃঢ় জাপ ঘাঁটিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। আইওজিমাতে জাপানীদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা খুব দৃঢ়। এর রক্ষার সাফল্যের উপর খাস জাপানের নিরাপত্তা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। প্রবল জাপ প্রতিরোধের বিরুদ্ধে আইওজিমায় অবতরণ মার্কিন সেনাদের পক্ষে যে খুব কৃতিত্বের পরিচায়ক তা বলা বাহুল্য মাত্র। গত কিছুদিন থেকে জাপানীদের রণনীতি খুব রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে। বিনা যুদ্ধে আকিয়াব ছেড়ে সরে যাওয়ার পর থেকে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে জাপানীরা যে কেন ক্রমশঃ পশ্চাদপসরণ করছে, তা এখনও ঠিক স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে না। প্রথম প্রথম অনেকে বলেছিলেন যে, ফিলিপাইনের যুদ্ধে . . জাপানী . . . করবে। . . . . এখানে . . ম্যানিলা অধি. . . . তবু সেরূপ তীব্র কো . . . . র সম্মুখীন যে মার্কি. . . . ওখান হতে হয়েছে এরূপ কো . . দ আমরা পাইনি। অথচ মার্কি. সৈন্য ক্রমশই খাস জাপানের দিক এগি. যাচ্ছে এবং পুনঃ পুনঃ অতিকায় বি. পাঠিয়ে জাপানের রাজধানী টোকিও শ. বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত করছে। জাপানে এই সব সামরিক বিপর্যয়ের য . কোইসো গঠিত জাপ মন্ত্রিসভার পরি. হবে বলেও অনেকে আশঙ্কা কর . খাস জাপান রক্ষার ব্যগ্রতায় . দি তার রণক্ষেত্রকে সংকীর্ণত . কে, তবে তার পক্ষে তা মারাত্ম . . হয়েছে বলেই মনে হয়। ফলে প্রবল বিপক্ষকে গৃহপ্র . আত্মরক্ষার প্রশ্নকে সে জটিলত . তুলেছে। তবে একথা বলা চলে . কৌশলের পরিকল্পনা করে . রণক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপ . সম্বন্ধে সন্তোষজনক . . ব্যাখ্যা এখনও কেউ দেন নি।

ব্রহ্ম রণাঙ্গন—এই রণাঙ্গন সম্বন্ধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কম্যাণ্ডের যে ইস্তাহার বের হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত মর্ম হল—চীনা প্রথম ডিভিসনের সৈন্যেরা উত্তর ব্রহ্ম রণাঙ্গনের সেনওয়াইর দিকে এগিয়ে চলেছে। সেনওয়াই থেকে লাসিওর দূরত্ব ৩২ মাইল। বিপক্ষের বাধা সত্ত্বেও মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা ইরাবতী নদীর উপরে সেতুমুখ প্রসারিত করেছে এবং মান্দালয়ের উত্তরে সিঙ্গু এলাকায় তারা আরও অগ্রসর হয়েছে। মাইটসনে সোয়েলি নদীর সেতুমুখ থেকে মিত্রপক্ষের সৈন্যদের বিতাড়িত করার জন্য জাপানীরা প্রবলভাবে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু তারা তা করতে সমর্থ হয় নি। জাপানীদের এক বৃহৎ রণপরিকল্পনায় বিভিন্ন অঙ্গ—ব্রহ্ম, প্রশান্ত মহাসাগর ও চীনের রণক্ষেত্র। পূর্বেই বলেছি সমগ্র জাপানী রণনীতিই বর্তমানে এক রহস্যময় ব্যাপার হয়ে পড়েছে। এ রহস্য আরও বেশী হয়েছে জাপানীদের নৌবল, বিমানবল ও সেনাবল সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য না জানার দরুণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুদ্ধ এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছতে বাধ্য যখন জাপানীদের মতলব আঁচ করা খুব কঠিন হবে না। কতদিন পরে সেরূপ অবস্থা আসবে তা আন্দাজ করে বলা কঠিন। তবে সে ক্ষণ যে অদূরবর্তী একথা স্বচ্ছন্দেই বলা চলে।

—বিষ্ণু গুপ্ত

প্রাচীন ভারতের দাসপ্রথা
মুক্তির নিয়মাবলী সম্বন্ধে
্যবহারশাস্ত্রের অন্যতম প্রসিদ্ধ
ণ্ডেশ্বর ঠক্কর কৃত 'বিদ্যারত্না
য়াদশ শক-শতাব্দীর মধ্যভাগে
ই গ্রন্থ রচিত হয়। চণ্ডেশ্বরের
ন্মভূমি মিথিলা, ইহাতে মনে হয় মিথিলা
তৎসন্নিহিত বাঙ্‌লাদেশে ছয়শত বৎসর
র্বে চণ্ডেশ্বর-বর্ণিত নিয়মপ্রণালী
লিত ছিল।

জাহৃত, ভক্তদাস, গৃহজ, ক্রীত, দাত্রিম,
এবং দণ্ডদাস—এই সাত প্রকার দাসের
নুসংহিতাতে পাওয়া যায়। যুদ্ধে
পক্ষের দাসদাসীরাও বিজেতৃ
ম্বন করিত, সেই দাসের সংজ্ঞা
াছে 'ধ্বজাহৃত' (ধ্বজিনী শব্দের
সেনার সাহায্যে পাওয়া যায়
সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।) যে
তাড়নায় অন্নার্থী হইয়া দাস্য
'ভক্তদাস'। আপন দাসী-
পুত্রকে 'গৃহ' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। মূল্য দিয়া খরিদ করিলে সেই দাসকে বলা হইত 'ক্রীত'। প্রতিগ্রহলব্ধ অর্থাৎ দানপ্রাপ্ত দাসের সংজ্ঞা 'দাত্রিম'। পূর্বপুরুষের দাসীর গর্ভে জাত দাস 'পৈতৃক'। রাজদ্বারে অপরাধী শূদ্র রাজদণ্ড পরিশোধে অসমর্থ হইয়া রাজসরকারে দাস্য-স্বীকার করিলে তাহাকে 'দণ্ডদাস' বলা হইত।

নারদস্মৃতিতে পনর প্রকার দাসের কথা দেখিতে পাই। যথা—(১) গৃহজাত, (২) ক্রীত, (৩) লব্ধ, (৪) পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত, (৫) অন্নাকালভৃত (দুর্ভিক্ষে অন্নদান করিয়া যে শূদ্রকে দাসরূপে পাওয়া যায়।) (৬) আহিত (প্রভু ঋণ গ্রহণ করিয়া উত্তমর্ণের নিকট যাহাকে বন্ধক রাখিয়াছেন,) (৭) ঋণমোক্ষিত (বড় ঋণ হইতে মুক্ত করিয়া যাহাকে দাসরূপে নিযুক্ত করা হইয়াছে), (৮) যুদ্ধে প্রাপ্ত, (৯) পণজিত (যদি এই বিচারে বা এই চুক্তিতে পরাজিত হই তবে এতদিন তোমার দাস হইয়া থাকিব এই প্রকার পণে পরাজিত), (১০) উপগত ("আমি তোমার দাস হইলাম" এইভাবে যে আত্মসমর্পণ করে), (১১) প্রব্রজ্যা ভ্রষ্ট, (১২) কৃত (যে কোনও কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদে যে দাস্য স্বীকার করে), (১৩) ভক্তদাস (পেটের জ্বালায় জীবন রক্ষার নিমিত্ত যে দাসত্ব করে), (১৪) বড়বাকৃত (বড়বা শব্দের অর্থ দাসী, দাসীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া যে ব্যক্তি দাসীর প্রভুর দাসত্ব স্বীকার করে), (১৫) আত্মবিক্রেতা।

সন্ন্যাস-আশ্রম-ভ্রষ্টদের পক্ষে বিশেষ নিয়ম আছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভ্রষ্ট হইলে রাজার দাসত্ব গ্রহণ করিবে, ব্রাহ্মণের পক্ষে এই স্থলে নির্বাসন দণ্ডই দাসত্বস্থানীয়। উল্লিখিত পনের প্রকার দাসের মধ্যে গৃহজাত, ক্রীত, লব্ধ, পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত ও আত্মবিক্রয়ী প্রভুর অনুমতি ব্যতীত দাসত্ব মুক্ত হইতে পারে না। দুর্ভিক্ষের সময় উদরান্নের জন্য যে দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, সে তাহার সুসময়ে ভুক্ত অন্নাদির মূল্য এবং দুইটি গরু প্রভুকে দিতে পারিলেই মুক্ত হইবে। ভক্তদাসের মুক্তি তাহারই ইচ্ছাধীন, প্রভুর অন্ন ত্যাগ করিলেই তাহার মুক্তি। প্রভুকে প্রাণসংশয় সংকট হইতে উদ্ধার করিতে পারিলে সকল অবস্থাতেই দাসত্বের বিরতি ঘটে। ঋণমোক্ষিত দাস সুদসহ পূর্বপ্রদত্ত ঋণের অর্থ স্বামীকে পরিশোধ করিতে পারিলেই মুক্ত হইতে পারিত। পণজিত এবং কৃতদাস নির্দিষ্ট মেয়াদের অন্তে আপনা হইতেই মুক্ত হয়। বড়বাকৃত দাস দাসীর সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিতে পারিলেই স্বতন্ত্রতা লাভ করিবে। পূর্বে যে দাসী বা দাসীকন্যা নয়, সেও দাসের সহিত বিবাহিত হইলে দাস-স্বামীর দাসীরূপে পরিগণিত হয়।

প্রভুর ঔরসে দাসীর গর্ভসঞ্চার হইলে সন্তান প্রসবের পরেই দাসীকে আর দাসীরূপে থাকিতে হইবে না; প্রভুর অপর পুত্র না থাকিলে দাসীগর্ভে জাত পুত্রও পুত্রের সম্যক্ অধিকারই লাভ করিবে।

যে দাসী নহে সে যদি কোন দাসের সহিত বিবাহিত হয়, তবে দাসের প্রভুই এই দাস-পত্নীরও প্রভু হইবেন। আর এক প্রভুর দাসী যদি অন্য প্রভুর দাসের সহিত বিবাহিত হয়, তবে সেই দাসী তাহার প্রভুর অনুমতিক্রমে দাসেশ্বরের দাসী হইবে, অনুমতি না পাইলে হইবে না। দাস সম্বন্ধেও একই নিয়ম।

প্রভুর অনুমতি না লইয়া কোন দাস পরের দাসীকে বিবাহ করিলে আপন আপন পূর্ব প্রভুই তখনও প্রভু থাকিবেন। কিন্তু ঐ দাস-দম্পতীর সন্তানে দাস-প্রভু ও দাসী-প্রভু উভয়েরই সমান অধিকার।

দাসদাসীর উপার্জিত অর্থে প্রভুরই সম্পূর্ণ অধিকার; স্বোপার্জিত অর্থ যথেচ্ছভাবে ভোগ করিবার অধিকার দাসদাসীদের নাই। একমাত্র শূদ্র জাতি ব্যতীত অপর জাতিকে দাস্যকর্মে নিয়োগ করা চলিবে না এবং নিতান্ত বিপন্ন না হইলে প্রভু কোন [illegible] না, বিশেষত দাসদাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিক্রয় করিলে রাজদ্বারে দুই শত পণ দণ্ড দিতে হইবে। বাঙালী হিন্দুর প্রাচীন সমাজ পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ নিবন্ধগ্রন্থ অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বের [illegible] রঘুনন্দনও এই সব বিষয়ের কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারও আপন নিবন্ধগ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, তিন শত বৎসর পূর্বেও দাস-দাসীর ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল।

ভারতের ন্যায় অন্যান্য দেশেও দাসত্ব-প্রথা ছিল। যুদ্ধে বিজিত সৈন্যদিগকে বন্দী করিয়া দাসরূপে পরিবারভুক্ত করা বা বিক্রয় করার পদ্ধতি প্রাচীন গ্রীসে প্রচলিত ছিল। প্রভুর গৃহকার্য নির্বাহ, কৃষি পরিচালনা প্রভৃতি দাসদের কাজ ছিল। এথেন্স নগরীতে দাসদের সামাজিক অবস্থা ইউরোপের অন্যান্য দেশ হইতে অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল, পরিবারেরই একজনের মত তাহারাও গৃহস্বামীর সকল কাজেই লিপ্ত থাকিত। রোমে দাসদের প্রতি তাদৃশ সুবিচার করা হইত না, সেখানে দাসদাসীদের বিবাহ প্রথা ছিল না, প্রভুর অনুমতি পাইলে কেবল স্ত্রী-পুরুষের মিলন মাত্র হইতে পারিত। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কে রাজাদেশে প্রথমত এই প্রথা রহিত হইতে আরম্ভ হয়, পরে সকল দেশেই ক্রমশ আইনের বলে রহিত হইয়াছে।

পূর্ব বঙ্গ এবং শ্রীহট্টের কোন কোন সম্পন্ন ভূস্বামী পরিবারে এখনও বাঁদি ও গোলাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব দাস-দাসীর সাংসারিক সমস্ত ব্যয় বহন করিতে প্রভুরা বাধ্য, প্রভুদের সহিত একই পরিবারে অথবা খানে বাড়িতে (প্রভুর বসত বাড়ির সংলগ্ন জমিতে) ঘর বাঁধিয়া বাঁদি গোলামেরা বাস করে। বাড়িঘর ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার রাখা, উচ্ছিষ্ট মার্জন, বাজার হাট করা প্রভৃতি দাসদাসীদের নিত্যকর্ম। এই সকল বাঁদিগোলাম গৃহজাত এবং ভক্তদাস শ্রেণীর অন্তর্গত। আজকাল ক্রয়-বিক্রয় প্রথা নাই বটে, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনকে দান করা, বিবাহে কন্যার সঙ্গে জামাতার বাড়িতে দীর্ঘকালের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া ইত্যাদি এখনও পূর্ববঙ্গের সমৃদ্ধ সমাজে প্রচলিত। এই প্রচলনকে দাস-প্রথা বলা চলে না, ইহা অনেকাংশে পুরুষানুক্রমে ভৃত্য পোষণের মত। কর্তৃ-শূন্য পরিবারে এই সকল চাকর-চাকরানীদের অনেক সময় কর্তৃত্ব করিতে দেখা যায়। পিতৃমাতৃহীন নাবালক প্রভুপুত্র, ভর্তৃহীন নাবালিকা প্রভুপত্নী ইহাদেরই তত্ত্বাবধানে থাকিয়া সংসার পরিচালনের যোগ্যতা অর্জন করিতেছেন—এরূপ পরিবার এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

গঙ্গোত্রী

সুবোধ ঘোষ

(১৬)

চুপ করে দাঁড়িয়েছিল কেশব। তার সকল নেতৃত্বের কৌশল ব্যর্থ হয়ে গেছে, আজকের ঘটনাকে সুপথে টেনে নিয়ে যাবার শক্তি তার নেই।

ভজু এগিয়ে চলেছিল গাঁজার দোকানের দিকে।

আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ভজুর সম্মুখে দাঁড়ালো মাধুরী। ভজু চকিতে দু'পা পিছিয়ে সরে দাঁড়ালো।

মাধুরী বললো—আমাদের মাপ কর ভজুদাদা। কিন্তু গাঁজা আর স্পর্শ করো না।

মাধুরী হাতযোড় করে দাঁড়িয়েছিল। ভজু যেন সন্দেহের মত দাঁড়িয়ে দেখছিল। একবার পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখলো ভজু। মাধুরীর দিকে তাকিয়ে তেমনি ভয়ে ভয়ে বিড়বিড় করে বললো—এঃ, আপনি আমার উপর পাপ টেনে আনছেন গো দিদি। এ কি কাণ্ড! ছি ছি!

জনতার পাশ কাটিয়ে ভজু এক লাফে দোকানের পথ ছেড়ে মাঠের দিকে সরে এল। তারপর দিঘীর কিনারা ধরে এক দৌড়ে পালিয়ে গেল।

মাতাল ভজু দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্য, একটুও তার পা টলছিল না।

আজকের রৌদ্রালোকে শত লোকের প্রত্যক্ষে মান্দার গাঁয়ের জীবনের নাটমঞ্চে যেন প্রমাণিত হয়ে গেল যে, মাধুরীই একমাত্র নায়িকা। মান্দার গাঁয়ের জীবনে নতুন ঘটনার সাড়া সৃষ্টি করতে, সকল অপঘটনার উপদ্রবকে শাসনে সংযত রাখতে একমাত্র শক্তি রাখে মাধুরী। কেশব ভট্চাযের নায়কত্ব বাতিল হয়ে গেছে। পাঁচ বছরের কালের সমাধিতে কেশব ভট্চাযের সেই প্রতিভা লুপ্ত হয়ে গেছে। মান্দার গাঁয়ের পথঘাট বদলে গেছে, কেশব ভট্চায স্বচক্ষে দেখেছে এই পরিবর্তন। তবু এই নতুন পথে দাঁড়াবার রীতিনীতি সে জানে না।

ভজু পালিয়ে চলে যেতেই জনতা উল্লাসে জয়ধ্বনি করছিল। বিদ্যাপীঠের ছেলেরা আরও হুল্লোড় সৃষ্টি করছিল। জয়ধ্বনি উচ্চরোল মাঝে মাঝে কর্কশ হয়ে গর্জনের মত শোনাচ্ছিল। গাঁজার দোকানের ভেণ্ডার রামচরণ তাড়াতাড়ি কপাট বন্ধ করে দিল।

তবু জনতার ছত্রভঙ্গ হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। যেন ঘটনার নেশায় পেয়েছে তাদের। আজ শুধু পথ রুখে দাঁড়াবার দিন। সকল অবাঞ্ছিতের বিরুদ্ধে আজ দাঁড়াতে হবে। সকল অনাহূতকে আজ গাঁয়ের সীমার বাইরে ঠেলে নিয়ে যেতে হবে। ইষ্ট এবং অনিষ্টকে চেনবার একটি নিয়ম তারা জেনে ফেলেছে। গাঁয়ের আগ্রহকে উপেক্ষা করে, গাঁয়ের সম্মতি না নিয়ে যা কিছু এসেছে, সবই অনিষ্ট। ইংরেজি স্কুল, গাঁজার দোকান আর বোর্ড অফিস—কোনদিন তাদের কাম্য ছিল না। আজও তারা ভাল করে এই সব আবির্ভাবকে চিনতে পারে না। তবু মনে হয়, এই সবই এক ভয়াবহ যড়যন্ত্রের সূত্রে বাঁধা। জেলা বোর্ডের সড়কের নতুন পুলটাকেও আজ শত্রু বলে মনে হয়। ঐ সেতু গাঁয়ের অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যকে যেন ইঁটপাথরে গেঁথে বন্দী করে রেখেছে। গাঁয়ের স্বাধীন মন পথ চলতে চলতে ঠিক ঐখানে এসে বাধা পায়। পুলবাবু দাঁড়িয়ে আছেন খাতা হাতে নিয়ে। কোন হাটুরে এক বোঝা কুমড়োর ডাঁটাও বিনা মাশুলে পার করতে পারে না। বোঝা প্রতি দু'পয়সা মাশুল। গরু প্রতি এক পয়সা মাশুল। পাল্কি আর গরুর গাড়ির এক আনা। এই সেতু গাঁয়ের কোন কল্যাণের আগমন সহজ করে তুলতে পারে নি, শুধু একবার লাট সাহেবের মোটর দৌড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজও মাশুল আইন অমান্য করার অভিযোগে একুশটি মোকদ্দমা দায়ের আছে। এর আগে দশ টাকা থেকে আড়াই টাকা পর্যন্ত জরিমানাও অনেকের হয়ে গেছে। আজ কারও মনে আর কোন সংশয় নেই। সকল পাপের ছদ্মবেশ আজ সুস্পষ্ট ধরা পড়ে গেছে। নেহাৎ অসবাধানের ভুলে

...ও কাঁপছে

...য়ের উদ্ধত শৃঙ্গ

...বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ,

...গঞ্জে বন্দরে, বনমরু,কান্তারে—

...জাগরণের হর্ষ, একই শৃঙ্খলা ভা...

...নি। দেশ জোড়া এই ব্রতের ...

পুরোহিত মহাত্মা গান্ধী। মন্দি...

মসজিদে আজ সকল প্রার্থনার মধ্যে ...

ঘোষণাই সব চেয়ে বড় সুরে শোনা...

জনতা যেন আবেগে চঞ্চল হয়ে

রণাঙ্গন খুঁজছিল। মহাত্মা গান্ধ...

জয়! ধ্বনির আলোড়ন তুলে

দৌড়ে চলে গেল জেলা বোর্ডের

দিকে। আজ সারা দিন ধরে ...

ঘোষ নিয়ে পুল পারাপার হবে

পয়সাও মাশুল দেবে না।

ছেলেরা একটা পাল্কি যোগ...

পাল্কির ভেতর মহাত্মা গান্ধীর...

মালা দিয়ে সাজিয়ে রাখলো।

তারা নিজেদের কাঁধে বয়ে ...

এক পয়সাও মাশুল দেবে...

বাধা দেয়, তবে সত্যাগ্রহ...

জয়! বিদ্যাপীঠের ছে... বোর্ডের সড়কে

পুলের দিকে চলে গেল।

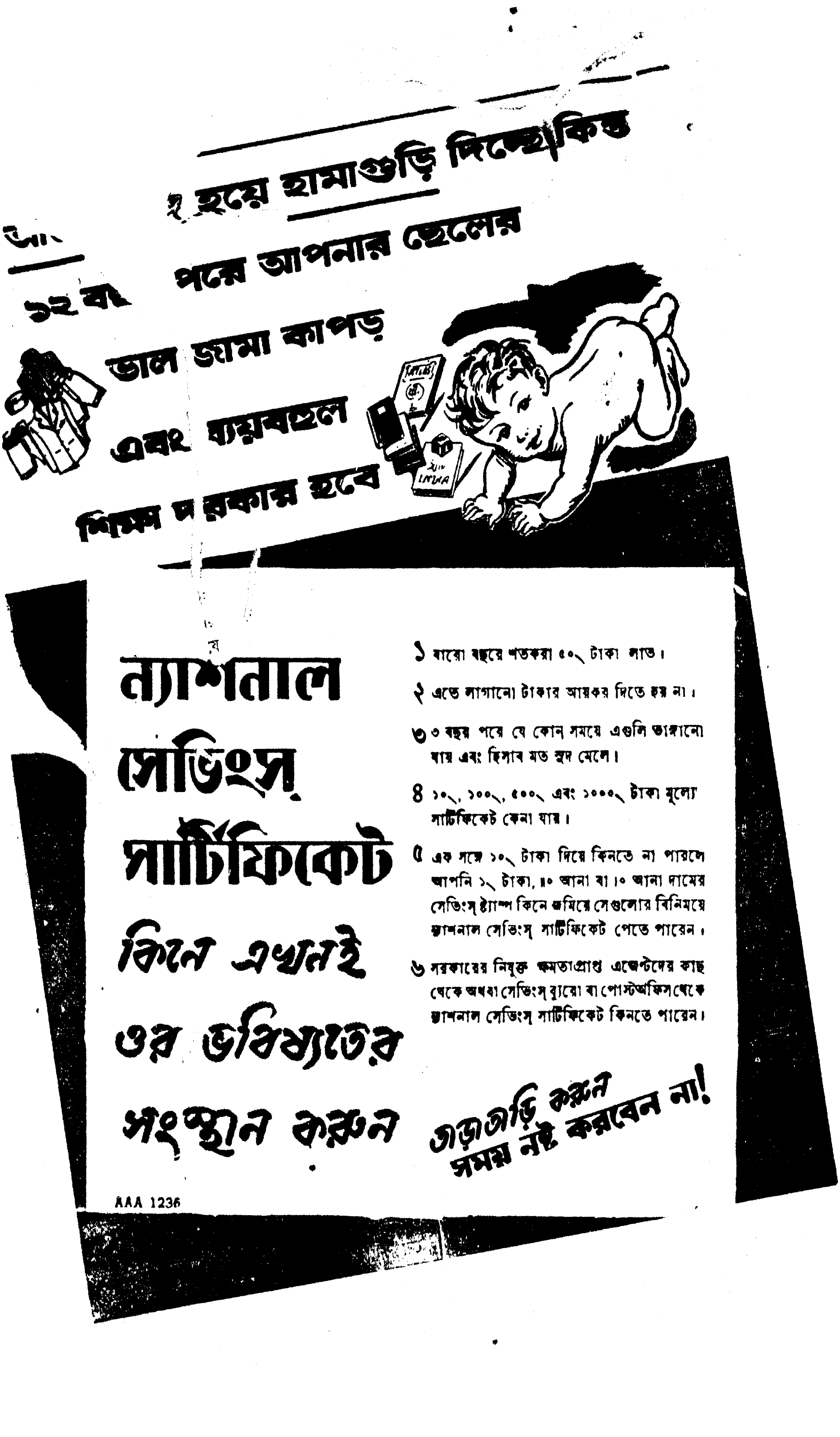
জনতার আর একদল হঠাৎ দেখতে পেল, বোর্ড অফিসের আঙিনায় একদল দূর গাঁয়ের চাষী এসে বসে রয়েছে। দু'একজন করে আরও আসছে—বকেয়া ট্যাক্স মিটিয়ে দিতে।

কেউ ট্যাক্স দিয়ো না! জনতা এই দুঃসাহসের আবেদন সমস্বরে ধ্বনিত করে, বোর্ড অফিসের দিকে দৌড়ে গেল। চাষীদের চারদিকে ঘিরে দাঁড়ালো।

দিঘীর ঘাটের আসর শূন্য। আর কেউ সেখানে ছিল না। শুধু কেশব ভট্চায আর মাধুরী। কেশব ভট্চায যেন আজ মনে মনে প্রস্তুত হয়ে এসেছে। তার কাজ এখনও শেষ হয় নি। তা না হলে, এখনও দাঁড়িয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না।

মাধুরীর আপাততঃ আর কোন কাজ নেই। বাড়ি ফিরে যাওয়াই এখন একমাত্র কাজ। কেশব সেখানে না থাকলে, মাধুরী অনায়াসেই ঘরে ফিরে যেতে পারতো। কিন্তু কেশবের নিস্তব্ধ অস্তিত্ব যেন একটা বাধা হয়ে মাধুরীর পথ আটক করে রেখেছে। একটা অপ্রস্তুত ও অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে নিঃশব্দে অন্যদিকে তাকিয়ে মাধুরী দাঁড়িয়েছিল।

কথা বলার জন্যই মাধুরীর দিকে চোখ তুলে তাকালো কেশব।


হয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে কিন্তু
পরে আপনার ছেলের
ভাল জামা কাপড়
এবং ব্যয়বহুল
দরকার হবে
ন্যাশনাল
সেভিংস্
সার্টিফিকেট
কিনে এখনই
ওর ভবিষ্যতের
সংস্থান করুন
১ বারো বছরে শতকরা ৫০৲ টাকা লাভ।
২ এতে লাগানো টাকার আয়কর দিতে হয় না।
৩ ৩ বছর পরে যে কোন সময়ে এগুলি ভাঙ্গানো যায় এবং হিসাব মত সুদ মেলে।
৪ ১০৲, ১০০৲, ৫০০৲ এবং ১০০০৲ টাকা মূল্যে সার্টিফিকেট কেনা যায়।
৫ এক সঙ্গে ১০৲ টাকা দিয়ে কিনতে না পারলে আপনি ১৲ টাকা, ।৷০ আনা বা ।০ আনা দামের সেভিংস্ ষ্ট্যাম্প কিনে জমিয়ে সেগুলোর বিনিময়ে ন্যাশনাল সেভিংস্ সার্টিফিকেট পেতে পারেন।
৬ সরকারের নিযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্টদের কাছ থেকে অথবা সেভিংস্ ব্যুরো বা পোস্টঅফিস থেকে ন্যাশনাল সেভিংস্ সার্টিফিকেট কিনতে পারেন।
তাড়াতাড়ি করুন
সময় নষ্ট করবেন না!
AAA 1236

কিছুক্ষণ ধরে একটা অস্বাভাবিক বিস্ময়ে কেশবের দৃষ্টি যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। মাধুরীকে যেন ঠিক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সে ... মান্দার গাঁয়ের নতুন জীবনের অভিনয়ে ... নায়িকার ..., মাধুরীর প্রতিচ্ছায়ার ... লেশ মাত্র এর মধ্যে নেই। বয়সে, চেহারায়, সাজে ও মুখাবয়বে সম্পূর্ণ এক নতুন মূর্তি। সেই গাঁয়ের মাটির পুতুলকে এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

মাধুরী অনেক বড় হয়ে গেছে; কিন্তু কেশবের বিস্ময় আরও দিশাহারা হয়ে পড়ছিল, সেই মাধুরী বড় হয়ে উঠেছে, না অন্য কেউ। এ যেন গ্রাম-ছাড়া ঐশ্বর্য বলেই সন্দেহ হয়। গাঁয়ের ঝুমকো কুঁড়ি বড় হয়ে কনকধুতুরা হয়ে যেতে পারে না। কেশবের সন্দেহ হয়, মাধুরীর মুখের ভাষাও আজ যে বুঝতে পারবে কিনা কে জানে। হয়তো সে-ভাষার ব্যাকরণও একেবারে নতুন ধরণের। মাধুরীর খদ্দরের শাড়ি, শাড়ি পরার ভঙ্গি, খোঁপার ছাঁদ, ভুরু, চিবুক, গ্রীবা—সবই যেন নতুন ছন্দের গর্বে গড়ে উঠেছে। এত অভিনবত্ব অসহ্য।

মাধুরী হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বললো—জেঠাইমার সঙ্গে এখনও দেখা করতে পারি নি, যেন কিছু না মনে করেন। আমি যাব একদিন।

সকল চিন্তার বিভ্রান্তি থেকে নিজেকে যেন জোর করে মুক্ত করলো কেশব। এই অভিনবত্ব যতই দুঃসহ হোক, সইতে হবে। মাধুরীকে চিনতে হবে। হয়তো চিনতে না পেরেই, সেই পুরাতন সত্যকে আজ এত অভিনব মনে হচ্ছে।

কেশব বললো—আজই চল।

মাধুরী কিছুক্ষণ চুপ করে, দূরে বোর্ড অফিসের আঙিনার জনতার দিকে তাকিয়ে রইল। তার পর যেন সংকোচের সঙ্গে বললো—কবে ছাড়া পেলেন কেশবদা?

কেশব—যে-রাত্রে তুমি এলে, তার আগের রাত্রে এসেছি।

মাধুরী—আপনি কি করে জানলেন যে আমি রাত্রিবেলা এসেছি।

কেশব—আমি দেখেছি।

মাটির দিকে মাথা হেঁট করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল মাধুরী। মান্দার গাঁয়ের দিনের আলোক মুছে গিয়ে ঝাপ্‌সা হয়ে আসছে। ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। সেই অন্ধকারের মধ্যেই এক জোড়া আগ্রহভরা দৃষ্টি যেন তাকে ঠাঁই ঠাঁই খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে কাহিনী যেন মান্দার গাঁয়ের অন্ধকারে নির্বিকার সত্যের মত লুকিয়ে রয়েছে। পাঁচ বছরের দীর্ঘ ব্যবধানেও সেই মোহ একতিল ক্ষয় হলো না। এই অবিচলত্ব একেবারে অসহ।

মাধুরী—আমি ... যাব।

কেশব—কেন?

মাধুরী—এখানকার কাজ ...

কেশব—একটা কথা জিজ্ঞাসা ... মাধুরী।

মাধুরী—বলুন।

কেশব—তুমি কি সত্যিই কলেজ ছেড়ে দিয়েছ।

মাধুরী—হ্যাঁ।

কেশব—এখন স্বদেশী করছো?

মাধুরী হেসে ফেললো। কেশব একটু অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞাসুর মত তাকিয়ে রইল।

মাধুরী বললো—কি রকম প্রশ্ন করছেন কেশবদা!

কেশব—বোধ হয় আমার প্রশ্নের ভাষাটা......

মাধুরী—হ্যাঁ।

কেশব—আমি সেকথা জানি মাধুরী।

মাধুরী যেন আরও স্পষ্ট করে বুঝবার জন্য তাকালো। কেশব বললো—আমি জানি, পাঁচ বছর কয়েদী হয়েছিলাম, আমার ভাষাটাও কিরকম হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, তোমার ভাষা এত নতুন হয়ে গেছে যে, আমারও বুঝতে কষ্ট হয়।

মাধুরী—আপনি এখন কি করবেন?

কেশব—জানি না।

মাধুরী—আন্দোলনে যোগ দেবেন না?

কেশব—কিসের আন্দোলন?

মাধুরী—নন্‌-কো-অপারেশন।

কেশব—আমি ওসব কিছু বুঝি না।

মাধুরী—চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবেন।

কেশব—তুমি কি সত্যিই আমাকে উপদেশ দিচ্ছ?

মাধুরী একটু বিড়ম্বিত ও বিরক্ত হয়ে বললো—না। অনুরোধ করছি।

কেশব—তোমার কাছে আমারও একটা অনুরোধ আছে।

মাধুরী—বলুন।

কেশব—তুমি এই আন্দোলন ছেড়ে দাও।

মাধুরী—অদ্ভুত অনুরোধ করছেন আপনি।

কেশব—একাজ তোমার ভাল লাগছে?

মাধুরী—এও আপনার অদ্ভুত প্রশ্ন।

কেশব—কেন?

মাধুরী—এর উত্তর হয় না।

কেশব—আমার কি মনে হয় জান? তোমার পক্ষে উত্তর দেওয়া কঠিন, তাই কিছু বলতে পারছো না।

মাধুরী—কি করে বুঝলেন?

কেশব—একাজ তোমার মনেপ্রাণে ভাল লাগছে না। জোর করে নিজেকে মাতিয়েছ। কিন্তু আমিও সত্যিই মাঝে মাঝে আশ্চর্য হই, তুমি কি ভেবে এই হুজুগে মাতলে?

... তোমারই অনুরো... ... আমার আছে।

...ক?

...রী—আমি জানি, আপনি আন্দো... না দিয়ে পারবেন না।

কেশব—তুমি ঠিকই বলেছ। যদি ব... পারতাম, এই আন্দোলনটা কি? ... জন্য? এর শেষ কোথায়? আমা... লাভ আছে এর মধ্যে?

মাধুরী—নিজের লাভ খুঁজলে ... মধ্যে পাবেন না।

কেশব—তাহলে তোমার ... বৃথা হবে, কোন আন্দোলনে আমার ... নেই।

মাধুরী—আপনি আজও ... রকম আছেন কেশবদা।

কেশব—কি রকম?

মাধুরী—কড়া কথা ব... আপনার চিরকালের অভ্যাস, আজও...

কেশব হেসে হেসে বললো—আমি কি সত্যিই সেই রকম আছি—তুমি বিশ্বাস কর?

মাধুরী—হ্যাঁ, পাঁচ বছরেও আপনার একটুও পরিবর্তন হয় নি।

কেশব—তোমার কাছে যেটা পাঁচ বছর মনে হচ্ছে, আমার কাছে সেটা শূন্য মাত্র।

মাধুরী অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

কেশব—তোমার জীবনে পাঁচ বছরে অনেক আশীর্বাদ এসেছে। তুমি বড় হয়ে উঠেছ, কলেজে পড়েছ, রাজনীতি শিখেছ। কিন্তু আমার পাঁচ বছর তো তা নয় মাধুরী। আমার কাছে একটানা রাত্রির মত এই পাঁচ বছর সময় কেটে গেছে। আমি কাউকে দেখতে পাই নি, কারও কথা শুনতে পাই নি। যা আগেই দেখা ছিল, যে কথা আগেই শোনা ছিল, তারই অনুভব নিয়ে আমার সময় কেটেছে। আমার কোন পরিবর্তন হয় নি মাধুরী। যেমন গিয়েছিলাম, তেমনি ফিরে এসেছি।

অনেকক্ষণ ধরে মাধুরী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মনের ভেতর যেন দুই ভ্রান্তির দ্বন্দ্ব চলছিল। কেশবের ভাষা সে বুঝতে পারে না, একথা চরম মিথ্যা।

মাধুরী বললো—কিন্তু তবু তোমার এতদিনে বদলে যাওয়া উচিত ছিল কেশবদা। পৃথিবী বদলে যাচ্ছে।

কেশব আশ্চর্য হয়ে দেখতে পেল, মাধুরীর চোখের কোনে যেন একটা সজল আবেদন চিক্‌চিক্ করছে। (ক্রমশ)

ষ্যার কংগ্রে
ী এবং তাঁহ
রী গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ অ
ভযোগে গত ১০ই ফেব্রুয়া
য়াছেন।

অদ্য কেন্দ্রীয় পরিষদে হিন্দুদিগের
াহ সম্পর্কে হিন্দু আইনানুযায়ী আ
নিষেধ দূর করিবার এবং বিশেষভাবে
ত্র বিবাহ আইনসিদ্ধ করিবার জন্য শ্রীযুত
ন্দ দেশমুখের বিলখানি সিলেক্ট কমিটিতে
র প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা হয়।

৫ই ফেব্রুয়ারী—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে
হন সচিব স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল
য়ে বাজেট পেশ করেন। ১৯৪৫-৪৬ সালে
হইতে রেলওয়েসমূহের ২২০ কোটি
য় হইবে এবং পরিচালনার ব্যয় হইবে
টি ৮৭ লক্ষ টাকা। সুতরাং ৬০
লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে।

মিত্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে
ন্যদের অপনিয়োগ করা" সম্পর্কে
ইমাম রাষ্ট্রীয় পরিষদে
স্তাব উত্থাপন করেন, তাহ
চ করিয়াছেন।

য়ারী—বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের
আরম্ভ হয়। এই দিন বাঙলার
তুলসীচন্দ্র গোস্বামী
বাজেট পেশ করেন।
উহাতে দেখা যায় চলতি বৎসরে ১১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা এবং আগামী বৎসরে (১৯৪৫-৪৬) ৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে। যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ বাবদ বাঙলা গভর্নমেণ্টের ১৯৪৩-৪৪ সালে ১৪২২৫০০০০, টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই বাবদ চলতি বৎসরে ২৯০৪০০০০০, টাকা এবং আগামী বৎসরে ১৮১০০০০০০, টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

অদ্য অপরাহ্নে জোড়াসাঁকো অঞ্চলে আপার চিৎপুর রোডে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ফলে একটি বৃহৎ চারিতলা অট্টালিকার ৎকয়দংশ একেবারে ধ্বসিয়া পড়ে। ফলে বহুলোক হতাহত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। এপর্যন্ত দুইজন মৃত্যুমুখে পতিত এবং প্রায় ৩০ জন আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতা কলেজ রোর এক বাড়ীতে একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, অদ্য অপরাহ্নে কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তি ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া উমা দে নাম্নী একটি তরুণীকে তাঁহার স্বামীর অনুপস্থিতিতে গলা কাটিয়া হত্যা করে এবং তাঁহার গহনাপত্র লইয়া চম্পট দেয়। পুলিশ তদন্ত চালিতেছে।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—যুক্তপ্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার শ্রীযুত পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

অদ্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হয়।

অদ্য অপরাহ্নে লাহোরে বিমান চালনা প্রদর্শনীতে বিমান ভাঙ্গিয়া পড়ায় উইং কম্যাণ্ডার মিঃ কে কে মজুমদার নিহত হইয়াছেন।

সেবাগ্রামে কস্তুরবা ভাণ্ডারের প্রাদেশিক সম্পাদকগণের বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে আটটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—বিহারের কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে বিহার সরকার যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার তীব্র সমালোচনা করিয়া মহাত্মা গান্ধী এক বিবৃতি দিয়াছেন।

১৯শে ফেব্রুয়ারী—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব জানান যে, বর্তমানে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ৬ জন সদস্য রাজবন্দীরূপে আটক আছেন। তাঁহাদের নাম শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুত সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি, শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীযুত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি এবং শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি। তন্মধ্যে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু ভারত সরকারের আদেশে আটক আছেন।

আজ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সমর দপ্তরের সেক্রেটারী মিঃ ত্রিবেদী যুদ্ধে হতাহত ভারতীয়দের সংখ্যা সম্পর্কে যে বিবরণ দাখিল করেন, তাহাতে জানা যায় যে, ১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১৫১৮৫৬ জন ভারতীয় হতাহত হইয়াছে।

আপার চিৎপুর রোডে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণের ফলে যে বাড়ীটি আংশিক ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল, উহার ধ্বংসস্তূপের ভিতর অদ্য অপরাহ্নে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহা লইয়া উক্ত দুর্ঘটনার মৃতের সংখ্যা ৬ হইল।

…হিক …বাদ

বিদেশী সংবাদ

১৪ই ফেব্রুয়ারী—পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন—মার্শাল কোনিয়েভের বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ব্রানেনবার্গে প্রবেশ করিয়াছে। এই দিন ব্রোমবের্গ রণাঙ্গনে যুদ্ধে ২০ হাজার জার্মান সৈন্য নিহত হইয়াছে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গন—পশ্চিম আফ্রিকার সৈন্যদল তিলিন হইতে ৭০ মাইল দূরবর্তী সেকপিউ দখল করিয়াছে।

বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী স্যার উইলিয়ম রোদেনস্টাইন ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারী—প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গন—মার্কিন নৌবহর টোকিওর আশেপাশে বিমান ঘাঁটি ও অন্যান্য সামরিক লক্ষ্যস্থলের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়।

ব্রহ্ম রণাঙ্গন—গতকল্য চীনা প্রথম আর্মির সৈন্যগণ বিনাবাধায় ব্রহ্ম রোডে অবস্থিত কটকাই দখল করিয়াছে। লাসিও হইতে কটকাইয়ের দূরত্ব ৪৮ মাইল।

পশ্চিম ইউরোপীয় রণাঙ্গন—রাইন নদীর তীর ধরিয়া ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারীর অগ্রগতি মন্থর হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, মার্শাল কোনিয়েভের অগ্রগতির ফলে কটবাস ও ড্রেসডেনের প্রবেশপথ হইতে সুদেতেনল্যাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত পূর্ব জার্মানীর এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। রুশরা ব্রেসলাউ বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে।

ডিভিসনের বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যগণ আকিয়াবের প্রায় ৬৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত রুইওয়ায় অবতরণ করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গন—জাপ নিউজ এজেন্সীর খবরে প্রকাশ, টোকিওর ৫৫০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ভলকানো… পপুঞ্জে মিত্র …নী এপর্যন্ত …বার অবতরণের চেষ্টা করে। …থিত জাপ বাহিনী গতকল্য মিত্র সৈন্যদের চ…বারের অবতরণ চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

অদ্য মার্কিন পোতবাহী বিমানসমূহ পুনরায় টোকিওতে বোমাবর্ষণ করে। এই লইয়া পর পর তিন দিন টোকিওতে বিমান হানা হইল।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—ফিলিপাইন রণাঙ্গন—আমেরিকান সৈন্যেরা বাতান উপদ্বীপ অধিকার করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গন—আমেরিকান বিমানবাহী জাহাজের বিমানসমূহ অদ্য পুনরায় টোকিও এলাকায় আক্রমণ চালায়।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—আজ লণ্ডনে কমনওয়েলথ রিলেশনস সম্মেলন আরম্ভ হয়। এই সম্মেলনে যোগদানকারী ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতা স্যার জাফরুল্লা খান বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দানের জন্য আবেদন জানান।

অদ্য লণ্ডনে বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে নূতন একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন সঙ্ঘ গঠনের ব্যাপক একটি পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। প্যারিসে ইহার হেডকোয়ার্টার হইবে।

ফিলিপাইন রণাঙ্গন—আমেরিকান সৈন্যদল কোরিজিডরে অবতরণ করিয়াছে এবং দ্বীপের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গন—মান্দালয় অভিমুখে অগ্রসর চতুর্দশ আর্মির সৈন্যগণ গত ১২ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে সাফল্যের সহিত দ্বিতীয় দফায় ইরাবতী অতিক্রম করিয়াছে।

পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন— জার্মানরা বার্লিনের ৭৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্বস্থ ক্রসেন ত্যাগ করিয়াছে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন—ওডারের পশ্চিম তীরবর্তী মার্শাল কোনিয়েভের দুইশত মাইলব্যাপী রণাঙ্গনে যুদ্ধ শুরু হইয়াছে। সহস্র সহস্র ট্যাঙ্ক, কামান ও বিমানের আক্রমণে বার্লিন, ড্রেসডেন ও মধ্য জার্মানী বিপন্ন হইয়াছে।

১৯শে ফেব্রুয়ারী—প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গন—মার্কিন সৈন্যগণ আয়োজিমা দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে।

পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন—ব্রেসলাউ দখলের যুদ্ধের প্রচণ্ডতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাইলেসিয়াতে লালফৌজ সাগান ও নাউমবুর্গ দখল করিয়াছে।

রুশ জেনারেল চের্নিয়াকোভস্কী গুরুতর আঘাতের ফলে মারা গিয়াছেন। তিনি পূর্ব প্রুশিয় রণাঙ্গনে নিযুক্ত ছিলেন। লালফৌজে তিনি সর্বকনিষ্ঠ আর্মি গ্রুপ কম্যাণ্ডার ছিলেন।

পশ্চিম ইউরোপীয় রণাঙ্গন—প্রথম কানাডিয়ান আর্মির সৈন্যদল রাইন ও মাসের মধ্যবর্তী সীগফ্রীড রক্ষাব্যূহের প্রধান ঘাঁটি গক শহরে প্রবেশ করে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গন—মান্দালয়ের ৩৫ মাইল পশ্চিমে মাইনমিউর নিকট বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদল ইরাবতী অতিক্রম করিয়াছে।

পরিণত জীবনের
সুনিশ্চিত সংস্থানের
জন্য
গ্রে



পৃথিবীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাহিনী

সম্পূর্ণ ভারতীয় বিমানবাহিনী আই. এফ.এ যোগ দিয়ে আপনি শত্রুপক্ষকে দ ক'রে ছাড়তে পারেন। অগ্নিবর্ষী এরোপ্লেনে চড়ে আকাশপথে নি যুদ্ধ করবেন। এই যান্ত্রিক পাখার অধিকারী সহজেই হওয়া যায়। আপনাকে শুধু কাজের লোক হ'তে হবে। এখনই যদি উঠে পড়ে লাগেন তবে এই বিভাগের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা—সবই আপনি অর্জন করতে পারবেন। আই. এ. এফ.এ কর্মরত ভারতীয় যুবকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আপনার সাহস ও কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিন।

যুদ্ধের পর কী করবেন তা' ঠিক করবার সময় এখনই !

• ভারতীয় বিমানবাহিনীর অফিসারেরা যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করবেন তার সাহায্যে ভবিষ্যতে বেসামরিক জীবনে ভালো কাজ তাঁরা সহজেই পাবেন।

• যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন গভর্নমেন্ট অনেক চাকরি নিজেদের হাতে রাখবেন। যাঁরা এখন যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন কেবল তাঁরাই পরে এ সব চাকরি পাবেন।

• এখন থেকেই বন্দোবস্ত চলছে যাতে যুদ্ধপ্রত্যাগত কর্মপ্রার্থীরা গভর্নমেন্টের খরচে তাঁদের ইচ্ছে মত কাজ শিখতে পারেন।

• যারা য়ুনিভার্সিটির পড়া ছেড়ে কাজে যোগ দিয়েছেন তাঁদের জন্য যুদ্ধের পর শিক্ষাসংক্রান্ত অনেক সুবিধের বন্দোবস্ত আছে, এর সাহায্যে তাঁরা যুদ্ধের পর আবার পড়া শুরু করতে পারবেন। এ সম্বন্ধে নিজের নিজের য়ুনিভার্সিটি থেকে বিস্তারিত খবরাখবর পাবেন।

আই. এ. এফ.এ প্রবেশ যোগ্যতা : ভালো স্বাস্থ্য, সুস্থ দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি এবং বয়স ১৭॥ বছর থেকে ২৮ বছর। প্রচুর পরিশ্রমের ক্ষমতা থাকা চাই। আর চাই ভালো সাধারণ শিক্ষা ও ইংরিজিতে ভালো লিখতে ও বলতে জানা।

এই কুপনটি কেটে দিয়ে আপনার কাছাকাছি জি. ডি. (পাইলট) রিক্রুটিং অফিসারকে পাঠালে তিনি আপনাকে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ও ভারতীয় বিমানবাহিনীর কাজ সম্বন্ধে বিস্তারিত সর্ত ও বিবরণ পাঠাবেন।

নাম ______________________

ঠিকানা ______________________

____

____

কুপনটি আপনার কাছাকাছি জি. ডি. আর. ও.কে পাঠিয়ে দিন
আই. এ. এফ. জি. ডি. (পাইলট) রিক্রুটিং অফিসার—কলকাতা
১৫ ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট; ঢাকা : C/o আর.এ.এফ. ষ্টেশন

...লিমিটেড

...২১

হেড অফিস—... ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা ঃ—...নস্কর

চাট্‌মোহর, কুষ্টিয়া, কামারখালি, কুমারখালি ও হাওড়া।

অতি সুবিধাজনক সর্তে সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ফোন—বি, বি ৪০২২

...রেল ম্যানেজার—
বি, এম, শী

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—
এম, কে, নন্দী

খাঁটি দুধ পাওয়া

...য় অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে

কিন্তু

ভিটামিল্ক হাউস ডেলিভারী স্কীমের

সদস্য হ'য়ে আপনি অনায়াসেই

খাঁটি দুধ পেতে পারেন।

এক পাউণ্ড ভিটামিল্ক (রোগবীজাণুমুক্ত খাঁটি গুঁড়া দুধ) প্রায় ২৬% মাখনযুক্ত ১০ পাউণ্ড খাঁটি দুধের সমতুল্য—আর সব রকমেই দুধের পরিবর্তে ভিটামিল্ক ব্যবহার করা যায়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন ঃ—

ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস্ লিঃ

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

ফোনস্ঃ—ক্যাল ১৪৬৪—৬৫

স্বামীজির যোগবল!

বিশ্ববিশ্রুত বৈদান্তিক ...মী প্রেমানন্দজীর প্রবর্তিত যোগস... প্রণালীতে আপনার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান আশ্চর্য্যরূপে অবগত হউন। যোগশক্তির এই অদ্ভুত পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া বহু সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি অযাচিতভাবে প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, বহু প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে এই আশ্চর্য ক্ষমতার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ১৯১৬ সাল হইতে এই প্রতিষ্ঠান সাধারণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি লাভ করিয়া আসিতেছে। ৫টি প্রশ্নের উত্তরের জন্য ২৲। বর্ষফল গণনা—১ বৎসরের শুভাশুভ গণনা ৩৲, জন্মপত্রিকা—সমস্ত জীবনের ফলাফল ৬৲ টাকা। জন্ম-বিবরণ বা অনুমান বয়স ও পত্র লিখিবার সঠিক সময় লিখিবেন।

প্রফেসর—এস, এন, বসু, বি-এ,
২০৩ অপার চিৎপুর রোড, বাগবাজার,
কলিকাতা।

সন্ন্যাসী প্রদত্ত হাঁপানী ও শ্বাস-কাসের মহৌষধ

(Saint given Asthmolin cause A.B.C.)

হাঁপানীতে বহুদিন ভুগিয়া শেষে এক সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধে ভাল হই। ১২ বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, রোগের প্রকার ভেদে ঔষধটির দুইটি course দ্বারা সর্বপ্রকার হাঁপানী চিকিৎসা সম্ভব, প্রথম courseএর ৭—১৪ দিনের ভিতর রোগী নিজকে রোগমুক্ত মনে করবেন। আমি চুক্তি করিয়াও চিকিৎসা করি (course A.B.C. মূল্য যথাক্রমে ৩০৲।৪০৲ টাকা)। ঔষধটির কতিপয় উপাদান অতি কষ্টে ভুটান পর্বতে সংগ্রহ করা হয় বলিয়া চেষ্টা সত্ত্বেও ঔষধটির মূল্য কমাইতে পারি নাই।
ক সি ভৌমিক, উকিল, ধুবড়ি (আসাম)।

ম্যালারি (MALARI)

(Substitute of Quinine)

কুইনাইনের সমগুণে বিশিষ্ট উপাদানে প্রস্তুত তিনদিনেই জ্বর বন্ধ হয়। জ্বরের পরে নিয়মিত ব্যবহারে টনিকের কাজ করে। (২০ ট্যাবলেট) ২৲ টাকা।

সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

চুলউঠা বন্ধ করিয়া মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখিতে অদ্বিতীয়। বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদোক্ত উপাদানে প্রস্তুত। শিশি ১।০।

সর্বত্র উচ্চ কমিশনে এজেণ্ট চাই

সকল ঔষধের মাশুল স্বতন্ত্র।

বিমান কেমিক্যাল ওয়ার্কস্,
১১৫।৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিরজীবনের গ্যারাণ্টী দিয়া—

জটিল পুরাতন রোগ, পারদসংক্রান্ত বা যে-কোন প্রকার রক্তদুষ্টি, মূত্ররোগ, স্নায়ুদৌর্বল্য, স্ত্রীরোগ ও শিশুদিগের পীড়া সত্বর স্থায়ীরূপে আরোগ্য করা হয়। ষ্ট্যাম্পসহ পত্রে নিয়মাবলী জানুন। ম্যানেজার ঃ **শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক** (গভঃ রেজিঃ) (শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাকেন্দ্র), ১৪৮নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিঃ

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ঃ—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশ

সূচীপত্র



দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ]   শনিবার, ১৯শে ফাল্গুন, ১৩৫১ সাল।   Saturday, 3rd March, 1945.   [১৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

জাতীয় পতাকা আতঙ্ক

মাঝে মাঝে আতঙ্ক রোগ-বিশেষ হইয়া দাঁড়ায় এবং এই রোগের সংক্রমণ যেমন সহজ, তাহার চিকিৎসাও তেমনই দুঃসাধ্য। জাতীয় পতাকার জন্য সরকারী আতঙ্ক আমরা পূর্বে বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি। কিছুদিন যাবৎ গভর্নমেণ্টের জাতীয় পতাকা সম্পর্কে একটা নীরব ঔদাসীন্যের ভাব আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। কিন্তু এবার জাতীয় পতাকার জন্য গভর্নমেণ্টের আতঙ্ক যেরূপ আকার ধারণ করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, ইহার সংক্রমণ ক্রমশঃই প্রবল ও ব্যাপক হইয়া পড়িতেছে। নানা-স্থানে জাতীয় পতাকা লইয়া শোভাযাত্রা সম্পর্কে গভর্নমেণ্টের আতঙ্কগ্রস্ত, অশ্রদ্ধা-পূর্ণ ও কঠোর মনোভাবের পরিচয় আমরা ইতিপূর্বেই পাইয়াছি। সম্প্রতি সিন্ধু-পরিষদের তথাকার স্বরাষ্ট্র সচিব এক প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করিয়াছেন যে, গত বৎসর ২রা অক্টোবর তারিখে জাতীয় পতাকা লইয়া শোভাযাত্রা ও নানারূপ ধ্বনি করায় ১১ হইতে ১৮ বৎসর বয়স্কা তেইশজন বালিকাকে গ্রেপ্তার করা হয়। অবশ্য গভর্নমেণ্টের আইন ও শৃঙ্খলার মহিমায় তাহাদিগকে একপক্ষকালের বেশী কারাগারে থাকিতে হয় নাই। সম্প্রতি অপর একটি সংবাদে প্রকাশ, শ্রীহট্টের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভারতরক্ষা আইন অনুসারে প্রকাশ্যে জাতীয় পতাকা প্রদর্শন নিষিদ্ধ করিয়াছেন। একাধিক হাইকোর্টের বিচারপতিগণ ঘোষণা করিয়াছেন যে, জাতীয় পতাকা বে-আইনী নহে এবং ইহা উত্তোলন করিবার অধিকার জনগণের আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জাতীয় পতাকা সম্পর্কে সরকারী এসব কার্যকলাপ কি আইন ও শৃঙ্খলার অমর্যাদাকর নহে? এরূপ ক্ষেত্রে জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে ব্যাপক সরকারী অভিযান বিশেষ অর্থপূর্ণ বলিয়াই মনে হয়। আমরা ব্রিটিশ রাষ্ট্র-ধুরন্ধরগণের মুখে মাঝে মাঝে মিলন ও মৈত্রীর গালভরা বুলি শুনিতে পাই। কিন্তু কার্যত আমরা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ধারক ও বাহকগণের শুভেচ্ছার যে পরিচয় পাই, তাহাতে সেই সমস্ত বুলি যে শূন্যগর্ভ তাহা স্বতঃই প্রমাণিত হয়। এদেশের জাতীয় পতাকার প্রতি যাহাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই, তাহাদের মুখে মিলন-মৈত্রীর বড় বড় কথা নিতান্তই অশোভন ও অন্তঃসারশূন্য।

নিরাপত্তা বন্দী প্রসঙ্গ

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৪ সালের ৭ই নবেম্বর তারিখে বিভিন্ন কারাগারে বাঙলায় নিরাপত্তা বন্দীর সংখ্যা ছিল ৩,৩৬৭। এই সমস্ত বন্দীর মধ্যে ভারতরক্ষা আইন ও বিধি এবং ১৯৪৪ সালের ৩নং অর্ডিন্যান্স অনুসারে ১২৮৬ জন রাজনীতিক নিরাপত্তা বন্দী এবং ২০৬৬ জন অ-রাজনৈতিক নিরাপত্তা বন্দী ছিল। ঐ তারিখে ৩নং রেগুলেশন অনুযায়ী বন্দীর সংখ্যা ছিল ১৫ জন। ১৯৪৪ সালের ৩নং অর্ডিন্যান্সের ৭নং ধারা অনুসারে নিরাপত্তা রাজনীতিক বন্দিগণ তাহাদের বক্তব্য জানাইতে পারেন। স্বরাষ্ট্রসচিবের উক্তিতে প্রকাশ, মাত্র ৩৫০ জন রাজনীতিক বন্দী এই বিধানের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের বিষয়ের পুনর্বিবেচনার জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সম্পর্কে বক্তব্য জানান। অবশিষ্ট ৯৩৬ জন নিরাপত্তা রাজনৈতিক বন্দী আইনের এই ... গ্রহণ করেন নাই। কেন এই অধিকাংশ বন্দী তাঁহাদের বক্তব্য জানান নাই, ... সম্বন্ধে এক প্রশ্নের উত্তরে খাঁ বাহাদুর মহম্মদ আলি বলেন যে, বক্তব্য জানানো বা না জানানো বন্দীদের কর্তব্য এবং বক্তব্য না জানাইবার কুফল তাঁহারাই ভোগ করিবেন। এই সমস্ত বন্দীর বক্তব্য না জানাইবার কারণ স্বরূপে রায় হরেন্দ্র চৌধুরী বলেন যে, একথা স্পষ্টই বুঝা যায়, বন্দিগণ মনে করেন যে, যাঁহারা তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন তাঁহাদের কাছে বক্তব্য জানাইয়া লাভ নাই। নিরাপত্তা রাজনৈতিক বন্দিগণের বক্তব্য শুনিবার জন্য বিচার-বিভাগের ব্যক্তিগণ লইয়া একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাবও তিনি করেন। এইরূপ কমিটি গঠিত হইলে আরও অধিকসংখ্যক বন্দী তাঁহাদের বক্তব্য জানাইবার সুযোগ গ্রহণ করিবেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। পরবর্তী আর একটি প্রশ্নের উত্তর হইতে জানা যায়, যে কারণে এই সমস্ত বন্দী তাঁহাদের বক্তব্য জানান নাই, তাহা সম্ভবত এই যে, যে সমস্ত অভিযোগে তাঁহা-দিগকে গ্রেপ্তার করা ও আটক রাখা হইয়াছে, তাহার সুনির্দিষ্ট কোন রূপ নাই, তাহার অর্থও কোন ক্ষেত্রেই পরিষ্কার নহে এবং তাহা সব ক্ষেত্রেই প্রায় একইরূপ। কাজেই সুনির্দিষ্টরূপে অভিযোগ জানিতে না পারায় তাঁহারা তাঁহাদের বক্তব্য জানাইতে পারেন নাই। তাঁহাদের বক্তব্য না জানাইবার যে কারণই বর্তমান থাকুক না কেন, এই সমস্ত বন্দীর ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের প্রতি গভর্নমেণ্টের দায়িত্ব আছে, তাহা স্মরণ করিয়াই তাঁহাদের বক্তব্য নিরপেক্ষভাবে বিবেচিত হইবার সুযোগ দান করা গভর্নমেণ্টের পক্ষে কর্তব্য। বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকালের জন্য এত অধিক দেশসেবককে স্বাধীনতা হইতে

ব... । কোন সুভ্য গভর্নমেণ্টের পক্ষেই প্রশংসনীয় নহে, পরন্তু তাহা অবিবেচনা ও হৃদয়হীনতার পরিচায়ক। এই প্রসঙ্গে পার্লামেণ্টে এক প্রশ্নের উত্তরে মিঃ অ্যামেরী ভারতে বিনা বিচারে আটক বন্দিগণের যে সংখ্যা দিয়াছিলেন তাহা মনে পড়িতেছে। তিনি বন্দীর সংখ্যা কিছু কম করিয়া বলিলেও ভারত গভর্নমেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, ১লা জানুয়ারী ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী দণ্ডিত বন্দীর সংখ্যা ৫৭০৮ এবং ১৯৪৪ সালের ৩নং অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী বিনা বিচারে আটক বন্দীর সংখ্যা ৭৫৭৪। এই উভয় প্রকার বন্দীর মোট সংখ্যা ১৩২৮২। ওয়াশিংটনের এক সভায় শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বলিয়াছেন, ভারত এক বিরাট বন্দিশিবিরে পরিণত হইয়াছে, তাঁহার এই উক্তিতে ... অতিরঞ্জন নাই। এই বিরাট বন্দি... ব্রিটিশ শাসনের কলঙ্কস্বরূপ।

ডাঃ মুঞ্জের অভিভাষণ

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা সম্মেলনের জলপাইগুড়ি অধিবেশনে সভাপতি বি এস মুঞ্জে তাঁহার অভিভাষণের এক স্থানে বলিয়াছেন,—

"ভারতে আমরা যে রাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চাই,—তাহা হইবে গণভোটের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাজ। ইহা হিন্দুরাজ অথবা মুসলমানরাজ, কিংবা খৃষ্টান-রাজ হইবে না, ইহা সমগ্র ভারতবাসীর গণতান্ত্রিক রাজ হইবে। এই রাজ্যে ভারতের প্রত্যেক জাতিই স্বাধীন ও বাধামুক্ত নাগরিক হইবে,—এখানে কোন পক্ষপাতিত্ব কিংবা এক ধর্মের সহিত অন্য ধর্মের, অথবা এক সম্প্রদায়ের সহিত অপর কোন সম্প্রদায়ের কোনরূপ বিদ্বেষ-ভাব থাকিবে না। পরন্তু প্রকাশ্যভাবে নির্বাচিত যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিতে সকলেই জগতের শ্রেষ্ঠ দানগুলি উপভোগ করিতে পারিবে।"

আশার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক আদর্শে অনুপ্রাণিত এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপায় কি? এ সম্বন্ধে ডাঃ মুঞ্জে যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ হইতেছে এই যে, যে সমস্ত প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সমস্ত প্রদেশে হিন্দু মহাসভা দ্বারা গভর্নমেণ্ট স্থাপন করিতে হইবে এবং যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সেসব প্রদেশে মুসলিম গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এইরূপভাবে স্থাপিত উভয় সম্প্রদায়ের গভর্নমেণ্ট পরস্পরের সম্মান ও শঙ্কার কারণ হইবে। কোন প্রদেশের হিন্দু মহাসভা গভর্নমেণ্ট তথাকার সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানগণের উপর অত্যাচার অবিচার করিতে পারে, এই ভয়ে ... গভর্নমেণ্ট সেখানে মুসলমানগণের উপর ...সী হইবে না। পরন্তু ...কে সুযোগ সুবিধা দানে ...বে। এইরূপে সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধিতে একটা সাম্যভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ডাঃ মুঞ্জে স্বচ্ছ দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে দেখিতে পাইতেন, এইরূপ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রতিক্রিয়ার ফলে কেবল সাম্প্রদায়িক জটিলতাই বৃদ্ধি পায়; তাহার কোন সমাধানই হয় না। এক্ষেত্রে ভেদবুদ্ধির উৎস কোথায় রহিয়াছে, অগ্রে তাহারই সন্ধান করা প্রয়োজন। আমাদের মতে সেকথা বিস্মৃত হইয়া এইরূপভাবে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী হওয়া অদূরদর্শিতা এবং প্রকৃত তথ্য ও সত্যকে এড়াইয়া যাওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভারতের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত আমেরিকায় সে দিন যে উক্তি করিয়াছেন, আমরা এক্ষেত্রে তৎসম্পর্কে বিবেচনা করিতে ডাঃ মুঞ্জেকে অনুরোধ করি। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, ভারতে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ইংরেজেরই সৃষ্টি এবং ভারতে ইংরেজ শাসন থাকিতে এই সমস্যার সমাধান হইবে না। ডাঃ মুঞ্জে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিতে গিয়া একটি ...ল করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি হইতে মনে ... তিনি ভারতের সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়কে মুসলিম লীগের সমর্থক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু মুসলমান মাত্রকেই মুসলিম লীগের সমর্থক বলিয়া মনে করা সঙ্গত নহে। কংগ্রেস-সেবকগণের মধ্যে বহু মুসলমান আছেন। তাঁহারা ভারতের স্বাধীনতা অর্জন প্রচেষ্টায় বহু দুঃখবরণ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। ভারতের বহু মুসলমান সম্প্রদায় মুসলিম লীগকে আদৌ সমর্থন করেন না, বরং কংগ্রেসকেই তাঁহারা সমর্থন করেন। ডাঃ মুঞ্জে মুসলিম লীগ দলের সঙ্গে মিলন প্রচেষ্টায় গান্ধীজীর পরাজয়ের মনোভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সম্ভবত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই যে, কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার একমাত্র মূর্ত প্রতীক। মহাত্মা গান্ধী জিন্না সাহেবের সঙ্গে যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে গিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হইলেও তাহাতে তাঁহার বা কংগ্রেসের কোনরূপ ক্ষতি বা অমর্যাদা হয় নাই বরং জিন্না সাহেবই উদারনীতিক মুসলমানগণের এমন কি তাঁহার অনুরাগী দলের অনেকেরও বিরাগভাজন হইয়াছেন এবং তাঁহার এই আচরণ চিন্তাশীল সমাজের সর্বত্র নিন্দিত হইয়াছে। ডাঃ মুঞ্জের মতে অহিংসা স্বাধীনতা লাভের উপায় হইতে পারে না। তিনি গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণের ভঙ্গী ... বলিয়াছেন যে, ... প্রধানত নৈতিকতা ও কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিকতা ... গঠিত, কিন্তু তাহাতে রাজনৈতিক বোধের সম্পূর্ণ অভাব পরিদৃষ্ট হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "হিন্দু মহাসভা পাশ্চাত্যের আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুসংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হিংসার সমর্থন করে।" মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্বের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। কিন্তু এই "আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুসংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ "হিংসার সমর্থনই বড় কথা নহে, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে যদি তাঁহাদের কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা ও গতি-নির্দেশ থাকে, তবে তাহাই দেশবাসী জানিতে চাহে।

জাতির অর্থনীতিক পুনর্গঠন

ডাক্তার জন মাথাই ভারতের খ্যাতনামা অর্থনীতিকদের মধ্যে অন্যতম। বোম্বাইয়ের পুনর্গঠন কর্মতালিকা স্বরূপে যাহা প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে, তিনি সেই কর্মতালিকারও একজন স্বাক্ষরকারী। সেদিন যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সমাবর্তন উৎসবে এই বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ ভারতের বর্তমান অবস্থার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যেসব কথা বলিয়াছেন, সেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার মতে যুদ্ধের ফলে শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের সমুন্নতির সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা সত্য; কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য, ভারতবর্ষ সে সব সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে যুদ্ধের জন্য দেশের সমুন্নতিমূলক অনেক অর্থনীতিক পরিকল্পনা পরিত্যাগই করিতে হইয়াছে। ডাক্তার মাথাই এজন্য গভর্নমেণ্ট এবং দেশবাসী উভয় পক্ষেরই ত্রুটি দেখিতে পাইয়াছেন; কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে গভর্নমেণ্টের দোষই পুরামাত্রায় রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। এসব উদ্যমে সব দেশেই গভর্নমেণ্টই অগ্রণী হইয়া থাকেন; অথচ এদেশের গভর্নমেণ্ট সেরূপ উদ্যোগী হন নাই; শুধু তাহাই নয়, তাঁহারা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির পথে নানাভাবে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছেন। ডাক্তার মাথাই তাঁহার অভিভাষণের উপসংহারভাগে বাঙলার তরুণ সম্প্রদায়কে জাতির ভবিষ্যৎ সংগঠনে উদ্যোগী হইতে আহ্বান করিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য অগ্নিময় প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হইয়া বাঙলার তরুণসম্প্রদায় তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিবে, আমরা ইহাই কামনা করি।

কাঠ খোদাই



শিল্পী-দয়ানন্দ (শান্তিনিকেতন)



শিল্পী—অনিলকান্ত মজুমদার (শান্তিনিকেতন)

দেশের কথা

বস্ত্রের দুর্মূল্যতার জন্য দোলের উৎসবে কাপড়ে রং না দিতে অনুরোধ করিয়া একটি আবেদন প্রচার করা হইয়াছিল। এই অনুরোধ কতটা পালিত হইয়াছে, আমরা জানি না; কিন্তু দেখিতেছি, বাঙলা জোড়া এই বস্ত্রের দুর্ভিক্ষের মধ্যে কর্তৃপক্ষ দোলের রঙ্গ প্রচুরভাবেই উপভোগ করিতেছেন। সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি মুলতুবী প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল, প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিয়া অসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী মিঃ [...]রাবদী বলেন,—

"বাঙ[...]া দেশে সত্যই যে বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ দে[...]ছে, ইহা বোধ হয় অস্বীকার করা চলে[...] বাঙলার জন্য মাথাপিছু মাত্র ১০ গজ কা[...] বরাদ্দ করা হইয়াছে। বস্ত্রের সরবরাহ [...]ন্ত কম হইবার জন্যই প্রধানত এই অবস্থা দেখা দিয়াছে। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। ইহা[...] কারণ এই যে, কিছু বস্ত্র ভারত হইতে রপ্তানি করা হইতেছে। এই রপ্তানি যদি একেবারে বন্ধ করা না যায়, তবে অন্তত ইহার পরিমাণ হ্রাস ক[...] হইবে, এই আশা করা যায়। তারপর ভারতে উৎপন্ন কিছু বস্ত্র দেশরক্ষায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং কিছু বস্ত্র সৈন্যদের জন্য উৎপন্ন করা হয়। এই সব কারণেই ভারতে সমগ্র[...]বে বস্ত্রাভাব হইয়া[...]। ইহার উপর আবার কয়লা[...] অভাবে অনেক মি[...] পুরা কাজ চালাইতে পারিতেছে না। বাঙলা সরকারের পক্ষ হইতে বাঙলার জন্য এত কম বস্ত্র বরাদ্দ করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হইয়াছে। আমি ভারত গভর্নমেণ্টকে জানাইয়াছি যে, বাঙলার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, বাহির হইতে অনেক লোকও বাঙলায় আসিয়াছে; বাঙলার সৈন্যগণের জন্য এবং বর্ধিত সংখ্যক হাসপাতালগুলিতে ব্যাণ্ডেজ তৈয়ারীর জন্যও অধিক পরিমাণে বস্ত্রের প্রয়োজন। কিন্তু কেন্দ্রীয় টেক্সটাইল বোর্ড এই সব কথার সম্বন্ধে বিবেচনা এমনই করিলেন যে, তাঁহারা বাঙলার বস্ত্রের বরাদ্দটা মাথাপিছু ১২ গজ হইতে আরও কমাইয়া ১০ গজ করিয়া দিলেন এবং অন্যান্য প্রদেশের বরাদ্দ বৃদ্ধি করিয়া কোথায়ও কোথায়ও ১৫ গজ, ২০ গজ এবং ২৪ গজ করা হইল।"

এরূপ অবস্থায় মৌলবী ফজলুল হক সত্যই বলিতে পারেন—'আমাদের মা-ভগিনীরা অনাবৃত দেহে থাকিতেছেন; কিন্তু কর্তারা সব ব্যাপারটা প্রহসন করিয়া তুলিয়াছেন।' বস্তুত বাঙলা দেশের এই সমস্যা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাকে তাঁহাদের মজা দেখা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। একপক্ষে তাঁহারা মজা দেখিতেছেন, অপরপক্ষে চোরাবাজারী দল এই অবসরে মজা লুটিতেছে। দেশের লোকের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, শ্রীযুত অতুলচন্দ্র সেন মহাশয়ের উক্তিতে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে। সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

"বাঙলায় বর্তমানে মারাত্মক রকম বস্ত্রাভাব দেখা দিয়াছে। আমার নিজের জেলা ঢাকার ব্যাপার সম্বন্ধে আমি এমন সব লোকের কথা জানি, যাহারা মাসের পর মাস কোন রকমে কটিদেশে ছিন্ন বস্ত্র জড়াইয়া লজ্জা নিবারণ করিতেছে। আমি এমন সব নারীর কথাও জানি, যাহারা লজ্জা নিবারণের কোন উপায় না থাকায় ঘরের বাহির হইতে পারেন না। সম্ভ্রান্ত এবং এমন কি কিছুদিন পূর্বে যে সব মহিলা ঘরের বাহির হইতেন না, তাঁহারা এক জোড়া বস্ত্রের জন্য প্রখর রৌদ্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দোকা[...]র সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরে নিতান্ত নিরা[...] ও ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।"

[...]মাদের টেবিলে 'মার্কিন-বার্তা' [...]য়াছে; যুদ্ধরত আমেরিকায় বস্ত্রাভাব ঘটিয়াছে, এমন কোন সংবাদই তো আমরা দেখিতেছি না; পক্ষান্তরে আমেরিকার প্রত্যেক নরনারী যুদ্ধের পূর্বের অবস্থার [...]য়ে সাজপোষাকে যাহাতে অধিকতর স[...]ভ্রান্ত হয়, সেখানকার গভর্নমেণ্ট এমন [...]ায় প্রবৃত্ত আছেন, এমন সংবাদই আমরা দেখিতেছি। ইংলণ্ডেও বস্ত্রের অভাবের কোন প্রশ্ন দেখা দেয় নাই। স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায় সম্প্রতি অল্প কিছুদিনের জন্য বিলাত ঘুরিয়া আসিয়াছেন। তিনি সেখানে লোকজনের খাওয়া-পরার তেমন কিছু কষ্ট দেখিতে পান নাই। বিলাত রাজার জাতির দেশ; সেখানকার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। পরাধীন এই হতভাগ্য দেশের সঙ্গে সে দেশের কোন তুলনাই চলে না; কিন্তু ভারতের অন্য কোন প্রদেশেও যে বাঙলার ন্যায় গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, সংবাদপত্রে কিংবা ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের আলোচনায় তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং বাঙলার এই ব্যাপারকে শাসকদের পক্ষে মজা দেখা ছাড়া কি বলিব?

বস্ত্রহীনের শোভাযাত্রা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাতেও বস্ত্র সঙ্কটের সম্পর্কে আলোচনা বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—

"বিভিন্ন প্রদেশে বস্ত্রের বরাদ্দ নির্ধারণের দায়িত্ব অবশ্য ভারত সরকারের হাতে রহিয়াছে; কিন্তু সে বরাদ্দ যতই কম হউক না কেন, দেশের লোকের মধ্যে যথাযথভাবে বণ্টন করিবার দায়িত্ব কাহাদের? এই বণ্টন ব্যাপা[...] যে বিষম [...]নীতি চলিতেছে, তাহা[...] এখন আর গোপন নাই। [...]দীনতে পাওয়া যায় যে, টেক্সটাইল [...] বোর্ডের সদস্যগণ এই বরাদ্দ বণ্টন ব্যা[...]রে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে[...]ছেন। বড়বাজারই প্রভাবান্বিত হইয়াছে, একথা বলিলে চলিবে না। সকলেই জানে যে, বড়বাজার কাহারও বন্ধু নয়। কিন্তু সেই যে বড়বাজার, সেই বড়বাজারও বোর্ডের সদস্যদের দ্বারা দুর্নীতি-কলুষিত হইতেছে। তাঁহারাই দুর্নীতির মূলে রহিয়াছেন। কর্তৃত্ব যখন তাঁহাদেরই হাতে, তখন বড়বাজার কলুষিত হয় কেন? ইঁহারা পরস্পরের স্বার্থ দেখিতেছেন। বস্ত্র-সঙ্কট কিরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে, একটি নজীর উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে। ত্রিপুরা জেলায় একজন অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ, কংগ্রেসকর্মী নহেন, একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান নৈরাশ্যে অভিভূত হইয়া বলিয়াছেন যে, তিনি অনাবৃত দেহ নরনারীদের লইয়া গঠিত একটি শোভাযাত্রা লইয়া সদরে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাইবেন কিনা, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন।

গালিগালাজ যুক্তি নয়

বিতর্কের উত্তরে অসামরিক বিভাগের মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী প্রকৃতপক্ষে কোন যুক্তিই উপস্থিত করিতে পারেন নাই। কাপড়ের বাজারে চুরি-বাটপাড়ি চলিতেছে, একথা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না। এ চোরাবাজারী ব্যাপার দমিত হয় না কেন, তিনি উহার কোন জবাব দেন নাই। শুধু অভিযোগকারীদিগকে 'মিথ্যাবাদী', 'জঘন্য মিথ্যাবাদী' 'জুয়াচোর' প্রভৃতি ভাষায় গালিগালাজ করিয়াই তিনি মন্ত্রিমণ্ডলীর সততা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। বলা বাহুল্য ইহাতে অভিযোগের কোনটিই খণ্ডিত হয় নাই, বরং সেগুলি দৃঢ় হইয়াছে। বস্তুত এক্ষেত্রে ভোটাভুটিতে জয়েরও যে কোন মূল্য আছে বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। বরং এতৎ-সম্পর্কিত ভোটে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কতটা নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়াছে, সেখানে কতখানি নির্লজ্জতা প্রশ্রয় পায়, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। মিঃ সুরাবর্দী এক্ষেত্রেও ভবিষ্যতের ভরসা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহারা বস্ত্র যথাযোগ্য বণ্টনের জন্য নূতন কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। এ কর্মপ্রণালীর আশ্বাস একেবারেই ফাঁকা। আমরা তাঁহাদের কত কর্মপ্রণালীই দেখিলাম, সেগুলি কোনটি কাজে আসে নাই; বরং কুকাজই তাহাতে বাড়িয়াছে।

বাঙলায় চাউলের কথা

এই তো গেল বস্ত্র, তারপর অন্নের সম্বন্ধেও এই একই প্রশ্ন মনে উঠে। জলপাইগুড়ির একটি সংবাদে প্রকাশ—

"সরকারী গুদামে মজুত আনুমানিক ৮ হাজার মণ গম সম্প্রতি এখানকার জনৈক ব্যবসায়ী ৭, টাকা মণ দরে ক্রয় করিয়াছে। এগুলি পচিয়া ... ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল। উক্ত ব্যবসায়ী ... ঐ গম ... টাকা দরে স্থানীয় আটা মিল ... জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এইভাবে সেটা লাভের ব্যবস্থা হইয়াছে। এখানে সম্প্রতি গম আমদানীর কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় এই ব্যবসায়ী একচেটিয়া সুযোগ ভোগ করিতেছে। এমত অবস্থায় জনসাধারণ এই পচা ও ব্যবহারের অযোগ্য গম হইতে প্রস্তুত আটা ছাড়া অন্য কোন আটা পাইতেছে না। সম্প্রতি মিউনিসিপ্যালিটি হইতে এই আটার নমুনা পরীক্ষার জন্য লওয়া হইয়াছে।"

দেশের দুর্দশা লইয়া মজা উপভোগের মাত্রা সকল দিক হইতে কতদূর গিয়া উঠিয়াছে, ইহাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। গরীবে খাইতে পায় না—সরকারী গুদামে আটা পচে। এক্ষেত্রে কৈফিয়ৎ এই শুনি যে, গুদামে সুব্যবস্থা করা যায় নাই। সেদিন ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর একটি প্রশ্নের উত্তরে খাদ্যসচিব স্যার জ্বালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব বলেন—

"বাঙলা সরকারের চাউল সংগ্রহ কার্য বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় তাঁহাদের ভাণ্ডারে প্রভূত চাউল মজুত হইয়াছে। সন্তোষজনকভাবে সেগুলি হস্তান্তর করিয়া চাউল নষ্ট হওয়া বন্ধ করিবার জন্য তাঁহারা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং বাঙলার চাউলের ঘাটতি হইলে পরে ফেরৎ পাইবার সর্তে ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট চাউল দিতে তাঁহারা আগ্রহান্বিত। বাঙলা দেশের মধ্যেই চাউল হস্তান্তর করিবার এবং রক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ভারত গভর্নমেণ্ট বাঙলা সরকারকে আর্থিক সাহায্য এবং দ্রুত অতিরিক্ত গুদাম নির্মাণের জন্য উপকরণ প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করিতে চাহিয়াছেন।

চাউল সংগ্রহ করিতে গেলেই গুদামের প্রয়োজন হয় এবং কিভাবে গুদামে মাল নষ্ট না হয়, ভাল থাকে সাধারণ ব্যবসায়ীরাও ইহা জানেন; এজন্য ভূধর-সাগর আলোড়ন করা আবশ্যক হয় না। বাঙলা দেশের মনীষী মন্ত্রীদের মস্তিষ্কে এ বিবেচনাটুকু করিবার শক্তির অভাব আছে, ইহা মনে করিলে তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে। তবু ইহা কেন ঘটে? নহিলে ভাগাড়ে হাজার হাজার মণ আটা-চাউল যায় না—লাভখোরেরা সস্তায় পচা মাল কিনিয়া দেশের লোককে গস্তাইতে পারে না; সুতরাং ইহাকে মজা দেখা ছাড়া আর কি বলিব?

ট্রামে গতিবিধি সমস্যা

সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কলিকাতা শহরে ট্রামে গতিবিধির অসুবিধার কথা উত্থাপিত হইয়াছিল। প্রশ্নের উত্তরে ঐ ...সম্পর্কিত বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় বলেন যে, ট্রাম কোম্পানীর কাছে তাঁহারা উহা জানাইয়াছিলেন। তাঁহারা এই জবাব দিয়াছেন যে, তাঁহাদের কার্যোপযোগী যতগুলি গাড়ি আছে তাঁহারা সেগুলি সব ব্যবহার করিতেছেন; নূতন ত্রিশখানা গাড়ির জন্য অর্ডারও দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু যুদ্ধজনিত প্রয়োজনে জাহাজে স্থানাভাববশত সেগুলি পৌঁছিতে বিলম্ব ঘটিতেছে। ট্রাম কোম্পানীর এই জবাব কিছু অস্পষ্ট কতদিন আগে নূতন গাড়ির জন্য অর্ডার দেওয়া হইয়াছে তাহা জানা যায় না। যুদ্ধজনিত অবস্থার জন্য কলিকাতায় লোকসংখ্যা অত্যধিক রকমে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সেজন্য গাড়িও বেশী প্রয়োজন, এই বিবেচনা তাঁহারা কতদিন আগে করিয়াছেন; ইতিমধ্যে ট্রামগাড়ির যাত্রীদের দুর্দশায় অনেকের মজা দেখিবার এবং ভীড়ের ফাঁকে তাকে তাকে থাকিয়া পকেটকাটাদের মজা লুটিবার সুবিধা হইয়াছে নিশ্চয়!

রেল-ভ্রমণের সংকট

ট্রাম, মোটরবাস এবং রেল সর্বত্র একই দৃশ্য। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র ট্রেনে আলোর অভাবের বিষয়টি উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

"ট্রেনে আলো থাকে না। বালব চুরি যায়, সরকারপক্ষ এই অজুহাত উপস্থিত করিয়া থাকেন; বালব যদি সত্যই চুরি হয়, তবে ট্রেনে তেলের বাতি ব্যবহার করা উচিত। যাত্রীরা বালব চুরি করে, আমি এই অভিযোগ বিশ্বাস করিতে পারি না। কারণ, যাত্রীরা যতক্ষণ ট্রেনে থাকে, ততক্ষণ তাহাদিগকে প্রায় জীবনমরণ সংগ্রাম করিতে হয়; এমন প্রাণ-সংকটে বালব চুরি করিবার সুযোগ ও সময় তাহাদের কোথায়? বিশেষত রেলের কামরার বালবগুলি সামান্য বৈদ্যুতিক শক্তিতে জ্বলে এবং শহরে যেখানে বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহৃত হয়, সেখানে অনেক বেশী শক্তি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে; তথায় ঐ বালব ব্যবহার করা চলে না। একমাত্র ব্যক্তিগত ব্যবহারের জায়গা মাত্রেই ঐগুলি ব্যবহার করা সম্ভব। তৃতীয় শ্রেণীর কোন যাত্রীর নিজস্ব ডায়নামো থাকিবে, ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব।

"কিন্তু কথা এই যে, যুদ্ধের দৌলতে বেঘোরে অন্ধকারে ফাঁপরে পড়িয়া ট্রেন ভ্রমণের নূতন আনন্দ উপভোগ করা যাইতেছে; আলোর ব্যবস্থা থাকিলে ইহা সম্ভব হইত কি?"

বসন্ত ও অন্যান্য মহামারী

আরও মজা আছে। সম্প্রতি কলিকাতায় ডেণ্টাল কলেজ হলে শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসকগণের একটি সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে টীকা সম্পর্কিত বিতর্কের বিবেচনা করা হয়। সম্মেলনে পরিগৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়—

"গভর্নমেণ্টের বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায়, বসন্তে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জনের মৃত্যু ঘটিতেছে। সভা এই অত্যধিক মৃত্যুর হারের জন্য আতঙ্ক প্রকাশ করিতেছেন। এমন লোকক্ষয় বন্ধ করিবার জন্য এবং রোগের বিস্তৃতি বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সভা গভর্নমেণ্টকে হাসপাতালে অধিক রোগীর শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতেছেন; কারণ বর্তমানে খুব কম লোকের শুশ্রূষার ব্যবস্থাই হাসপাতালে আছে। সভা এজন্য অবিলম্বে বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণের গতিবিধির সহিত সম্পর্ক-রহিত হাসপাতাল-সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিতে বলিতেছেন এবং এই উদ্যম সফল করিবার জন্য সকলকে সাহায্য করিতে আবেদন করিতেছেন।"

বঙ্গীয় মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতিস্বরূপে শ্রীযুত বিধানচন্দ্র রায়ও দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"বঙ্গব্যাপী মহামারীর ভীষণতা সম্প্রতি কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে; কিন্তু ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে সব অঞ্চল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হইত, সে সব স্থানেও ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি মহামারীর আকারে দেখা দিয়াছে। আমাদের দেশে লোকের স্বাস্থ্য উত্তরোত্তর ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছে। বহুদিন হইতেই এদেশে পীড়িত এবং সুস্থ অবস্থার মধ্যে বিভেদ রেখা অতি সামান্য ছিল; সম্প্রতি এই ব্যবধান একেবারে লুপ্ত হইবে। এমন সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ সংকটকালে আমরা নিশ্চিন্ত অবস্থায় থাকিতে পারি না। গভর্নমেণ্ট যেমন ব্যবস্থাই অবলম্বন করুন না কেন, দেশের লোকে কার্যকরভাবে সাহায্য না করিলে তাহা সার্থক হইতে পারে না।"

অথচ ঠিক এমন সংকটকালে কর্পোরেশন ও গভর্নমেণ্টের মধ্যে টীকার ব্যাপার লইয়া বিতর্ক আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতার চিকিৎসক সম্মেলনে উপস্থিত চিকিৎসকগণ এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই বিতর্কে জনসাধারণ মহা বিভ্রাটে পতিত হইয়াছে; তাহারা টীকার সম্বন্ধে এবং কর্পোরেশন, সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের উপর আস্থা হারাইতেছে। সম্প্রতি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় এই সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি এ বৎসর টীকা দিয়াও যাহাদের টীকা উঠে নাই, তাঁহাদের পক্ষে পুনরায় টীকা লওয়া উচিত হইবে কি না, এ সম্পর্কে তাঁহাদিগকে গৃহচিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া অবিলম্বে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতার জনসাধারণের মধ্যে সকলের অর্থসঙ্গতিতে গৃহ-চিকিৎসক রাখা সম্ভব হয় না। তাঁহাদের পক্ষে এই পরামর্শ অনুসারে কাজ করা এক মহা-সমস্যার বিষয়। কর্পোরেশন এবং গভর্নমেণ্ট এতদিনের মধ্যে এ সম্বন্ধে

একটা মীমাংসায় পেঁছিতে পারিলেন না—ইহাকে কি বলা যাইতে পারে? উত্তর পূর্ববৎ।

মন্ত্রিশাসনের মহিমা

বাঙলাদেশে উভয় আইনসভার সদস্যদের বেতন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। মন্ত্রিমণ্ডলই এক্ষেত্রে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সহৃদয়তা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। এদেশে আনুগত্যের রীতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ইহাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নীতি। কিন্তু সেদিন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলের অনুরূপ সদাশয়তারও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পরিষদে আই সি এস কর্মচারীদের অতিরিক্ত ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রসচিব বলেন যে, ভারত গভর্নমেণ্ট এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীরা তদপেক্ষা অনেক বেশী ভাতা বাড়াইবার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। দেশের লোকের অন্নাভাব বস্ত্রাভাব সকল দিক হইতে দুর্দশার অন্ত নাই; অথচ এমন সময় মন্ত্রীরা *আই সি এসদের মোটা বেতনের আমলাদের ভাতা বাড়াইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। এদেশের জনপ্রিয় মন্ত্রীদের এই যোগ্যতা নিশ্চয়ই বিশ্ববাসীর চোখে পরম উপভোগ্য হইবে!*

আটলাণ্টিক সনদের স্বরূপ

প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধটা জগতের রীতিনীতি উল্টাইয়া দিয়াছে। ঘরে বাহিরে উপভোগ্য বিষয়ের অন্ত নাই, দৃষ্টান্তস্বরূপে আটলাণ্টিক সনদের উল্লেখ করা চলে। এ বিষয় লইয়া আলোচনা, গবেষণা শেষ হয় নাই। চার্চিল সাহেব সেদিন কমন্স সভায় বলিয়া দিয়াছেন যে, আটলাণ্টিক সনদ একটা আদর্শ মাত্র, তাহা বিধান নয়, অর্থাৎ সে অনুসারে কাজ হইবে, এমন কোন কথা নাই। অথচ এই সনদ লইয়া এখনও বিতর্কের তুফান উঠিতেছে। আমেরিকায় নিউইয়র্ক পোস্ট পত্রে মিঃ স্যামুয়েল গ্রাফটন এই সনদের কথা তুলিয়া লিখিয়াছেন—

"জগতে মজা চলিতেছে মন্দ নয়। একদল লোক বলিতেছেন যে, আটলাণ্টিক সনদের কোন মূল্য নাই; কারণ সে সম্বন্ধে দস্তখত করা দলিল মিলে না। ইহাদের কাছে আন্তর্জাতিক সখ্যের কোন মূল্য নাই, ১০ পয়সা দামের একটুকরা কাগজেরই যত মূল্য। যদি ইঁহাদের কথাই সত্য হয়, তবে আমরা সেক্সপীয়রকে হারাইয়াছি; কারণ, তাঁহার নাটকগুলির মূল পাণ্ডুলিপি নাই। সুতরাং হ্যামলেট উদ্ধৃত করিয়া কোন কথা বলা চলিবে না। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ইহার পর তাঁহারা খৃষ্টের দশবিধ অনুশাসন মানিবেন তো? কারণ, তারও তো কোন পাণ্ডুলিপি মিলে না। সত্যই আমরা কি ভীষণ জগতেই না বাস করিতেছি। আমরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ [illegible] লিখিত করিয়া এবং ঠিক কোন কথাটি এক্ষেত্রে পাকাপাকি হইয়াছিল, তাহাও অনেক সময়ে স্মরণ করা দুর্ঘট হইয়া দাঁড়ায়; সুতরাং বিবাহ কি সত্য?"

আটলাণ্টিক সনদের মাহাত্ম্যবাদীরা এই [illegible]গণের যত কথাই বলুন না কেন, তাহার [illegible]লে তাজা কিছু সত্য নাই; শুধু মজা দেখাই মাত্র। ইহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না।

উপভোগ্য রূপ কথা

(মনীষী বার্নার্ড-শ' বলিতেছেন, সবচেয়ে বড় মজার ব্যাপার হইল ত্রিশক্তির ইয়ালটার বৈঠকের ঘোষণা। স্কটিস সমাজতন্ত্র সাপ্তাহিক পত্র "ফরোয়ার্ডে" তিনি একটি প্রবন্ধে এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

"আমরা সব রাজনৈতিক শিশু। এই শিশুরে [illegible]লকে ইয়ালটা বৈঠকের ঘোষণা যেমন মজা দিয়াছে তেমন মজা আর কোন রূপকথায় নাই। এই বৈঠকের বিচারে পোলিশ সমস্যা সম্পর্কে মার্শাল স্ট্যালিন প্রথম স্থান অধিকার করেন, বাকী দুইজন ধারে কাছে কোথায়ও ছিলেন না। মার্শাল স্ট্যালিন কমিউনিস্ট; সুতরাং তিনি তাঁহার মন স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন এবং তিনি কি [illegible] তাহা তিনি জানেন; অপর দুইজন [illegible]র পর্যন্ত ফ্যাসিজমে ডুবিয়া আছেন, অর্থাৎ ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য জনসাধারণের নিকট হইতে আদায় করা মূলধন এবং বিধি বিধান; এই তিনের সমন্বয়, ইহা তাঁহাদের [illegible]জি। তাঁহারা জানেন না যে, কবডেনী [illegible]সংস্কার, সংরক্ষণশীল গণতান্ত্রিকতা, মনরো [illegible] স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং উনবিংশ শতাব্দীর [illegible] কিছু টুকরাটাকরা মতবাদের সহিত তাঁহারা নিজেদের মতিগতিকে গুলাইয়া ফেলিয়াছেন। এসব দেখিয়া হাস্য সংবরণ করা যায় না। ইয়াল[illegible] বাস্তবিক কি হইয়াছিল জানিতে সত্যি কৌতূহল জাগে। এখন হইতে ২০ বৎসর পরে মার্শাল স্ট্যালিন যখন তাঁহার জীবনস্মৃতি লিখিবেন, তখন তাহা প্রকাশ পাইবে, কিন্তু ততদিন আমি বাঁচিয়া থাকিব না।"

আমেরিকায় বৃটিশ প্রচারকার্য

বাস্তবিকই কত মজার ব্যাপারই না চারিদিকে দেখা যাইতেছে। সেদিন লাহোরের প্রসিদ্ধ সাংবাদিক চমনলালজী ওয়ার্ধায় গিয়া মার্কিন মুলুকে ব্রিটিশের প্রচারকার্যে কেমন সব মজার ব্যাপার চলিতেছে, মহাত্মাজীকে তাহার কিছু পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। মিঃ পিটার মুইরের লিখিত "এই সেই ভারত" শীর্ষক একখানা পুস্তক আমেরিকায় খুব প্রচার করা হইতেছে। এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে, গান্ধীজী লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হিন্দু করিয়াছেন। মার্কিন দেশে প্রচারকদের এই শ্রেণীর প্রচারকার্যের নমুনার কথা শুনিয়া গান্ধীজী হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত আমেরিকায় গিয়া এই ধরণের সত্য প্রচারে কিরূপ অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছেন, সেদিন পার্লামেণ্টে ভারতসচিব আমেরী সাহেবের উত্তেজনায় তাহা কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইয়াছে। সংবাদে দেখিতেছি, ১লা মার্চ ইংলণ্ড ও আমে[illegible] সমুদ্রের [illegible] ওপারে এ সম্[illegible] প্রচারকার্যে দ্বন্দ্ব চলিবে। [illegible] থাকিবেন শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী প[illegible]ডত, আর অপরপক্ষে পার্লামেণ্টের সংরক্ষণশীল সদস্য মিঃ রবার্ট বুথবী বক্তৃতা করিবেন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের পক্ষে মার্শাল চিয়াং কাইসেকের ভূতপূর্ব উপদেষ্টা মিঃ আওয়েন লাটিমোর থাকিবেন, অন্যপক্ষে সিংগাপুরের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা মিঃ জো ফিসার বুথবীকে সমর্থন করিবেন। সাম্রাজ্যবাদ জগতের শান্তি ব্যাঘাতক কি না, এই বিষয়ে আলোচনা হইবে। ব্রিটিশের প্রচারকার্যের মহিমা এই দুর্দিনে কতদূর উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে বুঝিতে কষ্ট হয় না।

বর্বরের দেশ

গান্ধীজীর হাসিতে অসাধারণত্ব আছে, কিন্তু স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সেদিন নিখিল ভারত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমিতির সভায় ভারতবাসীদের সম্বন্ধে আমেরিকায় প্রচার-কার্যের যেরূপ নমুনা দিয়াছেন, তাহাতে আমাদের মত সাধারণ লোকদের মুখে হাসি ফুটিবে। স্যার শান্তিস্বরূপ বলেন—

"হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আমাদিগকে সম্বর্ধিত করা হইতেছিল, তখন সেখানে বিজ্ঞান-সাধনায় নিরত একটি দম্পতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। ইঁহারা ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। ইঁহারা দুঃখ করিয়া আমাদিগকে বলেন যে, ভারতে ম্যালেরিয়ার প্রতিকারকল্পে তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানে নির্ধারিত নীতির প্রয়োগ করা হয় না; ইহার কারণ এই যে, ভারতবাসীরা মশা মারিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা এতই অহিংসবাদী। আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেই যে, আমরা অপরকে হত্যা করিতে দ্বিধা করি না এবং আমাদের শাসকদের ছাড়া আমরা সকলকেই হত্যা করিতে পারি। দয়া করিয়া আমাদিগকে ডি ডি টি এবং আপনাদের অন্যান্য যে সব ঔষধপত্র আছে সরবরাহ করুন। আমাদের মার্কিন পরিভ্রমণের সময় সেখানকার একখানা প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রে ("লিটারারী ডাইজেস্ট") একজন জেনারেলের লিখিত ভারত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই প্রবন্ধে ছিল যে, একজন ব্রাহ্মণ জলে ডুবিয়া মরিতে বসে—ঐ সময় একজন হরিজন তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেও স্পর্শদোষজনিত পাপের ভয়ে ব্রাহ্মণ ঐভাবে জীবন বাঁচাইতে সম্মত হন নাই।"

এই জেনারেল ভদ্রলোক নিশ্চয়ই বিনা পয়সায় তাঁহার মূল্যবান মস্তিষ্কের অপব্যবহার করিতেছেন না। ইহার এমন গবেষণার জন্য প্রেরণা ব্রিটিশ কি ভারত কোন দেশের নিঃস্বার্থ বৈদেশিক হিতৈষণার উৎস হইতে উঠিতেছে জানিতে কৌতূহল হয়।



পাপ রয়েছে নিজেদের মনে, সুতরাং ভয় আর সংশয় ছড়ানো চারিদিকে। আমরা দুজনে পালিয়ে যাচ্ছি, আমরা ছাড়া একথা আর কেউ জানেনা। তবু মনে হচ্ছে সবাই যেন চারিদিক থেকে আমাদের তাড়া ক'রে আসছে। আমরা চুরি করিনি, ঠকাইনি কারুকে, তবু চোরের মতন আমরা চলেছি গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে। কি আতঙ্ক, কি উদ্বেগ, কি যেন সংশয়—চারিদিক থেকে আমাদের গ্রাস করতে আসছে। আমরা যেন খুনী আসামী। কোনো প্রকারে টিকিট দুখানা কিনে জাহাজে চড়তে পারলেই কতকটা নিশ্চিন্ত, তারপর জাহাজখানা একবার ঘাটছাড়া হ'লে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবো। নিজেদের মনের ভাব যথাসম্ভব গোপন ক'রে রয়েছি।

ট্রাম থেকে নেমে,—কারণ তখনও কলকাতায় মোটর বাস হয়নি,—আমরা হন হন ক'রে চলেছি চাঁদপাল ঘাট পেরিয়ে আউটরাম ঘাটের দিকে। সকাল তখন সাতটা। রবি ছাড়া-ছাড়া হয়ে ওপাশ দিয়ে চলেছে। ভাবটা এই আমরা যেন পুলিশে ধরা না পড়ি, আমাদের দেখে যেন কারো সন্দেহ না জাগে। এক সময় ইঙ্গিত ক'রে রবি আমাকে বললে, খবরদার, পেছন দিকে চাসনে। সোজা চল,—

আমি প্রাণপণে শিষ দিতে দিতে চললুম। শুকনো ঠোঁটে শিষ আসে না।

টিকিট ঘরের ছোট ফোকরের কাছে এসে দাঁড়ালুম। আগে থেকে খোঁজ নিয়েছিলুম, এখান থেকে রেঙ্গুনের ভাড়া তখন তেরো টাকা। টাকাটা বার ক'রে টিকিট দুখানা নেবার সময় নিজের হাতখানা দেখি ঠকঠক ক'রে কাঁপছে। নিজের ভাগ্য-অন্বেষণে যাচ্ছি পৃথিবী-ভ্রমণে, তবে এত ভয়টা কিসের? শুনেছি বিলেত থেকে বছরে কুড়ি হাজার ছেলে-মেয়ে দেশ ছেড়ে পালায়, তারা ভয় পায়না কেন? এই ত' টিকিট কেনা হয়ে গেল, তবে কি পালানো এতই সহজ? তবে কি সকল মানুষের জন্য পৃথিবীর সব দরজাই খোলা, কেবল আমরাই কি অপরের অনুগ্রহজীবী হয়ে আমাদের পৌরুষকে নীতিভ্রষ্ট করেছি? আমাদের কেন ছাড়পত্র নিতে হয়? আমাদের জীবনটা সহজ নয় কেন? আমাদের জীবনের ভাগ্যোন্নতির জন্য কেন পররাজশক্তির অনুমতি ভিক্ষা করতে হয়?

কিন্তু ভাগ্যোন্নতির শত সহস্র প্রকার কলাকৌশল নিয়ে তখন আমার মাথা ঘামাবার সময় নেই। আমার জীবনের প্রথম সমুদ্রযাত্রা তখন হাতের মুঠোর মধ্যে। ছোটবেলায় এক গণৎকার আমার হাত দেখে বলেছিল, তুই পরের ধন পাবি, তোর সমুদ্রযাত্রা আছে কপালে,—সেইটির একটি আজ সত্য হ'তে চললো। দুজনের টিকিট দুজনের হাতে নিয়ে আমরা জেঠির উপর এসে দাঁড়ালুম। এর আগে স্টীমারে আমরা বহুবার চড়েছি কিন্তু এখানা জাহাজ—এর সবটাই বিরাট। জেঠির উপর থেকে একখানা সিঁড়ি অনেক দূর উপরে উঠে গেছে ডেকের গায়ে। সেই সিঁড়ি বেয়ে লোক উঠছে অবিশ্রান্ত। দক্ষিণী, পাঞ্জাবী, পেশাওয়ারী, বর্মী, চীনা, নেপালী, উড়িয়া,—যতগুলো জাতকে তখনকার চোখ দিয়ে চিনতে পারি,—সবাই উঠছে। সকলের হাতে পুঁটলী, বাণ্ডিল, বাক্স, চামড়ার —কাঁথা, বিছানা,—সব মিলিয়ে ব্যাপারটা নোংরা। যুদ্ধের বন্দীরা যেমন নতমুখে প্রহরীদের কড়া শাসনের সামনে দিয়ে জাহাজে ওঠে, আমাদের ঠিক সেই অবস্থা। টাকা দিয়ে আমরা যেন চোর, যেন করুণাপ্রার্থী। যাঁরা করুণা করবেন অর্থাৎ হেডখালাসী, জমাদার, টিকিট চেকার, ব্যবস্থাপক, জেঠির কর্তা, গেটের প্রহরী,—সকলেই যেন পুলিশের এক একজন বড় সাহেব। নিজেদের অপ্রিয় করার, অশ্রদ্ধেয় ক'রে তোলার এবং জন-সাধারণের সঙ্গে নিজেদের ব্যবধান সৃষ্টি করার সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই পুলিশের লোকরা এদেশে ক'রে থাকে। কেন করে জানিনে, পিছন থেকে কোনো সংকেত আছে কিনা তাও জানিনে—শুধু দেখতে পাই পুলিশের লোক মানেই যেন কেমন একটা বন্য হিংস্রতা। অনেককাল পরে আমার এই ভুল অংশত ভেঙেছে,—দেখেছি অনেক সদাশয় ও ভদ্র শিক্ষিত ব্যক্তি পুলিশ বিভাগে আছেন। তাঁদের অনেককেই বন্ধু ব'লে জেনেছি।

যাই হোক, কেন ঠেলা খেলুম, কেন ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ির গায়ে আমাদের ছুটকে দেওয়া হোলো, কেন সহসা অপমান বোধ করলুম,—সেসব আলোচনা ক'রে অসন্তোষ জমিয়ে তুলবো না। আমাদের সমস্ত মনপ্রাণ তখন জাহাজে। আমরা চলেছি ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্বেষণে। আমরা ছোট জীবনের মধ্যে থাকবো না, প্রত্যহের 'লাভক্ষতি টানাটানি অতি ক্ষুদ্র ভগ্ন অংশভাগ, কলহ সংশয়'—এসব নিয়ে দিন কাটাতে পারবো না, আমাদের যেতেই হবে। আমি কি ভাবছিলুম ঠিক জানিনে, তবে জাহাজখানার কঠিন লোহার শিকলের টানের মতো আমাদেরও পিছন থেকে যেন টেনে পড়ছিল। ভাগ্য-অন্বেষণের পদ্ধতিটা আমার জানা নেই: কেমন ক'রে উন্নতি করতে হয়, উপার্জন করতে হয়, কেমন ক'রে ঘর গোছাতে হয়, কেমন ক'রে জীবনের ভিতর দিয়ে নিজের পথটা কেটে বা'র করতে হয়, অথবা কেমন ক'রে নিজের কোলে ঝোল টানতে হয়,—এ শিক্ষা আমি তখনও পাইনি। আমি শুধু জানলুম আমি বেরিয়ে পড়েছি জাহাজে, সাত সমুদ্রের অজানা লোক থেকে আমাকে আকর্ষণ করছে, আমাকে স্থির থাকতে দিল না, আমার নোঙর ছিঁড়ে গেল ঝড়ের হাওয়ায়,—আমাকে যেতে হবে অজানা থেকে অপরিচয়ের দিকে।

জাহাজের সকলের উপর তলায় গিয়ে উঠলুম আমি আর রবি। এটাকে বলে আপার ডেক। মস্ত বারান্দা,—সারাদিন বেড়িয়ে বেড়ানো যায়। মাথার উপরে লোহা আর কাঠের বরগার সাহায্যে তেরপল টাঙানো রয়েছে। বহু নরনারী চারিদিকে ছড়ানো। বাইরে খোলা গঙ্গা। ওপারে দেখা যায়, একটা ময়দার কল, এপারে অদূরে হাইকোর্টের চূড়া। আমাদের পুরানো বন্ধু ইডেন গার্ডেন রয়েছে ওই যে। ওই দূরে সেই পিতলের চূড়া বাঁধানো গম্বুজ, ওইটে হোলো মনুমেণ্ট, আর ওই হোয়াইটওয়ে লেড-লর চূড়া,—ওরা সবাই রইলো, ওরা সুখে থাক, অক্ষয় হয়ে থাক,—আমরা বিদায় নিচ্ছি। জাহাজের ওদিকটায় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিন, অসংখ্য ঘর, অগণ্য সুব্যবস্থা। এদেশের যানবাহনের সর্ব-প্রকার আরামদায়ক সুব্যবস্থাগুলি হয়েছে সাহেব-সুবোর জন্য, আমাদের জন্য নয়। ফার্স্ট ক্লাস বললেই সাহেবকে মনে পড়ে। কে সেই সাহেব জানিনে। কিন্তু সার্জেণ্ট মানেই সাহেব। লাট মানে সাহেব,

কমিশনার মানে সাহেব, জাহাজের ক্যাপ্টেন মানে সাহেব। কিন্তু খালাসী, জমাদার, ঝাড়ুদার, কুলী, আরদালী, বাবুর্চি পাহারাওয়ালা,—এদের নাম শুনলে আর সাহেব মনে পড়ে না। ইম্পিরিয়ল ইণ্ডিয়ান মেল শুনলেই দিব্যচক্ষে দেখতে পাই, গাড়ীর মধ্যে কেবল শ্বেতচর্মীরা চলেছে; যেমন অমুক ভারতীয় সৈন্যদলের সেনাপতি শুনলে গোরা সাহেবকেই মনে পড়ে। সে যাই হোক, জাহাজের ফার্স্ট আর সেকেণ্ড ক্লাসের দরজাগুলিতে মেহগনি পালিশ করা, পিতলের হাতল, ছোট ছোট সুন্দর জানলা, বারান্দায় পিতল বাঁধানো রেলিং,—ওদিকে আমাদের যাবার হুকুম নেই, শুধু পার্টিশনের ছিদ্র দিয়ে সভ্যজাতির সৌভাগ্যকে চুরি করে দেখার সুবিধা আছে। ক্রমে ক্রমে লক্ষ্য করলুম, আমরা যেন মস্ত একখানা চারতলা বাড়ীর ছাদের উপর উঠেছি, নীচের তলাগুলিতে প্রকাণ্ড সংসার। নীচের তলায় দোকান বাজার, আর অসংখ্য লোকের আনাগোনা। এক জায়গায় মস্ত উনুন জ্বালিয়ে ঠিক পুরি-কচুরি আর মিঠাইয়ের দোকান বসেছে। ওপাশে কয়েকটা ঘরে সব শ[illegible] চল্লিশ পঞ্চাশটে মহিষ, ষাড়, আর ঘোড়া চলেছে। একদিকে অসংখ্য বস্তায় স্তূপাকার খাদ্যশস্য। এদিকে এক পেশোয়ারীর মস্ত বড় মেওয়ার দোকান। আমরা চিনাবাদাম কিনলুম। আমাদের ভাবটা এই, এরা সব অতি তুচ্ছ মানুষ, আমরা এদের চেয়ে অনেক বড়।

বেলা আন্দাজ প্রায় নটার সময় ইঞ্জিনের ভিতর থেকে নানাবিধ ঘণ্টা বেজে উঠলো। বহু নরনারী চীৎকার করলো, সকলে মালপত্র গুছিয়ে বসলো। রবি আর আমি আপার ডেকে রেলিংয়ের ধারে এসে দাঁড়ালুম। জাহাজ ছাড়লো। আমরা বিদায় নিলুম, কিন্তু কা'র কাছে তা স্পষ্ট জানি নে। আমার চোখ কাঁপছে, বুক কাঁপছে, পা কাঁপছে। জলের ভিতর চাকার প্রচণ্ড শব্দ, জলটা তোলপাড় হচ্ছে। একটু নড়ে, একটু বাঁকে, একটু পিছনে যায়, একটু সামনে ঘোরে, একটু দোলায়, —এমনি ক'রে জাহাজখানা গঙ্গার মাঝামাঝি এসে গতিবেগ দিল। প্রকাণ্ড জাহাজ—অন্তত আমাদের চোখে। জাহাজখানার নাম, এস্‌-এস্‌-এলিফ্যান্টা। আমরা কলকাতার তীর থেকে ছিঁড়ে এলুম। এবার সত্যই জাহাজ হু হু ক'রে চললো। আমরা নিয়তির ভেলায় ভেসে চললুম।

গঙ্গার দক্ষিণ পথ। তবে এ-পথের কতকটা অংশ, অর্থাৎ শিবপুর আর বটানিক্যাল গার্ডেনস্‌ পর্যন্ত আমাদের পরিচিত। এইটুকু গঙ্গাকে আমরা জানি, চিনি। চারিদিকে তখন শেষ জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রজ্বালা, সূর্যের অগ্নিবর্ষণ, কিন্তু আমরা গঙ্গার দক্ষিণ সমীরণে অতটা কষ্ট পাচ্ছিনে। আমাদের গরম লাগছে না। মাঝে মাঝে ইঞ্জিনের ভিতর থেকে বয়লারের তাপের এক একটা গরম ঝলক আসছে, কিন্তু তা ছাড়া কি স্নিগ্ধ, কি অপরূপ জলযাত্রা! জাহাজ চলেছে গঙ্গার গতিপথের সঙ্গে তাল রেখে এঁকে-বেঁকে। মাঝে মাঝে ভাসমান বয়াগুলি দূরের থেকে স্রোতের বাঁকগুলির সঙ্কেত জাহাজের ক্যাপ্টেনকে জানিয়ে দিচ্ছে, আর ক্যাপ্টেন তাঁর নিজস্ব সাঙ্কেতিক ভাষায় ইঞ্জিন চালকের ঘড়িতে কাঁটা ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। খুটিয়ে সবটা আমরা বুঝিনে, কিন্তু অনেকটা এমনই মনে হয়। জাহাজখানি চলেছে ঠিক ময়ূরপঙ্খীর মতো হেলে দুলে এঁকে বেঁকে। আমরা দুই বন্ধু চলেছি নিরুদ্দেশ যাত্রায়।

মনের মধ্যে বেদনার পাক খাচ্ছে কি? —বুঝিনে। আনন্দের দোলায় দুলছে কি মন?—তাও বুঝিনে। নিজেকে ভালো ক'রে বিচার করার জন্য একলা আমি সবাইকে এড়িয়ে রেলিং ধ'রে দাঁড়ালুম; বোধ করি রবিও সেই কারণে দাঁড়ালো দূরে গিয়ে। ছোটবেলা থেকে সাধ, অকূলের দিকে পাড়ি দেবো। কল্পনা করেছি সেই জীবন—যে-জীবনটা পরিতৃপ্ত, কিন্তু পরিচয়হীন। বাসা বাঁধবো সেইখানে যেটা নির্জন সাগরবেলা; সেই কারণে কল্পনা করেছি আলাস্কা কিম্বা কাম্‌স্কাট্‌কা। দক্ষিণ আমেরিকার দীর্ঘ সমুদ্রতীর আমি মানচিত্রে পরীক্ষা ক'রে দেখেছি। দেখেছি ওখানেও কিছু কিছু জনহীন বেলাভূমি আছে,—সুতরাং সেটা ভেবে দেখতে পারি! আমি ভেবে রেখেছি উত্তর কিম্বা দক্ষিণ সাগরের মেরুপ্রান্তের শিখরলোক—সেখানে পাতালকন্যা উঠে আসে আলস্যের আলুলিত ভঙ্গীতে,—আপন মনে ব'সে ব'সে আকাশপ্রান্তে আলিম্পনা আঁকে,—আর আমি, রবিনসন ক্রুশোর মতো খুঁজে পাবো কোথাও এক নির্জন দ্বীপ তা'র কাছাকাছি। কোনো দূরে তুষার নদীর তট,—যেখানে শিলমাছেরা কথা কয় পরস্পর, তিমিরা যেখানে নির্জনে বিশ্রাম নেয়! কিম্বা এস্কিমোদের সমুদ্রে, যারা জন্তুর ছাল গায়ে ঢাকা দেয়, বরফের ঘরে থাকে, কাঁচা মাংস খায়, চর্বি ছাড়া যাদের আর কোনো জ্বালানি নেই। অথবা আমি থাকবো ব্রেজিলের অরণ্যলোকের প্রান্তবাহিনী এমাজনের তীরে কোনো জনহীন ক্ষুদ্র ভূভাগে। আমার দিন যাবে নদীর মতন। এটা রসকল্পনা, অথবা রূপকল্পনা —এ আমার বিচার ছিল না, কিন্তু যখন আনমনে থাকতুম, এই সব দিবাস্বপ্ন আমার কাছে সত্য হয়ে উঠতো। এমন কি আমার কল্পজগতের কুটীরের ভিতরকার আসবাবপত্র ও তৈজসাদিও আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পেতুম।—শুধু জল! অর্থাৎ জলাশয়কে মনে মনে দেখি; জলের ভিতরে বাসা বেঁধে থাকি; অন্ধ কালো জলের [illegible] তলে গিয়ে কিছু একটা পরম মূল্যবানকে তুলে আনি। সেটা কি—জানিনে। সেটাকে পেলে আমার সব পাওয়ার ক্ষুধা নিবৃত্তি হবে কিনা তাও জানি নে!

সহসা জাহাজের গুরুগম্ভীর নাদে ঝট্‌কা ভাঙলো; যেন ঘুম ভাঙলো আমার! নদীর এক এক বাঁকে এক একটি কুঠিবাড়ি দেখা যাচ্ছে। ছবির মতো বাড়িগুলি! দূরের থেকে দেখছি জানলাগুলি খোলা,—যেন প্রিয়জনের পথের দিকে জানলাগুলি তাকিয়ে। আমরা এখন সকল প্রকার শাসনের অতীতলোকে। আর আমাদের ধরাছোঁওয়া নেই, আমরা সকল বাঁধন কেটে এসেছি। আজ এবং আগামীকাল আমাদের কেউ না খুঁজতে পারে, কিন্তু তৃতীয় দিনে সকলেই একটু দুর্ভাবনায় পড়বে। খড়গপুর এমন কিছু বিদেশ নয় যে, যেতে আসতে দুদিন লাগবে। দুদিন ধ'রে শুধু ফুটবল ম্যাচ্‌ খেলেছি, এটাও তৃতীয় দিনে কারো পক্ষে বিশ্বাস্য হবে না। তাছাড়া নির্দিষ্ট ঠিকানাও কিছু দিয়ে আসিনি। আমরা সবাইকে প্রতারণা ক'রে এসেছি, এর লজ্জা কতখানি তা দেখবার জন্য আমরা আর উপস্থিতও থাকবো না। সাতদিন পরে সবাই বুঝবে আমরা ঘোর বিপদে পড়েছি; কিন্তু নিরুদ্দেশ যারা হয়েছে তাদের বিপদই বা কি? কিন্তু এসব কথা আর ভাববো না, কারো কথা এখন থেকে আর মনে ঠাঁই দেবো না।

সহসা আমার মনে পড়লো—মায়ের দুটো চোখ; কঠিনে কোমলে মেলানো সেই চোখ। সেই চোখ দেখলে একই সময় ভয় করে, আর কান্না পায়। মনে হোলো চোখ দুটো যেন আমার সঙ্গ নিয়েছে, আমার সকল আচরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণ করছে। আমাকে প্রশ্ন করছে নিঃশব্দে, সমালোচনা করছে শান্ত দৃঢ়ভাবে, অথচ আকুল হয়ে রয়েছে আমারই প্রতীক্ষায়। —না থাক্‌, ওই চোখের দিকে তাকাবো না, তাকাতে পারবো না।

আমি ধীরে ধীরে রবির কাছে স'রে গেলুম। কে যেন আমার পিছু নিয়েছে!

মধ্যাহ্ন কখন্‌ পেরিয়ে গেছে, এখন অপরাহ্ন। ক্ষুধা কিছু পেয়েছে, কিন্তু খাবার হুকুম আমাদের নেই। চার পয়সা চিনাবাদাম দুজনে খেয়েছি, আজকে আর কিছু নয়। সবশুদ্ধ গোটা পঁচিশেক টাকা আর আমাদের কাছে আছে, এইটিই আমাদের সমগ্র ভবিষ্যৎ। দৈনিক চার আনা থেকে ছয়

আনা—আমরা ব্যয় করতে পারি, তার বেশি কিছুতেই নয়। এই টাকায় অন্তত দু'মাস থেকে আড়াই মাস চালাতেই হবে। পাছে আমি গোপনে কোনও কিছু কিনে খাই, এজন্য আমার যথাসর্বস্ব দুটি টাকা রবি আমার ভিতরের পকেট খানাতল্লাসী করে নিয়েছে। আমাকে থাকতে হবে তার শাসনে, বাঁচতে হবে তার অনুগ্রহে। আজ সকালে তার বাড়িতে নাকি জলখাবার খেয়েছি একথা সে মনে ক'রে রেখেছে! কিন্তু নদীর খোলা বাতাসে যে ক্ষুধা পায়, একথা সে মানবে না। সে বলবে, ক্ষুধা পাওয়া অনুচিত। যারা ভাগ্য ফেরাতে যায় সমুদ্র পারে, নদীর হাওয়ায় তাদের ক্ষুধা পায় কেন? তারা উপবাস করতে শিখুক। যদি তার কাছে দাঁড়িয়ে ঢেকুর তুলেছি, অমনি সে সন্দেহ করবে, কোথাও বুঝি খেয়ে এলুম। যদি বলি ওটা পিত্তের ঢেকুর,—রবি বলবে, তুই ডাক্তারি কিছু জানিসনে। after all, আমার দাদামশাই ছিলেন মস্ত বড় শরীরতত্ত্ববিদ্, আমাকে আর ডাক্তারি শেখাতে আসিসনে। আমি নীরব হয়ে থাকি। যাই হোক, রবি আমাকে ঘিরে রইলো গোয়েন্দার মতো। যদি দু'পা এগিয়ে কারো সঙ্গে কথা বলেছি, কিম্বা একটু ও-ধারে গিয়ে নিরিবিলি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়িয়েছি,—অমনি রবি চোখ পাকিয়ে ডাকে আমাকে। বলে, ছিঃ, ওখানে হ্যাংলার মতন দাঁড়িয়ে থাকিসনে। লোকের খাওয়া দেখতে নেই!

সে দেখতে চায়, না খেয়ে থাকলে আমার মুখের চেহারা কেমন হয়, তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফাটে কি না, ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমি ছট্‌ফট্ করি কি না। অর্থাৎ সকল সময় আমার কাতর ভাবটি সে দেখতে চায়, আমাকে সর্বপ্রকারে প্রকৃতির কাছে পরাজিত দেখলে সে তুষ্ট হয়। আমি কেমন হাঁ করে নিশ্বাস টানি, কেমন ঢোক গিলি, কেমন অবসন্ন হয়ে পড়ি, কেমন তার কৃপার কাছে করুণ আবেদন জানাই,—এর জন্য সে অপেক্ষা করে। সে আমাকে কিছুতেই দেবে না, কারণ অত ঘন ঘন খেলেই যাবে টাকা ফুরিয়ে! খেয়ে-দেয়ে পেট মোটা করা যায়, কিন্তু ভাগ্য অন্বেষণ করা যায় না। এক সময়ে সে আমাকে নিয়ে নীচের তলায় ঘুরতে গেল। এক জায়গায় সুন্দর গরম কচুরি আর তরকারি বিক্রি হচ্ছে, কেউ পাকা আম অথবা কলা খাচ্ছে, কেউ খাচ্ছে আঙুর কিনে, কেউ পাউরুটি আর মাখন আর ডিম নিয়ে বসে গেছে, কোথাও বা আইসক্রীম লিমনেড খুলে খাচ্ছে,—রবি আমাকে সেই সব কেন্দ্রে ইচ্ছাপূর্বক ঘুরিয়ে নিয়ে এলো। বললে, খাচ্ছে সবাই, তাই বলেই কি তোকে খেতে হবে? সব ভুললি, খাওয়া ভুলতে পাল্লিনে?

বললুম, চেষ্টা করি বটে, তবে—কি জানিস—?

জানবার দরকার নেই! রবি আমার হাত ধরে টানলো। পুনরায় বললে, চুপটি করে এখানে দয়া করে বসো, অত খাই খাই করো না। ড্যাম—গ্লাটন!

করুণ কণ্ঠে বললুম, তোর ক্ষিধে পায়নি?

আমার! আমি ত' কুকুর বেড়াল নই যে, ক্ষিধে পেলেই খাবো?

আমি মলিন মুখে চুপ করে গেলুম। অনেকক্ষণ যায়। দিনের আলো প্রায় ম্লান হয়ে এলো। নিজের পেটটা পেরিয়ে বাইরের দিকে আর চোখ দুটো যেতে চায় না। এক সময়ে তার কাছ ঘেঁষে এসে বললুম, আজ রাতে আমাদের কী খাওয়া হবে?

রবি যেন গর্জন করে উঠলো। বললে, পরশু দিন হে'দোর মোড়ে দাঁড়িয়ে আমরা কী প্রতিজ্ঞা করেছিলুম? মনে নেই যে, একবারের বেশি রোজ খাবো না?

কিন্তু আজ একবারও ত খাইনি এখনও?

বটে। সকালবেলা মা যে তোকে হালুয়া আর চা দিল? সেটা বুঝি খাওয়া নয়?

হাসিমুখে বললুম, আরে, সে ত জল খাওয়া!

বটে! হালুয়াটা জল? এই ভাবে তোর পেট ভরাতে হবে জানলে কিছুতেই আমি আসতুম না।—বলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রবি চুপ করে রইলো। অতঃপর আমাকে আমেরিকায় নিয়ে চলা যে তার জীবনে কতখানি নির্বুদ্ধিতা আর বিড়ম্বনা—এই কথাটি সে আমাকে সযত্নে বুঝিয়ে দিতে লাগলো। কিন্তু জাহাজ তখনও বাঙলা দেশ ছাড়েনি! আমি ভাবছিলুম, ভাগ্যের নৌকা বেঁধেছি তবে কোন্ গাছে? হা ভগবান, মনে পড়ে গেল, রবি সেদিন বুঝিয়েছিল পথে কত বাধা, কত কাঁটা, কত অপমান, কত বিপর্যয়—সব সইতে হবে কিন্তু হাসিমুখে! রবি সে কথা ভুলে গেছে, আমি ভুলি নি। সুতরাং এখন সে যতই আমাকে তিরস্কার করতে লাগলো, আমি ততই হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে রইলুম।

তুচ্ছ খাওয়া! খাওয়ার জন্য এত লাঞ্ছনা! আমার গলায় দড়ি জোটেনি কেন? কিন্তু দিদিমা বলতেন, গয়া কাশী বৃন্দাবন—যেখানেই যাই না কেন, পোড়া পেট যায় সঙ্গে। বাস্তবিক পেটটা বাদ দিলে শরীরের আর থাকেই বা কি? হাত-পা, শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—সবাই খেটে খেটে হয়রান কিন্তু পেটটাই শুধু বসে বসে খায়! এই রকম একটা ষড়যন্ত্র শুনে একদা পেট বলে, আমি খাটি কেবা কোথা যায়? পেটকে ঠাণ্ডা রাখো, পেটের সেবা করো, পেটের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপচার সংগ্রহ করে আনো,—পেট খুব খুশি, হাত-পা খুশি, বিশ্বজগৎ তুষ্ট।

কিন্তু যাকগে। পেটের কথা পেটেই থাক। আমি একলা গিয়ে বসে রইলুম। জাহাজের সামনের দিকটায়। তখন সন্ধ্যার ধূসর গোধূলি ছায়া বিস্তার করেছে দূরে। গঙ্গার দুই পার ধীরে ধীরে বিস্তীর্ণ হয়ে এসেছে, দুই ধারে নদীর কূল আর চোখে পড়ছে না। দুই পারের কৃষ্ণবর্ণ রেখা দুটি কখন্ যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে। গঙ্গার জল আর গৈরিক নয়, অনেকটা যেন বিবর্ণ, যেন পানাপচা। ছোট ছোট ঢেউ লাগছে জাহাজের গায়ে। বয়ার আলো আর চোখে পড়ছে না, লাইট-হাউসের সঙ্কেতও আর লক্ষ্য করা যাচ্ছে না,—দূরে কেমন একটা ধূসর অস্পষ্ট ছায়াচ্ছন্ন সীমাহীনতা। শরীরের মধ্যে কেমন একটা বিকার দেখা দিল। সে বিকার শরীরে কিম্বা মনে কিম্বা মস্তিষ্কে, ঠিক মতো উপলব্ধি করা কঠিন। দুই দিকে দুই পার যতক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলুম, ততক্ষণ মনের মধ্যে একটা সাহস ছিল, একটা নিশ্চিতভাবের স্বস্তি ছিল। কিন্তু ঘনায়মান সন্ধ্যার পটে দাঁড়িয়ে সামনে চেয়ে যা দেখছি, তা একটুও স্পষ্ট নয়! কোন্‌টা জল, কোন্‌টা আকাশ, কোন্‌টা শূন্যলোক, পৃথিবীর সীমানাই বা কোন্ দিকে—কিছুই স্পষ্ট করে বোঝবার উপায় নেই। জাহাজটিকে আগে মনে হয়েছিল বিরাট, এখন দেখি একবিন্দুও নয়। মনে হয়েছিল জল কেটে কেটে তরতর করে আমাদের ময়ূরপঙ্খী নাও চলে যাবে সাগরের বুকের উপর দিয়ে, এখন দেখি, [illegible] আমরা সবাই একটা দিকচিহ্নহীন পারাবারের মাঝখানে একখানা ভেলায় ভাসছি নিরাশ্রয় নিরুপায়ের মতন—আর ইতস্তত তরঙ্গে আঘাত প্রতিহত হচ্ছি। আমার স্বকীয়তা কোথায়, কোথায় আমাদের সাহস, কে দেবে সান্ত্বনা? আকাশ অনন্ত জানি,—চোখে দেখতে পাই, বইতেও পড়ি; কিন্তু জল যে অনন্ত, একথা এমন করে কি জানতুম? সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে শোভা দর্শন এক, কিন্তু সমুদ্রের গহনলোকে এসে দাঁড়ানো অন্য কথা। কিছু দেখতে পাচ্ছিনে, তাই ভয় পাচ্ছি। কোন্ দিকে চলেছি তা জানতে পাচ্ছিনে বলেই বিভীষিকা দেখছি। আমার সেই ছোটবেলাকার অগ্নিকোণ আর ঈশানকোণ কোথায় হারিয়ে গেল? কোথায় গেল আমার আকাশের সেই তিন-তারা? কোথায় হারালুম আমার সেই সন্ধ্যামণি?

শরীরের মধ্যে বিকার দেখা দিচ্ছে কেন বুঝিনে। মনে হচ্ছে আমি বড় ক্লান্ত। কিন্তু না, এতটুকু পরিশ্রম করিনি, ক্লান্তি কেন হবে? হঠাৎ মনে হলো, আমি কি অসুস্থ? কই না, অসুস্থ হবার কোন কারণ ঘটে নি ত' আমার? তবে কি চিনাবাদামের

সঙ্গে দুপুরবেলায় কিছু নোংরা গিয়েছিল পেটে? আমার যকৃৎলোকে এত অশান্তি ঘটছে কেন? জাহাজটি তখন নাগরদোলার মতো দুলছে।

চোখ বুজে দেখতে পাচ্ছি, আজ একাদশীর নির্জলা দিনে মায়ের এতক্ষণে সন্ধ্যাহ্নিক সারা হোলো। তিনি জপ করছেন, অরণ্যে রণে দারুণে শত্রু মধ্যে হনলে সাগরে......সাগরে!!

মা জপ করছেন, তমেকোগতির্দেবী নিস্তারদাত্রী নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে!

আলোটা সামনে রেখে তিনি বসেছেন রামায়ণ খুলে। তাঁর ছোট ছেলে কাছে নেই, রামায়ণের নিত্য শ্রোতা নেই। বাড়িখানা ভয়নক শান্ত; এত শান্ত—যেন বড় বুকচাপা। তিরস্কার নেই, চেঁচামেচি নেই, সকলেই আপন আপন কাজ নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। পাঁচিলের ওপারে একটা মস্ত বড় গাছ, তার নীচে সাহাদের বড় পুকুর। রামায়ণের উপরে চোখ বুলিয়ে মা তাকাচ্ছেন সেইদিকে। ভাঁড়ারের কাজ তাঁর কিছু বাকি নেই।

রামায়ণের সেই দৃশ্যটা মা পড়ছেন সুর করে। বানরসেনা চলেছে দক্ষিণ পথে স্বর্ণলঙ্কার উদ্দেশে। সহসা বহুদূর অগ্রভাগে বাধা। অঙ্গদ চললেন তদন্তে। কিন্তু তিনি আর ফিরে এলেন না। রামচন্দ্র পাঠালেন সুগ্রীবকে। কিন্তু সুগ্রীবও ফিরলেন না। উত্তেজিতভাবে রাম পাঠালেন লক্ষ্মণকে, কিন্তু লক্ষ্মণেরও আর দেখা নেই। তবে কি সীতা উদ্ধার অসম্ভব? তবে কি ... জন সব মিথ্যে? অবশেষে রামচন্দ্র চললেন নিজে। বহু যোজন পথ অতিক্রম করে তিনি চললেন বানরসেনার অগ্রভাগে। দক্ষিণ ...তের শেষ প্রান্তসীমায় তিনি যখন এসে পৌঁছলেন, বাল্মীকি তখন ছোট্ট একটি শব্দ উচ্চারণ করলেন,—সমুদ্র!

ক্ষীণ প্রদীপের কম্পিত শিখাটি পেরিয়ে মায়ের নির্বাক দুটি শান্ত চোখ বাড়ির উঠান পেরিয়ে গাছপালা ডিঙিয়ে আকাশ অতিক্রম করে চললো নিরুদ্দিষ্ট সন্তানের সন্ধানে। সেই চোখ এসে দাঁড়ালো আমার সামনে ওই সীমাহীন বারিধি-পাথারের পটভূমিকায়। মনে মনে বললুম, সমুদ্র।

রামচন্দ্র ভুলে গেলেন বানর-সেনার কথা, সীতা-উদ্ধারের কথা, স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা, রাবণ-সংহারের কথা। কান ভরে শুনলেন ওই কেবল একটি শব্দ, সমুদ্র। কথা এখানে স্তব্ধ, ভাষা চলৎশক্তিহীন, চিন্তা গতিরুদ্ধ। কিন্তু রামচন্দ্র সমুদ্রের শোভা দেখে বিমূঢ় অভিভূত হয়ে আত্মবিস্মৃতভাবে ডুবে ছিলেন। এখানে সেই শোভা কোথায়? দূরে নিকটে আশেপাশে ছায়াচ্ছন্ন বিভীষিকা ছাড়া আর কোথায় কি? তবে কি ভবিষ্যৎটাও অমনি অকূল কালো? তবে কি সেই কুহকলোক যা আমাদের আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে অনিশ্চিতের দিকে, তার সমস্তটাই ছলনা?

চোখ বুজে কাৎ হয়ে পড়ে রইলুম। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল আমি আর উঠতে পারব না। বাহির সমুদ্রে বাতাস উঠেছে, সুতরাং খালাসীরা দড়িদড়া নিয়ে এদিক থেকে ওদিকে ছুটোছুটি করছে। মাঝে মাঝে ইঞ্জিন ঘরে পড়ছে টং টাং ঘণ্টা। বাতাস উঠলে জাহাজের কি হয়, দড়িদড়া কোন্ কাজে লাগে, জাহাজ ডোববার কোন আশঙ্কা ঘটে কিনা, এ আমার জানা নেই। একবার কাঁচড়াপাড়া আর জামালপুরে গিয়ে যন্ত্রবিজ্ঞান শেখবার চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু সেসব জায়গায় যখন একান্তই ঠাঁই করতে পারিনি, তখন ওটার সম্বন্ধে ঔৎসুক্যও আর নেই। কে একজন আনাগোনার পথে আমার একখানা পা মাড়িয়ে দিয়ে গেল—কিন্তু পা দুখানা অসাড় বলেই আর কোন সাড়া দিলুম না। কেন যে নড়তে পাচ্ছিনে, কেন যে চোখ খুলতে পাচ্ছিনে, কেন যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা আমার লোপ পেয়ে গেছে, এর কোন কারণ তল্লাস করার সামর্থ্য আমার ছিল না। জাহাজের ভিতরকার আলো ছাড়া বাইরে আর কিছু দেখার যো নেই, দেখবারও কিছু নেই—শুধু শুনতে পাচ্ছি জাহাজের দুই গায়ে প্রবল তরঙ্গের আছাড়িপিছাড়ি খাওয়া, আর গোঁ গোঁ গর্জন। জাহাজটা একবার উঠছে উপর দিকে, একবার নামছে অধঃ নীচের দিকে। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখা যায়, দিগন্তরেখার রেখা যেটি আকাশ আর সাগরের সন্ধিস্থল—সেটি প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়ে উপর নীচে নামা-ওঠা করছে।

দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, মনে হয় বসে পড়ি। বসে বসে চেয়ে থাকি। কথা কইতে রুচি থাকে না, কেউ প্রশ্ন করলে বিরক্তি বোধ হয়, খাদ্যের চেহারা দেখলে গা ঘুলিয়ে ওঠে। এক সময় মনে হয়, বসে থাকার চেয়ে শোওয়া ভালো এবং শুয়ে পড়ে চোখ বুজে থাকা আরো ভালো। কিন্তু চোখ বুজলেই মনে হয় যেন কোথায় কোন্ অতলে তলিয়ে যাচ্ছি—আরো নীচে, আরো নীচে... গেলুম গেলুম, আর নিজেকে ধরে রাখতে বুঝি পারলুম না......সহসা হুস করে ভেসে উঠলুম শূন্যে, অনেক উঁচুতে, আকাশের কিনারায়! আবার......আবার নামছি...... আবার নেমে যাচ্ছি......নীচে......নীচে...... অনেক......অগাধ নীচে......

সহসা চোখ খুলে যায়, ডেকের পাটাতন নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরি। আমার নিজের উপরে কোন প্রভুত্ব নেই, এক্তিয়ার নেই,—আমি ভাগ্যের ক্রীড়নক, আমি নিয়তির খেলা। আমি কেন ভাসছি অগাধ জলে, কে আমাকে ভাসাচ্ছে অকূলে, কে আমাকে টেনে নিয়ে চললো ওই অনন্তলোকে, আমাকে দিয়ে কী কাজ সম্পন্ন করা হবে, কেন এই পৃথিবী-ভ্রমণ, কেন বা এই অভিযান—সমস্ত প্রশ্ন লণ্ডভণ্ড মথিত-প্রতিহত হোতে লাগলো তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে। সহসা ব্যঙ্গ করলো কে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে। তুই যে বলিস, ঈশ্বরকে মানিনে? তুই যে বলিস, তুই চিরবিদ্রোহী, চিরপলাতক? তুই যে পথে-ঘাটে বলে বেড়াস, তুই দুঃসাহসী? এবার বল ঈশ্বরকে মানিস কিনা? চেয়ে দ্যাখ তরঙ্গের ওই প্রচণ্ডতার ভিতরে কে দাঁড়িয়ে, ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সাগরের মাঝখানে ওই করাল ভয়াল,—ও কে জানিস? ওই দিক্‌দিগন্ত-ব্যাপী মহানিশার ভিতর দিয়ে এই যে তুই ভেলায় চড়ে এখনও ভাসচিস, এ কার অনুগ্রহে? তোকে এই অন্ধকার সমুদ্রে নিশ্চিহ্ন করে দিতে কতটুকু সময় লাগে? ঈশ্বরকে মানিস কিনা, এবার বল?

এই আকাশপথে যে আলো বাড়িয়ে ধরবে, সে কে? শান্ত হবে তরঙ্গ দল, জাহাজ আবার যাবে মরালগতিতে, আবার খুঁজে পাবে কূল,—এসব কার সংকেত? ভিতরে ভিতরে কোন্ শক্তি নিহিত? কে ফুল ধরায়, আর ফুল ঝরায়? কোন শক্তি টেনে আনে সূর্যচন্দ্রকে? বায়ুপ্রবাহে কে জোগায় প্রাণশক্তি? মৃত্তিকায় কে পাঠায় রস? তরঙ্গের প্রাণে কে আনে প্রচণ্ডতা? জলকল্লোল কার ইঙ্গিতে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে? আমার ভিতরে কে ঘনিয়ে তোলে চিরকালীন অতৃপ্তি আর অনুসন্ধিৎসা? লতায়, পাতায়, শাখায়, মৃত্তিকায়, মক্ষিকায়, পিপীলিকায়—যে প্রচ্ছন্ন সংগ্রাম কল্পান্তব্যাপী প্রসারিত—সেসব কার ষড়যন্ত্রে? কে—তা জানিনে। সেটা আমার জানবার বয়স নয়। সেটা জানবার জন্য আমার এ অভিযান নয়। আমি সোজা হয়ে স্থির হয়ে উঠে বসলুম।

আমাকে যেতেই হবে, পার হতেই হবে, আমি যে রবির পক্ষে অযোগ্য সঙ্গী নই, এ প্রমাণ আমাকে করতেই হবে। অসুস্থ হলে আমার চলবে না, ভয় পেলে আমার পৌরুষের হানি ঘটবে,—কিছুতেই আমার উন্নতি হবে না। আর যাই হোক, আমি ত সেই সব মহাপুরুষেরই একজন, যারা মেরু-লোকে পাড়ি জমিয়েছে, যারা দুর্গমকে আয়ত্ত করার জন্য গেছে অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে হনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগৃহে, যারা গেছে মধ্য এশিয়ার মরুভূমিতে, আফ্রিকার নরখাদকের দেশে, হিমালয়ের দুরারোহ তুষার শৃঙ্গে? তারাও ত হয়েছিল মায়ের অবাধ্য, তারাও ভাইবোনদের বাঁধন কেটেছিল, প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, জীবনের সোজা পথ

ছেড়ে বাঁকা পথে পা বাড়িয়েছিল? আমি ত তাদেরই একজন।

আবার কখন কোমর ভেঙে কাৎ হয়ে পড়েছি, কখন চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে আবিল তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছে, কখন আবার অসুস্থ অনড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছি—কিছুই মনে ছিল না। সহসা রবি কোথা থেকে এসে ঠেলা দিয়ে আমাকে ডাকলো,—কিরে, পড়ে আছিস যে?

চোখ খুলে তাকাতে পাচ্ছিলুম না। রবি বললে, এ হে হে, বমি করে ভাসিয়েছিস দেখছি। জামাকাপড় নষ্ট করলি ত?

বললুম, বড্ড অসুখ করেছে আমার।

রবি হা হা করে হেসে উঠলো। বললে, দূর গাধা,—এর নাম সী-সিকনেস। অসুখ কি রে? নে খা—ও-ও-অক্। বলতে বলতে তার নিজের পেটের ভিতর থেকে কাঠ-বমি সশব্দে উঠে এলো।

বাঁ হাতে সে আমার মুখের চিবুকের আর নাকের ওপর এক গোছা পুরি আর তরকারী রাখলো, আমার হাতে সেগুলি দেবার ধৈর্য তার ছিল না। আমি চিৎ হয়ে পড়ে আছি, আমার নাকের ডগায় আর ঠোঁটের ওপর পুরি তরকারি—কিন্তু তখন আমার খাবার শক্তি এতটুকু ছিল না। রবির তৎক্ষণে নাড়িভুঁড়ি পাকিয়ে গলার শির ফুলে চোখ দুটো রাঙা হয়ে কাঠ-বমি উঠছে পেটের ভিতর থেকে। বলছে, না, আমার কিছু হয়নি...বুঝলি, এ কিছু না, আমার এসব হয় না। যতসব নেটিভদের বমি দেখে আমার পেটটা ঘুলিয়ে উঠলো...

রবি আমাকে প্রায়ই নেটিভ বলে। কিন্তু আমার চেয়ে সে কালো।

এক সময় জড়িত কণ্ঠে বললুম, তুই যে বলালি, আজকে আমাদের খাবার হুকুম নেই? তবে আবার খাবার আনলি কেন?

রবি বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে বললে, দয়া করে ঘড়িটা দেখবে কি? রাত এখন দুটো, অর্থাৎ টু এ-এম...মানে শুক্রবার থেকে শনিবার। এটা আমাদের ব্রেক-ফাস্ট মনে রেখো। ভোর বেলা যেন আর খাই-খাই করো না।

বললুম, রাত দুটো এখন?

ও-ও-ওয়াক্......আজ্ঞে হ্যাঁ, রাত দুটো এখন। এ আর তোমার দাদার দেওয়া সাত টাকার হাতঘড়ি নয়,—বমি সামলে রবি পুনরায় বললে, এ ঘড়িটির দাম, after all, পঁচাত্তরটি টাকা......নগদ করকরে......ও-ও-ওয়াক—ক্—ক......উঃ—এই বলে সে বুক আর কপালের যন্ত্রণায় হাঁপাতে লাগলো।

আমি অনড়, অচেতন।

রবি হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, দয়া করে গোঁফের ওপর থেকে খাবারটা নামিয়ে এবার খাবে কি? জল-টল বাপু আনতে পারবো না। নাও, চিবোও।

বললুম, তোর খাওয়া হয়নি?

আমার? তোর মতন হ্যাংলা নই যে, আড়ালে গিয়ে আমি চুরি করে কিনে খাবো। দিব্যি দোকানে গেলুম, বসলুম, পয়সা দিলুম—পেট পুরে খেলুম। ও-ও-ও......

বমির বেগে রবি কাত হয়ে বসে পড়লো। তারপর একটু সামলে বললে, যত সব নেটিভের পাল্লায় পড়ে...এসব জানলে তোকে আমি কিছুতেই আনতুম না। কী ভুল করেছি। এখনই ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে......ও-ও-ওয়াক্—ক—ক......

বিশ্বের বিরক্তি আর ঘৃণা তার মুখে চোখে। আমি সাড়া দিলুম না, প্রতিবাদ করতে পারলুম না। আমার নাকে, চোখে, মুখে তখন পুরি-তরকারী মাখানো; গোঁফের গোড়ায় সেগুলোর গন্ধ পাচ্ছি। তখন আমি আধমরা।

সর্বাঙ্গে বমি মাখা, তার সঙ্গে জামা-কাপড়ে তরকারীর দাগ লাগা। এমনি অবস্থায় সকাল হল। ভোরের প্রভাতসূর্য কোন্ দিক থেকে উঠেছে দেখিনি, বোধ করি রাত্রিশেষে তন্দ্রা এসেছিল। বাতাস অনেকটা পড়ে গেছে, রোদ উঠেছে, তাই বো... হয় আমরা কিছু সজ্ঞান হয়েছি। আ... উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে জাহাজের বারান্দা দি... চলা কঠিন,—পা অত্যন্ত টলে, মাথা ঘে...র পড়ি-পড়ি ভাব হয়। এদিক ওদিক তা...য়ে দেখি, সকলেই এলোমেলোভাবে মাত... মতো করে চলবার চেষ্টা করছে, ...তরাং আমিও সেইভাবে অগ্রসর হবা... চেষ্টা করলুম। খালা...রা তখন সমুদ্রে... থেকে বাল্তি-বালতি জ... তুলে ডেকের ...পর-তলা ধুতে আরম্ভ করেছে। সে...ই জল কোথাও দাঁড়াচ্ছে না... দ্রুত চ... যাচ্ছে পিছনে ডেকের নালি দি...।

অবসন্ন চোখ দিয়ে দেখ... ...মুদ্রের দিকে। এত নীল—এত ন... কখন দেখিনি। চারিদিকে নীল,—ঘন ...লের মতো হাতের কাছে নীল জল। হরি...বারের গঙ্গার সেই নীলধারা নয়, কারণ তাতে দেখা যায় স্বচ্ছতা। কিন্তু এ এ...কবারে ব্লু-ব্ল্যাক কালি যেন হাতে লাগ... রং লেগে যাবে। যত গভীর, তত ঘন, তত বিপুল। আমরা কোন দিক থেকে এসেছি, কোন দিকে যাবো, তীর কোন দিকে—তা'র কোনো সংকেত কোথাও নেই। কতখানি সমুদ্র পেরিয়েছি জানি নে, কতটা বাকি তাও জানিনে। সমুদ্রে সময়ের নির্দেশ নেই। প্রতিক্ষণে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিটাই দুলছে। আমি, তুমি, জাহাজ, আকাশ সমুদ্র, দিগন্ত,—সমস্তটা দোলায়মান। অদূরে সাগর পাখীরা আমাদের এ... জাহাজটিকে আশ্রয় ক'রে চলেছে সমু... অভিযানে। তা'রা অস্থায়ী আশ্রয় নিয়েছে এই জাহাজে, এই জাহাজ থেকে নেমে তা'রা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে মাছ শিকার করছে। দুধের মতো শাদা পাখী মাঝে মাঝে ভাসছে গাঢ় নীল সমুদ্র শয্যায়। দেখতে পাচ্ছি সমুদ্রের ভিতর থেকে উড্ডীন মাছ লাফিয়ে প্রায় পঞ্চাশ কি একশো গজ দূরে উড়ে গিয়ে আবার জলে ডুব দিচ্ছে। নীল-বর্ণ তরঙ্গরাশির উপর দুগ্ধশুভ্র সর্পাকৃত ফেনা জমে উঠছে পলকে পলকে। যেন নীলকলেবর বনমালী খেলাচ্ছলে গলায় তুলে নিচ্ছেন যুঁইফুলের মালা। গতরাত্রে অনড়চক্ষে দেখেছি ফসফরাস জ্বলছে সমুদ্রে কোটি কোটি বৈদুর্যমণির মতো। দেখে অভিভূত হয়েছিলুম। আজ সকালের রৌদ্রের আলোয় জ্বলছে ফেনার ফণাগুলি। সেই অপরূপ বিদ্যুতের আলোয় চক্ষে যেন ধাঁধাঁ লাগে।

রবি আমাকে অন্য একটা পথ ব'লে দিল, আমি সেই পথ দিয়ে নীচে নেমে গেলুম। আশ্চর্য হয়ে যাই, কত পথ কত অলিগলি। কত রাস্তা চ'লে গেছে কত দিকে,—অনেক সময় পথ হারিয়ে গিয়ে অনেক লোক হন্তদন্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নীচের তলায় বাজার বসেছে, গয়লারা দুধ বিক্রি করছে, খাবারের দোকানে পরিবেষণ চলছে। একদল চলেছে স্নান করতে; কেউ জামা কাপড় নোংরা ক'রে সাবান ঘষতে লেগে গেছে। সমুদ্রের দোলায় মানুষের শরীরের নয়টি ইন্দ্রিয় যে কত আলগা হয়ে যায় তার প্রমা... পাচ্ছি যেখানে সেখানে। আজ সকালে ...তাসের চাপ কিছু ..., তাই অনেকেই ...কতকট। সুস্থবোধ ...ছে। চোখ খুলে ... কোথায় কিভাবে ... স্ত্রীলোকদের খোলা ...কের ধারে আসতে দেওয়া হয় না, পা...ড়ের সমুদ্র দেখে তারা চীৎকার ... অথবা তাদের সংজ্ঞা লোপ পায়। মেয়েরা নাকি আবেগপ্রবণ জীব। তাদের রাখা হয় হোলডের নীচে, অর্থাৎ সকলের নীচের তলায়। তাদের সঙ্গে শিশুরা আছে, তারা সকল সময় অসুস্থ—তারা যে জীবিত অবস্থায় জাহাজ থেকে নামবে এমন মনে হয় না। খালাসীরা থাকে ছোট ছোট ঘরে। একটি ঘরে কাঠের ফ্রেম দিয়ে তৈরি আলমারির তাকের মতো এক-একটি ফোকর। প্রত্যেকটি ফোকরে এক একজন খালাসী ঢুকে শুয়ে পড়লে সমুদ্রের দোলায় আর তাদের ছিটকে পড়ার ভয় নেই। নীচের থেকে কড়িকাঠ পর্যন্ত একটি মানুষের ফোকরের উপর আর একটি মানুষ শুয়ে আছে,—এটি কৌতুক দৃশ্য। মাস্তুলের দিকে অসংখ্য জীবনতরী লোহার শিকলে বাঁধা থাকে, তার সঙ্গে লাইফ-বেল্ট। যদি বিপদ ঘটে, যদি জাহাজ ডোবে, তখন সেইগুলিই শেষ ভরসা। ভেবে দেখলুম, জাহাজডুবির পর জীবনতরীতে

ভেসে বেড়ানো, অথবা কোমরবন্ধ জড়িয়ে হাঙগরের গ্রাসে যাওয়ার চেয়ে টুপ করে ডুবে যাওয়া অনেক ভালো। মাঝ-সমুদ্রে জাহাজ ডুবির পর যারা বাঁচে, আমি তাদের অতিমানব বলে মনে করি। নিয়ম হল এই, জাহাজডুবির সম্ভাবনায় আগে নামবে শিশু ও নারী, তারপর বৃদ্ধ, তারপর টিকিট-করা আর সব যাত্রী, তারপর জাহাজের কর্মীরা—সকলের নামবার পর ক্যাপ্টেন নামবেন, অর্থাৎ ক্যাপ্টেন সবশেষে। কিন্তু সেই অন্তিমকালের প্রাণরক্ষার সংগ্রামে এসব নিয়ম যথাযথ প্রতিপালিত হবে কি না জানিনে। জাহাজের ক্যাপ্টেনের বিচারই হলো সর্বশেষ বিচার। তিনিই একমাত্র অধিনায়ক; তিনিই সকলের অভিভাবক। আমাদের জাহাজের খালাসীরা সকলেই নোয়াখালি অথবা চট্টগ্রামের বাঙালী মুসলমান। প্রত্যেকের স্বাস্থ্য অতিশয় ভালো, শক্তি অপরিমেয়, খায় প্রচুর, তাদের রান্না দিবারাত্রই চলছে। সর্বদা নীল রংয়ের পোষাক, তারা স্নান করে দিনে বহুবার, সমুদ্রের অবিশ্রান্ত হাওয়ায় তাদের অসুখ করে না।— সমুদ্রেই তাদের সংসার, সমুদ্রেই তাদের বাসা, সমুদ্রই তাদের জীবন,—তারা সবাই সামুদ্রিক। অহোরাত্র তারা পরিশ্রম করছে, ছুটোছুটি করছে, লোহার শিকল টানাটানি করছে, মাস্তুলের ডগায় উঠছে, নীচে নামছে, উপরে ছুটছে। জাহাজের ইঞ্জিনীয়ার, সহকারী ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, ওভারসীয়ার, ইলেকট্রিশিয়ান, ইঞ্জিনচালক, বয়লারের লোক—প্রত্যেকের কাছেই খালাসী মোতায়েন থাকে। তাদের কাছে [illegible] সুবিধা অপেক্ষা জাহাজের কল্যাণের দিকটা বেশী লক্ষ্যণীয়। জাহাজ যেন নির্বিঘ্নে চলে, জাহাজের যন্ত্রলোকে যেন কোথাও বিকলতা [illegible] না যায়—প্রতি মুহূর্তে সতর্ক প্রহরী চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে জাহাজের সর্বপ্রকার সংবাদ বহন করে আনছে। জল বড় অবিশ্বাসী।

জামা-কাপড় কাচা হলো না, তবে কতকটা সুস্থ হয়ে যখন একটু দেখে শুনে বেড়াচ্ছি, পথে রবির সংগে দেখা। দেখি তার সংগে একজন বাঙালী সাহেব। ইতিমধ্যে কখন যে দুজনে আলাপ হয়েছে জানতে পারিনি। পরিচয় হবার পর জানতে পারলুম তিনি মিস্টার ভাদুড়ী, এই জাহাজেরই ইঞ্জিনীয়ার। বছর তিরিশ বয়স, সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান,—বুঝতে পারা গেল তিনি বিলাত-ফেরত; কিছুদিন আমেরিকাতেও ছিলেন। এই জাহাজের এই সামান্য পাঁচশো টাকার চাকরি তিনি শীঘ্রই ছাড়বেন। তিনি আটলাণ্টিকের কোন জাহাজে ভালো চাকরির চেষ্টায় আছেন। দুজনের আলাপ চলছে ইংরেজিতে হাসি-হাসি মুখে। রবি আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ইংরেজি বলছে, একটু অনর্গল হবার চেষ্টা করছে—তার জানানো চাই, ইংরেজি ভাষায় আলাপে সে দক্ষ। তার ব্যাকরণ ভুল হোক আসে যায় না, বাক্য সম্পূর্ণ না হোক ক্ষতি নেই, একবচন আর বহুবচনের গণ্ডগোলে ভাষা গোলমেলে হয়ে উঠুক, গ্রাহ্য নেই।—তাকে ইংরেজি বলতেই হবে। সে-ইংরেজি ভাষা আমাকে শোনানো চাই, আমার চেয়ে সে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত—এটি অবশ্যই প্রমাণিত হওয়া চাই। সে বলে after all Native বা etiquete জানে না, সুতরাং awful. তারা চকোলেট খেতে শেখেনি, bread and butter কাকে বলে জানে না, তারা shabby তাদের launch খাওয়া অত্যন্ত 'পুয়োর',—তাদের sea sickness হয় bay of Bengal-এ; তারা unfit for the sea, তারা অত্যন্ত home-sick.

পরোক্ষভাবে কটূক্তিগুলি আমাকেই করা হচ্ছে। আমি একটু দূরে সরে গিয়ে পুরী-কচুরীর দোকানের সামনে দাঁড়ালুম। রবি আর মিস্টার ভাদুড়ী তখন অসংলগ্ন আলাপে একেবারে মশগুল। আড়চক্ষে সেদিকে একবার তাকিয়ে আজ আমি বেপরোয়ার মতন মস্ত এক ঠোঙা পুরী-তরকারী আর মিঠাই কিনে গোগ্রাসে গিলতে আরম্ভ করে দিলুম। সবশুদ্ধ পাঁচ আনা হয়েছে শুনে একবার ভয়ে আমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু আর থামা যায় না, কেননা পেটের প্যাঁড়া তখনও আমার খাওয়া হয়নি। মরিয়ার মতন একখানা প্যাঁড়া চেয়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ গালে পুরে একঘটি জল ঢক ঢক করে গিললুম। তারপর এক পয়সা পান নিয়ে মুখে পুরলুম। শুনেছি ফাঁসী যাবার আগে লোকে এমনি মরিয়া হয়ে ওঠে।

দোকানদার পয়সা চাইলো সওয়া ছ' আনা। রবি অদূরেই দাঁড়িয়েছিল, আমি সম্ভবত ইঙ্গিতে রবিকে দেখিয়ে দিয়ে সেখান থেকে সরে পড়লুম। রবি এতক্ষণ আমার আহারাদির ব্যাপারটা কিছুই লক্ষ্য করেনি, এবার তার পাশ দিয়ে পান চিবিয়ে চলে যাবার সময় বলে গেলুম, আমি উপরের ডেক-এ আমাদের জায়গায় আছি, তুই আসিস।

মিনিট দশেক পরে রবি আমার কাছে এসে দাঁড়ালো, অনেকটা যেন কোন দস্যুর পৈশাচিক ভঙ্গিতে। রবির রংটা কালো,—বেশ ঘন কালো, মুখে বসন্তের দাগ, নীচের ঠোঁটটা পুরু, দুইটা সামনের দাঁতের মাঝখানে ঈষৎ ফাঁক, চোখ দুটো ছোট ছোট। হিংস্র শ্বাপদের মতো সেই চোখ জ্বলছে। চেয়ে দেখলুম, সে তার দুই বগলে দুই হাতের ঘুষি পাকিয়ে রেখেছে। দাঁতের উপর দাঁতের পাটি এমন চেপে ধরেছে যে, মুখখানার চোয়াল কঠিন, নিরেট।

তীক্ষ্ণ চাপা কণ্ঠে বললে, [redacted], উঠে দাঁড়া রাস্কেল ......

কাতর কণ্ঠে বললুম কেন?

পান খাওয়া হচ্ছে? সোয়াইন......উঠে দাঁড়া—

বললুম, রাগ করেছিস ভাই?

হুঁ। মেয়েলি গলা। —তোর বুকের ছাতির মাপ কত বল্?

ভয়ে ভয়ে একটু কমিয়ে বললুম, সাড়ে উনত্রিশ।

রবি বললে, আমার প্রায় একত্রিশ, তা জানিস? আয় লড়ে যা। দেখতে পাচ্ছিস আমার বাইসেপসখানা? এক্সপ্যান্ড করলে বুকখানা বত্রিশ হয়, তা জানিস?

ভীতকণ্ঠে বললুম, এইবার জানলুম, মনে রাখবো। আরে ভাই, খুব ক্ষিধে পেয়েছিল তাই ছ' আনা খেয়ে ফেলেছি!

রবি দাঁত কামড়ে আমার নাকের ডগায় ঘুষি এনে বললে,—আমার একটা প্রেস্টিজ আছে, তা জানিস? জানিস আমি কলুটোলার সরকার? ছ' আনা রোজ খেয়ে আমাকে তুই অগাধ জলে ভাসাবি? ভিক্ষে করাবি? এঃ, আবার পান খেয়েছে এক পয়সার! পানের সংগে আবার তাম্বুল-বাহার! —সে যেন খিঁচিয়ে উঠলো।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিবারণের পর আমার দেহ তখন অনেকটা সুস্থ বৈকি। সুতরাং প্রহারের আগে অবধি তার তিরস্কার গায়েই মাখবো না। আর যাই হোক, দুজনে একটু ভালোবাসা আছে মানতেই হবে। আমি সমুদ্রের 'সিনারি' দেখতে লাগলুম।

এমন সময় ফস করে রবির বাঁ হাতখানা বগলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। এতক্ষণ পিঠের দিকে সে একটি রুমালের পুঁটলি লুকিয়ে রেখে আমাকে কটু তিরস্কার হানছিল। এবার দেখলুম রুমালে বাঁধা এক ঠোঙা পরম উপাদেয় গরম কচুরি, পুরি, নিমকি, আলুরদম, সন্দেশ—ইত্যাদি। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললে, কেন খাব না শুনি? তুই খাবি, আমি খাব না? বেশ করব! তোর পয়সায় খাই? নে তোর এক টাকা পৌনে দশ আনা ফিরিয়ে। —কিন্তু এ-দুদিন আর তোমাকে এক দানাও খেতে দেব না বলে রাখলুম। খেয়ে খেয়ে আমার সর্বনাশ করলে! গ্লাটন্?

বললুম,—কিন্তু না খেয়ে যদি পিত্তি পড়ে?

এঃ পিত্তি! গলা টিপে তোমার পিত্তি এখনই গালিয়ে দেব। ব্লাডি নেটিভ। —বলে রবি আমার মুখের সামনে বসে পরম পরিতৃপ্তির সংগে একটি একটি করে চিবিয়ে খেতে লাগলো। ভাবটা এই, আমাকে সে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবে, আমার চেয়ে

বেশী খাবে, আমার চেয়ে ভালো জিনিস খাবে, এবং আমি যেন তার খাওয়ায় আর ভাগ না বসাই। চেটে চুষে চিবিয়ে গিলে সে খেতে লাগলো পরম পরিতোষের সঙ্গে।

এক সময় তাকে এদিক-ওদিক তাকাতে দেখে বললুম, খাবার জল এনে দেব কি? সে বললে, দয়ামায়া কি আছে তোর?

উঠে দাঁড়ালুম তৎক্ষণাৎ। তারপর চললুম জাহাজের দোলায় টলতে টলতে। নীচে গিয়ে এক খালাসীর সঙ্গে আলাপ করে একটি টিনের কৌটা সংগ্রহ করা গেল। এক কৌটা মিঠাপানি এনে হাজির করলুম। কৌশলে জানালুম, জলটুকু আনতে আমাকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে! অর্থাৎ আমি এত করি বন্ধুর জন্য, কিন্তু তার মন পাইনে। জলটুকু হাতে নিয়ে বসে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলুম। আমার মতো সেবা তার করে কে?

এক সময় রবির আলুরদম-মাখা এঁটো কালো হাতখানা আমার মুখগহ্বরের কাছে এগিয়ে এল। বললে, দয়া করে হাঁ কর, এ-সন্দেশটি তোমার জন্যেই কেনা! —এই বলে সন্দেশটা সে সস্নেহে আমার গালে পুরে দিল অতি যত্নে!

আমাদের বন্ধুত্ব অক্ষয় হোক।

আহারাদির পর আমরা যখন নিশ্চিন্ত হয়ে সে-বেলাকার মতো সুস্থির হয়ে বসলুম একটু নিরিবিলিতে, তখন প্রায় মধ্যাহ্ন। সমুদ্র এখন কতকটা সহনীয় হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারা গেল, ক্ষুধার তাড়নাতেই আমাদের মধ্যে পদে পদে বিবাদ বাধছিল। আহার-সংযমটা অবশ্য ভালো, তাই বলে উপোস করে ভাগ্য অন্বেষণ করতে যাব, এ কেমন কথা? রবি খুশী হয়ে বললে, টাকা ত' ফুরোবার জন্যেই। খরচ করতে জানলে তবেই টাকা আসে। ড্যাম্ মণি!

সমুদ্রের স্বভাবটি বুঝতে পেরেছি এই দুদিনে। সকাল থেকে দুপুর অবধি যেন কতকটা শান্ত থাকে, অপরাহ্ণের দিক থেকে বাতাসের চাপ আসে, চেহারাটা যায় বদলে। দেখতে দেখতে সমুদ্র আমাদের চোখ রাঙাতে থাকে। ফ্রান্সের প্রান্তে বিস্কে সাগরও নাকি বঙ্গোপসাগরের মতো কর্কশ আর উদ্দাম। আমরা যদি কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারি, যদি সাহসে নিজেদের বাঁধি, যদি চলে-ফিরে বেড়াই, নিয়মিত আহার করি, তবেই সমুদ্রকে বাগ মানাতে পারি। আমরা যেন অনেকটা সহজ হয়েছি।

একটা বিদ্ঘুটে গন্ধ আসছে কোথা থেকে। আশপাশে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, একটা ময়লা তেলের বাষ্প। গতকাল থেকে এই গন্ধটা আমাদের যেন পেয়ে বসেছে। গন্ধটা নাকের ভিতর দিয়ে মগজে ওঠে, শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে, নাড়িতে পাক খায়, আর বমির ভাব আসে। কেমন যেন যন্ত্রণা হয় ওই গন্ধটায়, মন আর মস্তিষ্ক অস্থির-অসুস্থ হয়ে ওঠে, জাহাজে বাস করাটা অসহনীয় করে তোলে। গন্ধটার হাত থেকে কেমন করে আমরা নিষ্কৃতি পাব, এজন্য এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করে বেড়াতে লাগলুম। আমাদের অশান্ত করে তুলেছে।

একজন ফিরিওয়ালা পান-চুরুট বিক্রি করছিল। ঠিক মনে নেই আমি কিংবা রবি —দুজনের একজন প্রস্তাব করল, আচ্ছা, সিগারেটের গন্ধ নাকে নিলে হয় না?

সেই আমাদের প্রথম সিগারেট খাওয়া।

'হাতী' সিগারেট তখন নূতন। তখনও 'ট্যাট্লার' ওঠে নি। 'হাওয়াগাড়ি' আর 'কলম্বিয়ার' যুগ তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে। আমরা দু' আনা দিয়ে এক প্যাকেট 'হাতী' সিগারেট কিনলুম। এই গন্ধের আক্রমণ থেকে আমাদের আত্মরক্ষা করতেই হবে।

তারপর? —মায়ের নির্বাক দুটো চোখ সামনে নেই, দিদিমার কপাল চাপড়ানো নেই, দাদাদের শাসন নেই, বোনেদের গোয়েন্দাগিরি নেই! —আমরা দিব্য সিগারেট ধরালুম। থুতুতে সিগারেটের ডগা ভিজে গেল, অসাবধানে ধোঁয়া গলায় ঢুকে কাসতে কাসতে প্রাণান্ত—আমি ধোঁয়া নিয়ে রবির নাকের কাছে দিই, রবি ধোঁয়া নিয়ে আমা[র] নাকের কাছে ছেড়ে দেয়। আমাদের প্র[থ]ম ধূমপান! এর আগে অনেক ছোটবে[লায়] মামার জন্য তামাক সাজতে গিয়ে সি[ঁ]ড়ির ধারে বসে এক-আধবার হুঁকো যে টা[নি]নি, তা নয়—কিন্তু [সে]টা অজ্ঞানের দুরু[ন্ত]পনা, সেটা চিন্তাকৃত [অ]বস্থা নয়। আজ [এ]রটা প্রয়োজন, নিতান্ত [প্র]য়োজন। আমার ধোঁয়া রবির নাকে, রবির ধোঁয়া আমার [না]কে। অন্তত ওই গন্ধটাকে ভুলতেই হবে।

মিঃ ভাদুড়ীর পরে আর দুজন বাঙালী বন্ধু জুটলো। রবির ধারণা, তাঁরা নিতান্তই নেটিভ, অর্থাৎ ভেতো বাঙালী। ডিম, পাউরুটি, মাখন আর চকোলেট যে দৈনিক খায় না সে রবির দু চোখের বিষ। তবু আলাপ হলো বৈকি। একজনের নাম হিতেন রায়, আর একজন তাঁর ভাগ্নে —কি যেন নামটা। মামা-ভাগ্নে দুজনেই আমাদের চেয়ে বয়সে বড়। তাঁরা যাচ্ছেন রেঙ্গুনে। রেঙ্গুনে হিতেনবাবুর কাকা থাকেন। ঠিক রেঙ্গুনে নয়—শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে জঙ্গলের মধ্যে। কলকাতায় চাকরি-বাকরি নেই, কাজকর্ম কিছু একটা করা চাই,—কাকাকে ধরে যদি বর্মায় কিছু সুবিধা হয়। তাঁরা খুব আশা করে চলেছেন সে-দেশে।

কিন্তু আমরা?

রবি বললে, আমরা অবিশ্যি আপাতত বর্মায় যাচ্ছি—তবে সম্প্রতি চীন-জাপান হয়ে আমেরিকায় যাব। বর্মার লাটকে আর চীনের প্রেসিডেণ্টকে আমরা একথা জানিয়েছি। তবে কি জানেন, আমেরিকানরা ভারি ব্যবসাদার। অবিশ্যি আমাদের বিশেষ বন্ধু হলেন ধনগোপালবাবু, দরকার হলে তিনি আমেরিকান গভর্নমেণ্টকে ধমকে দেবেন। লীগ অফ নেশনস থেকে আমার জ্যেঠামশাইকে নেমন্তন্ন করেছিল, জ্যেঠামশাই যাবার সময় পাননি। আমরা ইউরোপে যদি যাই, তবে সুইস গভর্নমেণ্টের অতিথি হব। কিন্তু আমেরিকায় আমাদের অনেক কাজ, বোধ হয় ইউরোপের নেমন্তন্ন 'একসেপ্ট' করতে পারবো না!

ভাবলুম রবিকে চিমটি কেটে একটু সংযত করি, কিন্তু হিতেনবাবুদের সামনে দাঁড়িয়ে নতমুখে নিজেদের তরকারি আর বমির দাগলাগা জামা কাপড়ের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলুম। তাঁরা রবির কথা অবিশ্বাস করছেন কিনা ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে, তবে অবাক হয়ে রয়েছেন বৈ কি। সুইস গভর্নমেণ্টের অতিথি যারা হবে, তারা অন্তত ডেকের যাত্রী যে হবে না, তাদের জামাকাপড় যে আর একটু অন্তত ভদ্র হওয়া দরকার—সেদিকে রবির লক্ষ্য ছিল না। রবির কাঁধে ঝোলানো রয়েছে একটা বায়নাকুলার অর্থাৎ দূরবীণ, তার সঙ্গে একটা চামড়ার কেস,—সেইটিই যেন কতকটা আমাদের আভিজাত্যের পরিচয়। অনেকে মনে করতে পারতো সেটা চোরাই মাল,—কেন না তার সঙ্গে আমাদের পোষাক-আসাক এবং ভাবভঙ্গী মেলে না। দূরবীণটি রবি শেষ মুহূর্তে পিতার পোর্টমাণ্টো থেকে হাত সাফাই ক[illegible]দাব ব্যাগে পুরেছিল। সে বলতো, [illegible]টি তার দাদা[illegible] থেকে কে[illegible] দাম কত?—রবি টাকার অঙ্কটা বলতো না, বলতো উনিশ পাউণ্ড! [হি]তেনবাবুদের সঙ্গে বন্ধুত্বটা সারাদিনে [বে]শ জমে উঠলো। তাঁরা প্রতিবাদ করেন না, সন্দেহ প্রকাশ করেন না—নিতান্তই ভেতো বাঙালীর মতন নীরব শ্রোতা। এইটিই রবির পক্ষে সুবিধা। রবি জানিয়ে দিল তাদের জমিদারীর কথা, কলুটোলার সরকারদের কথা, তাদের রামবাগানের মামার বাড়ির পরিচয়, ব্যাঙ্ক-জগতে তার পিতার প্রতিষ্ঠার কথা এবং তার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ টাকার গল্প! আমি মাঝে মাঝে তার আজগুবি গল্পে অস্বস্তি বোধ করছি দেখে সে হয়ত এক সময় বলে ওঠে, এটা বোধ হয় তুই শুনিসনি! তোকে বলা হয়নি! যা তুই এখান থেকে, আমাদের জিনিসপত্তরগুলো লক্ষ্য রাখিস।

আমি সামনে থাকলে তার গল্পের পক্ষে অসুবিধা।

হিতেনবাবুরা মুগ্ধ হয়ে শোনে। বলে, আমাদের কাকার ওখানে যদি সুবিধে না পাই, তবে আপনাদের সঙ্গী হবো। কি বলেন?

রবি তৎক্ষণাৎ অস্বস্তিবোধ করে। উত্তরে বলে, কি জানেন, আমরা ঠিক টাকাকড়ি রোজগার করে বড়লোক হতে বেরোইনি, আমরা বেরিয়েছি লাইফ দেখতে—দেখতে চাই জীবনটা কেমন। After all, আমরা' হলুম rolling stone! We gather no moss. হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

রবি কাষ্ঠ হাসি হেসে উঠে হিতেনবাবুদের প্রস্তাবটাকে হাল্‌কা করে দেয়।

রবি পায়চারি করে আর সিগারেট ধরায়। মিঃ ভাদুড়ী আসেন অবসর সময়ে। দুজনে জাহাজের ডেকের উপর এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি চলে ফিরে বেড়ায়। খুব ভাব দুজনে। হিতেনবাবুরা খালাসীদের রান্নাঘর থেকে ভাত সংগ্রহ করে খায়—রবি তাদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে। আমি শুয়ে থাকি, বমির বেগ সামলাই। রবি বলে, আমাদের সঙ্গে Stroll করতে পারিস নে? Stroll করলে বমি আসে না। দিনরাত জাহাজের ডেকে আমরা Stroll করতে ভালো লাগে।

অপরাহ্নের দিকে জানতে পারলুম Stroll শব্দটা সে ভাদুড়ীর কাছে সংগ্রহ করেছে। নতুন নতুন ইংরেজি শব্দ শেখবার জন্য সে ডালহাউসী আর চৌরঙ্গীর পাড়ায় ঘুরে বেড়াতো। এতকাল পরেও তার সে অভ্যাস আছে কিনা জানিনে।

ভাদুড়ী হলেন সাহেব, দস্তুর মতো সাহেব। তাঁর সিগারেট খাওয়া, প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকোন, ওঁর ইংরেজি ভাষার বাঁক, তাঁর মুখে টম্ ডিক-হ্যারির কথা, তাঁর শুষ্ক চুলের ... চেহারা, তাঁর ... করা আচরণ—সমস্ত মিলিয়ে তিনি সাহেব। রবি তাঁর সম্বন্ধে গদগদ। হিতেনবাবুরা ভাত খায়, কোঁচার ... হাত মোছে, পুঁটলির ওপর বসে, গামছা ... স্নান করতে যায়, চাকরির খোঁজার কথা বলে, সুতরাং তাদের কোন কালচার নেই। রবি তাদের দিকে তাকিয়ে নাক সিঁটকোয়। আমার মতন 'ভোতোকে' তাদের দলে ভিড়িয়ে দেয়। ভাবটা দাঁড়ালো, এই ভাদুড়ীর সঙ্গে আমি অথবা হিতেনবাবুরা বন্ধুত্ব করার অযোগ্য। সন্ধ্যার পরে ভাদুড়ী বিদায় নেবার সময় রবি হাত তুলে কোন দিন বলে, চিয়ারো! কোনদিন বলে, অ রিভয়া।

রবির বিদায় সম্ভাষণটা 'কোনদিনই মাতৃভাষায় শুনিনি।

আমরা সোমবারে পৌঁছবো। কিন্তু রবিবারের দিনের শেষটা আর যেন ফুরোতেই চায় না। বাতাস উঠেছে সাগরে, অশান্ত সাগর ঢেউয়ে ঢেউয়ে থৈ থৈ করছে। জাহাজ দুলছে, ঝড়ো বাতাস লাগছে ডেকের তেরপলে। নীল দেখে আমরা ক্লান্ত, স্থলভাগের কথা যেন ভুলেই গেছি। মানুষ যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, পথ দিয়ে যে গাড়ি চলে, বাড়িগুলো যে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে লোককে আশ্রয় দেয়,—এসব যেন আমাদের কাছে এখন অবাস্তব। নীল রং আমাদের চোখে নেশা ধরিয়েছে। কিন্তু অস্থির হলে আমাদের চলবে না, ধৈর্য রক্ষা অবশ্যই করতে হবে। আর এই ত' সবে আরম্ভ মাত্র। এখনও সম্পূর্ণ বঙ্গসাগর, তারপর দক্ষিণ-পশ্চিম প্যাসিফিক্, চীন সাগর, তারপর জাপান। জাপান আর আমেরিকার মাঝখানে সবচেয়ে বড় মহাসাগর, আট্‌লাণ্টিকের কথা এখন না হয় ছেড়েই দিলুম। আমরা রাত্রে যখন বিশ্রাম করতে শুই পাশাপাশি, আমাদের দুজনের মাঝখানে থাকে বড় বড় সমুদ্রগুলি, আমাদের আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়ে তরঙ্গ-দলের উচ্ছ্বাস শ্বসিয়ে ওঠে। কাছাকাছি কেউ যখন থাকে না, তখন আমরা টাকাকড়ির হিসেব করি চুপিচুপি। এর মধ্যে এক টাকা সিগারেটে খরচ হয়ে গেছে হিসেব করে আমরা দুজনেই ভয়ে বিবর্ণ। এখন থেকে একটি সিগারেট দুজনে ভাগ করে খাবো এই স্থির হলো। কিন্তু জামাকাপড় কেমন করে কাচা হবে, ধোপা কোথায়, সাবান কোথায়, চুল ছাঁটার খরচ, কোথায় গিয়ে উঠবো, লোকে সন্দেহ করে জায়গা দেবে কিনা, টাকা রোজগারের আগে পর্যন্ত কি-ভাবে খরচ চালাবো—এইসব বিবিধ সমস্যা ভিড় করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বমির বেগও বেড়ে যায়। দীর্ঘরাত আমরা জেগে থাকি। সাগরের শোভা বিরক্তিকর লাগে। সমস্যা শুনে রবি বলে, তুই ত আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিলি, এবার সামলাও?

বললুম, কুলিগিরি করলে কিন্তু রোজ পয়সা পাওয়া যায়।

রবি বললে, তুই কি বলতে চাস?

বলতে চাই যদি মুটেগিরি করি, রাস্তায় শুয়ে থাকি, ছাতু কিনে খাই—

রবি মিনিটখানেক সিগারেট টানতে টানতে কী যেন ভাবলো। তারপর চেঁচিয়ে বললে, ইম্‌পসিবল।

বললুম, আমাদের চেহারায় কিন্তু মানিয়ে যেত না রে।

রবি আর্তকণ্ঠে বললে, আমার একটা কালচার আছে মনে রাখিস! ভাদুড়ী যদি শোনে, আমার সঙ্গে আর কথা বলবে না। আমার প্রেসটিজ যাবে।

বললুম, লুকিয়ে লুকিয়ে করবো, ক্ষতি কি?

রবি বললে, তুই বুঝি আমাকে এইজন্যে আনলি? জানিস, আমার বাবা এখনো বেঁচে? জানতে পারলে তিনি সুইসাইড করবেন!

আমার মুখে একটা পাকা কথা জুটে গেল,—সম্ভবত কোন বইয়ের কথাই চুরি করে বললুম, কিন্তু মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে গেলে নীচের ভিতটা শক্ত হওয়া দরকার। তাই বলে কুলিগিরি? আমি না হয় আই-এ পড়তে পারিনি। কিন্তু পড়লে গ্রাজুয়েট হতে পারতুম, মনে রাখিস। রবি বলতে লাগলো, দাদামশাই একটু বলে দিলে আমার এ-টি-এস চাকরি মারে কে? একশো পঁচাত্তর টাকা স্টার্টিং, তুই ভাবতেও পারিসনে। তুই বরং মুটেগিরি করিস,—কুলি এসেন্সিতে আমি সুপারিশ করে দেবো। আমি কুলী? কী অডাসিটি তোর।

অর্থাৎ আমাদের অদূর ভবিষ্যতের কার্য-পন্থা সেরাত্রেও অনির্দিষ্ট রয়ে গেল। আমি আর রবিকে না ঘাঁটিয়ে চুপ করে গেলুম।

সেই রাত্রে আমাদের প্রথম ভালো ঘুম হয়েছিল। জাহাজের দোলা ছিল কম, সুতরাং বমির চাড়ও কম। বমির বেগ কমবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সুস্থ বোধ করতে লাগলুম। আমাদের আতঙ্কও অনেকটা কমে গিয়েছিল।

পরদিন প্রভাত সাড়ে ছটা কিম্বা সাতটায় আমরা অস্পষ্ট তীরভূমি লক্ষ্য করলুম। প্রথম তীরভূমি দৃষ্টিগোচর হলে জাহাজের যাত্রীরা আনন্দে কি প্রকার উত্তেজিত হয়ে ওঠে, সেই দৃশ্য দেখলুম। গ্রহলোকে নূতন একটি পৃথিবী সহসা আবিষ্কৃত হলে, অথবা মৃত প্রিয়জন সহসা বেঁচে উঠে দাঁড়ালে প্রাণে যে উল্লাস দেখা দেয়, অনেকটা সেইরূপ। কেউ চীৎকার করে, কেউ গান গায়, কেউ অনাবশ্যক ছুটোছুটি করে। শিশুরা, মেয়েরা, বধূরা—সবাই নীচের থেকে উঠে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। যেন মৃত্যুসাগরের অপর প্রান্তে জীবনের ইসারা দেখা দিয়েছে। দিগন্তলোকে একটি ঘন সবুজ সুতোর রেখা দেখা যায়। রবি তার বায়নকুলার দিয়ে ঘন ঘন দেখতে লাগলো, কিন্তু আমাকে একটিবারও দিল না। আমার উৎপীড়িত কৌতূহল মাথা খুঁড়তে লাগলো দিগন্তের শেষ প্রান্তে।

নদীর মোহানায় আমাদের জাহাজ প্রবেশ করেছে। একটি পাইলট জাহাজ—ছোট্ট জাহাজ—আমাদের আগে পথ দেখিয়ে চলেছে। এইটিই নাকি নিয়ম। দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে রেঙ্গুনের গম্বুজ, মিনার, চূড়া—আরো কত কি! বড় বড় প্রাসাদ-গুলো শ্বেতবিন্দুর মতো চিকচিক করছে! আমরা বিস্ময়কর একটি নূতন জগতের সীমানায় এসে পৌঁছেছি। কিন্তু এ কোন্ জগৎ?

বেলা প্রায় আটটা। রোদ তখনও কাঁচা। নদীর দূর কিনারায় প্রথম লক্ষ্য করছি চন্দ্রাকার শাম্পান,—ঠিক এক ফালি পঞ্চমীর চাঁদ। নদীর তট ছেড়ে উপর দিকে দেখতে পাচ্ছি, এক বিরাট সুবর্ণ মন্দিরের চূড়া। সেই সোনার চূড়াটি রেঙ্গুনে সর্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হয়। রৌদ্রে সেই চূড়া ঝলমল করছে।

আমরা বর্মায় এসে পৌঁছলুম।

ব্যবসা বানিজ্য

শরের ও বাঁশের কাজ

শ্রীনিশাপতি মাজি

গ্রামের মেয়েরা ধান থেকে চাল তৈরী করে। স্ত্রী-পুরুষে তুলা হতে সুতা কাটে। কামার লোহা পিটিয়ে কোদাল গড়ে দেয়। ছুতার কাঠ চিরে গাড়ীর চাকা বানায়। কুমারের ছেলেমেয়েরাও মাটি হতে হাঁড়ি গড়ে। সেইরূপ গ্রামের ডোম ও মুচিদের সবাই শরের চেয়ার এবং বাঁশ হতে মোড়া প্রস্তুত করে। হাড়ী-বাগ্দী ও মুসলমান গরীব পরিবারু তালগুড় তৈরী করে। গরীবদের গৃহে গৃহে এইসব শিল্প কাজ খুব কম মূলধনেই পরিচালিত হয়ে উন্নিতসাধন প্রয়োজন হয়েছে। গঠন প্রণালীও যুগোপযোগী হওয়া আবশ্যক। উৎপাদন সংখ্যাও চাহিদা অনুপাতে অধিক হওয়া দরকার। তা ছাড়া শিল্পটিকে সংরক্ষণের জন্য অতি সত্বর কাঁচামাল উৎপন্নের আয়োজনও করতে হয়েছে।

কাঁচামাল সংগ্রহ

বাঙলা দেশের সর্বত্রই শর, বাঁশ ও তাল-গাছ প্রচুর জন্মায়। বর্তমান দিনে এইসব দ্রব্যগুলি খুব উচ্চ মূল্যে বিক্রি হচ্ছে। সব খোয়াইয়ে এইসব গাছ বসালে জায়গার ক্ষতি হয় না। তা ছাড়া বাগানের এবং জলাশয়ের বেড়ার জন্য এইসব গাছ খুব কার্যকরী। এত অল্প ব্যয়ে বেড়া দেবার অন্য ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। যেসব জলাশয়ের মাটি সংস্কার হচ্ছে তাতে যদি তাল আঁটি বসানো যায়, তাহলে পাড়ের মাটি সহজে জলাশয়ে গড়িয়ে পড়ে না। জলাশয়কে সুশীতল করে রাখে। তাল পুকুরের মিশমিশে কালো জল হলে আজও গ্রামের লোক স্নান করে ধন্য হয়। তাল-



তাল ও শর গাছ



মোড়া ও চেয়ার তৈরি হচ্ছে

থাকে। কেননা কাঁচা মাল গ্রাম হতেই গরীবরা খুব তৎপর সংগ্রহ করতে পারে। গ্রামের লোকেরা বার বার বরাত দিয়ে তৈরী জিনিস ক্রয় করে। অনেকে আজও নগদ পয়সা না দিয়ে দ্রব্যাদি বিনিময় করে থাকে। শ্রীনিকেতনের প্রচেষ্টায় বাঁশের মোড়া, শরের চেয়ার ও অন্যান্য শিল্প-দ্রব্যের যথেষ্ট উন্নতিসাধন হয়েছে। এই কারণে শহরের লোক খুব আগ্রহ সহকারে গৃহের নিত্য আবশ্যক ও গৃহসজ্জার জন্য শিল্পদ্রব্যগুলি ক্রয় করছেন। ফলে অনেক ব্যবসায়ী ও শিক্ষিত যুবকগণ এইসব শরের, বাঁশের, চামড়ার ও অন্যান্য শিল্প-দ্রব্য সরবরাহের কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে এইজন্য শিল্পগুলির আরো কিন্তু গ্রামে এইসব দ্রব্যগুলি নির্মূল হয়ে যাচ্ছে। অনাবাদী জমিতে শর ও বাঁশের মূল এবং তালগাছের আঁটী বসছে না। অথচ অনাবাদী পতিত জমিতে এইসব গাছ খুব সহজে হয়। শরের মূল, বাঁশের গোড়া এবং তালের শিকড় একবার মাটিতে মূল বসাতে পারলে সহজে মরে না। বছরে একবার করে মাটি কুপিয়ে নিলে অথবা গোড়ায় মাটি দিলে গাছ বড় হতে থাকে। ছাগল গরুর উৎপাত হতে চারাগাছকে অবশ্য রক্ষা করতে হয়। কিন্তু গাছ বড় হলে আর কোন ভয় থাকে না। এর দ্বারা গৃহীর একটা স্থায়ী বার্ষিক আয় বাড়ে। জায়গাজমির সীমানা রক্ষা হয়। যেসব জায়গার মাটি গড়ানী জলে নষ্ট হচ্ছে সেই গাছের গুড় ও রস উপাদেয় খাদ্য। তাল কাঠ, শর এবং বাঁশ গৃহ নির্মাণ ও মেরামতির প্রধান জিনিস। তালপাতার আচ্ছাদন দিয়ে অনেক গরীব গৃহরক্ষা করে। তালশাঁস খায়। ভাদ্র মাসে পাকা তাল খেয়ে অনেক গরীব একবেলা পার করে দেয়। বাঁশের দেড়শত প্রকারের এবং শরের প্রায় পঞ্চাশ রকমের গৃহীর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি হয়ে থাকে। অন্যান্য দ্রব্যের কথা বাদ দিয়ে আজ কেবল-মাত্র শরের চেয়ার ও মোড়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি। এসব শিল্পকাজ যে কোন লোক দশ পনেরা দিনে হাতে কলমে অভিজ্ঞ লোকের কাছে শিখে নিতে পারে। কাজ গুলি কঠোর কষ্টসাধ্য এবং কুলগত বৃত্তি

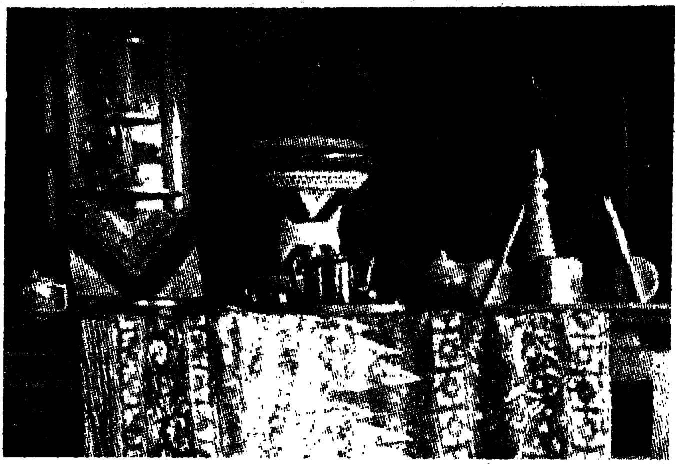
হওয়ায় অবশ্য অপরের পক্ষে গ্রহণ করা একটু শক্ত। এজন্য শিক্ষাপ্রণালীর নানারূপ নক্সা ও চিত্র দিয়ে প্রবন্ধটির ভার বৃদ্ধি করতে চাই না।

শরের চেয়ার

মাঘ ফাল্গুন মাসে শর পাকে। এই সময় শর কাটলে শরের রঙ ভাল দেখায়। তার পূর্বে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে যদি শর ফুলগুলোকে ডাঁটাসমেত সংগ্রহ করতে পারা যায় তাহলে তার থেকে ভাল শক্ত শরের দড়ি করা যেতে পারে। ডাঁটাগুলি থেঁতলে ফেললে সূতাকার করবার উপযোগী হয়। সেগুলি ছুঁচ দিয়ে টুকরা টুকরা করে একটু ভিজা অবস্থাতেই পাক দিলে দড়ি ভাল হয়ে থাকে। শরের দড়ির জাল যদি ঘন করে বুনে বসবার জায়গায় গদি করা যায়, তাহলে দেশী শিল্পে বিদেশী দ্রব্য দিতে হয় না। তা ছাড়া এই রকম শরের দড়ি অনেকদিন টেঁকে। আজকাল দড়ি পাকাবার ভাল ছোট ছোট হাত-চালানো কল বার হয়েছে। এইসব কলের দ্বারা ঘরের লোক অবসর সময়ে প্রচুর দড়ি প্রস্তুত করতে পারে। বাবুই, শন, পাট ধঞ্চা এবং অন্যান্য দ্রব্য হতেও এই কল দিয়ে দড়ি পাকানো যায়।

মাঘ মাসে শর কেটে পাতাগুলি ছাড়িয়ে ফেলতে হয়। শরের ডগা দিয়ে চেয়ারের কাটি তৈরি হয় না। ইজন্য দড়ি পাকাবার কথা বলেছি। সোজা সরল এক সাইজের শর বেছে নিয়ে নানা ... র শরকাটি তৈরি ... এক হাত তিন ... তার মধ্যে ... কাটিগুলি পোয়া ও দেড়হাত মাপের ... বাঁশের প্রয়োজন হয়ে থাকে। তারপর ... (এক বাতার দুইটি সমান মাপের গো... হাতের) চাকা তৈরি করতে হয়।

চাকার উপর ছোট কাটিগুলি বসবার দিকে এবং বড় ও মাঝারি কাটিগুলি পিছনদিকে একটির পর একটি বসিয়ে বেঁধে যেতে হয়। চাকার মাঝে একটা আরো দড়ির বাঁধন দিতে হয়। এই ভাবে উপরের পিছন দিকে আরো তিনটা বাঁধন দিয়ে চেয়ারের মত আকার তৈরি করা যায়। চেয়ারের সর্ব উপরে শরের খোঁচা যাতে দেহে না লাগে তার জন্য এবং তার স্থায়িত্বের জন্য সামান্য খড়ের কুটা সমেত দড়ি জড়িয়ে দিতে হয়। মাটির সাথে লড়াই করবার জন্য এইরূপ চেয়ারের সর্বনিম্নে ভালভাবে দড়ি জড়ালে চেয়ারটি সহজে নষ্ট হয় না। বাঁধনের কাজ শনের দড়ি ও তালগুচ্ছের পাতার বোঁটার বেত দিয়েও হয়ে থাকে। তাল বেতকে পাঁকে চাপা দিয়ে রাখলে কালো রঙ হয়। শরের মোড়ায় কালো বেত ভাল মানায় এবং এই বেত দিয়ে নানা শিল্পকলা দেখাতে পারা যায়। কিন্তু মনে থাকে যেন শরের শত্রু জল।



শ্রীনিকেতন শিল্পভবন-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত মোড়া ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্য

বাঁশের মোড়া

বাঁশের মোড়ার শত্রু ঘুণ। জলে যদি দুই তিনমাস ভাল পাকা বাঁশ ভিজিয়ে রাখা যায় তাহলে ঘুণে ধরে না। এইরূপ হলে বাঁশ ভিজিয়ে রেখে লম্বা লম্বা পাবযুক্ত বাঁশে সরু কাটি তৈরি করতে হয়। ঘন গাঁটওয়ালা বাঁশে মোড়ার শ্রী ভাল হয় না। সরু কাটি তৈরি করে আলকাতরা মাখিয়ে আগুনে সেঁকে ফেললে রঙ করার মত সুন্দর দেখায়। সাইজমত মোড়ার বা... করা যায়। মাঝারি মোড়ার জন্য এক হাত লম্বা কাঠি দরকার। যতটা গোল করবার ইচ্ছে ততটা গোলচাকা বাতার দ্বারা পূর্ণ করে রাখলে ভাল হয়। তারপর গোলচাকায় প... পর তালবেত দিয়ে কাটি বাঁধা নিয়ে। বেতগুলিকে যদি বাঁধবার সময় ...নিফলের মত গিঁট দেওয়া যায় ...ন দেখতে ভাল দেখায়। এইভাবে ...রার কাঠামো খাড়া করে মাঝে ...টি সাদা বাঁধন দিয়ে তার দুপাশে ...রের মত বেতের নক্সা কাটা যায়। অথবা ... ছোট ত্রিভুজ করলেও দেখতে মন্দ না। তারপর উপরের ছাদ তালবেতের ...বা শরের দড়ির দেওয়া যেতে পারে। ...দ তালবেতের ভয়ানক শত্রু। শুকিয়ে ...টমটে হলেই ছিঁড়ে যায়। অবশ্য পুনরায় মেরামতি করা যেতে পারে। কিন্তু শরের দড়ি অথবা বেত দিয়ে মোড়া বাঁধলে অনেক দিন টেকে। শিল্পীর সাধনায় মোড়ার এইসব অসুবিধা দূর হয়েছে। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দিচ্ছি।

ভেড়ার চামড়ায় খোদাই করবার মত যদি কোন সুন্দর চিত্র অংকন করা যায় এবং নানা রঙে রঙিন করা যায় তাহলে মোড়ার রূপ খুব দেখনসই হয়ে থাকে। শ্রীনিকেতন শিল্পভবনের শিল্পিগণ এইরূপ ভেড়ার চামড়ার উপর নানাবিধ চিত্র অংকন করে দেশবাসীর এবং বিদেশীর মোড়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে মোড়ার খুব চাহিদা হয়েছে। এক একটি মোড়া ১২৷৷৹ টাকায় (মাঝারী সাইজ) বিক্রি হচ্ছে। টাকাটা কে কত পাচ্ছেন তার একটা খসড়া দিলাম। অবশ্য দ্রব্যাদি খরিদ এবং মজুরীর তারতম্য হলে এর কমবেশী হিসাব হয়ে থাকে।

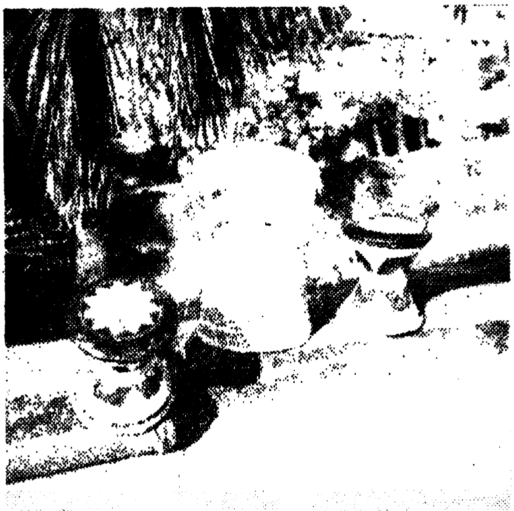
মোড়া তৈরীকারক	২৷৷৹
বাঁশ ও তাল বেত প্রভৃতি	৷৷৹
ভেড়ার চামড়া	৫্
রঙ, স্পিরিট ইত্যাদি	৷৷৹
শিল্পী	১্
মুচি (সেলাইয়ের জন্য)	৷৷৹
যানবাহন ও সংগ্রহ বাবদ	৷৷৹
ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠান	২্
	১২৷৷৹

দেখা গিয়েছে, একটি মোড়া ১২ ঘণ্টায় তৈরী হয়। একজন ৩০ দিনে কমপক্ষে ২০টি মোড়া তৈরী করতে পারে। তারপর মোড়ার উপর গদিতে কারুকার্য করবার জন্য যে ভেড়ার চামড়া থাকে তাতে শিল্পীকে কমকরে চার ঘণ্টা কাজ করতে হয়। চামড়ার গদি করবার জন্য এবং নীচে সেলাইয়ের জন্য মুচিরও প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগে। এ থেকে মোটামুটি বলা চলে যে, ১০ জন ডোম, ২ জন শিল্পী এবং ২ জন মুচিকে নিয়ে মাসিক ২০০টি মোড়া তৈরী করতে পারা যায়। পূর্বে একটি মোড়ার যে হিসাব দিয়েছি, সেই অনুপাতে এর মূল্য ২৫০০্ টাকা হতে

পারে। উক্ত টাকার মধ্যে ১০ জন ডোমে ৫০০৲, ২ জন শিল্পীতে ২০০৲, ২ জন মুচিতে ১০০৲, ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠান ৪০০৲ এবং শর ও বাঁশের মূল্য বাবদ ১০০৲ টাকা থাকে। বাকী চামড়া, রঙ, যানবাহন খরচাদির জন্য ব্যয় হবে। তিন চার হাজার টাকা মূলধন নিয়ে এইরূপে দেশের শিক্ষিত যুবকগণ স্বদেশী ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু এই কাজ আরো উন্নত করার দিকে সকলের লক্ষ্য নেই। বাঙলাদেশে প্রায় ২৫ হাজার ডোম এবং

finishingও খুব ভাল হয়। কিন্তু আজ ডোমদের হয়ে এসব কথা চিন্তা করতেও আশঙ্কা হয়। তারা আজ অস্পৃশ্যদের মধ্যেও অস্পৃশ্য। এই সব সর্বহারাদের বাসগৃহ নেই। শরীর ও বাসস্থান পরিষ্কার রাখবার শিক্ষা নাই। উচ্ছিষ্ট অন্ন ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে ক্ষুধা নিবারণ করে। যাতে এদের সর্বপ্রকার অবনতি ঘটে, সে জন্য (পশ্চিম বঙ্গে) পচুই মদের দোকান খুলে রাখা হয়েছে। তাই এরা নির্বিকার চিত্তে ঘর-দুয়ার, গরুবাছুর,

বাঁশের শরের চামড়ার ও চরকার কাজ আজ পূর্ণোদ্যমে চলছে। শ্রীনিকেতন শিল্প-ভবনেও প্রতি বৎসর গড় ৩০০ জন লোক বিভিন্ন প্রকার হাতের কাজ শিক্ষালাভ করে অন্ন সংস্থানের স্থায়ী উপায় লাভ করেছে। তাই বলতে বাধ্য, দেশের আর্থিক অবস্থা যেরূপ বিপন্ন হয়েছে, তার প্রতিরোধের জন্য সব রকম মতবাদ ও দলাদলি ভুলে সকলেরই অবিলম্বে চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক। দেশনেতা ও দেশের প্রাণবান কর্মীদের প্রত্যেক জিলায় জিলায় শ্রীনিকেতন শিল্পভবনের ন্যায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা কর্তব্য। নতুবা গৃহহীন, খাদ্যহীন ও স্বাস্থ্যহীন নরনারী আন কোন সহজ উপায়ে ভারতের বুকে টিকে থাকতে পারবে না।



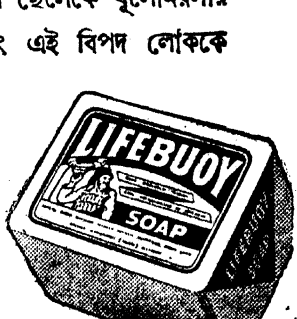
মোড়া ও চেয়ার

৭৫ হাজার মুচি পূর্বে বাঁশের ও চামড়ার কাজ করত। আজ এরা জাত-ব্যবসায় ত্যাগ করে কৃষি কাজে মজুরি খাটছে। অনেকে বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য হারিয়ে তিলে তিলে মরছে। মুচিরা ভেড়ার ও গরুর চামড়া তৈরী করতে দিনে দিনে অক্ষম হচ্ছে। চামড়া তৈরী ও কাগজ প্রস্তুতের জন্য সামান্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে গৃহশিল্পের গোঁড়ামী না করে কারখানার আংশিক সাহায্য গ্রহণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। তাতে মুচি ও ডোমের জীবনযাত্রার মানদণ্ড উচ্চ হতে পারবে। আজ একজন ডোম মোড়ার কাটি তৈরী করে। তারপর সে নিজেই কাটিতে আলকাতরা মাখায়। তারপরে কাঠামো ও বেতের কাজ করে। এভাবে না করে যদি একজন কাটি তৈরী করে আর একজন আলকাতরা মাখায়, অন্য আর একজন কাঠামো করে এবং অপরজন বেতের কাজ করে, তাহলে উৎপন্ন মোড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়েছে, এইভাবে প্রায় দ্বিগুণ অধিক তৈরী করা যায়। তাছাড়া সাইজ ও

গহনাপত্র, এমন কি ·ী কন্যা বন্ধক দিয়েও পচুই মদ পান করে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় এইজন্য এরা অগ্রদূতের মত পল্লীকে চঞ্চল করে তোলে। ১৯২৮ সালে পশ্চিম বঙ্গের পদদলিত হিন্দু জাতির এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে শ্রী· ·তন প্রতিষ্ঠান এইসব সর্বহারাদের সেবা· ·জ নিযুক্ত করে ছিলেন। আজ তাই বাঁশের ও শরের কাজের বহুবিধ ভূমিকা ও তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। শান্তিনিকেতন কলাভবনের শিল্পীদের পরামর্শে ও সহায়তায় শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠান বাঁশের ও মোড়ার কাজে নূতন অলংকরণের প্রবর্তন করে রুচির দিক দিয়ে কুটীরশিল্প·ক নূতন পথে মোড় ফেরালেন। তা ছা· পল্লীবাসী যাতে অবসর সময়ে একটা · একটা শিল্প কাজে নিযুক্ত থেকে আবশ্যক দ্রব্য উৎপন্ন করে তারও আয়োজন হল। বর্তমানে শ্রীনিকেতন মহিলা সমিতি ও ব্রতীবালক বিভাগের দ্বারা এই কাজ আরো দ্রুত প্রসার লাভ করেছে এবং তারই ফলে গ্রামে গ্রামে



আজ সে অনেক কিছুই শিখ কিন্তু কোন শিক্ষাই তার প্রতিদিন লাইফ্‌বয় মাখার অভ্যাসটির চেয়ে বেশী উপকার করবেনা। তার মা এই ভেবে গর্ব্ব ও আনন্দ বোধ করেন যে তাঁর এই শিক্ষা ছেলেকে ধূলোময়লার বিপদ থেকে রক্ষা করছে — এবং এই বিপদ লোককে অসতর্কভাবে আক্রমণ করবার জন্যে সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই রয়েছে।



লাইফ্‌বয় যে শুধু একটি ভাল সাবান তা নয়, এর ব্যবহার একটি ভাল অভ্যাস

L. 77-109 BG — LEVER BROTHERS (INDIA) LIMITED

দেশ-এর নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১৩, ষাণ্মাসিক—৬৷৷৹

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপ :—

সাধারণ পৃষ্ঠা—এক বৎসরের চুক্তিতে

১০০" ও তদূর্দ্ধ ... ৩, প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার

৫০"—৯৯" ... ৩৷৷৹ " " " "

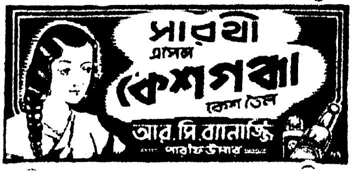
সাময়িক বিজ্ঞাপন

৪, টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জানা যাইবে।

সম্পাদক—"দেশ"

১নং বর্ম্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।



এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৯, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

ক্লিয়ারিং

কলিকাতা, কাণপুর, এলাহাবাদ ক্লিয়ারিং হাউসগুলির অধীনে ক্লিয়ারিং সুবিধা প্রাপ্ত

—শাখাসমূহ—

এলাহাবাদ	ঝালকাঠি
অমরাবতী	ঝাড়গ্রাম
আলমডাঙ্গা	জব্বলপুর
আজমিরিগঞ্জ	কাঁথি
বেরিলী	খড়্গপুর
বালেশ্বর	লক্ষ্ণৌ
বেলদা	মেদিনীপুর
ঔরঙ্গাবাদ	মির্জাপুর
বেনারস	মহারাজগঞ্জ
ভৈরব	নাগপুর
কাণপুর	নর্থ কলিকাতা
চাকুলিয়া	রায়পুর
ছাপরা	রাণাঘাট
দার্জিলিং	সৈদপুর
গয়া	শ্যামবাজার
ঘাটাল	শিলিগুড়ি
ঘাটশীলা	শ্রীহট্ট
গোপালগঞ্জ	উনাও
জামসেদপুর	ফলতা
জোনপুর	

৭৷৷৹ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

শিশুমঙ্গলে

শিশু শিক্ষা

শ্রীঅনাথনাথ বসু

শিক্ষারম্ভ

সাত বৎসর, বয়সের আগে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিবার উপর জোর দেওয়া উচিত নহে একথা আমি ইতিপূর্বে একটি প্রবন্ধে বলিয়াছি।* আমাদের দেশে যে চারপাঁচ বৎসর বয়সে ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়া শেখানো আরম্ভ করা হয়, সকল দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহাতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। সুতরাং আমার মতে আবশ্যিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার আরম্ভ পাঁচ বৎসর বয়সে না করিয়া আরও কিছুদিন পরে অর্থাৎ সাত বৎসর বয়সে করা উচিত।

এক্ষেত্রে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, উল্লিখিত প্রবন্ধে আমি "লেখাপড়া"র কথাই বলিয়াছি, শিক্ষার কথা নহে। 'লেখাপড়া' ও 'শিক্ষা' একার্থবোধক নহে। একথা আমরা সকলেই জানি; কিন্তু কেমন করিয়া জানি না জীবনে প্রায় প্রতিপদেই এই ভুলটা করিয়া বসি, ভাবি শিক্ষার অর্থ লেখাপড়া জানা এবং শিক্ষা দেওয়ার মানে লেখাপড়া শেখানো। জীবনের অন্য খানে এই ভুলের জন্য কত-খানি ক্ষতি হয় জানি না, কিন্তু ছোট শিশুদের বেলায় এই ভুলের ফল যে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয় তাহা চারিদিকেই দেখিতেছি। সুতরাং কথাটা অত্যন্ত পরিচিত এবং পুরাতন হইলেও সেটাকে নূতন করিয়া বলা দরকার হইয়া উঠিয়াছে।

শিশুর জীবনে শিক্ষা শুরু হয় অনেক আগে; বস্তুত যে মুহূর্তে সে মাতৃক্রোড়ে ভূমিষ্ঠ হইল সেই মুহূর্ত হইতেই তাহার শিক্ষা আরম্ভ হইল। এতদিন সে মাতার গর্ভে ছিল, তাহার কোন স্বাধীন সত্তা ছিল না, তাই তাহার সকল অভাব প্রয়োজন মাতাই মিটাইয়াছেন, তাহার জন্য শিশুকে স্বাধীনভাবে কোন চেষ্টা করিতে হয় নাই। কিন্তু যে মুহূর্তে নাড়ীর বাঁধন কাটিল অর্থাৎ শিশু স্বাধীন মানবকরূপে জীবন-যাত্রা শুরু করিল তখন হইতেই তাহাকে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করিবার চেষ্টা করিতে হইল, তাহার স্বাধীনতার শিক্ষা শুরু হইল। ইহার পূর্বে মাতৃগর্ভে যখন তাহার খাদ্যের অভাব ঘটিয়াছে মা আপনা হইতেই তাহার কোন চেষ্টার অপেক্ষা না করিয়াই নিজ দেহ হইতে খাদ্য দিয়া তাহার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, কিন্তু এখন আর তাহা হইবে না। এখন তাহাকে কাঁদিয়া জানাইতে হইবে তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা পাইয়াছে, তখন সেই কান্নার শব্দে জাগিয়া তাহার মা তাহাকে খাদ্যপানীয় জোগাইবেন। এইভাবেই স্বাধীন মানবকরূপে শিশুর জীবনযাত্রা শুরু হয়। তাহাকে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতে হয় সংসারের এই নূতন পরিবেশের সহিত বোঝাপড়া করিবার জন্য, ইহাকে আপন করিবার জন্য। এই চেষ্টাই জীবন, আর এই চেষ্টাই শিক্ষা। এই শিক্ষার ফলে এক দিক দিয়া যেমন পরিবেশের সহিত শিশুর পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইতে থাকে, অন্য দিক দিয়া তেমনই সে পরিবেশকে আয়ত্ত করিয়া নিজের প্রয়োজনমত তাহাকে ব্যবহার করিতে পারে। ইহাই শিক্ষার ফল। শিক্ষার ফলে আমরা দেহমনের স্বাধীনতা লাভ করি, শিক্ষার ফলে জীবনযাত্রা সুগম ও সহজতর হইয়া ওঠে। এই শিক্ষারই ফলে যাহা অপরিচিত, অজ্ঞাত সুতরাং যাহাকে বুঝি না বা ভয় করি, যাহাকে আমার প্রয়োজনমত ব্যবহার করিতে পারি না, তাহাকে জানি ও বুঝি, তাহার ভয় ভাঙিয়া গিয়া তাহা পরিচিতের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া দাঁড়ায় এবং তাহা আমার জীবনপথের সহায় হইয়া ওঠে।

শিশু একান্তই আত্মসর্বস্ব হইয়া জন্ম-গ্রহণ করে। জগতে এক মা ছাড়া আর কাহাকেও সে জানে না, জানার প্রয়োজনও অনুভব করে না। এই একান্ত আত্মসর্বস্ব ক্ষুদ্র শিশুকে তাহার মনের খোলস ভাঙিয়া তাহার দেহকে পুষ্ট করিয়া সামাজিক করিয়া তুলিতে হইবে। পরিবারের একজন সমাজের একজন করিয়া তুলিতে হইবে। ইহাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া বৃহত্তর মানব সমাজে আপনার স্থান বাছিয়া খুঁজিয়া লইতে শিশুকে সাহায্য করাই শিক্ষার প্রধান কাজ। লেখাপড়া বলুন, বৃত্তি শিক্ষা বলুন সকলেরই লক্ষ্য এই। শিশুকে লেখাপড়া শেখাই কেন? মানবসমাজের যে সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার তাহার পূর্বজগণ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, সে ভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে পারিলে তাহার জীবন পূর্ণতর হইবে, এই জন্যই। বৃত্তি শিখাইবার উদ্দেশ্য যাহাতে সে অন্যনির্ভর না হইয়া স্বাধীনভাবে নিজের জীবিকা অর্জন করিতে পারে। এগুলির আগে আর একটা শিক্ষা আছে সে শিক্ষা সকল শিক্ষার মূল; জীবনের প্রথম ধাপে শিশু সেই শিক্ষা লাভ করে।

শৈশবের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য শিশুকে সামাজিক করিয়া তোলা, সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিতে শেখান। ইহার জন্য শিশুকে ভাষা শিখিতে হয়, সামাজিক আচরণ শিখিতে হয়। যে শিশু মূক হইয়া জন্ম লইয়াছিল তাহার কণ্ঠে ভাষা ফুটিল, সে আমাদের ভাষা শিখিল, ইহার চেয়েও বড় বা কঠিন শিক্ষা আর কি হইতে পারে? যে শিশু একান্ত আত্মকেন্দ্র ছিল সে পরিবারের একজন হইয়া উঠিল, পারিবারিক কর্মচেষ্টায় সহযোগিতা করিতে শিখিল; ইহার চেয়ে প্রয়োজনীয় আর কোন শিক্ষা হইতে পারে? এইগুলি তো ভবিষ্যতের সকল শিক্ষার বনিয়াদ।

শৈশবে আর এক শিক্ষাও শিশুকে লাভ করিতে হয়; ইহাকেও বনিয়াদি শিক্ষা বলিতে পারি। শিশু জীবনযাত্রার সহায়-রূপে, শিক্ষার উপকরণরূপে, প্রাণশক্তি ছাড়া কতকগুলি দৈহিক বৃত্তি এবং কতকগুলি মানসিক ভাব ও বৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে; তাহার জীবনের সহায় এই তার দেহ এবং এই দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি। যদি তাহার দেহ পুষ্টি না পায়, যদি তাহার দৈহিক বৃত্তিগুলি স্ফূর্তি লাভ না করে, যদি তাহার মানসিক ভাব ও বৃত্তিগুলি মার্জিত না হয়, তাহা হইলে [illegible] জীবনের বনিয়াদই নষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং শৈশবে শিশুর প্রাণশক্তি নিয়োজিত হয় (উচিত তাহা নিয়োজিত হওয়া উচিত) দেহমনের পুষ্টিসাধনে। তখন অন্য দিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশ নাই; অন্য দিকে দৃষ্টি দিতে গেলে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সুতরাং যদি এই বয়সে শিশুর উপর অন্য কোন ভার দেওয়া হয়, যাহার ফলে তাহার দেহমনের বিকাশে বাধা পড়ে, তবে সেটা একান্তই অন্যায় হয়। ছোট শিশুদের লেখাপড়ার কৃত্রিম জগতে আনিয়া তোলার, তাহাদের লেখাপড়া শিখাইবার বিরুদ্ধে ইহাই সকলের চেয়ে বড় যুক্তি। লেখাপড়ার চেয়েও অনেক বেশি দরকারী শিখিবার বিষয় তাহার আছে, তাহার সমস্ত শক্তি সেই ধরণের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইলে তাহারও কল্যাণ, সমাজেরও কল্যাণ; অতএব সেইভাবে তাহার শক্তি ব্যয় হউক। তাহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিলে শুধু যে শক্তির অপচয় ঘটিবে তাহা নহে, তাহাতে শেষ পর্যন্ত শিশুরও ক্ষতি হইবে, সমাজেরও ক্ষতি হইবে।

এতক্ষণ আমি সাধারণভাবেই শৈশবে

* [illegible] ৩য় সংখ্যা, ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩[illegible]

শিক্ষণীয় বিষয়গুলির কথা বলিয়াছি; এইবার সেইগুলি সম্বন্ধে আর একটু বিস্তারিতভাবে বলি। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখা দরকার যে, এই বিষয়গুলির প্রতি অধিকাংশ অভিভাবকেরই দৃষ্টি নাই; তাঁহাদের অনেকেরই এগুলি যে শিক্ষার বিষয় সে ধারণা নাই। উদাহরণস্বরূপ যদি বলি যে, শিশুর খাওয়াদাওয়া বা শৌচের ব্যাপারটা খুব ছোটবেলা হইতেই শিক্ষার বিষয়, তাহা হইলে বোধ করি অনেকেই আশ্চর্য হইবেন; কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই আমার যুক্তি স্পষ্ট বোঝা যাইবে। অতি ছোট শিশুকেও সময়মত খাওয়ানোর বা মলত্যাগ করিবার অভ্যাস করানো উচিত। অনেক মাতাই এই অভ্যাস করান এবং এরকম যে করা যায় তাহা জানেন। ইহাতে শুধু যে কয়েকটা দৈহিক অভ্যাস শেখা হয় তাহা নহে এইভাবেই শিশু অলক্ষ্যে নিয়মানুবর্তিতা শিখিতে আরম্ভ করে, তাহার মনের শিক্ষাও চলে। সুতরাং এই ধরণের অভ্যাসগঠনের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। কিন্তু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, অধিকাংশ শিশুই শৈশবে এই শিক্ষা-লাভ করে না। এই ভাবের আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

বস্তুত শৈশবের শিক্ষার বেশীরভাগই অভ্যাস গঠনের শিক্ষা। শৈশবেই খাওয়াপরা হইতে আরম্ভ করিয়া ভালভাবে স্পষ্ট করিয়া কথা বলা, একত্রে চলা, মিলিয়া মিশিয়া খেলা করা ইত্যাদি সকল প্রকারের অভ্যাস গড়িয়া তুলিতে হইবে। শিশুর প্রাণশক্তি [illegible] শিখিতে নিয়োজিত হইবে। ইহাই শিশুশিক্ষা।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়িল। পূর্বেই বলিয়াছি শিশুর শিক্ষা স্বাধীন হইবার শিক্ষা। বহু মাতাই অন্ধস্নেহবশে শিশুর স্বাভাবিক চেষ্টায় বাধা দেন। শিশু নিজে কাপড় পরিতে বা কোন কাজ করিতে চাহিতেছে; তখন হয়তো সেই কাপড়পরা ঠিক মায়ের মনোমত কাজের বা সুন্দর হইবে না বা সে কাজে শিশুর হয়তো প্রথমটা কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা আছে তাই বলিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া নিজে সে কাজ করিয়া দিলে শিশুকে পরাধীন করিয়া রাখিবার শিক্ষাই দেওয়া হয়। পরাধীনতায় আরাম আছে। চেষ্টা নাই, সুতরাং কিছুদিন এইভাবের শিক্ষা পাইলে শিশু সত্যসত্যই দেহমনে পরাধীন হইয়া পড়ে; সে নূতন কোন চেষ্টা করিতে ভয় পায়, নূতনভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে তাহার আর সাহস থাকে না।

শিশু যে উপকরণগুলি লইয়া জীবনযাত্রা শুরু করিয়াছে শৈশবে তাহাকে সেই উপকরণগুলি ঠিকমত ব্যবহার করিতে শিখিতে হয়। হাত, পা, চোখ, কান ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানের উপকরণ। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। এইগুলি ব্যবহার করিতে শিখিলে সঙ্গে সঙ্গে মনেরও বিকাশ ঘটে। বস্তুত মনোবিকাশের তো অন্য কোন উপায় নাই, বিশেষ করিয়া ছোটবেলায়।

যে শিশু চোখ দিয়া বিভিন্ন রঙের পার্থক্য চিনিতে শিখিল, কান দিয়া বিভিন্ন সুরের প্রভেদ ধরিতে জানিল, সে সেইসঙ্গে অনেক কিছুই শিখিল। যে শিশু পরের হাত না ধরিয়া নিজে সোজা হইয়া চলিতে শিখিল, সে যে শুধু একটা ভাল অভ্যাস শিখিল তাহা নহে, সেই সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া দেহের মাংসপেশীগুলি সংযতভাবে ব্যবহার করিতে হয়, কেমন করিয়া চলার সঙ্গে সঙ্গে গতি নির্ণয় করিয়া একাগ্রভাবে চলিতে হয় তাহার শিক্ষাও পাইল। মনের এই শিক্ষার দাম কি কম? যে শিশু তাহার হাতের আঙুলগুলি দিয়া বোতাম লাগাইতে বা ফাঁস দিতে শিখিয়াছে সে সঙ্গে সঙ্গে নিপুণ-ভাবে আঙুল চালাইবার শিক্ষালাভ করিয়াছে। সেই শিক্ষার উপর ভিত্তি করিয়া ভবিষ্যতে একদিন তাহার হাতের লেখা শেখা হইবে; আজ চোখ দিয়ে সে যে বিভিন্ন আকৃতির পার্থক্য বুঝিতে শিখিয়াছে তাহারই ভিত্তিতে সে একদিন অক্ষর ও শব্দ চিনিতে শিখিবে। সুতরাং শৈশবের এই শিক্ষার বনিয়াদ যদি ঠিকমত রচিত না হয় তাহা হইলে ভাবীকালে সে যাহা শিখিবে তাহাও ঠিকমত শেখা হইবে না।

এতক্ষণ যে ধরণের শিক্ষার কথা বলিয়াছি শিশুর পক্ষে সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। এই শিক্ষা কিছুটা সম্পূর্ণ হইলেই তবে লেখাপড়া শেখান আরম্ভ করা যাইতে পারে, তাহার আগে নয়। তাহার আগে করিতে গেলে শিক্ষার বনিয়াদ কাঁচা থাকিয়া যায়, *শিশুর জীবন ঠিকভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে না। সুতরাং শিশুর জীবনে শিক্ষা শুরু হইবে পুঁথি দিয়া নহে, লেখাপড়া দিয়া নহে; যে স্বাভাবিক শক্তিগুলি লইয়া সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই শক্তিগুলিকে দৈহিক মানসিক নানাভাবের সদাচারের ভিতর দিয়া নিয়মিত করিয়া, নিয়ন্ত্রিত করিয়া।* এই শিক্ষা শুরু হয় চার পাঁচ বৎসরে নয়, তাহার অনেক আগে। একথা বুঝিলে শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে পিতামাতাকে অনেক আগে হইতেই অবহিত হইতে হয়, তাহার আয়োজন করিতে হয় এবং সেটা করিতে হইলে প্রথমে শিশুকে বুঝিতে হয় এবং মোহমুক্ত দৃষ্টিতে তাহার জীবনের প্রয়োজনগুলি বুঝিতে শিখিতে হয়। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেভাবে শিশুশিক্ষা চলে না। তাই চারিদিকে এত শক্তির অপচয় ও শিক্ষার ব্যর্থতা ঘটে। এই সমস্যার সমাধান না হইলে কোনদিনই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সার্থক হইবে না।

সংগে তাহার আলোচনা হইয়াছিল কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে। সেই আলোচনার খানিকটা অংশ ধনপতির মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলাম প্রায় সেইরূপই লিপিবন্ধ করিতেছি।

* * *

ভগবান কহিলেন "খোদার উপর খোদ্‌কারী বলিয়া যে একটা কথা আছে সেটা তোমাদের লেখকদের পক্ষে যত সত্য, তত আর কাহারো পক্ষে নহে। আমি ঘটনা যেরূপে সাজাই অথবা ছড়াই, তোমরা তাহাতে খুশী না হইয়া তাহা নূতন করিয়া সাজাও। ভাল চরিত্রে খারাপের খাদ মিশাও এবং খারাপ চরিত্রে ভালর ভেজাল না মিশাইলে তোমাদের মন খুশী হয় না। আগের ঘটনা পরে এবং পরের ঘটনা আগে তোমরা অম্লানবদনে বসাইয়া থাক। তোমাদের প্রবাদ প্রশ্ন করে 'রাখে হরি মারে কে? মারে হরি রাখে কে?' এ প্রশ্নের খাঁটি জবাব হইতেছে, 'লেখক'। এই তো সেদিন পাগলাডাঙ্গায় এক তরুণী বিধবাকে বিষ পানে আত্মহত্যা করাইলাম, তোমাদের নীতিবাগীশ সমাজ যাহাকে পদস্খলন বলিয়া থাকে তাহার লজ্জা হইতে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য। তোমাদের জনৈক লেখক তাহার একটি ছোট গল্পে ডাক্তারী যন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত বিষ টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিয়া তরুণীকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছে এবং জীবনরক্ষা কর্তা ঐ তরুণ ডাক্তারের সংগে ডাক্তারের পিতা, মাতা এবং অন্যান্য সমস্ত আত্মীয়স্বজনের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও বিবাহ দেওয়াইয়াছে। তোমাদের চলতি ভাষায় তরুণীটি মরিয়া ভূত হইয়াছে; কিন্তু ঐ লেখকটির লিখিত গল্পে সে ডাক্তারের গৃহিণী হইয়া আনন্দে ঘরকন্না করিতেছে; কিছুদিন হইল তাহাদের একটি কন্যাও জন্মিয়াছে।"

ধনপতি কহিল "বুঝিয়াছি আপনি পাগলো-ডাঙ্গার বনজ্যোৎস্নার কথা বলিতেছেন। বেচারা সতেরো বছর বয়সে সধবা এবং সওয়া সতেরো বছর বয়সেই বিধবা হইয়া সামাজিক নিয়মে বাধ্য হইয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করিতেছিল। বছর তিনেক প্রাণপণ চেষ্টায় সে তাহার স্বাভাবিক কামনার উৎসমুখে ব্রহ্মচর্যের পাথর চাপা দিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত......"

ভগবান কহিলেন "ঠিকই ধরিয়াছ। আমি বনজ্যোৎস্নার কথাই বলিতেছি। কেলেংকারীর পর সে বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিল; কিন্তু লেখকের গল্পে সে সুচরিতা নাম ধরিয়া বাঁচিয়া উঠিল। তরুণ ডাক্তার তপনকুমার......"

ধনপতি কহিল, "তপনকুমার আদর্শচরিত্র পুরুষ। সমাজের সহানুভূতিহীন কুসংস্কার এবং অন্যায় অবিচার ভাঙিবার কালাপাহাড় সে। ভাবুন তো একবার ঐ ব্যাপারের পর নিজের সমস্ত আত্মীয়স্বজনের মতের বিরুদ্ধেও ঐ দুখিনী মেয়েটিকে বিবাহ করিয়া সে কি মহৎ আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। ঐ মেয়েটি যৌবনে যোগিনী হইতে পারে নাই বলিয়া তাহার জন্য দুঃখ করিতে পারি; কিন্তু তাহাকে ঘৃণা করিবার অধিকার আমাদের আছে কি? নিশ্চয়ই নাই। গল্পে দেখুন ঐ মেয়েটিই ডাক্তারের গৃহিণী হইয়া সমাজের একটি আদর্শ নারী হইয়াছে। মরিলে কি তাহা পারিত? চমৎকার গল্পটিতে লেখক ইহাই বুঝাইয়াছেন যে, ঘৃণা ভুলিয়া আমরা যদি সহানুভূতি করিতে শিখি, সমাজের বাঁধাধরা নিয়মের কেহ একটু এদিক ওদিক করিয়া ফেলিলেই তাহাকে জঘন্য মনে না করিতে শিখি, তাহা হইলে এই মেয়েটির মত অনেক জীবনই ব্যর্থতার পথে না গিয়া সার্থকতার পথে অগ্রসর হইয়া সমাজের

লেখু-ভেক

অ·কৃ·ব

প্রচুর কল্যাণ করিতে পারে।"

ভগবান কহিলেন "আমি যে ব্যাপারটাকে মরণান্ত করিয়াছিলাম, লেখক সে ব্যাপারটাকে বদলাইয়া মিলনান্ত করিয়াছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে আমি যাহাদের বাঁচাইয়া রাখি তোমাদের লেখকরা তাহাদের মারিয়া ফেলে।"

ধনপতি কহিল "আর্টের খাতিরে অনেক সময় মানুষ মারিতে হয় বই কি। আপনি চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, গাছপালা, নদী, পাহাড়, সমুদ্র, আকাশ প্রভৃতির বেলায় চমৎকার শিল্পী বটেন; কিন্তু মানুষের জীবনের বেলায়—যদি কিছু না মনে করেন তো বলি—অধিকাংশ সময়ই অশিল্পীসুলভ মনের পরিচয় দিয়া থাকেন।"

ভগবান মৃদু হাসিলেন। কহিলেন, 'মানুষের জীবনের বেলায় আমি ইচ্ছা করিয়াই ওরূপ করিয়া থাকি, মানুষের শিল্পী মনকে সৃষ্টির সুযোগ দিবার জন্য। সৃষ্টি মানেই পরিবর্তন, যদিও পরিবর্তন মাত্রেই সার্থক সৃষ্টি নহে। স্রষ্টা মানুষের সবচেয়ে আদরের জিনিস হইতেছে মানুষের জীবন। তোমাদের ইংরাজ কবি আলেকজান্ডার পোপ (Alexandar Pope) এই কথাটাই তাহার মাতৃভাষায় বলিয়াছিল: 'The proper study of mankind is man'; আর তোমাদের রবি ঠাকুরের 'ভাষা ও ছন্দ' নামক কবিতায় মহর্ষি নারদ বাল্মীকি কবিকে কি বলিয়াছিল মনে আছে তো?"

ধনপতি রবীন্দ্রনাথের কবিতা হইতে আবৃত্তি করিল:

......সেই সত্য যা রচিবে তুমি;
ঘটে যা তা সব নহে; কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমভূমি অযোধ্যার চেয়ে সত্য জে[নো]।"

ভগবান কহিলেন "ঠিক। যাহা ঘটে, [...]ৎ আমি যত কিছু ঘট[াই] তাহার সবই সা[হি]ত্যের পক্ষে মূল্যবান নহে। শিল্পী মানুষ [...]ত্তব ঘটনাকে নিজের শি[...] সৃষ্টির উ[...]গদে প্রয়োজনমত অদল-বদল ক[রি]য়া নিবে; [...]হাকে এই সুযোগ দিবার জন্যই—ঐ [...] একটু [...]গেই তুমি বলিয়াছ—মানুষের জীবনের [বে]লায় আমি অশিল্পিসুলভ মনের পরিচয় দি[...]কি। ইচ্ছা করিয়াই দিয়া থাকি।"

ধনপতি কহিল "এই জন্যই অনেক বাস্তব জীবনে আপনি যাহাকে বাঁচাইয়া র[াখেন] সাহিত্যে তাহাকে মারিতে হয়। আমি নি[...] লেখক বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হই; [...] আপনি অন্তর্যামী, আপনার কাছে লজ্জা কোনো অর্থ হয় না। তাই আমার [...] লেখা 'বিদায় গোধূলি' গল্পটিই উদাহরণস্ব[রূ]পে উল্লেখ করিতেছি। গল্পের প্লটটি [...] আসিয়াছিল ওপাড়ার উমেশবাবুর জী[ব]ন-কাহিনী শুনিয়া। উমেশবাবু নাকি প্রেম কর[িয়া]ই বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু বিবাহ করিয়া [...] বেশী দিন টিকিল না। কারণ বিবাহের বছরখানেক না যাইতেই বেচারার স্ত্রী সেই [...] অসুখে পড়িলেন, আর কিছুতেই সারিবার নাম করেন না। এখনো তিনি বাঁচিয়া আছেন। সম্ভবতঃ আরো অনেকদিন বাঁচিয়া থাকিবেনও। উমেশবাবু তো আপনার উপর মহা চটিয়া আছেন, স্ত্রীর উপরও। আমি আমার গল্পে উমেশবাবুর স্ত্রীকে পরলোকে পাঠাইয়া গল্পটিকে এমন চমৎকার করুণরসাত্মক করিয়া ফেলিয়াছি যে, [...]

[...]করিতে পারি না। উমেশবাবুর স্ত্রীকে লইয়া মৃত্যু এবং উমেশবাবুর দুই দিক হইতে সে কি নিদারুণ টানাটানি। প্রাণপণে 'যেতে নাহি দিব' বলিয়াও শেষ পর্যন্ত উমেশবাবু স্ত্রীকে যাইতে দিতে বাধ্য হইলেন। তারপর প্রতি সন্ধ্যায় যে তুলসীতলায় উমেশবাবুর স্ত্রী প্রদীপ জ্বালাইয়া প্রণাম করিতেন, প্রতি সন্ধ্যায় সেই তুলসীতলার পাশে আসিয়া দাঁড়ান উমেশবাবু। চোখে তাঁহার অশ্রু, বুকে তাঁহার হাহাকার। সেই তুলসীতলায় তেমনি প্রতিদিনের মত নামে সন্ধ্যা; কিন্তু হায়, সে কোথায়, সে কোথায়?... তাহা হইলেই দেখুন যে উমেশবাবুর স্ত্রীকে আপনি বাস্তবে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন এবং হয় তো বেশ কিছুদিন রাখিবেনও, তাহাকে গল্পে মারিয়া কি চমৎকার একটি করুণ কাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছি।"

ভগবান কহিলেন "ঠিকই করিয়াছ। সাহিত্য বাস্তবের হুবহু ফোটোগ্রাফ নহে। সাহিত্যে realism বা বাস্তবতা বলিলে এরূপ বুঝায় না যে বাস্তবে যেরূপ দেখি হুবহু তাহারই ছবি আঁকিতে হইবে। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের (Wardsworth) ...ভাষায় ...'the light that never was on sea or land' এবং রবি ঠাকুরের ভাষায় 'আপন মনের মাধুরী' মিশাইতে হইবে বাস্তবের সংগে। ঐ জিনিসটি না মিশাইতে পারিলে বাস্তবতা হইতে পারে; কিন্তু সাহিত্য হইবে না।"

ধনপতি কহিল "বাঃ, আপনি বলেন বেশ। হাঁ, আরেকটা কথাও মনে পড়িয়াছে। আপনি থামিতে জানেন না, লেখক থামিতে জানে এবং এবং থামিতে জানাটা শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে মস্ত কথা।"

ভগবান কহিল "কথাটা যখন উঠাইলে তখন ভাল করিয়াই বলি। আমার সংগে লেখকের যেরূপ সম্বন্ধ, লেখকের সহিত পাঠকের সম্বন্ধও অনেকটা সেইরূপই। আমার ঘটনা সংস্থান অথবা ঘটনা পরম্পর্য—যাহাই বল না কেন—ঠিক শিল্প [...]কুমার (ইংরাজী ভাষায় artistic) নয়; [তাহা]র কারণ আমি যদি সকলই ঠিক করিয়া [দি]লাম লেখক করিবে কি? তাই লেখকের [...]নীকল্পনাকে ইংরাজী ভাষায় scope [...] দিবার উদ্দেশে [...] থামিতে জানি না এবং চরিত্রাবলী [...]লী এমনভাবে ছড়াই যে, হুবহু [...]কল করিয়া গেলে নকলই হই[...] হইবে না। অর্থাৎ আমি [...]বার জন্যও কিছুটা বাকী রাখি। [...]মনই পাঠকের কল্পনার বা সৃজনী-[...]ন্যও কিছুটা বাকী রাখিবার জন্যই [...] যায়। মানুষের কৌতূহলের সীমা নাই। [...]র চিরন্তন প্রশ্ন: 'তারপর'? পাঠকের [অ]নেকগুলি তারপরের জবাব দিয়া পাকা লেখক শেষকালে একটি তারপর অ-জবাবিত রাখিয়া থামিয়া পড়েন। সেখানেই পাঠকের কল্পনা পাখা মেলিয়া উড়িতে থাকে। তোমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উপন্যাসের উপসংহার এ ক্ষেত্রে বড় সুন্দর উদাহরণ হইবে। জলতরংগে ভাসিতে ভাসিতে অথবা ডুবিতে ডুবিতে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা কোথায় গেল প্রশ্ন করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র থামিয়া গেলেন। ভাবিয়া দেখ তো কি সুন্দর!"

ধনপতি কহিল "থামিতে জানার কথাটা তো আমিই উঠাইলাম। আপনি এমনভাবে বলিতেছেন যেন কথাটা আপনিই আমাকে প্রথম শুনাইতেছেন।"

ভগবান কহিলেন "কথাটা নহে বটে; কিন্তু কথাটার ব্যাখ্যা যে আমিই তোমাকে প্রথম শুনাইলাম, এটা স্বীকার কর তো?"

ধনপতি বিনীত কণ্ঠে কহিল "তা করি।"

অনুবাদসাহিত্য

উপনিবেশ

(অনুবাদ গল্প)

নীল্ বেল

বিশপ চিঠিখানা শেষ করে মুখ তুলে চাইলেন! অনেক দিনের পুরোনো বন্ধুকে লিখছিলেন! সে আজ অনেকদিন আগেকার কথা!! দুজনে এসেছিলেন এই পথে, তিনি রয়ে গেলেন লন্ডনেই, আর বন্ধুটি ভবঘুরে ছাঁচের, তিনি পাড়ি জমিয়েছিলেন সুদূর নিউগিনির কোন এক উপনিবেশে মিশনারীর কাজে।

আজ আবার সেই এক দৃশ্য! চিঠিখানা লেখা শেষ করে তিনি রেভাঃ পার্সি এপেল্‌বির হাতে দেন! কোন এক মায়ায় এরা দেশ ছেড়ে দূরে দূরান্তর পাড়ি জমায় তিনি বোঝেন না!

সবে এম এ ডিগ্রি নিয়ে বার হয়ে সে চলেছে এখান থেকে! সারাদেহে যৌবনের প্রাচুর্য, চোখ দুটোতে অস্বাভাবিক একটা জ্যোতি!! বিশপ প্রথম থেকেই যুবকটিকে ভালবেসেছিলেন! আজ সেও চলে যাবে!!

একা নয়! নববিবাহিত স্ত্রীও যাবে সঙ্গে! সভ্যজগতের মেয়ে, সোনালী চুলে দিনের আলো ঝলমল করে; ইসাবেল অবাক হয়ে চেয়ে থাকে দূরাপসৃয়মান নগরীর দিকে! ধীরে ধীরে মিশে যায়, কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশ কোলে মুছে যায় উঁচু চূড়োগুলো!! অস্পষ্ট কুয়াসার যবনিকা ভেদ করে চলে অন্তহীন সাগরের পানে!! ইসাবেলের চোখের কোল জলে ভরে আসে! পার্সির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মুখ ফিরিয়ে নেয়!!

ডেকটার উপর রোজই আড্ডা জমে! সারি সারি ডেকচেয়ারে, রেলিংএর ধারে কম্বল বিছিয়ে জমে খানিক ক্ষণের আড্ডা!! কার ডাকে ইসাবেল ফিরে চায়!! বিশ্বাসই করতে পারে না!! মেয়েটিও অবাক হয়ে চেয়ে থাকে তার দিকে। চোখের আনন্দের দ্যুতি ক্রমশ ম্লান হয়ে যায় দুজনেরই, মেয়েটি অপ্রস্তুত হয়ে বলে ওঠে —"মাপ করবেন, ঠিক চিনতে পারিনি, ভেবেছিলাম আমারই এক বন্ধু!"

ইসাবেলের হাসির শব্দে তার কণ্ঠস্বর ডুবে যায়—

"কেন, ছিলাম না আগে, এখন হতে আপত্তি কি থাকতে পারে?"

মেয়েটি হেসে ফেলে!

পার্সির বই পড়া বন্ধ হয়ে যায়, কেবিনটায় বেশ আড্ডা জমে উঠেছে! কদিনের মধ্যেই ইসাবেল জাহাজে কয়েকটি বেশ বন্ধুও জুটিয়ে নিয়েছে, সেদিনের মেয়েটি, সেও রয়েছেই দলে!! ডাক্তারের সঙ্গে চলেছে চেঞ্জে। সানবাঁধ বেড়ান তাও ভুলে যায়। চলেছে তাদের দিনগুলো সুন্দর সাবলীল, স্বচ্ছগতিতে।

কিন্তু চলল না। সেদিন ছিল সারা আকাশটায় সকাল থেকেই ছেঁড়া মেঘের আনাগোনা, ঢেউএর মাথায় মাথায় ক্রমশ সংঘর্ষ বেড়েই চলল। তারপর কোন এক অশুভ মুহূর্তে উঠল "হ্যারিকেন"; প্রশান্তমহাসাগরের বুকে। জাহাজ চলছিল তখন মিলেনীসিয়ান্ আর্কিপেলো থেকে প্রায় দুশ মাইল দূরে।

সে রাত্রির কথা তারা কেউ ভুলবে না! পার্সি বিস্ময়ে চেয়ে থাকে দিগন্ত বিস্তৃত সাগরের অশান্ত বুকের দিকে! আকাশের কালি মাখা রংএর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে!! রুদ্ধ গর্জনে!! তারা কোনমতে চলেছে ভাসতে ভাসতে!! জাহাজটা এতক্ষণে বোধ হয় প্রশান্ত মহাসাগরের অতলতলে তলিয়ে গেছে!! পার্সি ভাবতে পারে না এ রাত্রের কোন এক দুঃস্বপ্ন না সত্যি!

আবার সকাল হয়!! দিনকার মত সূর্য ওঠে!! তারা চেয়ে থাকে সমুদ্রঘেরা দ্বীপটার দিকে!! জনহীন দ্বীপ, সাদা বালিয়াড়ির প্রান্তে শুরু হয়েছে অযত্নবর্ধিত নাম না জানা তরুশ্রেণী! তা রোদে দাঁড়িয়ে থাকে নিঝুম নিথর হয়ে!! এখান থেকে উদ্ধার পাবার কোন উপায় নাই!!

স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধবার চেষ্টাই করতে হবে! দলের মধ্যে তারা মোটে দুজন!! পার্সি ইসাবেলা, সেই মেয়েটি এগ্নেস, (ডাক্তার হয়ত......তার এতক্ষণে তলিয়ে গেছে, যদিই বা বেঁচে থাকে এখন শাসাল রোগিনী হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার দুঃখে প্রায় আধমরা) আরও তিনজন তারাও নারী, পার্সি ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ আর কেউ নাই তাদের সঙ্গে!

নরম মাটি, কোন আজানা যুগ থেকে বুকে নিয়ে রয়েছে সৃষ্টির অপূর্ব ঐশ্বর্য! নীরব অতীতে ব্যাকুল নয়নে চেয়ে!! তার রুদ্ধ বিফল যৌবন আজ হয়েছে সফল, সার্থক!! মাটির মানুষ তার বুকে গড়েছে তাদের বাসভূমি, সন্ধান পেয়েছে তার ঐশ্বর্যের! মানুষ!! তারই সন্তান!!

পার্সিই দলের কর্ণধার, একমাত্র সারাদিনের তীব্র উত্তাপেও তারা চেয়ে থাকে!! নির্ধূম নীল আকাশ দূরে সীমাহীন সমুদ্রের বুকে সরলরেখায় মিলিয়ে গেছে!! সূর্য পশ্চিম দিগন্তের বুকে ঢলে পড়ে দিন শেষের খেয়াপারে! পার্সি ইসাবেল এগ্নেস ডোরা নীরব সন্ধ্যায় বড় ঝাউ গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে থাকে!!

এত নীরবতা তারা দেখেনি, নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়! মাঝে মাঝে ভেসে আসে বাতাসে সিন্ধু কল্লোল; বালিয়াড়ির বুকে চলেছে ভাঙ্গাগড়ার খেলা!! দিন শেষে হয় নেমে আসে রাত্রি!!

সমস্বরে তারা গেয়ে চলেছে, ঠিক দেশের মত আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে যেমন গাইত— "Amen—"

জীবনযাত্রা প্রণালীতে জটিলতা নেই এদের জগতে!! হত্যা করবার প্রয়োজন নাই, তাই অস্ত্রেরও দরকার নাই! মাটির বুকে এখানে জমে ফসল, বনের গাছে রাশিকৃত ফল!!

পার্সির কথাই সত্যি!! পৃথিবী থেকে দূরে তারা ছয়জনেই গড়ে তুলবে নোতুন পৃথিবী!! এই হবে তাদের জগৎ স্বতন্ত্র; সম্পূর্ণ; অথচ সুষ্ঠু!

এক বছর কেটে গেল দেখতে দেখতে!!

এর মধ্যে স্মরণীয় ঘটনা ঘটে নাই কিছুই, একমাত্র ইসাবেলের একটি শিশু এসে তাদের জগতে লোকসংখ্যা বাড়ান ছাড়া, সন্তান!! ইসাবেলা দুহাতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে!! পার্সিও কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়!!

গির্জার ঘণ্টাটা নীরব আকাশ ভরে তুলেছে দুজনের সমারোহ; নবাগত শিশু! তারা যেন অর্গ্যানটায় বাজিয়ে চলেছে 'ব্লু ডাবলিডের' একটা সুর! বাবা—মা!!

ইসাবেল প্রাণপণে নিজেকে সামলাতে পারে না, তার দুচোখ বয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুরাশি, নির্জন দ্বীপে শত শত মাইল দূরে রয়েছে তারা, সে দেশে আর কোনদিনই ফিরতে পারবে না!! পারবে না!

সবচেয়ে হয়েছে তাদের চিন্তার ব্যাপার, পরবে কি! যার যা ছিল পরনে, গেছে!! পার্সির সম্বল মোটে দুখানা শতচ্ছিন্ন পাজামা! মেয়েরাও এ ভাবে!!

পৃথিবীর ইতিহাস যেন পার্সির চোখের সামনে কতকটা ফুটে ওঠে! রোদের প্রখরতায়—তাদের দেহের রং তামাটে হয়ে গেছে, জলবায়ুর জন্যে সারা দেহে এসেছে একটা পরিবর্তন!! হাতের পেশীগুলো মোটা হয়ে উঠেছে! সারা দেহে আর সেদিনের সৌন্দর্য নাই, সভ্য জগতের মেয়েদের মত চালচলন তারা ভুলে গেছে! তাদের গতিতে এসেছে প্রাণস্পন্দের পরিচয়; সারা দ্বীপের মাঝে যেখানে তারা এসে

পড়েছিল যে মন নিয়ে, তা আজ কোনদিকে চলে গেছে!! আদিম যুগের কোন নিওলিথিক এজের মত তারা আবার শুরু করেছে তাদের জীবনযাত্রা! পার্সিকে দেখলে আর চেনা যায় না, সারা মুখ দাঁড়িতে ঢেকে আসছে!! আদিম যুগের মানুষ তারা, দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে আসে মনেরও কতক পরিবর্তন!

নবাগত শিশু বেড়ে চলেছে!! সঙ্গে সঙ্গে চলেছে দিন, দিনের পর মাস!

সেদিন কি তিথি জানে না পার্সি! চাঁদটি অনেকখানিই বড় হয়ে রয়েছে! নির্জন সমুদ্রের দূরদিগন্তে ঢেউএর মাথায় মাথায় ফসফরাস চকমক করে!! বালিয়াড়ির বুকে আছড়ে পড়ে সোনা রংএর ঢেউ!! আবার আসে তারা—আবার! বারে বার!! নির্জন আকাশ বাতাস, নাম-না-জানা পাখীর ডাক আর ঢেউএর রুদ্ধ গর্জনে ভরপুর!

ছোট জগৎ! খ্যাতি সম্পদ মান সম্মান তারই জন্য সে দেশ ছেড়ে বার হয়েছিল নিউ-গিনীর কোন এক উপনিবেশে, আজকের পরিবর্তনটায় অবাক হয়ে যায় পার্সি!

সহসা কার পায়ের শব্দে পার্সির চিন্তা-জাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়!

হাসির আভায় মুখখানা ভরিয়ে তোলে এগ্নেস!

বিরক্ত করলাম তো!

পার্সিকে কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে বেপরোয়াভাবেই বসে পড়ে বালিয়াড়িতে!

তার ডাক্তার এ' দিনে বোধ হয় রোগিনীর শোক ভুলেছে এগ্নেসকে আর চেনা যায় না, সারা দেহে যৌবনের কল্লোল, সাগরের ... মধু গতিতেই বয়ে চলেছে! চাঁদের আলোয় নিটো... নিরাভরণ দেহের প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে কি ... অপূর্ব সম্পদ লুকানো রয়েছে! সম্পদ ...ষ্টির ইতিহাস!

স্বপ্ন জাগে! এপিক! মহাকাব্য! পৃথিবীর ইতিহাসে এরাই তার উপকরণ! মাটি আর মানবী! জীবনের মহাকাব্য! নোতুন মাটিতে ফসল ফলাল, এল সঙ্গে জীবনের জোয়ার! পার্সির জগতের সেই নায়ক! মানুষ বার হয় দেশ দেশান্তরে! আমেরিকার দিকহীন প্রেহরীর প্রান্তরে! আফ্রিকার কোন নিভৃত বনানীতে! মধ্য এশিয়ার বনসমাকীর্ণ মরুপ্রান্তে মানুষ এল! নোতুন জগতের হ'ল সৃষ্টি! কামনা অনির্বাণ দীপশিখা অন্ধকার বন-প্রান্তে ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসেও নিভে যায়নি! শেষ হয়নি জীবনের মহাকাব্য! চলে আসছে—চলছে—চলবে!!

এগ্নেস অনেক কিছু বলবার চেষ্টা করে, তার বাঁধ ভাঙ্গা হাসির জোয়ারে পার্সি কেমন যেন হারিয়ে ফেলে নিজেকে!

"পিটার অনেক বড় হয়ে উঠছে!"

ঘাড় নাড়ে পার্সি! এদের জন্মতে সে নবাগত! ইসাবেলের সন্তান!



"ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি"

পার্সি সরে বসবার চেষ্টা করে, তার কাঁধের কাছেই স্পর্শ পায় সে এগ্নেসের অনাবৃত বাহুমূলের! তার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস পড়ে পার্সির গায়ে!

এগ্নেসের চোখে আজ চাঁদের আলোয় দেখা যায় কামনার তীব্র জ্বালা! পার্সির সারাদেহে জাগে একটা শিহরণ! প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করে এগ্নেসের সবল বাহু বন্ধন থেকে!!

এগ্নেস অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে! হাঁফা' রুদ্ধ আবেগে! পার্সি নিজেকে মুক্ত করে ...লে যায় সেখান ...থকে! এগ্নেসের সারা...হে মনে লেগেছে উত্তাল সিন্ধুর স্পর্শ! বালিয়াড়িতে ব...সে কি যেন ভাবতে থাকে

দি... যায়, পা... সেদিন থেকেই বুঝতে পারে একটু পরিবর্তন! সকলের মধ্যেই! কেবল ...বেল ছাড়া, সে পিটারকে নিয়েই ... নিজের কাপড়ের টুকরো দিয়ে তা... সাজাবার চেষ্টা করে! ছেলেটার হাসির শ... ইসাবেল সব কিছু ভুলে যায়!

...োরা এগ্নেস মার্থা! সেই ছোট মে...া তার মধ্যেও এসেছে একটা পরি...র্তন! সেদিন অন্ধকার রাত্রে ডোরা এক ...কম ইচ্ছা করেই পার্সির গায়ে ধাক্কা মে... বসল! এড়াবার চেষ্টা করে পার্সি, কি...ন্তু কখন যে অযাচিতভাবে তারা আসে জ... না!

সকলেই হাসতে থাকে! এগ্নেস—ডোরা —মার্থা সকলেই! পার্সির কথা আজ যেন ...রা মানতে রাজী নয়! পার্সি শাসনের ...ুরে বলে—"আমার কথা মানতেই হবে!"

এগ্নেস চোখ দুটো তার দিকে তুলে জবাব দেয়, আমরা কি মানছি না! ভাল করেই মানব কিন্তু—"

কথাটা আর শেষ হয় না! বাকী সকলেই হেসে ফেলে! পার্সি অবাক হয়ে চেয়ে থাকে তাদের দিকে! রাগ করবে না সেখান থেকে চলে যাবে তাও বুঝে উঠতে পারে না!

দিকহীন সমুদ্রের রংএ রোদ মিশে আকাশ ভরিয়ে তুলেছে! বালিয়াড়ির বুকে সাদা ফেনার রাশি রোদে ঝলমল করে! ঘননীল ঢেউএর মাথায় মাথায় চলেছে সামুদ্রিক পাখীদের লুকোচুরির খেলা!

ইসাবেল পিটারকেনিয়ে সমুদ্রের দিকে এসেছে! দুরন্ত বালক বালিয়াড়ির বুকে বসে মাথায় গায়ে বালি ছিটিয়ে চলেছে! বুক অবধি গা ডুবিয়ে ইসাবেল অনুভব করে সমস্ত দৃশ্যটাকে! লজ্জার বালাই নাই! অনাবৃত দেহে সমুদ্রের নীলজল যেন নীলাম্বরীর শোভা এনে দিয়েছে! অবাক হয়ে থাকে নিজের দিকেই! বার বার চেয়ে আশা মেটে না! সুন্দর—সে এত সুন্দর!!

এগ্নেসকে আসতে দেখে মুখ তুলে চাইলো! বালিয়াড়ির উপর থেকে পিটারকে নিয়ে এগিয়ে আসে সে! ইসাবেল শুনে চলেছে তার কথাগুলো—"পিটার অনেক বড় হয়ে উঠছে তার নাকি সঙ্গীরও দরকার! আর ছেলেরা—ছেলেদের সঙ্গে খেলতেই ভালবাসে!"

ইসাবেলার মুখে ফুটে ওঠে একটু সলজ্জ হাসি! কিন্তু পরক্ষণেই তা মুছে যায় নিঃশেষে! এগ্নেসের কথাটা তার কানে বিশ্বাস হয় না, রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রশ্ন করে—'সত্যি'!

হাসে এগ্নেস!—"হ্যাঁ শীঘ্রই পিটার তার সঙ্গী পাবে! আর কোন ছেলে না হয় মেয়ে!"

স্বপ্নাবিষ্টের মত জল থেকে উঠে আসে ইসাবেল, তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে এগ্নেসের অনাবৃত দেহের দিকে চেয়ে থাকে!...সাড়া! মুকুলিত যৌবনের প্রথম স্পর্শ! এগ্নেস বলে চলেছে"—সারা দ্বীপে পার্সিই একমাত্র—

সে যে আমার স্বামী। তা হয় না, হতে পারে না, তাকে আমি তোমাদের কথা বলব না—বলতে পারব না।"

হাসে এগ্নেস—"কেন সভ্যজগতে অনেক-বার বিয়েই ত হয়।"

ইসাবেলের চোখ দিয়ে জল বার হয়ে আসে —"পিটারকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে—'না—না'। দয়া কর তোমরা। এ হতে পারে না। কখনও না। এ আমি হতে দোব না।"

উদ্গত অশ্রুরাশি চাপতে চাপতে চলে যায় ইসাবেল। হাসে এগ্নেস—"দয়া।"...... ডোরা মার্থা সকলেই হাসে। নিয়ম তাদের তৈরি, এ যে তাদেরই উপনিবেশ।

এক কলমের আঁচড়ে দীর্ঘ ষোল বছর কেটে গেল। একটার পর একটা করে। একদিন কোস্টগার্ডের, ওয়ারলেস সেটে একটা খবর পাওয়া যায়...স্টিমসিপ 'আনাম' খবর পাঠাচ্ছে ...তারা নাকি ঝড়ের বেগে মেলোনিসীয়ান আর্কিপিলেগোর নিনিগো দ্বীপ থেকে প্রায় ২৫০ মাইল উত্তর পূর্ব কোণে একটা নাম-না-জানা ছোট দ্বীপের কাছে গিয়ে পড়ে। সেখান থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে নেমে গিয়ে উদ্ধার করেছে পাঁচজন বৃদ্ধা আর নিম্ন বয়সের প্রায় ৭৪ জন ছেলেমেয়ে যুবকযুবতীকে। অপিসে সংবাদপত্রে একটা চাঞ্চল্য পড়ে যায়।

দ্বীপ থেকে জাহাজখানা যাত্রা করেছে।... ডেকের উপরে তারা অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে। ক্রমশ দ্বীপের বাসিন্দারা আর ভাল করে দেখতে পায় না দ্বীপটাকে।

দুজন নাবিক কথাবার্তা কয়ে চলেছে। বার্ট বলে চলেছে......"কেন বা চাইবে ওরা আসতে ওখান থেকে প্রচুর খাবার, তাছাড়া কোন কাজই করতে হয় না। আমাকেই যদি কেউ থাকতে বলে অনায়াসে পারি।" পাইপটার দীর্ঘ টান দিয়ে চলেছে। লেসলীর কথায় মাথার টুপিটা খুলে হাওয়া করবার চেষ্টা করে। জবাব দেয় বার্ট —"দেখব আবার কি।...মাঠের মধ্যে কার যেন কবর রয়েছে ইংরাজি ঠিক বুঝি না কি যেন লেখা রয়েছে রেভারেণ্ড পার্সি নয় কি, ছাই হবে।"

"রেভারেণ্ড পার্সি।"—লেসলী হাসতে থাকে! বার্ট পাইপটার লম্বা টান দিতে দিতে চেয়ে থাকে দূরাপসৃয়মান দ্বীপটার পানে, সেটাকে আর দেখা যায় না।—অস্পষ্ট দিগন্তসীমায় মিলিয়ে গেছে।......

ডেকের এক কোণে একটি বৃদ্ধা, নীল কোটরাগত চোখ থেকে উদ্গত অশ্রু মুছবার চেষ্টা করে। ও যেন কার জীবনের ইতিকথা—মরণের সত্যতায় কখনও মুছে যায় না।

অনুবাদক—শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু।



ইনি চোরা বাজার ধ্বংস করতে সাহায্য করছেন

ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট কর্তৃক প্রচারিত

AAA 1384B

বাঙালা। [illegible]
সুতরাং দুর্ভিক্ষটা সেখানে [illegible] তা-ই
নূতন নয়। কোন নূতন [illegible] দিয়ে
পারিয়া এই অন্তঃপুরো [illegible] দিকে এক-
সত্যি কথাটাকেই তাঁর [illegible] আজকাল।
করাতেই হয়ত শ্রোতৃমণ্ডলী [illegible] পরিচালক, তারকা
শঙ্করকে "দুয়ো" "দুয়ো" [illegible] এতো চলে
এবং অতঃপর [illegible] এখনকার নতুন
অবলম্বন করেন। [illegible] নিয়ে। তিনটে
চিরকালই পালাইয়া [illegible] যুগপৎ মুক্তিলাভ
সুতরাং এই পলায়ন [illegible] মাত্র এক সপ্তাহ শেষ
নূতন নয়। [illegible] সপ্তাহে' পড়ে কোন

* * [illegible]। আর এটা লোককে

শক্তি সম্মেলনে [illegible] কি? সুতরাং একরকম
পাঠ করিলাম; [illegible] তে হয়! এইভাবে সব
সংগ্রহের মতো [illegible] দেখছি 'রজত-জয়ন্তী'
উপকূলের বরাদ্দ [illegible] তী' হ'য়ে চলেছে।
দুর্লভ হইয়াই [illegible] দের সঙ্গে জনগণের
বলিতেছেন [illegible] কোথায় তারা কাপরে পড়ে
সিসকোতে [illegible] ছবিখানির কদর হচ্ছে কি
ব্যবস্থা হইবে [illegible] দপেই কদর করবার মত
পারিবে; কিন্তু [illegible] কি-না তাতে! ছবির প্রতি
বর্তিত হইবে [illegible] করার পন্থার তো কোন
না। তাছাড়া [illegible] র ওপর এই মিথ্যা ভাষণ ও
নিশ্চয়ই এত [illegible] না নিলেই কি নয়? এই
আর তিনিই [illegible] পক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যে যে-
আমাদিগকে [illegible] ই চিত্রগৃহে দীর্ঘকাল চলে
ভাষাটা মাস [illegible] যাপন করে নিজেদের গুণের

* [illegible] লির ওপরেও লোকের বিশ্বাস
[illegible] 'সন্ধি' ছবিঘর, মিনার ও

কেন্দ্রীয় [illegible] একই দিনে মুক্তিলাভ ক'রে
বেপরো [illegible] য় সতের সপ্তাহ পার হ'য়ে কি
ইয়া [illegible] সবে 'সুবর্ণ-জয়ন্তী' পালন
অবশ্য [illegible] দয়ের পথে'ও চলেছে এই
কাতুহল [illegible] কিন্তু এখানে আর এক বৈচিত্র্য—
বিশেষ [illegible] র তরফকার বিজ্ঞাপনে দেখছি
সপ্তাহ' আর বিতরণেরটাতে '২৪শ'—
[illegible] ছবির বিজ্ঞাপন একই কাগজে এই-
[illegible] বের হ'লে কোনটা বিশ্বাস করবে
[illegible]? এই সৃষ্টিছাড়া হিসেব থেকে
[illegible] দের রেহাই দেবার জন্যে বঙ্গীয়
[illegible] চিত্র সংঘের পাণ্ডাদের দৃষ্টি আকর্ষণ
[illegible] ছি।

পর্বত পে অপ্‌না ডেরা (রাজকমল কলা-
মন্দির)—কাহিনী, সংলাপ ও গান ঃ
[illegible] ওয়ান শারার, পরিচালনা ঃ ভি শান্তা-
রাম, আলোকচিত্র ঃ ভি অবধূত, শব্দ-
যোজনা ঃ এ কে পারমার, সুরযোজনা ঃ
বসন্ত দেশাই; ভূমিকা ঃ উল্লাস, বনমালা,
শান্তারাম, মদনমোহন, বিজয়া, বেবী নলিনী
প্রভৃতি। কাপুরচাঁদের পরিবেষণায় ছবিখানি
২রা মার্চ থেকে প্যারাডাইস ও ছায়াতে
দেখান হচ্ছে।

[illegible] চিত্রে বৈচিত্র্য আনা বিষয়ে শান্তারামের
জুড়ী এখন আর কেউ নেই। কি বিষয়
নির্বাচনে, আর কি রূপদানে, শান্তারামের



প্রত্যেক ছবিই অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্যে স্মরণীয় অবদান হয়ই। 'পর্বত-পে অপ্‌না-ডেরা'তে তার ব্যতিক্রম হয়নি যদিও গোড়াতেই স্বীকার ক'রে ফেলতে হ'চ্ছে যে 'আদমী' ও 'পড়শী'র সে স্ট্যাণ্ডার্ড শান্তারাম বজায় রাখতে পারেননি। সহজে লোকের মনতুষ্টির মত সস্তা জিনিস আমদানী ক'রে ছবির আর্থিক সাফল্যের দিকে নিশ্চিত হওয়ার দিকেই শান্তারামের যেন ঝোঁক বেশি—নিজস্ব প্রতিষ্ঠান কিনা!—'শকুন্তলা' থেকেই এ পরিচয় পেয়ে আসচি। এই কারণেই বোধহয় সত্যিই বিচিত্র এবং চমৎকার একটা বিষয়বস্তু হাতে নিয়ে তার রূপটা অসাধারণ ক'রে তুলতে গিয়েও আটকে গিয়েছেন—প্রযোজনা, পরিচালনা এবং তদোপরি ছবির পরিবেষণার কাজ একসঙ্গে সামলাতে গিয়ে কল্পনা প্রবাহে ভাটা পড়ে যাচ্ছে না তো? 'সীরিয়াস' বিষয়বস্তু এবং তার মধ্যে কোন ফাঁক না থাকতেও জোর করে হাস্যরসের জিনিস দিতে গিয়েই কাল হ'য়েছে। প্রথম নজর থেকেই ছবিখানি যে অসাধারণ কিছু সে ছাপ মনে ধরে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তা বজায়ও থাকে কিন্তু তবুও তেমন তুষ্টিলাভ হয় না।

কাহিনী হচ্ছে এক সাধুর—যে একটি তরুণীর দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয় এবং শেষে সেই তরুণীরই প্রেমে পড়ে পাহাড়ের চূড়াবস্থিত তার আশ্রম ছেড়ে নীচে নেমে চলে আসে এবং তাকে বিবাহ করে' ক্রমে তার নৈতিক পতন আরম্ভ হয় এবং সুরা আর নারীই তার জীবনের একমাত্র আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য একদিন সে তার হুঁস ফিরে পায় এবং ভুল বুঝতে পারে।

কলাকৌশলের কারসাজীই হ'চ্ছে ছবিখানির সবচেয়ে বড় গুণ, এদিক থেকে এর তুলনা কমই পাওয়া যাবে। আলোকচিত্র, শব্দযোজনা, সাজসজ্জা ছবিখানির গৌরবের জিনিস; সংলাপ এবং গান বিশেষ আকর্ষণ। প্রধান ভূমিকায় উল্লাস চেহারায় মানালেও ভূমিকার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। নায়িকা বনমালার অভিনয়ই ফুটেছে সবচেয়ে চমৎকার। আর ছোটখাটো ভূমিকাগুলির অভিনয়ও ফুটে উঠেছে বেশ। সব মিলিয়ে ছবিখানিকে বছরের একটা শ্রেষ্ঠ অবদান বলতেই হবে, সব ত্রুটি সত্ত্বেও।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

দু'খানি উল্লেখযোগ্য ছবির মুক্তি হ'চ্ছে এই সপ্তাহে। একখানি হ'লো শান্তরামের 'পর্বত-পে-অপ্‌না-ডেরা' যার সমালোচনা এই সঙ্গে দেওয়া হ'য়েছে, আর অপরখানি হ'চ্ছে শৈলজানন্দের পরিচালনায় কালি ফিল্মসের ছবি 'অভিনয় নয়'। এ ছবিখানি প্রায় বছরখানেক ধরে মুক্তি প্রতীক্ষায় ছিল; শৈলজানন্দের এটি চতুর্থ অবদান এবং আগের তিনখানি ছবিতেই সাফল্যলাভ ক'রে তিনি পরিচালক হিসাবে যে আসন ক'রে নিয়েছেন তা 'অভিনয় নয়'তে আরও উঁচুধাপে উঠবে মনে হয়।

* * * *

আগামী ১৭ই মার্চ জয়ন্ত দেশাই প্রোডাকসন্সের 'সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত' এলিট সিনেমাতে মুক্তিলাভ ক'রবে। এলিটে দিশী ছবি এই প্রথম।

বিবিধ

সরকারী নতুন আইন হয়েছে—প্রচার-চিত্র মুক্তি দেবার আগে দিল্লী থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। কাহিনী তো ছবি তোলবার আগে অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়ই, তার ওপরেও এই কড়ার।

* * *

বম্বে টকীজের নতুন গোলমাল না মিটলে দেবিকারাণী কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং তাঁকে চক্রবর্তী কণ্ট্রোলার অব প্রোডাকসন্সের পদে অধিষ্ঠিত হবেন বলে কথা উঠেছে।

* * *

বাঙলার নবতম সংগীত পরিচালক এবং বিখ্যাত ঠুংরীগায়ক শচীন দাস (মতিলাল) গত ২১ তারিখে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হ'য়েছেন। বম্বের অভিনেতা সুরেন্দ্র আগামী ৩রা মার্চ লাহোরের এম-এ ক্লাসের ছাত্রী সত্যা ঋষির সঙ্গে পরিণীত হবেন—সুরেন্দ্রের এটা দ্বিতীয় পক্ষ।

* * *

লক্ষ্মীদাস আনন্দ শ্রীমতী কাননকে নিয়ে 'কৃষ্ণলীলা' নামক যে ছবিখানি তুলবেন তার পরিচালনাভার সম্ভব হ'লে দেবকীবাবুর ওপরে দেওয়া হবে, নয়তো অন্তত চিত্রনাট্যটাই তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হতে পারে।

বাবুরাও প্যাটেল একখানা প্রচার-চিত্র তোলার লাইসেন্স পেয়েছেন। এরও প্রধান অংশে থাকবেন সেই সুশীলারাণী।

নিউ থিয়েটার্সের সবচেয়ে পুরনো আলোকচিত্র-শিল্পী ইয়ুসুফ মুলজী বম্বের প্রকাশ পিকচার্সে যোগদান ক'রেছে—কারণ, তাকে ডিঙিয়ে অন্যকে পরিচালনার সুযোগ দেওয়া হ'য়েছে।

রজত জয়ন্তী উৎসবে—

অভিনয় সুষমামণ্ডিত

সানরাইজ পিকচার্স-এর

অনবদ্য সামাজিক কথা-চিত্র

মা বাপ :: মা বাপ

—শ্রেষ্ঠাংশে—

বীণা, নাজির, ইয়াকুব, জগদীশ, দীক্ষিত, মির্জা মুসারফ, আমীর কর্ণাটকী

* * *

হাসি-কান্নার ভিতর দিয়া মনের অন্তস্তলে যা সাড়া দেয়—যা দেখিবার জন্য মন-প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠে—যা দেখিতে দেখিতে সমাজ এবং সভ্যতার প্রতি জাগে বিদ্রোহ। এখনও না দেখিয়া থাকিলে আজই দেখুন—

সগৌরবে প্রদর্শিত হইতেছে

সিটী ও প্যারামাউণ্টে

প্রত্যহ : ৩টা, ৬টা ও ৯টায়

—প্রত্যহ—

১৬শ সপ্তাহ ২॥, ৫॥ ও ৮॥টায়

বম্বে টকীজের

অভাবনীয় সাফল্যমণ্ডিত নিবেদন

জোয়ার ভাঁটা

—শ্রেষ্ঠাংশে—

মৃদুলা, শামীম, দিলীপ, আগাজান

জ্যোতি সিনেমা

রমলা

(তলোয়ারের সৌজন্যে)

জয়ন্ত দেশাই-এর হাস্য ও প্রণয়মূলক চিত্রে গ্রাম্য বালিকারূপে অপূর্ব অভিনয় করিয়াছেন !

লা ল কা র

শ্রেষ্ঠাংশে—ঈশ্বরলাল, মোবারক

প্রত্যহ : বেলা ৩টা, ৬টা ও রাত্রি ৯টায়

৭ম সপ্তাহ মিনার্ভা

চক্ষু ও কর্ণের তৃপ্তিসাধক

সিলভার ফিল্ম-এর মুশ্লিম সামাজিক চিত্র

বড়ে নবাব সাহেব

চন্দ্রমোহন — কুমার — বিব্বো

প্রমীলা — পাহাড়ী সান্যাল

প্রভাত ও ম্যাজেষ্টিক

প্রত্যহ—৩টা, ৬টা ও রাত্রি ৯টা ৪র্থ সপ্তাহ !

২রা মার্চ থেকে

একত্রে

প্যারাডাইস ও ছায়া

শান্তারামের

পর্বত-পে অপ্‌না-ডেরা

গণেশ প্রত্যহ : ৩টা ৬টা ও ৯টা

৪র্থ সপ্তাহ

কীর্ত্তি পিকচারের

ব রা ত

শ্রেষ্ঠাংশে : শোভনা সমর্থ

চিত্র-তারকাদের মত আপনার ত্বক্ রক্ষা করুন!



মনোরমা

মনোরমা বলেন "[illegible]মার ত্বক যে সর্ব্বদা তরুণ ও কমনীয় দেখায় তার সমস্তটাই লাক্স [illegible]লেট্ সাবানের কল্যাণে।" প্রায় সব ভারতীয় চিত্র-তারকাদের মত [illegible]তনি এই বিখ্যাত সৌন্দর্য্য-সাবান নিয়মিত ব্যবহার করেন। তিনি [illegible]লেন "লাক্স টয়লেট্ সাবানের কার্য্যকরী ফেণা কি করে ত্বককে দা[illegible] মুক্ত রাখে, এটা সত্যই আশ্চর্য্য।"



লাক্স টয়লেট্ সাবান

LTS. 123-111-40 BG. LEVER BROTHERS (INDIA) LIMITED

সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস : সিলেট

কলিকাতা অফিঃ ৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট্

কার্যকরী মূলধন

এক কোটী টাকার উর্দ্ধে

জেনারেল ম্যানেজার—জে, এম, দাস

শাইকো

খোস, একজিমা, হাজা, কাটা, ঘা, পোড়া ঘা নালীঘা, ফুস্কুড়ি চুলকানি, ও চুলকানিযুক্ত সর্ব্ব প্রকার চর্ম্মরোগে অব্যর্থ

এরিয়ান রিসার্চ ওয়ার্কস

পি১৩ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ (নর্থ)



[১৪]

(দ্বিতীয় পর্যায়)

নানা কথা—নানা লোক

জীবনের মোড়ফেরা

বলেছি কাশিয়াবাগান আমাদের বহু আত্মীয় সমাগমের একটা আড্ডা ছিল। যোড়াসাঁকোর সবাই প্রায় আসতেন। আত্মীয় ছাড়া কুটুম্বদেরও নিত্য আগমন ছিল। মোহিনীবাবুর চারটি ভাই আপনার লোকেরই মত আনাগোনা করতেন। তার মধ্যে তাঁর দ্বিতীয় ভ্রাতা রমণীবাবুর সঙ্গে সরোজাদিদির ছোট বোন ঊষাদিদির বিয়ে হয়ে গেল। রমণীবাবু আত্মীয়শ্রেণীভুক্তই হয়ে গেলেন এবং আজীবন আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কবান রইলেন। মোহিনীবাবু যখন বিলাত প্রবাসে, রমণীবাবুই তখন তাঁদের বৃহৎ পরিবারটি পালন করতেন। আমার বাবা-মশায়ের সাহায্যে তিনি মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে একটি বড় চাকরী পেলেন। তাঁদের চতুর্থ ভ্রাতা রজনীর আবিবাহ কাশিয়াবাগানে আনাগোনা ছিল। তখন তার ছাত্রজীবন। পড়াশুনায় খুব ভাল ছিল——আর আমাদের নানা বই থেকে মুখে মুখে গল্প শোনাত। আইভানহোর গল্প বোধহয় প্রথম তার কাছে শুনি, পুকুরে একটু একটু সাঁতার দিতে সে-ই শেখায়। আমি তখন ছোটর দলে, তার বেশী ভাব ছিল দিদির সঙ্গে। কলেজে পড়তে পড়তেই বোধ হয় তার গগনদাদাদের ছোট বোন সুনয়নীর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হল। কাশিয়াবাগানে আনাগোনা কমে এল। যে রাত্রে তার বিয়ে, আমরা যোড়াসাঁকোর বাইরের বারান্দা থেকে খুব ঘটা করে, গ্যাসগেলাসের বাতি জ্বালিয়ে, গড়ের বাদ্যি বাজিয়ে বর-আগমন দেখলুম। বর জুড়িঘোড়ার গাড়ীতে বসা, মাথার উপর ছত্র ধরা—দেখতে খুব সুন্দর, সব ভাইদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে গৌরবর্ণ। গাড়ীর থেকে নেমে ৬।১, নম্বরের অন্তঃপুরে সে যে প্রবেশ করল—সেই অবধি অন্তরাল হয়ে গেল আমাদের চোখের থেকে ও জীবনের থেকে। গগনদাদাদের সঙ্গে যোড়াসাঁকোর এ বাড়ীর সামাজিকভাবে মেলামেশা নেই, আদান-প্রদান নেই, তখন পর্যন্ত—প্রাইভেট-ভাবে ছেলেদের যাতায়াত থাকলেও। পাথুরেঘাটার, কয়লাহাটার ও মদনবাবুদের বাড়ীর পুরুষ ও মেয়েরাই তাঁদের বেশী আপন—মহর্ষির বাড়ীর সবাই রক্তেতে নিকটতর হলেও ব্যবহারে পর। অথচ একদিন এল যেদিন এই রজনী ও সুনয়নীর মেয়ের সঙ্গেই দ্বিপুদাদার ছেলে দিনুর বিয়ে হল। দিনুর সেই প্রথমা পত্নী। তার অকালমৃত্যুর পর দিনুর দ্বিতীয়বার বিবাহ হল মদনবাবুদের বাড়ীতে। ঠাকুর গোষ্ঠীর এমন একটি ঘরে যাদের সঙ্গে সামাজিকতা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কাল যেমন নিকটকে দূর করে, তেমনি আবার দূরে সরাকে কাছেও টেনে আনে। গগন দাদাদের বড় বোন বিনয়নীরই মেয়ে প্রতিমা—রথীর স্ত্রী। সে কিন্তু অনেক পরের কথা। সুনয়নীর সঙ্গে বিয়ের পর থেকে রজনী ঘরজামাই হয়ে সেই যে ৬।১নং এ বাস করতে লাগল—আর আমাদের সঙ্গে তিলমাত্র সম্পর্ক রইল না। ওবাড়ীর মেয়েদেরই মত সেও অসূর্যম্পশ্য হল এ বাড়ীর সম্পর্কিত সকলের। তখনো তার ছোট ভাই সজনী ও সেজদাদা যোগিনীর কিন্তু মোহিনী রমণীবাবুদের সঙ্গে সঙ্গে কাশিয়াবাগানে সমান গতিবিধি রইল। যোগিনীর শুধু গতি নয়, একেবারে স্থিতি বল্লেও চলে। মোহিনীবাবু সুবিজ্ঞ, সুপণ্ডিত; রমণীবাবু প্র্যাকটিক্যাল কমন-সেন্সবান—তিনিও পড়াশুনায় অগ্রণী, তখনই বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপক। এণ্ট্রান্সের সময় ইংরেজী বইগুলিতে তিনি আমাকে খুব তৈরী করে দিয়েছিলেন। সজনী ছেলেমানুষ, পাগলাটে, পরে বোধহয় একেবারেই পাগল হয়ে গিয়েছিল। আর যোগিনী—কি বলব? কখনো একান্ত মৌন—তখন দাদারা ঠাট্টা করতেন—"পিঞ্জরে বসিয়া শুকে মুদিয়া নয়ন, কি ভাবিছ মনে?" চটত না কিন্তু, একেবারে নির্বিকার। কখনো খুব বাক্যবাগীশ। দশ পঁচিশ প্রভৃতি খেলায় যে দানটা চায়, ঠিক সেইমত কড়ি ফেলতে একেবারে সিদ্ধহস্ত। তর্কে ও তাসে তাকে পরাস্ত করা প্রায় অসম্ভব। জীবনের শেষভাগে আমার মায়ের সাহায্যে বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছিল। একটা কোন আশা নিয়ে গিয়েছিল। সে আশা পূর্ণ হবার নয় তাও জেনেছিল সেখানে থাকতে থাকতেই। ব্যারিষ্টার হয়ে হাইকোর্টে যাতায়াত করত; কিন্তু জীবিকা অর্জন তার ব্রিজ খেলার জিতের উপরই বাঁধা ছিল। বিলেত থেকে ফেরবার আগে সকলের অগোচরে এক মেমকে বিয়ে করে তাকে ও একটি কন্যাকে রেখে এসেছিল নিজের রোজগারে তাদের পালন পোষণ করত, সে বিষয়ে কর্তব্যশীল ছিল, কেবল স্বভাব-সুলভ মৌনবৃত্তি অবলম্বন করে পাঁচজনকে জানায়নি। অনেক পরে মায়ের মৃত্যুর পর এক ডাগর কন্যা যখন জলসমুদ্র-করে কলকাতায় উত্তীর্ণ হয়ে, মোহিনীবাবুদের গৃহে উপস্থিত হ'ল তখন সকলে জানতে পারলে। মেয়েটি খুব ভাল, এখন লেডি ডাক্তার। আর একজনকে মনে পড়ে, সে-ও আপন লোকের মত অকাতরে আসা-যাওয়া করত। সে হচ্ছে অবিনাশ চক্রবর্তী—কবি বেহারী চক্রবর্তীর অতি আদরের বড় ছেলে। তার উপর বেহারীবাবুর একটি কবিতা ছিল—"বাছনি আমার"—তাই দিয়ে সে সকলের পরিচিত। ভারি সরল, ভারি সাদাসিদে ও ভারি সঙ্গীত-প্রিয় ও সঙ্গীতের রসজ্ঞ সে। আমি একদিন একলা বসে বসে আপন মনে পিয়ানোতে বিথোভনের প্রসিদ্ধ ক্লাসিকাল রচনা—"Moon-light Sonata" বাজাচ্ছিলাম। সে পাশের ঘরে বসে চুপ করে শুনছিল। আমার বাজনা শেষ হয়ে গেলে আমার কাছে এসে বল্লে—"মরি! মরি! কি সুন্দর।" তার পরদিন আমার উপর একটি কবিতা লিখে নিয়ে এসে আমায় উপহার দিলে—"প্রাণের বোনটি আমার সরলা সুন্দরী।" তার আশা যাওয়া ক্রমে

কমে এল, একেবারে বন্ধ হল। শেষে নাকি সে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল।

কাশিয়াবাগানে আর এক পরিবারের নতুন করে যাতায়াত আরম্ভ হল—সে আশু চৌধুরী ও তাঁর অনুজদের। এঁদের ভিতর আর এক রকমের চটক ছিল সেকালের "আধুনিকতা।" যত না পাবনাই এঁরা, তারচেয়ে বেশী কৃষ্ণনাগরিক। এঁদের বাঙ্গলা উচ্চারণে সেই মনোমোহন-লালমোহন-ঘোষীয়তা, ঐ দুই ভাইয়ের মতই এঁদেরও বচনপ্রাচুর্য। এঁদের মনস্তত্ত্ব অনেক নতুন ভাবের রাজ্যে ঘোরাফেরার গাঁথুনির উপর দাঁড়ান। সব ভাইদের মধ্যে আশুবাবুই সবচেয়ে চটকদার। তাঁর ভিতর এমন একটি মোহিনী ছিল, যাতে সবাইকে বশ করতেন। তাঁদের সেজভাই কুমুদবাবুরও সেটা কতক কতক ছিল।

এঁরা ছাড়া লোকেন ত আসতই—যখনি ছুটী পেত। চৌধুরী ছোট ভাইদের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না আগে, এখানে হল। আশুবাবু কিন্তু তার পরম বন্ধু বিলেত থেকেই। এঁদের সকলের আসাযাওয়ার সমসাময়িক আমার লেখার হাত খুলে যাওয়া।

অন্যত্র একবার বলেছি—'বালকে' প্রকাশিত আমার প্রথম প্রথম রচনা উদ্যমের পর ভারতীতে 'প্রেমিক সভা' বলে অস্বাক্ষরিত হাস্যরসান্বিত একটি লেখা লিখে Byron-এর মত আমি একদিন হঠাৎ জেগে উঠে যখন দেখলুম বড় লেখক হয়ে গেছি, চারদিক থেকে প্রশংসা বর্ষণ হতে থাকল, এবং আর সবাইকে ছাপিয়ে রেখে রবিমামা যখন অপ্রত্যাশিতভাবে অভিনন্দন করে লিখলেন—"নাম দিসনি বলে তোর এ লেখার ঠিক যাচাই হল। নতুন হাতের লেখার মত নয়, এ যেন পাকা প্রতিষ্ঠ লেখকের লেখা। এ যদি আমারই লেখা লোকে ভাবত, আমি লজ্জিত হতুম না।" এত বড় সমাদরে আমি আহ্লাদে লজ্জায় মৌন হয়ে গেলুম। কিন্তু এ-লেখা লিখে একটু বিপদেও পড়লুম। কেউ কেউ নিজের মাথায় টুপি খাপ খেয়ে বসছে সন্দেহ করে মাথা চুলকাতে লাগল, কেউ বা কথঞ্চিৎ মাথা-গরম হয়ে আমার দিকে কটমট করে তাকাতে লাগল। কিন্তু এ চায়ের পেয়ালার ঝড় শীঘ্রই শান্ত হয়ে গেল। 'চিরকুমার সভা'র মত প্রেমিক-সভা ভেঙ্গে গেল না, সমানই কার্যকরী রইল।

কলম আমার খুলে গেল। এর পর সংস্কৃত কাব্যের আলোচনামূলক লেখা বেরতে থাকল। প্রথমেই কুমারসম্ভবের 'রতি-বিলাপ।' হীরেন দত্ত পরম্পরায় বলে পাঠালেন—'ভারি একটা নূতনত্ব আছে এ-লেখায়।' তাঁর মৃত্যুর দু-তিন বৎসর পূর্বেও—যখন 'নীলের উপোস' শোনাছিলুম তাঁকে—তার প্রতিপাদ্য বিষয়ও ভাষায় তারিফ করতে করতে বললেন—'আপনার সব লেখা বই আকারে ছাপান না কেন? বাঙলার সাহিত্য-জগতকে বঞ্চিত করে রাখছেন। আপনার 'রতি-বিলাপ' একটা sensation এনেছিল—সেসব ত আজ পর্যন্ত বই করে গেঁথে রাখলেন না। এখনো ছাপিয়ে ফেলুন।'

তার পরে 'মালবিকা-অগ্নিমিত্র'। বঙ্কিমবাবুকে এইটি পড়তে পাঠিয়েছিলুম আগে লিখেছি। তাঁর এ বিষয়ে যে দুর্মূল্য চিঠি পেলুম, সে চিঠি গেছে পাঞ্জাবের পলিটিক্যাল অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে—সে কথাও পূর্বে বলেছি। মালবিকা-অগ্নিমিত্র সম্বন্ধে রবিমামার চিঠিও সঙ্গে সঙ্গে গেছে। শুধু এই বিষয়ের চিঠি নয় তাঁর। ছেলেবেলা থেকে তাঁর যত চিঠি পেয়েছিলুম—অন্তত খান পঞ্চাশেক হবে—সবই অকালে কালগর্ভে প্রলীন হয়ে গেছে।

তার পরে বেরল 'মালতী-মাধব'। এ সবই আমার এফ-এ ও বি-এতে পাঠ্য-পুস্তক ছিল। 'মৃচ্ছকটিক' আরম্ভ করেছিলুম, শেষ হয় নি। 'কবি-মন্দির' নাম দিয়ে এগুলি একত্রে গ্রন্থাকারে বের করতেও প্রবৃত্ত হয়েছিলুম—দীনেশ সেনের তত্ত্বাবধানে, কেননা তখন নিজে আমি লাহোর যাত্রাভিমুখে। দু-তিন ফর্মা মাত্র ছাপিয়ে দিয়ে দীনেশ বাবু আর শ্রম-স্বীকার করে অগ্রসর হলেন না—ছাপান ফর্মাগুলি কোথায় রাখলেন, তারও সন্ধান পেলুম না—ছাপাখানা তাদের পাওনা আমার কাছ থেকে কড়ায় গণ্ডায় অগ্রিম নিয়ে নিয়েছিল। নিজে প্রবাসে থেকে কারো হাতে বই ছাপানর ভার দেওয়া নিরর্থক অর্থের শ্রাদ্ধমাত্র বুঝে নিলুম। তার পর দেশে এসে যখনই নিজে চেষ্টা-পরায়ণ হয়েছি, জগৎজোড়া যুদ্ধের করাল-মূর্তি দেখা দিয়েছে—কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা-বশত সকলে আমায় নিরস্ত করেছে।

ইতিমধ্যে মায়ের সঙ্গে সোলাপুরে মেজমামার কাছে থাকতে গেলুম কয়েক মাসের জন্যে। সেখানে মারাঠি ক্লাবে দুর্গাপূজোর 'দশেরা' বা বিজয়া দশমীর উৎসবের দিন বরোদার গাইকোয়ার এলেন। মহারাজা অতি ভদ্র—মামার প্রতি ও আমার প্রতি যে সৌজন্য দেখালেন, তাতে মুগ্ধ হলুম। কিন্তু সেদিন যে উৎসব দেখলুম, তাতে একেবারে চমৎকৃত হলুম। খালি লাঠি-তলোয়ার খেলার ও নানাবিধ ব্যায়ামের প্রদর্শনী—আর বীরত্বমূলক বক্তৃতার ধারা। আমাদের দেশের বাঈনাচ, গান ও মদ্যপান প্রভৃতির ধারা নয়।

তার পরে গেলুম, পুণায় বম্বে প্রেসিডেন্সীর সিভিলিয়ানদের একটা Fancy-dress Ball-এ। সমস্ত ঘর-ভরা সাহেব মেমদের মধ্যে আমরা তিনজন মাত্র ইণ্ডিয়ান—মেজমামা, মা ও আমি। মনে পড়ে মা সন্ন্যাসিনীর সাজে গিয়েছিলেন, আমি সরস্বতীর। মাকে এই সন্ন্যাসিনীর বেশ খুব শোভা পেত। বসন্ত-উৎসবের অভিনয়েও তিনি সন্ন্যাসিনীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। নতুনমামী হয়েছিলেন উপেক্ষিতা নায়িকা—যতদূর মনে পড়ে সন্ন্যাসিনীর বরে তিনি নায়কের প্রেমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিতা হয়েছিলেন।

পুণায় যাওয়া সেবার এই 'সিভিল-সার্ভিস নাচ' উপলক্ষ্যে। কিন্তু সে ব্যাপারটা আমার মনে কোন স্থায়ী রেখা কাটল না—পদ্মপত্রে জলের মত সরে গেল। লোকেনের সেই কথাটি মনে পড়ল—যেদিন সে অনুভব করেছিল ইংরেজদের ও তার মধ্যে কি একটি দুর্মোচনীয় ব্যবচ্ছেদ রেখা। যে যাত্রায় আমার মনের ভিতর একটা স্থায়ী ভাবের বিক্ষোভ তুললে পুণায় সহরের মধ্যে শনিবার—পেট দিয়ে যেতে যেতে একটি পেশোয়া-স্তম্ভের সম্মুখীনতায়। ভারতীতে সেবার আমার একটি প্রবন্ধ বেরল—'বাঙালী ও মারাঠি'। 'বীরাষ্টমী' উৎসবের বীজ মনে মনে উপ্ত হল সেই দশেরার দিনের খেলা দেখায় ও এই পেশোয়াদের বীরত্ব-স্তম্ভের সন্দর্শনে। বাঙালীর জাতীয় উৎসব পন্থায় পরিবর্তন আনিয়ে তার জাতীয় চরিত্রের আমূল পরিবর্তনের একটি সূত্র আমার হাতে ধরালেন জগৎ-ব্যাপারের মহাসূত্রধর।

আজকাল ঘরে ঘরে, স্কুলে স্কুলে, সভায় সভায় মেয়েদের নাচ। সেকালে তাল রেখে রেখে ষ্টেজের উপর দুপা চলাও গর্হিতাত্মক ছিল। একবার "আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান" রবীন্দ্রনাথের এই গানের সঙ্গে ছোট মেয়েদের একটু নাচের ধাঁচা ঢুকিয়ে দিলুম কত ভয়ে ভয়ে। কিন্তু তার চেয়ে সাহসিক কাজ আর একটা হয়েছিল।

সাড়ে সাত বছরে বেথুনে স্কুলে ঢুকেছিলুম—প্রায় দশ বছর পরে, আমার সতের বছর বয়সে বি-এ পাশ করে স্কুল থেকে বেরিয়ে এলুম। কিন্তু স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে বিচ্ছিন্ন হল না। বছর বছর প্রাইজের সময় তদানীন্তন লেডি-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিস্ চন্দ্রমুখী বসু ও পরে কুমুদিনী খাস্তগির আমায় অনুরোধ করে আনাতে লাগলেন মেয়েদের প্রাইজের দিনের গান-বাজনায় তৈরি করে দেবার জন্যে। আমার নিজের গান একটি শেখালুম

'নমো নমো ভারত জননি—
বিদ্যামুকুটধারিণী!
বরপুত্রের তপ-অর্জিত
গৌরব মণিমালিনী!'

এটি জগদীশ বসুকে নতুন মামার সংগীত-সমাজ থেকে মানপত্র দেওয়ার উপলক্ষ্যে

রচিত হয়েছিল—অনেকেই ওঁর আগে শোনেন নি। শত গানে স্বরলিপি আছে। বেথুন স্কুলে প্র্যাকটিস যখন চলছিল, তখন বিপিন পাল তাঁর কাগজে এই গান সম্বন্ধে একটা মন্তব্য লিখলেন—"তাঁর মেয়েরা বাড়িতে একটি নতুন গান অভ্যেস করছিল—তারই কথা তাঁর কানে ভেসে এল। একটা আশ্চর্যতা অনুভব করলেন। এতদিন দেশে যত জাতীয়-সংগীত রচিত হয়ে এসেছে, সবেরই ভাব হতাশাময়, অতীতের স্মরণে শোকমূলক ক্রন্দনময়। এই গানের প্রাণ আর এক রকমের—বর্তমানের উপর দাঁড়িয়ে তেজস্বিতার সঙ্গে উৎসাহময় ও ভবিষ্যতের নিশ্চিততায় আনন্দময়।" কিন্তু প্রাইজের দিন যখন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে এই গান গীত হল তিনি—বেথুন স্কুলের একজন কমিটি মেম্বর—একটু সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন, উসখুস করতে লাগলেন। পরের দিন চন্দ্রমুখী বসুকে ডেকে পাঠিয়ে জানালেন—এ গান স্কুলে গাওয়ান ঠিক হয়নি—কেননা, তার শেষ লাইনগুলি হচ্ছে—

এসেছে বিদ্যা, আসিবে ঋদ্ধি
শৌর্যবীর্যশালিনী।
অপমানক্ষত জুড়াইবি মাতঃ
খর্পরকরবালিনি!

আমার সময়ে ছেলেমেয়েদের একই বিদ্যামন্দিরে co-education ছিল না। যখন আমি এফ-এ ক্লাসে উঠলুম সুধীদাদাদের মত আমারও 'Science' একটা পাঠ্য-বিষয় করবার প্রবল ইচ্ছা হল। বেথুন কলেজে তার সুযোগ নেই। আমি এডুকেশন-বিভাগে অনেক নিষ্ফল আবেদন-নিবেদন করলুম—কোন বন্দোবস্ত হল না। অবশেষে বাবামহাশয়ের বন্ধু ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের Science Association-এ সান্ধ্য লেকচারে যোগদানের আয়োজন হল আমার জন্যে। ভিন্ন ভিন্ন কলেজের এফ-এ ক্লাসের ছাত্রতে ভরা থাকত লেকচার হল। আমি একমাত্র ছাত্রী হলুম। প্রথমে ডাক্তার সরকার ও ফাদার লাঁফোর সঙ্গে তাঁদের ঘরে গিয়ে বসে থাকতুম, আমার সঙ্গে সুধীদাদা ও আমার দাদা থাকতেন। যখন লেকচারের সময় আসত লেকচারাররা উঠে হল-অভিমুখে যেতেন, সেই সময় আমিও উঠতুম, আমার দু-পাশে দুই দাদা থাকতেন। ছেলেরা ফিস ফিস করে বলত—'Body-Guards'! আমাদের তিনজনের জন্যে সামনের লাইনে তিনখানা চেয়ার লাগান থাকত, ছাত্রদের জন্যে বেঞ্চ।

এই রকম করে করে Physics শিক্ষা হল আমার। বেথুনে বটানি নিতে পারতুম—যার দরুণ কোন apparatus-এর দরকার হত না। কিন্তু আমার দৃঢ় পণ ছিল আমি বাড়ির ছেলেদের সমান সমান Physics-ই নেব। এই লেকচার শোনা ছাড়া বাড়িতেও সাহায্য পেতুম যোগেশবাবুর কাছে—আশুবাবুর মেজ ভাই। তখনো তিনি বিলেত যাননি—মেট্রপলিটনেই বোধ হয় বিজ্ঞানের অধ্যাপক। আমার জিদ বজায় রইল, পদার্থ-বিজ্ঞানে আমার প্রাথমিক প্রবেশ লাভ হল, পাসও হলুম এবং সায়ান্স এসোসিয়েশন থেকে একটি রৌপ্য-পদক পেলুম। সেই পর্যন্ত ফাদার লাঁফোর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠভাবে জানাশোনা হয়ে গেল। তিনি শুধু সেণ্টজেভিয়ারের একজন মাস্টার নন, সামাজিক মেলামেশায়—ডিনারে, ইভনিং পার্টিতে, সব আমোদ-প্রমোদে সদা সামিল হন; গল্প-গুজব, হাসিখুসী ও সৌজন্যে ভরা।

বি-এ ক্লাসে যখন উঠলুম, তখন লক্ষ্ণৌ মিস্ থোবার্ণের স্কুল থেকে দুটি খৃষ্টান মেয়ে এসে আমার সহপাঠী হল। একজন বাঙালী শরৎ চক্রবর্তী ও একজন হিন্দুস্থানী—নাম এথেল র‍্যাফেল। শরৎ একেবারে আদর্শ নেটিভ খৃষ্টান মেয়ে—মিশনারির আগ্রহে ভরা। তার নিজের মুখের কথায় জানলুম—হিন্দু মেয়েদের খৃষ্টান করার জন্যে তাদের বাড়ি থেকে চুরি করে আনা, লুকিয়ে রাখা, আত্মীয়দের ধোকা দেওয়া—সব কিছুতে অভ্যস্ত সে। এথেল আর একরকম প্রকৃতির। সেও খৃীষ্টধর্মে গোঁড়া বিশ্বাসী, কিন্তু ছল-চাতুরির ভিতর দিয়ে যায় না। সুন্দরী নয়, কিন্তু তার চোখ দুটির ভিতর এমন একটি 'wistfulness' আছে—দেখলেই তার প্রতি মায়া বসে। রবিমামাও সেটি লক্ষ্য করেছিলেন—যখন তাকে একদিন আমাদের বাড়িতে দেখেন।

বেথুন কলেজে এসে আমার সহপাঠী হয়ে তার বুকের ভিতর একটা মস্ত আলোড়ন চলতে থাকল। পাঞ্জাব ও পশ্চিমে সেকালে দস্তুর ছিল মিশনারিরা কাউকে খৃীষ্টধর্মে দীক্ষিত করলে তাদের বংশগত ভারতীয় নাম ত্যাগ করিয়ে ইংরেজি নামে ভূষিত করত। তাই এথেল এখন 'মিস্ র‍্যাফেল'। তারা বংশে রাজপুত, তার বংশপরম্পরাগত পদবী হচ্ছে 'সিংহ'। আমাদের সংসর্গে এসে সে জাতীয়তার দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত হল। একটা গ্রীষ্মের ছুটীতে লক্ষ্ণৌ গিয়ে সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেটকে নোটিশ দিয়ে নিজের 'এথেল র‍্যাফেল' নাম পরিত্যাগ করে—'লীলা সিংহ' নাম পরিধান করলে। বোধ হয় কলকাতার য়ুনিভার্সিটি ক্যালেণ্ডারে তার 'লীলা সিংহ' নামই বেরিয়েছিল। 'লীলা সিংহ' নামেই, ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরেই সে থোবর্ন কলেজ থেকে আমেরিকায় খৃীষ্টান মেয়েদের প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিল। স্বদেশপ্রীতি তার ভিতর সর্বতোভাবে জাগ্রত হয়ে উঠল। আজকাল মিশনারিদেরও পলিসি হচ্ছে কনভার্টদের দেশীয় নামই বজায় রাখা। বরঞ্চ লাহোরে এই নিয়ে একটু গোলযোগ হয়েছিল। চাকরির সুবিধার জন্যে একজনরা নিজেদের মিশনারি-দত্ত ইংরেজি নামের আবরণ ছাড়েন নি। ইংরেজের scale-এ বেতন পেলেন তাতে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট জানতে পেরে তাঁদের জোর করে ইংরেজির সঙ্গে দেশী পদবীর একটা লেজুর জোড়াতে বাধ্য করলে, যাতে সহজেই ধরা যায় যে, আসলে নেটিভ তাঁরা এবং বেতনের হারও তাঁর কমে গেল। লীলা সিংহ তাঁর বংশগত নাম নিজে হতে পুনর্গ্রহণ করে আত্ম-মর্যাদা ফিরে পেলেন।

বি-এ পাশের পর আমি দু-তিন বছর ভারতীয় সেবাকার্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করলুম। তখনো বিয়ের কোন কল্পনাই মাথায় আসেনি—একেবারে যেন 'আপনার মন আপনার প্রাণ আপনারে সঁপিয়াছি।' সংস্কৃতে এম-এ দেবার জন্যে বাড়িতে প্রস্তুত হতে লাগলুম। মহেশ ন্যায়রত্ন শুনতে পেয়ে শাসালেন—'দেখব কেমন করে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র না হয়ে বাড়িতে পড়ে এম-এ পাশ করে। আমার অধ্যাপক পণ্ডিত শীতলচন্দ্র বেদান্তবাগীশের জিদ চড়ে গেল—তিনি আমাকে পাশ করাবেনই। সাংখ্যকারিকা পড়ান আরম্ভ হল। দুই-এক স্থলে আমার প্রশ্নে তিনি অত্যন্ত প্রীত হলেন—বললেন 'আর একটিমাত্র ছাত্র তাঁকে এই রকম প্রশ্ন করেছিল—সে হীরেন দত্ত—একখানি হীরের টুকরো'।

কিন্তু এম-এ শেষ পর্যন্ত পড়া হল না—মহেশ ন্যায়রত্নের challange-এর উত্তর দেওয়া হল না। আমার মনের ভিতর ভারি একটা চাঞ্চল্য আসতে লাগল—বাড়ির পিঞ্জর ছেড়ে বাইরে ছুটে যাওয়ার জন্যে, কোন একটা নিরুদ্দেশ যাত্রার জন্যে, ভাইদের মত স্বাধীন জীবিকা অর্জনের অধিকারের জন্যে। মাকে বাবামশায়কে বিরক্ত করে করে অবশেষে বাবামহাশয়ের সক্রোধ সম্মতি পেলুম। বাকী রইল কর্তা দাদামশায়কে জানান, তাঁর সম্মতি নেওয়া। তিনি নতুন যুগের নিজের ছেলেমেয়েদেরই স্বাধীন ইচ্ছা ও তদনুযায়ী ব্যবহারের কখন বিরুদ্ধতা করেন না। নাতী-নাতনীদের বেলায় ত করবেনই না জানা ছিল। মেজমামা যখন, মেজমামীকে বিলেত নিয়ে যান, কর্তা দাদামশায় বাধা দেননি—বিলেত থেকে ফিরলে যখন তাঁকে নিয়ে গবর্ণমেণ্ট হাউসের পার্টিতে যান, কর্তা দাদামশায় বাধা দেননি—যদিও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতিরা ঘরের বউকে সেখানে দেখে লজ্জায় পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিলেন, দেউড়ি দিয়ে হেঁটে মেজমামী যখন গাড়িতে চড়ছিলেন, বাড়ির পুরাতন ভৃত্যদের চোখ দিয়ে দর দর করে জল

পড়ছিল। মা ও মামীরা তখনই গঙ্গাস্নানে গেলে বাড়ি-ভিতর থেকে পাল্কী চড়ে গঙ্গার ঘাটে পেঁৗছে, পাল্কীশুদ্ধ গঙ্গায় ডুব দিইয়ে নিয়ে আসা হত তাঁদের। এ-বাড়ি থেকে গগন দাদাদের বাড়িতে কখন যেতে হলেও পাল্কী চড়ে যেতেন। সেই সব প্রাচীন সংস্কার ভঙ্গ করে যখন তাঁরা মেজমামার ইচ্ছানুযায়ী পথানুবর্তিনী হলেন, কর্তাদাদামশায় কোন বাধা দেননি তখন—আমার বেলায় কেন দেবেন? তবুও তাঁকে বলতে হবে, আশীর্বাদ নিতে হবে। তিনি আমার যাবার ইচ্ছা শুনে কোন আপত্তি প্রকাশ করলেন না। শুধু বড়মাসিমাকে ডেকে বললেন—'সরলা যদি অঙ্গীকার করে জীবনে কখনো বিয়ে করবে না, তাহলে আমি তার তলোয়ারের সঙ্গে বিয়ে দিই যাবার আগে।'

এই রোমাণ্টিক প্রস্তাবে আমি নিজের ভিতর ডুবে ভেবে দেখলুম—কখনোই যে বিয়ে করব না, এ রকম প্রতিজ্ঞা দিতে কি প্রস্তুত আমি? আমাদের বাড়িতে থিয়সফির প্রভাবের দিনে কাশী থেকে একজন মাতাজীর প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। মা বলতেন—'সরলার বিয়ে দেব না, ঐ মাতাজীর মত দেশের কাজে উৎসর্গিত থাকবে।' ছেলেবেলায় মা-বাপ স্রোতের যে মুখে ভাসান, তৃণটি সেই মুখেই চলতে থাকে। আমার মনোবৃত্তিও অ-বিবাহের মুখে চলে চলে তারই তটে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পরে মায়ের নিজের মত বদলে গিয়েছিল, খুব চাইতেন আমার বিয়ে দিতে. আমি কিন্তু আর ধরাছোঁয়া দিইনে—যাদের নাম করতেন, তাদেরই না-পছন্দ করতুম। কিন্তু কর্তা দাদামশায় যখন প্রতিজ্ঞা করতে বললেন যে, এ জীবনে কখনো বিয়ে করব না, আমার মনে বিদ্রোহ এল। নিজেকে যাচিয়ে দেখলুম এরকম প্রতিজ্ঞা নিয়ে 'চির-কুমারীত্ব' স্বীকার করতে প্রস্তুত নই। কোন মেয়েই সেইটে তার অন্তিম লক্ষ্য করতে পারে না। যতদিন স্বচ্ছন্দে-বিহার চলে চলুক, কিন্তু একদিন যে পরচ্ছন্দে নিজেকে চালানর ইচ্ছে হতে পারে, সে ইচ্ছে পূরণের পথে আপনার হাতেই চিরকালের মত বেড়া তুলে দিতে মন মানলে না।

বাবামশায় যে সম্মতি দিয়েছিলেন তার ভিতর একটি গুপ্ত আশা তাঁর নিহিত ছিল—যাব কোথায়? উপযুক্ত চাকরি কোথায় আমার জন্যে বসে আছে? তা কিন্তু ছিল। সরলা রায়দের সঙ্গে আমি যখন মহীশূর ভ্রমণে গিয়েছিলুম, তখন মহারাজার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়নি—তিনি গিয়েছিলেন উটকামণ্ডে। কিন্তু সেখানকার দেওয়ান-প্রমুখ সকল বড় কর্মচারীরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী বলে আমায় অত্যন্ত উচ্চ নজরে দেখেছিলেন। আমি ডাক্তার রামস্বামীর মাতুল, মহারাজের প্রিয়পাত্র, রাজ্যে অতি প্রভাবশালী, মহারাণী গার্লস স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বেসর্বা নরসিং আয়েঙ্গার দরবার বক্সিকে একখানি টেলিগ্রাম পাঠালুম—"Want to serve the school. Wire if opening."

দু-দিনের মধ্যে টেলিগ্রামের উত্তর এল—"Always opening for yau. Start as soon as you like."

পরে তাঁর কাছে গল্প শুনলুম, আমার টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি আনন্দে বিভোর হয়ে মহারাজাকে গিয়ে বলেছিলেন—'একটি A°1 পরিবারের মেয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের স্কুলে আসতে চাইছেন। অমূল্য সুযোগ।'

মেজমামা তখন সেতারায়। মহীশূরে যেতে বম্বে দিয়ে সেতারা পথে পড়ে। মা সেতারা পর্যন্ত আমার সঙ্গে গেলেন। মেজমামা সেতারা থেকে আমার অভিভাবক হয়ে আমায় মহীশূরে ছাড়তে গেলেন। মেয়েদের চাকরি করা সম্বন্ধে, স্বাধীন জীবিকা অর্জন সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন দ্বিধা নেই—সব রকম সমাজ সংস্কারের তিনি পক্ষপাতী। মহর্ষির দৌহিত্রী হয়ে চাকরি করতে যাওয়ায় কোন পারিবারিক লাঘব তিনি অনুভব করলেন না। আমায় পেঁৗছিয়ে, সব রকম সুবন্দোবস্ত আছে দেখেশুনে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি ফিরে গেলেন।

কুমুদিনী খাস্তগির তখন মহীশূরে ঐ স্কুলেই এসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। ঘটনাক্রমে তাঁর ঐ সময় চাকরি ছেড়ে কলকাতায় আসার প্রয়োজন হল। দেওয়ান বা দরবার বক্সির আমার জন্যে নতুন post সৃষ্টি করতে হল না। কুমুদিনী দিদির স্থান আমার জন্যে তখনি উন্মুক্ত হয়ে গেল। তাঁদের ইচ্ছা সকলের অপ্রিয় উপস্থিত যে ইংরেজ মেম লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে বহাল আছে, তার সঙ্গে কড়ারের বছরটা উত্তীর্ণ হয়ে গেলেই আমাকে তার পদে অভিষিক্ত করবেন। একটা বছর এইভাবে চলুক।

আমি আত্মীয়স্বজনবিরহিত জীবনযাত্রায় পদক্ষেপ করলুম। আমার জীবনের মোড় ফিরল। ক্রমশ

গান

কানাই সামন্ত

আমার মন বলে, যাই যা-ই যা-ই যাই গো।
কোথা যাবে যে তার ঠিকানা নাই নাই গো।
নীল সায়রে একলা নেয়ে
যায় কে চাঁদের তরী বেয়ে,
কূলের থেকে চেয়ে চেয়ে
নয়নে নিদ হারাই আমি তাই গো।
মন বলে, যাই যা-ই যা-ই যাই গো॥

ঘরবিবাগি উঠল হাওয়া।
যার পরশ ওই বয়ে আনে
হবে কি তার পারে যাওয়া ॥

আমার দুঃখসুখের ফুলে
গেঁথেছি, আর মনের ভুলে
অঞ্জলি আজ শূন্যে তুলে
গলেতে কার আমার এ হার
পরাতে চাই গো।
মন বলে, যাই যা-ই যা-ই যাই গো॥

কেউ একজন অসাবধানে কথা বলে-



... আর শত্রুপক্ষ সযত্নে খবরটা জোড়া দিয়ে নেয়।

পরের সপ্তাহে অথবা পরের মাসে এই অসতর্কভাবে উচ্চারিত কথাগুলির জন্য ভারতের জনসাধারণ তাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি থেকে বঞ্চিত হয়, জীবনও নষ্ট হয়।

আমাদের মধ্যে শত্রুর যে গুপ্তচর আছে তাদের চাতুর্য ও ধৈর্য কম আছে ভাববেন না। খবরের অতি ছোটো ছোটো টুকরোগুলি নিয়ে তারা কাজ চালায়। দিল্লীতে টেলিফোনের একটু শোনা আলাপ, বোম্বের কোনো রেলস্টেশনে প্রাপ্ত আধখানা চিঠি, কলকাতার রেস্তোরাঁয় হঠাৎ শোনা একটি মন্তব্য — এই সব তারা বহু পরিশ্রমে জোড়া দেয়। এইগুলি একত্র মিলে হয়তো মানে দাঁড়ায় বর্মায় এক ডিভিসন সৈন্যদলের চলাচল অথবা করাচীতে জাহাজ ছাড়বার তারিখ।

শত্রু কান পেতে আছে — সাবধান !

দৃঢ়চিত্তে স্থির করুন যে শত্রুর কাজে লাগে এমন কোনো কথা উচ্চারণ করবেন না। সৈন্যদের গতিবিধি, অস্ত্রসম্ভার, জাহাজের আসা ও যাওয়া এসব বিষয়ে কখনো আলোচনা করবেন না।

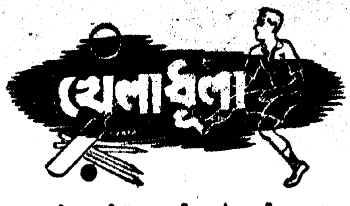


এই ভাবে আপনি জাহাজ ও নাবিকদের জীবন রক্ষা করতে পারেন। আমাদের যোগাযোগের লাইনের রক্ষক হতে পারেন—জনসাধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যাতে নির্বিঘ্নে এসে পৌঁছোয় তাতে সাহায্য করতে পারেন।

আপনার জন্য যেন বিপদ না ঘটে

ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট কর্তৃক প্রচারিত

AAA 1342



হকি

হকি খেলার মরসুম আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও হকি খেলোয়াড়দের মধ্যে খেলায় যোগদান করিবার কোনই উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে না। প্রতিদিন মাঠে বিভিন্ন খেলা দেখিবার জন্যও বেশ দর্শকসমাগম হইতেছে। এমন কি বিশিষ্ট হকি ক্লাবের পরিচালকগণকে নিজ নিজ দলের শক্তিবৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রতি বৎসরের ন্যায় খেলোয়াড় সংগ্রহ করিতে ছুটাছুটি করিতেও দেখা যাইতেছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, এত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে বাঙালী হকি খেলোয়াড়গণ কিরূপে সুনাম অর্জন করিতে পারেন, অথবা উন্নতি করিবার মত শক্তিলাভ করিতে পারেন, এইরূপ আলোচনায় অথবা ব্যবস্থায় কোন পরিচালক ব্যস্ত আছেন বলিয়া দেখা যাইতেছে না। লীগ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইলে বিভিন্ন দিনের দল গঠন ব্যাপার পরিচালকদের এত বিব্রত করে যে, এইরূপ গঠনমূলক কোন কার্য করার তাঁহাদের অবসর থাকে না, ইহা আমরা জানি এবং সেই জন্যই মরসুম আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব হইতেই আমরা এই বিষয় পরিচালকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য বিভিন্ন প্রবন্ধের অবতারণা করি। কিন্তু এখন দেখিতেছি, সেই সমস্তই "অরণ্যে রোদনের" ন্যায় ব্যর্থ হইয়াছে।

বাঙালী হকি খেলোয়াড়দের কথা ছাড়িয়া দিলেও বাঙলার হকি খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড যেরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা নিয়মিত শিক্ষার ব্যবস্থা না হইলে প্রতি বৎসরেই বাঙলা হকি দলকে বিভিন্ন স্থানে শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতায় গতবার বাঙলা দল যেরূপ ফলাফল প্রদর্শন করিয়াছিল, এই বৎসরে তাহারই পুনরাবৃত্তি করিবে, এই বিষয় কাহারও সন্দেহ থাকিলেও আমাদের নাই। আমাদের এই উক্তি যে ভ্রান্তিমূলক নহে, তাহার প্রমাণ শীঘ্রই পাওয়া যাইবে।

কুস্তি

বঙ্গীয় অপেশাদার কুস্তি সঙ্ঘ পরিচালিত প্রাদেশিক কুস্তি প্রতিযোগিতা দেখিয়া আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। ভারতীয় প্রথায় এই প্রতিযোগিতা পরিচালিত হইলেও বিভিন্ন লড়াই বেশ দর্শনযোগ্য হয়। যোগদানকারী মল্লবীরদের মধ্যে অনেকেই যে অদূর ভবিষ্যতে নিখিল ভারত মল্লযুদ্ধে সুনাম অর্জন করিতে পারিবেন, তাহারও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

৭ স্টোন বিভাগ:—কানাই দে (জোড়াবাগান ব্যায়াম সমিতি) শম্ভু দাসকে (খিদিরপুর ব্যায়াম সমিতি) পরাজিত করে।

৮ স্টোন বিভাগ:—রাধা মাঝি (ছোটবাজার ব্যায়াম সমিতি, মেদিনীপুর), সুনীল বসুকে (হালদারপাড়া জিমন্যাসিয়াম) পরাজিত করে।

৯ স্টোন বিভাগ:—নীলমণি চন্দ্র (হালদারপাড়া জিমন্যাসিয়াম) নীরদ বৈরাগীকে (চেতলা সঙ্ঘ) পরাজিত করে।

১০ স্টোন বিভাগ:—অমূল্য রায় (চেতলা সঙ্ঘ) সুধীর ঘোষকে (ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ) পরাজিত করে।

১১ স্টোন বিভাগ:—বদ্রীনাথ শীল (চেতলা সঙ্ঘ) ইন্দ্র চক্রবর্তীকে (সাউথ ক্যালকাটা ফিজিক্যাল কালচার এসোসিয়েশন) পরাজিত করে।

১২ স্টোন বিভাগ:—ঘনশ্যাম দাস (সিমলা ব্যায়াম সমিতি) মলয় ঘোষকে (মাণিকবাবুর আখড়া) পরাজিত করে।

হেভী ওয়েট বিভাগ:—তারক দত্ত (কালিকা ব্যায়াম সমিতি) ভবানী ঘোষকে (গোবরবাবুর আখড়া) পরাজিত করে।

এ্যাথলেটিকস্

বাঙলার এ্যাথলেটিক স্পোর্টসের মরসুম শেষ হইতে চলিয়াছে। বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের অনুমোদিত সমস্ত প্রথম শ্রেণীর প্রতিযোগিতাও শেষ হইয়াছে। বর্তমানে কয়েকটি বালিকা ও মহিলাদের স্পোর্টস অনুষ্ঠান বাকী আছে। যেরূপ গরম পড়িয়াছে, তাহাতে এই সমস্ত অনুষ্ঠানে কেহ অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবেন, ইহা আমরা আশা করি না।

এই বৎসরে যতগুলি স্পোর্টস অনুষ্ঠান দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, সমস্তগুলিতেই বৈদেশিক এ্যাথলীটদের সাফল্যলাভ করিতে দেখিয়াছি। বাঙালী এ্যাথলীট কোন একটি বিষয়েই উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। বাঙালী এ্যাথলীটদের এই শোচনীয় পরিণাম দেখিলে দুঃখ হয় সত্য, তবে আমরা কি করিতে পারি? তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশের পথ রচনা করিয়াছেন। গত ১০ বৎসর ধরিয়া তাঁহাদের নিয়মিত শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন করিতে আমরা বার বার অনুরোধ করিয়াছি, তাঁহারা কর্ণপাত করেন নাই। এই বৎসর তাঁহারা এ্যাথলীটস ইউনিয়ন গঠন করিলেন, আমরা আশা করিলাম শিক্ষার একটা ব্যবস্থা হইবে। মরসুম শেষ হইয়া গেল, কোনই ব্যবস্থা হইল না। ইউনিয়নের পরিচালকগণ যদি এই বিষয়ে একটু উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন, এমন কি যদি কিছু জনমত সৃষ্টি করিবার মত আন্দোলন করিতেন, তাহা হইলে বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া যেভাবে এই বিষয়টি উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, এই বৎসর তাহা করিতে পারিতেন না। কিন্তু ইউনিয়ন নীরব থাকায় এসোসিয়েশনের পরিচালকগণও নীরব থাকিবার সুবিধা পাইলেন। প্রতি অনুষ্ঠানে বৈদেশিক এ্যাথলেটিকগণকে সাফল্যলাভ করিতে দেখিয়াও তাঁহাদের প্রাণ একবারও নিজেদের শোচনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে লড়িবার সাড়া দিল না কেন বুঝি না।

ভলিবল

বেঙ্গল ভলিবল এসোসিয়েশন বাঙলার ক্রীড়ামোদিগণের মধ্যে কিরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে তাহার প্রমাণ সম্প্রতি জেলা ভলিবল প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে পাওয়া গিয়াছে। এই প্রতিযোগিতাটি শান্তিপুরে অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও বাঙলার বিভিন্ন জেলা হইতে বহু দল যোগদান করে। হাওড়ার জেলা দল এই প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করিয়াছে। কলিকাতা দল তীব্র প্রতিযোগিতা করিয়াও শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করে। তবে কলিকাতা দলের পক্ষে এইটুকু বলা চলে যে, কয়েকজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় ছুটির অভাবের জন্য দলে যোগদান করিতে পারেন নাই, ফলে দলের শক্তি কমিয়া যায়। তাহা হইতেও কলিকাতা দল যেরূপ খেলিয়াছে, তাহার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। হাওড়া দলও উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াই বিজয়ীর সম্মানলাভ করিয়াছে। কলিকাতা ও হাওড়া দলের এই শেষ মীমাংসার খেলাটি খুবই উচ্চাঙ্গের হয়। বেঙ্গল ভলিবল এসোসিয়েশনের পরিচালকগণের সুব্যবস্থার জন্য বাঙালী খেলোয়াড়গণ এই খেলায় যে উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী হইয়াছেন, তাহার নিদর্শনও এই অনুষ্ঠানে পাওয়া গিয়াছে।

ভলিবল খেলা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ খেলা। এই খেলায় বাঙলার খেলোয়াড়গণ দলে দলে যোগদান করিয়া বেঙ্গল ভলিবল এসোসিয়েশনের প্রচেষ্টায় সাহায্য করিলে অদূরভবিষ্যতে বাঙলার দল, ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিতে পারিবে ইহা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি।

সন্তরণ

সন্তরণ মরসুম আগতপ্রায়। মার্চের প্রথম সপ্তাহ হইতেই সমস্ত সন্তরণ ক্লাব নিয়মিত সন্তরণ শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে। এই শিক্ষা বিষয় বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন যে কোনরূপ সাহায্য করে না, ইহা সকল সাঁতারুরেই জানা আছে। সুতরাং প্রত্যেক ক্লাবের পরিচালকগণ বিশেষ ব্যবস্থা না করিলে উৎসাহী সাঁতারুগণ উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী হইতে পারিবেন না, ইহা বলাই বাহুল্য। ইহা ছাড়া এসোসিয়েশনের কর্মপদ্ধতিও বাঙলার সাঁতারুদের উন্নতিতে বিশেষ সাহায্য করে না ও করিবেও না। এই এসোসিয়েশনের কর্মপদ্ধতিরও পরিবর্তন প্রয়োজন। আমরা আশা করি, বাঙলার উৎসাহী সাঁতারুগণ মরসুমের আরম্ভ হইতেই শিক্ষার যাহাতে সুব্যবস্থা হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

দোললীলার তত্ত্বকথা

আপনারা আমার মুখ থেকে দোল-লীলার তত্ত্বকথা কিছু শুনতে চেয়েছেন। বর্তমানে আমাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। বাইরের বিষয়ের চাপে আমরা গতানুগতিক ধারা ধরে যেন কানা হয়ে চলেছি, আমাদের মনে গভীর-রূপে কোন ভাবনা দানা বাঁধতে পারে না। আর স্থায়ী ভাবের ধারার সাড়া যদি জীবনে না মিলে, তবে সান্ত্বনা কোথায়? এক ছেড়ে আরকে ধরা, শুধু জরা আর মরা। ' কোন সত্যকে আমাদের স্বভাবের ভাবে, দার্শনিক ভাষায় আত্মস্বরূপে লাভ করাকেই বলা চলে লীলা। পরের ছেলেকে চলতে দেখলে আমার তা তেমন নজরে পড়ে না; কিন্তু নিজের ছেলের গমন আমার কাছে নটন-লীলা হ'য়ে দাঁড়ায়। এখানে আমি আমার ছেলের ক্রিয়াকে স্বভাবের ভাবে পেয়েছি, আপনার ক'রে পেয়েছি, আত্মস্বরূপে জেনেছি। অন্য ছেলের ক্ষেত্রে তা হয়নি। দৃষ্টির এই তফাৎ রয়েছে। আমি যদি স্বভাবের ভাবে, জগতের সব ছেলেকে দেখতে পারি, তবে জগৎ জুড়ে সব ছেলের গমন আমার কাছে নটন হয়ে দাঁড়ায় এবং আনন্দঘন লীলার ছন্দে আমার মনে যা স্পন্দন জাগায়। সুতরাং স্বভাবের গূঢ় সরীতির এই প্রভাব আমাদের মন যেখানে লাভ করতে সমর্থ হয়, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ পেতে পারে। সেক্ষেত্রে উপাধির কোন বাছ-বিচার থাকে না। আপনা হ'তেই মন সেখানে টানা পড়ে যায়। এই হিসাবে লীলা কোন সিদ্ধান্ত নয়, তা একান্ত, জ্যান্ত নড়াচড়া এবং ধরা জিনিস। এ বস্তু পরোক্ষ নয়, এ প্রত্যক্ষ এবং সমক্ষ অর্থাৎ একেবারে সামনাসামনি যাকে আমরা দেখি, চিনি, জানি; সে ক্ষেত্রে সন্দেহের কোন গ্লানি থাকে না। সুতরাং তাকে আশ্রয় করে আমাদের মন স্থিতি লাভ করে এবং শান্তি পায়। আমাদের দেশের সাধকেরা আমাদের অন্তরের মূলে নিহিত এই স্বভাবের গূঢ় স্বরূপ বিশ্লেষণ করলেন। তাঁরা বললেন, আমাদের মনের মূলে একজন আপনজন গোপন রয়েছেন; তাঁর সম্বন্ধে চেতন হ'লেই আমাদের চোখে সর্বত্র লীলার স্ফুরণ হয় এবং আমরা আনন্দময় অবস্থার মধ্যে স্থায়ীভাবে স্থান লাভ করতে পারি। এই আপন জন কেমন, যাঁর সম্বন্ধে চেতন হ'লে সর্বত্র আনন্দ লীলার স্ফুরণ হয়, আর তাকে চেতন করবার উপায়ই বা কি? এই জিজ্ঞাসার মূলেই দোল-লীলার ব্যঞ্জনা রয়েছে। এদেশের রস-সাধকেরা এ তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে বলেছেন, যিনি তোমার ভিতরে রয়েছেন, তিনিই তোমার বাইরেও বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। তোমার মনের গহন বনে সেই আপন জনের বাঁশীর সুরই বাজছে, শুধু তুমি সেই সুরে নিজকে জুড়তে পারলেই বিশ্ব জুড়ে আনন্দের গান তোমার কানে বেজে উঠবে; আর তোমার জীবনে আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ত হবে এবং সেই আনন্দ-লীলা তোমার কাছে প্রত্যক্ষ বা মূর্ত ও দীপ্ত সত্য হয়ে যাবে। আজ এই বিশ্বে তুমি আপনার জনকে একান্তভাবে পাচ্ছ না, তোমার জীবনে স্থায়ী সান্ত্বনা কিছুই নাই; তখন আপন জনের আপ্যায়নে তোমার মন কানায় কানায় ভরে উঠবে। কিন্তু এমন সব কথাও আমাদের কাছে পরোক্ষ থেকে যায়। আমরা শুধু কথার জোরে মনের গহনে আপন জনের সাড়া পাই না। এদেশের রসসাধক-গণ এ সমস্যার নিরসন করলেন। তাঁরা বললেন, বিশেষ কিছুই নয়; শুধু বেদনা হ'লেই এই যে আপন জন, যিনি অতি গোপন, তাঁকে জানা যায়, চেনা যায় এবং বিশ্ব--ব্রহ্মাণ্ডময় তাঁর আনন্দলীলা প্রত্যক্ষ হ'তে পারে। যেখানে বেদনা তৎসম্বন্ধেই আমাদের চেতনা এবং সেই চেতনা-সূত্রে মনে ভাবের আনাগোনা এবং সেই আনাগোনার পথে লীলা জানা ও চেনা সম্ভব হয়ে থাকে। নিজের ছেলের জন্য আমার অন্তরে বেদনা আছে, এই জন্যে তার সম্বন্ধে আমার মন চেতন ধর্মে সর্বাঙ্গীনভাবে সাড়া দেয়, আর তার কর্ম আমার কাছে লীলায় পরিণত হয়। যিনি আমার আপন জন হ'য়েও মনের গোপন গহনে রয়েছেন, তিনি তেমন থাকলে তো আমার কোন লাভ নাই। ঈশ্বর সকলের হৃদয়দেশে অবস্থান করছেন, এ তো গীতাতেও আমরা শুনেছি, কিন্তু তিনি আমার দৃষ্টিতে বেদনায় জাগেন কি না, চেতনায় দীপ্ত হয়ে লীলায়িত হয়ে উঠেন কি না, এই হলো বড় কথা। এদেশের সাধকেরা এর উত্তরে বললেন, অন্ধ তুমি, তাই তাঁর বেদনা সম্বন্ধে সন্দেহ করছ, দেখতে পাচ্ছ না তিনি কি বেদনা নিয়ে তোমার কাছে আনাগোনা করছেন। প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই তোমার প্রতি বেদনাই তাঁর জাগা রয়েছে। গাছে লতায় পাতায়, চন্দ্র-সূর্যের ছন্দে ছন্দে তাঁর বেদনাই তোমাকে চেতনা দিচ্ছে। তোমার মনে তাঁর বোলই এসে এসে দোল দিচ্ছে। গোল ঘটাচ্ছে তোমার এই দেহের খোল। তুমি এর রোলেই মেতে রয়েছ; তাই তাঁর বোল শুনতে পাচ্ছ না। তাঁর বোলে আর কোলে মিল হলেই তোমার দেহ-সম্পর্কিত এই স্বার্থ-বিচারের গোল কেটে যাবে। তুমি প্রত্যক্ষভাবে তাঁর স্পর্শ পাবে, আর আনন্দময়ের আনন্দলীলা তোমার নেত্রে দৃপ্ত হয়ে উঠবে। ঠাকুর নরোত্তম এ সম্বন্ধে কি বলেছেন, আপনারা অনেকে হয়ত তা জানেন। তিনি বলেন, "অন্য বোল গণ্ডগোল নাহি শোন উতরোল লহ প্রেম হৃদয়ে ধরিয়া।" বসন্তের বাতাসে স্থূলে বোল আর কোলে দোল দিবার এই লীলাই রয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়ে পিরীতির আকুতি আমাদের মনের কোণে চিরন্তন কোন গোপন আসঙ্গ-লিপ্সার বাতি যেন জ্বালিয়ে তোলে। সে রসের স্পর্শে এমন একটা বেদনা আমাদের ভিতর বেজে উঠে, এমন একটি মধুর বোলের দোল আমাদের ভিতর খেলে যাতে আমরা জীবনের বস্তু বিচারের কার্পণ্যগত দৈন্য ভুলে যাই। কার কোলের স্পর্শ আমাদিগকে যেন দেহের বিবেচনা—খোলের রোল ভুলিয়ে দেয়। বিচার ছাড়িয়ে এই যে সঞ্চার, রসের ইহাই প্রকার। আর বিচারকে অতিক্রম করে আমাদের আনন্দ রস-নিমগ্নতার অধিকার।

এদেশের সাধকেরা বলেন, আনন্দই তোমার প্রাণ, আকাশে বাতাসে আনন্দের যে অবদান রয়েছে তার দিকে টান হলেই দেখবে জীবনে আনন্দের বান উঠেছে। এই দেহ ব্যাপারেও তুমি সেই আনন্দেরই অনুদিন সাধনা করে চলেছ। প্রাণের জন্য হাসপাশ করছ; পূর্ণ প্রাণের পরিচয় পাচ্ছ না। পাবে কেমন করে? দান না করলে যে প্রাণ মিলে না। কিন্তু দান করবার মত টান এখানে এমন মিলে না যাতে বোলে কোলে এক হয়ে আমাকে সকল গোল ভুলিয়ে দেয়। সবই ক্ষণিক; অর্থাৎ দেহের দিকে টান রেখেই দেয়; একেবারে প্রাণভরা আনন্দদীপ প্রদীপ্ত হয়ে দেহ-চিন্তার কালো আলো করে দেয় না। স্বার্থের চেতনা মনের কোণে সূক্ষ্মভাবে আনাগোনা করে এবং পরে তার টানে পড়েই মন বিচারের ঘরে ফিরে আসে। নিঃশেষে জয় করে নেয়, এমন ভালবাসা এখানে কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে প্রাণই প্রাণকে টান দিতে পারে। আর তোমাকে বেদনার টানে আকর্ষণ করে আনন্দ-লীলার রাজ্যে নিয়ে যেতে পারে এবং আয়াস থেকে অনায়াস জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে; বসন্তের বাতাসে সেই প্রাণের আভাস আসছে—প্রাণময় প্রকাশের অনায়াস রাজ্যে যেতে চাও কি? 'পৃথক আয়াসে যোগ দুঃখময় বিষভোগ'। লীলা একেবারে প্রকাশ না হলে অনায়াস হয় না। মনের কোণে আনুমানিক একটা সাধনই সে ক্ষেত্রে হতে পারে; কিন্তু একান্ত নিবেদন সম্ভব হয় না। বসন্তের বাতাসে যে আসঙ্গলিপ্সা জড়-জগতে আভাসে এলো, এদেশের সাধকেরা তাতে অগম্য অনঙ্গ-বিলাসের প্রকাশও ধরে ফেলে দিলেন, বৃন্দাবনের লীলায়। যিনি মনের গহনে গোপনে ছিলেন তিনি রস-সংবেদনে প্রেম-জাগিয়ে প্রাণময় হয়ে সকলকে জয় করলেন। এই প্রাণতত্ত্বই বৃন্দাবন লীলায় ব্যক্ত হয়েছে। বিশ্বে ব্যাপ্ত আপনজনের গোপন মাধুরীর চাতুরী এখানে ধরা পড়ে গিয়েছে। এই লীলার অনুধ্যানে মনের গোপন টানে, পিরীতির পরম রীতি বিশ্বে প্রদীপ্ত হয়ে উঠে। আমাদের অন্তরের মূলে যে উদ্দীপন রয়েছে, এই আনন্দ চিন্ময় লীলার রস-ছন্দে তাতে যেন বান উঠে, আর দেহ পর্যন্ত চঞ্চল করে তোলে। বিশ্বময় প্রাণদেবতার বোলে কোলে এক করে আমাদের দোলায়। যে দেহ ক্ষুদ্র স্বার্থের বন্ধনের মধ্যে পড়ে গোলে রয়েছে, সে ছন্দময় আনন্দের রাজ্যে বাতাস পেয়ে নিত্য জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতায় বিকাশ লাভ করে। কিন্তু সাধারণত, আমরা যাকে জীবে দয়া বলি ও জিনিষ প্রেম নয়, দয়া আর মায়া এ দুই-ই খণ্ড জিনিষ এবং বস্তুত ওর মূলে কাম থাকে, প্রেম ও বস্তু নয়। ওর মূলে আমাদের দেহের চেতনা, নিজের বর্ণনা থাকে, আমি রক্ত মাংসের জীব, আমাদের সেই দেহসম্পর্কিত চেতনায় আমি সে ক্ষেত্রে বেদনা বোধ করে থাকি, কিন্তু প্রেমে এমন স্বার্থ-সম্পর্কিত সতর্ক চেতনা থাকে না, সর্বত্র পরিব্যাপ্তচেতনার সঙ্গে দেহের বর্ণনা ভুলে বেদনা জাগে; কীট পতঙ্গ, থেকে গাছ লতা-পাতায়, ধূলি বালিতে পর্যন্ত নিজেদের প্রাণের বেদনাগত চেতনা সঞ্চারিত হয়। দয়ার মূলে অনেকটা অহঙ্কার থাকে, উচ্চ-নীচ বিচার থাকে, কিন্তু প্রেমে অভেদ অন্বয় চিন্ময় রসে হৃদয় পরিপ্লাবিত হয়। সাধক তখন দেহের

চেতনা ভুলে জড় অজড় সর্বত্র সঞ্চারিত প্রাণের সংগে প্রাণ মিশিয়ে পরিপূর্ণ অখণ্ড প্রাণ রসের উচ্ছল লীলা উপভোগ করতে আকুল হয়ে উঠে। এ হিসেবে মায়ার গণ্ডী সবচেয়ে নীচে, তার উপরে দয়া; কিন্তু প্রেমে কায়াকে ছেয়ে হৃদয়ের বেগ ধেয়ে যেতে চায়। ঘট, পট, দূর নিকট আত্মার আলোকে উজ্জ্বল করে তোলে। সে অবস্থা ক্ষুদ্র দেহ ব্যাপ্ত চেতনায় বিশ্বের সংগে প্রাণময়সূত্রে যুক্ত হয়। ঘটাকাশ মহাকাশে মিশে অবাধ আশ্বাসে—অনায়াস বিলাস লালসে নিমগ্ন হয়। মূলা প্রকৃতি রাধারাণীর লীলাময়ী শক্তির অনুগতি-সূত্রে সে আপন পতিকে খুঁজে পায়। এ হ'ল সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব। কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী ঠাকুরের ভাষায় তখন 'পরম-পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন, কৃষ্ণের মাধুর্য-রস করায় আস্বাদন।' প্রকৃতপক্ষে তখন মানুষের জীবন একেবারে বদলে যায়। সে এক নূতন জীবন লাভ করে, জগৎটাও নূতন রকমে দেখে। এ জগৎ সম্বন্ধে বিচার বা বিতর্ক ভেদ জ্ঞানে বিকার আর থাকে না। তখন থাকে শুধু সঞ্চার। সে অবস্থায় সাধকের নিজের স্বার্থ-সম্পর্কিত সব ক্রিয়া লোপ পায়। মধুর শক্তিই তাহাকে চালায়। প্রকৃতপক্ষে মধুরের ধর্মই হল প্রভাব বিস্তার করা। আর সঞ্চার-সূত্রে বিচারের বিলোপ সাধন করা। আমরা জগতে যাকে মধুর বলি, যাকে ভালবাসি, তার ক্রিয়াও এইরকম। অফিসে কাজের সময় আমি ছেলের কথা ভুলতে চেষ্টা করলেও সে আমার বাধা সত্ত্বেও আপন হয়ে এসে হেসে দাঁড়ায়। আমার ক্রিয়া অপেক্ষা করে না। তার লীলা আমার উপরে খেলতে থাকে। এতো সব পার্থিব ভালবাসার ব্যাপার। অপার্থিব যে প্রেম সে মাধুরীর কত চাতুরী তা ধারণা করুন। তার কাছে আমার সকল জারিজুরি ভেংগে যায়, আর মন অনির্বাণ আকুতিতে তাকেই চায়, অন্য বিচার আর সে ক্ষেত্রে রয় না। বিশ্বের ঘটপট বিভিন্ন সূত্রে সেই-বেদনা আমাদের হৃদয়ে দানা বেঁধে উঠে, আর ঘেঁসে মিশে একেরই চেতনা মনের অনুভূতিকে অখণ্ড আপ্যায়নে রঞ্জিত করে ফোটে। এখানকার চোখে যাকে জড় বলে মনে করছি, সে যেন হেসে এসে বুকে মিশে বলে ধরো আমাকে ধরো, আমি তোমার পর নই। এ অবস্থায় জড় বলে কোন জিনিষই গণ্য হয় না, সবই চৈতন্য, সবই বদান্য, সবই করুণ, আর তার স্পর্শে বুকে বিলসিত হয় তারুণ্য। জীবনে কোন কার্পণ্য বা দৈন্য আর থাকে না। প্রেমের এই ধর্ম, সে উপাধি জ্ঞান রাখে না। উপাধি জ্ঞান তো দেহের সম্বন্ধ বা স্বার্থ-সম্বন্ধকে ভিত্তি করেই হয়। কোন ক্ষেত্রে যদি ভালবাসা একটু দানা বেঁধে উঠে, তবে উপাধির সম্বন্ধে সে ক্ষেত্রে আমরা কানা হয়ে যাই। বেদনার সূত্রে তার সংগে আমাদের অন্তরে অভেদবোধে চেতনাগত যোগ হয়, আর সে আমাদের আপনা হয়ে পড়ে। রস-সাধনার পথে এগিয়ে গেলে এই সত্য সুস্পষ্ট ভাবেই জীবনে অনুভব হয়। গভীর প্রেমের বেদনায় গাছ লতায় পাতায় যে চেতনা খেলছে, তার সংগে আমাদের চিত্ত সমধর্মী হয়ে যায়। যেখানে বেদনা সম্পর্কে চেতনা ভাবের আনাগোনা সেখানে মনে ভাবগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ভাষাও বোঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে ভাষা ভাবেরই বাহন। গূঢ় বেদনার সূত্রে বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত জীবন-দেবতার ভাবের প্রেরণা আমাদের ভিতর এলে বিশ্ব-প্রকৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন নূতন ভাষা খোলে। জড়প্রকৃতির ভাষা আমরা বুঝি না, কিন্তু প্রেমের দৃষ্টি যদি একবার খুলে যায়, তবে বিশ্বপ্রকৃতির মূলে যে শক্তি রয়েছে, তা আমাদের কাছে ব্যক্ত হয়ে দাঁড়ায়। তার হাসা ভাষা আমরা বুঝতে পারি; আর লীলামাধুরী আস্বাদ করতে সমর্থ হই। দেহের গর্বে এখন যেমন সকলকে তুচ্ছ করে চলছি, তখন আর তেমনটি সম্ভব হয় না। গাছ, লতাপতা থেকে ধূলিকণা পর্যন্ত আত্মীয়তার মাধুরী-লীলায় আমাদের দৃষ্টিতে জীবন্ত হয়ে উঠে। সকলেই নড়াচড়া আর একান্ত আত্মীয়তায় যেন আমাদের গলাগলি ধরা, এমন উপলব্ধি হয়। বীজের যেমন অংকুর থাকে, তেমনই বিশ্ববীজের মধ্যে সেই একই চীজ; আমাদের সেই আপনজনের আকিঞ্চনই আমাদের চোখে উন্মুক্ত হয়। বীজাংকুরের মতই এ লীলা নিত্য গোপন; কারণ গোপনীয়তাই সনাতন যে মাধুরী তার চাতুরী। সে কোন দিনই শেষ হয় না—অশেষ রসের দেশে আমাদের মনকে নিয়ে লীলারসে গিয়ে মিশে। লতাটি পাতাটি দেখে আজ হেলে ফেলে দলে চলে যাচ্ছি, তখন তার মধুর বোলে তাকে কোল দিতে ইচ্ছা হয়—আর সে দোলে দেহের কোন গোলই থাকে না। বিকারবিহীন কেবল সঞ্চার। এই অবস্থায় বিশ্ববীজে কামবীজের সাধনা আরম্ভ হয়। সাধক নিজের শুধু মনকে নয়, দেহকেও প্রেমের টানে দান করে পরম পুরুষার্থতা লাভ করেন। দেহের সকল চেতনার সচল, সবল এবং সফল আবেশে রসের রাজ্যে প্রবেশ করেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত শক্তি তাঁকে আরতি করে আনন্দময়ী মূল-প্রকৃতি বা রাধারাণীর দেশ নিত্যধাম বৃন্দাবনে নিয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে রসের এই সাধনার জড়ের সব উপাধি লোপ হয়ে গেলে থাকে কি? থাকে ভাব। বিচার লোপ হ'য়ে গেলে থাকে কি? থাকে সঞ্চার। এজগৎটাই উপাধি—এজগৎটাই বিচার। এ ভাষা এবং এমন ভাষা যে, আমরা বুঝি না, তাই সোজাসুজি ধরতে পারি না, এবং বোঝা হয়ে পড়ে এ বস্তু আমাদের পক্ষে। জগৎরূপ ভাষার ছন্দে ছন্দে যা বলা হচ্ছে, বিচার ভুলে আমাদের মন স্বচ্ছন্দে তাতে দুলে উঠে না। এর বাক্য আমাদের হৃদয়ে ঐক্য করে ধরতে পারি না। জীবনের এইখানেই যত সমস্যা। উপাধিকে এড়িয়ে, ভাষার রাজ্য ছাড়িয়ে, মন যদি একবারে হৃৎ-কর্ণে এ ভাষা ধরতে পারে, তবে বুঝে সকল দিক থেকে তার 'স্ব'ত্বই এ বিশ্বের ভাষায় ব্যক্ত হচ্ছে। সবাই বলছে, 'আমি তোমার' 'আমি তোমার'। এই 'স্বর' ভাবে বা স্বভাবে যখন মন অবস্থিত হয়, তখন ভেদ ভাব আর থাকে না, সকলের বোলে আমাদের কোলে দোল জেগে উঠে; সকলকে আমরা আত্মীয়তার সূত্রে একই দৃষ্টিতে দেখি। উপাধি ভেদের অভাব হ'লে বিভিন্ন ভাব বিলীন হয়ে গিয়ে মহাভাবের দ্যোতনা জীবনে সঞ্চারিত হয়। আনন্দময় রসের এক গূঢ় গতি আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত হয়ে, আমাদের নিত্য প্রীতিতে বিলসিত এবং বিকশিত করে তুলে। দৃষ্টির এই পরিবর্তনই রস সাধনার বড় কথা। দৃষ্টির যদি পরিবর্তন না হয়, আমি যদি গাছকে গাছই দেখি, লতাকে লতাই দেখি, লোষ্ট্রে এবং স্বর্ণখণ্ডে আমার দৃষ্টি ভিন্ন থাকে, তবে বুঝতে হবে সাধনা আমার ভিতর লীলার চেতনা জাগাতে পারে নি। এরূপ ক্ষেত্রে ভগবান্ বুদ্ধের ভাষাতেই বলতে হয়, কিং তে জটা হি দুম্মেধো কিং তে অজিনসাটিয়া, অভ্যন্তরং হি গহনং বাহিরং পরিমজ্জসি? তোমার জটায় কি করবে, তোমার অজিনে কি করবে, তোমার ভিতরে আগাছার জংগল রয়েছে, তুমি কেবল বাইরে মাজছ, ঘসছ—কিন্তু—কবি কংকণের ভাষায়—সোণারূপা নহে বাপা, এ বেংগা পিত্তল ঘষিয়া মাজিয়া তুমি করেছ উজ্জ্বল; আবার দু'দিন পরেই জং ধরে যাবে, ভোল বদলাতে হবে। দৃষ্টি এ পথে বদলে গেলে তবে নূতন সৃষ্টি নজরে পড়ে। বিশ্বপ্রকৃতির আত্মীয়তার কথা আমাদের হৃদয়ে গাথা হয়ে বাজতে থাকে, অনুক্ষণ সে কোমল বচনে একান্ত রসঘন-সংবেদনে হৃদয়ে আনন্দ চিন্ময়রসের বিভংগী জেগে উঠে। দেহের সব কামনা মনোময় মাধুরীর চাতুরীতে বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত প্রেমময় এক পরম সত্যের স্পর্শ রসে যেন মিশে যেতে চায়। একান্ত প্রাণ দেবতার আসংগ অংগে অংগে উদ্দীপনা জাগিয়ে যেন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যে দেহ জড় ভোগের বেদনায় আমাকে উপাধির ভেদজনিত খেদ এনে দিচ্ছে, শুদ্ধ মনের রসঘন সংবেদনের টানে পড়ে তখন সেই দেহই পরম প্রেমের রসঘন মাধুর্যে আপনাকে নিয়ে যেন আপনাতে বিলীন হতে চায়। তখন আর সাধনার দরকার হয় না—পৃথক্ আয়াস থাকে না, দেহের টানেই কাম ছেড়ে প্রেমের রাজ্যে অভিসার আরম্ভ হয়। রায় রামানন্দের জগন্নাথ বল্লভ নাটকে এ অবস্থার অভিব্যক্তিতে বলা হয়েছে, "মঞ্জুতর গুঞ্জদলি কুঞ্জমতিভীষণং মত্তমরুদন্তরগগন্ধ-কৃতদূষণং—সকলমেতৎ ঈরিতং। বিশ্বপ্রকৃতির থেকে যেন মাতাল বাতাস ছুটে এসে আমাদের উপাধির সকল বিচার খুলে ফেলে দিয়ে, জীবন দেবতাকে বুকে বুকে পাবার জন্যে আকুল করে তোলে। উপাধি থাকে না—সেই পরম স্পর্শের সংবেদনময় আনন্দের উদ্দীপনায় প্রাণ দেবতার সংগে রংগ সম্পর্কময় অসংশয় চেতনাই শুধু থাকে। পতিব্রতাজন যেন পতি। অন্যত্র না চলে মন; প্রকৃতপক্ষে অন্যত্র বলে কোন সত্যই তখন আমাদের সতর্কতায় দীপ্ত থাকবার সুযোগ পায় না। বিশ্বের উপাধি হ'তে তখন আমাদের বিধি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলো নিধি পেলো, ভাষা থেকে ভাব পেলো, শব্দ থেকে অর্থ পেলো, বোলের মধ্যে কোল পেলো। শব্দ থেকে এভাবে অর্থে যাবার, ভাষা থেকে ভাবের রাজ্যে যাবার, উপাধি ছেড়ে নিধি লাভ করবার সাধনার রীতি আছে। বেদে, উপনিষদে এবং বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন ভাবে এই রস-সাধনার কথাই বলা হয়েছে। শব্দের সংগে অর্থের সংগতিই সাধনা। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই বেদ—প্রাণময় দেবতার নিঃশ্বাস; কিন্তু আমরা প্রাণের অভাবে হাঁসফাঁস করছি, প্রাণময় শব্দের অর্থ বুঝতে পারছি না, ভাষায় দিশাহারা হয়ে ঘুরছি, ভাব লাভ আমাদের পক্ষে আচারে বিচারে শতপ্রকারে এবং পাণ্ডিত্যের জোরে হচ্ছে না। আমরা 'হরি' শব্দ শুনছি, কিন্তু "প্রেম দিয়া হরে মন" এই অর্থের সংগে আমাদের মন যুক্ত হচ্ছে না। নাম সাধনার এই হলো গূঢ় কথা। শব্দের ভিতর আত্মীয়তার মাখা উক্তি এবং সেই উক্তির মাধুর্যময়ী শক্তি, আর সেই শক্তির লীলা-বিভংগীময় ব্যক্তি। এই মিলনেই মরণ জয় হ'লো এবং জীবন সার্থক হলো। অনন্ত বসন্তের রাজ্যে আমাদের অবস্থান হলো। আমরা যেন জীবনকে তুচ্ছ করে না দেখি, মানুষের জীবন মরবার জন্যে নয়, আনন্দময় অনন্ত জীবনের সংগে মননসূত্রে যোজনের প্রয়োজনের বেদন এবং তদুপযুক্ত আয়োজনও এতে রয়েছে। বসন্তের আবেশে এ হাসি, এ নাচ ক্ষণিক নয়, একে স্থায়ী করা চলে—প্রেমের বলে। আর সেই প্রেমের সাধনা এ দেশের তত্ত্বদর্শিগণ জগৎকে দান করে গেছেন। পাশ্চাত্যের চাকচিক্যময় কাচের প্রলোভনে আমরা যেন সে কাঞ্চনকে

বিকিয়ে না দেই। সুযোগ তো রয়েছে, সেই কথাটাই বলবো। কিন্তু এ বিষয়ে আমার যোগ্যতা কিছুই নেই।

যাঁরা এই সাধন-পথের পথিক, শুধু তাঁরাই বৈষ্ণব রসতত্ত্বের এসব গূঢ় লীলা বুঝতে পারেন। আর সে পথের গতি-প্রকৃতি উপলব্ধি করবার সামর্থ্যও তাঁদের মধ্যেই সম্ভব হতে পারে। আজ আপনাদের কাছে শুধু এই কথাটাই বলতে চাই যে, আমরা যেন কোলে বোলে এক ক'রে নিতে পারি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়েই তো আত্মীয়তার বোল বাজছে; কিন্তু সে বোলে কোল মেশান দেখতে পাচ্ছি না। তাই দোললীলা আমাদের কাছে সার্থক হ'ল না। 'Water Water Everywhere not a drop to drink' আমাদের অবস্থাও যেন কতকটা এই রকম হয়েছে। প্রেমের ঠাকুর ঘটেপটে সকল সূত্রে আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন; কিন্তু আমাদের কাছে তা বৃথা হ'চ্ছে। জীবনে আমাদের রস নাই, আনন্দ নাই—ঠাকুর প্রেমানন্দ দাসের ভাষায় বলা যায়—আমরা প্রকৃতির বাঁঘিনী মুখই সর্বদা দেখতে পাচ্ছি, তার হ্লাদিনী রীতি আমাদের দৃষ্টিতে মূর্তি ধরে উঠছে না। বসন্তের বাতাস জীবনে এলো আর গেলো; কিন্তু আমরা বাসন্তী প্রকৃতির বোলে প্রেমময় দেবতার কোলের স্পর্শ পেয়ে দোললীলা জীবনে সার্থক করতে পারলাম না। জগতের এই দুঃখ দূর করবার জন্যে বাঙলাদেশে এক মধুর লীলা হ'লো। তেমন লীলা আর কোন দিনই হয় নাই। যিনি আপনজন তিনি চেতনাময় বেদনা নিয়ে আমাদের কাছে একেবারে নড়াচড়া হ'য়ে ধরা দিলেন। শচীমায়ের কোলে অবতীর্ণ হলেন। যার বোল দোল দিচ্ছিল বিশ্বপ্রকৃতিতে, তিনি বোলের সঙ্গে কোল মিশিয়ে আমাদের সাধন-ভজনের সকল গোল ঘুচিয়ে দিলেন। মহাপ্রভু এসে দোল-লীলার গোপনতত্ত্ব জগতে ব্যক্ত করলেন, কে'দে কে'দে বোলে কোলে এক ক'রে বেদের অন্তর্নিহিত গূঢ় সাধনাকে জগতে আবার প্রতিষ্ঠিত করলেন। বাঙলার এই প্রেমের ঠাকুরের চোখের জলে ভাসা বোলের সঙ্গে কোল দেওয়ার লীলা যদি আমাদের মনকে স্পর্শ করতে পারে, তবে জীবন সার্থক হবে। আমাদের গোপন আপন দেবতার বেদনা তো আমরা কোন দিন বুঝিনি, আমাদের জন্যে এমন চোখের জলে ভেসে তিনিই আমাদের কোল দিলেন, এতেও আমাদের চেতনা হবে না? আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থের সংস্কার ভুলে প্রেমের দোলে সকল উপাধি ভেদের সংস্কার ভুলে তাঁকে কোল দিতে পারব না? নইলে তো আমাদের এই পতিত-জীবনে অন্য কোন সার্থকতাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।*

* শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী হলে বাণী সমাজের উৎসব-সভায় 'দেশ' সম্পাদকের বক্তৃতার অনুলিপি।

গত সংখ্যার প্রশ্নগুলির উত্তর

১। বিগত ১৮৬৩ সালের ৫ই অক্টোবর তারিখে চার্লস্টন বন্দরের নিকটবর্তী সমুদ্রবক্ষে ফেডারেল নৌবহরের "নিউ আয়রন সাইড্স্" নামক প্রধান যুদ্ধ জাহাজ-খানির পার্শ্বদেশে "ডেভিড" নামক টর্পেডো-বোট থেকে প্রথম টর্পেডো হানা হয় এবং তাতে যুদ্ধ জাহাজখানির গুরুতর ক্ষতিসাধন হয়।

ফেডারেল নৌবহর চার্লস্টন্ বন্দরের উপর যখন ক্রমাগত গোলা বর্ষণ করছিল, তখন ডাঃ সেণ্ট জুলিয়েন র‍্যাভেনেল্ (Dr. St. Julien Ravenel) নামক একজন চিকিৎসক ও কৃষিকার্য সংক্রান্ত রসায়নতত্ত্ববিদ্ একটা পুরানো ও অব্যবহার্য বলে পরিত্যক্ত রেল ইঞ্জিনের বয়লার থেকে এই টর্পেডো-বোটখানি তৈরি করেন। এই বোটখানির আকার ছিল চুরুটের মতো এবং দৈর্ঘ্য ছিল ৩০ ফুট ও প্রস্থ ৫½ ফুট। একটা ক্ষুদ্র বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের সাহায্যে এই বোটখানি চালানো হত। এর উপরের ১০ ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট অংশ ছাড়া আর সমস্ত অংশ জলের নীচে ডুবে থাকত। পৃথিবীর ইতিহাসে এই "ডেভিড"ই প্রথম টর্পেডো-বোট এবং ১৮৬৩ সালের ৫ই অক্টোবর তারিখে সর্বপ্রথম সফলতার সঙ্গে এ থেকে যে আঘাত হানা হয়েছিল,—সে-ই জল-যুদ্ধের ইতিহাসে প্রথম টর্পেডোর আঘাত। এর পর থেকেই টর্পেডো দেখা দিল জলযুদ্ধে এক নৌ-বিধ্বংসী, আতঙ্ককর প্রচণ্ড অস্ত্ররূপে।

২। আমেরিকার যে প্রথম প্রেসিডেণ্ট বেতারে বক্তৃতা করেন, তাঁর নাম মিঃ হার্ডিং। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর বক্তৃতা বেতারযোগে প্রথম প্রচারিত হয়।

৩। রামধনুর ঠিক মধ্যবিন্দুর উপরকার আকাশে এরোপ্লেন থেকে দেখলে দেখা যাবে, রামধনু অর্ধবৃত্তাকার নয়, পরন্তু সম্পূর্ণ বৃত্তাকার।

৪। উট্ পাখী।

৫। 'হামিং বার্ড' (Humming Bird) নামে এক প্রকার পাখী আছে। তারা পিছনের দিকেও উড়ে যেতে পারে। ভ্রমর ইত্যাদি পতঙ্গের পক্ষ সঞ্চালন থেকে যেমন গুঞ্জনধ্বনি হয়, ওড়বার সময় এদের পাখা নাড়ার ফলেও তেমনি গুঞ্জনধ্বনি হয় এবং এইজন্যে এদের নাম হয়েছে 'হামিং বার্ড'।

৬। খাবার নীচেকার নরম মাংসপিণ্ড, নাক ও জিভ—কুকুরের শরীরের এই কয়েকটি অংশ ঘামে।

৭। সে রাত্রি ১২টার সময় বাড়িতে ফিরেছিল। দরজা খুলতে খুলতে সে ১২টা বাজার শেষ আওয়াজটা শুনতে পেয়েছিল।

৮। এমন অবস্থান-ক্ষেত্র কেবল উত্তর-মেরুতেই সম্ভব। কাজেই শিকারী যে ভালুক শিকার করেছিল, তা মেরুদেশের এবং তার রং ছিল সাদা।

মৃতের নালিশ

শ্রীঅরুণকুমার সরকার

তুমি ভুলে গেছ কারা একদিন
পথে পথে গেছে কাঁদি'
একমুঠি চাল, একফোঁটা ফেন
দুয়ারে দুয়ারে সাধি'।
তারা ত তোমার কেহ নয়, শুধু
পথের ভিখারী তারা,
ভুলে গেছ তাই পরিচয়, তাই
ভুলেছ এমন ধারা।
কথাটি না ক'য়ে মরেছে তাহারা
নীরবে পথের ধারে,
মরিবার আগে অভিশাপ তারা
দিয়ে গেল নাক' কারে,
শুধু তাহাদের চোখের কোণায়
এই আশা ছিল লেগে,
তাদের মরণে তাদের দেশের
ভায়েরা উঠিবে জেগে।
চোখের জলেতে পথের ধুলায়
লিখে রেখে গেল তারা
এ-অপরাধের প্রতিশোধ নেবে
পিছনে রহিল যারা।
তোমাদের কাছে নালিশ জানায়
মৃত আত্মার দল,
আজিকে কি তবে ব্যর্থ হয়েছে
তাদের চোখের জল!
নেবে না তাদের প্রতিশোধ যারা
না-খেয়ে মরিল পথে,—
মৃত আত্মারা কাঁদিয়া শুধায়
মরণের পার হ'তে।

নবযুগ

শ্রীশরৎচন্দ্র দত্ত

শ্বাসরুদ্ধ পৃথিবীর চোখে
রক্তক্ষয়ী দুঃস্বপ্নের ভয়াল কাহিনী:
সর্বব্যাপী ধর্মধ্বজী উদ্ধত বাহিনী
গেয়ে ফেরে অপরূপ উদার বন্দনা—
তবু আসে মন্বন্তর মহামারী পীড়ন বঞ্চনা!
মুমূর্ষুর হাহাকারে বিমর্ষ বাতাস:
পথপ্রান্তে মর্মান্তিক মৃতের মিছিল—
ফেলে যায় তীব্র দীর্ঘশ্বাস!
চির বহমান
ভারবাহী জীবনের এই অসম্মান?
রুধিরাক্ত ধরণীর পুঞ্জীভূত পাপ:
ভেসে যায় ধ্বংসের বন্যায়—
ঈশানী ঝড়ের শেষে নতুন আভায়—
দিগন্তেতে রাহুমুক্ত সূর্যের প্রকাশ—
রক্তের মন্থনে ওঠে অভিনব অমৃত আশ্বাস!
নবযুগ স্রষ্টা তাই:
দিক্‌ভ্রান্ত দানবের যায় আজ হে'কে—
মহত্ত্বের নবজন্ম আনে হেথা ডেকে!

গঙ্গোত্রী

সুবোধ ঘোষ

(১৭)

কেশব বললো—এখানে আর তোমার কোন কাজ নেই বোধ হয়, চল, তোমায় বাড়ি পেঁ'ছে দিয়ে আসি।

মাধুরী—না, এখন আর কোন কাজ নেই। মনে হচ্ছে, এ গাঁয়েও আর আমার কোন কাজ নেই।

কেশব আর মাধুরী ফেরার পথে গল্প করে চলেছিল। গাঁয়ের পথের দুপাশে ঘাস আর গাছের পাতায় ধুলো ছড়িয়ে আছে। দু'দিন ধরে জনতার ছুটোছুটিতে গাঁয়ের পথের চেহারাটা যেন বিভ্রান্ত হয়ে আছে। এক পশলা ঠাণ্ডা বৃষ্টি অঝোরে ঝরে না পড়লে এই ধুলো আর মিলিয়ে যাবে না। দূরে দীনুবাবুদের বাগানের ভেতরে ছোট একটা ঝড় যেন বন্দী হয়ে ছটফট করছিল। কয়েকটা শিমুল যেন উৎসবের আনন্দে বিহ্বল হয়ে রাশি রাশি সাদা তুলো ছড়াচ্ছিল চারদিকে। বাগানের কিনারা ঘেঁসে ছায়ার চিহ্ন ধরে চলেছিল দুজনে।

কেশব বললো—এ গাঁয়ে আর কোন কাজ নেই, এর অর্থ বুঝলাম না।

মাধুরী—অর্থ খুব স্পষ্ট।

কেশব—আমার কাছে খুবই অস্পষ্ট।

মাধুরী—আপনি থাকতে এগাঁয়ে আমি কোন কাজ করতে পারি না।

কেশব—তা'হলে আমিই তোমাকে বড় অসুবিধায় ফেললাম।

মাধুরী—ফেললেন বৈকি।

কেশব—আমার জেল থেকে খালাস পাওয়াই বোধ হয় অন্যায় হয়েছে।

মাধুরী চুপ করে রইল। ঠিক এতটা স্পষ্ট করে মাধুরী হয়তো বলতে চায়নি।

কেশব আবার বললো—আমি যদি এগাঁয়ে না থাকি, তবে তোমার কোন অসুবিধা নিশ্চয় হবে না।

মাধুরী—এটা তোমার গাঁ কেশবদা। এখানে তুমি থাকবে না, এটা অস্বাভাবিক।

কেশব—তোমার গাঁ নয়?

মাধুরী—আজ আপনাকে একটা সত্যি কথা বলবো কেশবদা।

কেশব—বল।

মাধুরী—গাঁয়ে ফিরে এসেছি, কিন্তু চিরদিনের জন্য এসেছি ভাবতে গেলে...।

কেশব হেসে ফেললো—সেই কথাই আমি তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম।

মাধুরী—কেন এরকম হলো কেশবদা?

কেশব—তোমার দোষ নেই।

মাধুরী—এক এক সময় মনে হয় এ সবই তোমার দোষ।

কেশব—হ্যাঁ আমারই দোষ। বিলেত যাবার পথ খোলা পড়ে থাকতে জেলে চলে গেলাম, তাও আমার ফৌজদারী দায়ে।

সেইখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো মাধুরী। কেশব বললো—তুমি কিছু চিন্তা করো না মাধুরী। আমি তোমাকে চমকে দেবার জন্য কোন কথা বলছি না। তুমি বদলে গেছ, কোন অন্যায় করনি। মানুষ মাত্রই বদলে যায়। আমিও বদলে যাব একদিন।

মাধুরী তবু চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কেশব যেন নিজের মনেই বলছিল—সবারই জীবন চুপ করে বসে থাকে না। পাঁচ বছর আগেও একথা আমি জানতাম। কিন্তু তখন সেই সঙ্গে আর একটা বিশ্বাস ছিল—যে তুমি আমি ভবিষ্যতে বদলে যাব একই নিয়মে। সেই পরিবর্তনে তুমি আমার কাছে পর হয়ে যাবে না। আমিও পর হয়ে যাব না।

মাধুরী—আজ কি সেই বিশ্বাসের কোন ব্যতিক্রম দেখছ?

কেশব—হ্যাঁ, তুমি বদলে গেছ, আমার অপেক্ষায় না থেকে।

মাধুরী—আজ আর আপনার সঙ্গে কথা বলার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছি না কেশবদা। বলতে গেলে, আমার কথা আরও দুর্বোধ্য হয়ে যাবে।

কেশব—তুমি কোনদিন আমার কাছে দুর্বোধ্য হবে না, হতে পার না। থাক সেসব কথা। আজ এইখানেই বিদায় নিলাম।

কেশব চলে গেল। মাধুরী দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ। এতক্ষণ আলাপের মধ্যে একটা সত্য সকল বাধাবন্ধ ঠেলে যেন নিজের জোরে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়ে গেল। কেউ কারো কাছে দুর্বোধ্য নয়, কেউ বোধ হয় বদলে যায় নি। প্রত্যেকের এক একটি কথার আড়ালে প্রত্যেকেই অনায়াসে বুঝে ফেলতে পারে তার মধ্যে যা-কিছু অভাষিত ছিল। কিন্তু আজকের দুপুর শেষ হয়ে সন্ধ্যা নামবে, তারপর রাত্রি। সেই রাত্রিও কেটে যাবে গাঁয়ের অন্ধকারের নিঃশব্দ স্রোতে পাড়ি দিয়ে। কিন্তু তারপর? কাল সকালে উঠে আর কোন নতুন কাজের খেই খুঁজে পাবে না মাধুরী। যতক্ষণ কেশব ভটচায এ গ্রামে আছে, ততক্ষণ তার অস্তিত্বকে ভুলে থাকা মাধুরীর পক্ষে একেবারে অসম্ভব। মাধুরীর প্রত্যেকটি কাজের স্বাধীন আবেগকে অদৃশ্য সূত্রে যেন পেছন থেকে টানবে কেশব ভটচাযের নীরব আত্মগোপন। যেখানে কেশব ভটচাযের চোখের দৃষ্টি সজাগ হয়ে আছে, সেই আসরে গিয়ে দাঁড়াবার মত প্রহসন সৃষ্টি করতে চায় না মাধুরী।

হ্যাঁ, সেই কথাও মনে পড়ে যায় হঠাৎ। কেশবকে বিলেত গিয়ে পড়বার খরচ দিতে রাজী হয়েছিলেন সঞ্জীববাবু। যদি কেশব রাজী হতো। মাধুরী ভাবতে গিয়ে কোন পরিণাম কল্পনা করে উঠতে পারে না। ঘটনার গতি কোন্ দিকে মোড় ঘুরে চলে যেত কে জানে? পরিতোষের আবির্ভাব হতো না। কেশব নিজে ইচ্ছে করে এক-রোখা স্বভাবের দোষে সঞ্জীববাবুর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিল। তা না হলে মাধুরীর কাছে আজ সম্মুখের জীবনের ক্ষেত্র সম্মুখের পথ—কিছুই অস্পষ্ট ও সংকুচিত হতো না। কোন দ্বিধাদ্বন্দ্বের বিড়ম্বনা দেখা দিত না।

সেকথা মনে পড়ে, কেন বিলেত যেতে চায়নি কেশব? বিলেত গিয়ে ম্লেচ্ছত্ব শিখবার ভয় আছে, সেজন্য নয়। বিলেত গিয়ে ইংরেজ-ভজনা শিখতে হবে, সেই অধঃপাতের আশঙ্কার জন্য নয়। কেশবের একমাত্র আশংকা ছিল মাধুরীর কাছে হেসে হেসে নিজেই সেকথা জানিয়ে দিয়েছিল—বিলেত গিয়ে বদলে না যাই।

এ কিসের বদল, তা ভাষ্য করে বোঝবার কোন দরকার মনে করেনি কেশব। কারণ, যার কানে কানে একথা বলা হয়েছিল, সে সমস্ত হৃদয়ের আগ্রহ দিয়ে এ বাণীর অর্থ বুঝতে পেরেছিল একদিন। সব বদলে যাক্, শুধু যেন হৃদয়ের কোন বদল না হয়। যে আশ্বাসে ও নিষ্ঠায় আজকার হৃদয়ের অনুরাগ সত্য হয়ে রয়েছে, তার কোন পরিবর্তন হয় না। সেখানে পরিবর্তন অর্থই অধঃপতন, সকল বিশ্বাসের অসম্মান।

হঠাৎ যেন মাধুরীর অন্তর্লোক থেকে

একটা [illegible] মত দৃষ্টি ঝাপসা করে আনে। বিলেত গিয়ে সত্যিই লোকে বদলে যায়। কি-এমন মোহ আছে সেখানে। এত সুন্দর ভারতবর্ষের রূপে যারা লালিত, তারা বিদেশে বিলেতে গিয়ে ভুলে যাবে কোন্ ছলনায়? পরিতোষ বিলেতে রয়েছে। তার মনে কোন দিন এ দুর্বলতা ছিল না, মাধুরী সেকথা ভাল করে জানে। পরিতোষের প্রতিভায় সেই শক্তি আছে। শত কাজের ভিড়ে থাকুক পরিতোষ, শত রূপে আর নতুন বৈভবের মোহ তার সম্মুখ দিয়ে যাওয়া-আসা করুক, কি করে সে ভুলে যাবে দূর স্বদেশের একজোড়া প্রতীক্ষাকুল দৃষ্টির অহরহ কামনা। পরিতোষও বিলেত গেছে, বদলে যাবার জন্য নয়। যেমনটি সে গিয়েছে, তেমনি ফিরে আসবে।

মাধুরী বুদ্ধিমতী মেয়ে। তার সবচেয়ে বড় গুণ—সে নিজেকে বিচার করতে পারে। স্পষ্ট করে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা বলতে পারে। যুক্তি না পেলে যুক্তি খুঁজতে চায় না। কেশব ভটচায সেই পাঁচ বছর আগেকার গাঁয়ের ছেলে হয়ে আজও রয়ে গেছে, এই অপরিবর্তনীয় নিষ্ঠাকে মাধুরীর ভাল লাগেনি, কিন্তু আজ সেই মাধুরী সকল মনের ভয় আশংকা ও আগ্রহ দিয়ে কামনা করে, পরিতোষ যেন বদলে না যায়। অবিচল ও অপরিবর্তনীয় হয়ে থাকুক পরিতোষ। আরও তিন বছর পরে সে ফিরে আসবে, কিন্তু এর মধ্যে যেন ব্যতিক্রম না হয়।

মাধুরী তার ভুল বুঝতে পারে। তার দুর্বলতা বুঝতে পারে। কেশব ভটচায তার হৃদয়ের পারধি থেকে দূরে সরে যায়নি, অবিচল হয়েই ছিল। কিন্তু মাধুরীই তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কেশব ভটচাযের অপরিবর্তনীয়তা তার কারণ নয়। মাধুরী আজ মনে প্রাণে চায়, যেন কেউ বদলে না যায়। হৃদয়ের সাথীত্বে যেন পথ বদল না হয়। তবু কেন যে কেশব ভটচাযকে আজ ভয় করে, পরিতোষের জন্য মায়া হয়, কোন কারণ খুঁজে উঠতে পারে না মাধুরী।

বাড়ির দিকে এগিয়ে চললো মাধুরী। ভবিষ্যৎকে যদি সহজভাবে, সকল আনন্দে পেতে চায়, তবে এভাবে আর চলতে পারে না। সকল বিষয়ে স্পষ্ট হয়ে যাওয়াই ভাল। নিজের মনের কামনাকে সত্য-মিথ্যা করার জন্য কোন অজুহাত খুঁজে লাভ নেই। যা মন চায়, তাকেই সে স্বীকার করে নেবে। নিজেকে সকল জটিলতা থেকে মুক্ত করতে হলে আজ এই সত্য বিনা দ্বিধায় ঘোষণা করার সময় এসে গেছে। কেশব ভটচায পাঁচ বছর আগেকার কাহিনীর মধ্যেই কিশোর দিনের সেই নতুন আলোর প্রীতির শিখরে অটুট হয়ে থাকুক, কিন্তু শুধু এক স্মরণীয় ও বরণীয় কাহিনীর মধ্যেই। কোন দিক দিয়ে আজ আর সেই কাহিনীকে জাগিয়ে তোলবার ভরসা নেই, সেই নিয়মও নেই যেন। কেশব ভটচাযও জেনে শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে যাক্, যেন পুরাতনের দাবী তুলে সে বর্তমানকে আর বিভ্রান্ত না করে। সুখে থাকুক কেশব, কোন দিন তার ওপর মাধুরীর কোন ঘৃণা না আসে। কেশবদা—হোক্ না গ্রাম্য নিরীহ বিশ্বাসী অবিকার প্রেমের উপাসক কেশবদা। কেশবদা বুঝুক, পৃথিবীতে অনেক ঘটনা আছে, যা বিনা কারণেই আসে, বিনা কারণেই ইতস্তত উধাও হয়ে যায়। আবির্ভাব তিরোভাবের কোন ছন্দোবাঁধা নিয়ম নাই। এ সত্য বুঝতে পারলে কেশব ভটচাযেরও অনেক ভুল চুকে যাবে, অনেক ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হবে। এতে কেশব ভটচাযের উপকারই হবে।

আর দেরী করা উচিত নয়। আর একটু পরেই খাওয়া-দাওয়া সেরে কেশবদার বাড়ি যাবে মাধুরী। জেঠীমার সঙ্গে দেখা করতে হবে। আজ আর মনের মধ্যে কোন সংকোচ বয়ে নিয়ে যাবে না মাধুরী। পাঁচ বছর আগের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যে ও সরল আবেগে পাঁচ বছরের ঘোর দুর্জ্ঞেয় ব্যতিক্রমের সত্যটুকু ঘোষণা করে আসবে।

ঘরে ফিরে নানা কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না মাধুরী। জীবনের একদিকের বাধা ও ভ্রান্তিকে আজ অস্বীকার করার প্রতিজ্ঞা সে নিয়েছে। সেই সাহস তার আছে। কিন্তু তবু কেন সে নিশ্চিন্ত হত পারে না? একদিকের দ্বন্দ্ব মিটে গেলে, আর একদিকে কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। সেদিকে মিলনের পথ আপনিই খুলে যায়। কেশব ভটচায যদি বিনা বেদনায়, বিনা অনুশোচনায়, বিনা চোখের জলে আজ তার জীবনে অস্বীকৃত হয়ে যায়, তবে পরিতোষ তার কাছে আর কোন সমস্যাই নয়। পরিতোষের আবির্ভাব না হলে কেশব ভটচাযও তার জীবনে কোন সমস্যারূপেই দেখা দিত না। অঙ্কের মত যে-নিয়মকে সত্য বলে মনে হয়, পর মুহূর্তে সেই সত্যে সংশয় আসে কেন? আবার পরিতোষের কথা ভাবতে হয় কেন?

সঞ্জীববাবু বলছিলেন—কালই ফিরে যাব মীরগঞ্জে। এখানে তোর তো আর কোন কাজ নেই মাধু?

মাধুরী অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল—না।

সঞ্জীববাবু—সবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

মাধুরী—হ্যাঁ।

সঞ্জীববাবু—কেশবের মা'র সঙ্গে একবার দেখা করতে ভুলিস্ না।

মাধুরী—হ্যাঁ, আজই দেখা করবো।

সঞ্জীববাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—যদি কেশবের সঙ্গে দেখা হয়, তবে আমার কাছে একবার আসতে বলিস্।

মাধুরী—বলবো।

সঞ্জীববাবু একটু আশ্চর্য হলেন। তিনি হয়তো মাধুরীর কাছে একটু আপত্তির কথা শোনার জন্যই প্রস্তুত ছিলেন। এসব কথার উত্তরে একটু আপত্তি করাই মাধুরীর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু কেশবের প্রসঙ্গে মাধুরীর কোন বিচলতার লেশ মাত্র নেই। সঞ্জীববাবু মনের বিস্ময় চেপে নিয়েই যেন তাকিয়েছিলেন। মাধুরীর এতটা সপ্রতিভ নির্লেপ হয়তো তিনি আশা করেননি। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, এ অনুরোধ শুনে মাধুরী একটু বিরক্তই হবে।

সঞ্জীববাবু চুপ করেই রইলেন। মাধুরী ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা চরকা নিয়ে টানাটানি করছিল, সঞ্জীববাবু যেন বিরক্ত হয়ে ডাক দিলেন—কালই মীরগঞ্জে ফিরবো মাধু।

মাধুরী—বেশ।

সঞ্জীববাবু—বড় বেশী হাঙ্গামা বাধছে চারদিকে। না বুঝেসুঝে কোন কাজে হাত দিও না। এসব কাজ তাদেরই সাজে যারা............।

মাধুরী হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলে—কাদের এসব কাজ সাজে বাবা?

সঞ্জীববাবু—আন্দোলন চালাবার মত মাত্র একটি মানুষ আছে এ গাঁয়ে।

মাধুরী—কিন্তু সে এই সব আন্দোলন পছন্দ করে না।

সঞ্জীববাবু—তুই একথা বললেও আমি বিশ্বাস করবো না। তুই যেসব কান্ড করছিস্, এইসব হৈ-চৈ হয়তো সে পছন্দ করে না।

মাধুরী মনে মনে ক্ষণিকের জন্য যেন পরাভূত হয়ে চুপ করে গেল। এই কথাই সে আজ কিছুক্ষণ আগে স্বয়ং তারই মুখ থেকে শুনেছে। কে জানে, হয়তো এই কথাই সত্য।

তার জন্য কোন দুঃখ নেই মাধুরীর। অনায়াসে এই স্বদেশিয়ানার অভিনয় ছেড়ে দিয়ে মীরগঞ্জে চলে যেতে পারে সে। যে সবচেয়ে উপযুক্ত, যে সত্যিকারের অধিকারী, সেই গ্রহণ করুক সকল কর্তব্যের দায়। তবু মাধুরী আর ভুল করবে না। আর নতুন করে কোন দ্বন্দ্ব ডেকে আনবে না জীবনে। আজ এখুনি পরিতোষকে চিঠি লিখতে হবে।

একই ডাকে দু' দুটো চিঠি লেখা হলো পরিতোষকে। কাল রাত্রে একখানা লেখা হয়েছিল, আবার আজ আর একটি। একই সঙ্গে দুটো চিঠি পাবে পরিতোষ, চিঠি পেয়ে সে কি বুঝবে কে জানে। শুধু নিশ্চয় এইটুকু বুঝতে পারবে, মাধুরী একা পড়ে আছে। তার চারদিকে সংকটের ঢেউ রুখে উঠেছে। এমন সময় আর দূরে সরে থাকা উচিত নয়।

চিঠি লেখা শেষ হলে মাধুরী নিজেই আশ্চর্য হয়ে বুঝলো পরিতোষকে সে পত্র পাঠ দেশে ফিরতে লিখেছে।

লেখা শেষ করেও তার হাত কাঁপছিল। যেন ঘোর বিপদে পড়ে ভয়ার্তের মত চিঠির লেখাগুলি পরিতোষকে আহ্বান করছে।

(ক্রমশ)

সাপ্তাহিক সংবাদ

২০শে ফেব্রুয়ারী—পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইলে বিরোধী দলের নেতা শ্রীযুত ভীম সেন সাচার গবর্নমেণ্টের নিয়ন্ত্রণাদেশ অগ্রাহ্য করিয়া উহাতে যোগ দেন।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অদ্যকার অধিবেশনে মুসলিম লীগের ছাটাই প্রস্তাবটি ৫৮—৪৬ ভোটে গৃহীত হয়।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য তাঁহার বরাহনগর বাসভবনে ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

অদ্য কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীটে কমার্শিয়াল মিউজিয়াম হলে ছাত্র-ছাত্রীদের এক সভায় ছাত্রসমাজের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পিত ১৫ দফার সংগঠনমূলক কার্যসূচী কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে কর্মপন্থা অবলম্বন করার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের একটি সাময়িক কমিটি গঠন করা হয়।

গতকল্য ব্যারাকপুর ট্রাংক রোডের উপর খড়দহ থানার নিকট একখানি পুলিশ লরীর সহিত আর একখানি লরীর ভীষণ সংঘর্ষের ফলে ৩ জন পুলিশ কনেস্টবল ও আর এক ব্যক্তি নিহত ও ১০ জন আহত হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারী—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নোত্তরকালে কলিকাতায় ট্রাম গাড়িতে অত্যধিক ভিড় সম্পর্কে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। এইদিন ব্যবস্থা পরিষদের বিগত অধিবেশনে গৃহীত বেঙ্গল লেজিসলেটিভ চেম্বার্স (সদস্যদিগের বেতন) বিলখানি কোনরূপ সংশোধন না করিয়াই ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হয়। বিলে প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যদিগের বেতন ১৯৪৪ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৫০৲ হইতে ২ শত টাকা ও দৈনিক ভাতা ১০৲ হইতে ১৫৲ টাকা করিতে বলা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দল কর্তৃক উত্থাপিত দুইটি ছাটাই প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাবটি বিনা ডিভিসনে গৃহীত হয়। শ্রীযুত রামনারায়ণ সিংহ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অসুবিধার বিষয় আলোচনা করিবার জন্য প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন।

খনির নীচে মেয়ে মজুর নিয়োগের প্রতিবাদ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে অদ্য ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কলিকাতার নাগরিকদের এক বিরাট সভা হয়। নিঃ ভাঃ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বে-আইনীভাবে গৃহস্থের বাড়িতে প্রবেশ করিয়া একটি স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার করিবার অভিযোগে হাওড়ার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ইউ এন সিদ্দিকী জে কেন ও এফ কাসিন্স নামক দুই ব্যক্তিকে দায়রায় সোপর্দ করিয়াছেন।

২২শে ফেব্রুয়ারী—বর্তমানে বাঙলায় যে নিদারুণ অভূতপূর্ব বস্ত্রসংকট ও বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, তাহা নিবারণ করিতে বাঙলা গবর্নমেণ্টের অক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনার্থ অদ্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিরোধী দলের পক্ষ হইতে এক মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। বিতর্কের শেষে মুলতুবী প্রস্তাবটি ৬৫—১০৪ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রসচিব জানান যে, ১৯৪৪ সালের ৭ই নবেম্বর তারিখে বাঙলায় ভারতরক্ষা আইন ও বিধি এবং ১৯৪৪ সালের অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ১২৮৬ জন রাজনৈতিক বন্দী (নিরাপত্তা) এবং ২৩৬৬ জন অ-রাজনৈতিক নিরাপত্তা বন্দী ছিল। উক্ত তারিখে তিন আইন অনুসারে রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা হইতেছে ১৫ এবং কোন অ-রাজনৈতিক বন্দী ছিল না।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—মাদ্রাজের কুলসেকরপতনম হত্যা মামলায় তিনেভেলীর দায়রা জজ দুইজন যুবককে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছিলেন। মাদ্রাজ হাইকোর্ট এই দণ্ড সমর্থন করেন। ইহার পর প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল হয় এবং তাহাও না-মঞ্জুর হইয়াছে। এই মামলা ১৯৪২ সালের আগষ্ট হাঙ্গামার জের।

মিঃ আই বি সেন বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

২৪শে ফেব্রুয়ারী—লাহোরে তিনটি নৃশংস হত্যাকান্ড হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় চিকিৎসক ডাঃ লালচাঁদ, তাঁহার স্ত্রী এবং ভৃত্য একদল সশস্ত্র ডাকাতের আক্রমণে নিহত হইয়াছেন।

আজ সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদে হেদায়েতুল্লা মন্ত্রিসভাকে ২৫—১৯ ভোটে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়।

শ্রীহট্টের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে এক আদেশ জারী করিয়া শ্রীহট্ট জিলায় কংগ্রেস পতাকার প্রকাশ্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধীর সহিত পরামর্শ ও অনুমোদনে প্রিন্সিপাল এস এন অগ্রবাল ছাত্রদের জন্য ১৪ দফা গঠনমূলক কার্যসূচী প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিহারের মীনাপুর থানা লুঠের অতিরিক্ত মামলায় ৭ জন আসামী যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। এই মামলা ১৯৪২ সালের আগষ্ট হাঙ্গামার জের।

জলপাইগুড়িতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা সম্মেলনের অধিবেশন সুরু হয়। ডাঃ বি এস মুঞ্জে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—জলপাইগুড়িতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হয়। পাকিস্থান এবং বাঙলার মন্ত্রি-মণ্ডলীর শাসনপদ্ধতি সমেত দেশের রাজনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে এই অধিবেশনে ছয়টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাঙলার লীগ মন্ত্রীদলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের বিষয় উল্লেখ করিয়া সম্মেলন এই মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙ্গিয়া দিবার দাবী করেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারী—ওয়ার্ধায় মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত হিন্দুস্থানী প্রচার সভার সম্মেলন আরম্ভ হয়।

অদ্য কলিকাতায় স্যার বি এন রাও (কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি), ডাঃ দ্বারকানাথ মিত্র (কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি), প্রিন্সিপাল জে আর ঘরপুরে (পুণা ল' কলেজ), মিঃ টি আর বেঙ্কটরাম শাস্ত্রীকে (মাদ্রাজের এডভোকেট) লইয়া গঠিত হিন্দু আইন কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্ত অদ্য প্রথম সাক্ষ্য দেন।

২৭শে ফেব্রুয়ারী—খান বাহাদুর হাজী মৌলাবক্স সিন্ধুর হেদায়েতুল্লা মন্ত্রিসভায় ষষ্ঠ মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছেন।

জন্য গত রবিবার ভাতার ষ্টেশনস্থ (বর্ধমান) মাধব পাবলিক হাইস্কুল প্রাঙ্গণে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়।

বিদেশী সংবাদ

২০শে ফেব্রুয়ারী—পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন—চেকোস্লোভাকিয়ায় দানিয়ুবে নদী তীরে জার্মানরা প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ চালায়। মিত্রপক্ষ পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। ব্রাটিস্লাভা ও ভিয়েনার দিকে মিত্রপক্ষের অগ্রগতি সাময়িক-ভাবে ব্যাহত হয়। জার্মান নিউজ এজেন্সীর প্রধান সমর সংবাদদাতা জানান যে, নীস ও ববার নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া জার্মানরা সোমারফেল্ড ও সোরাউ পুনরধিকার করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গন—মার্কিন নৌসৈন্যগণ আয়োজিমার দক্ষিণাংশে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পৌঁছিয়াছে। সুরিবাচিয়াইয়ামার জাপ সুদৃঢ় ঘাঁটিটি ইহার ফলে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

২১শে ফেব্রুয়ারী—ওয়াশিংটনের এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, পাল্টা ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থার যে বার্ষিক রিপোর্ট কংগ্রেসে পেশ করা হইয়াছে, উহাতে প্রকাশ, নাৎসীদের হাতে যে লক্ষ লক্ষ অসামরিক অধিবাসী প্রাণ হারাইয়াছে, তাহা ছাড়াও রুশদের ৫৩ লক্ষ সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে।

২২শে ফেব্রুয়ারী—লালফৌজের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মার্শাল ষ্টালিন ঘোষণা করেন যে, গত ৪০ দিনে লালফৌজ ৮ লক্ষ জার্মান সৈন্য নিহত ও সাড়ে তিন লক্ষ জার্মান বন্দী করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গন—মার্কিন বাহিনী আয়োজিমার প্রায় অর্ধাংশ অধিকার করিয়াছে।

পশ্চিম ইউরোপীয় রণাঙ্গন—মার্কিন তৃতীয় আর্মির সৈন্যদল আরও ২৪টি শহর অধিকার করিয়াছে।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—আনকারা বেতারে বলা হইয়াছে যে, তুরস্কস্থ বৃটিশ দূত তুর্কী সরকারকে সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে যোগদান করিবার নিমিত্ত আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। বেতারে আরও বলা হইয়াছে যে, তুরস্ক ১লা মার্চের মধ্যে এক্সিস পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে—এই সর্তে তাহাকে সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তুরস্ক বেতারে পরে আবার ঘোষণা করা হইয়াছে যে, তুর্কী জাতীয় পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে এক্সিস শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছে।

২৪শে ফেব্রুয়ারী—মিশর এক্সিস শক্তিগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। প্রধান-মন্ত্রী আমেদ মাহের পাশার বিবৃতির পর মিশর পার্লামেণ্ট আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রী আমেদ মাহেরের যুদ্ধে যোগদানের বিষয় বিতর্কের কালে তাঁহার প্রতি গুলী নিক্ষেপ করা হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ নিহত হইয়াছেন।

পশ্চিম জার্মান রণাঙ্গন—মার্কিন প্রথম আর্মি কর্তৃক ডুরেন অধিকৃত হইয়াছে।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গন—মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদল ম্যানিলায় জাপানের শেষ ঘাঁটি সঙ্কুচিত করিয়া আনিয়াছে এবং শত্রু দুর্গ ধ্বংসের কাজ সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে।

গভর্নমেন্ট এখন সাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিতরণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করছেন

মজুতদারি ও অতিলাভ নিবারণ আইনের জের টেনে সাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণ নিয়ন্ত্রণের আদেশ পাশ হয়। ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে এই আদেশ আইনে পরিণত হয়। এই আদেশের উদ্দেশ্য এই যে কেবল দু'একটি বড় বন্দরে সব বিক্রি না হয়ে যেখানে প্রয়োজন বেশি দ্রব্যাদি যাতে সেখানেও পৌঁছায়।

এই আদেশ অনুসারে—

১। নির্দিষ্ট তালিকাভুক্ত জিনিসগুলির প্রত্যেক আমদানিকারক বিদেশ থেকে যে জিনিস আসবার সম্ভাবনা আছে অথবা এসে পৌঁছেছে সে জিনিস সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সিভিল সাপ্লাইজ-এর কণ্ট্রোলার জেনারেলের কাছে দাখিল করতে বাধ্য।

২। কণ্ট্রোলার জেনারেলের অনুমতি বা নির্দেশ ছাড়া আমদানিকারক এই সব জিনিস বিক্রি করতে পারবেন না। মাল পৌঁছবার রিপোর্ট দাখিল করার ২১ দিনের মধ্যে কোনো নির্দেশ না পেলে বিক্রি করতে পারবেন।

৩। কেউ এদেশে নির্দিষ্ট তালিকাভুক্ত কোনো জিনিস প্রস্তুত করলে তাকে কণ্ট্রোলার জেনারেলের কাছে উৎপাদনের খরচের এস্টিমেট এবং বিতরণের নির্ধারিত ব্যবস্থার বিবরণ অবশ্য দাখিল করতে হবে।

৪। আভ্যন্তরীণ বিতরণের ব্যবস্থার জন্য কণ্ট্রোলার জেনারেল দেশের সর্বত্র এজেন্ট নিয়োগ করবেন এবং এই সব জিনিস কেবল তাদের মারফতেই বিক্রি হতে পারবে।

কণ্ট্রোলার জেনারেলের ব্যাপক ক্ষমতা আছে। তিনি এই সংক্রান্ত ব্যবসা সম্পর্কে যে কোনো সংবাদ জানতে চাইলে তা জানাতে হবে এবং তিনি খাতাপত্র ও দলিলাদি পরীক্ষা করতে অথবা সে স্থান সার্চ করতে পারবেন।

সঠিক বিতরণে ঘাটতি কমে

যুক্তপ্রদেশে মজুতদারি ও অতিলাভ
৮৭ জনের শাস্তি

লক্ষ্নৌ, ১৭ই অক্টোবর—সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তপ্রদেশের ৩২টি জেলায় মজুতদারি ও অতিলাভ (নিবারণ) আইন ভঙ্গ করা সম্পর্কে ১০৯টি মামলার বিচারে ৮৭টি মামলায় আসামীরা শাস্তি পায়। আটানব্বইটি নতুন মামলা দায়ের করা হয়।

সংবাদপত্রে এই ধরণের খবর পড়ুন। প্রতি সপ্তাহে আরও অনেক মজুতদার ও অতিলাভকারীদের সাজা হচ্ছে।

* নির্দিষ্ট তালিকায় এ পর্যন্ত ৩১টি জিনিস ধরা হয়েছে। সম্পূর্ণ তালিকাটি এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে— ম্যানেজার অব পাবলিকেশান্‌স্ সিভিল লাইন্‌স, দিল্লী



HOARDING & PROFITEERING
HPPO
PREVENTION ORDINANCE

নিউ দিল্লী থেকে ডিপার্টমেন্ট অব ইণ্ডাস্ট্রিজ অ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাইজ কর্তৃক প্রচারিত।

AAA 1821

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ঃ—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র

মূল্য নিয়ন্ত্রণ—

গভর্নমেন্ট কি ভাবে আপনাকে সাহায্য করছেন

মজুতদারি ও অতিলাভ নিবারণ আইনে সিভিল সাপ্লাইজ এর কন্ট্রোলার জেনারেলকে আপনার স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ, তিনি—

১। ব্যবসায়ীকে বেচা কেনার দলিল রাখতে এবং তার নিজের ব্যবসা ছাড়াও অন্য ব্যবসা সম্পর্কে যে কোনো খবর জানাতে নির্দেশ দিতে পারেন।

২। ব্যবসায়ীকে খাতাপত্র দেখাতে নির্দেশ দিতে পারেন এবং তার ব্যবসার স্থানে একজন গেজেটেড অফিসারের প্রবেশ করার ও সার্চ করার আদেশ দিতে পারেন।

৩। সন্দেহ হলে মালপত্র আটক করতে পারেন।

৪। বন্দরে মাল নামানো পর্যন্ত আমদানির খরচ কত হয়েছে সার্টিফিকেট দিতে পারেন, সে সার্টিফিকেট চরম প্রমাণ বলে গণ্য হবে।

৫। যেখানে সব চেয়ে বেশি দরকার সেখানে যাতে মাল পৌছায় সেজন্য নির্দিষ্ট লোকের কাছে বিক্রির নির্দেশ দিয়ে বিতরণের ব্যবস্থা করতে পারেন।

৬। ব্যবসায়ী বা উৎপাদনকারীকে নিজের এলাকায় প্রকাশ্যভাবে নির্ধারিত মূল্য তালিকা রাখতে নির্দেশ দিতে পারেন।

খাদ্য-শস্য এবং মাঝে মাঝে বিশেষভাবে যে সব জিনিস বাদ দেওয়া হয়েছে সেগুলি ছাড়া সকল জিনিস সম্পর্কেই এই অর্ডিন্যান্স খাটবে।

কতগুলি জিনিসের সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই সংক্রান্ত নোটিসগুলি ম্যানেজার অব পাবলিকেশান্‌স্, সিভিল লাইন্‌স্, নিউ দিল্লী—এই ঠিকানা থেকে পাওয়া যাবে।

বেশি দাম নেওয়া হয়েছে সন্দেহ জাগলে স্থানীয় সিভিল সাপ্লাইজ অফিসারকে অথবা ইচ্ছা করলে এই ডিপার্টমেন্টে জানাতে দ্বিধা করবেন না। সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে তদন্ত করা হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রমাণের দায়িত্ব আসামীর উপরেই পড়ে, মামলা যিনি দায়ের করেছেন তাকে আসামীর অপরাধ প্রমাণ করতে হয় না, আসামীকেই নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে হয়.

১৫,০০০৲ টাকা জরিমানা ও হাজত

অতিলাভের কঠোর সাজা

করাচী, ১৩ই অক্টোবর—গতকাল মজুতদারি ও অতিলাভ নিবারণ আইনে কয়েকটি জেনারেল স্টোরস দোকানের মালিকদের কঠোর সাজা দেওয়া হয়। একজন দোকানীকে ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১৫,০০০৲ টাকা জরিমানা করা হয়।

প্রতিদিনই বর্ধিত সংখ্যায় মুনফাখোর ও মজুতদারদের সাজা হচ্ছে। গভর্নমেন্ট ইন্‌স্‌পেক্টাররা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে দেখাশোনা করছেন।

সব খবর জানুন আপনার অধিকার দাবি করুন

HOARDING & PROFITEERING

HPPO

PREVENTION ORDINANCE

নিউ দিল্লী থেকে ডিপার্টমেন্ট অব ইণ্ডাস্ট্রি এণ্ড সিভিল সাপ্লাইজ কর্তৃক প্রচারিত।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ] শনিবার, ২৬শে ফাল্গুন, ১৩৫১ সাল। Saturday, 10th March, 1945. [১৮শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ-সেবা

স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায় সম্প্রতি লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের এক সভায় ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশের বর্তমান শাসন-নীতির তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দান না করিলে ভারতের রাজনীতিক সমস্যা সমাধানের কোন আশা করা যায় না এবং সমগ্র ভারতের জনমত অভিব্যক্ত করিবার ক্ষমতা একমাত্র কংগ্রেসেরই আছে। স্যার বিজয়প্রসাদ কংগ্রেস দলভুক্ত নহেন। তিনি মডারেট নীতির একজন ধারক, বাহক ও পোষক এবং সেই হিসাবে অনেক বিষয়ে কংগ্রেসের নীতির তিনি বিরোধী; কিন্তু তাঁহার এই বিশেষ রাজনীতিক মতের দায়ে তিনি প্রকৃত সত্য প্রকাশে সংকুচিত হন নাই; ইহাই সুখের বিষয়। বলা বাহুল্য স্যার বিজয়প্রসাদের রাজনীতিক মতের আমরা বিরোধী; তথাপি তাঁহার এই স্পষ্টবাদিতার জন্য আমরা তাঁহাকে প্রশংসা করি। এই সম্পর্কে মিঃ এম এন রায়ের দলের লণ্ডনস্থ প্রতিনিধি মিঃ এ কে পিল্লাইয়ের আচরণ এ দেশের সকল দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কিছু দিন পূর্বে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবী জানাইবার উদ্দেশ্যে ভারত সচিব মিঃ আমেরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য একটি প্রতিনিধিমণ্ডলী গঠনের প্রস্তাব করা হয়। মিঃ পিল্লাইকে এই প্রতিনিধি দলে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইলে তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হন। পিল্লাই সাহেবের মতে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দান করিবার জন্য দাবীর সঙ্গে ভারতের সকল দলের সমর্থন নাই; পক্ষান্তরে তাহা একটি দল বিশেষেরই প্রস্তাব। এইটুকু বলিয়াই মিঃ পিল্লাই সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য গভর্নমেণ্টের উপর চাপ দিলে ভারতের অন্যান্য রাজনীতিক দলের প্রতি শত্রুতা সাধনই করা হইবে; কারণ কংগ্রেসী দলের এতটা দুঃসাহস যে, তাহারা এখনও ব্রিটিশের ভারত ছাড়িয়া যাইবার জন্য গান্ধীজী যে দাবী উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা সমর্থন করে! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া মিঃ রায়ের দল মাসিক মোটা টাকা মাসোহারা পাইতেছে এবং পিল্লাই সাহেবের ন্যায় ব্যক্তি সাম্রাজ্য-মন্ত্রণা সভায় ভারতের প্রতিনিধি হইয়াছেন, অবশ্য এ সব বিষয় বিবেচনা করিলে মিঃ পিল্লাইয়ের এই আচরণে এবং দেশের স্বার্থ সম্বন্ধে তাঁহার এই ধরণের নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতায় বিস্মিত হইবার বিশেষ কারণ থাকে না। স্বার্থকেই যে ইঁহারা পরমার্থস্বরূপে গ্রহণ করিয়া চলেন, তাহা আমাদের বিশেষভাবেই জানা আছে। প্রখর রবির কর শিরে সহ্য হয় হে, তার তাপে তপ্ত বালু পদে সহা দায় হে।" মিঃ পিল্লাইয়ের আচরণে কবি রঙ্গলালের এই উক্তিই আমাদের স্মৃতি-পথে উদয় হইতেছে।

ভারতের দুর্দশা

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ভারতীয় বণিক সমিতি সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গেল। সঙ্ঘের সভাপতিরূপে মিঃ জে সি শীতলবাদ দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের সম্বন্ধে নানাদিক আলোচনা করিয়াছেন। অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের অবস্থার আলোচনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, পরাধীন ভারতের সহিত ইংলণ্ড বা আমেরিকা অন্য কোন দেশেরই তুলনা চলে না। ব্রিটিশ প্রভুত্ব এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে ভারতবর্ষ ক্রমাগত শোষিতই হইয়াছে এবং ভারতের আর্থিক সমৃদ্ধির সকল উদ্যম এখানে উপেক্ষিত হইয়াছে; শুধু তাহাই নয়, বিদেশীর স্বার্থ রক্ষার জন্য এদেশের অর্থ-সমৃদ্ধির তেমন উদ্যমে অন্তরায় সৃষ্টি করা হইয়াছে। বিদেশীর এমন নির্মম শোষণ নীতির ফলে অর্থনৈতিক দিক হইতে অসহায় এবং দুর্বল ভারতের উপর আজ যুদ্ধের জগৎ-জোড়া চাপ আসিয়া পড়িতেছে। গভর্নমেণ্ট জোড়াতালি দেওয়া কোন ব্যবস্থার দ্বারা অর্থনৈতিক এই সঙ্কট সামলাইয়া লইতে সমর্থ হইতেছেন না। তাঁহাদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও অবস্থা উত্তরোত্তর শোচনীয় আকার ধারণ করিতেছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সর্বাংশে কার্যকর হয় নাই এবং দুর্নিবার চোরাবাজার দেশের সর্বত্র হাহাকার সৃষ্টি করিতেছে। শ্রীযুত শীতলবাদ চোরাবাজারে কারসাজী খেলায় যাহারা দেশের রক্ত শোষণ করিতেছে, তাহাদিগকে অতি তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে দেশের ঘৃণ্যতম শত্রু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে এই প্রশ্নই উঠে যে, এমন চোরাবাজারী কারবার দমিত হয় না কেন? সরকারের সকল শক্তি ও বল ও বাহন এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় কোন্ যাদু-মন্ত্রের প্রভাবে? চোরাবাজার অন্য দেশেও আছে ইহা আমরা জানি; কিন্তু আমাদের ন্যায় এমন দুর্ভোগ কোন দেশ বা জাতির ভাগ্যে ঘটে নাই; ইহার কারণ কি? গভর্নমেণ্টের চোখের সম্মুখেই এখানে চোরাবাজার পূর্ণ প্রতাপে চলিতেছে, এমন কাণ্ড কোন দেশেই সম্ভব হয় বলিয়া আমাদের ধারণাও হয় না। শ্রীযুত শীতলবাদ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দেশের এই অর্থ সঙ্কটের সমাধান হইবে না; পক্ষান্তরে যুদ্ধোত্তর ভবিষ্যতে বিদেশীদের প্রতিযোগিতায় ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের সর্ববিধ প্রচেষ্টাও

সংকুচিত হইবে। আমরা তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সর্বাংশে সমর্থন করি।

স্বামী সহজানন্দের বিবৃতি

স্বামী সহজানন্দ নিখিল ভারত কিষাণ সভার সভাপতি পদ পরিত্যাগ করিতে সিদ্ধান্ত করিয়া সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তিনি তাঁহার এতৎসম্পর্কিত বিবৃতির এক স্থানে লিখিয়াছেনঃ—

"কিষাণ-সভা এই যুদ্ধকে কখনও জন-যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করে নাই; কিন্তু তাঁহারা আমাদিগকে সেই কাদায় টানিয়া নামাইয়াছেন। আমরা কখনও নিজেদের একমাত্র দেশ-ভক্ত বলিয়া অভিহিত করিয়া অপর ব্যক্তি বা দলকে বিশ্বাস-ঘাতক ও পঞ্চমবাহিনী বলিয়া দুর্নাম দিই নাই। কিন্তু তাঁহারা এমন কি সভার নাম করিয়া এ কাজ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। প্রায় তিন বছর আগে সভা ইহার দায়িত্বশীল সভ্য ও শাখা-কমিটিসমূহকে পাকিস্থানের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন কিছু না করিতে অনুরোধ করে। কিন্তু তাঁহারা স্বেচ্ছায় দলের মুখপত্রসমূহকে তাঁহাদের দলীয় নীতি-প্রচারের বাহন করিয়া তোলেন। তাঁহারা যে সভার উপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাহা বহু দৃষ্টান্ত সহকারে প্রমাণ করা যাইতে পারে।"

বলা বাহুল্য দেশের জনগণের মধ্যে বৈপ্লবিক শক্তি সংগঠনের সকল চেষ্টা আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়া থাকি; কিন্তু আমরা জানি, সাম্যবাদের ভ্রান্ত নামে এদেশের শ্রমিক ও কৃষাণদের মধ্যে নানাপ্রকার অপ-প্রচার চালানো হইতেছে এবং এই অপ-প্রচারের দ্বারা অজ্ঞ দেশবাসীর মনে স্বাধীনতার আন্দোলন সম্পর্কে নানা-রূপ সংশয় সৃষ্টি করিবার চেষ্টা চলিতেছে। বর্তমান যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে এদেশের কম্যুনিস্টগণও এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধে রুশিয়ার যোগ-দানের পর হইতেই ইহাদের সুর বদলাইয়া গেল এবং ইঁহারা এই যুদ্ধকে 'জন-যুদ্ধ' নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন। স্বদেশ-রক্ষার্থে স্বাধীন রুশিয়ার জনগণের যে যুদ্ধ তাহা 'জন-যুদ্ধ' নামে অভিহিত হওয়ার অর্থ আমরা বুঝি। কিন্তু সাম্রাজ্য-বাদী স্বার্থ-সংঘাতের ফলে এবং সেই স্বার্থ সুদৃঢ় করিবার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া যে যুদ্ধ, সে যুদ্ধ ভারতীয় জন-গণের কাছে কি করিয়া যে 'জন-যুদ্ধ' নামে অভিহিত হইতে পারে, তাহা আমাদের বিচার-বুদ্ধির অগম্য। অথচ এই যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলিয়া স্বীকার না করাতেই কংগ্রেসকর্মিগণ এই দলের দ্বারা পঞ্চম বাহিনী নামক হীন আখ্যায় বিশেষিত হইতেছেন। এই হীন মন্তব্যের ফলাফল সম্বন্ধে ধারণা করিবার ক্ষমতা ইঁহাদের নাই, এমন নয়; ইঁহারা যে কংগ্রেসের কার্যকলাপের ক্ষতিসাধনের বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই এই দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি করিয়া থাকেন, ইহা স্পষ্টই বোঝা যায়। 'পাকিস্থান' সম্বন্ধেও এই দলের নীতি বিশেষ অর্থপূর্ণ। পাকি-স্থানের মত একটা অবাস্তব ও অসম্ভব এবং সমগ্র দেশের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর একান্ত প্রগতি-বিরোধী মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা-পূর্ণ নীতির সমর্থনে ইঁহাদের আগ্রহ বিস্ময়জনক। স্বামী সহজানন্দের বিবৃতিতে প্রকাশ, কংগ্রেসসেবিগণ যদি কিষাণ-সভায় যোগদান করেন, তবে ইঁহারা সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইবেন এবং তাহার ফলে যদৃচ্ছা কর্মনীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন না এই আশঙ্কায় সভায় তাঁহারা সংহতি রক্ষার ধুয়া তুলিয়াছেন এবং কংগ্রেসসেবিগণের কিষাণ সভায় যোগ দিবার প্রস্তাব ও প্রচেষ্টা অনু-মোদন করিতে পারেন নাই। এইরূপ সংঘর্ষের ফলেই স্বামী সহজানন্দকে পদ-ত্যাগের সিদ্ধান্ত করিতে হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে এদেশের প্রকৃত জনকল্যাণকামিগণকে আমরা অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে বলি। দেশের বিভিন্ন শক্তিকে সুগঠিত করিয়া বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের পথে সাক্ষাৎ সম্পর্কে প্রয়োগ করাই বর্তমানে প্রথম প্রয়োজন। সাম্রাজ্য স্বার্থের সঙ্গে কোনরূপ আপোষ-নিষ্পত্তির ছলাকলায় তাঁহারা যেন বিভ্রান্ত না হন।

সৈন্যগণ কর্তৃক নারীর উপর অত্যাচার

কলিকাতায় সম্প্রতি এক বক্তৃতায় ডাঃ মুঞ্জে নারীগণের উপর অত্যাচার নিবারণ-কল্পে যুবকগণকে সচেষ্ট হইতে বলিয়াছেন। দেশের নারীগণের সম্ভ্রম রক্ষা করা যুবকগণেরই পক্ষে অবশ্য কর্তব্য এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে যদি তাঁহারা সাহসের সঙ্গে এইরূপ অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তবে এই পাপ নিবারিত হইতে পারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বর্তমান যুদ্ধকালে নারীগণের উপর বিদেশী বিশেষ শ্রেণীর দ্বারা অনুষ্ঠিত নানারূপ অত্যাচারের যে সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে জনসাধারণ স্বভাবতই ভীত হইয়া পড়ে। এইরূপ অত্যাচার সংঘটিত হইলে অত্যাচারকারীকে শাস্তিদান ব্যাপারে এবং তদ্দ্বারা এই পাপ প্রশমনে দেশবাসী ও গভর্নমেন্ট উভয়েরই দায়িত্ব রহিয়াছে। হাওড়ায় একটি ঘটনায় দুইজন বৃটিশ নৌ-সৈনিক পাশবিক অত্যা-চারের অভিযোগে দায়রায় সোপর্দ হইয়াছে। আমরা দেখিলাম বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। সম্প্রতি এই ব্যাপার সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় আইন সভায়ও প্রশ্নোত্তর হইয়াছে। প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ, ১৯৪৪ সালের প্রথম হইতে সৈন্যগণ যেসব স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিয়াছে কিংবা করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদের মোট সংখ্যা ৭১। কেন্দ্রীয় আইন সভার শ্রীযুক্ত নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে, হাওড়ায় অত্যাচারিতা বালিকাটি তৎকালে সদ্য-প্রসূতি এবং রোগ-কাতর ছিল। গত ৩১শে অক্টোবর ঘটনাটি ঘটে। ৪ মাসের উপর হইল এই ঘটনাটি সংঘটিত হইয়াছে, অথচ এই সম্পর্কে বিশেষ কোন বিষয় জনসাধারণ জানিতে পারে নাই। এইরূপ ঘটনায় বিচার-সম্পর্কিত সংবাদ জনসাধারণকে না জানাইবার কি হেতু থাকিতে পারে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বরং এরূপক্ষেত্রে জনসাধারণ যদি ঘটনার ফলাফল সম্বন্ধে কিছুই জানিতে না পারে, তবে তাহাতে অসন্তোষ ও বিরুদ্ধ ধারণারই সৃষ্টি হয় বলিয়াই আমরা মনে করি। এই শ্রেণীর অপরাধে অভিযুক্তদের পরিচয় ও তাহাদের বিচারের ফলাফল জানিবার অধিকার দেশবাসীর আছে এবং তাহাতে এই পাপের প্রতিরোধে নৈতিক প্রতিবেশ-সৃষ্টিরও সাহায্য হয়। এইভাবে তদ্দ্বারা আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে সহায়ক শক্তিই সংগঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং এ সম্বন্ধে অবহিত হইতে আমরা গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করিতেছি।

পরলোকে মিঃ এইচ ডি বসু

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাতনামা ব্যারি-স্টার মিঃ এইচ ডি বসু ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি পর-লোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, এস আর দাশ ও স্যার বিনোদ মিত্রের সম-সাময়িক ছিলেন। তিনি ব্যবহার-শাস্ত্রে সূক্ষ্ম জ্ঞান, স্বাধীন মনোবৃত্তি ও মার্জিত রুচির জন্য সুপরিচিত ছিলেন। বিগত বিগত ২৫ বৎসর কাল কলিকাতা হাই-কোর্টে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তিনি কোন-না কোন পক্ষভুক্ত ছিলেন। একাধিকবার তাঁহাকে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার স্বাধীন মনোবৃত্তি কখনও রাজকীয় অনুগ্রহ-লাভকে শ্রেয়ঃ বলিয়া গণ্য করে নাই। তাঁহার পরলোকগমনে কলিকাতা হাইকোর্ট বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল এবং বাঙলাদেশ একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ও অনমনীয় দৃঢ়-চরিত্র ব্যক্তি হারাইল। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের সমবেদনা জানাইতেছি এবং তাঁহার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-নিবেদন করিতেছি।

দেশের কথা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাজেট সম্বন্ধে আলোচনাকালে কৃষি-মন্ত্রী খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেমুদ্দিন আমাদিগকে একটি বিশেষ আশার কথা শুনাইয়াছেন। তিনি বলেন, গভর্নমেণ্ট প্রতি মাসে পাঞ্জাব হইতে ৫০০টি করিয়া দুগ্ধবতী গাভী আমদানী করিতেছেন। কিছুদিন পূর্বে বোম্বাই শহরের রাজপথ দিয়া দুগ্ধের স্রোত বহিয়াছিল। সরকার কর্তৃক বাঁধা দরে দুধ বিক্রয়ে পোষায় না বলিয়া দুগ্ধ-বিক্রেতারা অভিমানভরে দুধ আনিয়া ঢালিয়া দিয়া এই ব্যাপার ঘটায়। এই সম্পর্কে পার্লামেণ্টেও একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। ভারতসচিব আমেরী সাহেব তাহার বিশেষ জবাব দিতে পারেন নাই। তিনি সম্ভবত পরবর্তী সংবাদে কোথায় মধুর স্রোত বহে, তাহা জানিবার অপেক্ষায় আছেন। তবেই ব্রিটিশ-শাসনে ভারতবর্ষে কেমন দুধ ও মধুর স্রোত বহিতেছে, জগতের লোককে তাহা জানাইয়া চমৎকৃত করা সম্ভব হইবে। তবে মধু অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ আয়ুর্বেদে এই বিধান আছে। কয়েক মাস আগে বিহারে কোন কোন স্থানে রাস্তায় গুড়ের স্রোত বহিয়াছিল। এ-খবর অনেকেই জানেন। আমরা, বাঙলার অধিবাসীরা দুগ্ধবতী গাভী স্বদেশে আমদানীর সংবাদে আনন্দে প্রায় অধীর হইয়া উঠিয়াছিলাম, এমন সময় বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভায় একটি চাঞ্চল্যকর খবর আমাদিগকে দিলেন। তিনি বাজেট সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন—

"কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে বাঙলা সরকার যে সকল ষাঁড় ক্রয় করিয়াছিলেন, সেগুলি মরিয়া গিয়াছে। এই ষাঁড় ক্রয়ের সম্পর্কেও কিছু দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি গভর্নমেণ্ট ছাগসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং তদনুসারে ছাগ ক্রয় করা হইতেছে। এই সকল ছাগের মধ্যেও অনুরূপ মৃত্যু দেখা দিতে পারে এবং আগামী বৎসর হয়ত আমাদিগকে জানানো হইবে যে, ছাগগুলি মরিয়া গিয়াছে।"

কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, ছাগগুলি যদি ষণ্ডগুলির মত মৃত্যুমুখেই পতিত হয়, সেজন্য মন্ত্রীদিগকে দায়ী করা চলিবে না কিংবা শাসনকার্যে তাঁহাদের মহিমা ক্ষুণ্ণ হইবারও কোন কারণ থাকিবে না। কারণ কি, বাঙলার অর্থসচিবই সে সত্য সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন—

আপনাদের মধ্যে অনেকে শাসনকার্যের দোষ ধরিয়াছেন, এক্ষেত্রে গলদ কিছু থাকিতে পারে; কিন্তু নিজেরাই বলুন তো, যুদ্ধের জন্য, মুদ্রাস্ফীতির দরুণ, আবশ্যক দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য জনসাধারণের মধ্যে কি নৈতিক অবনতি দেখা দেয় নাই? নিশ্চয়ই গভর্নমেণ্টকে সেজন্য দোষী করা চলে না, কুইনাইনের চোরাবাজারের কথাই বিবেচনা করিয়া দেখুন, গভর্নমেণ্ট এজন্য দায়ী নহেন। জনসাধারণের মধ্যে নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়াছে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। গভর্নমেণ্ট খাদ্যদ্রব্যের চোরাবাজার সৃষ্টি করেন নাই। আপনাদের নিজেদের দেশের লোকেরাই তাহা করিয়াছে; এবং দুর্ভিক্ষের ইহা একটা প্রধান কারণ।

সুতরাং ষাঁড় মৃত্যুর জন্যও গভর্নমেণ্ট দায়ী নহেন, ছাগ মৃত্যুর জন্যও গভর্নমেণ্ট তেমনই দায়ী হইবেন না, জনসাধারণের নৈতিক অধঃপতনই দায়ী হইবে। এক্ষেত্রেও একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। মিঃ হুমায়ুন কবীর সে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন—

অর্থসচিব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, অন্য প্রদেশের মত দৃঢ়বিশ্বাস লইয়া বাঙলা সরকার দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য অগ্রসর হইতে আজ অক্ষম। ইহার কারণ কি এই নয় যে, বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল দলগত স্বার্থের উপর নির্ভর করেন। তাঁহারা জনসাধারণের সমর্থনের উপর নির্ভর করিতে সাহসী হন না। পরিকল্পনা ভাল হইলেও তাহা সম্পাদনের নৈপুণ্যের অভাবে সরকার তাহার সুফল নষ্ট করিয়াছেন। খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ ও বণ্টনের উৎকৃষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত করিবার দক্ষতার অভাবে স্তূপাকার শস্য নষ্ট হইয়াছে এবং জনসাধারণ অনাহারে মারা গিয়াছে। অসাধুতা, দক্ষতার অভাব ও অন্যান্য গলদের জন্য বিপুল ক্ষতি ঘটিয়াছে।

অর্থসচিব অবশ্য ক্ষতির কথা অস্বীকার করেন নাই। তিনি ভারত সরকারের উপর দায়িত্ব চাপাইয়া নিজেদের ত্রুটি ক্ষালনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন—

এ সব ক্ষতির জন্য আপনারা অবশ্যই উদ্বেগ বোধ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু আপনাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এই ক্ষতির কতক অংশ ভারত সবকার বহন করিতে প্রস্তুত আছেন। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তই করা যায় যে, এ প্রদেশের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কাজ খারাপ হইয়াছে বা অযোগ্য লোকের হাতে ন্যস্ত হইয়াছে, বলিয়া তাঁহারা মনে করেন না। ক্ষতির শতকরা ৫০ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিতে সম্মত হইয়াছেন।

কিন্তু খাদ্যশস্য নষ্ট হইতে না দিয়া যদি সেগুলি অনাহারক্লিষ্ট লোকদের দেওয়া হইত, তবে অনেক নরনারীর প্রাণ রক্ষা পাইত; এজন্য দায়িত্ব কাহার? অবশ্যই মন্ত্রীদের নয়!

জনসাধারণের দারিদ্র্যের নজীর

শাসন বিভাগ সর্বপ্রকার দুর্নীতির ঊর্ধে, কোন্ মূর্খ ইহা অস্বীকার করিবে? সম্প্রতি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র নিজস্ব সংবাদদাতা নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রেরণ করিয়াছেন—

গত বৎসর দুর্ভিক্ষের সময় মাননীয় স্যার আজিজুল হক রাণাঘাটে তাঁহার নিকট মহকুমায় বিনামূল্যে বিতরণ করিবার জন্য অনুমান ৬০ বস্তা আতপ চাউল স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে দিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ২৩ বস্তা চাউল একেবারে খারাপ ছিল। এখন প্রকাশ পাইয়াছে যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মাত্র ৯ বস্তা চাউল বিতরণের জন্য পারমিট দেন এবং আর ২৩ বস্তা চাউল একেবারে খারাপ হইয়া মানুষের অখাদ্য হইয়া গিয়াছে এবং বহু অনুসন্ধানের পরও বাকী চাউলের বস্তাগুলির কোন হদিস পাওয়া যায় নাই।"

স্যার আজিজুল ভারত গভর্নমেণ্টের শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য। বাঙলা দেশের জনসাধারণের এমন নৈতিক অধঃপতনের পরিচয় তিনি পাইয়াছেন এবং সেই সূত্রেই সম্ভবত গভর্নমেণ্টের খাদ্যসচিব স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তবও এ তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন; সুতরাং বাঙলার অর্থসচিব সত্যই বলিতে পারেন, বাঙলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কাজ যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালিত হইতেছে, ভারত সরকার নিশ্চয়ই এ সত্য বুঝিয়া লইয়াছেন।

রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি

কিন্তু বাঙলা দেশের দুর্গতির মূলে দেশের লোকেরই শুধু যে নৈতিক অধোগতি রহিয়াছে এমন নয়, শত্রুপক্ষ জাপানী গুপ্তচর দুষ্টগ্রহেরও ভর এক্ষেত্রে বিদ্যমান। দেশের লোকের দুঃখে মন্ত্রীদের বেদনা ও চেতনার অন্ত নাই। রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তিদানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পরিষদের আলোচনাতে ইহাও জানা যায়। বাঙলার অর্থসচিব মহাশয় বলেন, তিনি এজন্য মনে খুব বেদনা পাইয়া থাকেন। আরও অধিক-সংখ্যক বন্দীকে মুক্তিদান করা সম্ভব হয় নাই, ইহা দুঃখের বিষয়। দেশের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিশ্চয়ই যত অধিকসংখ্যক বন্দীকে মুক্তিদান করা সম্ভব, তাঁহাদিগকে মুক্তি দিতে ব্যগ্র আছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিবে এই যে, যাঁহারা গুরুতর অবস্থায় পীড়িত, এমন কি, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে উপনীত তাঁহাদিগকে মুক্তি দিলে দেশের নিরাপত্তা কিভাবে ব্যাহত হইতে পারে? স্বরাষ্ট্র বিভাগের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী খান বাহাদুর মহম্মদ আলী সেদিন বলিয়াছেন যে, যাঁহারা অত্যন্ত পীড়িত, তাঁহাদের মুক্তি দিবার সম্বন্ধে প্রথমে বিবেচনা করা হইয়া থাকে। এই উক্তির মূলে যদি যাথার্থ্য থাকে, তবে জলপাইগুড়ির শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং শ্রীযুত কেদারেশ্বর সেন-গুপ্তকে কেন মুক্তিদান করা হইতেছে না।

সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, শ্রীযুত দাশগুপ্ত গুরুতর পীড়িত এবং তাঁহাকে রাজসাহী জেল হইতে রাজসাহী সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, শ্রীযুত সেনগুপ্ত উত্থানশক্তিরহিত অবস্থায় আছেন। তাঁহার শরীরের ওজন ৭৪ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। জনসাধারণের নৈতিক অধোগতিই কি ইঁহাদের প্রতি মানবতা-প্রদর্শনে মন্ত্রীদের পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে?

মন্ত্রীপক্ষের তৎপরতা

দেশবাসীর প্রতি বেদনার গভীর টানে বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর মনের অবচেতন স্তর হইতে সম্প্রতি এই প্রশ্নের একটি উত্তর বাহির হইয়া আসিয়াছে। রাজনীতিক বন্দী সম্পর্কিত বিতর্কের উত্তরে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দিন সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে বোঝা যায়, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজেদের মনের সব কথা তাঁহারা নিজেরাই জানেন না। তিনি বলেন, নিরাপত্তা বন্দীদের আটক রাখার সম্বন্ধে সেদিন তিনি ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছিলেন যে, এ সম্বন্ধে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টেরই ষোল আনা দায়িত্ব: কিন্তু তাহা সত্য নয়। ভারত গভর্ণমেণ্ট বলিয়া একটা বস্তুও আছে এবং তাঁহারাও এই প্রাদেশিক দায়িত্ব বহনের ক্ষেত্রে কম নহেন। স্যার নাজিমুদ্দিন গর্ব করিয়া বলিয়াছেন, আইন সভার কাজে তাঁহার কুড়ি বৎসরের অভিজ্ঞতা আছে। এই সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি এক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থাটা কি ওজন করিয়া লইতে পারেন নাই? তিনি আমলাতন্ত্রসুলভ মুরুব্বিয়ানা দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, এই সব বন্দীর মুক্তির জন্য তাঁহারা অত্যন্তই ব্যগ্র। বন্দী জীবনের কষ্ট যে কি তাহা তিনি খুবই বোঝেন। তাহাদিগকে ভাল খাওয়ান হয়, পরানো হয়, সুতরাং তাহাদের সুখে থাকা উচিত স্যার নাজিম এমন মনে করেন না; কারণ যে অবস্থাতেই হউক না কেন, বন্দী জীবনের বেদনা নিদারুণ! কিন্তু তাঁহারা কি করিবেন? বাঙলা গভর্ণমেণ্ট এমন খবর পাইয়াছেন এবং তাঁহাদের কাছে এমন সব দলিলপত্র আছে, যাহার দ্বারা বোঝা যায়, বন্দীদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যাহাদের সঙ্গে জাপানী গুপ্তচরদের যোগাযোগ আছে এবং বন্দীরা ঐসব গুপ্তচরকে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেছেন। মানুষকে বিনা বিচারে বন্দী অবস্থায় রাখিয়া প্রতিবাদের কোন অবসর না দিয়া এমন অভিযোগ আরোপ করা নীতি এবং যুক্তি সঙ্গত কাজ নয়। আমরা এমন কাজকে নির্লজ্জতার পরিচায়ক বলিয়াই মনে করি।

দুই সরকারের কোপাত্মক

বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং— কথায় আছে পেটের দায়ে বাঘেও ধান্য ভক্ষণ করিয়া থাকে। গত রবিবার কলিকাতার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে বেংগল মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেসন কমিটির উদ্যোগে আহূত একটি সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বক্তৃতায় বাঙলা দেশের দুর্ভিক্ষজনিত দুরবস্থার কথা উত্থাপন করিয়া বলেন,—

"বিগত দুর্ভিক্ষের পরে আমার নেতৃত্বে বাঙলার কোন কোন স্থানে জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের কাজ চলে; সেই অনুসন্ধানের ফলে ইহাই অনুমান হইয়াছিল যে, গত দুর্ভিক্ষে এই প্রদেশে কিছু কমবেশী ৩৫ লক্ষ লোক জীবন হারাইয়াছে। বাঙলা সরকার ইহা অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, অনুমান ১৮ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সম্প্রতি এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পন্থায় বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান কার্য পরিচালিত হইতেছে। এখন প্রকাশ পাইয়াছে যে, বিগত দুর্ভিক্ষে অনুমান ৩৪ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। এই হিসাব ইতিমধ্যে সরকারের কাছেও পেঁৗছিয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। রোগের প্রসার সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ আমরা পাইয়াছি, তাহাতে দেখা যায়, গত দুই বৎসরে বাঙলার শতকরা ৪৬ জন লোকে রোগে শয্যাশায়ী হইয়াছে। এইরূপ ভাবে রোগের আক্রমণের ফলে বাঙলার অনেক স্থানে বহু কর্মক্ষম ব্যক্তি অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং যাহারা এই সকল লোকের মুখাপেক্ষী ছিল, তাহাদের চরম দুর্গতি ঘটিয়াছে। মধ্যবিত্ত সমাজের অনেক লোকও অনুরূপভাবে অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু বিগত দুর্ভিক্ষের জন্য দায়িত্ব বাঙলা সরকারের ছিল না এবং এখনকার বস্ত্রের দুর্ভিক্ষের জন্যও তাঁহাদের সেইরূপ দায়িত্ব নাই। একদিকে বাঙলা দেশের বুভুক্ষার ব্যাপক অভিযান চলিয়াছে, অন্যদিকে এতৎসম্পর্কিত দায়িত্ব লইয়া বাঙলা সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে লড়াই চলিয়াছে, এ দৃশ্য আমরা বাঙলা জোড়া দুর্ভিক্ষের সময় দেখিয়াছি। সম্প্রতি বস্ত্রের দুর্ভিক্ষে বাঙলা দেশ বিপন্ন। ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, যদি অবিলম্বে তাহার প্রতিকার না হয়, তবে সমগ্র বাঙলা দেশ দিগম্বরের দেশে পরিণত হইবে। এক্ষেত্রেও দেখিতেছি, সেই পূর্ব বিতর্ক আরম্ভ হইয়াছে। ভারত সরকার বলিতেছেন, বাঙলা দেশ তাহার জন্য নির্দিষ্ট বরাদ্দ অপেক্ষা ভারত সরকারের কৃপায় অনেক বেশী কাপড় পাইয়াছে। সুতরাং একান্ত অকারণে বাঙলার এই বস্ত্র সংকট; এজন্য ভারত সরকারের পক্ষ হইতে মিঃ ভেলোদি বিস্মিত, স্যার আজিজুল হক স্তম্ভিত। এ সম্পর্কে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে বিস্তৃত হিসাবও উপস্থিত করা হইয়াছে। আমরা সরকারী এ সব হিসাবের কাণাকড়িরও যে মূল্য আছে, ইহা মনে করি মফঃস্বলে কোথায়ও কাপড় মিলে না এদিকে ইহাও শুনিতেছি যে, সরকার কর্মচারীদের সতত জাগ্রত সাধুতা স্বচ্ছন্দে ডিঙ্গাইয়া কলিকাতা হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয়ের পারে চীন ও তিব্বতে পর্যন্ত চোরাবাজার সম্প্রসারিত হইয়াছে। ভারত সরকার ও বাঙলা সরকারের তদ্বিরের চাপে এবং দেশজোড়া তাহাদের একের বদান্যতা ও অপরের সততার প্রতিক্রিয়া-প্রভাবে আমাদের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রতিকার কোথায়, আমরা শুধু তাহাই ভাবিতেছি।

দরিদ্রের প্রতি দরদ

সুতরাং গজকচ্ছপের এ যুদ্ধ অকারণ প্রকৃতপক্ষে আমাদের নেহাৎ অদৃষ্টেরই দোষ। বাঙলা সরকার যেমন আমাদের দুর্গতির জন্য দায়ী নহেন সেইরূপ ভারত সরকারকেও এক্ষেত্রে দোষী করা চলে না। ভারত সরকারের বাজেট উপস্থিত করিতে গিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইজম্যান এ সম্পর্কে তাঁহার চরম বাণী শুনাইয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার ৬ বৎসর আমলের আলোচনা করিয়া এই বলিয়া গর্ব বোধ করিয়াছেন যে, ১৯৪৩ সালে দ্রব্যাদির মূল্য যে উচ্চহারে পেঁৗছে, তদপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পায় নাই। শ্রমিক চাষী, ব্যবসায়ী, ইত্যাদি নানা শ্রেণীর লোকের হাতে বহুল পরিমাণে অর্থ আসিয়াছে বলিয়া স্যার জেরেমি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ইহাতে আনন্দিত হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। দ্রব্যাদির মূল্য এখন এত অধিক রহিয়াছে যে, সর্বত্র দেশের জনসাধারণ নিদারুণ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। বস্ত্র নাই, তেল নাই, কয়লা নাই, ব্যাধির ঔষধ নাই, পথ্য নাই। ইহার উপর স্যার জেরেমি আমাদিগকে বিদায়কালীন পদাঘাতও না করিয়া পারেন নাই। পোস্টাল পার্শ্বেলের হার, টেলিফোনের ভাড়ার উপর সারচার্জ, সাধারণ ও জরুরী টেলিগ্রামের উপর সারচার্জ, সাধারণ ও তামাক এবং তামাক হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের শুল্ক বৃদ্ধি, এই সব প্রস্তাবে প্রকারান্তরে দরিদ্র দেশবাসীর অর্থনৈতিক চাপই বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। কিন্তু স্যার জেরেমির অকৈতব ভারত-প্রেমে কে সন্দেহ করিবে? তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় পাষাণও যে গলে! অতএব—ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র।

ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের সুযোগ

তথাপি চিন্তা নাই; ভারতে নব জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে। স্যার টমাস এইন্সকাফ পূর্বে ভারত, ব্রহ্ম এবং সিংহলের ট্রেড কমিশনার ছিলেন। তিনি বিলাতের ইস্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সেদিন বলিয়াছেন—

ভারতের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির উপর * আমাদের ভবিষ্যতের আশাভরসা নির্ভর করিতেছে। যুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্বে হইতে গ্রেট ব্রিটেন ভারতের জনসাধারণের জন্য সস্তা দামে জিনিস-পত্র বিক্রয়ের ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়ে। ব্রিটিশের অনুকরণে ভারতে যে সব যন্ত্রচালিত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, সেগুলির জন্যও ইংলণ্ড যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে নাই। যুদ্ধের পর ভারতের সর্বত্র অর্থনৈতিক জীবনের জাগরণ ঘটিবে। এ সময়, ইহা কি আশা করা যায় না যে, ভারতবর্ষ পুনরায় গ্রেটব্রিটেনের মাল রপ্তানির বাজার যোগাইবে? অবশ্য, আমেরিকাও আছে। আমেরিকার ব্যাপারীরা ভারতের বাজারে নিজেদের মাল চালাইতে চেষ্টা করিবে, ইহা সত্য; কিন্তু মার্কিনদের এ প্রতিযোগিতাকে অতিরিক্ত আশঙ্কা করিবার কারণ নাই; কারণ, আমেরিকা এবং ভারতের মধ্যে দরের বৈষম্য অনেক বেশী রহিয়াছে।

মার্কিন জাতির দৃষ্টি যে এ দিকে দস্তুর মতই রহিয়াছে; ইহা নানাসূত্রে বিদিত হইয়াছে। সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক শহরে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ক্লাবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিসেস ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট অপেক্ষাকৃত আন্তর্জাতিক পরিভাষায় মোলায়েম করিয়া মার্কিন জাতির সে মনোভাবকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন—

যুদ্ধের পর সব দেশে বেকার সমস্যা দেখা দিবে। আমাদের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে পরস্পরের ভিতর সহযোগিতা প্রয়োজন। আমাদিগকে যদি ঘরে ঘরে কাজ যোগাড় করিতে হয়, তবে পরস্পরের মধ্যে বিকি-কিনির সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। এইভাবে আমাদের এবং আমাদের প্রতিবেশীর পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য জগৎজোড়া বাজার গড়িয়া তুলিতে হইবে। অন্য সব দেশের নরনারীদেরও কাজ চাই এবং মাল উৎপাদনের ক্ষমতা চাই, নতুবা তাহারা আমাদের সঙ্গে কারবার চালাইতে সমর্থ হইবে না।

জগৎ জোড়া বাজার খোঁজের এমন তাড়ার মধ্যে পড়িয়া পরাধীন আমরা, আমাদের পিষ্ট হওয়া ছাড়া আর কি উপায় আছে?

ভবিষ্যতের আতঙ্ক

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ক্রিমিয়ার বৈঠকের সাফল্য সম্বন্ধে যাহাই বলুন এবং বিশ্ব-মৈত্রীর জন্য ত্রিশক্তির ত্যাগ ধর্মের মর্ম যতই ব্যাখ্যা করুন, ভবিষ্যতে এশিয়াই যে শক্তিবর্গের অর্থনৈতিক স্বার্থ সংঘাতের লীলাভূমিতে পরিণত হইবে এবং এসিয়ার প্রধান পরাধীন দেশ ভারতের উপরই কোন চাপ আসিয়া পড়িবে, এমন আশঙ্কা জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের সকলের মনেই উদিত হইতেছে। কারণ, দুর্বল চিরকাল প্রবলের পক্ষে প্রলোভনের বস্তু হইয়া থাকে। মিঃ আওয়েন লাটিমোর "এশিয়ার সমস্যার সমাধান" শীর্ষক তাঁহার সদ্য প্রকাশিত পুস্তকে এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—

এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি শক্তিবর্গের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইতে পারিলেই এশিয়ায় পূর্বাঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইবে না। এসিয়ার বিভিন্ন প্রদেশের সমৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে এবং এরূপভাবে তাহা করিতে হইবে যাহাতে ভবিষ্যতে শক্তিবর্গের মধ্যে তাহা লইয়া স্বার্থ-সংঘাতের ক্ষেত্র সৃষ্ট হইবার কারণ না থাকে। শত্রুপক্ষের অধিকার হইতে মুক্ত রাজ্যগুলির সম্বন্ধে এবং মিত্রশক্তির অধিকারভুক্ত রাজ্যসমূহের সম্পর্কে আমেরিকাকে বিশেষ সতর্কতার সহিত তাহার ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণ করিতে হইবে। অধিকৃত দেশসমূহে স্বাধীন করিবার পর সেগুলি আমেরিকার যুদ্ধকালীন মিত্রশক্তির অধিকারে পুনরায় লওয়ার ব্যাপারে আমেরিকা যেন কোনভাবে লিপ্ত না হয়। ভবিষ্যতে অবস্থা এমন দাঁড়াইতে পারে যে, ব্রিটিশ এবং মার্কিনকে হয়ত শুধু জাপানীদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্যই সংগ্রাম করিতে হইবে না, তাহাদের নিজেদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য নিজেদের অধীন দেশেও সংগ্রাম করিতে হইবে। যুদ্ধের পরবর্তী এই শোচনীয় অধ্যায়ে আমেরিকা যেন কোনরূপ অংশ গ্রহণ না করে।

কিন্তু কোন জাতিকে পরাধীন রাখিবার এই উদ্যমে সাহচর্য করাই শুধু নিন্দনীয় নহে, তেমন কাজে সম্মতি যোগানোও সমভাবে নিন্দনীয়। বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ, এইভাবে অতীতে দস্যু সঙ্ঘে পরিণত হইয়াছিল। ভবিষ্যতেও যে তাহা না হইবে, এমন কি নিশ্চয়তা আছে? বরং তেমন সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই দেখা যাইতেছে। পার্লামেণ্টের কমন্সসভায় ইয়াল্টা সম্পর্কিত বিতর্কে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্পিয়ার্স সিরিয়া ও লেবানন সম্পর্কে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

বিশ্বমানবের স্বাধীনতাকে আমরা সর্বক্ষেত্রেই মূল্য দিতেছি। মিঃ চার্চিল সিরিয়া এবং লেবাননের স্বাধীনতা সমর্থন করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়; কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি আর একটি কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিপজ্জনক। তিনি বলিয়াছেন যে, ইহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য শক্তিপ্রয়োগ করা হইবে না। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যখন ইহাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তখন তাহাদের পক্ষে এই ধরণের যুক্তি চলে না। যেমনভাবে হউক, যদি শক্তিপ্রয়োগ করা প্রয়োজনও হয়, তাহা স্বীকার করিয়াও এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে কোন শক্তি—তাহাদের সঙ্গে আমাদের যেরূপ সম্পর্কই থাকুক না কেন, আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করিলে তাহাদের বিরুদ্ধেই আমাদের শক্তিপ্রয়োগ করিতে হইবে। প্রধান মন্ত্রী আমাদিগকে এই কথা বলিয়াছেন যে, এই অঞ্চলে ফরাসীদের বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে, কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে লেবানন এবং সিরিয়ার অভিমত উল্লেখ করেন নাই। বড়ই বিস্ময়কর এই ভুল। আটলাণ্টিক চুক্তি স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে একজনের পক্ষে এমন ভুল হওয়া উচিত ছিল না। মিঃ চার্চিল এবং মিঃ ইডেন নিশ্চয়ই ইহা জানেন যে, সিরিয়া সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট যখন কায়রোতে তাঁহাদের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, সেই সময়ই ফরাসী কর্তৃপক্ষ নিজেদের দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় রত সিরিয়ার সেনাদলকে বাধা দিবার জন্য সেনাবাহিনী ও সৈন্যবাহী স্পেশ্যাল প্রেরণ করিতেছিলেন।

হাওয়া কোন দিকে ইতিমধ্যেই ঘুরিতেছে এই বিবরণ হইতেই তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে।

ভাবী বিপ্লব ও বিদ্রোহ

মিঃ রুজভেল্ট মার্কিন কংগ্রেসের নিকট প্রদত্ত ইয়ালটার সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত বিবৃতিতে এই ভরসা দিয়াছেন যে, সানফ্রান্সিসকোর বৈঠকে জগতে যাহাতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং পররাজ্য গ্রাসের প্রচেষ্টা নিন্দিত ও দণ্ডিত হয়, এমন পাকা ব্যবস্থা করা হইবে; কিন্তু তাহাই যে জগতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় নয়, শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সম্প্রতি একটি বেতার বক্তৃতায়ও ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—

পরাধীন দেশসমূহের প্রশ্নের সঙ্গে মানব-সভ্যতার প্রশ্ন এবং সমগ্র জগতের ভবিষ্যৎ বিজড়িত রহিয়াছে। যুদ্ধোত্তর জগতে বাহির হইতে অন্য দেশ আক্রমণ করিবার সুযোগ অপেক্ষাকৃত হ্রাস পাইবে ইহা সত্য; কিন্তু যে সব দেশ পরাধীন রহিয়াছে, সেগুলির সম্বন্ধে কি হইবে? স্বায়ত্তশাসনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়াতে ঐ সব দেশের লোকের মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইতেছে, এই বিক্ষোভ আভ্যন্তরীণ সশস্ত্র প্রতিরোধের আকারে দেখা দিবে, এমন আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে এবং ইহা দলন করিতে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে, শুধু সদিচ্ছা প্রকাশে এক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সুতরাং জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে রাজনীতিক চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন সাধন করা প্রথমে প্রয়োজন।

চার্চিল এক্ষেত্রে নিরুত্তর তো বটেনই, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টও ত্রিশক্তির পারস্পরিক স্বার্থের চাপে পড়িয়া বেশ সুবোধের মতই এ সত্য চাপা দিয়া চলিয়াছেন। এই ধরণের ধাপ্পাবাজী দীর্ঘদিন চলে না।

মার্কিনের আয়োজন

জগতের বিভিন্ন দেশের বাজার আয়ত্ত করিবার জন্য মার্কিন দেশের বিজ্ঞান সাধনায় এখন হইতেই সাড়া জাগিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ কাঠ হইতে আশ্চর্যজনক আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা কাঠ হইতে মদ, জুতার তলা, রণতরী, ডেকের পাটাতন এবং বিমান হইতে উদ্ধার-কার্য পরিচালনার্থ সুরক্ষিত বাক্স প্রস্তুতের পরিকল্পনা উদ্ভাবন করিয়াছেন। সংবাদে প্রকাশ—

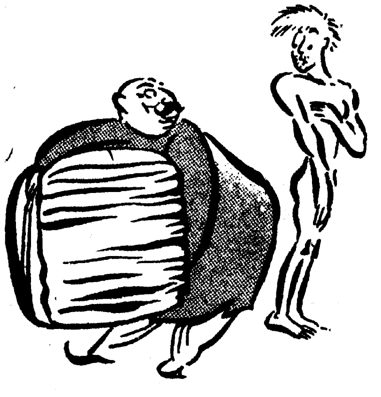
গত বৎসর গ্রীষ্মকালে করাতের গুঁড়া এবং কাঠের কুচি হইতে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যবহারের জন্য এলকোহল প্রস্তুতের প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই এলকোহল এখনও যুদ্ধের কার্য সম্পর্কিত কলকারখানায় ব্যবহৃত হইতেছে; ইহা পরিস্রুত করিলে উত্তম রকমের প্রথম শ্রেণীর সুস্বাদু মদ হয়।

সুতরাং যুদ্ধের পর আমাদিগকে আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য জল টানিতে এবং কাঠ বহিতে হইবে না; জলের অভাব উৎকৃষ্টতর পানীয়ের দ্বারাই পূরণ হইবে।

ফরাসী নেতা দ্য গল প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অসমর্থ বলিয়া একটি , সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি নিশ্চয়ই তিনি মার্জ্জনা করিয়াছেন। কিন্তু এই আমন্ত্রণ নাকি অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক বলিয়া ফরাসী নেতা তাহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বাঁদর-গ্রন্থির প্রখ্যাত চিকিৎসক Dr. Voronoff এখন ফ্রান্সে আছেন। একটি অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ যে, ফ্রান্স তার বিগত যৌবন ফিরিয়া পাইবার জন্য এখন Dr. Voronoffএর চিকিৎসাধীনে আছে। সুস্থ সবল হইয়া উঠিবার আগে নিমন্ত্রণ-রক্ষা বর্তমানে তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

* * *

বঙ্গীয় আইন পরিষদের সংবাদে জানা গেল যে, বস্ত্র সঙ্কটের জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশের জন্য কুমিল্লাতে একটি দিগম্বর মিছিলের



ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু তাহাতে সমস্যার কোন সমাধান হইবে কিনা সন্দেহ—কেননা এতদিন আমরা ন্যাংটার বাটপাড়ের ভয় নাই বলিয়াই জানিয়া আসিয়াছি। কিন্তু যুদ্ধের বাজারে প্রবাদটি নূতনরূপে প্রচারিত হইতেছে অর্থাৎ বাটপাড়ের ন্যাংটার ভয় নাই।

* * *

আমরা অবশ্য শ্রীযুক্ত অনন্তশয়নের এই দাবী সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি। কিন্তু সর্দার মঙ্গল সিংএর প্রস্তাব সমর্থন করিতে ভরসা পাইতেছি না। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের খানাপিনার জন্য কোন কোন স্টেশনে ট্রেন থামাইয়া রাখার ব্যবস্থা (যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য হয়) করা হউক। কিন্তু সর্দারজী হয়ত জানেন না যে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের খাওয়াকে "খানা" বলে না, তার নাম "গেলা"। সুতরাং গেলার জন্য ট্রেন থামাইয়া রাখার প্রস্তাব অযৌক্তিক!

* *

ট্রামে-বাসে

উচ্চারণের সুবিধার জন্য বর্মার কোন কোন গ্রামের নূতন নামকরণ করা হইয়াছে। এই নামকরণ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ অনেকখানি রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন—কেননা, এই নাম রাখা হইয়াছে কোন কোন বিখ্যাত সুরকারের নামানুসারে। আবার কতকগুলি গ্রামের নাম হইয়াছে—সর্বজন পরিচিত নৃত্যের নাম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—Hoffman, Gibert, Strauss, Rhumba, Foxtrot ইত্যাদি ইত্যাদি। উচ্চারণের দিক হইতে অবশ্য এই নামগুলিও আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক নয়—সুতরাং তার বদলে "কথাকলি", "মনিপুরী" প্রভৃতি নামকরণ হইলেই আমরা খুশী হইতাম। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় আমাদের দেশের নূতন নামকরণের প্রশ্ন উঠিলে কর্তৃপক্ষ আমাদের যেন অন্তত একটু নৃত্যছন্দে ছন্দিত করেন।

* * *

এবারে বঙ্গীয় আইন পরিষদে সদস্যরা নূতন ধরণের হোলি খেলিয়াছেন। আগেকার যুগে "গাধা", "বাঁদর" প্রভৃতির ছাপ রঙ মাখিয়া লোকের পিঠে মারিয়া দেওয়া হইত। পরিষদে এবার "মিথ্যুক", "চোর" প্রভৃতির ছাপ সদস্যরা পরস্পর পরস্পরের পিঠে মারিয়া দিয়াছেন। জনৈক আমেরিকাবাসী (সংবাদটি অসমর্থিত) নাকি এই হোলি খেলার একটি ফটোও তুলিয়া নিয়াছেন। তিনি স্যার গিরিজা-শঙ্করের প্রতিনিধি কিনা তা অবশ্য সংবাদটিতে বলা হয় নাই।

* * *

কেন্দ্রীয় পরিষদে রেলওয়ে বাজেট বিতর্কে বলা হইয়াছে যে, রেলওয়ের যে সব কাজকর্ম হয় তার ৯৯¾ অংশই ভারতীয়দের হস্তে ন্যস্ত আছে। এই ঘোষণার পর ভারতীয় সদস্যদের পক্ষে পূর্ব-বঙ্গের সুপ্রচলিত প্রবাদ অর্থাৎ "কর্তায় কইছে হালার ভাই, আনন্দের আর সীমা



নাই বলিয়া [illegible]

কিন্তু শ্রীযুক্ত অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার পূর্ব-বঙ্গের ,প্রবাদটির সঙ্গে পরিচিত নহেন বলিয়াই দাবী করিলেন যে, আমাদের উপরের দিকের এক-চতুর্থাংশ কাজ দিলেই আমরা খুশী থাকিব। এই দাবী অনুসারে কাজ হইলে অতঃপর রেলওয়ের চাকর-বাকর, পয়েণ্টসম্যান প্রভৃতি সমস্তই হইবে ইউরোপীয়ান। এমন কি স্যার এড্ওয়ার্ড বেন্থলকেও দিল্লি স্টেশনে "পানিপাঁড়ে" হইয়া ঘুরিতে দেখা যাইবে।

* * *

লণ্ডনের জনৈক প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ বলিয়াছেন যে, পূর্ণ স্বাস্থ্যবান সন্তান লাভ করিতে হইলে স্বামীকে বিবাহের পূর্বে মাস তিনেকের জন্য dieting করিতে হইবে। আমরা বিবাহের পূর্বে এবং পরে সব সময়ই যে dieting করিয়া থাকি তার



সাক্ষী স্বয়ং স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব। লণ্ডনবাসীর পক্ষে না খাইয়া শুট্‌কী মারিয়া থাকা হয়ত সম্ভব হইবে না। কিন্তু স্বাস্থ্যবান সন্তানের জন্য অতঃপর আমরা নিরম্বু উপবাস করিয়া পৃথিবীতে রেকর্ড রাখিয়া যাইতে পারিব বলিয়া আশ্বস্ত হইতেছি।

* * *

মেয়েদের পক্ষে কয়লার খনির ভিতরে কাজ করা সম্বন্ধে একটি নিষেধাজ্ঞা ছিল। সম্প্রতি সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। মেয়েরা কয়লা খনিতে নামিয়া কাজ করিলে কয়লার আমদানী বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া সরকার পক্ষ হইতে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমরা জানি কয়লা তোলা অপেক্ষা কয়লা পোড়ানোর কাজেই মেয়েদের হাত পাকা। তবে খনিগর্ভে নির্বাসিত বিরহসন্তপ্ত স্বামী যদি স্ত্রীর সান্নিধ্যে কর্মপ্রেরণা লাভ করেন, তাহা হইলে অবশ্য বলার কিছু থাকে না। কিন্তু এত করার পরও যদি কয়লা বাড়ন্ত হয় তাহা হইলে এই কয়লার কালি কিন্তু শতবার ধুইলেও মুছিবে না।



শ্রাদ্ধিক

শ্রীতারাপদ রাহা

সুশোভনের বাবা মারা গেলেন। আধ ঘণ্টাও হয়নি সুশোভন তাঁকে হরিনাম শুনাতে শুনাতে বের করে উঠানে তুলসী তলায় রেখেছে। পিসতুতো বিধবা বোন সরোজিনী মামার মৃতদেহ স্পর্শ করে বসে আছে। মৃত বাপের মুখের দিকে চেয়ে তাঁর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কিছুক্ষণ কেঁদেছে সুশোভন। একটু আগে যাঁর বুকখানা দ্রুতবেগে স্পন্দিত হচ্ছিল, অসহায় চোখ দুটি কষ্ট আর আকাঙ্ক্ষার সংগে যুদ্ধ করতে করতে এদিক ওদিক প্রিয়জনের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল—সে বুক আর চোখ এখন একেবারে নিথর নিস্পন্দ হয়ে গেছে। ঠোঁট দুটো যেন ক্রমে ফাঁক হয়ে যাচ্ছিল। এ মুখের দিকে আর চাইতে পারছিল না সুশোভন,—একটু পরে এই পরম প্রিয় মুখখানাতে নিজে হাতে নুড়ো জেবলে দিতে হবে তার। তাড়াতাড়ি চাদর দিয়ে বাপের মুখ ঢেকে দিয়ে পাশেই পিসতুতো ভাইয়ের বাড়ীতে গিয়ে বসলো সুশোভন।

পাশের বাড়ীর খগেন আর জ্ঞাতিভাই সুশীল লোক ডাকতে গেছে। ওরা আসবে, যোগাড়যন্ত্র করবে, তবে ত—। এখন কয়েক ঘণ্টা তার ছুটি; বাপের মৃতদেহের কাছ থেকে দূরে বসে নিজের অবস্থাটা সে একবার ভাল করে ভেবে নিতে চায়। সে পুরুষ, তাতে বড় হয়েছে—রব করে কাঁদা তার অশোভন,—কিন্তু চোখের জল তার বাধা মানছিল না।

বুকের ভেতর থেকে একটা—'বাবা গো'—রব বেরিয়ে এল সুশোভনের; কোঁচার-খুঁটে মোছা চোখের পাতা দুটি আবার নতুন করে ভিজে উঠল। নিজেকে সামলে নিতে দুটো হাঁটুর মাঝে মুখ রাখলে সুশোভন।

ঠিক সেই সময় ছোট ভাই মৃণাল এসে ডাকলে,—দাদা?

কাপড়ে চোখ মুছে সুশোভন জিজ্ঞাসু-নেত্রে চাইলে।

একবার বাড়ীর ভেতর আসবে,—দত্ত বাড়ীর মতিকাকা আর সত্যকাকা এসেছেন,—আর চৌধুরী বাড়ীর দাদা। ডাকছেন তোমায়।

চোখ দুটো আর একবার কাপড় দিয়ে ভাল করে রগড়ে নিয়ে সুশোভন বাড়ীর ভেতর এল। মতি দত্ত আর প্রকাশ চৌধুরী স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকলেন,—এস সুশোভন, এস।

উঠানে কয়েকখানা চেয়ার আর বেঞ্চ পাতা ছিল—বেঞ্চখানা সুশোভনকে দেখিয়ে মতি বললেন,—বসো।

যিনি গেলেন,—তিনি ত গেলেনই,—তা' বাপের ব্যাপারে তুমি কত কি—

সুশোভনের শোক-দুর্বল হৃদয়ে—হঠাৎ কে যেন একটা হাতুড়ির ঘা লাগিয়ে দিলে: বাপের মৃতদেহ এখনও উঠানে পড়ে রয়েছে—এর মাঝেই!...নিজেকে সামলে নিতে তার একটু সময় লাগলো। এদের চটালে বিপদ আছে—তা-ও সে জানে। একটু পরে মুখে যথাসাধ্য শান্তভাব এনে সে উত্তর করলে,—



মতির হাতে তখন হুঁকো ছিল,—দু'একটা টান দিয়ে একটু দেরি করে' তিনি বললেন—

বাপের মৃতদেহ মাটিতে পড়ে রয়েছে, এই অবস্থায় কাষ্ঠাসনে বসতে সুশোভনের ভাল লাগছিল না,—সে বললে, আমি বেশ আছি, কাকা, আপনি বলুন।

মতির হাতে তখন হুঁকো ছিল,—দু'একটা টান দিয়ে একটু দেরী করে তিনি বললেন,—কয়েকটা কথা তোমায় জিগ্গেস করা প্রয়োজন বোধ করছি।

বলুন।

কাকা, ছ'মাস আগে পাছে—দুটো কাজ, তাই যা ভাবছি—

তবুও—

মায়ের কাজের যতটা কাছাকাছি হয়—তারই চেষ্টা করব।

এবার খাওয়া লওয়ার কি করবে ভাবছ?—লুচিই করবে না কি?

মায়ের কাজের সময় কি করে কলকাতা থেকে ময়দা আর ঘি এনেছি—আপনারা ত জানেন। এবার আর সে সুযোগ কোথায় পাব?

তা, এবার তুমি চিড়ে দই কয়তে পারো,—কোন হাঙ্গামা নেই।

অতি বিনীতভাবে সুশোভন বললে,—এসব মিটে যা'ক,—ধীরে সুস্থে একটা কিছু—আপনারাই এসে ঠিক করে দেবেন।

মোট কথা বাপের দেহ এখনও বাড়িতে পড়ে—এ সময় খাওয়ার ফিরিস্তি দেবার মত মনের অবস্থা সুশোভনের ছিল না। সে তাড়াতাড়ি কথা শেষ করে ওঁদের কাছ থেকে ছুটি নিতে চায়। তার যাবার উপক্রম দেখে মতি আবার ডাকলেন,—সুশোভন, শোনো,—।

সুশোভন আবার কাছে এসে দাঁড়াল।

বাপের কাজ তা'লে মায়ের কাজের মতনই,—মানে প্রায় কাছাকাছিই—করতে চাও ত?

আজ্ঞে হাঁ,—যতটা পারি, প্রায় কাছাকাছি।

মতি হঠাৎ মৃণালের দিকে তাকিয়ে বললেন,—তা'লে তুমি ও সবের ব্যবস্থা করতে পার।



হ্যেরিকেন ধরে কোন রকমে খাটিয়া নীচে জলের কূলে নামানো হল।

সুশোভন কিছু বুঝতে না পেরে মতি কাকার মুখের দিকে তাকালো।

মতি দত্ত বললেন,—ওরা দাদাকে খাটে করে সংকীর্তন করে নিয়ে যেতে চাইছে কি না,—তাই বলছি।

এতক্ষণে বুঝলে সুশোভন—জাঁকজমক করে—গ্রামবাসীকে খাওয়াবে এমন আভাস না পেলে—ওরা তার বাপকে খাটে চড়ে সংকীর্তন শুনতে শুনতে—শ্মশানে যেতে দিতে নারাজ।

মতি কাকার দল বিদায় নিলেন।

কাঠুরিয়া জুটেছে অনেক—কিন্তু কাঠ চেলা করতে কেউ চায় না। বুনোপাড়া থেকে কুঞ্জ সর্দারকে ডেকে এনে কাঠ চেলা করা হ'ল। জ্ঞাতি কাকা—বারীন—কিছুটা চেলা করলেন। কীর্তনের দলও এসে গেছে,—খোল জুটেনি। নিতাই খোল আনতে ওপারে গেছে। কীর্তনের দল হাসাহাসি সুরু করেছে। তাদের একসের মাখা তামাক—আর নারকেলের ছোবড়া চাই,—কলকে দুটো হলে ভাল হয়। বিড়ি চাই চার প্যাকেট।

সুশোভনের নির্দেশমত মৃণালই এসবের ব্যবস্থা করেছে। পাড়ার ছেলেরাই এনে দিলে সব। বারীন কাকা ঝটপট কাঁচা বাঁশের একখানা খাট তৈরী করে ফেললেন। খোলও এসে গেছে।

ওদিকে আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে। বারীন কাকা তাড়া দিচ্ছেন,—একটু জলদি করো,—বৃষ্টি নামলে,—চিতা ফেলে একটিকেও পালাতে দেব না আমি বলে দিচ্ছি। রাত কটা বাজে!

রাত প্রায় সাড়ে ৯টার সময়—কীর্তনীয়া ষোলজন, কাঠুরিয়া দশ জন, সুশোভন, মৃণাল, বারীন কাকা আর খগেন এই ত্রিশ জন লোক হরিবোল দিয়ে মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে চললো। সুশোভন ও মৃণাল দুজনাই কাঁধ দিয়েছে। সুশোভনের ইচ্ছা হচ্ছিল—কীর্তনের দল এমন একটা গান ধরে—যাতে এ জীবনের নশ্বরতার কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু ওদের ঝগড়াই থামছে না।

শ্মশানের কাছাকাছি এসে—কীর্তন ধরলে ওরা। কিন্তু তাতে সুশোভনের প্রাণের খোরাক মিললো না। ওর প্রাণে আজ যে শোকের বাগেশ্রী ধ্বনিত হচ্ছে—তার সঙ্গে ওদের সুর বা আবেগের একেবারে সঙ্গতি নেই।

এদিকে মেঘে সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেছে। আঁধারে পথ দেখা যায় না, হেরিকেন ধরে কোনরকমে খাটিয়া নীচে জলের কূলে নামানো হ'ল। উঁচু পাড়। কাঠুরিয়ারা কাঠের বোঝা উপরেই ফেলে তামাক খেতে বসলো। মেঘ ঘনিয়ে আসছে। বারীন খুড়ো চিতার জায়গা করে—চীৎকার করছেন, ওরে তোরা কাঠ দিয়ে যা। কেউ সাড়া দেয় না। অবশেষে সুশোভনই উঠে কাঠ আনতে গেল। ওকে দেখে কয়েকজন কাঠুরিয়া কাঠের বোঝা ধরলে,—কিন্তু নীচে নামতে আর কেউ চায় না। পাড়ের উপর থেকেই গড়িয়ে দিতে লাগল কাঠের বোঝা। বারণ করলে—কেউ শোনে না। সুশোভন নীচে নেমে এসে বারীন কাকার সাহায্যে বাপের খাটিয়া দূরে সরিয়ে রাখলে,—নইলে কাঠের বোঝার দৌরাত্ম্যে দাহ হবার আগেই বাপের দেহ নদীর জলে হারিয়ে যেতে পারত।

কাঠের বোঝা পাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওরা আবার তামাক খেতে বসলো। আর একটা কলকে গেছে কীর্তনের দলে। খোল করতাল বাজছে বটে, কিন্তু গান কেউ করছে না।

সুশোভন বাপের সর্বাঙ্গে ঘি মাখিয়ে দিতে লাগলো।

নাও,—ভাল করে মাখাও,—এ জন্মের মত মাখিয়ে দাও—বারীন কাকা বললে।

সুশোভনের দুই চোখ ভিজে উঠলো,—ঠোঁট দুটি দাঁতে চেপে ধরলে সে।

সাত কলসী জলে বাপের দেহ স্নান করিয়ে—চিতায় উঠিয়ে—মুখে আগুন দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে—যখন সে বারীন কাকা আর মৃণালের সঙ্গে উপরে রওনা হ'ল—তখন ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি সুরু হয়েছে।

নিভবে না ত, বারীন কাকা?

একবার ধ'রে গেলে আর ভয় নেই।...চল উপরে গাছের নীচে বসে একটু তামাক খেয়ে নেই।

খগেন একটু আগে উপরে উঠেছে;—ওরা আনতেই বললে,—এরা সব পালিয়েছে। বৃষ্টি পড়ার উপক্রম দেখেই সরেছে।

সুশোভন বিশ্বাস করতে পারছিল না: ঐ বটগাছটার নীচে নেই ত?

সব দেখা হয়ে গেছে, ভাই,—এসব সেয়ানা ছেলে।

বারীন কাকা বললেন,—দেখ ত' তামাক আর কলকে রেখে গেছে কি না?

খগেন বললে,—এই গাছতলা,—আর ঐখানে বসেছিল ওরা, দাঁড়ান, খুঁজে দেখছি।

মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল,—তারই আলোতে সবাই এদিক ওদিক সব দিক খুঁজে দেখলে,—তামাক, কলকের কিছুই রেখে যায় নি তারা।

বারীন কাকা হাঁকলেন,—বিড়ি,—বিড়ি কার কাছে ছিল?

বিড়ি ছিল মূল গায়েন নিতাইয়ের কাছে,—তাই নিয়েই ভেগেছে সে।

কারো মুখেই কথা সরলো না। বাতাসের সঙ্গে গুড়ি গুড়ি দুই চার ফোঁটা পড়ে বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। বাতাসে চিতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে,—তারই দিকে চেয়ে চারজন—নীরবে বসে রইল।

খানিক পরে শুধু বারীন বললেন,—বাড়ি ত আসো না, বাপু এই গ্রাম,—এদের নিয়ে আমরা গ্রামে আছি। ......যাবি,—যা,—শেষে তামাক-কলকেও নিয়ে গেলি!

একদিন পরের কথা। ভোরী বেলায়ই —জোঁকায় পুরুত বাড়ি খবর দেওয়া হয়েছে—কলকাতায় যাবার আগে তাকে সব কিছু জেনে যাওয়া চাই ঃ কি কি জিনিষ কিনতে হবে—পুরুতের কাছে কি কি জিনিষ দাম দিয়ে কিনে নেওয়া চলবে। মিষ্টি কথা বলে—হাতে পায়ে ধরে—যদি কিছু কমে সারা যায়। মায়ের কাজের সময় যেখানে যেখানে সামান্য জিনিষ দিলে চলত—মায়ের আত্মার তৃপ্তি হবে মনে করে, সেখানে অনেক ভাল ভাল জিনিষ দিয়েছে সুশোভন। ষোড়শের পাদুকা দানের জায়গায় খড়মের সাথে সুন্দর একজোড়া ভেলভেটের চটী, রুপোর টুকুরোর জায়গায় রুপোর সুন্দর এক সেট বোতাম। কাঠালের সুন্দর একখানা খাট,—তোষক, বালিশ, মশারি—কিছুই বাকী রাখেনি।

পুরুত যেমনি ফিরিস্তি দিয়েছিলেন,—জিনিষ সেই মতই কেনা হয়েছিল। সুশোভন ভেবেছিল—কাজ নির্ঝঞ্ঝাটেই কেটে যাবে,—কিন্তু তা কাটল না। সুন্দর খাটখানার উপর সাজানো শয্যাদ্রব্য দেখে গুরু বললেন—এ বিচিত্র শয্যা আমার,—গুরুবরণের শয্যা এ,—গুরু-বরণ না হলে শ্রাদ্ধই হতে পারে না,—পুরুত বলেন, এ আমার,—আপনি পাবেন ত শুধু জলপাত্র,—না হয় চলুন জিজ্ঞাসা করে আসি গোয়ালপাড়ার প্রমথ পঞ্চতীর্থের কাছে। উত্তেজিত গুরু-পুরুতের প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম।—সুশোভনের সে সব কথা মনে আছে।

এবার সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সকল দিকের কথা শুনে নিতে চায়, যাতে কোন গোলযোগ না বাধে।

বেলা প্রহর দেড়েকের সময় পুরুত অবিনাশ চক্রবর্তীর ছেলে সন্তোষ সাইকেলে চড়ে এল,—একটা ঝাড়নে বাঁধা সিধে সাইকেলের সামনে ঝুলছে।

সুশোভন এর আগেরবার দেখেছে তাকে,—চিনতে পেরে জিগ্‌গেস করলে, কোত্থেকে এলে ঠাকুর?

সরইনগর একটা ষষ্ঠীপুজো ছিল।

সাইকেলে চড়েই আজকাল পুজো করে বেড়াও না কি?

অনেক যজমান, নইলে সময়ে কুলোয় না,—লক্ষ্মী পুজো,—সরস্বতী পুজোর দিন ত—সাইকেল না হলে চলেই না।

এত দুঃখের মাঝেও হাসি পাচ্ছিল সুশোভনের,—কোনরকমে সামলে নিয়ে বললে, —তোমার বাবাকে খবর পাঠালাম,—তিনি না এসে—

তিনিই আসবেন,—তিনি খবর পাঠিয়েছেন,—তিনি একটু রেজেষ্ট্রি আফিসে গেছেন, সন্ধ্যাকালে আসবেন, অথবা কা'ল—

হঠাৎ রেজেষ্ট্রি আফিসে!

বাবা যে ওখানে কাজ করেন।

এসব কথা জানত না সুশোভন,—শুনে মনটা কেমন হয়ে গেল ঃ ছেলে সাইকেলে চড়ে পুজো করে বেড়ায়,—বাপ কাজ করেন রেজেষ্ট্রি আফিসে!

বারান্দায় বসে তামাক খেতে খেতে ভাবছিল সুশোভন। দুই তিন দিনের মাঝে এদিককার কাজ গুছিয়ে কলকাতা যেতে হবে তার। মৃণাল কোথায় যেন যাচ্ছিল,—সুশোভন ডাকলে তাকে,—মৃণাল শোন।

মৃণাল এগিয়ে এল।

ব'স এখানে, শুনি। সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভাল।...জান ত সমান্য কাজ করি। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের যে টাকা তোলা ছিল,—তার অধিকাংশ ভেঙে মায়ের শ্রাদ্ধ করেছি,—আবার ত পিতৃদায়ে পড়লাম,—এবার ত কিছু দিতে পারবে?

ম্লান হেসে মৃণাল বললে,—আমার কি কিছু আছে দাদা, যে দেব?

তবু কিছু ত কাজ করো!—কিছুই দিতে পারবে না?—সব কিছু হিসাব করে—তবে আমি টাকার জোগাড় করব কি না!

ধরে রাখ—কিছুই না।

সুশোভনের মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠলো। বোঝে সে সবই, তবু কিছুই যেন হয়নি—এমনি সুরেই বললে—বাবার কাজে জোর করে কিছুই তোমার কাছে চাই না,—কিন্তু এ কাজে কিছু যে তোমার দিতে হয়,—অন্ততঃ দুটো টাকাও দিও।

মুখ দেখে বেশ বুঝা যায়—মৃণাল এবার বেশ খুশী হয়ে উঠেছে,—তবু মুখখানা বেশ গম্ভীর রেখে সে বললে,—তা দেব,—কিন্তু দুটো টাকা কি আবার টাকা?

দুই তিন দিনের বেশি বাড়িতে থাকা চলবে না,—এর মাঝেই তার সব কিছু ঠিকঠাক করে যেতে হবে। ভাত খাওয়াতে হ'লে ক' মণ মাছের দরকার,—অতটা মাছ পাওয়া যাবে কি না,—গেলেই বা দাম কত পড়বে। সব কিছুই জানা দরকার।

* * *

লোক-চরিত্রের কথা ভাবতে ভাবতে মনটা খারাপ করে সুশোভন তামাক টানছিল,—এমন সময় ভানু চক্কোত্তিকে সংগে করে মৃণাল বাড়ি ঢুকলো।

আসুন,—ভানুদা, আসুন,—মৃণাল—সতরঞ্চটা পেতে দে।

ভানুদাকে দেখে সুশোভনের মনটা একটু হালকা হয়ে উঠল; এবার যা হ'ক—একটা সদযুক্তি মিলবে। কলকাতা থেকে আনা সিগারেটের টিনের থেকে একটা সিগারেট এনে দিলে সুশোভন ভানুদার হাতে। ভানুদা সিগারেট ধরালে—সুশোভন বললে,—বড়ই মুস্কিলে পড়লাম ত, ভানু-দা!

কি হল?

এবার ভাতের ব্যবস্থা করতে চাই-ছিলাম—সংগে কিছু ঘি-ভাত থাকবে,—কিন্তু মাছের জোগাড়—হবে কি করে?

ওসব হাংগামা করতে যাবে কেন,—মাছের কি বিশ্বাস আছে?—ভাতের সংগে প্রচুর মাছের ব্যবস্থা করতে না পারলে লোকে টিটকিরী দেবে।

তাহ'লে?

লুচির জোগাড় করাই তোমার ভাল। কিছু দই মিষ্টি থাকলেই হ'ল,—বস্।

কিন্তু ময়দা?

কত লোক খাওয়াতে চাও তুমি?

এই ধরুন পাঁচ ছয় শো।

আচ্ছা ময়দার ব্যবস্থা করে দেব আমি।

কোত্থেকে দেবেন?

এখান থেকেই দেব,—তোমার কোন ভাবনা নেই—মাগুরায় ভাল গাওয়া ঘি পাবে তুমি,—ঐ সংগে কিছু কুমড়ো আনিয়ে রেখ।

সুশোভনের মুখে হাসি ফুটে উঠলো ভানু-দা এসে তাকে কি দুর্ভাবনা থেকে যে মুক্তি দিলেন!

ঠিক পারবেন ত ভানু-দা।

আচ্ছা—দুর্ভাবনা তোমার এখনই ঘুচিয়ে দিচ্ছি...মৃণাল,—ছুটে গিয়ে একবার সুনীল মিত্তিরকে ডেকে আন ত।

আসল কথা—কণ্ট্রোলের ময়দা আছে গ্রামে,—কিছু পয়সা বেশী খরচ করলেই ব্যবস্থা হয়ে যায়,—সুনীল এসেও আভাসে ইংগিতে সেই কথাই জানালো। সুশোভনের এতে লাভই,—কলকাতা থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে—হাংগামা করে—বহু পয়সা খরচ করে ময়দা আনার চেয়ে এ ঢের ভাল। সুনীল ময়দা দেবার টাকাও নিয়ে নিল।

লুচির ব্যবস্থা এক রকম পাকাই হয়ে গেল।

এখন দরকার—কত লোক খাবে—তার একটা হিসাব।

লোক কিছু কমানো যায় কি না—সেই আলোচনা হচ্ছিল,—এমন সময় মতিকাকা এলেন। পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন,—বারান্দায় আলো দেখে, আর অনেক লোকের গলা শুনে এসেছেন তিনি।

আসুন, কাকা, আসুন,—সুশোভন আপ্যায়ন করেই ডাকলো।

মতিকাকা বারান্দায় আর উঠলেন না,—মুখখানা ভার ভার। নীচে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করলেন,—কি হচ্ছে তোমাদের?

একটা মোটামুটি হিসেব করছিলাম,—কত লোক হ'তে পারে।

লুচি করাই সাব্যস্ত করলাম, কাকা।

মতি দত্ত চমকে উঠে বলেন,—লুচি?—তবে আমায় যে সেদিন বললে ভাত,—কি দোষ করলো ভাতে?

মাছ জোটাতে পারব না, কাকা,—খবর নিয়ে জানলাম।

মাছ জোটাতে না পারো—চিড়ে দই করো। শেষে কিন্তু ফ্যাসাদে পড়বে, সুশোভন, বলে রাখছি।

ফ্যাসাদ কেন হ'বে?

এখানকার লোকের হিসেব নেই তোমাদের—ধরো দুশো লোক বেশী হয়ে গেল,—চিড়ের ব্যবস্থা থাকলে—এ বাড়ী ওবাড়ী থেকে দু'চার সের চেয়ে চিন্তেও আনা যায়—দইয়ের সঙ্গে একটু জল মিশিয়েও দেওয়া যায়—লুচি কম পড়লে—কি করবে তুমি?

যাতে কম না পড়ে—তার ব্যবস্থা থাকবে কাছে।

কত খরচ করবে তুমি?

ধরুন খাবার জন্যে—সাতশো।

ওতে কিছুই হবে না,—লুচি করলে—বারশোর কমে খাওয়া হবে না।

বিদ্রুপের হাসি হাসলেন—মতি কাকাঃ আট মণ—বারো তেরো মণে কুলায় না কি আগে দেখ! তাইত বলছিলাম—খাওয়াতে হয় খাওয়ানোর মত খাওয়াতে হয়। না পারো ত মানুষ কমিয়ে দাও,—বলে মতি দত্ত বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন।

ভানু বললে, মায়ের কাজে একবার লুচি করে তোমরা নাম কিনেছ,—আবারও লুচি? তাতে সুখ্যাতি যে তোমাদের বেড়ে যাবে,—ও'র ভয় লোকে বলবে মতি দত্ত আঃ তাঁর বাপের কাজে কি খাইয়েছিল,—এ বাড়িতে ছ মাস পর পর দুটো কাজেই লুচি! এবার চিড়ে দই খাওয়ালে ও তবুও বলতে পারবে—এই ত একবার খাইয়েই হাঁপিয়ে পড়ল,—এবার খাওয়ালো ত চিড়ে দই!...

কথা শুনে সুশোভন অবাক হয়ে ভানুদার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

* * *

ভানুদা চলে যাবার মিনিট পনের পরেই পুরুত অবিনাশ চক্কোত্তি এলেন।

চক্কোত্তি বললেন, না, সুশোভন, সত্যি বলছি—মনটা আমার বড়ই খারাপ হয়ে গেছে। দাদা আমায় বড্ডই ভালবাসতেন। পণ্ডিত লোক ছিলেন,—কি ধর্মজ্ঞান! আমি এলে—আমার সঙ্গে কেবল ধর্ম-আলোচনাই হ'ত।...বৌদি আগে চলে যাওয়ায় বড়ই মুসড়ে পড়েছিলেন,—দিনরাত চোখে জল। আমি ধর্মকথা বলে—অনেক বুঝালে—কিছু প্রবোধ মানেন। সেদিন হাটে এসে দেখা করতে এসেছিলাম,—বললেন,—ঠাকুর, তোমার কথাতেই মনটা কিছু হালকা হয়েছে আমার। তাত হবেই—তোমরা হলে যজমানের মঙ্গলাকাঙ্খী। কথায় কথায় দাদা বললেন—সুশোভনের মায়ের শ্রাদ্ধে কাজকর্ম বেশ ভালই হয়েছিল,—লোকে খুব সুখ্যাতি করছে,—কিন্তু আমার একটা আপশোষ রয়ে গেছে অবিনাশ,—তোমাকে একটা গরদের নামাবলী দিতে পারলে—আমার শান্তি হ'ত।

এ সব কিসের ভূমিকা—সুশোভনের তা না বুঝবার কোন কারণ ছিল না। জ্বালায় তার গা চিটমিট করছিল, তবুও সাজা কলকেটা বামুনের হুঁকোয় তুলে সে পুরুত ঠাকুরের হাতে তুলে দিতে গেল। ঠাকুর মশায় বললেন, হুঁকোর জলটা ত ফেলে দিতে হবে বাবা—তোমাদের যে অশৌচ,—সরোজিনীকে বলুন ওদের বাড়ী থেকে জলটা পালটে দিয়ে যাক।

সরোজিনী জল পালটাতে হুঁকো নিয়ে গেলে—কলকেটাতে ফুঁ দিতে দিতে সুশোভন বললে,—আপনার ত আবার রাত হয়ে যাচ্ছে, আমি ভেবেছিলাম কয়েকটা কথা জেনে নেব।

বলো।

আপনি ত জানেন—বাবার বৃষোৎসর্গে আপত্তি ছিলঃ ষাঁড় ছেড়ে দিলেই কয়েক দিন পরেই আর খুঁজে পাওয়া যায় না,— তার কি দশা হয় তা-ও জানেন। অথচ বাড়ীতে চিরকাল পুষবার মত সামর্থ্যও আমাদের নেই। সুতরাং এবারও ষোড়শ হবে। আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই যে মায়ের কাজের সময় ষোড়শের যে যে জিনিসের লিষ্ট দিয়েছিলেন, তার কি কোন পরিবর্তন করা প্রয়োজন হবে?

না, না,—কিছুই পরিবর্তন নয়—ঐ সব।

একোদ্দিষ্টের কাপড়?—মায়ের সময় ত লালপাড়ে সাড়ী দেওয়া হয়েছিল,—এবার ঐটা পালটে দিতে হবে ত?

হাঁ, হাঁ—ঐটের বদলে—থান বা পেড়ে ধুতী। তা ওটা তুমি একটু খেলো কিনলেও পারো—ওটা ত অগ্রদানী পাবে কি না!

সরোজিনী হুঁকোয় জল পালটে এনেছে। পুরুত ঠাকুর তামাক টানতে সুরু করলে সুশোভন বললে,—গতবার গুরুদেব মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন এবার শয্যাদ্রব্য দুটো করতে চাই,—আর কি কিছু গুরুদেবের পাওনা আছে?

পুরুতের মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠলঃ ও থাট উনি পান না,—আমি গোয়ালপাড়ার পণ্ডতীর্থকে জিগেস করেছি,—তুমি মিছিমিছি খরচ করতে চাও ত আমি কি করবো?

হাঁ,—আর একটা জিগ্‌গেস করি,—সবদিকেই কিছু খরচ কমাতে চাই এবার, আপনি ত ষোড়শের কোন কোন জিনিষের মূল্য ধরেও নিয়ে থাকেন।...গতবার ত একটা ভালো ছাতাই দিয়েছি,—এবার যদি ছাতার মূল্য ধরে দিই,—চলবে?

না, না,—ছাতার কি মূল্য ধরে দিলে চলে? পৈতে, চন্দন কাঠ, প্রদীপ—এই সবের মূল্য ধরে দেওয়া চলে।

মৃদু হাসলো সুশোভনঃ চলুন, যে আঁধার, আলো ধরে আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

* * *

প্রায় হপ্তাতিনেক পরে—কলকাতা থেকে জিনিষপত্র কিনে স্ত্রীপুত্র নিয়ে বাড়ী এসেছে সুশোভন। খরচ কমাবে কি,—সে ত দেখে বেড়েই চলেছে। সেবার একটা শয্যা দিয়েছিল এবার আবার দুটো শয্যা। তাছাড়া কালী প্রামাণিক বেঁকে বসেছিল,—অশৌচের কাপড় নেবে না সে,—যে কয়জনের অশৌচান্ত করবে সে তাদের প্রত্যেকের জন্য নোতুন কাপড় দিতে হবে।

সুশোভন বলেছিল, অশৌচের কাপড়ই ত চিরকাল পেয়ে এসেছিস তোরা?

কালী বলে, না—ও-সব এখন আর আমরা নিই না—আমরা কমিটি করে ঠিক করেছি, নোতুন কাপড় চাই।

আমাদের অশৌচের কাপড়গুলো যে নিলি।

সে সব কি বাড়ি নিছি আমি? আমি আপনারা চলে এলেই জলে ভাসিয়ে দিয়েছি।

সেবার নগদ কিছু টাকা দিয়ে, আর দু'খানা নূতন কাপড় পরে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোন রকমে কালীর হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল সুশোভন। এবার সেই বকেয়া কাপড়ের সংখ্যার সঙ্গে আবার নোতুন সংখ্যা যোগ করতে হল সুশোভনের।

এদিকে খরচের মাত্রা দেখে আর ছোট ভাই কিছু দেবে না শুনে গিন্নির মুখ ভার হয়েই আছে। কথায় কথায় কমলা বলে, এবার আমাদের পথে বসাবে, তবে ছাড়বে।

সুশোভন একবার উত্তরে বলেছিল—বাবা-মা আর আমার কাছে ভাত কাপড় চাইতে আসবেন না।

উত্তরে কমলা বলেছিল, সে কথা ঠিক—কিন্তু মানুষের কখন কি হয় বলা যায়? আমাদের কথাও ভাবতে হয়।

কথাটার অর্থ সুশোভন বুঝেছেঃ সুশোভনের অকাল মৃত্যু হলে এরা দাঁড়াবে কোথায়,—টাকা ত কিছুই রইল না।

কথাটায় যৌক্তিকতা আছে—তাই সুশোভন আর তর্ক করে নাই, কিন্তু মনটা তার বড় খারাপ হয়েই আছেঃ বাপের কাজে কমলার হয়ত তেমন সহানুভূতি নাই।

মায়ের কাজের সময় যেসব আত্মীয়স্বজনের আনা হয়নি, এবার তাদের সবারই আনা চাই। সুশোভন সবার কাছেই পত্র দিয়েছে। মাগুরা থেকে একখানা বড় নৌকা করা হবে—ওর কাছাকাছি যাদের বাড়ি তারা সবাই সুশোভনের সাথে এক নৌকোয় আসার কথা। কিন্তু কেউ এল না। এল সুশোভনের আসার দুই-একদিন পর পর, তিন চারবার করে নৌকো ভাড়া দিতে হল। বোনটি আবার তার জা আর শাশুড়ীকে সঙ্গে করে এনেছে। যাবার সময় এদের প্রত্যেকের আবার মান্যের কাপড় চাই।

কমলার মুখ-ভার ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

ঘাট করবার দিন কালী প্রামাণিক মোট পাঁচখানা নূতন কাপড় আদায় করে নিল। ছাড়া কাপড়গুলো কালী নেয় কিনা দেখবার জন্য সুশোভনের বড় কৌতুহল ছিল, কিন্তু কালী ঐ যে স্নান করতে লেগেছে—আর তার উঠবার নাম নেই। বেশ কিছুক্ষণ দেরী করে সুশোভন বাড়ী এল—কালী তখনও নদীর জলে গা রগড়াচ্ছে।

পরের দিন। ভেতরের উঠানে শ্রাদ্ধের জায়গা করা হয়েছে। ষোড়শের জিনিষপত্র সব

এদিকে ওদিকে সাজানো। পুরুত এসেছেন, তাঁর এক ছেলে এসেছে, অগ্রদানী ও গুরুদেব এসেছেন। শ্রাদ্ধের আসরে বসেছেন তাঁরা। মতি দত্ত একবার এসে ষোড়শের জিনিষপত্রের দিকে একবার কটাক্ষ করে চলে গেলেন। বেশ বুঝা যায়, তিনি দেখে গেলেন তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধের উপকরণের চেয়ে এগুলি ভাল হয়েছে, না মন্দ হয়েছে। তাঁকে আসরে বসতে বলা হল। তিনি বসলেন না, তাঁর কাজ আছে।

আকাশ বেশ পরিষ্কার। আষাঢ় মাসে এমন আকাশ বড় দেখা যায় না। শ্রাদ্ধ করতে বসেই সুশোভন বললে, আষাঢ় মাস, বড়ই ভয় ছিল—কাল সন্ধ্যায়ও আকাশ দেখে তেমন ভরসা পাই নি, আজ আকাশ দেখে মনে হচ্ছে যেন ভালয় ভালয়ই কেটে যাবে।

অবিনাশ চক্কোত্তি সুশোভনকে হাত উঁচু করে অভয় দিয়ে বললেন,—কিছু ভয় নেই বাবা—এ অধম সন্তানের প্রতি মায়ের বড় কৃপা। শোন তবে বলি। ও-পাড়ার শ্রীমন্ত চন্দর কালীপুজোর জোগাড় করেছে সেবার আষাঢ় মাসে বারোয়ারী তলা। উপরে হরতকী গাছের পাতার ছাউনি ছাড়া আর ছাউনি নেই. পুজোর একটু আগে কোত্থেকে—এক কালো মেঘ এসে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেললে। শ্রীমন্ত ত তাই দেখে থর থর করে কাঁপতে লাগলো, পুজোর জিনিষপত্র বুঝি সব যায়। বললাম, শ্রীমন্ত তোমার ভয় কি, যাঁর পুজো তিনিই রক্ষা করবেন। বলে চোখ বুজে মাকে ডাকতে লাগলাম। বললাম—মা, আমি অধম সন্তান—বিদ্যাবুদ্ধি কিছু নেই, ওকে তোমারই নামে অভয় দিয়েছি মা—তুমি আমার লজ্জা নিবারণ করো। প্রায় আধঘণ্টা ধরে ডাকলাম মাকে, সুশোভন,—মা আমার লজ্জা নিবারণ করলেনঃ হয়ত বিশ্বাস করতে চাইবে না, কিন্তু লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখো—ও পাড়ায় বৃষ্টিতে এক হাঁটু জল বেধে গেল—কিন্তু এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে নি বারোয়ারীতলায়—

শুনে মৃদু হাসলো সুশোভন।

শ্রাদ্ধের কাজ আরম্ভ হল।

কয়েকটা দান হয়ে যাবার পর ভূমি দানের পালা। পুরুত বলে চলেছেন—বিষ্ণুর্নমোঽদ্য আষাঢ়মাসি কৃষ্ণে পক্ষে দ্বিতীয়ায়াং তিথৌ ভরদ্বাজ গোত্রস্য প্রেতস্য........অক্ষয় স্বর্গকামঃ ইমাং সশস্যা—

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে পুরুত বললেন,—একটু থামো,......একটা কথা বলিঃ অনেকে ষোড়শের ভূমি দানের সময় কোন ফলের গাছ, কি মাঠান জমি দান করে থাকে,—তোমার যদি তেমন কোন অভিলাষ থাকে ত এই হচ্ছে তার সময়। আমি অবশ্য কিছু চাইছি না—তোমার যদি কোন অভিলাষ থাকে তাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

হাত জোড় করে সুশোভন বললে,—দেখুন আমি এখানে থাকি না—ছোট ভাই মৃণাল থাকে, তার কি সুবিধে, কি অসুবিধে না জেনে আমার হঠাৎ কিছু বলে ফেলা ঠিক নয়, এখানে যে উপকরণ সাজানো আছে, তাই দিয়েই—

বেশ, তাই সেরে দিচ্ছি আমি—ভাইয়ের সঙ্গে যুক্তি করে ওটা পরে না হয়—

পুরুত মুখ ভার করে মৃৎপাত্রের উপরকার ধানের দিকে চেয়ে মন্ত্র পড়িয়ে চললেন......ইমাং সশস্যা প্রিয়দত্তাং তদ্ভূমিম্ অর্চিতাম শ্রীবিষ্ণু দেবতা কামঃ যথাসম্ভব গোত্র নাম্নে ব্রাহ্মনায় অদং দদানি।

* * *

পরের দিন খাওয়া দাওয়া। আয়োজন নিখুঁৎ করবার জন্য এবার বাড়িতেই মিষ্টি তৈরী হচ্ছে। মাগুরা থেকে হালুইকর আনা হয়েছে। এদিকে মৃণাল পাড়া থেকে ফিরে এসে বললে,—দাদা আয়োজন ত করেছ—কিন্তু এদিকে যে মতিকাকা দল পাকাচ্ছেন।

কেন?

গ্রামের কয় ঘর বাদ দিয়েছ, অথচ ভিন গাঁয়ের লোককে নিমন্ত্রণ করেছ।

ওঃ—

বললে বটে ওঃ—কিন্তু ভাবনাও হতে লাগলো সুশোভনের। একটু পরে সে মৃণালকে ডেকে বললে,—ভানুদাকে ডেকে আন ত।

ভানুদা এলে সব কথা তাঁকে খুলে বললে সুশোভনঃ কি করা যায়, ভানুদা—বলুন ত।

হেসে উঠলেন ভানুদাঃ কিছু করতে হবে না তোমার,—তুমি গ্যাঁট হয়ে বসে থাকো। ওরা চায় তুমি গিয়ে ওদের একটু খোসামোদ করো। তা করতে যাবে কেন?...অন্যায় ত কিছু করো নি।...দেখবে সবই আসবে,—না আসে রবাহুতের অভাব হবে না—আর তারা খেলেই বেশি পুণ্যি হবে তোমার, চুপ করে বসে থাক।

* * *

পরের দিন খাওয়া দাওয়া নির্বিঘ্নেই হয়ে গেল। সকাল বেলায়ও খবর পাওয়া গিয়েছিল—মতি দত্তের ঘরে জটলা চলেছে। সুশোভন ভানুদার কথা মত কোথাও আর গেল না। মতি দত্ত আগের "ব্যাচে" বসেই খেয়ে গেল।



কে যেন ঘাটে দাঁড়িয়ে ডাকছেন—নৌকো একবার লাগিয়ে দেও মাঝি।

সুশোভন নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে পরিবেশন করিয়েছে।

পুরুত ঠাকুরের খাওয়া হয়ে গেছে বারোটা, একটায়—তবু তিনি ঠায় বসেই রয়েছেন। ভয়ে সুশোভন তাঁর কাছে এগুচ্ছে না। তা ছাড়া ব্যাপারের বাড়ি, সময়ই বা কই। পুরুতের ভাব দেখে মনে হয় কি যেন তার বলবার আছে—ঠিক সুযোগ মিলছে না।

* * *

যাবার দিন মস্ত বড় এক নৌকা করতে হল সুশোভনের। আত্মীয়স্বজন সবাই মাগুরা পর্যন্ত যাবে তার নৌকায়। নিজেদের খরচ লাগার ভয়ে এবার আর কেউ আলাদা নৌকা করলে না। বাপ মা দু'জনারই সব কিছু শেষ হয়ে গেল—এক বিরাট শূন্যতার বোঝা সমস্ত হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তুলছে। সুশোভনের ইচ্ছা ছিল—নির্জ্জনাটে এক নৌকায় শুয়ে এই বেদনার কথাই ভাবতে ভাবতে যায়, কিন্তু তারও সুযোগ নেই—চারিদিকে লট বহর আর আত্মীয়স্বজনের চেঁচামিচি।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নৌকা ছাড়া হল। বাইরে এসে দাঁড়ালো সুশোভন। গতবার বাবা এসে একখানা লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ঘাটে। চোখ দুটি তার বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল। মৃণাল আর ছোট বউ এসে দাঁড়িয়েছে ঃ স্বার্থপর সব। সরোজিনীদি চোখ মুছছে।......মতি দত্ত গাড়ু হাতে নদীর ঘাট থেকে উঠছেঃ খুব খেলাটাই খেলেছেন এবার দত্ত।

নৌকা চলতে লাগলো, সুশোভন বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। শ্মশানে বাপের শেষ চিহ্নটা একবার দেখে যেতে চায় সে। ওপারে জোঁকার ঘাটগুলি দেখা যাচ্ছে।...কে যেন ঘাটে দাঁড়িয়ে মাঝিদের ডাকছেন,—নৌকো একবার লাগিয়ে যেও মাঝি।

পুরুত ঠাকুর যে!

নৌকো একবার লাগাও ঘাটে—সুশোভন হুকুম দিলে।

নৌকা ঘাটে লাগলে সুশোভন নেমে ঠাকুরকে প্রণাম করে এল।

তোমাকে আশীর্বাদ করবো বলেই কখন থেকে ঘাটে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি—পুরুত বলতে লাগলেন,—আবার কবে দেখা হবে কে জানে। মা দয়াময়ী মঙ্গল করুন তোমার।... তোমার মাবাপের কাজকর্ম নারায়ণের কৃপায় বেশ ভালই হয়েছে, সবাই সুখ্যাতি করছে.....

মাঝিরা বেলা বেড়ে যাচ্ছে দেখে নৌকা ছেড়ে দিল। এইবার নৌকা ঘুরলেই সুশোভন আড়ালে পড়বে,—পুরুত ঠাকুর অপেক্ষাকৃত উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন—আমার নামাবলীর কথা যেন ভুলো না বাবা,—তোমার বাবার ওটা দিতে বড়ই ইচ্ছে ছিল......কিছুদিন পরে দিলেও চলবে, বুঝলে—

শেষের কথাটা আর ভাল করে কানে গেল না সুশোভনের—পাশেই নদীর চরে কারা যেন একটা গরুর মৃতদেহ ফেলে গিয়েছে—কুকুরগুলি ভুচর আর খেচর তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি সুরু করেছে—তাদের চীৎকারে।

ওপারে গ্রামের শ্মশানে বাপের দেহ-বয়ে আনা খাটখানা এখনও জলের কিনারায় তেমনি পড়ে রয়েছে।

আরব জগতে ইসলামের নুতন রূপ

রেজাউল করিম, এম এ, বি এল

আরব জগৎ বলিতে যে সব দেশকে বুঝায়, সে সব দেশে বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে মানুষের অবস্থার সামাজিক পরিবর্তন অতি অদ্ভুতভাবে সাধিত হইয়াছে। সামাজিক ও পারিবারিক আচার বিচার, চাল-চলন, হাবভাব ও বেশবিন্যাসের পরিবর্তনের সহিত লোকের মনের ধর্মভাবেরও পরিবর্তন হইয়াছে। ঐহিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের সহিত একাঙ্গিভাবে ধর্মকে সংযুক্ত করিলে সর্বপ্রধান ক্ষতি এই হয় যে, মানুষ যখন সামাজিক বিধিব্যবস্থা ও পারিবারিক প্রথা ও চালচলনের পূর্ণতা ও স্থায়িত্বসম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়ে, তখন তাহারা শুধু এইগুলিকেই পরিত্যাগ করে না, এগুলির সহিত যে ধর্ম সংযুক্ত থাকে এবং যে ধর্মকে আশ্রয় করিয়া এই সব অনিত্য বিধিব্যবস্থা গড়িয়া উঠে, সেই ধর্মকেই আক্রমণ করিয়া বসে। ধর্মের স্থায়িত্ব ও সার্বজনীনতাকে অস্বীকার করিয়া বসে। 'রিফরমেশন' আন্দোলনের পর ইউরোপের বহু লোকের মনে এইভাবে ধর্মের প্রতি সন্দেহ জাগিয়াছিল।

বিগত পঁচিশ বৎসরে নিকট-প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সেই প্রকার সন্দেহের ভাব জাগ্রত হইয়াছে এবং আজ এই সন্দেহ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। এখানে কয়েকটি সামাজিক বিধিব্যবস্থার সহিত ইসলামকে এমনভাবে জড়িত করা হইয়াছিল যে, পরিশেষে ইসলাম এবং সামাজিক বিধিব্যবস্থা ও আচার বিচারগুলি একই অর্থবোধক ও ভাববাহক শব্দ হইয়া পড়িয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ পর্দা ও অবরোধের কথা বলা যাইতে পারে। বহু যুগ হইতে এইগুলি ইসলামের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যুগের চাপে এই ধরণের প্রথার উপর যখন সংস্কারকগণের আক্রমণ পতিত হইল, তখন শুধু এগুলিই ধরাশায়ী হইল না, ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের বহু বিধি-নিষেধের ভিত্তি শিথিল হইয়া গেল। নিকট-প্রাচ্যের জীবনধারা এইভাবে নানা পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইহার ফলে ইসলাম সম্বন্ধে মানুষের মধ্যযুগীয় ধারণার বহু পরিবর্তন সাধিত হইল। সেখানে ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তাধারার মধ্যে যে সব পরিবর্তন আসিয়াছে আজ সেই বিষয় কিছু আলোচনা করিব।

মুসলিম মহিলাদের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নারীদের সামাজিক উন্নতির জন্য যে সব পরিবর্তন প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা যুগান্তকারী পরিবর্তন। একটা মূলগত মনোভাবের পরিবর্তনের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে। মুসলিম জগতে আজ ধর্মকে নূতনভাবে চিন্তা করিবার ও উপলব্ধি করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে। শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ, সামাজিক ঐক্যের আদর্শের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, আর্থিক বিপর্যয়, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য, প্রাচীরঘেরা হেরেমের বাহিরে বৃহত্তর জগতের আকর্ষণ—এই সব যুগপৎভাবে নিকট-প্রাচ্যের মনোভাব পরিবর্তনে সহায়তা করিয়াছে। মেয়েদের কার্যক্ষেত্রের প্রসার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রাচ্য দেশের জীবনাদর্শের মৌলিক কাঠামোকে পুনর্গঠন করিবার আগ্রহ সর্বত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধর্মবোধ সম্বন্ধে তথায় এমন একটা পরিবর্তন আসিয়াছে যে, মেয়েদের অবস্থার আমূল সংস্কার না হইয়া পারে না। মেয়েদের অবস্থার পরিবর্তন ও ধর্মবোধের পরিবর্তন—এই দুইয়ের কোনটা অপরটার কারণ অথবা ফলস্বরূপ তাহা বলা কঠিন। তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, মেয়েদের অবস্থার সংস্কারের জন্য ধর্মবোধেরও কতকটা পরিবর্তন হইয়াছে। আবার ধর্মবোধের পরিবর্তনের জন্য মেয়েদের স্বাধীনতার আদর্শ ও সীমা আরও প্রসারিত হইয়াছে। ইসলামের মধ্যযুগীয় আদর্শ অনুসারে গঠিত সমাজের মেয়েদের অবস্থা এমন শোচনীয় স্থানে আসিয়া পড়িয়াছিল যে, সেই

অবস্থার সামান্যমাত্র পরিবর্তন বা উন্নতিকে ইসলাম-বিরোধী কাজ বলিয়া বিবেচিত হইত। এই পরিবর্তন মুসলমান সমাজে যুগ যুগ হইতে প্রচলিত প্রথাকে রীতিমতভাবে চ্যালেঞ্জ দিতেছে। আবার এই সব মধ্যযুগীয় প্রথাকে চ্যালেঞ্জ না করিলে মেয়েদের জীবনের কোনপ্রকার পরিবর্তন সম্ভব হইবে না। আরব জগতের নবজাগ্রত মুসলিম যুবকদের সহিত আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, তাহারা সাহসের সহিত ইসলামের মধ্যযুগীয় আদর্শ ও শিক্ষাকে সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া যে সব আদর্শকে অলঙ্ঘনীয় বিধি বলিয়া মনে করা হইত, সে সব আদর্শকে তাহারা পরিবর্তন ও কতক কতক ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিতে দ্বিধাবোধ করে না। মুসলিম সামাজিক জীবনে যে সব প্রথা অচলায়তন সৃষ্টি করিয়াছে, সেগুলিকে অনেকে বিনা দ্বিধায় পরিত্যাগ করিতেছে। সেই জন্য মুসলিম মহিলাদের সামাজিক জীবনে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। মিশরের একজন মহিলা নেতা বলেন,—"মধ্যযুগীয় ইসলাম মেয়েদের জীবনের উপর একটা দাস-মনোভাবের (inferiority) পাথর ভার চাপাইয়া দিয়াছে। এই তথা-কথিত ধর্ম সেই সমস্ত সামাজিক প্রথাকে এমন একটা অনুমোদন দিয়াছে, যাহা মহিলাদের পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের সমস্ত সম্ভাবনাকে নষ্ট করিয়াছে।"

ইসলাম নারী জাতির অধিকার স্বীকার করিলেও মুসলিম সমাজ, তথা মুসলিম-জগৎ নারীদের উপর সর্বত্র সুবিচার করিতে পারে নাই। ইসলামের পয়গম্বর নারী জাতির কল্যাণের জন্য বহু বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার যুগে নারীদের জন্য যতটা কল্যাণ করা সম্ভব ছিল, তাহা তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা বহু বিষয়ে সামাজিক সংস্কার সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সে-যুগে প্রচলিত বহু কু-প্রথা তিনি রহিত করিয়াছেন। বহুবিবাহকে হ্রাস করিয়াছেন। বিধবা ও অনাথিনী নারীদের রক্ষার সুব্যবস্থা করেন। মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকার স্বীকার করেন। বিবাহের সময় 'দেনমোহরের' ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যবস্থা করেন। এইভাবে তিনি যেসব সংস্কার আনয়ন করেন, তাহা নারী-স্বাধীনতায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। পরবর্তী যুগে মুসলিম সমাজে যে জঘন্য অবরোধ-প্রথা প্রবেশ করিয়াছে, তাহার জন্য কোরান্ বা ইসলাম দায়ী নহে। কোরান্ এইটুকু বলিয়াছে যে, নারী বাহির হইবার সময় তাহার অলঙ্কারাদি (জিনত) সাধারণকে দেখাইবে না। পরবর্তী ভাষ্যকারের কেহ কেহ 'জিনত'-শব্দের এই অর্থ করেন যে, মেয়েদের 'জিনত' হইতেছে তাহাদের মাথার কেশ। সুতরাং কেশ আবৃত করিতে হইবে। বাইবেলেও এই ধরনের কথা আছে—'women's hair is her crowning glory.' এই কেশ আবৃত করার প্রথা হইতে পরে বোরকার প্রচলন হইয়াছে। এইভাবে ভাষ্যকারগণের বিকৃত ব্যাখ্যার ফলে সমস্ত মুসলিম সমাজের নারীদের মধ্যে অবরোধ ও বোরকা ধীরে ধীরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং পরে উহাই ইসলামের অঙ্গীভূত একটা আদর্শের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িয়াছে। বহুবিবাহ-নিয়ন্ত্রণ, মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকার-প্রদান, প্রভৃতি সংস্কার-মূলক বিধি প্রবর্তন করিয়া হজরত মহম্মদ প্রমাণ করিয়াছেন যে, তিনি একজন বাস্তববাদী মানুষ ছিলেন। সামাজিক উন্নতির জন্য ধর্মপ্রেরণা একটা ফলপ্রদ উপায়বিশেষ। আরবগণ সামাজিক সংস্কার অপেক্ষা ধর্ম-মনোভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই সমাজ গঠন করিয়াছিল। সংস্কার-প্রবৃত্তি সর্বদাই পরিবর্তনমুখী। কিন্তু ধর্মপ্রেরণা পরিবর্তনবিরোধী। ধর্মের নামে সামাজিক সংস্কার করিলে তাহার কু-ফল এই হয় যে, কতকগুলি সংস্কৃত প্রথা ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। পরবর্তী কালে যুগের দাবীমত সেগুলি পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। মুসলিম নারীদের জন্য ইহা দুর্ভাগ্য যে, সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমানের মধ্যে ধর্মের অনুপ্রেরণায় যেসব সামাজিক সংস্কার প্রবর্তিত হইয়াছিল, যুগের দাবী অনুসারে সেগুলির পরিবর্তন ও পুনঃ-সংস্কারের জন্য ক্রমশ উন্নতশীল ও বিকাশমান ভিত্তি রচিত হয় নাই। ধর্ম ও সামাজিক সংস্কারকে একই পর্যায়ভুক্ত করার ফলস্বরূপ রক্ষণশীলতা সমাজে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সাধারণ মুসলিমের মন পরিবর্তন-ভীতু হইয়া পড়িয়াছে। হজরতের প্রত্যেক কথা ও কাজ স্বর্গীয় অনুপ্রেরণার দ্বারাই হইয়াছে, এইরূপ বিশ্বাসের ফলে তাঁহার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ, অনুরাগ ও বিরাগের বস্তুগুলিকেও স্থায়িত্ব ও অনন্তত্ব দ্বারা সর্বকালোপযোগী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। জগৎ পরিবর্তনশীল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রাথমিক যুগের আরব দেশের বহু প্রথাকে আজিও ধর্মের নামে চালু রাখা হইয়াছে। ধর্মীয় আইনের ভাষ্যকারগণ যুগের প্রয়োজন সম্বন্ধে খুব বেশী সচেতন ছিলেন না। বিশেষত, মেয়েদের উন্নতি ও স্বাধীনতার আদর্শ দ্বারা তাঁহারা মোটেই উদ্বুদ্ধ হন নাই বলিয়া তাঁহারা ভাবিতে পারেন নাই যে, যুগের সময়ের ও অবস্থার পরিবর্তনের সহিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক বহু বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তন ও সংস্কার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িতে পারে। চিন্তায়, ভাবে, আদর্শে ও সমাজ-কল্যাণমূলক কর্ম-পদ্ধতির ক্রমবিকাশের ব্যাপারে তাঁহারা সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া রহিয়া গেলেন। তাই নারী-কল্যাণমূলক সমস্ত ব্যবস্থায় তাঁহাদের চিন্তা সপ্তম শতাব্দীর আদর্শ ও অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। হজরতের যুগেও মেয়েদের যে অধিকার ছিল, তাঁহারা তাহাও সঙ্কুচিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ধর্মের বিভিন্ন শিক্ষাকে তাঁহারা আরও কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। হজরত মহম্মদ সেই সপ্তম শতাব্দীতে মেয়েদের জন্য যেসব সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা সেই যুগের মানদণ্ড অনুসারে নিশ্চয় প্রগতিমূলক ছিল। কিন্তু সেই সব সংস্কারকে যদি বিংশ শতাব্দীতে শাব্দিক অর্থে অপরিবর্তনীয় বলিয়া বিবেচনা করা হয়, তবে তাহার সোজা মানে এই হইবে যে, ইসলাম সর্বপ্রকার পরিবর্তন ও ক্রম-বিবর্তনকে বাধা দেয়, অথবা নিরুৎসাহ করে এবং বর্তমান যুগের স্পর্শ হইতে ইসলাম নারী জাতিকে সর্বপ্রকারে দূরে রাখিতে চায়। কিন্তু ইসলামের উদ্দেশ্য তাহা নহে। ইসলাম ক্রমবিবর্তনবাদ স্বীকার করে, সেইজন্য ইসলাম সামাজিক কোন বিধি-ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী আইন বলিয়া স্বীকার করে না। সেইজন্য নারী-প্রগতিমূলক কোন কাজই ইসলামবিরোধী হইতে পারে না। যুগের প্রয়োজন ও অবস্থার পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য না রাখার ফলে মুসলিম জগতের সর্বত্র নারী-সংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থাগুলি গোঁড়া ও রক্ষণ-শীল আদর্শ অনুসারে অপরিবর্তনীয় হইয়া রহিয়াছে। এ-যুগে রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ এখনও ঘোষণা করেন, 'যেহেতু আমরা মুসলিম, সেই হেতু আমাদের কোন পরিবর্তনের দরকার নাই।' হজরতের যুগে ইহাদের জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, আজ ঠিক তাহাই আছে। এতটুকুও পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু এই তেরশত বৎসর ধরিয়া জগৎ বসিয়া থাকে নাই। তাহার বহু পরিবর্তন হইয়াছে। জীবনের ধরণ সম্বন্ধেও মৌলিক পরিবর্তন হইয়াছে। এই যুগে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সপ্তম শতাব্দীর জীবনাদর্শ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না।

আরব জগতে আজ মানুষের জীবনাদর্শে বহু পরিবর্তন হইয়াছে। প্রথম মহাসমরের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সমগ্র আরব জগৎ একটা স্বতন্ত্র জগৎ ছিল। এই সময়ে নারীদের সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা ঠিক মধ্যযুগের মতই ছিল। কিন্তু মহাসমরের

প্রভাব ভীষণ ধাক্কা দিয়া তাহাদের এই ধারণাকে চুরমার করিয়া দিয়াছে। এই আঘাতে ইসলামের মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার দুর্গ একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মানুষের ধর্মরাজ্যের বাহিরে বাস্তব জগতে বিভিন্ন প্রকার শক্তিশালী প্রভাব—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ায় দিগ্‌ব্যাপী একটা প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। যে-ব্যবস্থা বহুবিবাহ সমর্থন করে, মেয়েদেরকে অবরোধে রাখিতে চায়, মেয়েদের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করে—তাহার উপর লোকের মন বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। ব্যাপার গুরুতর মনে করিয়া প্রতিক্রিয়াশীল কর্তৃপক্ষগণ এই নব্যাদর্শের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। তাহারা এই নবযুগকে পদে পদে বাধা দিতে লাগিল। কিন্তু ক্রমোন্নতির উত্তেজনা অদম্য হইয়া উঠিল। পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তব জগতের আবেদন মুসলিম সমাজের মধ্যে প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থাকে ক্রমাগত ধাক্কা দিতে লাগিল। তাহার ফল এই হইল যে, অনেক স্থলে মধ্যযুগীয় ধর্মের ভিত্তি পর্যন্ত উল্টাইয়া গেল। বর্তমান সভ্যতার সংঘর্ষে আসার জন্যে আরব জগতে সামাজিক পরিবর্তন অপরিহার্যরূপে দেখা দিয়া ধর্মের ধারণা ও আদর্শের ব্যাপারেও বহু পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে। একদিকে পরিবর্তনের হেতু, অন্যদিকে পরিবর্তনের ফল—এই দুইটির পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হইতে ধর্মের প্রতি একটা সংস্কারমূলক মনোভাব সর্বত্র জাগিয়াছে। এই পরিবর্তিত মনোভাব ইসলামকে যুগের দাবী অনুসারে রূপায়িত করিতে সহায়তা করিতেছে। ইহা হইতে বহু সামাজিক প্রথার সংস্কার অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবর্তনের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার প্রভাব মুসলিম মেয়েদের বেলায় খুব বেশী করিয়া দেখা যাইতেছে। কারণ, মেয়েদের মুক্তি হইতেছে সামাজিক সংস্কারের প্রধান মানদণ্ড। এই মুক্তির প্রশ্নই হইতেছে প্রাচীন ও নব্য মতবাদের পার্থক্য বিচারের প্রধান পরীক্ষাস্থল। বিংশ শতাব্দী মুসলিম জগতে ধর্ম ও সমাজের মধ্যে একটা নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চায়। বর্তমান জগৎ সর্ববিষয়ে আনিয়াছে একটা পরিবর্তন। প্রাচীন ধর্মীয় ও সামাজিক আদর্শ দ্বারা একীভূত জীবন-ব্যবস্থাকে বর্তমান জগৎ ভাঙ্গিয়া দিয়া ধর্ম ও সমাজকে পৃথক্ করিয়া গড়িতে চায়। বস্তুত বর্তমান জগৎ মধ্যযুগীয় জীবনাদর্শের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা মৌলিক বিপ্লব আনয়ন করিতে চায়। বহু যুগ হইতে ধর্ম ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা নানাভাবে পরস্পরের সহিত জড়িত হইয়া কিভাবে ক্রিয়া করিতেছে, তাহা সম্যক উপলব্ধি করা একটু কঠিন ব্যাপার। আরব জগতে ধর্ম ও সামাজিক সংস্কার লইয়া দুইটি দল গঠিত হইয়াছে। প্রথম দলের মধ্যে আছেন কতকগুলি প্রগতিবাদী সংস্কারক। তাঁহারা ইসলামের ধর্মীয়-সামাজিক-ব্যবস্থাকে একেবারে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া নূতনভাবে জাতি গঠন করিতে চান। তাঁহারা সমাজ-ব্যবস্থায়, রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইসলামকে স্থান দিতে চান না। তাঁহারা ইসলামের ধর্ম-বিশ্বাসকে নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়া মনে করেন। ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস দ্বারা মানুষের ঐহিক ব্যাপারকে প্রভাবান্বিত করিতে তাঁহারা মোটেই ইচ্ছুক নহেন। দ্বিতীয় দলকে 'সংস্কারবাদী বলা যাইতে পারে। তাঁহারা প্রাচীন ইসলামের বিধি-ব্যবস্থাকে নূতনভাবে ব্যাখ্যা করিতে চান। তাঁহারা একথা বেশ বুঝিয়াছেন যে, ইসলামকে নূতন জগতের সহিত খাপ খাওয়াইতে হইলে ইসলামের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না করিলে চলিবে না। ইঁহারা ইসলামের মধ্যে প্রচলিত প্রত্যেক বিধি-ব্যবস্থাকে চিরশাশ্বত বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইঁহারা রক্ষণশীল দলের অভিনব সংস্করণ মাত্র। বিংশ শতাব্দীতে ইসলাম সম্বন্ধে সবচেয়ে তর্কের বিষয় হইতেছে, সপ্তম শতাব্দীর আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইসলামের সামাজিক গঠন-প্রণালীকে পরিবর্তন ও সংস্কার না করিয়া এ-যুগে কেমন করিয়া চালান সম্ভব হইবে? আর এই সামাজিক গঠনপ্রণালীর প্রধান বিষয় হইতেছে, নারী জাতির সামাজিক অবস্থা,—তাহাদের স্বাধীনতা ও অধিকার। যাঁহারা ইসলামকে নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করিতে চান, তাঁহারা কোরানের 'স্পিরিটে'র (spirit) সহিত (শাব্দিক অর্থের সহিত নহে) সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মেয়েদের মুক্তির প্রশ্নকে সহজ করিয়া তুলিতে চান। তাঁহাদের মতে পর্দা, বহু-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং এই ধরণের নারীসংক্রান্ত বহু সামাজিক প্রশ্নের এমন-ভাবে সমাধান করিতে হইবে, যাহার জন্য ইসলামকে একেবারে বর্জন না করিয়াও বর্তমান যুগোপযোগী আদর্শ গ্রহণ করিতে যেন কোন বাধা উপস্থিত না হয়।

ধর্মীয় ঐতিহ্য ও যুগের দাবী—এই দুইটি সমস্যার সম্মুখীন হইয়া তুরস্ক যুগের দাবীকেই অগ্রে স্থান দিয়াছে। ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য না করিলেও প্রথা, আচার-বিচার ও মধ্যযুগীয় বহু সংস্কারকে সমূলে বর্জন করিয়াছে। রাষ্ট্র ও সমাজের উপর যুগ যুগ ধরিয়া ধর্মের যে দুর্লঙ্ঘ্য কর্তৃত্ব বিরাজ করিতেছিল, নব্য তুরস্ক তাহা অপসারিত করিয়াছে এবং দেশের উন্নতি-প্রচেষ্টাকেই রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।* মুসলিম জগতের অন্যান্য অঞ্চল পূর্বোক্ত দ্বিতীয় পন্থা অনুসরণ করিতেছে। অর্থাৎ ইসলামকে যুগের দাবীর সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতেছে। তাহারা সমস্ত সামাজিক সংস্কার ও পরিবর্তনকে ইসলামের আইনের 'স্পিরিটের' সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া স্বীকার করিতেছে। সমাজের সমস্যাকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিবার সর্বাপেক্ষা প্রধান কেন্দ্র হইতেছে মিশর। মনে রাখিতে হইবে যে, মিশরে রাজতন্ত্র প্রচলিত আছে। রাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা সর্বক্ষেত্রেই রক্ষণশীল এবং মধ্যযুগের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়। যেসব দেশ নূতন সামাজিক আদর্শ-অনুসারে নিজেদের মনোবৃত্তি ও সামাজিক রীতি-নীতি গঠিত করিতে চাহিতেছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে নানা বিষয়ে পার্থক্য ও মতানৈক্য আছে এবং তদনুসারে তাহারা অগ্রগতির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিতেছে। মিশর প্রভৃতি দেশ এই বিষয়ে একমত যে, তাহারা সামাজিক অগ্রগতির সীমানির্ধারণের ব্যাপারে ইসলামের নজীরে বিশ্বাসী। ধর্ম ও বর্তমান সভ্যতার সম্পর্ক লইয়া যেসব নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে, তৎসম্বন্ধে মুসলিম জগতের বিভিন্ন প্রদেশে ধর্মের প্রতি কিরূপ আচরণ প্রকাশ করিতেছে, তাহা জানিবার আগ্রহ আমাদের হইতে পারে। প্রথমেই মিশরের কথা ধরা যাক। আপাতদৃষ্টিতে মিশরকে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন দেশ বলিয়া মনে হইবে; কিন্তু কায়রোর সাধারণ অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হইবে যে, এ সম্বন্ধে তথাকার সরকারী দৃষ্টি মধ্যযুগীয় এশিয়ার দিকে নিবদ্ধ। তুরস্কের মত এখানে ইসলামের নজীর ও আদর্শকে অগ্রাহ্য করিবার মনোভাব কাহারও নাই। ধর্ম ও রাষ্ট্রকে একই দেহে খাড়া করিয়া মিশরকে ধর্মের দুর্গ ও ধর্মের রক্ষকভাবে গঠিত করিবার প্রবল চেষ্টা এক দল লোকের মধ্যে দেখা যাইবে। মিশরের আল্ আজহার বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র প্রদেশের উপর অপার প্রভাব বিস্তার করে। এই আল্ আজহারের জন্যই মিশর মুসলিম জগতে একটা প্রধান ইসলামিক কেন্দ্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। প্রায় এক হাজার বৎসর হইতে আল্ আজহার বিশ্ব-বিদ্যালয় মুসলিম জগতে প্রাধান্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। মিশরের মুসলিম শাসনকর্তাগণও সব সময় প্রতি ব্যাপারে ইসলামের প্রাধান্য রক্ষার কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া আসিতেছেন। বস্তুত আল্ আজ-হার ও মিশরের রাজশক্তি রক্ষণশীলতাকে সংরক্ষণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে।

মিশর বহু বিষয়ে পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন হইলেও মূলগত বিষয়ে একেবারেই প্রাচ্য

আদর্শের অনুসরণ করে। সেখানে সরকার পক্ষ হইতে ইসলামের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়, রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া রাজশক্তি পরিচালিত হয়। রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে একটা নিবিড় সহযোগিতা আছে। কিন্তু ইহার মূলে কারণ ধর্মনৈতিক নহে। রাজনৈতিক কারণেই এই সম্পর্ককে অক্ষুন্ন রাখা হইয়াছে। ধর্মানুভূতিকে জাগাইয়া রাখিয়া সর্বত্র রাজশক্তিকে রক্ষা করা হইয়া থাকে। আল্ আজহার এই ধর্মানুভূতিকে সতত জাগ্রত রাখিতে সহায়তা করে। রাজশক্তি ও আল্ আজহার উভয়পক্ষই Status quo অর্থাৎ প্রচলিত অবস্থাকে অব্যাহত ও অক্ষুন্ন রাখিতে সর্বদাই সচেষ্ট, কিন্তু এত করিয়াও মিসরকে নূতন যুগের প্রভাব হইতে রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, মিসরে নানাস্তরের লোকের মধ্যে মধ্যযুগীয় ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব জাগ্রত হইয়াছে। ধর্মান্ধতার সহিত রাজতন্ত্রের নিগূঢ় যোগাযোগ থাকায় এই বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে নাই। কিন্তু তুষানলের মত ধিকি ধিকি একটা অসন্তোষের আগুন জ্বলিতেছে, তাহা বেশ উপলব্ধি করা যায়। মিসর হইতেছে মধ্যযুগীয় ইসলামের একটা শক্তিশালী কায়েমী স্বার্থের লীলাভূমি। আবার সরকার পক্ষ হইতে এই মধ্যযুগীয় ইসলামকে সাহায্য, উৎসাহ, ও প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এই দুই কারণে সেখানে নরমপন্থী সংস্কারকগণ ইসলামের সহিত খাপ খাওয়াইয়া উন্নতিমূলক কার্যের জন্য আন্দোলন চালাইয়া থাকেন। অবশ্য আতাতুর্কের মত ধ্বংসকারী সংস্কারক যে নাই তাহা নহে। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা খুব অল্প। বর্তমানে সামাজিক সংস্কারের আন্দোলন মিসরে সকল শ্রেণীর লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এবং সর্বত্র একটা বর্তমান করণের প্রবৃত্তি (Modernising tendency) অনুভূত হইতেছে। কাসিম আমিন মিসরে একজন বিখ্যাত সংস্কার আন্দোলনকারী নেতা। তিনি কোর্-আনের বর্তমান ভাষ্যের আলোতে নারীদের জন্য পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করেন। সেইজন্য তাঁহাকে সরকারপক্ষ হইতে এবং রক্ষণশীল সমাজের পক্ষ হইতে বহু লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি ইহাতে দমিয়া পড়েন নাই। ধর্মের ব্যাপারে তাঁহাকে চরমপন্থী অথবা বিদ্রোহী বলা চলে না। কারণ তিনি কোর্-আনের ভিত্তিতেই সমাজ সংস্কার চাহিয়াছেন। নরমপন্থী সংস্কারকদের আদর্শ অনুসারে সমস্ত সংস্কার কোর্-আনের "স্পিরিটের" সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রবর্তন করিতে হইবে। কিন্তু এই ধরণের মতবাদের এভাবে স্বাধীনতার ক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। ইহার পরবর্তী অধ্যায় হইতেছে ইসলামের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যুগের দাবীর অনুরূপ সংস্কার সাধন আনয়ন করা। এই যুগ ধীরে ধীরে আসিতেছে। ইস্লামের বিরোধী এমন কোন সংস্কার মিসরে আইন দ্বারা গৃহীত হয় নাই। কিন্তু তথাকার ধর্মীয় চিন্তার মধ্যে পরিবর্তন ও বিপ্লবের সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখা যাইতেছে। বহু পূর্বে আল্ আজহারে পাশ্চাত্য প্রথায় বৈদ্যুতিক আলো প্রবেশ করিতে পায় নাই। কিন্তু বর্তমানে সে বাধা নাই। আল্ আজহারে বৈদ্যুতিক আলোর প্রবেশ প্রমাণ করে যে এই প্রাচীন রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠানেও নূতন যুগের হাওয়া লাগিয়াছে। তথায় ধর্মশিক্ষার মধ্যে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে নূতন শিক্ষানীতির প্রবর্তন, শিক্ষাপদ্ধতির প্রাচীন ধারার পরিবর্তন, আধুনিক রীতিতে নব্য কারিকুলাম প্রবর্তন, আধুনিক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা, আধুনিক বিজ্ঞান, তুলনামূলক ধর্মশিক্ষা, প্রাচীন মসজিদ হইতে ছাত্রগণকে স্থানান্তরিত করিয়া নূতন ভবনে আনয়ন, বর্তমান যুগের চাপে আল্ আজহারে এই ধরণের বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এই ধরণের পরিবর্তন হঠাৎ সামাজিক বিপ্লব আনিবে না। কিন্তু প্রতি বৎসর পনর ষোল হাজার মুসলিম ছাত্রকে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও তুলনামূলক ধর্মালোচনার সম্মুখে আনয়নের ফল যে সুদূরপ্রসারী হইবে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এইসব শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ উত্তরকালে সামাজিক প্রথার উপর অপার প্রভাব বিস্তার করিবে এরূপ আশা করা যায়।

ধর্মের সহিত রাজনীতির নিগূঢ় সম্পর্ক থাকার জন্য মিশরে সমগ্র ধর্ম ব্যবস্থাটা তর্ক ও আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। অধিকতর সুবিধাজনক মনে করিয়া বহু লোক প্রচলিত ধর্ম ব্যবস্থাকে বাহ্যতঃ স্বীকার করে বটে; কিন্তু যুগের দাবী অনুসারে ইহার প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানকে অন্তরে অন্তরে স্বীকার করে না বা তদনুসারে কাজ করে না। মিশরে একটা নূতন বিপ্লবী দল জাগিয়া উঠিতেছে যাহারা সর্ববিষয়ে উগ্রপন্থী। সামাজিক সংস্কারের ব্যাপারে তাহারা ধর্মের প্রাধান্য ও নজীরকে অস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই দলের কেন্দ্র হইতেছে মিশরের কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়। একদিকে এই বিশ্ববিদ্যালয় আর অন্যদিকে আল্ আজহার—এই দুই উগ্র ও নরমপন্থী দলের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদ আরম্ভ হইয়াছে। মিশরে রাজশক্তি আনুষ্ঠানিক ধর্মের পক্ষভুক্ত থাকার জন্য এমন কোন বিপ্লবাত্মক সংস্কার প্রবর্তিত হয় নাই যাহা প্রচলিত ধর্মাদর্শের বিরোধী। কিন্তু এদেশে বিপ্লবাত্মক ভাব ধারা এমনভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে যে, মনে হয় অচিরে একটা প্রবল ধর্ম বিপ্লব আরম্ভ হইবে। এখানে বায়ু ও আলোকের মত নূতন চিন্তাধারা যেভাবে মানব মনে নিত্য সঞ্চারিত হইতেছে তাহাতে ইহা আশা করা ভুল হইবে না যে, সেখানে যুগের দাবী মত (ক্রম বিবর্তনের মধ্যেই হউক অথবা বিপ্লবের মধ্যেই হউক) সামাজিক পরিবর্তন আসিতে বাধ্য। বর্তমানে মিশরবাসীর প্রধান লক্ষ্য হইতেছে রাজনীতি—ধর্মনীতি নহে। এই রাজনৈতিক কারণে নূতন সামাজিক সংস্কার ও ইসলামের আধুনিক ব্যাখ্যার মধ্যে একটা আপোষ হইতে বাধ্য। কোর-আন নারী জাতির জন্য যে সীমা রেখা টানিয়া দিয়াছে, নূতন ব্যাখ্যার দ্বারা তাহাকে আরও প্রসারিত করা হইতেছে। এইভাবে মধ্যযুগীয় প্রত্যেক আদর্শের একটা না একটা যুগোপযোগী অর্থ করা হইতেছে।

কেউ একজন মুখ খুলেলো



ফলে দশলক্ষ গ্যালন কেরোসিন সমুদ্রের জলে মিশল ও ভারতের শত শত গ্রামে কেরোসিনের অভাব ঘটল

অসতর্ক কথায় জীবন নষ্ট হয় এবং তা ছাড়াও যে সব জিনিসপত্র ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না, সে সব অমূল্য জিনিসপত্রও নষ্ট হয়। কেরোসিন তারই একটিমাত্র। শত্রুপক্ষ আমাদের জাহাজ ডুবিয়ে দিলে আমরা খাদ্য এবং ওষুধপত্র হারাই।

কেউ একজন মুখ খুলেছিল বলে—

এই বিবৃতিটি পাঠ করার সময় আপনি যেখানেই থাকুন, মনে রাখবেন আপনার ট্রেণের কামরায়, ক্লাবে, হোটেলে অথবা টেলিফোনে কথা বলার সময় শত্রুর গুপ্তচর হয়তো নিকটেই থেকে অসতর্ক কথা শুনছে। আপনার চিঠি হারিয়ে গিয়ে তার হাতে পড়তে পারে। তাকে হার মানানোর একটি-মাত্র উপায় আছে—আপনার সতর্কতা ও সংযম।

জাহাজ, সৈন্যদের গতিবিধি, নতুন রাস্তা, রেলপথ, এরোড্রোম বা অস্ত্রসম্ভার সম্বন্ধে আপনি যতটুকু জানেন তা নিয়ে আলোচনা না করার, তা প্রকাশ না করার, এমন কি আপনি যে কিছু জানেন এরকম কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত না করার জন্য নিজেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করলে নাবিকদের নিরাপত্তা ও জনসাধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এসে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা সম্পর্কে আপনার চরম সহায়তা করা হবে।

আপনার জন্য যেন বিপদ না ঘটে

ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট কর্তৃক প্রচারিত

AAA' 1341

উলুঘাসের দুঃস্বপ্ন

শ্রীবারীন্দ্রনাথ দাশ

বেশ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মনে ছিল না আমরা যুদ্ধোত্তর যুগে পা দিতে যাচ্ছি।

যুদ্ধের শেষ রাতটুকু একটু বেশী নিবিড় হয়ে ঘনিয়ে এসেছে। একদল আশাবাদীর চোখে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের স্বপ্ন। কিন্তু যাদের আশায় ও আশ্বাসে এ স্বপ্ন দেখা, তাদের চোখে দুঃস্বপ্ন। আর যাদের জন্যে এই স্বপ্ন দেখা তাদের চোখের সামনে সর্ষেফুলের ফুলঝুরি।

কংগ্রেস একদা বলেছিলো এবং এখনো বলছে যে, আমি ভারতবর্ষে একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে আমি স্বাধীনতার দাবী পেশ করছি পৃথিবীর দরবারে। ইণ্ডিয়া অফিসের পৃষ্ঠপোষকতায় সেদিন এদেশে সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হোলো ধর্মের ভিত্তিতে। এই বিভেদটি সর্বান্তঃকরণে মেনে নিলো মুসলীম লীগ। দাবী তার নেতৃত্ব। নেতৃত্বের ছ্যাকরা গাড়ীকে স্বাধীনতা দাবীর



নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি

তেজী ঘোড়ার সামনে রেখে ইণ্ডিয়া অফিস বল্লে কংগ্রেসকে,—তপস্বী বেড়ালের নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তোমরা বোঝপড়া করো নিজেদের মধ্যে; আমি শুধু পিঠে ভাগ করবো আমার নিজের নিরপেক্ষ বিচার বুদ্ধিতে। তৈরী হোলো পাকিস্থানের খসড়া। ডি-আই রুলের লাটে উঠলো কংগ্রেসী আন্দোলন। নেতাদের নির্বিকল্প সমাধি লাভ ঘটলো কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। জন-যুদ্ধের মার্ফিয়ায় বুঁদ হয়ে তথাকথিত সাম্যবাদীরা চুলবুলিয়ে উঠে বললে—এবার কংগ্রেস লীগ মিলন হোক। তারপর স্বাধীনতার পথে সম্মিলিত দলের ক্যাভালরী চার্জ সুরু করবো।

কথাটা শোনায় ভালো। একটা রোমাণ্টিক টাচ আছে। কিন্তু মিলন হবে কিসের ভিত্তিতে। যে ভাবাদর্শের মূলসূত্রগুলি বজায় রাখতে কংগ্রেস নেতারা আজ কারারুদ্ধ হয়েছেন, সেগুলো মুসলীম লীগ সমর্থন করে না। জতীয়তাবাদীরা চায় এই বিদেশী শক্তি আজ ঘরের ছেলে হয়ে ঘরে ফিরে যাক। মুসলিম লীগ চায় এই বিদেশী শক্তি আজ খাল কেটে আনা কুমীরের মতো তার পাকিস্থানের পেরাম্বুলেটার পাহারা দিক। কংগ্রেস আন্দোলন করুক, সে শুধু ফসল কাটবে। কাস্তের জোগান দিচ্ছে তথাকথিত সাম্যবাদীরা। তারা পাকিস্থানের নাম দিয়েছে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার। সোভিয়েট-রাশিয়ার নূতন কন্সিটিটিউশনের ক্যারিকেচার এর চাইতে ভালো আর হয় নি। দেশটাকে দুভাগ করে আত্মনিয়ন্ত্রণ! যার জন্যে গণভোটও নেওয়া হবে না। গান্ধীজী স্কন্দস্থির করে ফিরে এলেন মালাবার হিলের অনমনীয় শৃঙ্গশীর্ষ হতে। সাম্যবাদীরা নগরীর প্রেক্ষাগৃহে গণনৃত্য দেখাতে সুরু করলো—গান্ধী-জিন্না ফির মিলেঙ্গে। ইণ্ডিয়া অফিস বল্লে—There you are! আগে নিজেদের বিবাদবিসংবাদ মিটিয়ে ফেল। মুসলমানদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্যে একমাত্র ট্রাস্টি করো লীগকে। তারপর স্বাধীনতা। আমরা তো দিতে প্রস্তুত আছি। তোমরা এবার নিতে প্রস্তুত হলেই হয়। জিন্না সাহেবেরও এক কথা,—আগে পাকিস্থান স্বীকৃতি, তারপর বৃটিশ রাজের নিষ্কৃতি। কম্যুনিস্ট পার্টি অধিকতর উৎসাহে নাচতে লাগলো—গান্ধী-জিন্না ফির মিলেঙ্গে।

ভারতীয় পলিটিক্সের বল-রুমে ভালো করেই জমে উঠেছে মুসলিম লীগের ট্যাঙ্গো। ঢলঢলে পার্টনার জুটেছে কম্যুনিস্ট পার্টি। সংগীত পরিচালনা করছে ইণ্ডিয়া অফিসের ব্যাণ্ডমাস্টার।

রাজনৈতিক বিপ্লবের প্লবতা আছে যথেষ্ট, অকূলপাথারে ভেসে বেড়াবে, ডুবে যাবে না, কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের অকাল জাগর-স্বপ্ন হঠাৎ আইসবার্গের মতো আমাদের সমস্যা-সমুদ্রে মাথা উঁচিয়ে উঠেছে। প্রথমটা তথাকথিত 'পোস্ট-ওয়ার রিকন্সট্রাকশান' বা যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন। দ্বিতীয়টা ড্রাফট হিন্দু কোড। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বা সামাজিক পুনর্গঠন অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী এবং



পাকিস্থানের পেরাম্বুলেটার

সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু সে কি রাষ্ট্র পুনর্গঠনের আগে সম্ভব? কেন্দ্রীয় পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতায় এদের সম্ভাবনা কতখানি? দু' দল লোক ঐ দুটি পরিকল্পনা নিয়ে মাতামাতি করছেন, এ ধরণের অনৈসর্গিক পরিকল্পনা পরাধীন দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের পিচ্ছল যাত্রাপথে প্রতি পদক্ষেপে খানিকটা পিছলে যেতে বাধ্য। স্কুল জীবনে অঙ্ক কষতাম,—একটি বাঁদর একটি পিচ্ছল বাঁশ বেয়ে উপরে ওঠবার চেষ্টা করছে; প্রতি মিনিটে সে একটা নির্দিষ্ট ফিট উঠছে এবং খানিকটা পথ পিছলে পড়ছে; কতক্ষণে সে বাঁশের ডগায় উঠতে পারবে। পোস্ট-ওআর প্ল্যান এবং ড্রাফট হিন্দু কোডের পৃষ্ঠপোষকেরা আমাদের এ ধরণের একটা সমস্যার সম্মুখীন করেছে। ...ছ.

এসব সমস্যা স্থির ও ধীর মস্তিষ্ক ...সার
চিন্তা করবা ...াদি। এইগুলোর
আহার। ...আমাদের মনের মধ্যে জন্মায় ভয়, প্রেম ইত্যাদি নানারূপ অন্তর্বেগের সম... ...নুভূতি। এগুলো মানুষের সেই আগেকার গুহাবিহারের যুগেও যেমন ছিল, এখনকার বিমানবিহারের যুগেও ঠিক তেমনি আছে। এই সকল অন্তর্বেগ উপস্থিত হ'লে তখনকার মানুষ অকৃত্রিমভাবেই তা প্রকাশ করতো, অর্থাৎ ভয় পেলেই সে ছুটে পালাতো, রাগ হ'লেই হয়তো আচড়কামড় দিত, প্রেমের উদয় হ'লে কাউকে আলিঙ্গন দিতে তার বাধতো না। এতে সংস্কৃতির অভাব যতই থাক, মনের রোগের কোনো বালাই

মহামারী না হয়ে দাঁড়ায়। সায়েন্স কলেজের একজন খ্যাতনামা রসায়নবিদ ঘাসের চপ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। শোনা যায়, তিনি তা'তে সাফল্যলাভ করেছিলেন আশানুরূপভাবে। বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারে খাদ্য বিভাগে একজন বিশেষ উপদেষ্টারূপে নিয়োজিত আছেন। বাজারে শাকসব্জী তরীতরকারী বেশ দুর্মূল্য। আমাদের খাওয়ার আইটেমও অনেক কমে এসেছে। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে রেশনিংএর ব্যবস্থায় ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঘাসও রেশন করা হবে এবং চপের প্রস্তুত কৌশল সমস্ত দৈনিকের রবিবাসরীয় মহিলা



নাচো নাচো প্যারে মনকে মোর

মহলে পাকপ্রণালী কলমে প্রকাশিত হবে এবং যথাক্রমে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়াটা নেহাৎ কল্পনামূলক হলেও মানুষে-গরুতে এক টেবিলে ভোজনটা সুমধুর বাস্তবে পরিণত হবে। সেদিনকার ফুড কনফারেন্সের রিপোর্টে দেখলাম যে, দুধ সরবরাহ বাড়াবার জন্য একটা ড্রাইভ দেওয়া হবে। কর্তৃপক্ষ কলকাতায় দুধও রেশন রবার বিষয় বিবেচনা করছেন বলে শোনা ন্স। দুধে জলের অনুপাত ও চালে

আঁহাজ, ... সমতা থাকাটা বা অস্ত্রসজ্জার সম্বন্ধে আ . ই রুলের না করার, তা প্রকাশ না ক জল জানেন এরকম কোন ইঙ্গিত প া, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করলে নাবিকদের 1 প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এসে পৌ আপনার চরম সহায়তা করা হবে।

ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট কর্তৃ

AAA'1341

হতে দেওয়া উচিত নয়, এই সাধু সংকল্প নিয়েই সিলেক্ট কমিটি ইনসুরেন্স এ্যামেন্ডমেণ্ট বিলে এজেন্টদের কমিশনের হার কমিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন কিনা জানি না। তবে বীমার দালালেরা যে বেশ বিপন্ন বোধ করছেন সেটা বোঝা কঠিন নয়। আমরা খানিকটা সোয়াস্তি পেতে পারি এই ভেবে যে এ্যাপেণ্ডিক্সের ব্যথা অনুভব করবার সঙ্গে সঙ্গে অহরহ জীবনবীমা করবার অনুরোধের দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে না।

অথচ এদিকে ইনফ্লেশান কমবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আমাদের cost of living প্রায় আড়াই শো গুণ বেড়ে গেছে। চার্চিল সাহেব আমেরিকার প্রতি ভ্রূভঙ্গী করে পার্লিয়ামেণ্টে এক বক্তৃতায় বলেছেন, "পৃথিবীর বেশীর ভাগ সোনা নিয়ে সিন্দুকে জমিয়ে রাখা কি পাওয়ার পলিটিক্স নয়? তাই যদি হয়, বৃটেন সেদিক থেকে নিষ্কলঙ্ক।" কিন্তু স্টার্লিং ব্যালেন্সের পাওনা আটকে রাখা এবং ভারতবর্ষে ইনফ্লেশান হতে দেওয়াটা কি ধরণের পলিটিক্স, সে উত্তর চার্চিল সাহেবের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি, পাওয়া যাবেও না। সোনায় যদি মরচে পড়ে, লোহা তার নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়বে সেটা বিচিত্র নয়, কিন্তু মারওয়াড়ী শেঠ যদি কাবলীওয়ালাকে তার জীবিকার্জন পাওয়ার পলিটিক্স বলে গাল দেয়, তাহলে মারওয়াড়ীর চরিত্র বিশ্লেষণ বাঙালীর পক্ষে দুঃসাধ্য।

কারণটা অতি সহজ। মারওয়াড়ীর চোরা-বাজারের কারবার হোলো খাঁটি ইকনমিক্স, পাওয়ার পলিটিক্স নয়। সেখানে সে চায় মুনাফা। তার বেশী কিছু সে চায় না। চাওয়ার দরকার নেই,—কান টানলে মাথা এসে যাওয়ার মতো, মুনাফার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতাও যথাসময়ে হাতে এসে পড়বে। চার্চিলীয় অভিধানে একে পাওয়ার পলিটিক্স বলে না। চার্চিল সাহেব বিশ্ব-রাজনীতি ক্ষেত্রে পাওয়ার পলিটিক্স করতে চান না। শুধু তিনি নিঃশব্দে রাজনৈতিক চোরাবাজারে মুনাফা করবার অভিপ্রায়ে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে চলেছেন। তিনি বাড়তে চান না। তাঁর সাবেক কমনওয়েলথ নিয়েই তিনি পরিতৃপ্ত থাকবেন। তবে বিশ্বের কল্যাণের জন্য জার্মানীর এক-তৃতীয়াংশের শাসনক্ষমতা তিনি নেবেন, গ্রীসের অধিবাসীদের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যে তিনি সেখানে সৈন্য সমাবেশ করে "বিদ্রোহী ট্রটসকাইট"দের উপর গুলী চালাবেন এবং হয়তো অভিভাবকবিহীন নাবালক আফ্রিকান ইতালীয় উপনিবেশ-

গুলোর অভিভাবকত্বের ভার গ্রহণ করবেন। তা' ছাড়া বর্মার তেল আছে, মালয়ের রবার আছে, সিংগাপুর হংকং আছে এবং সম্ভব হলে পারস্যের তেল-কনসেশানও হয়তো হবে। পথের নির্দেশ পেলে সহযাত্রীর অভাব হয় না। স্টালিন পোলিশ-ইউক্রেন চান, বলটিক স্টেটস চান, বলকানে প্রভাব-এলাকা চান, হয়তো দক্ষিণ সাখালিনও চাইবেন। ফিলিপাইনের নিরাপত্তার জন্যে আমেরিকাও প্রশান্ত মহাসাগরের জাপ ম্যাণ্ডেটারী দ্বীপ-গুলো চেয়ে বসেছে। ফ্রান্স তার লিবানন, ইন্দোচীন প্রভৃতি ফিরে পেতে চায়। য়াল্টা কনফারেন্সে জার্মানী ভাগ বাঁটোয়ারার



ভারতীয় পলিটিক্সের বলরুমে

বন্দোবস্ত হয়ে গেল। বিশ্বরাজনীতির মজলিসী আসর আজ স্ফূর্তির হাওয়ায় মশগুল। যে যা চাইছে—চার্চিল সাহেব বিশেষ আপত্তি করছেন না। তিনি শুধু নিজের এলাকা বজায় রাখতেই ব্যস্ত। আসর থেকে তাঁর গলা শোনা যাচ্ছে "নাচো নাচো প্যারে মনকে মোর"। স্টালিনের লীলারঙ্গে তাঁর চোখে এতটা নেশা লেগেছে যে, পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে স্টালিনের মুরুব্বিয়ানা তিনি নিঃশব্দে হজম করলেন। আমেরিকা শুধু তালের মাত্রা গুনছে।

ভারতবর্ষে গান্ধীজী নিঃশব্দে চরকা ও অন্তর্গঠনের প্রোগ্রাম দিয়ে যাচ্ছেন। কম্যুনিস্ট পার্টি গণনৃত্য নিয়ে মেতে আছে —গান্ধী-জিন্না ফির মিলেঙ্গে। আর এখন ঋতুরাজের আবির্ভাবে বাঙলার বসন্তক্লিষ্ট জনসাধারণ ভাবছে ভ্যাকসিনেশ্যান-লিমফ নিয়ে সরকার ও করপোরেশনের বিবাদ কবে থামবে এবং উলুঘাস কবে থেকে নির্বিবাদে গজিয়ে নিঃশঙ্ক তৃণ-জীবন যাপন করতে পারবে।

স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গ

মনের রোগ

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য ডি-টি-এম্‌

শরীর আর মন দুই স্বতন্ত্র জিনিস তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এমনই অবিচ্ছেদ্য যে পরস্পরকে স্বতন্ত্র করে ভাবাও যায় না, আর দুইএর মধ্যে কোন্‌টি প্রধান তাও কিছু বলা যায় না। অনেকে বলে মনই প্রধান, শরীরটা স্থূল আবরণ মাত্র। আবার অনেকে বলে শরীরই প্রধান, মন একটা তার ছায়া মাত্র। কিন্তু যে যাই বলুক, আমরা শরীর-মনের এক একটি সমষ্টি। আমাদের শরীরকে বাদ দিয়েও মন নেই, আর মনকে বাদ দিয়েও শরীর নেই। শরীর অসুস্থ হ'লে মনকে সুস্থ রাখা যায় না, আবার মন অসুস্থ হ'লে শরীর সুস্থ থাকলেও তা কোনো কাজের হয় না। সুতরাং প্রকৃতভাবে সুস্থ হ'তে হ'লে আমাদের দুই দিক থেকেই সুস্থতা অর্জন করতে হবে, মাত্র একটা দিকে লক্ষ্য রেখে অন্য দিকটাকে অবহেলা করা চলবে না। শরীরকে সুস্থ না রাখতে পারলে সে বিকল হয়, তাকে আমরা বলি ব্যাধি। মনকে সুস্থ না রাখতে পারলে সেও বিকল হয়, তাকে আমরা বলি উন্মাদ অবস্থা। কিন্তু সেও এক রকমের ব্যাধি। চেষ্টা করলে শরীরের ব্যাধিকে যেমন নিবারণ করা যায়, মনের ব্যাধিকেও তেমনি নিবারণ করা যায়।

মানসিক স্বাস্থ্য হচ্ছে সেই অবস্থা যার দ্বারা মানুষ নিজেকে সুখী ও স্বচ্ছন্দ অনুভব ক'রে স্বাভাবিক জীবন সহজভাবে যাপন করতে পারে। আনন্দবোধই মানসিক স্বাস্থ্যের প্রধান লক্ষণ। কিন্তু সে আনন্দ উচ্ছ্বসিত বা ক্ষণস্থায়ী নয়, তা অনাবিল ও দীর্ঘস্থায়ী। অসুস্থ মন নিয়ে কেউ হয়তো মদ খেয়েও ক্ষণিক আনন্দ পেতে পারে, কিন্তু এ সে জিনিস নয়। এ আনন্দ জীবনকে হাসিমুখে গ্রহণ করার সহজ অভিব্যক্তি।

আনন্দপূর্ণ মানসিক স্বাস্থ্য লাভ করতে হ'লে মনকে অর্থাৎ মস্তিষ্কের বুদ্ধি-কেন্দ্রকে যথেচ্ছাচারে অভ্যস্ত হ'তে দিলে চলে না, তাকে যথারীতি ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে হয়। এই শিক্ষার সর্বপ্রথম এবং প্রধান নীতিটি এই যে, নিজেকে আপন পারিপার্শ্বিকের উপযোগী ক'রে নিয়ে চলতে হবে, উপস্থিত আবেষ্টনের সংগে নিজেকে অনায়াসে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এ ব্যতীত কেউই বাঁচতে পারে না, এমন কি গাছপালাও না। গাছপালাগুলো যেমন আবেষ্টনেই থাক, সেখান থেকেই রস এবং আলো আহরণ ক'রে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নেয়, যদিও তাদের মন বলে কোনো পদার্থই নেই। প্রাণীজগতে যত নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে ওঠা যায় ততই মস্তিষ্কের ক্রমিক উন্নতি লক্ষ্য করা যায়, ততই মনের অস্তিত্ব প্রকট হ'য়ে ওঠে। মানুষ তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী, তাকে মনের দ্বারাই সমস্ত কাজ করতে হয়, মনের দ্বারাই সমাজে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলতে হয়। যে তাতে সক্ষম হয় তার পক্ষে সুস্থ হ'য়ে থাকা সহজ হয়, আর যে অক্ষম হয় সে চারিদিক থেকে নানারূপ ধাক্কা খেয়ে আন্তরিক অসুস্থ হ'য়ে পড়ে।

প্রত্যেক মানুষের বাইরের রূপও যেমন স্বতন্ত্র রকমের, মনের রূপও তেমনি স্বতন্ত্র রকমের। তাই আমরা দেখতে পাই যে কোনো দুটি মানুষের মন কখনো এক রকমের হয় না, প্রত্যেকের মনই তার আপন স্বাতন্ত্র্যটিকে রক্ষা ক'রে চলে। এক একটি মন যেন এক একটি মৌলিক প্যাটার্নের জিনিস, তার আর দ্বিতীয় কোনো জুড়ি নেই। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই প্রত্যেকে বিভিন্ন চরিত্রের হয়, কারো সংগে কারো তুলনা করা চলে না। এইটাই প্রকৃতির স্বাভাবিক ব্যবস্থা আর এই জন্যই সংসার এমন বৈচিত্র্যময় হয়েছে, নতুবা একই চরিত্রের মানুষ যদি বহু সংখ্যায় থাকতো তাহ'লে পৃথিবী অসম্ভব হ'য়ে উঠতো। অতএব মনে সুস্থ হ'য়ে থাকতে হ'লে কারো চরিত্র পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই, কেবল দেখতে হবে যেন মানসিক সত্তাটি অযথা বিকৃত না হ'য়ে যায়।

কাকে বলে সুস্থ মন? এখন সেইটাই ভালো ক'রে বোঝা দরকার। তার জন্যে প্রথমে অসুস্থ মন সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকা চাই। শরীরের রোগ সম্বন্ধে ধারণা থাকলে যেমন নীরোগ অবস্থাকে বোঝা সহজ হয়, মনের অসুস্থতা সম্বন্ধে ধারণা থাকলেও তেমনি মানসিক সুস্থ অবস্থার কথা বোঝা সহজ হয়।

মনের অসুস্থতা দুই রকমের আছে,—সামান্য আর গুরুতর। যাদের মনে কোনো গুরুতর রোগের দ্বারা পরিপূর্ণ বিকার উপস্থিত হয় তাদের স্বরূপ দেখলেই আমরা বুঝতে পারি, তাদের আমরা বলি পাগল বা উন্মাদ। তাদের সম্বন্ধে পরিচয় দেবার এখানে প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ ছাড়া সামান্য রোগও নানা-রকমের আছে, যাকে আমরা চলিত কথায় বলি নার্ভাসনেস্‌ বা স্নায়ুদৌর্বল্য, আর বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলে সাইকো-নিউরোসিস। যে যতকাল এতে ভোগে সে ততকাল আপাত-সুস্থ চেহারা নিয়েও নানারকম অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে, এবং দোষ হচ্ছে জানতে পারলেও নিজেকে সম্বরণ করতে পারে না। অসুস্থতা হিসাবে খুব গুরুত্ব না থাকলেও এই প্রকার সাইকো-নিউরোসিসের অভিব্যক্তি অতি বিচিত্র রকমের এবং আপনাপন জন্মগত ও সংস্কারলব্ধ প্রকৃতি অনুযায়ী প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই তা এক একটা স্বতন্ত্র ও অদ্ভুত রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়।

নানা কারণে সাইকো-নিউরোসিসের সংখ্যা আজকাল এতই বেড়ে গেছে যে, কোনো রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে চিকিৎসকদের অনেক সময় ভেবে দেখতে হয় যে এটা প্রকৃতই শরীরের কোনো রোগ, না মনের রোগ। বিশেষত শহরের রোগীদের মধ্যে শতকরা প্রায় পঞ্চাশ জনের বেলাতেই দেখা যায় যে, তাদের মনের রোগটাই প্রধান, শরীরের রোগটা অবান্তর মাত্র। এটা দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নেই, কিন্তু শহরের তথাকথিত সভ্য মানুষের মহলে এই রকমই এখন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তারা মনে করে যে, তাদের শরীর খারাপ হয়েছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাদের মন হয়েছে অসুস্থ। এতে অবশ্য তাদের নিজেদের কোনো অপরাধ নেই।

সাইকো-নিউরোসিসের ধাত অনেকে হয়তো খানিকটা উত্তরাধিকারসূত্রেও অর্জন ক'রে থাকে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে মনের উপর অত্যধিক উৎপীড়নের ফলেই এগুলো দেখা দেয়। জীব হিসাবে আমাদের কতকগুলো সহজ প্রবৃত্তি আছে, —যেমন আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি, জিঘাংসার প্রবৃত্তি, যৌন প্রবৃত্তি ইত্যাদি। এইগুলোর থেকেই আমাদের মনের মধ্যে জন্মায় ভয়, ক্রোধ, প্রেম ইত্যাদি নানারূপ অন্তর্বেগের অনুভূতি। এগুলো মানুষের সেই আগেকার গুহাবিহারের যুগেও যেমন ছিল, এখনকার বিমানবিহারের যুগেও ঠিক তেমনি আছে। এই সকল অন্তর্বেগ উপস্থিত হ'লে তখনকার মানুষ অকৃত্রিম-ভাবেই তা প্রকাশ করতো, অর্থাৎ ভয় পেলেই সে ছুটে পালাতো, রাগ হ'লেই হয়তো আচড়কামড় দিত, প্রেমের উদয় হ'লে কাউকে আলিঙ্গন দিতে তার বাধতো না। এতে সংস্কৃতির অভাব যতই থাকুক, মনের রোগের কোনো বালাই

ছিল না। কিন্তু এখন অন্তর্বেগ প্রকাশের কোনোই উপায় নেই, সমস্তই চেপে রাখতে হয়। কেবল যে এইগুলিমাত্রই তা নয়, আরো অনেক বহুতর রকমের প্রবৃত্তি আছে যেগুলোকে আমাদের ছেলেবেলা থেকেই চাপতে শুরু করতে হয়, আর মনের স্বাভাবিকস্ফুরণকে পদে পদে ব্যাহত ক'রে চলতে হয়, যেহেতু এইই সভ্যতার নিয়ম। তার ফলে বাইরে যদিও আমরা সকল অবস্থাতেই নিরীহের মতো চুপ ক'রে শান্ত হ'য়ে থাকি বটে, কিন্তু চাপা দিয়ে রাখলেও ভিতরে এর কোনোটাই লোপ পায় না, মনের মধ্যে এর প্রত্যেকটির ক্রিয়া সম্পূর্ণভাবেই চলতে থাকে। শুধু তাই নয়, চেপে রাখার দরুণ এর প্রত্যেকটির ক্রিয়া আরো দীর্ঘস্থায়ী এবং জটিল হ'য়ে ওঠে। আগেকার গুহাবাসী মানুষ ভয় পেলেই ছুটে পালাতো, তৎক্ষণাৎ তার ভয়ের একটা নিবৃত্তি ঘটতো। কিন্তু এখনকার দিনে সামান্য কারণে ছুটে পালানো হাস্যকর, অতএব নির্বিকারভাবে দেখাতে হয় যে আমার কোনো ভয় নেই, এদিকে অন্তর্বেগটির নিবৃত্তি ঘটাতে না পেরে মনে মনে অনেকক্ষণ যাবৎ অনেক কষ্টই ভোগ করতে হয়। এমনিভাবে যে কোনো মৌলিক অন্তর্বেগকেই চাপা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা হোক, ভিতরকার মন তার পীড়ন থেকে কোনোক্রমেই অব্যাহতি পায় না। চিন্তাশক্তি অবিরত তাই নিয়ে ক্রিয়া করতে থাকে, এবং এই ক্রিয়ার ফলে তার অযথা অপব্যয় হ'তে থাকে। এই নিরবচ্ছিন্ন পীড়নের ও অপব্যয়ের ফলে মানসিক তেজসম্পদ এমন দেউলিয়া হ'য়ে যায় যে, কোনো একটা অতিরিক্ত আঘাত বা পীড়ন সে আর সহ্য করতে পারে না, অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটলে সে আর আপন স্বাভাবিক ওজন বজায় রেখে চলতে পারে না। অতএব নিত্য নিত্য অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে আসে মানসিক ক্লিষ্টতা, তার থেকেই হয় মানসিক অসুস্থতার প্রস্তাবনা। গোড়া থেকে আমাদের ভুল বোঝানো ও ভয় লাগানো শিক্ষাপদ্ধতিই এর জন্য দায়ী।

একে তো সভ্যতার সঙ্গে সমানতালে চলতে গিয়ে আমাদের অনেক রকমের লাঞ্ছনাই ভোগ করতে হচ্ছে, প্রতিনিয়তই কত শক্ পেয়ে প্রাণপণে সহ্য ক'রে যেতে হচ্ছে, অনবরত উদ্বেগ আর ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই দিন কাটাতে হচ্ছে। এর উপরে যদি কোনো আত্মীয়ের মৃত্যু, বা দুর্ঘটনা, বা অর্থহানি বা কোনো একটা দুর্দশা এসে পড়ে, তখন অনেকেরই মানসিক অসুস্থতা দেখা দেবার সম্ভাবনা হয়। বলা বাহুল্য, এগুলো নৈমিত্তিক কারণ মাত্র, যাদের মন স্বাভাবিকরূপে সুস্থ থাকে তারা এতে অসুস্থ হয় না। যাদের মন নানারূপ চিত্তবৃত্তিনিরোধের প্রয়াসের ফলে অনেক পূর্ব থেকেই ক্লিষ্ট হ'য়ে থাকে, তারাই এই সকল নৈমিত্তিক আঘাত আর সহ্য করতে পারে না এবং সহজেই নানারূপ মানসিক বিকারে অসুস্থ হ'য়ে পড়ে।

সাইকো-নিউরোসিস্ মোটামুটি চার রকমের আছে—নিউরাস্থিনিয়া, হাইপো-কন্ড্রিয়া, হিস্টিরিয়া এবং সাইকাস্থিনিয়া এইগুলির কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া যাক।

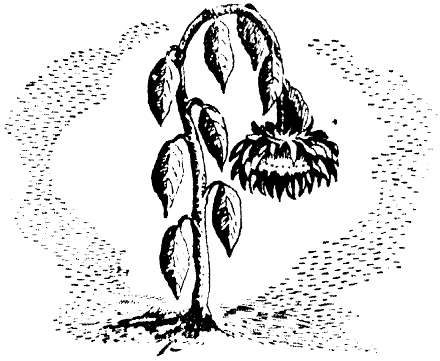
নিউরাস্থিনিয়া—এই কথাটির অর্থ নার্ভের দুর্বলতা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ দুর্বলতা নার্ভের নয়, দুর্বলতা আসলে মস্তিষ্কের। আমাদের শরীরের সমস্ত নার্ভগুলি টেলিগ্রাফের তারের মতো এক প্রকার তন্তুময় তার, সেগুলি মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার কেন্দ্রকোষসমূহ থেকে প্রসৃত এবং নানাবিধ স্নায়বিক বার্তার আদান-প্রদানকারী আধার মাত্র। নার্ভ মাত্রেই আপন কেন্দ্রাধীনস্থ বার্তাবহ, বাহিরের বার্তাকেন্দ্রে পেঁ'ছে দেওয়া আর কেন্দ্রের বার্তা যথাস্থানে পেঁ'ছে দেওয়া ছাড়া তার আর কোনই ক্ষমতা নেই এবং তার গঠনেও কোনো জটিলতা নেই। সুতরাং কেটে ছিঁড়ে বা রোগে ভুগে নষ্ট হ'য়ে না গেলে তার সহজে কোনো বিকৃতি ঘটতে পারে না বা নিজস্বরূপে তার মধ্যে কোনো দুর্বলতা জন্মাতে পারে না। যা কিছু দুর্বলতা বা চাঞ্চল্য ঘটে, তা মানসকেন্দ্ররূপী মস্তিষ্কে। কিন্তু মনের দোষ হয়েছে এ কথা কোনো নিউরাস্থিনিয়াগ্রস্ত রোগীকে বলা চলে না, বলতে হয় যে, নার্ভের দোষ ঘটেছে। সম্ভবত এই কারণেই নিউরাস্থিনিয়া নামটির উদ্ভাবনা। সামর্থ্যের অতিরিক্ত দুশ্চিন্তায় পীড়িত হ'তে থাকলে যে ক্লিষ্টতা আসে, তার থেকে এই অবস্থার উৎপত্তি হয়। এই অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকেরই হয়তো কিছু সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা আছে, দারুণ উদ্বেগ কিংবা মনোকষ্টের কালে সহজ মানুষের মধ্যেও এইরূপ নিউরাস্থিনিয়ার ভাব অল্পবিস্তর দেখা দিয়ে থাকে। তখন মেজাজটি হয়ে যায় খিটখিটে, মনে হয় যেন শরীরে আর কোনো সামর্থ্য নেই, সর্বদাই দারুণ ক্লান্ত, কিছুতে মন লাগে না, কোনো কাজে একাগ্রতা আসে না। এই প্রকার অবসাদের অবস্থার যখন বাড়াবাড়ি ঘটে, তখনই হয় পুরোদস্তুর নিউরাস্থিনিয়া। তখন দেখা যায় যে, মানুষটি যেন সর্বদাই অবসন্ন, তথাপি অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠিত, অতি তুচ্ছ ব্যাপারেও মহা আতঙ্কিত, সামান্য একটা শব্দ হলেই একেবারে চমকে ওঠে, তুচ্ছ কারণেও মনে করে এইবার সর্বনাশ ঘটলো, গভীর ঘুম তার কখনই হয় না, আধা ঘুমের অবস্থায় কেবলই স্বপ্ন দেখে ও ভয় পায়, সেই ভয়কে দমন করতে গিয়ে সে আরও বেশি ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। তথাপি যদিও সে এতই ক্লান্ত, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে বলবার সুযোগ পেলে তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। আসল কথা তার মানসিক তুলাদণ্ডটি একেবারে বিকল হয়ে গেছে, অনবরত ভীত আর সন্ত্রস্ত হ'য়ে সে একটা দুর্বহ জীবন যাপন করতে থাকে। নিজেকে নিয়ে সে সামলাতে পারে না, বারে বারে মৃত্যুকামনা করতে থাকে, কোনো দুর্বল মুহূর্তে হয়তো আত্মহত্যাও ক'রে ফেলতে পারে। একবার যদি এই নিউরাস্থিনিয়ার অবস্থাটি পাকা-পাকি দাঁড়িয়ে যায়, তা'হলে তার মূল কারণটি দূর হয়ে গেলেও সে আর পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায় না, মস্তিষ্কের ঐ বিকৃতিটুকু ভিতরে ভিতরে থেকেই যায়। তার ফলে দেখা যায় যে, তার স্থায়ী রকমের কতকগুলো মুদ্রাদোষ ঘটে গেছে—হয়তো অনবরত চোখ পিট্-পিট্ করে, নতুবা থেকে থেকে মুখ বিকৃতি করতে থাকে, নতুবা কিছু একটা অদ্ভুত রকমের অঙ্গভঙ্গী করতে থাকে। এই রোগ ভাবপ্রবণ পুরুষদের মধ্যে, আর বিশেষ করে বয়ঃপ্রাপ্ত যুবকদের মধ্যেই প্রায় দেখা যায়। আজকাল যুদ্ধপ্রত্যাগত সৈনিকদের মধ্যেও এই রোগ অনেক দেখা যাচ্ছে। যাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি প্রখর আর জীবনের আদর্শ উচ্চস্তরের, তাদের মধ্যেও সাধারণত এই রোগ হ'তে দেখা যায়। এই সকল রোগীরা চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা চায়, চিকিৎসক অনন্যোপায় হয়ে নানা রকম ওষুধ প্রয়োগ করে, কিন্তু কিছুতে কিছু ফল হয় না। প্রকৃতপক্ষে রোগটি নার্ভের নয়, মনের।

হাইপোকন্ড্রিয়া—আমরা চলিত কথায় একে বলি রোগ-রোগ বাই। মানুষ এতে অহেতুক নিজেকে দারুণ অসুস্থ ও মরণাপন্নবৎ বোধ করে। নিশ্চয় শরীরে একটা কিছু মারাত্মক রোগ হয়েছে, এই ভেবে সে একেবারে শয্যা নিয়ে পড়ে থাকে, মনে মনে ভাবতে থাকে যে, এবার আর তার জীবনের কোনো আশা নেই। বস্তুতপক্ষে কিন্তু দেখা যায় যে, এই রকম আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনা নিয়েই সে বেঁচে থেকে বহুকাল কাটিয়ে দিচ্ছে। বারে বারে এরা নিজের নাড়ি দেখে আর ডাক্তারকে দিয়ে বুক পরীক্ষা করায়, কেবলই ভাবে হার্টফেল হবে কিংবা থাইসিস্ হবে। অষ্টপ্রহর নিজের শরীরের চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকলেও এরা কিন্তু নিজের প্রকৃত অবস্থাটি কিছুতে বুঝতে পারে না এবং বুঝতে চায় না, নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চিত করতে থাকে। অথচ সে প্রবঞ্চনা কেউ ধরিয়ে দিলেও তার

থেকে সে মুক্ত হ'তে পারে না। এরা অতিমাত্রায় আত্ম-সচেতন, আত্ম-সর্বস্ব। এদের মন আদৌ বহির্মুখী থাকে না, সম্পূর্ণরূপে অন্তর্মুখী (Introspective) হয়ে দাঁড়ায়, আর এদের ইন্দ্রিয়গুলোও সেই অনুযায়ী কাজ করে। ফলে যে চোখ বাইরের বস্তু দেখবার জন্য উদ্দিষ্ট, সে কেবল আপনার ভিতরের দিকেই উঁকি মারে, যে কান বাইরের শব্দ শুনবে, সে আপন হৃদস্পন্দনই শুনতে থাকে, আর যে পেটের ক্রিয়াগুলি আপনা অগোচরেই ঘটে যাওয়া উচিত, সেগুলি বিকৃত ও পীড়াদায়ক রূপ নিয়ে নিত্য গোচর হয়ে পড়তে থাকে। এই শেষোক্ত জিনিসটাই অনেকের পক্ষে দুরারোগ্য ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার মূর্তিতে অবশেষে আত্মপ্রকাশ করে। তখন কেবল মনে হয়, খাদ্য বুঝি হজম হচ্ছে না, দাস্ত বুঝি পরিষ্কার হচ্ছে না, পেটে বায়ু হচ্ছে, আম জমছে, হজমের যন্ত্রগুলো একেবারে বিকল হ'য়ে গেছে। একে বলে বায়ুরোগ এবং প্রকৃতই এটা একরকম বায়ুরোগ। এর বাস্তব অস্তিত্ব কোনোরূপ পরীক্ষার দ্বারাই ধরা যায় না।

হিস্‌টিরিয়া—এরও উৎপত্তি মনে, ভয় কিংবা কোনো আত্ম-নির্যাতন থেকে। কিন্তু এক্ষেত্রে মন হাইপোকন্‌ড্রিয়ার ন্যায় সামান্য কিছু একটা লক্ষণ থেকে মারাত্মক রোগের কল্পনা করে না, এখানে আগে আসে রোগের কল্পনা, তারপরে আসতে থাকে তার লক্ষণগুলি। এতে প্রায়ই প্রথমে কিছুকালের জন্য থেকে থেকে মূর্ছা হ'তে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে হয়তো দাঁত লেগে যায় ও নানাবিধ আক্ষেপ হ'তে থাকে। মূর্ছার অবস্থায় হয়তো দুই তিন দিন পর্যন্তও রোগী অনাহারে পড়ে থাকে, কিন্তু এ সম্পূর্ণ চৈতন্যলোপ নয়, কারণ অনেক আকস্মিক উপায়ে তৎক্ষণাৎ চেতনা ফিরিয়ে আনা যায়। এই মূর্ছার অবস্থা পার হ'য়ে গেলে কিংবা মূর্ছা না ঘটলেও অনেক সময় দেখা যায় যে, রোগী অকারণেই হঠাৎ কথা বলতে পারছে না, কিংবা কানে মোটে শুনতে পাচ্ছে না, কিংবা তার কোনো একটা অঙ্গ অবশ ও অকর্মণ্য হ'য়ে গেছে, হয়তো তার কোনো একটা জায়গা অসাড় হয়ে গেছে, কিংবা অনর্থক অত্যন্ত ব্যথা পাচ্ছে, হয়তো হাতটা বা পা'টা এমন বেঁকে গেছে যে, কিছুতেই সোজা করা যায় না। বলা বাহুল্য, এই সকল অদ্ভুত লক্ষণের কোনোটাই শারীরিক বিকৃতি হেতু ঘটে না এবং এর কোনো যুক্তিযুক্ত কারণও চিকিৎসাশাস্ত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং খবর নিলে জানা যায় যে, রোগীর পূর্ব জীবনের অভিজ্ঞতায় এর ইতিহাস প্রায়ই প্রচ্ছন্ন থাকে, যেমন ছেলেবেলায় যদি কারো স্বরভঙ্গ হয়ে থাকে, তবে হিস্‌টিরিয়াতে সেই স্বরভঙ্গটাই নতুন ক'রে দেখা দেয়। সাধারণত স্ত্রীলোকদের মধ্যেই এই রোগ হ'তে দেখা যায়। যাদের হিস্‌টিরিয়া হয়, তাদের বুদ্ধিবৃত্তি খুব উঁচুস্তরের নয়, কোনো এক দুশ্চিন্তার নির্যাতনে তারা সহজেই অভিভূত হ'য়ে পড়ে। তাদের মানসিক কেন্দ্রে দ্বন্দ্ব ঘটতে ঘটতে স্বাভাবিক কার্যকারণযুক্ত ক্রিয়াপরম্পরার ক্ষেত্রে এমন একটা বিঘ্ন উপস্থিত হয় যে, সচেতন মনের মহলটি সম্পূর্ণ বা কতক অংশ তখন হঠাৎ একেবারে অর্গলবদ্ধ হয়ে যায়। তখন তারা নানাপ্রকার রোগের অভিনয় করতে থাকে আর আপনাপন ধরণে রোগের লক্ষণসমূহ প্রকাশ করতে থাকে। সেইজন্য কখনো বা তারা দেখায় ভূতে পাওয়ার মতো লক্ষণ, কখনো বা ধনুষ্টংকারের মতো লক্ষণ। রোগের অভিনয়ের মতো চমৎকার অভিনয় আর কিছুই নেই; দেখলেই মনে হয় একটা কঠিন রোগ হয়েছে এবং তাতে সকলের সহানুভূতিও আকর্ষণ করে, কিন্তু এই অভিনয় তারা ইচ্ছাপূর্বক সচেতনভাবে কখনই করে না। সচেতন মন তখন অবরুদ্ধ, অচেতন মনই কেবল ক্রিয়া করতে থাকে এবং তাদের চেতন মন সে খবর কিছুই জানে না। এই রোগাভিনয়ের অবস্থা যত সহজে ঘটে, তত সহজেই আবার একে আরোগ্য করাও সম্ভব হয়। ভূতে পাওয়া ও নজর-লাগা প্রভৃতি ব্যাপার এই পর্যায়েই পড়ে, নামজাদা ওঝার মন্ত্র ও মাদুলি প্রভৃতির দ্বারা বিশ্বাস জন্মাতে পারলে এই রোগ অতি আশ্চর্যরকমে আরোগ্য হ'য়ে যায়। তার কারণ মনের দ্বারাই যে রোগের উৎপত্তি, মনকে বশীভূত করতে পারলেই তা তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হ'য়ে যায়।

সাইকাস্‌থিনিয়া—সাইকি অর্থে মন। নিউরাস্‌থিনিয়া কথাটির অর্থ যেমন নার্ভের দুর্বলতা, সাইকাস্‌থিনিয়া কথাটির অর্থ তেমনি মনের দুর্বলতা। অর্থাৎ এস্থলে রোগের লক্ষণ রোগীর শরীরে বা





আচরণে প্রকাশ পায় না, যা কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটে তার মনে এবং রোগী নিজেও তা জানে। অস্বাভাবিকরূপে যত অদ্ভুত রকমের ভয় বা সন্দেহ বা বিতৃষ্ণা বা বাসনার দ্বারা তার মনটি সর্বদা আবিষ্ট (obsession) হ'য়ে সেই দিকেই অনন্যচিন্ত হ'য়ে থাকে। এই অবস্থাতে কেউ বা ঘর থেকে বাইরে বেরোতে ভয় পায় (claustrophobia), কেউ বা বন্ধ ঘরের মধ্যে ঢুকতে ভয় পায়, কেউ বা শুচিবাইগ্রস্ত হয় (mysophobia), কেউ বা সন্দেহবাইগ্রস্ত হয়, কারও বা চুরি করার বাই হয়, কারও বা অনবরত সংখ্যা গণনার বাই হয়, কারও বা আগুন লাগাইবার বাই হয়। এইগুলিকে বলে মেনিয়া (mania) এবং এ যে কত প্রকারের হ'তে পারে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

আমরা যে এত মনোবিকারের কথা উল্লেখ করলাম, সেগুলি যে ঐরূপ স্বাতন্ত্র্য নিয়েই সকল সময়ে দেখা দেয় তা নয়, একটির লক্ষণের সঙ্গে অপরটির লক্ষণ মিশ্রিত হয়েও থাকতে পারে, যেমন হিস্টিরিয়ার সঙ্গে হাইপোকন্ড্রিয়াও থাকতে পারে, আবার নিউরাসথিনিয়ার সঙ্গে সাইকাস্থিনিয়াও থাকতে পারে। এ ছাড়া রোগগুলি যে চিরকালের জন্য স্থায়ী হয়ে থাকে তাও নয়, অনেকের মধ্যে সাময়িকভাবে দেখা দেয় এবং সময় বিশেষে আরোগ্যও হ'য়ে যায়। সাধারণ সময়ে যারা সুস্থ মনে থাকে এবং যাদের মনের জোর আছে বলে ধরে নেওয়া যায়, প্রতিকূল অবস্থায় পড়লে তাদের মধ্যেও এই সকল রোগের কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায়। সুতরাং সকলের পক্ষেই মনকে সুস্থ রাখবার জন্য সচেষ্ট হওয়া দরকার এবং এই সব অসুস্থতা থেকে যথাসম্ভব মুক্ত থাকা দরকার।

এর জন্য তিনটি জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন প্রথমত, আপন শরীরটিকে সুস্থ রাখা। অসুস্থ শরীরে মনোবিকারগুলি যত সহজে আসতে পারে, সুস্থ শরীরে তা পারে না। দ্বিতীয়ত,—বাঁধা নিয়মে সুশৃঙ্খল জীবন-যাপন করা, অর্থাৎ কাজের সময়টিতে কাজ ও বিশ্রামের সময়টিতে বিশ্রাম করা। নিয়ম অনুযায়ী চলতে থাকলে মন সহজে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠে না, তার একটা স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকে। তৃতীয়ত,—সকল অবস্থাতেই শান্ত ও সংযতমনা হ'তে অভ্যাস করা। বাল্য ও কৈশোরকাল থেকেই এই অভ্যাসটি করাতে হয়, শিক্ষা দিতে হয় যে, কিছুতেই বিব্রতবোধ করবে না। আর আমরাও সেই শিক্ষা নিতে পারি, অর্থাৎ ছেলেদের যেমনভাবে শিক্ষা দিতে হয়, আমরা নিজেরাও আমাদের মনকে তেমনিভাবে শিক্ষা দিতে পারি। আসলে নিজের মনের দ্বারাই মনকে সুস্থ রাখা যায়। এর জন্য আত্মবোধের একটা অভ্যাস থাকা প্রয়োজন, যাতে সময় বিশেষে নিজের ভিতরের দিকে চেয়ে দেখা সম্ভব হয় এবং রাগলে বোঝা যায় যে, আমি রেগেছি, ভয় পেলে বোঝা যায় যে, আমি ভয় পেয়েছি। আত্মবোধ থাকলেই আত্মসংযম সম্ভব হয়।

যদি কোনো কারণে মন বিপর্যস্ত বা বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে এবং মানসিক শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা দেখা যায়, তাহ'লে তাকে সংবৃত করবার চেষ্টার দ্বারা আরো ক্লিষ্ট না ক'রে কিছুক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়াই উচিত। মানসিক বিশ্রাম মানে নিদ্রা, তা ছাড়া আর কিছুতেই তার বিশ্রাম ঘটতে পারে না। যখন মনের কল বিগড় যায় তখন তাকে মসৃণ ক'রে নেবার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট তেল হচ্ছে ঘুম। ঘুম আছে বলেই আমরা শত সহস্র ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও প্রকৃতিস্থ আছি, নইলে আমরা সকলেই পাগল হ'য়ে যেতাম। ঘুমই সকল রকম মনের রোগের ওষুধ; এতে অনেক উন্মাদ রোগও আরোগ্য হ'য়ে যায়। অতএব যখন দেখা যায় যে, মন বিশৃঙ্খল হ'য়ে উঠেছে কিংবা সীমা অতিক্রম করবার উপক্রম হচ্ছে, তখন ঘুমের ব্যবস্থাই সকলের চেয়ে সমীচীন। তখন অভ্যাসেরও অতিরিক্ত সময় ঘুমোতে হবে, দিনরাত্রি ঘুমিয়ে কাটালেও কোনো ক্ষতি নেই। যদি সহজে ঘুম না আসে তবে সাময়িকভাবে ওষুধের সাহায্য নিতেও দোষ নেই।

স্থায়ী রকমের মনোবিকারকেও আরোগ্য করা যায়। তার উপায় সাইকো-অ্যানালিসিস বা বিশেষজ্ঞ কর্তৃক মনোবিশ্লেষণ। এতে মনের ভিতরকার শিকড়গুলি সুদূর বাল্যকাল পর্যন্ত খুঁড়ে খুঁড়ে বেঁধে করা হয়, তখন যে সমস্ত বিষ অচেতনের গহ্বরে চাপা থেকে মারাত্মক হ'য়ে উঠেছিল, বাইরের হাওয়া লেগে তার বিষাক্ততা একেবারেই নষ্ট হ'য়ে যায়।

স্নানের কথা

শ্রীসত্যচরণ ঘোষ

মানুষের মনে স্নান করার প্রবৃত্তি যে কোন্ যুগে প্রথম জাগ্রত হয়েছিল, তা নিশ্চয় করে বলা যায় না।

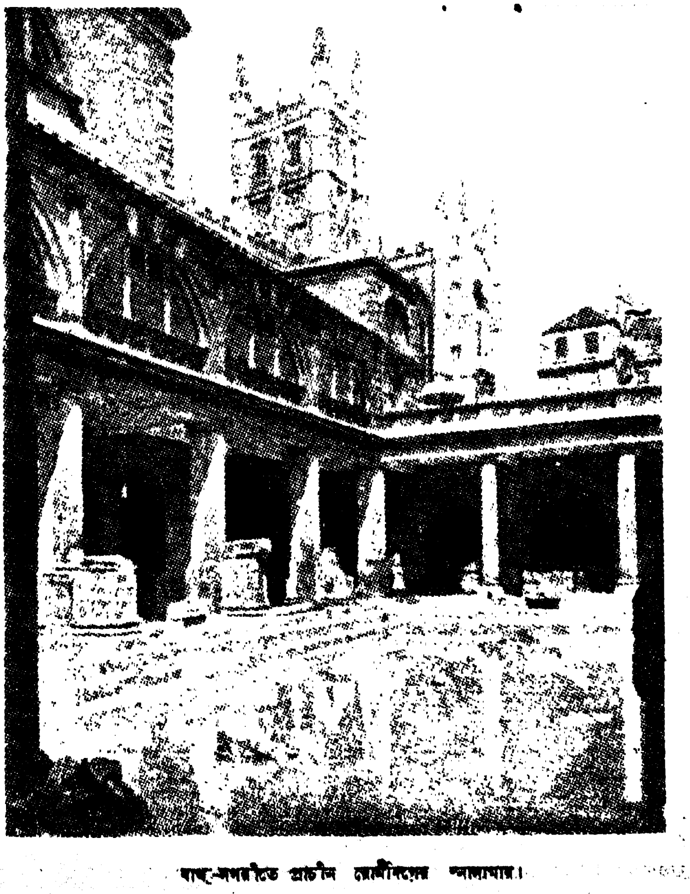
সুপ্রাচীনকালে, যখন একদিন গ্রীষ্ম-পীড়িত মানুষ তার দেহটাকে শীতল করতে চেয়েছিল, তখন সম্ভবত তার মনে হয়েছিল, যে জল সে পান করে তার শীতলতার কথা। শরীরের যে অংশ জলের সংস্পর্শে আসে, সে অংশেই বেশ শীতলতা অনুভব হয়। তাই সে ভেবেছিল, দেহটাকে যদি ঐ শীতল জলের মধ্যে ডুবিয়ে কিছুক্ষণ রাখা যায়, তা'হলে সে প্রচণ্ড গ্রীষ্মে আরাম পেতে পারে। পরীক্ষার জন্যে সে নেমে পড়লো জলের মধ্যে—তারপর সে আবিষ্কার করলে জলে স্নান বড় স্নিগ্ধ ও আরাম-দায়ক। স্নানের ইতিহাসের গোড়াকার কথা আমরা এরকমভাবে অনুমান করে নিতে পারি।

সুপ্রাচীনকালে পৃথিবীতে শীতপ্রধান অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতেই স্নানের প্রচলন প্রথম হয়েছিলো, এটা মনে করা চলে। তারপরে স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য স্নানের উপযোগিতা লক্ষ্য করেই হয়তো শীতপ্রধান দেশগুলিতেও স্নানের প্রচলন হয়েছিল। প্রাচীন যুগের মানুষ স্নানকে নিত্যকৃত্যের তালিকায় যে স্থান দিয়েছিল, বিংশশতাব্দীর সভ্যতাপ্রাপ্ত মানুষ তা ক্ষুণ্ণ করেনি এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষের স্বাস্থ্য-রক্ষা ও রোগ-নিরাময়ের প্রয়োজনে স্নানের উপযোগিতা-বোধ ও অভ্যাস বেড়েই চলেছে।

প্রধানত ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু জীবন-ধারণের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হওয়ায় সভ্য মানুষের বড় বড় শহর অনুরূপ জলবায়ু-প্রধান অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলিতে, দক্ষিণ আমেরিকার চিলী অঞ্চলে, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে ঐরূপ জলবায়ু দেখা যায়। এই সমস্ত দেশের মধ্যে গ্রীস, রোম, মিশর পৃথিবীতে সভ্যতার আলো যে প্রথম জ্বেলেছিল তার পরিচয় ইতিহাসে আছে।

খৃস্টপূর্ব প্রায় দেড় হাজার বছর আগে যে স্নানের রীতি ছিল, তার প্রমাণ গ্রীস ও মিশরের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে। এই সমস্ত ধ্বংসাবশেষ উদ্ধারের সময় উন্নত-রুচির-পরিচায়ক বড় বড় স্নানাগার দেখতে পাওয়া যায় এবং সেগুলিকে বেশ যত্নের সহিত প্রাচীন সভ্যতার সাক্ষীস্বরূপ আজও রক্ষা করা হচ্ছে। ঐ সময়ে ভারতবর্ষেও যে প্রাচীন-কালে আধুনিক রুচিসম্মত স্নানাগারের প্রচলন ছিল তার প্রমাণ মহেন্-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষ অপসারণের সময় পাওয়া গেছে।

এর পর গ্রীস ও রোমান সাম্রাজ্য তদানীন্তন ইউরোপে যখন গৌরবের শিখরে উঠেছিলো, তখন জনসাধারণের জীবনধারণের পথে স্নানের প্রভাব এক বিরাট আকারে দেখা দিয়েছিলো। রোমানরা দেশের প্রধান প্রধান স্থানে সাধারণের জন্য বড় বড় স্নানাগার স্থাপিত করেছিল। এগুলি শুধু স্নানের জন্যই ব্যবহার হ'ত না, এগুলি ছিল আবার সাধারণের পরস্পরের সঙ্গে দেখা করার স্থান। লোকেরা এখানে এসে জড়ো হ'তো, গল্পগুজব করতো, হাটবাজারের সংবাদ আলোচনা করতো, আবার ব্যবসাও করতো। এই সব স্নানাগারে বিভিন্ন কাজে রত লোকদের আনন্দ দেবার জন্যে গান বাজনার ব্যবস্থাও ছিল। জনসাধারণের কাছে দেশের কথা, বিদেশের কথা, সাহিত্যের কথা, বিজ্ঞানের কথা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দেবারও সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আমাদের বিংশশতাব্দীর ভারতবর্ষে জনসাধারণের কাছে এই ধরণের লোকশিক্ষার বন্দোবস্ত তো নাই-ই বরং স্নানের ঘাটগুলিতে আরাম করে স্নানের ব্যবস্থাও নেই। পল্লীগ্রামের তো কথাই নেই—পানায় ডুবে আছে পুকুর, অনাহারে মরে আছে প্রাণ—অজ্ঞতার অন্ধকারে, দুর্গন্ধময় পঙ্কিল আওতার মাঝখানে পড়ে লোকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছে।



বাথ-নগরীতে প্রাচীন রোমানদের স্নানাগার।

রোমানদের ঐসব স্নানাগারগুলির ভেতর দিয়ে সাধারণ শিক্ষার কাজকর্ম হত না। তাদের এই স্নানাগারগুলি বর্তমান তুরস্ক ও রোমান স্নানাগারের মতো ছিল। এই সমস্ত স্নানাগারে জল প্রবেশের ও জল নিষ্কাসনের পথগুলি আশ্চর্যজনক আধুনিক ছিল।

অবগাহন স্নানের উপকারিতা এবং স্বাস্থ্যের উপর তার প্রভাব রোমানরা বিশেষভাবেই বুঝতে পেরেছিল এবং সেই কারণেই তাদের অধিকৃত অঞ্চল গ্রেট ব্রিটেনে স্নানের প্রচলন ব্যাপকভাবে হয়েছিল।

ব্রিটেনে রোমান অধিকারের পূর্বে স্নানের প্রচলন মোটেই ছিল না। এমনকি টিউডরের সময় থেকে অলিভার ক্রমওয়েল পর্যন্ত জলে স্নান করার কোন নজিরই নেই—তবে ঐ সময়ে বড় বড় ঘরের মহিলারা নিজেদের সৌন্দর্য রক্ষার জন্যে মদে স্নান করতেন এবং তাঁদের মেয়েরা দুধে স্নান করতেন এমন কথা জানা যায়। এ ছাড়া স্নান করার আর কোন নজির পাওয়া যায় না।

রোমানরাই ব্রিটেনে স্নানের প্রথম প্রচলন করে। ইংলণ্ডে ব্রিস্টলের কাছে সোমারসেটের অন্তর্গত বাথ প্রদেশে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে জলধারা অবিরাম গতিতে নির্গত হয়ে আসছে। দু'হাজার বছর আগেও এই প্রস্রবণের অস্তিত্ব ছিল। এই প্রস্রবণের জল এত গরম যে কিছুক্ষণ ধরে ঠাণ্ডা না করলে তা গায়ে ঢালা যায় না। এই গরম জলের হাওয়া খেয়ে রোগ সারাবার জন্যে ব্রিটেনের নানাস্থান থেকে অধিবাসীরা আসত। এই প্রস্রবণটির নাম হ'চ্ছে বাথ। নানাপ্রকার ধাতু মিশ্রিত এই উষ্ণ প্রস্রবণের জলের মূল্য রোমানরা বুঝেছিল এবং ঐ উষ্ণ প্রস্রবণের ধারে তারা এক বিরাট স্নানাগার প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই স্নানাগারের নাম দিয়েছিল 'রোমান-বাথ'। স্নানের জন্যে প্রসিদ্ধি লাভ করার ফলেই সম্ভবত এই স্থানটির নাম হয়েছিল 'বাথ'। ব্রিটেনে রোমান শাসন শেষ হ'বার পর স্নান করার প্রথাটা প্রায় বন্ধ হয়েছিল—কারণ সাধারণে জলে স্নান করাটাকে ঠিক ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু রোমান বাথটি আজ পর্যন্ত প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ বর্তমান আছে।

এর পর প্রায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রাণী এলিজাবেথের সময়ে গরীব অধিবাসীদের চিকিৎসা করবার জন্য রোম নির্মিত স্নানাগারের পার্শ্বে একটি হাসপাতাল খোলা হয়েছিল। 'তা' এখনও দেখতে পাওয়া যায়। তারপর সন্তান না হওয়ায় দ্বিতীয় জেমস সন্তান কামনায় তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী মেরী অফ মোদেনাকে বহুদিন বাথের আবাসে রেখেছিলেন এবং তার ফলে সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী তাঁর পুত্রের জন্ম হয়। তৃতীয় জর্জ এবং চতুর্থ জর্জের সময়ে বাথ নগরীর অশেষ উন্নতিসাধন হয়েছিল। বাথের ঐ উষ্ণ প্রস্রবণটির জলের তাপ ১০৪° থেকে ১২০° ফারেনহিট। বহু পরিমাণ ক্যালসিয়াম, নাইট্রোজেন গ্যাস, কার্বোনিক এ্যাসিড গ্যাস এবং সামান্য রেডিয়াম ও অন্যান্য ধাতুর সংমিশ্রণই বাথের জলকে অমর করে রেখেছে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশে সীতাকুণ্ডের উষ্ণ প্রস্রবণ এবং যমুনা নদীর উৎপত্তি স্থানের নিকটে উষ্ণ কুণ্ড উল্লেখযোগ্য। এই কুণ্ড দুটির জলেও অনুরূপ পরিমাণ



'স্পা'-চিকিৎসা। শোয়ান অবস্থায় জলের ভিতর রোগীকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

রাসায়নিক দ্রব্য বর্তমান আছে—কিন্তু বহুদূরে অবস্থিতি হেতু বাথ শহরের ন্যায় এ জলের উপকার আমাদের দেশের খুব কম লোকেই পায়।

এ রকম করেই ইংলণ্ডের শীতপ্রধান স্থানে উষ্ণ জলে স্নানের কথা ধীরে ধীরে দেশের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তারপর এলো জগতের মহাপরিবর্তনের দিন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে Industrial Revolution-এর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রাচীন রুচির সম্পূর্ণরূপ পরিবর্তন হয়ে গেলো, শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য বর্ধনের আকাঙ্ক্ষাও মানুষের মনে ক্রমশ তীব্রতর হতে লাগল। কাজেই অন্তত এই উদ্দেশ্যেও স্নানের প্রয়োজন বেশী করেই অনুভূত হল। কিন্তু গৃহস্থের বাড়িতে স্নানঘর না থাকায় ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে সাধারণ স্নানাগার খোলা হল এবং এগুলি এক কেন্দ্রীয় অফিস কর্তৃক পরিচালিত হতে লাগল। তারপর খেলাধুলার প্রচলন যখন বেশী করে সামাজিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করল, তখন গায়ের ময়লা পরিষ্কার করবার জন্যে ঝরণা ও পুকুরে স্নানের রীতি আরম্ভ হল। ক্রমে সাঁতারও যখন খেলাধুলোর মধ্যে বিশেষ স্থান পেলো তখন স্নানের প্রচলন প্রকারান্তরে আরো বেড়ে গেল। একদিন যে দেশে স্নানের কথা শুনলে লোকে চমকে উঠতো, সে দেশে এখন ঘরে ঘরে স্নানের ব্যবস্থা হয়েছে, রুচিসম্পন্ন ভাল ভাল স্নানের ঘরও গড়ে উঠেছে।

স্বাস্থ্যের উপর স্নানের প্রভাব খুবই বেশী। বিজ্ঞানের দিক দিয়ে এবং আরোগ্যকর উপায় হিসাবে স্নানের মূল্যও কম নয়। ত্বকের কার্যপ্রণালীর উন্নতিসাধনে স্নানের উপযোগিতা খুব বেশী। শরীরের সমস্ত অংশে তাপ বণ্টনের এবং শরীর থেকে জলীয় পদার্থ বাষ্পাকারে বার করে দেবার ভার থাকে ত্বকের স্নায়ুগুলির ওপর। স্নানের ফলে স্নায়ুগুলির ওপর ক্রিয়া হয় এবং তদ্দ্বারা শরীরের তাপের পরিবর্তন সাধিত হয়। শরীরের দূষিত আবর্জনা নিষ্কাসনে ত্বকের সাহায্য খুব বেশী দরকার হয়। গ্রীষ্মকালে শরীরে যে ঘাম দেখা যায়, সেই ঘামের সঙ্গেই শরীরের দূষিত আবর্জনা বহু পরিমাণে বেরিয়ে যায়। স্নানের ফলে ত্বকের এই কাজটি বেড়ে যায়—বিশেষত গরম জলে স্নান করলে দেহ থেকে দূষিত পদার্থ আরও বেশী পরিমাণে নির্গত হয়।

ইংলণ্ডে যখন স্নানের প্রচলন ছিল না, তখন নানাপ্রকার ব্যাধিতে দেশটা পূর্ণ ছিল। কিন্তু রীতিমত স্নানের প্রচলন হওয়ার পর রোগের প্রকোপ ধীরে ধীরে কমে যায়। শরীরের উপর স্নানের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে চিকিৎসকগণ একে চিকিৎসাক্ষেত্রে বিশেষ স্থান দিয়েছেন। মানুষের এমন কতকগুলি ব্যাধি আছে, যেগুলিকে আরোগ্য করবার জন্য চিকিৎসকেরা শীতল কিম্বা উষ্ণ জলে স্নানের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। পৃথিবীতে যতগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে প্রায় সবগুলির জলই স্নানের জন্য ব্যবহৃত হয়, অবশ্য জলের উষ্ণতাকে রোগী হিসাবে কমান বা বাড়ানো হয়ে থাকে। রোগ-নিরাময়ের ক্ষমতার জন্যই হয়তো আমাদের দেশের সীতাকুণ্ড তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে।

সাধারণভাবে কিংবা বৈজ্ঞানিকভাবে শরীরের পূর্ণ স্নান বা আংশিক স্নানের যে সব প্রণালী আছে ডাক্তার ব্রানটন নিম্নলিখিত ভাবে তার শ্রেণীবিভাগ করেছেন:—

(ক) জলস্নান (খ) ঔষধ-দিগ্ধ স্নান (গ) বাষ্প-স্নান ও (ঘ) বায়ুস্নান।

(ক) জলস্নান

জলস্নান দুই রকমের—স্বাভাবিক জলে স্নান ও ঔষধ-দিগ্ধ জলে স্নান। স্বাভাবিক জলকে আবার গরম করে স্নান করা হয়। ইহা অনেক রকমের হয়, যেমন—

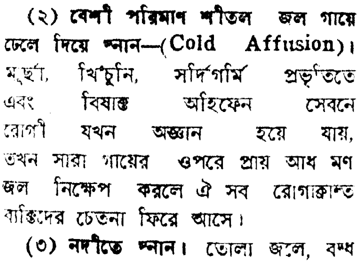
(১) অবগাহন স্নান। অবগাহন স্নান

আমাদের দেশে সাধারণ স্নানই। এর উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ বলার কিছু নেই। তবে এরূপ স্নানের পর গায়ের চামড়া বেশ নরম হয় আর দেহ থেকে একটা নির্মল আভার প্রকাশ হয়। শীতল জলে অবগাহন স্নানের আজকাল একটু পরিবর্তন হয়েছে। স্বাস্থ্যবান লোক যাঁর শরীরের রক্ত সঞ্চালন খুব ভাল তাঁর পক্ষে এরূপ স্নান অতি সুন্দর— ন' বছর বয়স থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত শীতল জলে স্নান করা যেতে পারে, কিন্তু নিতান্ত শিশু, বৃদ্ধ ও যাদের স্বাস্থ্য খুব দুর্বল তাদের পক্ষে এরূপ স্নান বিপজ্জনক। যাদের রক্তের চাপ বেশী তাদেরও এরূপ স্নান করা উচিত নয়। এই জলের উত্তাপ ৬০ ডিগ্রি ফারেনহাইট অর্থাৎ কলের জলের উত্তাপের মতন। গ্রীষ্মকালে এই তাপ ঠিকই থাকে; কিন্তু শীতকালে এই তাপাঙ্ক আরও কমে যায়। শীতল জলে অবগাহন স্নান করার ফলে শরীরের শক্তি বাড়ে এবং সর্দি কাশি, 'বসন্ত' প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে দেহের মধ্যে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে ওঠে। শরীরে যখন উত্তাপ বেশী থাকে তখনই এই স্নান করা উচিত—সুতরাং শয্যাত্যাগের পর প্রত্যহ অবগাহন স্নান করা যুক্তিসংগত।

(২) বেশী পরিমাণ শীতল জল গায়ে ঢেলে দিয়ে স্নান—(Cold Affusion)। মূর্ছা, খিঁচুনি, সর্দিগর্মি প্রভৃতিতে এবং বিষাক্ত অহিফেন সেবনে রোগী যখন অজ্ঞান হয়ে যায়, তখন সারা গায়ের ওপরে প্রায় আধ মণ জল নিক্ষেপ করলে ঐ সব রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের চেতনা ফিরে আসে।

(৩) নদীতে স্নান। তোলা জলে, বদ্ধ জলে বা পুকুরের শীতল জলে অবগাহন স্নান অপেক্ষা নদীতে স্নান করা খুব স্বাস্থ্যপ্রদ। নদীর জলে যদি খুব স্রোত থাকে এবং স্নানের সময় সাঁতার কাটা যায় তাহ'লে দেহের পেশীগুলি খুব দৃঢ় হয় ও শরীরে শক্তি সঞ্চয় হয়। এরূপ স্নানের ফলে হজম শক্তি বিশেষভাবে বাড়ে।

(৪) শীতল জলের ঝরণায় স্নান—(Cold Shower Bath)। ঝরণা স্নানের ব্যবস্থা প্রায় সৌখীন লোকের বাড়িতে



ভিচি ডুশ প্রণালীতে কৃত্রিম ঝরণায় স্নান।

দেখা যায়। কলের মুখে একটা ছোট বহু-ছিদ্রবিশিষ্ট 'চালুনি' লাগিয়ে দেওয়া হয় আর ঐ ছিদ্রগুলির ভেতর দিয়ে কলের জল বৃষ্টিধারার মতন পড়তে থাকে। এরূপ স্নান উন্মাদ, ফিট এবং সর্দিগর্মি রোগের পরম ঔষধ।

(৫) স্নানের 'টবে' উপবিষ্ট হয়ে স্নান করা—(Cold Sitz-Bath or Cold Hip Bath)। এরূপ স্নান শুধু শরীরের নিম্ন অংশকেই করান হয়। রোগীকে গামলার ভেতরে এমন করে বসান হয় যাতে রোগীর কটি পর্যন্ত জলে ডুবে থাকে। এ জলের উত্তাপ ৬০ ডিগ্রি থেকে ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট্ হয়ে থাকে। এর ফলে শীতল নিম্নাংশের শিরাগুলি ও অন্ত্র সঙ্কুচিত হয় এবং পরে প্রসারিত হয়, বিশেষত যখন অঙ্গমর্দন করা হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা, বাত, ফাইব্রাসিটিস (fibrasitis), মেদ রোগ (obesity) প্রভৃতি রোগে এ প্রকার স্নান খুব ফলপ্রদ।

(৬) শীতল পদ-স্নান—Cold foot bath)। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশে পদ-স্নান খুবই পরিচিত। আহারের পর পা দুটো ভাল করে ধোয়ার রীতি বাংলা দেশের জাতিগত অভ্যাস বললে অন্যায় হয় না।

অতিথি এলে তাকে পা ধোয়ার জল আগে দেবার রীতি এদেশের একটা সামাজিক নিয়ম। ইহা চরনযুগলকে শক্তিশালী করে তোলে—মাথাকে ঠাণ্ডা রাখে ও দেহের সমস্ত অংশকে সুস্থ করে। কিন্তু ঋতুকালে স্ত্রীলোকদিগের পদস্নান নিষিদ্ধ।

(৭) শীতল আর্দ্র কাপড় দিয়ে আবৃত স্নান—(Cold Wet Sheet Pack)। এই স্নানে রোগীর বিছানার ওপর দুখানি কম্বল বিছানো হয়—বালিসটিকেও যত্নপূর্বক ঢেকে রাখা হয়—তারপর একখানি পরিষ্কার বিছানার চাদরকে বেশ করে ভিজিয়ে ঐ কম্বল দুটির ওপর ছড়িয়ে পাতা হয়। পরে উলঙ্গ অবস্থায় রোগীকে উহার উপর চীৎ করিয়া শুইয়ে ভিজা কম্বল ও চাদরটি দিয়ে বেশ শক্ত করে রোগীকে ঢেকে ফেলা হয়। রোগীর পা'দুটিকেও বেশ করে ঢেকে রাখা হয় এবং আরও দু'তিনখানা কম্বল দিয়ে মোড়া হয়—শুধু রোগীর মুখটা খোলা থাকে। কিছুক্ষণ শীত করে, তারপরে রোগীর গা থেকে খুব ঘাম বেরোয়, আর এর ফলে রোগীর দেহের উত্তাপ কমে আসে, ভুল বকা ও ক্রোধশীলতা অনেক কমে যায়। প্রায় আধ ঘণ্টা থেকে ১ ঘণ্টা পরে রোগীর গা থেকে সমস্ত ঢাকা খুলে ফেলে তার গা' শুকনো তোয়ালে দিয়ে বেশ করে মুছে দেওয়া হয়। ঠাণ্ডা জলের পরিবর্তে ঈষদুষ্ণ বা উষ্ণ জল ব্যবহার করা যেতে পারে। স্কারলেট ফিবার, হাম, বসন্ত প্রভৃতি পীড়ায় এই স্নানের ব্যবস্থা করা হয়। উত্তেজনায়, উন্মাদনায় এবং অনিদ্রায় এরূপ স্নানে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

(৮) শীতল ডুস স্নান—এই স্নানে জলধারাকে শরীরের যে কোন অংশে বেগে নিক্ষেপ করা হয়। অনেক সময়ে পেট কামড়ালে, পেটে ভার ভার বোধ হলে নাভিদেশে কলের জলের ধারা জোরে পড়লে বেশ আরাম হয়। মদ খেয়ে মস্তিষ্কের বিকার হ'লে, আফিং সেবনে সংজ্ঞাহীন হ'লে মাথায় এই জলধারা দিলে উপকার হয়।

প্লীহা, যকৃৎ খুব বাড়লে, শরীরের কোন গ্রন্থি শক্ত হ'লে বা ফুললে, অর্শরোগে, শ্বেতপ্রদর এবং কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু গুহ্যপ্রদেশে রক্তস্রাবে এরূপ জলের ধারায় আক্রান্ত অংশকে স্নান করালে রোগের উপশম হয়।

(৯) শীতল জলে স্নান এবং স্পঞ্জ স্নান—(Cold Bath and Cold Sponging)। জ্বর অবস্থায় এই প্রকার স্নানের রীতি আছে। জ্বর যখন অসম্ভব বেড়ে যায়, তখন রোগীকে এরূপ স্নান করালে জ্বর দ্রুত কমে যায়। কিন্তু ডাক্তার কিম্বা শিক্ষিত নার্স না থাকলে এই স্নান করানো বিপজ্জনক। এরূপ স্নানের সময় রোগীর গায়ের উত্তাপ ও নাড়ীর গতি খুব সাবধানে লক্ষ্য করতে হয়—কারণ উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন না করলে রোগীর প্রাণ বাঁচানো দুষ্কর হয়। রোগীকে চারজন লোকের দ্বারা ধরাধরি করে স্নানে বসাতে হয়। স্নানের জলের প্রথম উষ্ণতা হবে রোগীর দেহের উষ্ণতা অপেক্ষা কিছু কম—তারপর ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে জলের উষ্ণতাকে ৮০ ফারেনহাইটে কমিয়ে আনতে হয় এবং কোনক্রমে এর কম যেন না হয়। এরূপ স্নানে বসাবার পূর্বে রোগীকে উত্তেজক ওষুধ খাওয়ানো উচিত।

শরীরের পৃথক পৃথক অংশকে ~~ভিজে~~ গরম কাপড় দিয়ে আলাদা করে পুঁছে দেওয়াকে স্পঞ্জস্নান বলে। যে কোন রোগে শরীরে উত্তাপ খুব বেড়ে গেলে অর্থাৎ ১০৩·৪ ফারেনহাইটের উপর উঠলে এই স্নানে জ্বরের তীব্রতা কমে আসে। এই আংশিক স্নানের বিশেষত্ব এই যে, যে স্থানে স্পঞ্জ করা হবে শুধু সেই স্থানটি খোলা আর বাকি স্থানটি সম্পূর্ণ আবৃত থাকবে।

(১০) ঈষদুষ্ণ জলে স্নান—(Tepid Bath)। সাধারণ ব্যবহার ছাড়া শরীরের রক্তচাপ বাড়াবার জন্য এবং স্নায়ুমণ্ডলীকে যথাযথ রাখার জন্যে এই স্নানের প্রয়োজন হয়। উন্মাদ রোগ ও প্রবল উত্তেজনায় এই স্নান বিশেষ ফলপ্রদ। এই জলের উষ্ণতা হয় মানুষের দেহের উত্তাপের সমান অর্থাৎ ৯৮·৪ ফারেনহাইট।

(১১) উষ্ণ স্নান—এর তাপ ৯৮·৪ ফারেনহাইট থেকে ১১০· ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়।

১১৫ ফারেনহিট উত্তাপের জল হাতে সহ্য করা যায় কিন্তু দেহে সহ্য হয় না। উষ্ণ স্নানের দেহের ওপর প্রতিক্রিয়া খুব দ্রুত হয় এবং দ্রুত ঘাম নির্গত হয়। উষ্ণ জলে অনেকক্ষণ গা ডুবিয়ে রাখলে হৃদয় দুর্বল হয়—সেইজন্য যাদের হৃদরোগ আছে, তাদের উষ্ণজলে স্নান করা একেবারে নিষিদ্ধ। ব্যায়াম করার পর দেহের পেশী-



স্পা'-চিকিৎসা। বসা অবস্থায় রোগীকে জলের মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

গুলিকে নরম করবার জন্যে ও শীতের কাঁপুনি থেকে রেহাই পাবার জন্যে ১০৪° ফারেনহিট্ উত্তাপের জলে ১০ থেকে ১৫ মিনিট পর্যন্ত স্নান করার পরই সঙ্গে সঙ্গে শীতল জলে স্নান করে স্নান শেষ করলে সুফল হয়। ঠাণ্ডা কিম্বা উষ্ণ জলে অধিকক্ষণ থাকা ক্ষতিকর—কিন্তু ঈষদুষ্ণ জলে অধিকক্ষণ থাকিলে স্বাস্থ্যহানিকর ভয় থাকে না।

(১২) **উষ্ণ পদ-স্নান—**(Hot Foot Bath) শ্লেষ্মা, মাথায় সর্দি বসার দরুণ মাথার যন্ত্রণা ও জ্বর জ্বর ভাব, নাসিকা থেকে রক্তস্রাব, শিশুদের তড়কায় এই স্নান অত্যন্ত ফলপ্রদ। ঠাণ্ডা লেগে স্ত্রীলোকের ঋতু বন্ধ হলে এরূপ স্নান করলে ঋতু বন্ধ দূর হয়।

(১৩) **উষ্ণ জলের গামলায় উপবিষ্ট অবস্থায় শরীরের নিম্নাংশের স্নান—**(Hot Sitz Bath)। শীতল জলে এরূপ স্নানের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু ঐরূপ উষ্ণ জলে স্নান করলে মূত্রকৃচ্ছ্র, বাধক, ঠাণ্ডাহেতু হঠাৎ ঋতু বন্ধ, মূত্রাশয়ের রোগ প্রভৃতিতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

(১৪) **উষ্ণ জলের স্পঞ্জ**—মাথা ধরায়, ঘাড় ও কপালের যন্ত্রণায় এরূপ স্পঞ্জ আরামদায়ক। ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং শ্লেষ্মায় উষ্ণ স্পঞ্জ ব্যবহারে উপকার হয়।

(১৫) **উষ্ণ ডুশ স্নান** (Hot Douche), এর দ্বারা শরীরের বাইরের সমস্ত অংশ কিংবা পৃথক পৃথক অংশ এবং শরীরের আভ্যন্তরীণ অংশে প্রবেশের পথগুলি, যথা—কর্ণ, নাসিকা জননেন্দ্রিয় এবং গুহ্য-দ্বার দিয়ে শরীর মধ্যস্থ স্থানগুলিকে বিধৌত করা হয়। ভিচি এবং 'এ' শহরে উষ্ণ প্রস্রবণের জল তথাকার স্নানাগারে ঝরণা ধারায় নিক্ষেপ পূর্বক রোগীকে স্নান করান হয়, এরূপ ধারা-স্নানকে বলা হয় ভিচি ডুশ এবং 'এ' ডুশ। ভিচি এবং 'এ' দুটি খনিজ জল প্রস্রবণ। এই উষ্ণ প্রস্রবণের নাম অনুযায়ী এরূপ ডুশের নাম হয়েছে—ভিচি এবং 'এ' ডুশ।

বহুদিনের পুরাতন গ্রন্থি এবং পেশী রোগে ও গা থেকে ঘাম বার হবার জন্যে ভিচি ডুশ্ দিয়ে স্নান করানো হয়। এই স্নান করাবার সময় রোগীর গাকে মর্দন করানো হয় (চিত্রে দ্রষ্টব্য)। শরীরের ভেতরে ডুশ দিয়ে ভিতরের যন্ত্রগুলিকে পবিষ্কার এবং রোগজীবাণুশূন্য করা হয়। শরীরের মধ্যে, বিশেষত প্রসবের পর গর্ভাশয়ে, জরায়ু মধ্যে কিংবা যোনিপথের কোন অংশে যদি রক্ত জমাট হয়ে অসহ্য যন্ত্রণার সৃষ্টি করে, তখন ঐ সমস্ত স্থান সুস্থ করার জন্যে ডুশ দেওয়া হয়। মূত্রাশয়, পাকস্থলী এবং উদরও এই ডুশে ধৌত করা হয়, কিন্তু এ কাজ খুব অভিজ্ঞ লোক ছাড়া হয় না। বৃহৎ অন্ত্রের প্রদাহে এরূপ ডুশের প্রয়োগ খুব উপকারক। এ ডুশের জলের উত্তাপ ১০০° ফারেনহিট হওয়াই উচিত—ঈষদুষ্ণ জলে ডুশ দিলে শরীর মধ্যে ডুশের জল যেখানে লাগে সেখানে কম্পন হয়, তাতে ভাল ছাড়া মন্দই হয়। একারণ শীতল কিম্বা ঈষদুষ্ণ জলে এ ডুশ দেওয়াও নিষিদ্ধ। গর্ভ পরিস্রবের পর অত্যধিক মাত্রায় রক্তস্রাব হলে এ ডুশে খুব ভাল কাজ হয়।

(ঘ) ঔষধদিগ্ধ জলে স্নান

জলের সঙ্গে ভেষজ মিশিয়ে রোগ নিরাময়ের জন্যে যে স্নানের ব্যবস্থা দেওয়া হয়, তাহাকে ঔষধদিগ্ধ স্নান বলা হয়। এ স্নানেরও যে প্রকার ভেদ আছে, তার বিবরণ নীচে দেওয়া হল ঃ

(১) **সমুদ্র স্নান—**(Sea Bath) সমুদ্র স্নানের সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত আছি। সমুদ্রের জল লোনা এবং লোনা জলে স্নান করলে ত্বকের স্বাভাবিক কাজের উন্নতি হয়। আহারের পর স্নান করা উচিত নয়—বেলা ১১টায় কিংবা বেলা ৩টায় সম্পূর্ণ রোদের সময় সমুদ্রে স্নানের প্রশস্ত সময়। এ স্নান যাবতীয় চর্ম রোগের পরম ঔষধ। গর্ভাবস্থায় সমুদ্র স্নান যদিও ক্ষতিকর নয়, তথাপি এ অবস্থায় স্নান করা উচিত নয়। ঋতুর সময় স্নান করলে কোন ক্ষতি হয় না।

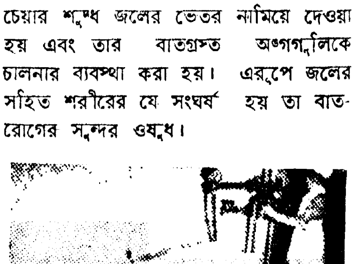
সোরাইসিস্ (Psoriasis) রোগে সমুদ্র স্নানের বিধি খুব ভাল। কিন্তু সামান্য জ্বালার উদ্রেক হলে জল থেকে উঠে পড়া উচিত।

(২) **লবণাক্ত জলে স্নান** (Brine Bath)। খাবার লবণ কিংবা সামুদ্রিক নুন প্রায় সাড়ে চার সের জলের সঙ্গে গুলে এই স্নান করা হয়। এরূপ স্নান পৃথিবীর নানাপ্রকার খনিজ জলেও হয়ে থাকে এবং এই সব খনিজ জলে লবণের সহিত ব্রোমাইন এবং আইওডিন মিশানো থাকে। এরূপ জলে স্নান করলে দুর্বলতা, পুরানো বাত ও গ্রন্থিস্ফীতি রোগের উপশম হয়। দুর্বল শিশুদের এ প্রকার জলে স্নান করানো উপকারক।

(৩) **কার্বোনিক এ্যাসিড স্নান** (Carbonic Acid Bath)। জলের সঙ্গে সোডিয়াম্ ক্লোরাইড, ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড ও কার্বনিক এ্যাসিড গ্যাস (মুক্ত) পরিমাণ মত মিশিয়ে স্নানের ব্যবস্থা করা হয়। হৃদরোগে এ স্নান ফলপ্রদ হয়।

(৪) **এ্যালক্যালাইন স্নান** (Alkaline Bath)। কাপড় কাচা সোডা চার আউন্স জলের সঙ্গে মিশিয়ে স্নানের জল তৈরী করা হয়। গরহজম, গেঁটে বাতের পক্ষে উপকারী। চর্মরোগেও এ স্নানের বিধি দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সোডার ভাগ ৫ থেকে ১০ আউন্স পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়ে কিম্বা আধ পাউণ্ড নরম সাবান গুলে জলকে আরও কড়া করে তুলতে হয়। এ স্নান প্রায় ২০ মিনিট ধরে করা চলে।

(৫) **খনিজ জলে স্নান** (Mineral water Bath) এ স্থানের কথা আগেই বলা হয়েছে। এরূপ উষ্ণ জলে রোগীকে দোলান হয় নামিয়ে দিয়ে। রোগীর মুখ ছাড়া সমত অঙ্গের ওপর জলের মর্দন হয়—এরূপ স্নান যন্ত্রণানিবারক, বিশেষত যে সমস্ত বেদনা সাধারণভাবে মর্দনে উপশম হয় না। আবার অনেক সময়ে বাতে অসহায় পঙ্গু রোগীকে চেয়ারে বসিয়ে চেয়ার শুদ্ধ জলের ভেতর নামিয়ে দেওয়া হয় এবং তার বাতগ্রস্ত অঙ্গগুলিকে চালনার ব্যবস্থা করা হয়। এরূপে জলের সহিত শরীরের যে সংঘর্ষ হয় তা বাত-রোগের সুন্দর ঔষধ।



স্পা'-চিকিৎসা-প্রণালী অনুসারে টবের ভিতর রোগীকে শুইয়ে দিয়ে ফেন-স্নান। এতে বাত ও কুষ্ঠরোগ রোগ নিরাময় হয়।

খনিজ জলের সাহায্যে আর এক রকমের নূতন প্রকারের স্নান করানো হয় যাকে বলা হয় ফেন-স্নান (Foam Bath) এরূপ স্নান দ্বারাও বাতের উপশম হয়। এই ধাতুমিশ্রিত জলের মধ্য দিয়ে বায়ু চালনার দ্বারা ফেনার সৃষ্টি হয়। উষ্ণস্নান যারা সহ্য করতে পারে না, তাদের পক্ষে এরূপ স্নান উপকারক।

(গ) বাষ্প-স্নান

(১) জলীয় বাষ্পে স্নান (Water Vapour Bath)। এরূপ স্নানে রোগীকে শুধু মাথা বাদ দিয়ে বেশ করে ২।৩ খানা কম্বলে মুড়ে ফেলে একটা বেতের চেয়ারের ওপর বসান হয়। ঐ চেয়ারের তলায় একটি স্পিরিট ল্যাম্পের ওপর জল গরম করা হয়। এই জল থেকে উত্থিত জলীয় বাষ্প ঐ চেয়ারের ছিদ্রগুলি দিয়ে রোগীকে উত্তপ্ত করে। এ স্নানের উপকার প্রায় পূর্বে কথিত উষ্ণ স্নানের মতই। ব্রাইটস্ রোগে (Bright's disease) এ স্নানের উপযোগিতা খুব বেশী। এ স্নানের পর রোগীর যাতে শীত না করে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়। এরূপ স্থলে রোগীকে ১৫ থেকে ২০ মিনিট পর্যন্ত বাষ্পে স্নান করানোর পরই তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গরম কম্বলে চাপা দিতে হয়।

(২) **রুশ দেশীয় বাষ্পীয় স্নান** (Russian vapour Bath)। আর্দ্র বাষ্পে একটি ঘর পূর্ণ থাকে, প্রয়োজন মত এর তাপের তারতম্য করা হয়। এই বাষ্পের মধ্যে রোগীকে গা খুলে বসতে হয়। কিন্তু যাদের হৃদয় দুর্বল তাদের পক্ষে এরূপ স্নান নিরাপদ নয়। এই স্নান গেঁটে বাত ম্যালেরিয়া জ্বর, মূত্রাশয়ের ও চর্মরোগের পক্ষে ভাল।

(৩) **টারকিশ্ বাথ** (Turkish Bath) এই স্নান 'রাশিয়ান বাথের'ই মত, শুধু এতে শুষ্ক বায়ু ব্যবহার হয়। উপকারও ঐ 'রাশিয়ান বাথে'র মত।

(ঘ) বায়ু-স্নান

এই স্নান রোগীকে খুব উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে এরূপ ঘরে বসিয়ে করান হয়। বৈদ্যুতিক আলোটি খুব তাপ বিকীরণ করতে থাকে। রোগী এই উত্তাপে যতক্ষণ না বেশী পরিমাণে ঘেমে ওঠে, ততক্ষণ তাকে বসিয়ে রাখা হয়। তারপর তাকে শীতল স্নান করানো হয়। যারা উত্থানশক্তিহীন তাদের শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী এরূপ স্নানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। হাসপাতালে এরূপ স্নানের জন্য রোগীর গলা পর্যন্ত একপ্রকার তারের জাল দিয়ে আবৃত করা হয় এবং এই তারের নীচে থাকে বেশী শক্তির বৈদ্যুতিক আলো যা খুব তাড়াতাড়ি তারের জালকে উত্তপ্ত করে তোলে আর এই উত্তাপের ফলে রোগীর শরীর গরম হয়। এরূপ স্নানে মূত্রাশয়ের রোগে বিশেষ ফল লাভ হয়।

এ ছাড়া আরো কতকগুলি স্নানের প্রচলন আছে যেমন—

(১) **পারদ স্নান** (Calomel Baths) ২০।২৫ গ্রেন পারদ একটি ধাতব পাত্রে রাখা হয় এবং পাত্রটিকে আগুনের ওপরে বসিয়ে রাখার ফলে বাষ্পীভবন হয়। এই পাত্রের কিছু ওপরে বাষ্প স্নানের মত রোগীকে বসিয়ে রাখা হয়—এই বাষ্প রোগীর চতুষ্পার্শে লেগে তাকে উষ্ণ করে। উপদংশ রোগে এরূপ স্নান ব্যবহার হয়।

(২) **ভুষি বা তুষ স্নান**—(Bran Baths) এক গ্যালন জলে চার পাউন্ড ভুষি বা তুষ বেশ করে জ্বাল দেওয়া হয়, তারপর এই জল ছেঁকে নিয়ে স্নানের ঠান্ডা জল মিশিয়ে স্নানের উপযুক্ত করে স্নান করা হয়। এতে গায়ের ত্বকের প্রদাহ উপশমিত হয়।

(৩) **বালুকা-স্নান**—(Sand Bath) পুরানো বাতের পক্ষে এ স্নানের ব্যবস্থা করা হয়। বালিকে খুব গরম করা হয়, তারপর যখন ঠান্ডা হয় তখন এর মধ্যে রোগীকে বসিয়ে রাখা হয়।

(৪) **কর্দম স্নান**—(Mud Bath)। রোগীর গায়ে খনিজ জলের তলাকার মাটি মাখিয়ে দেওয়া হয় এবং ২০ মিনিট পরে ঠান্ডা জলে সমস্ত গা ধুইয়ে দেওয়া হয়। এতে বাত ও চর্মরোগের উপকার হয়।

(৫) **রৌদ্র স্নান** (Sun Bath)। রৌদ্রের সংগে মানুষের শারীরিক গঠনকার্যের অতি নিকট সম্বন্ধ। রৌদ্র থেকে আমরা পাই ভিটামিন 'ডি' যার দ্বারা শরীরের বাড় ও পুষ্টিসাধন হয়।

চিকিৎসাক্ষেত্রে যে বিভিন্ন প্রকারের স্নানের প্রচলন আছে এই প্রবন্ধের সংকীর্ণ পরিসরে বিশদভাবে তা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। যেগুলি খুব প্রয়োজনীয় এবং উল্লেখযোগ্য শুধু সেগুলিরই কথা বলা হ'লো।

পৃথিবীতে শুধু মানুষের মধ্যেই স্নান সীমাবদ্ধ নয়, ইতরপ্রাণী, পশু, পক্ষীদের ভেতরও এর প্রভাব যথেষ্ট লক্ষিত হয়। মানুষ তার বুদ্ধির জোরে স্নানের উপকারিতা উপলব্ধি করেছে; কিন্তু পশু, পক্ষীদের মধ্যে এ একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

মহিষ জলে স্নান ক'রতে খুবই ভাল বাসে। গ্রীষ্মকালে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে জলে ডুবে থাকে। হাতি শুঁড় দিয়ে তার দেহের চারিদিকে জল ছিটিয়ে স্নান করে। পাখীরা বৃষ্টির দিনে তাদের ডানাগুলোকে খুলে কেমন স্নান করে! জলের অভাবে পাখীরা ধুলোর মধ্যে ডানা ঝাপটে ধূলি-স্নান করে, এ আমরা সচরাচর দেখে থাকি। এ সমস্ত লক্ষ্য করলে স্নানের একটা সত্যি-কারের গুণের জন্যেই যে অনেক প্রাণীর মধ্যে বিশেষ করে, মানুষের মধ্যে স্নানের দিকে একটা সহজাত ঝোঁক রয়েছে, তা বলা চলে।

বিংশ শতাব্দীর মানুষ জলের গুণাবলী বুঝতে পেরেছে। তাই সে গুণকে কাজে লাগাবার জন্যে তারা চিকিৎসাক্ষেত্রে জল-চিকিৎসার (Hydro-Therapy) প্রবর্তন করে বর্তমান যুগের অশেষ উপকার সাধন করেছে।


"লোকটির কাছে ব্লেড ছিল, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত দামে আমাকে বিক্রি করতে অস্বীকার করল"
"এখুনি আমরা এব্যাপারে তদন্ত করছি"

পেখু-গুরু

অ · কৃ · ব

একদিন বেদানার দানা চিবাইতে চিবাইতে ভাবিয়াছিলাম "কি অদ্ভুত! দানাসর্বস্ব যে ফল, তাহারি নাম কিনা বেদানা!" আরেকদিন বেগুন-ভাজা খাইতে খাইতে মনে হইয়াছিল "এত গুণ যাহার, তাহার নাম হইল বেগুন?" এই দুটি ফলের নামকরণের ইতিহাস এবং নাম-কর্তাকে জানিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু জানিবার উপায় কেহ বাৎলাইয়া দিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। নাম হইতে নামের মালিকের স্বরূপ আন্দাজ করা এই কারণেই নিরাপদ নহে।

* * *

আপেল খাইতে খাইতে একদিন স্বর্গোদ্যানের নিষিদ্ধ ফলের কথা মনে হইয়াছিল। পুরুষ আদম এবং নারী ইভ্ ছাড়া স্বর্গোদ্যানে আর তৃতীয় মানুষ ছিল না। ভগবান অনেক ঝোপ্-ঝাড়ের আড়ালে লুক্কায়িত একটি গাছ দেখাইয়া কহিলেন "দেখ, তোমরা এই উদ্যানে আর যাহা খুশি তাহা কর, যাহা খাইতে ইচ্ছা হয় খাও, কিন্তু খবরদার, এই গাছটীর ফল কিন্তু কখনও খাইও না।" ভগবানের উদ্দেশ্য পরিষ্কার, অতএব টীকা নিষ্প্রয়োজন। সর্পরূপী শয়তানের প্ররোচনায় নারী ইভ্ নিষিদ্ধ ফল খাইয়া শেষ পর্যন্ত আদমকেও খাওয়াইয়া ছাড়িল। সঙ্গে সঙ্গে দুজনের মনে উদয় হইল ইংরেজী বাইবেলের ভাষায় "Knowledge of good and evil", বাঙলা ভাষায় "মন্দ ও ভালোর জ্ঞান।" তারপর অনেক ব্যাপার। শেষকালে ভগবান সব টের পাইয়া আসিয়া কহিলেন "এ তোমরা করিয়াছ কি? পই পই করিয়া তোমাদের মানা করিয়া গেলাম ঐ গাছটির ফল তোমরা খাইও না কিছুতেই; অথচ তোমরা বাছিয়া বাছিয়া ঠিক ঐ গাছেরি ফল খাইলে? যাও, এই পাপের ফলে তোমাদের আর স্বর্গোদ্যানে স্থান হইবে না!" (আরো কয়েকটা শাস্তির বিধান ভগবান দিয়াছিলেন, সেগুলির ফিরিস্তি অনাবশ্যক-বোধে এখানে দিলাম না। যাঁহারা প্রয়োজন বোধ করেন তাঁহারা বাইবেল পড়িয়া দেখিতে পারেন।) ফলে দুজনে হাতধরাধরি করিয়া আদম ও ইভ্ স্বর্গোদ্যান ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। ইহা লইয়া জনৈক ইংরেজ কবি একটি বিরাট কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

* * *

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না—অন্তত আমার নাই—যে আদম ও ইভ্‌কে যেমন করিয়া হউক নিষিদ্ধ ফল খাওয়ানোই ভগবানের উদ্দেশ্য ছিল। নতুবা ঐ গাছটিকে অত ভাল করিয়া দেখাইয়া দিবার কি দরকার ছিল? আমার তো মনে হয় ঐভাবে দেখাইয়া না দিলে আদম ও ইভ্ ঐ গাছটিকে খেয়ালই করিত না। এ সন্দেহও আমার হয় যে ইভের প্রলোভনকারী সাপটি শয়তান নহে—ছদ্মবেশে স্বয়ং ভগবান।

* * *

ভগবানের আদেশ অমান্য করিয়া জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়া আদি-দম্পতি আদম ও ইভ্ যাহা করিয়াছিল তাহাই আদি পাপ বলিয়া খ্যাত হইয়া আছে, এবং তাহা দ্বারা যে রসের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাই আদি-রস। সেই আদি পাপ হইতেই নাকি আদি-দম্পতির বংশধরগণের জন্ম, এবং সেই হইতে বংশপরম্পরায় আদি পাপ অনন্ত প্রবাহে বহিয়া চলিয়াছে।

পাপ হইতেই আমাদের জন্ম ইহা ভাবিয়া যে লজ্জা ও হীনতাবোধ, তাহা অপেক্ষা হাস্যকর আর কি হইতে পারে? বকরূপী ধর্মকে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন লোকের সম্মুখে লোকের পর লোক মরিতে দেখিয়াও মানুষ যে নিজের মৃত্যুর কথা ভাবে না ইহাই আশ্চর্য। আমি যুধিষ্ঠির হইলে বলিতাম পুরুষ ও নারীর যে সম্পর্ক আমাদের অস্তিত্বেরই মূলস্বরূপ, তাহাকে উপযুক্ত মর্যাদার দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাহাকে গর্হিত মনে করিয়া মানুষ লজ্জিত হয় ইহাই আশ্চর্য।

বাইবেলে যীশুর যে অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, তাহার পিছনে আছে এই হাস্যকর মনোবৃত্তি। আমাদের দেশেও দীক্ষাদাতা মহাপুরুষগণের দীক্ষিত শিষ্যগণ নানাভাবে ইহাই প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হন যে, এই সব পবিত্র পুরুষের অপাপবিদ্ধা জননীগণ তাঁহাদের পবিত্র কৌমার্য না হারাইয়াই অলৌকিক উপায়ে সন্তান লাভ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ আমরা পাপ-পঙ্কের কীটগণ যে গর্হিত উপায়ে পৃথিবীর আলো দেখিয়া থাকি, এই অলৌকিক মহাত্মাগণ সেইরূপ লজ্জাকর উপায়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন নাই। এই ভক্তের দলকে বলিতে ইচ্ছা হয় "বাপু হে! এতটাই যখন করিলে তখন অনর্থক মাতৃ-জঠরেই বা এই ভদ্রলোকদের বাস করাইলে কেন? একেবারে ভুঁইফোঁড় করিলেই হইত।"

* * *

কিন্তু আপেল হইতে অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িলাম দেখিতেছি। এতটা না আসিয়া মাধ্যাকর্ষণ পর্যন্ত আসিলেই হইত—নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ, অথবা মাধ্যাকর্ষণের নিউটন্ পর্যন্ত। আপেলের চাষ পৃথিবী হইতে উঠিয়া গেলেও মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের কাহিনীতে আপেল চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবে। এত ফল থাকিতে এই চিরস্মরণীয় সম্মানটা পড়িল গিয়া আপেলের ঘাড়ে! ভাগ্যবান আপেল!

নিউটন নাকি একদিন এক নিরালা আপেল-গাছের তলায় বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন। তখন তাহার বয়স—আমার যতদূর মনে হইতেছে—অল্প। এমন সময় হঠাৎ একটি পরিপক্ক আপেল বোঁটা ছিঁড়িয়া টুপ্ করিয়া নিউটনের সামনে পড়িল। অন্য কোন ছেলে হইলে টপ করিয়া আপেলটি তুলিয়া লইয়া হয়তো পরমানন্দে খাইতে সুরু করিতেন। কিন্তু নিউটন অন্য কোন ছেলে ছিলেন না। তিনি ভাবিতে সুরু করিলেন। তাঁহার এই ভাবনার ফল কি হইয়াছিল তাহা আমরা জানি—মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার। ধরলাম বলে কোনোদিন এমন হইতে পারে যে, নূতন কোন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া প্রমাণ করিয়া দিবে, মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব কোনো তত্ত্বই নয়। কিন্তু যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন মাধ্যাকর্ষণকে আমরা তত্ত্ব বলিয়াই মানিব।

* * *

মাধ্যাকর্ষণ প্রসঙ্গে প্রেমের কথা মনে পড়িয়া গেল। মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কর্তারই দেশের জনৈক কবি তাঁহার একটি গদ্য প্রবন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে, পদার্থ-জগতে যাহা মাধ্যাকর্ষণ মনোজগতে তাহাই প্রেম।

কথাটা হয় তো সত্যই। মাধ্যাকর্ষণে পতন, প্রেমেও পতন। মাধ্যাকর্ষণে পড়িয়া কখনো কখনো প্রাণ যায় অথবা হাত পা ভাঙে; প্রেমে পড়িয়াও কখনো কখনো প্রাণ যায় এবং হাত পা না ভাঙুক মন ভাঙে।

মাধ্যাকর্ষণের মত প্রেম, এবং প্রেমের মত মাধ্যাকর্ষণ চিরন্তন। প্রেম লইয়া যেমন বহু কাব্য উপন্যাসাদি রচিত হইয়াছে, মাধ্যাকর্ষণ লইয়াও খুব সম্ভব তেমনই অঙ্ক ও বিজ্ঞানের গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে। মাধ্যাকর্ষণ যেমন ছোটবড়র তফাৎ না করিয়া সকলকেই টানে, প্রেমও তেমনি সকলকেই টানে। টানিয়া নামাইতে পারে কি না সে কথা অবশ্য আলাদা।

এই প্রসঙ্গে কবি বন্ধু বিদ্যাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অতি আধুনিক কবিতার খানিকটা উদ্ধৃত না করিয়া পারিতেছি না। অপরাধ হইলে পাঠক-পাঠিকাগণ (যদি কেহ থাকেন) মাপ করিবেন।

"তোমার সবুজ মনের সবুজ প্রেম,
সে যেন মাধ্যাকর্ষণের মতো—
যায় না দেখা, যায় অনুভব করা শুধু।
মাধ্যাকর্ষণের একটানা সংগীতে
ভাসে অনন্ত অতীতের সূক্ষ্ম সুর;
সেই সুর বাজে প্রেমের বীণায়
তারে তারে, ছন্দে ছন্দে।
মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব বহুকাল ভেসেছিলো শূন্যে
আত্মপ্রকাশের বাহন খুঁজে,
শেষে ধরা দিলো নিউটনের কাছে,
অথবা ধর্‌লো নিউটনকে—
নিউটনের নাম হয়ে গেল
মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার-কর্তা রূপে।
মানুলুম মাধ্যাকর্ষণকে আবিষ্কার করেছিলেন
আইজ্যাক নিউটন্,
অথবা মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেছিলো
স্যার আইজ্যাক্ নিউটনকে।
কিন্তু কেউ কি বল্‌তে পারে
প্রেম আবিষ্কার করেছিলো
কে, কবে, কেন, কেমন করে, কোথায়?..."

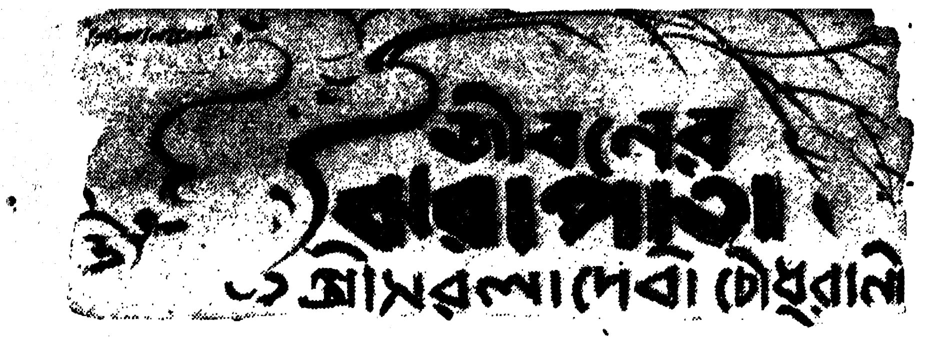
* * *

কবি-বন্ধু জবাব আশা করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু জবাব কি হইতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা করার হাত এড়াইতে পারি নাই।

বাইবেলে যদি বিশ্বাস করি তাহা হইলে প্রেমের ইতিহাসের সুরু হইয়াছিল স্বর্গোদ্যানে ইভ্ ও আদমের নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের পরমুহূর্ত হইতেই। বাইবেলে যাহাকে আদি পাপ বলা হইয়াছে তাহাই প্রকৃতপক্ষে আদি প্রেম।

কেহ কেহ এইখানে আপত্তি তুলিয়া বলিতে পারেন, প্রেমের মত সূক্ষ্ম জিনিস বর্বর যুগে ছিল না, থাকিতে পারে না, অতএব প্রেম সুরু হইয়াছিল আদম ও ইভের বহু পরে। এই আপত্তি মানিয়া নিলে প্রশ্ন ওঠে "কত পরে?" কিন্তু সে এক কঠিন গবেষণার ব্যাপার।

তাছাড়া প্রেম সম্বন্ধে এরকম চুলচেরা আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই ঠিক করিয়া নিতে হয় প্রেম জিনিষটা কি, তাহার স্বরূপ কি। প্রথমেই এ সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার করিয়া না নিলে আলোচনাও হইবে ঘোরাটে রকমের। বন্ধুদের মধ্যে যাহারা প্রেমে পড়িয়াছেন অথবা পূর্বে পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছি, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় কেহই কোনো হদিস্ দিতে পারেন নাই। সবাই প্রেমের তৌফিলনাম্ না জানিয়াই প্রেমে পড়িয়াছিলেন।



(দ্বিতীয় পর্যায়)

মহীশূর

মহীশূরে বাসে যে ভারত আমার হৃদয়ে প্রতিভাত হল সে এক অপূর্ব নূতন। "একালে সেকাল" নাম দিয়ে তার ছবি এঁকেছিলুম তখন 'ভারতী'তে। এ যুগের ভারত নয় যেন সে, সেই সংস্কৃত নাটক ও কাব্যের যুগের।

মহারাণী গার্লস স্কুলের সঙ্গীতাচার্যের কাছে আমি নিজেই বীণা শেখার প্রার্থী হলুম। এমন সুযোগ কি ছাড়তে পারি? প্রথমদিন যখন তাঁর কাছে গেলুম—দেখলুম মাটিতে বড় মাদুর বিছান রয়েছে, তার একধারে তিনি বসে আছেন, একধারে আমার জন্যে জায়গা খালি রয়েছে—মাঝখানে দুটি রুদ্র বীণা। একটি হাতে তুলে নিয়ে—হিন্দী ইংরেজী অনভিজ্ঞ আচার্য সংস্কৃতে "তত্র ভবতি" বলে আমায় অভিবাদন করে বল্লেন—"তন্ত্রী-ত্রুটিতা।" চমকে গেলুম। কালযন্ত্র কি চার পাঁচশত বছর পিছিয়ে গেছে? আমি কি সংস্কৃত সাহিত্য কাব্য থেকে বেরিয়ে আসা একটি নায়িকা? আমার আশেপাশে সব মেয়েদের বেণীতে কুন্তলে ফুল জড়ান, সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে মাথা ঘষে একটা হালকা যন্ত্রে অল্প আগ্নি রেখে যন্ত্রটি হাতে করে চুলের ভিতর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চুল শুকানো—এ সবে কি মেঘদূতের এক একটি বর্ণনা চোখের উপর ভেসে উঠল না? এমন আরও কত কি! যাঁরা কবি কালিদাসকে বাঙালী বলে দাবী করতে চান দক্ষিণ ভারত অঞ্চলে আজ পর্যন্ত প্রবহমান অনেক কিছু আচার ও রীতি দেখে আমার ত মনে হল না তাঁদের দাবী সমূলক। বাঙালীর লোভটা বড় বেশী! কাজ কি আমাদের টানাবোনা করে, নানা কুতর্কে কষ্টপ্রমাণে প্রমাণিত করার চেষ্টায় যে কালিদাস বা ভবভূতি—সবাই বাঙালীর পূর্বপুরুষ—ভারতের অন্য প্রদেশবাসীর নয়? কবি জয়দেবের মত অত বড় ভারতবিশ্রুত কবি থাকতে আমরা আরো কাউকে আমাদের বংশাবলীভুক্ত করতে কেন লালায়িত হব? এ যেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের চেষ্টারই সমতুল্য প্রয়াস যে, শাণ্ডিল্য গোত্রের কবি ভট্টনারায়ণ কেবল শাণ্ডিল্য 'ঠাকুর'দেরই পূর্বপুরুষ—সারা বঙ্গদেশব্যাপী শাণ্ডিল্য গোত্রের বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্রের নয়? আশা করি এমন একদিন আসবে না যেদিন বাঙালী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথে সন্তুষ্ট না থেকে সেক্সপীয়র বা গেটেকে ধরেও টানাটানি করবে বাঙালী বলে প্রতিপাদন করতে।

আমি মহীশূরে যেদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করি সেই দিকেই দেখি অতীত আজও মূর্ত হয়ে আছে। আমার মুগ্ধতায় প্রীত হয়ে দরবার বক্সি সাহেব আমার showman হয়ে আমায় চারিদিকে নিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি একজন সংস্কারক। যেখানে অতীত সংস্কারের প্রাচীর এখনও অত্যন্ত দৃঢ় প্রথমেই সেইখানে আমায় নিয়ে গেলেন—মহারাজার কাছ থেকে খাস অনুমতি নিয়ে—পুরুষদের সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শনে। ঘোর সনাতনী পণ্ডিতগণের মধ্যে আমাকে নিয়ে গিয়ে ফেলে অনুরোধ করলেন—"উপনিষদ থেকে দু'একটা মন্ত্র শোনাবেন এঁদের।" দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ সংস্কৃত-অধ্যাপকেরা স্তম্ভিত। প্রথমত এক স্ত্রীলোকর দ্বারা তাঁদের অধ্যাপনাগৃহের দুর্গভেদ—তার উপর তার মুখে বেদ উপনিষদের আবৃত্তি শ্রবণ? স্বয়ং ব্রাহ্মণ নরসিং আয়েঙ্গারের এই অব্রাহ্মণ্য প্রস্তাবে তাঁরা চঞ্চল হয়ে পড়লেন। কিন্তু দরবার বক্সী তিনি, মহারাজের দক্ষিণ হস্ত, তাঁর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি তুলতে সাহস পেলেন না। স্ত্রীমুখে বেদপাঠ তাঁদের শুনতেই হল। আমি ব্রাহ্ম-ধর্মগ্রন্থে কর্তাদাদামশায়ের সঙ্কলিত মন্ত্র থেকে দু'চারটি শোনালুম। সৌভাগ্যবশত আমার বৈদিক উদাত্ত অনুদাত্তাদি স্বর ও সংস্কৃত বর্ণমালার উচ্চারণ বাঙালী সংস্কৃতজ্ঞসুলভ অশুদ্ধ ছিল না। তার কারণ যোড়াসাঁকোতে অনেকগুলি দাদাদের একত্রে উপনয়ন সংস্কারের সময় যখন গুরু হেমচন্দ্রের সমীপে কয়দিন বাসকালে এবং তার পূর্বে ও পরেও দুই একমাস ধরে তাঁদের এই মন্ত্রগুলি সম্পূর্ণরূপে কণ্ঠস্থ করান হয়—আমি কর্তাদাদামশায়ের কাছে আবদার ধরেছিলুম—"আমাকেও শেখান হোক।" ছেলেদের শিক্ষা সমাপ্ত হলে ওঁদের মধ্যে এ বিষয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়েছিলেন সেই ন'মামার একমাত্র পুত্র বলুদাদাকে কর্তাদাদামশায় আদেশ করেছিলেন আমায় বাড়িতে এসে নিয়মিতভাবে ঐ মন্ত্রগুলি পড়তে শেখাতে। আদি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যেরা যে স্বরে ও প্রকারে বেদীতে বসে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতেন—তা দাক্ষিণী ও বেণারসী পণ্ডিতদের স্বর ও প্রকার—বাঙালী অধ্যাপক পণ্ডিতের নয়। দাদামশায় বহুব্যয়ে তাঁদের আনিয়ে আচার্যপদে নিযুক্ত করেছিলেন। সুতরাং মহীশূরের পণ্ডিতেরা আমার উচ্চারণে তাঁদের উচ্চারণ থেকে কোন প্রভেদ পেলেন না। একালে মেয়ের মুখে উপনিষদ শোনায় একটা সংস্কারগত আঘাত লাগলেও শ্রুতিগত ব্যথা পেলেন না। শুক্ল না যজুর্বেদীয় মন্ত্র বল্লুম—সেই সম্বন্ধে আমার সঙ্গে সংস্কৃতে খানিকক্ষণ আলোচনা করলেন। আমি ব্যাকরণ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে যতটা পারি উত্তর দিলুম। নরসিংহ আয়েঙ্গার মহা খুসী হয়ে আমায় তারপর নিয়ে গেলেন সাংখ্যের ক্লাসে। সাংখ্যের পণ্ডিত আমায় অপ্রতিভ করার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন শিষ্যদের কোন প্রশ্ন করতে। আমি তাতে প্রথমে অগ্রসর হলুম না, কারণ আমার সংস্কৃতে কথোপকথন চালানর শক্তির উপর বেশী জোরজুলুম করতে ভীত হচ্ছিলুম। কিন্তু অবশেষে নরসিং আয়েঙ্গারের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে সাংখ্যকারিকা থেকে একটি প্রশ্ন করলুম। অধ্যাপক বলে উঠলেন—"সাধু! সাধু!" কিন্তু শিষ্যেরা তাঁর উত্তর দিতে একটু থতমত খেয়ে গেল। নরসিং আয়েঙ্গার গর্বে ফুলে উঠলেন, সেদিনকার মত আমার পর্যটন শেষ হল।

মহীশূরে গিয়ে ঠেকে অনুভব করেছিলুম বাঙলার স্কুল কলেজে বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের যে সংস্কৃতে কথাবার্তা কওয়ানর অভ্যেসটা একেবারে বাদ দেওয়া হয় সেটা একটা মস্ত ত্রুটি। বিদ্যাসাগর মশায়ের উপক্রমণিকা থেকে সেকালে সংস্কৃতের শিক্ষারম্ভ হত আমাদের। তাতে ফলং ফলে ফলানি, জলং জলে জলানি—এইসব আওড়িয়ে আওড়িয়ে মুখস্থ করাই ছিল কাজ। বিশেষ্য বিশেষণ ও ক্রিয়াপদ জুড়ে এক একটা সেন্টেন্স রচনা করার পন্থাই ছিল না তাতে। মহীশূর স্কুলে মহারাষ্ট্রীয় স্কলার ভাণ্ডারকারের যে বই সংস্কৃতের প্রথম পাঠ্য তাতে দেখলুম আরম্ভ থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা সংস্কৃতে অল্প

অল্প কথোপকথনে অভ্যস্ত হয়। ঠিক য়ুরোপের অলেনডর্ফের বইয়ের মত এটি। সে বইখানি য়ুরোপের সর্বভাষায়—ফ্রেঞ্চ জার্মান ইতালীয়ান প্রভৃতিতে ইংরেজদের কথোপকথন চালাতে শেখানর জন্যে প্রসিদ্ধ। প্রথমেই কানে শোনার মত 'direct method'এ কতকগুলি সেন্টেন্সের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়—তারপরে ব্যাকরণের জটিলতায় প্রবেশ করান হয়। বাঙলা স্কুল-কলেজেও এই দরকার।

দ্বিতীয় ত্রুটি—কলকাতা য়ুনিভার্সিটির অধীনে সংস্কৃত প্রথম পাঠ্য পুস্তক থেকে আরম্ভ করে শেষপাঠ্য পুস্তক পর্যন্ত সবই দেবনাগরী লিপিতে নয়—বাঙলা লিপিতেই লিপিবদ্ধ। ছাত্র-ছাত্রীরা এমন কি টোলের পণ্ডিতেরাও দেবনাগরী অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত নন। য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষায় বাঙলা অক্ষরে লিপিবদ্ধ প্রশ্নের উত্তরও তাতেই দেওয়া হয়। কোন সংস্কৃত পুস্তক আসল সংস্কৃত অক্ষরে পড়তে গেলেই তাঁদের আটকে যায়। দেবনাগরী অক্ষর পড়তেই পারেন না, ত লিখতে পারা ত আরো দুঃসাধ্য। আমি পড়তে পারতুম—কিন্তু লেখা আমারও অভ্যেস হল অনেক বিলম্বে মহাত্মা গান্ধীর তত্ত্বাবধানে। তিনি এ বিষয়ে রীতিমত task master হলেন আমার—চরখা কাটার সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে প্রতিদিন খানিকটা সময় যাপন করতে হত।

তৃতীয় ত্রুটি—বিকৃত উচ্চারণের। বাঙলার টোলের পণ্ডিতদের কেউ কেউ সংস্কৃতে অনর্গল ব্যাকরণশুদ্ধ কথা কইতে পারেন দেখেছি। কিন্তু কি কর্ণ-পীড়ক অবিশুদ্ধ উচ্চারণ! অ-আর ভেদ নেই, লম্বা টান ছোট টানের ভেদ নেই, হ্রস্বদীর্ঘের ভেদ নেই, ই-ঈর ভেদ নেই, বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব'য়ের ভেদ নেই, শ ও স-এর ভেদ নেই, ন ও ণ-য়ের ভেদ নেই। 'ভেদরিপুনাশিনী মম বাণী' বলা যেতে পারে বাঙালীর কণ্ঠ-নিঃসৃত সংস্কৃতকে। কিন্তু এটা স্থল নয় অভেদবুদ্ধি চর্চার। তাতে শুধু সারা ভারতবর্ষের কাছে হাস্যাস্পদ হতে হয়। মনে পড়ে আমি ছাড়া একমাত্র হেম—শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা—ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে পাঞ্জাবে ও পশ্চিমে যাওয়া উপলক্ষে ও দেশী মেয়েদের সংস্রবে আসায়—ক্লাসে বিশুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃত পড়ার বিষয়ে অবহিত ছিল। বেথুন স্কুলে, ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে ও সঙ্গীত সম্মিলনী প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠানে কর্তৃপক্ষরা যখনই মেয়েদের বেদ-গানে প্রস্তুত করার ভার আমার উপর দিয়েছেন—তখনই এই চিরাভ্যস্ত বিকৃত উচ্চারণের সংকীর্ণ বাঙালীপথ থেকে বিশুদ্ধ উচ্চারণের ভারতীয় রাজপথে আনতে অনেকটা কষ্ট পেতে হয়েছে। ভারত স্ত্রী-শিক্ষা-সদনে আমি এ বিষয়ে সংস্কৃত অধ্যাপককে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করে দিয়েছি।

স্টেট থেকে আমি যে বাড়ি পেয়েছিলুম থাকার জন্যে, ভারী সুন্দর, ছোটখাট, দোতালা। নীচে ড্রইং রুম ও খাবার ঘর, উপরে দুটি শোবার ঘর—যার একটি ড্রেসিং-রুমে পরিণত হয়েছে, স্নানের ঘর ও বারান্দা। সব ঘরগুলিতেই সুন্দর ওয়াল পেপার লাগান। কাছেই ব্রাহ্মণদের 'অগ্রহার' —অর্থাৎ রাজ সরকারের দান, নিষ্কর ব্রাহ্মণ পল্লী। মহীশূরের ক্ষত্রিয় রাজবংশের অধিকাংশ প্রজাই হয় শিবোপাসক ব্রাহ্মণ বা লিঙ্গায়ৎ এবং জৈনী। দুই শ্রেণীর মেয়েদের সাড়ী পরার ধরণে ও কপালে তিলকচর্চায় পার্থক্য আছে—দেখলেই চেনা যায় কে কোন্ ঘরের মেয়ে। ইস্কুল দুবার করে বসে—একবার সকালে, একবার বিকেলে। অধিকাংশই বিবাহিত মেয়ে, কেউ বা অনেক ছেলের মা। সকালে মেয়েরা প্রায়ই বাসী সুতির ছাপান কাপড়ে আসে। দুপুরে বাড়ি ফিরে স্নানাদি করে শুচি হয়ে মৈসোরি সুন্দর সুন্দর পাকা রঙের রেশমী কাপড় পরে আসে। যাই পরুক একটা পারিপাট্য, একটা সহজ সৌষ্ঠবে ভরা। কোমরে সকলেরই প্রায় সাড়ীর উপর একটা রূপার ঘুঙ্গুরদার বেল্ট। কারো কারো সেটা খাঁটি সোনার। গায়ে খুব বেশী গয়না নয়—নাকে কানে হীরা বা মুক্তার ফুল ও নাকছাবি, হাতে দু-একগাছি চুড়ি। সোনা মোতি হীরের চুড়ি হোক আর না হোক সধবাদের হাতে কাঁচের চুড়ি থাকতেই হবে—আমাদের নোয়ার মত—সেইটিই তাদের সধবাত্বের লক্ষণ। বিধবারা কাঁচের চুড়ি পরে না, সোনার পরতে পারে। শ্রেণীবিশেষে কিছু কিছু পার্থক্যও দেখা যায়। পূজাপার্বণের দিন মন্দিরে গিয়ে পূজা দেওয়া ও দেবতা দর্শন মেয়েদের নিয়মিত কাজ। রাস্তায় মেয়েদের হাঁটা, চলাফেরা অন্যান্য দৈনিক দৃশ্যের একটি অন্যতম। কোন পথেচলা মেয়ের প্রতি কোন পথে-চলা পুরুষের বাঁকা দৃষ্টি নেই। যা নিত্যনৈমিত্তিক সাধারণ ঘটনা সেটা অসাধারণ শূন্যতায় কোন পুরুষ বা বালকের ঠাট্টা বিদ্রূপ বা টিটকারির কারণ হয় না। এদের বারো মাসে হিন্দুর তের পার্বণ ত বাঁধা আছেই—উপরন্তু সম্প্রদায় বিশেষের অতিরিক্ত বিশেষ পর্বদিনও আসে। এই পর্বগুলি ভারতবর্ষকে কেমন একসূত্রে গেঁথে রেখেছে সেইটে লক্ষ্য করলুম।

বাঙলার গৃহে গৃহে যেদিন বোনেরা ভাইদের কল্যাণ কামনায় ভাই দ্বিতীয়া করে—এখানেও সেদিন সেই উৎসবের আনন্দ। ঘরে ঘরে বিশেষ পকান্ন প্রস্তুত হচ্ছে, ঘরে ঘরে ভাইরা বোনদের আশীর্বাদী বা প্রণামী দিচ্ছে, ঘরে ঘরে এক মা বাপের সন্তানদের —পুত্র ও কন্যার জন্মগত ঐক্য বন্ধনে আর একটি করে গাঁট বাঁধা হচ্ছে। নব্যসভ্যতার যুগে খৃষ্টান জগতের অনুকরণে ভারত-বর্ষের এই সকল পারিবারিক প্রীতিবর্ধক উৎসবগুলি অনেক পরিবার থেকে উঠে যাচ্ছে। আমাদের কারোও দেখছি কোন কোন স্থলে এটা একটা আদানপ্রদানের মধ্যে গণ্য হয়ে হিসেব খতিয়ে দেনাপাওনা মেটান হয়, বোনের বাড়ি গিয়ে তার স্নেহমাখা অন্ন ও বস্ত্র গ্রহণ না করেই তাকে হিসেব কাটা-কাটি করে টাকা ধরে দেওয়া হয়। হায় এ কালের অভাগা ভাই ও অভাগিনী বোন। যে নিঃস্বার্থ নিগূঢ় নির্মল ভালবাসার দুটি স্রোত হৃদয়ে সারা বছর সঞ্চিত মালিন্যের মাটি খুঁড়ে দুদিক দিয়ে বের হয়ে বিশুদ্ধ মিলন চাইছিল—বছরের একটি দিনও আর সে অবসর পেলে না।

বাঙলা দেশেই বোনেরা সেদিন ভাইকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান, কিছু না কিছু উপহার দেন। কিন্তু বাকি সারা ভারতবর্ষে —দক্ষিণে উত্তরে পশ্চিমে—সেদিন ভাইরাই বিশেষ করে বোনকে কিছু না কিছু দ্রব্য বা অর্থ দেন। বোন শুধু সিঁদুর চন্দনের টিপ এবং মিষ্টান্ন ভাইয়ের জন্যে প্রস্তুত রাখেন, আর একগাছি মঙ্গলসূত্র ভাইয়ের হাতে বেঁধে দেন। যদি ভাই বিদেশে থাকেন, তবে ডাকযোগে যথাদিনে তাঁর হাতে পৌঁছিয়ে দেন—খৃশ্চানদের নিউ-ইয়ার্স বা ক্রীসমাস কার্ডের মত। বাঙলার দায়ভাগ ও অন্যান্য প্রদেশের মিতাক্ষরাজনিত উত্তরাধি-কারগত পার্থক্যের সঙ্গে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়াতে ভাইবোনদের পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিকোণের পার্থক্যের সূক্ষ্ম যোগ আছে কি? মোটের উপর দেখেছি, বঙ্গেতর বাকি ভারতবর্ষে কন্যা ও ভগ্নীর প্রতি পিতামাতা ও ভাইয়ের স্নেহশীলতা ও দেওয়ার প্রবণতা অত্যন্ত বেশি। যেন যত দাও কিছুতেই পর্যাপ্ত দেওয়ার তৃপ্তিবোধ হয় না। সে-সব দেশে আমাদের দেশের মত বরপণ-প্রথা ছিল না, শ্বশুরকুল থেকে কোন রকম দাবী আসত না, কারণ দেশাচার ও কুলাচার দাবীর অপেক্ষা না রেখে স্বতই মেয়েদের যথাসাধ্য দিত। শুধু বিয়ের সময় নয়, মেয়ে যতবার পিতৃ-গৃহে আনাগোনা করত ততবারই। মেয়েকে দেওয়ার রীতির এত বাড়াবাড়ি ছিল যে, রাজপুতবংশে সেই জন্যে মেয়েকে একবার জামাতার হস্তে সমর্পণ করে আর কোন দিন বাড়ি আনতে সাহস করত না, পাছে তাতে বাপের আত্মসম্মান রক্ষার্থে প্রায় সর্বস্বান্ত হ'তে হয়। অবস্থা বুঝে পিতৃভক্ত মেয়েও সেইজন্যে আসতে চাইত না—জানত তাতে মা-বাপকে কত বিপন্ন করা হবে। আর 'কুমারী' অবস্থায় কন্যার আদরের কথা বললেই শেষ হয় না। দুর্গাপূজায় যে 'কুমারীপূজা' বিহিত, আছে—সেই দেবীপ্রতিম চক্ষেই হিন্দু-ভারতে কন্যাকে দেখা হয়। এমনকি, কন্যা পিতামাতা বা বড়ভাইদের পাদস্পর্শ করে কখন প্রণাম করে না—তাতে তাঁদেরই অকল্যাণ-ভয়—পুত্রবধূরা বা ছোটভাজেরা করে। ছোট ছোট খুঁটিনাটির পার্থক্যগুলির

ভিতর দিয়ে যে একটি সাধারণ ঐক্যসূত্র দেখা যায়, সেই ঐক্যে হিন্দু-ভারত পাল-পার্বণে বাঁধা।

মহীশূরে দেওয়ালীতে আর একটি মিলন-সূত্র পেলুম, যদিও তারও ভিতর পার্থক্য আছে। মূল্শেতর ভারতের সর্বত্র দেওয়ালী শুধু রাত্রে আলো জ্বালান ও বাজি-পোড়ানর দিন নয়—এটি নতুন খাতার দিন। আর আমাদের বিজয়া-দশমী দিনের মত এটি আত্মীয়-বন্ধুদের পরস্পরের মনোমালিন্য মুছে ফেলে সৌহার্দ্যে পুনর্মিলনের দিন। আরও একটি অনুষ্ঠানে সেদিনটি সকলের বুক ভরে দেয়—লক্ষ্মীর পূজায়। দেওয়ালীতে জুয়াখেলা স্বগৃহে লক্ষ্মীর আবাহনেরই প্রকারান্তর। প্রতি গৃহটি সেদিন খোলার ঘর হোক বা অট্টালিকা হোক নিকিয়ে সারাদিন ধরে সারা বছরের সঞ্চিত আবর্জনা সাফ করে, আলপনায় গৃহখানি সুচিত্রিত করে, রাত্রে লক্ষ্মীর শুভাগমনের জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়। একে বলে "দেওয়ালী কি সফাই।" ইংরাজদের 'Spring cleaning'-এর আর এক রূপ। একজনের কাছে গল্প শুনলুম, সে বছর এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে এই রকম ঘরে ঘরে দেওয়ালিকি সফাই হয়েছে। এক গরীব ব্রাহ্মণ ও তার ব্রাহ্মণী দুজনে অতি ভক্তিভরে গোবর দিয়ে তাদের ঘরখানি নিকিয়ে উঠানের জঞ্জাল পরিষ্কার করে লক্ষ্মীর প্রতীক্ষায় জেগে বসে আছে। সে গ্রামখানির ছোট বড় প্রতি ঘরে ঘরে এই-রূপ জাগরণ চলেছে। এদিকে লক্ষ্মী-ঠাকরুণ তাঁর ঝাঁপি হাতে করে চুপি চুপি এসে প্রতি ঘরের জানলা দিয়ে ভিতরে উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখছেন। কোনটিই তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। অবশেষে সেই গ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের খানার ঘরের টেবিলের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ল। কি শুভ্র শ্বেত চাদর-খানি বিছান মেজে, কি ঝক ঝকে কাঁচের গেলাসে ও রূপার কাঁটা চামচেতে সাজান ভোজন স্থান, কি সুন্দর আলোতে ও ফুলেতে সুশোভিত। দেখে দেখে মুগ্ধ হয়ে লক্ষ্মী সে রাত্রি সাহেবের সেই ভোজন-মন্দিরে ঢুকে সেইখানেই বসে পড়লেন। গরীব ব্রাহ্মণদের গোবর নিকিয়ে লক্ষ্মীর আশাপথ চেয়ে চেয়েই রাত্রি কাটল।

পঞ্জাবে দেখেছি দেওয়ালীতে লক্ষ্মী-পূজার সময় কোন কোন গৃহে পুরোহিতের সাহায্য ব্যতিরেকে গৃহস্বামী ও গৃহিণী নিজেরাই পূজা নির্বাহ করেন। যেখানে স্ত্রী নিজেই পুরোহিত, সেখানে পূজার পদ্ধতিটিও মেয়েলী, সহজ, সাদাসিদে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বড় বড় সংস্কৃত মন্ত্রে যা বলেন মাতৃ ভাষায় তারই সরল ভাবান্তর। একবার একটি পরিবারে বসে স্বামীস্ত্রী দুজনে মিলে পূজা করা দেখেছিলুম। তাদের দুজনের আসনের সামনে লক্ষ্মীর একটি প্রতিমা অর্থাৎ মাটির একটি ছোট্ট পুতুল, তাঁর আশেপাশে অন্যান্য নানা-পুতুল নানা দেবদেবীর মূর্তি—যা দেওয়ালীর বাজারে পাওয়া যায়, বাড়ি বাড়িতে সবাই কিনে রাখে। মাটির এক পঞ্চপ্রদীপ—তাতে তেল সলতে দিয়ে আলো ধরান। একখানা রূপার থালায় অনেকগুলি চকচকে রূপার টাকা, আর একখানিতে ফুল, জল, ধান্য, খই, মিষ্টান্ন প্রভৃতি। গৃহিণী একটি ফুল তুলে লক্ষ্মীমূর্তির দিকে চেয়ে বল্লেন—লক্ষ্মী আয়ি! স্নানং। নমা।

লক্ষ্মীর একেবারে সাক্ষাৎকরণ হচ্ছে—আশা প্রতীক্ষা মাত্র নয়, একেবারে এসেছেন, ঐ যে দেখা যাচ্ছে! অভ্যাগতের সৎকার হোক! স্নান করাও!

—স্নানং! নমা—নমস্কার!

ইতিমধ্যে ছাদের উপর চাকরের সাহায্যে দীপাবলী সাজিয়ে ঘরে এসে, মা-বাপকে ঘিরেবসা ছেলেমেয়েরা মায়ের ও বাপের সংগে সংগে লক্ষ্মীর গায়ে জলসিঞ্চন করে নমস্কার করলে।

তারপর গৃহিণী বল্লেন—লক্ষ্মী আয়ি! পুষ্পং! নমা!

দেবী গৃহাগতা! তিনি সাক্ষাতে বিরাজ-মানা! ছবিতে যেমন স্বামী বা পুত্র সাক্ষাতে বিরাজমান হন তেমনি এই পুতুলে লক্ষ্মী!

সকলে তাঁকে পুষ্প প্রক্ষেপ করে নমস্কার করলেন।

এবার—লক্ষ্মী আয়ি! ধূপং দীপং নমা!

ধূপকাটি জ্বালিয়ে ঘোরান হল, দীপ দেখান হল।

লক্ষ্মী আয়ি! নৈবেদ্যং! নমা।

নৈবেদ্যের থালি তুলে লক্ষ্মীকে আহার্য নিবেদন করা হল, নমস্কার করা হল।

তারপর গৃহপতি—

"ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মোক্ষিয়ে-
দামৃতাৎ। ওঁ"

মানে না জেনেই প্রাণপ্রতিষ্ঠার এই সংস্কৃত মন্ত্রটি বল্লেন। তাদের মন্ত্রচৈতন্য বা শব্দার্থ বোধ অর্থাৎ সম্মুখস্থ লক্ষ্মী মূর্তিকে অন্তরে অনুভব হয়ে গেছে এবং ভাবের গাঢ়তায় তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠাও করে ফেলেছেন তা জানেন না। শেষকালে সপরিবারে "জয় জগদীশ হরে" এই আরতির গানটি গেয়ে পূজা সমাপন হল। গৃহিণী নিজের মনে খানিকক্ষণ লক্ষ্মীকে ধ্যান করলেন। আসন ছেড়ে উঠবার আগে আমাকে ধরলেন—"একটি কিছু মন্ত্র আপনিও বলুন। আমার একটি জানা ছিল, আমি সেইটি বল্লুম ও মানে বুঝিয়ে দিলুম—

ওঁ ত্রৈলোক্যমাতরং হ্রীং শ্রীং স্বাহা।

"যিনি ত্রিলোকের মা, ত্রিলোককে অন্ন দেন, জল দেন, পুষ্টি দেন—তাঁকে ছুঁইয়ে—অন্তরে হৃদয়ে অনুভবে এনেছি। তিনি বাইরে শ্রী হয়ে materialised হয়ে অন্নে ধান্যে, সোনায় রূপায় অন্নসম্ভারে রূপ ধরে প্রকাশ হোন।"

তারা ভারি খুসী হয়ে এই মন্ত্রটি লিখে নিলে, পর বৎসর থেকে তাদের পূজাবিধির অংগীভূত হল।

গৃহিণীটি প্রাক্তন আর্যসমাজভুক্ত স্বামীকে সনাতনী করে ফেলেছেন। বল্লেন—"প্রত্যেক গৃহস্থের দরকার লক্ষ্মীপূজো ও শক্তিপূজা। এ দুই ছাড়া সংসারে কার চলে?" ধর্মসংস্কারকদের তর্কবিতর্কের ভিতর তিনি নেই—তাঁর আছে সংসারী গৃহিণীর প্র্যাকটিক্যাল কমনসেন্স। গৃহপতি বল্লেন—"আর্যসমাজ ব্রাহ্ম সমাজাদির ক্রিয়াক্রমে আর তাঁর আস্থা নেই। তাদের tenets হচ্ছে—negation of everything, Positive কোন কিছুর আশ্রয় দেয় না গৃহস্থকে।"

মহীশূরে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য অত্যধিক। সেখানে পুরোহিতের মধ্যস্থতায় ছাড়া কোন পূজো হতে পারে—মেয়েরা নিজেই করতে পারেন, তার পরিচয় পাইনি। তাঁরা মন্দিরে যে পূজাদ্রব্য নিয়ে যেতেন তা পুরোহিতের দ্বারা নিবেদিত হত।

প্রত্যেক উৎসবের দিন স্কুলের কোন-না-কোন বড় মেয়ে বা শিক্ষয়িত্রী আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত, হাতে উৎসব-ভোজের কিছু না কিছু নিদর্শন নিয়ে আসত। মাঝে মাঝে তিন চারজনে একত্রে এসে, বীণা সঙ্গে করে এনে আমায় গান ও বাজনা শুনাত। তাদের বীণার ঝঙ্কারের সঙ্গে গাওয়া একটি গান আমার মনে পড়ে—সেটি তেলেগু নয়, হিন্দি—

"সত্যলোকসে নারদ আওয়ে!
নারদ বীণ বাজাওয়ে!
আরে আরে নারদ বীণ বাজাওয়ে!
আরে আরে নারদ বীণ বাজাওয়ে।"

শুধু এই কটি কথা—কিন্তু ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে গেয়ে গেয়ে অফুরন্ত! সত্যলোক থেকে নারদ যে বীণা হাতে করে নামছেন—তাঁর বীণার ঝঙ্কার শুনা যাচ্ছে—একেবারে realistic!

দুই একটি মেয়ে বেহালা বাজাতে পারত। আমিও লরেটোতে প্রফেসর মাঞ্জাতা বলে একজন ইতালীয়ান মাস্টারের কাছে বেহালা শিখতে আরম্ভ করেছিলুম—বি-এ পাশের পরে। ইন্দিরাও তাঁর কাছে শিখতেন, যদিও তিনি অনেক আগে থেকেই সোলাপুরে একজন সাহেবের কাছেই আরম্ভ করেছিলেন। সে য়ুরোপীয় বেহালা বাজানর ধরণে ও মহীশূরী বেহালা বাজানর ধরণে অনেক তফাৎ। য়ুরোপীয় বেহালায় হাত পাকতে সারাটা জীবন যায়। বেহালা যার অঙ্গের অঙ্গী না হয়, চারটে তারের উপর ছড়ি বুলিয়ে বেহালার কাঠখানার থেকে সঙ্গীতের দেবদেবীদের বাইরে বের করে আনা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। কাটাছাঁটা ঠিক ঠিক স্বর বের করা যেতে পারে; কিন্তু প্রাণ থাকে তার বহু দূরে। কিন্তু মহীশূরী বেহালায় চারটি তারের স্বরগ্রাম সাজানর প্রভেদেই দেখলুম বাজনায় প্রাণ ফোটানতে সহজ-সাধ্যতা এসে পড়ে। আর মীড়ে মীড়ে হাত উঁচু-নীচু সরানতেই আমাদের রাগরাগিণীর রূপ একেবারে ফুটে ওঠে—বিলিতি ধরণে বাজানতে তাদের অঙ্গলাবণ্য যেন বিদেশী পোষাকে ঢাকা পড়ে থাকে। এদেশে এ যন্ত্রকে বেহালা বা Violin বলে না, 'Fiddle' বলে। বোধ হয় পর্তুগীজদের কাছে দাক্ষিণীরা এ যন্ত্রটি প্রথম বাজাতে শিখে নিজেদের প্রয়োজনমত তারবাঁধার রকমটি বদলে নিয়েছে ও বীণার তারের মত এতে মীড় ফুটিয়েছে। এখানে মেয়েদের হাতে যখন বেহালা শুনতে থাকলুম একটা ব্যথা বাজতে লাগল কোথায়। এদেশের রুদ্রবীণায় পেলুম গাম্ভীর্য, বেহালায় পেলুম সকরুণতা।

মেয়েরা আমার সঙ্গে কোন্ ভাষায় কথা কইত? ইংরেজিতে—আমি তেলেগু জানিনে, তারা হিন্দি জানে না। তাদের অবাধ ইংরেজি কথোপকথনও একটা বিস্ময় আনলে। শুনেছিলুম মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে সকলেই প্রায় ইংরেজি বলে—সে ছোটলোকী ইংরেজি—নাম তার 'পিজিন ইংলিশ'। এদের শিক্ষিত ইংরেজি। কিন্তু এরই ভিতর মাঝে মাঝে হাস্যরসের সৃষ্টি হ'ত। একদিন আমায় একটি স্কুলের মেয়ে জিজ্ঞেস করলে "আমায় যে uncle পেঁছতে এসেছিলেন, তিনি matricide না patricide?"

ক্রমশ

মেডিক্যাল লাইসেন্‌শিয়েট্‌
জনসেবায় রত

বর্তমান মহাযুদ্ধ প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। জাপানকে পরাজিত করবার এই প্রচেষ্টায় আমাদের অনেক সৈন্য-সামন্ত হতাহত হবার আশঙ্কা আছে। আহতদের জন্য ডাক্তারের চিকিৎসা, পরিচর্যা ও সহানুভূতি একান্ত ভাবে দরকার। সামরিক ডাক্তারেরা আহত সৈন্যদের চিকিৎসা ক'রে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন শান্তি স্থাপিত হলে বেসামরিক প্রয়োজনে তা বিশেষ কার্যকরী হবে। এই কাজের জন্য "ইণ্ডিয়ান আর্মি মেডিক্যাল কোর"এ আজই নাম লেখান। প্রবেশ যোগ্যতা: প্রার্থীদের বয়স সাধারণত: ৪৫ বছরের নিচে এবং স্বাস্থ্য সামরিক কাজের উপযুক্ত হওয়া চাই। এল্‌. সি. পি. এস্‌., এল্‌. এম্‌. এম্‌. এফ্‌., এল্‌. এম্‌. এফ্‌., এল্‌. এম্‌. পি. অথবা সমপর্যায়ের ডিপ্লোমা থাকা চাই।

চাকরির সর্ত

"এ" ক্লাস সার্ভিস: এই কাজে ডাক্তারদের ভারতের বাইরে যেতে হয়, ফলে তাদের অভিজ্ঞতার প্রসারও বেড়ে যায় অনেক। পদোন্নতির সুযোগও প্রচুর। মাইনে সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্টের পদে ৪০০৲ টাকা থেকে শুরু ক'রে পদোন্নতির সঙ্গে বেড়ে লেফটেন্যাণ্ট কর্নেলের পদে ১৩৫০৲ টাকা পর্যন্ত হয়।

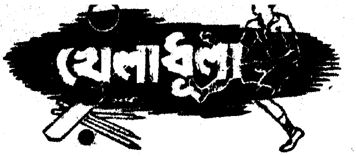
"বি" ক্লাস সার্ভিস: এই কাজে ডাক্তারদের ভারতের মধ্যেই কাজ দেওয়া হয়। চরম উন্নতি ক্যাপ্টেনের পদে। মাইনে সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্টের পদে ২৫০৲ টাকা থেকে শুরু করে ক্রমে ক্যাপ্টেনের পদে ৫৫০৲ টাকা পর্যন্ত হয়।

এলাওয়েন্স (দু' ক্লাসেরই জন্য)

স্পেশ্যালিস্টদের (বিশেষজ্ঞ) মাইনে: যাঁরা স্পেশালিস্ট হিসেবে নিযুক্ত হন তাঁদের নির্দিষ্ট মাইনের উপরে ১০০৲ টাকা বেশি দেওয়া হয়। সামরিক চিকিৎসকদলের কর্তৃত্বপদে নিযুক্ত অফিসারদের মাইনের উপরে ৩০৲ টাকা থেকে ২৫০৲ টাকা পর্যন্ত বেশি দেওয়া হয়। **পোষাক পরিচ্ছদের জন্য** নিয়োগের সঙ্গে ৭৩৩৲ টাকা দেওয়া হয়। **অগ্রিম বেতন:** নিয়োগের প্রথমে ৩০০৲ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়। **গ্র্যাচুইটি:** সমর বিভাগ ছাড়ার পর প্রত্যেক বছরের জন্য এক মাসের নির্দিষ্ট মাইনে হিসেবে টাকা পাওয়া যায়। তা ছাড়া শারীরিক অক্ষমতার জন্য পেন্‌শান্‌, পরিবার ও বিধবা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ এবং সন্তানের শিক্ষায় খরচ সবই চলতি রেগুলেশান্‌ অনুযায়ী পাওয়া যায়। ইণ্ডিয়ান ল্যাণ্ড ফোর্সের অন্যান্য অফিসারদের মতো সেপারেশান্‌ এলাওয়েন্স, ট্রাভেলিং এলাওয়েন্স এবং সীড কম্‌সেশান্‌ও পাওয়া যায়।

বিস্তারিত খবরাখবর নিম্নলিখিত অফিসারদের কাছ থেকে পাবেন: প্রাদেশিক 'মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে'র কর্তাদের কাছে (বেসামরিক হাসপাতালের সার্জন জেনারেল বা ইন্সপেক্টার জেনারেল); ভারতীয় সামরিক হাসপাতালের কর্তাদের কাছে; জি. এইচ. কিউ. নিউ দিল্লীতে "ডিরেক্টার অব মেডিক্যাল সার্ভিসেস্‌"এর কাছে অথবা নিউ দিল্লীতে "ডিরেক্টার জেনারেল, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস"এর কাছে।

Indian Army Medical Corps



কর্নেল সি কে নাইডুর জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে বোম্বাইতে ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে চারিদিনব্যাপী এক বিশেষ ক্রিকেট খেলা হয়। এই খেলায় ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া দলের সাহিত কর্নেল নাইডুর দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া দলের অধিনায়ক হন প্রবীণ ক্রিকেট খেলোয়াড় অধ্যাপক দেওধর ও কর্নেল নাইডু নিজে অপর দলটি পরিচালনা করেন। এই খেলায় কর্নেল নাইডুর দল এক ইনিংস ও ১৬ রাণে পরাজিত হইয়াছেন। এই খেলায় ব্যাটিংয়ের কৃতিত্ব বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। উভয় দলের ছয়জন খেলোয়াড় শতাধিক রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এমন কি ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া দলের চারিজন খেলোয়াড় একই ইনিংসে শতাধিক রাণ করিয়াছেন। ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত আর একটিও ইতিপূর্বে হইয়াছে বলিয়া প্রদর্শন করা সম্ভব হইবে না। বোলিং ও ফিল্ডিং বিশেষ দর্শনযোগ্য হয়। ভারতের প্রায় সকল বিশিষ্ট খেলোয়াড়ই এই খেলায় যোগদান করেন, সুতরাং এইরূপ ফলাফল প্রদর্শিত হওয়ায় আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া প্রথম ইনিংস:—৬৫৪ রাণ (বিনু মানকড় ১২১, বিজয় মার্চেণ্ট ১৩০, বিজয় হাজারী ১৬৮, আর এস কুপার ১২৭ নট আউট, কিষেণচাঁদ ৫০; সি এস নাইডু ২০২ রাণে ৫টি, সি টি সারভাতে ১৪০ রাণে ৩টি ও আর এস মোদী ৫৯ রাণে ২টি উইকেট পান)।

কর্নেল নাইডুর দলের প্রথম ইনিংস:—৩৯৭ রাণ (আর নিম্বলকার ৬৭, মুস্তাক আলী ৮২, গুলমহম্মদ ১১৫, ডি কম্পটন ৩৮, আর এস মোদী ২৪; বিজয় হাজারী ৮৯ রাণে ৩টি, আমীর ইলাহি ১১০ রাণে ৩টি, কিষেণচাঁদ ৬৮ রাণে ৩টি উইকেট পান)।

কর্নেল নাইডুর দলের দ্বিতীয় ইনিংস:—২৪১ রাণ (ডি কম্পটন ১০০, সারভাতে ২৬, আর এস মোদী ৩৪, গুলমহম্মদ ২৮; হাফিজ ৫৮ রাণে ৫টি ও বিজয় হাজারী ২১ রাণে ২টি উইকেট পান)।

ভারতীয় ক্রিকেট দল আগামী ১৮ই মার্চ সিংহল অভিমুখে যাত্রা করিবে। পূর্বে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের মধ্যে কে সি ইব্রাহিম ও জি পার্থসারথী যাইতে পারিবেন না। তাঁহাদের স্থানে এ জি রামসিং ও আর বি নিম্বলকারকে দলভুক্ত করা হইয়াছে। আমীর ইলাহি কেন স্থান পাইলেন না বুঝা গেল না। নিম্নে ভারতীয় দলের প্রথম তালিকা ও খেলোয়াড়দের নাম প্রদত্ত হইল:—

ভারতীয় দল ১৮ই মার্চ মাদ্রাজ হইতে সিংহল অভিমুখে যাত্রা করিবে। ২০শে মার্চ সিংহলে পৌঁছিবে। ২১শে ও ২২শে মার্চ সিংহল ক্রিকেট এসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে খেলিবে। ২৩শে মার্চ সম্মিলিত কলেজ দলের সহিত খেলিবে। ২৪শে মার্চ কলম্বো হইতে গ্যালী যাত্রা করিবে। ২৮শে মার্চ কলম্বো প্রত্যাবর্তন করিবে। ৩০শে, ৩১শে ও ১লা এপ্রিল এই তিনদিন নিখিল সিংহল দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। ২রা এপ্রিল ভারত অভিমুখে যাত্রা করিবে। খেলোয়াড়গণ বিজয় মার্চেণ্ট (অধিনায়ক) আর বি নিম্বলকার, এস ব্যানার্জি, এল অমরনাথ, সি এস নাইডু, সি টি সারভাতে, বিনু মানকড়, আর এস মোদী, মুস্তাক আলী, এ জি রাম সিং, জি কিষেণচাঁদ।

মিঃ এইচ এন কণ্ট্রাক্টর দলের ম্যানেজার হিসাবে দলের সহিত যাইবেন।

হকি

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি খেলা শেষ হইয়াছে। আমরা যেরূপ ধারণা করিয়াছিলাম, বাঙলা দল বিজয়ীর সম্মান লাভ করে নাই। এমন কি ফাইনালে পর্যন্ত উঠিতে সক্ষম হয় নাই। ফাইনালে ভূপাল দলের সহিত যুক্তপ্রদেশ দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। খেলাটি তীব্র প্রতিযোগিতামূলক হয়। ভূপাল শেষ পর্যন্ত এক গোলে জয়লাভ করিয়াছে। নিম্নে পূর্ববর্তী বিজয়ী দলসমূহের নাম প্রদত্ত হইল:—১৯২৮ সাল যুক্তপ্রদেশ, ১৯৩০ সাল—রেলওয়ে দল, ১৯৩২ সাল—পাঞ্জাব দল, ১৯৩৪ সালে কোন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় নাই, ১৯৩৬ সাল—বাঙলা দল, ১৯৩৮ সাল—বাঙলা দল, ১৯৪০ সাল—বোম্বাই দল, ১৯৪২ সাল—দিল্লী দল, ১৯৪৪ সাল—বোম্বাই দল।

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতায় বাঙলা দলকে বার বার অসাফল্য বরণ করিতে দেখিলে সত্যই দুঃখ হয়। বাঙলার হকি পরিচালকগণ কিরূপে নীরবে ইহা সহ্য করেন, বুঝি না। ভবিষ্যতে যাহাতে ইহার পুনরাবৃত্তি না হয়, তাহার ব্যবস্থা কি তাঁহারা করিবেন না? যদি তাহা করিবার তাঁহাদের ইচ্ছা থাকে, তাঁহাদের উচিত এখনই তাহা সকলের সমক্ষে প্রকাশ করা। হকি মরসুম এখনও শেষ হয় নাই। এই সময় প্রকাশিত হইলে তাঁহাদের ব্যবস্থার মধ্যে যদি কোন দোষ-ত্রুটি থাকে, তাহার পরিবর্তন করিবারও সুবিধা পাইবেন। এমন কি আগামী বৎসরে যাহাতে উন্নতির সহায়ক কার্যকরী পন্থা বাঙলার সকল হকি দল গ্রহণ করে, তাহারও ব্যবস্থা হইতে পারে। আমরা আশা করি, বাঙলার হকি পরিচালকগণ সেই সুযোগ গ্রহণে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করিবেন না।

এ্যাথলেটিকস

গত বৎসর কলিকাতার বিভিন্ন মহিলা স্কুল, কলেজ ও ক্লাবের প্রতিনিধিগণ একত্র হইয়া "বেঙ্গল উইমেন্স স্পোর্টস এসোসিয়েশন" গঠন করিলে আমাদের মনে হইয়াছিল, বাঙলা দেশের মহিলা ও বালিকাদের বিভিন্ন স্পোর্টস ও খেলাধূলা পরিচালনায় যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা শীঘ্রই বিদূরিত হইবে। বিশেষ করিয়া পুরুষ পরিচালিত স্পোর্টস বা খেলাধূলা অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে যে সকল মহিলা ও বালিকার আপত্তি আছে, তাঁহারা বিনা দ্বিধায় যোগদান করিবেন। কিন্তু বর্তমানে একই নামে দুইটি এসোসিয়েশন গঠিত হইতে দেখিয়া আমরা বিশেষ হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। দ্বিতীয় যে এসোসিয়েশনটি গঠিত হইয়াছে, তাহার পরিচালকমণ্ডলীর তালিকা দেখিলে দেখা যাইবে, অধিকাংশই পুরুষ এবং পূর্বগঠিত এসোসিয়েশনের ন্যায় বিভিন্ন ক্লাব, স্কুল ও কলেজের মহিলা প্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত নহে। দ্বিতীয় এসোসিয়েশনের স্পোর্টস সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেই অনুষ্ঠানে অধিকসংখ্যায় বৈদেশিক বালিকা ও মহিলাগণকে যোগদান প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে অনুরূপ দৃশ্য দেখিতে হইয়াছিল। অথচ প্রথম গঠিত এসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানে শতাধিক বাঙালী বালিকা ও মহিলা যোগদান করে এবং দর্শক হিসাবে প্রায় সহস্রাধিক বাঙালী বালিকা ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের স্পোর্টস শীঘ্রই ক্যালকাটা মাঠে অনুষ্ঠিত হইবে। গত বৎসরের ন্যায় শত শত বাঙালী বালিকা ও মহিলা এ্যাথলীটকে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে দেখিব বলিয়াই মনে হয়। জানি না, আমাদের এই উক্তি সত্য হইবে কি না। তবে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত স্পোর্টসের তুলনায় অধিকসংখ্যক বাঙালী মহিলা এ্যাথলীটকে একত্র হইতে দেখিব, ইহা জোর করিয়াই বলিতে পারি। কারণ আমরা জানি, উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি হিসাবে যাঁহারা যোগদান করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই কোন না কোন ক্লাব, স্কুল বা কলেজের ব্যায়াম পরিচালিকা। যাহা সত্য, তাহাই প্রকাশ করা হইল, কোন পক্ষের মুখপত্র হিসাবে ইহা লিখিত হয় নাই। বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ বাঙলার সর্বশ্রেণীর, সর্বপ্রকারের স্পোর্টসের উন্নতির জন্য কিরূপ ব্যস্ত, তাহারই নিদর্শন হিসাবে ইহা প্রকাশ করা হইল। এক বৎসর হইল এই দুইটি এসোসিয়েশন গঠিত হইয়াছে। দুইটিই অলিম্পিকের অন্তর্ভুক্ত হইবার আবেদন করে। প্রথমটি অনুমোদন লাভ করে নাই, দ্বিতীয়টি করিয়াছে। প্রথমটি ইহার জন্য প্রতিবাদ করে। কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করে, কিন্তু এই পর্যন্ত পরিচালকগণ দুইটি মিলাইয়া একটি করিবার চেষ্টা করেন নাই। ফলে হইয়াছে এই বিভিন্ন ক্লাব, স্কুল, কলেজ প্রভৃতির কর্তৃপক্ষগণ দ্বন্দ্বের মাঝে নিশ্চিন্ত মনে বালিকা ও মহিলা এ্যাথলীটদের যোগদান করিতে অনুমতি দিতে পারিতেছেন না। এইজন্যই মহিলা এসোসিয়েশন গঠিত হওয়া সত্ত্বেও মহিলা বা বালিকাগণের মধ্যে স্পোর্টস ও খেলাধূলার বিপুল উৎসাহ জাগে নাই।

"দেশ"-এর নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১৩, ষাণ্মাসিক—৬॥

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপ:—

সাধারণ পৃষ্ঠা—এক বৎসরের চুক্তিতে
১০০" ও তদূর্দ্ধে ... ৩, প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার
৫০"—৯৯" ... ৩॥০ " " " "

সাময়িক বিজ্ঞাপন
৪, টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জানা যাইবে।

সম্পাদক—"দেশ"
১নং বর্ম্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

সমরপ্রসঙ্গ

ইউরোপের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় রণাঙ্গনেই মিত্রপক্ষের অগ্রগতি এখন মন্থর। জার্মানদের প্রবলতর প্রতিরোধই এর কারণ। কিন্তু এই মন্থরতা সত্ত্বেও জার্মানীর খুব গুরুত্বপূর্ণ অনেক শহর ও স্থান ক্রমশ মিত্রপক্ষের হস্তগত হচ্ছে। পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষ কলোন অধিকার করেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। কলোন জার্মানীর একটি খুব প্রসিদ্ধ শহর। সামরিক দিক থেকেও এর গুরুত্ব খুব বেশি। আর এমন অনুকূল পরিমণ্ডলের মধ্যে কলোনের অবস্থান যে, তাতে স্বভাবতই এই শহরটি শিল্প-বাণিজ্যের একটা বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। কলোনে প্রস্তুত 'ও-ডি-কলোন' নামক সুগন্ধির কল্যাণে ভারতবর্ষের খুব সাধারণ লোকেরও কলোনের নামের সঙ্গে পরিচয় আছে। কলোনে তৈরি মোটরের সঙ্গেও এদেশের অল্প-বিস্তর লোকের চাক্ষুষ পরিচয় ঘটেছে। কিন্তু এই দুটো জিনিস ছাড়া, কার্পাস ও পশমী বস্ত্রাদি, চিনি, মদ, সাবান, নানা প্রকারের যন্ত্রাদি যুদ্ধপূর্বে কলোনে তৈরি হতো। নিকটেই কয়লা ও লোহখনি থাকাতে এই শহরকে একটা বড় শিল্পকেন্দ্র-রূপে গড়ে তুলতে খুব সুবিধা হয়েছে। কলোন রাইন নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। রাইন পশ্চিম ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-নদী। রাইন নদী জার্মানী থেকে বেরিয়ে হল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে গিয়ে উত্তর সাগরে পড়েছে। কাজেই, কলোন স্বভাবতই সমুদ্র-বাণিজ্য ও আভ্যন্তর বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল। এ ছাড়া কলোন রেলপথেরও একটা বড় কেন্দ্র। এই শহর হস্তচ্যুত হওয়াতে যে জার্মানীর একটা বড় রকমের ক্ষতি হ'ল, তা কোন রকমেই অস্বীকার করা চলে না। কোন সুইডিশ সাংবাদিকের কাছ থেকে সংগ্রহ-করা রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ, হের ফন রিবেনট্রপ বলেছেন যে, জার্মান বাহিনী যথাসর্বস্ব পণ করে রাইন রণাঙ্গন রক্ষা করবে। তিনি নাকি আরও বলেছেন যে, তাঁদের যদি যুদ্ধে পরাজয় অনিবার্যই হয়, তাহ'লে তাঁরা স্টালিনের নিকট পরাজয় স্বীকার করে তাঁকেই সমগ্র জার্মানী অধিকার করতে দেবেন। এই-ভাবে তাঁরা ব্রিটেনকে জব্দ করবেন ও তার সাম্রাজ্যবাদী নীতি ব্যর্থ করে দেবেন। রিবেনট্রপের এ উক্তি যে রাজনীতির আর একটা খেলা, লাল জুজুর ভয় দেখিয়ে পুঁজিবাদী মনকে বাগে আনবার আর একটা প্রচেষ্টা, তা বলা বাহুল্যমাত্র। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার পর থেকেই জার্মানী এ খেলা খেলে আসছে। জার্মানী যখন সমরশক্তিতে সমৃদ্ধত, পৃথিবীর ত্রাস, তখনই যখন তার এ চাল সফল হয়নি, তখন পতনোন্মুখ জার্মানীর এ কূটনীতি সফল হবে বলে মনে হয় না।

পূর্ব রণাঙ্গনেও রুশবাহিনীর সাফল্য সামরিক গুরুত্বের দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মার্শাল স্টালিন ঘোষণা করেছেন যে, মার্শাল জুকভের সৈন্যেরা জার্মান রক্ষাব্যূহ ভেদ করে বাল্টিক সাগরের তীরে কোলবের্গ অঞ্চলে পৌঁছেছে। আর এদিকে মার্শাল রকোশভস্কির সৈন্যদলও যুগপৎ বাল্টিক সাগরের তীরে উপস্থিত হয়ে কোয়েসলিন অধিকার করেছে। এই দুই সৈন্যদলের মধ্যে দূরত্ব এখন মাত্র ৩০ মাইল। কোলবের্গ বাল্টিক সাগরের তীরে একটি বন্দর। ওডার নদীর তীরবর্তী স্টেটিন শহর থেকে কোলবের্গ ৬৫ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। কোয়েসলিনও বাল্টিক উপকূল অঞ্চলে একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর, ডানজিগ থেকে স্টেটিনের পথে একটি সুরক্ষিত ঘাঁটি। এছাড়া স্টেটিন থেকে রেল-পথে ২২ মাইল পূর্বে অবস্থিত স্টারগার্ড, স্টেটিনের ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত পিরিৎস এবং নয়স্টেটিনের পশ্চিমে অবস্থিত পোলৎসিন শহরও লালফৌজ দখল করেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। এর ফলে ওডার নদীর তীরে অবস্থিত জার্মানীর প্রসিদ্ধ বন্দর স্টেটিন ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এসোসিয়েটেড প্রেস অব্ আমেরিকা'র সংবাদে প্রকাশ, মার্শাল জুকভ ও মার্শাল রকোশভস্কির সেনাবাহিনী হঠাৎ বাল্টিক সাগরের তীরে গিয়ে পৌঁছানোর ফলে দুটো জার্মান বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই দুটো বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা নাকি হবে প্রায় দু'লক্ষ।

ইউরোপের যুদ্ধ সম্বন্ধে সম্প্রতি হিটলার ও গোয়েবলস্ তাঁদের বক্তৃতায় যেসব মন্তব্য করেছেন, তা এখানে উল্লেখযোগ্য। গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী মিউনিকে হিটলারের এক বক্তৃতা পঠিত হয়। তিনি তাতে জার্মানীর আক্রমণ-শক্তির বদলে প্রবল প্রতিরোধশক্তিরই প্রশংসা করেন এবং বলেন, নাৎসীবাদের সহায়তায়ই জার্মানদের এই দৃঢ় মনোবল ও প্রবল প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়েছে। এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমরা জয়লাভ করবো। যে পর্যন্ত না উল্লেখযোগ্যভাবে যুদ্ধের মোড় ফিরে, ততদিন পর্যন্ত নাৎসী জার্মানী যুদ্ধ চালাবে। যুদ্ধের মোড় এই বৎসরেই ফিরবে। পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাদের হৃদয়ে দুর্বলতার সঞ্চার করতে পারবে না।"

জার্মাণ প্রচার সচিব ডাঃ গোয়েবলস্ বক্তৃতা করেছেন গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার। তিনি বলে-ছেন,—"আমাদের অবস্থা চূড়ান্তভাবে আশংকাজনক হয়ে উঠেছে; কিন্তু নিরাশ হওয়ার মত কিছু হয়নি।......আমরা আবার আমাদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করবো।" তিনি আরও বলেন,—"আমাদের লোকেরা আজ চরম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলেছে। তারা যে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।" ডাঃ গোয়েবলস্ বক্তৃতা প্রসঙ্গে এও বলেছেন যে, জার্মানরা যদি পরাজিতই হয়, তবে জার্মান নেতারা সম্মানজনক মৃত্যুবরণ করবে।' তিনি ইংলণ্ডকে বিমান আক্রমণ, ভি—২র আক্রমণ, ইউ-বোটের ক্রমবর্ধমান আক্রমণের কথা বলে ভয় দেখিয়েছেন।

হিটলার ও গোয়েবলস্ এই উভয়ের বক্তৃতা থেকেই বোঝা যায় জার্মানীর অবস্থা কত সঙ্কটজনক এবং জার্মানীর বিপদ কত বেশি। তবু যে তাঁরা পুনঃ পুনঃ পরিণামে জয়লাভের কথা বলছেন তা' যে জার্মানদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যেই বলা হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। যুদ্ধ করে জয়লাভের স্বপ্নও এখন জার্মানীর পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। শত্রু-বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণের হাত থেকে জার্মানী যদি এখন আত্মরক্ষা করতে পারে তা হলেই জার্মান নেতারা জার্মান জনগণকে জোর গলায় বলতে পারবেন যে তাঁরা জয়লাভ করেছেন—শত্রুর আক্রমণ তাঁদের পরাজিত করতে পারেনি। জার্মানীর সমস্ত প্রতিরোধ এখন শত্রুর কাছে আত্ম-সমর্পণের বিপদ থেকে বাঁচবার জন্য। তার এ আশা হওয়া স্বাভাবিক যে, তার প্রতিরোধ ক্ষমতা যদি এত বেশি হয় যে, সমগ্র জার্মানীকে দখল করতে মিত্রপক্ষকে যে মূল্য দিতে হবে, তাঁরা তা দিতে প্রস্তুত নন তা হলে জার্মাণীর সঙ্গে একটা আপোষ রফা করতে বাধ্য হয়েই তাঁদের রাজী হতে হবে। তা হলেই জার্মানী বর্তমান অবস্থায় একে নিজের জয় বলেই মনে করবে। এই যদি জার্মানীর মনোগত উদ্দেশ্য হয় তা হলে একদিকে সে যেমন প্রবল প্রতিরোধ চালাবে অন্যদিকে তেমনি সে বিপুল ধ্বংসাত্মক কার্যে মন দিবে।

বিমান, ইউবোট ও ভি-২র আক্রমণ যে ইতিমধ্যেই খুব বৃদ্ধি পেয়েছে তার সংবাদ পাওয়া গেছে। গোয়েবলস্ এসবের আক্রমণের তীব্রতা আরও বেড়ে চলবে বলে হুমকি দিয়েছেন। হিটলার নূতন নূতন ধ্বংসাত্মক অস্ত্র তৈরীর কথা তাঁর বক্তৃতার মারফত জানিয়ে দিয়েছেন। হিটলার বিষ-বাষ্প ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত আছেন এরূপ গুজবও সংবাদের মারফত জানা গেছে। কাজেই মিত্রপক্ষকে আপোষ রফায় বাধ্য করার একটি আশা জার্মানীর মনে কাজ করছে বলেই মনে হয়। অবশ্য জার্মানীর সে আশা সফল হওয়ার কোন সম্ভাবনাই বর্তমানে দেখা যাচ্ছে না।

—বিষ্ণু গুপ্ত

গঙ্গোত্রী

সুবোধ ঘোষ

(১৮)

হেডমাস্টার দিননাথ বিশ্বাস গাঁয়ে ফিরে এসেছে। বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ভূদেব চাটুয্যেও এসেছে। আজ সকাল থেকে গাঁয়ের বাতাসে একটা গোপন ঘটনার আভাষ যেন অস্ফুট শব্দে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। মান্দার গাঁয়ের অন্তকরণও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। নতুন একটা ঘটনার আক্রমণের স্পর্শ পেয়েও সাড়া দিতে পারছিল না। হঠাৎ একটু হতভম্ব ও একটু বিমূঢ় হয়ে গেছে মান্দার গাঁ। দিঘীর ঘাটের ধারে মাঠের ওপর অনেকগুলি উর্দিপরা মূর্তি দেখা যায়। মীরগঞ্জ থেকে পুলিশদল এসেছে। এখানে দাঁড়িয়ে দূর জেলা বোর্ডের সড়কের দিকে তাকালে দেখা যায়, একটি মোটরগাড়ী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। গাঁয়ের শান্ত মনের দুয়ারে আজকের ভোরেই যেন একটা রঙীন বাঘ থাবা পেতে বসে আছে। মোটরগাড়ীর রঙচঙে মূর্তিটা সকালবেলার রোদে চক্ চক্ করছিল। সদরে যাদের আনাগোনা আছে, দিঘীর ঘাটে প্রাতঃস্নান সারতে এসে তারাই সবার আগে এই গাড়ীটিকে চিনেছে—খুব সম্ভব এস ডি ও সাহেবের গাড়ী।

ইউনিয়ন বোর্ড অফিসের মাথায় একটা বিবর্ণ ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছিল। গাঁয়ের তিনটি পথের মোড়ে লেঠেল পুলিশের ছোট ছোট এক একটি দল দাঁড়িয়েছিল। বোর্ড অফিসের বারান্দায় একটা কম্বলের ওপর একটা প্রকাণ্ড দড়ির বাণ্ডিল, গোটা পঞ্চাশ হাতকড়া এবং একটা তুলো-ব্যাণ্ডেজের ফার্স্ট-এড বাক্স পড়েছিল। পুলিশ ফৌজের লোকেরা মাঠের ঘাসের ওপর শরীর এলিয়ে শুয়েছিল। সঙীন লাগানো বন্দুকগুলি একসঙ্গে তিন-চারটি করে চূড়োবাঁধা হয়ে মাটির ওপর দাঁড় করানো ছিল।

* কালকের আর আজকের সকালে কত প্রভেদ! আজ সারা মান্দার গাঁ এখনো নিঃশব্দে ঘুমোচ্ছে। সারা গ্রামের হর্ষ যেন আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে। নিত্যদিনের মত জাগরণের নিয়ম ভুলে গেছে সবাই। হঠাৎ মনে হতে পারে, মান্দার গাঁ ভয় পেয়ে গেছে। এই আক্রমণের জন্য যেন প্রস্তুত ছিল না মান্দার গাঁ।

না, তা নয়। মধ্যরাত্রির অন্ধকারের মধ্যেই সারা গাঁয়ের কাণে কাণে এই খবর পৌঁছে গিয়েছিল। দিঘীর ঘাটের মাঠে কড়া বুটের শব্দের প্রথম আগমনের বার্তা সবাই জানে। প্রতি ঘুমন্ত ঘরের কাণে কাণে রতন চৌকীদার এই খবর জানিয়ে দিয়েছে। উর্দিহীন রতন চৌকীদার জীবনে এই প্রথম নতুন ধরণের পাহারা দিয়েছে। এই তো সেই রতন যে চিরকাল পুলিশ ফৌজের আগে আগে পথ দেখিয়ে এসেছে, গাঁয়ের হৃৎপিণ্ডকে সদরের হাতের মুঠোয় তুলে দিয়েছে। আজ সব চেয়ে বেশী সতর্ক ও সশঙ্ক হয়ে আছে রতন। সারারাত ঘুমোতে পারেনি রতন। শুধু মান্দার গাঁ নয়, রাত্রির অন্ধকারে দৌড়ে দৌড়ে গফুরাবাদ পর্যন্ত চলে গেছে রতন। কারও জানতে বাকি নেই, এ বার চরম বোঝাপড়ার লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে নিকটে। সদর থেকে দণ্ডধরের আবির্ভাব হয়ে গেছে গাঁয়ের মাটীতে। চরম কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

এস-ডি-ও রায় সাহেব কে কে বাসুও প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। মান্দার গাঁয়ের বিদ্রোহী আত্মাকে স্তব্ধ না করে তিনি ফিরবেন না। কিন্তু ক্রমেই বেলা বাড়ছিল। ছটফট করছিলেন কে কে বাসু। মাঝরাত্রি থেকে একটা রণক্ষেত্র প্রস্তুত করে অপেক্ষায় বসে আছেন। কিন্তু শত্রুর দেখা নেই।

ঠিক মধ্যাহ্নে মান্দার গাঁয়ের পথের মোড়ে মোড়ে ঢোল বাজতে আরম্ভ করলো। এস-ডি-ও সাহেবের ঘোষণা চেঁচিয়ে শোনানো হলো—সমস্ত গ্রামের লোককে এই মুহূর্তে অর্ডার করা হলো, যেন প্রত্যেকে বিকেলের মধ্যে এসে ইউনিয়ন বোর্ড অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে সরকারী পতাকাকে সেলাম জানিয়ে যায়, নচেৎ......।

ঢোলওয়ালা পুলিশ জোরে চেঁচিয়ে একটা ফিরিস্তি পড়ে শোনাচ্ছিল—যাদের এই সেলামবাজীর কষ্ট থেকে রেহাই দেওয়া হলো। যারা পর্দানশীন স্ত্রীলোক, তাদের আসবার দরকার নেই। যারা দুধ-খেকো শিশু, তাদের আসবার দরকার নেই। যারা সরকার পক্ষের লোক তাদের আসবার দরকার নেই।

কে কে বাসু আর একটা ফর্দ তৈরি করে দিয়েছেন—কারা সরকার পক্ষের লোক। ঢোলওয়ালা পুলিস সারা গাঁয়ের পাড়া-পাড়া ঘুরে জানিয়ে দিয়ে গেল, সরকার পক্ষের লোকদের, গরহাজিরা মাপ করা হলো। বোর্ডের যারা মেম্বার আছে, তাঁদের আসতে হবে না। হেডমাস্টার দিননাথ বিশ্বাস ও তাঁর বাড়ির কাউকে আসতে হবে না, প্রেসিডেন্ট ভূদেব চাটুয্যে ও তাঁর বাড়ির কোন লোককে আসতে হবে না। আর যাদের দাগীর খাতায় নাম আছে, তাদের কাউকে না আসলেও চলবে। এ ছাড়া যারা আছ, সবাই অবিলম্বে চলে এস, সরকারী পতাকাকে সেলাম জানিয়ে যাও, নইলে......।

এস-ডি-ও কে কে বাসু শুধু একজনকে গ্রেপ্তার করতে চায়, রতনকে। গ্রামের আর সবারই কসুর তিনি মাপ করে দেবেন। ঢোলওয়ালা পুলিশ বার বার নিঝুম মান্দার গাঁয়ের ঘরে ঘরে বার্তা শুনিয়ে গেল।

এক একটি মুহূর্ত গুণতে গুণতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন কে কে বাসু। পুলিশেরা গাছের ছায়ার নীচে ঘুমোচ্ছিল। গাঁজার দোকানের শীর্ণ বারান্দার এক কোণে টুলের ওপর বসে কে কে বাসু এক একবার চমকে উঠছিলেন, চারদিকের নিস্তব্ধতায়। বিকেল হয়ে আসছে, তবু কোন অনুতপ্ত ক্ষমাপ্রার্থী বিদ্রোহীর দেখা নেই। দিঘীর ঘাটের পথে একটা ছায়ার সাড়াও দেখতে পাওয়া যায় না। রতনকে যারা গ্রেপ্তার করতে গিয়েছে তারাও এখনো ফিরলো না।

পুলিশ ইনস্পেক্টরকে কাছে ডেকে একবার পরামর্শ করলেন কে কে বাসু। কিছুক্ষণ পরে আবার গাঁয়ের পথে নতুন নির্দেশ ঢোলের সংগে বেজে উঠলো—যারা সরকারের পক্ষে আছে, যারা হাঙ্গামার বিরুদ্ধে, তাদের সবাইকে বোর্ড অফিসের প্রাঙ্গণে জমা হতে হবে। শান্তি সভা! শান্তি সভা! এস-ডি-ও কে কে বাসু সবাইকে ডাকছেন!

বিকেল হয়ে মান্দার গাঁয়ের গাছের ছায়া পূবদিকে লুটিয়ে পড়ছিল। মাঠ

রাওার দল দিঘীর জলের ওপর ঝাঁপ ক্ষান্ত করে গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়ছিল। একটি একটি করে সরকার পক্ষের লোকেরা এসে বোর্ড অফিসের আঙিনায় ভীড় করছিল। হেডমাস্টার দিনমণি বিশ্বেস সপরিবারে এসেছেন, দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরও তিনি সংগে নিয়ে এসেছেন। ভূদেব চাটুয্যের বাড়ির সবাই এসে পেঁছে গেছে। আরও অনেকে আসছে একে একে—দাগী চন্ডী তেলি, রহিম বেদে, ভজু বাউরী......।

কে কে বাসু বিমর্ষভাবে বললেন—সরকার পক্ষে মাত্র এই কজন? আর যোগাড় করতে পারেন না?

ইন্সপেক্টর বললেন—হ্যাঁ, আরও দুএকজন হতে পারে, তার বেশী নয়।

কে কে বাসু বললেন—শীগ্‌গির করুন।

ইন্সপেক্টর তাঁর হাতের ফাইল একবার ঘাটাঘাটি করলেন। একজন কনস্টেবলকে বললেন—দাগী গোবিন্দ কুর্‌মিকে ডেকে নিয়ে এস।

জনতার মাঝখান থেকে ভজু উত্তর দিল—গোবিন্দ বুড়ো আসতে পারবে না হুজুর। উহার চলবার ক্ষমতা নাই। আজই মরবে।

ইন্সপেক্টর—কি হয়েছে?

ভজু—বুড়া দুদিন হতে রক্ত বমি করছে।

ইন্সপেক্টর একটু বিব্রতভাবে তাকালেন কে কে বাসুর দিকে। কে কে বাসু সত্যিই মুসড়ে পড়ছিলেন। সমস্ত ঘটনাটা যেন কি একটা ধূর্ত কৌশলে তাঁর সকল আয়োজনের সাগ্রহ নিষ্ঠাকে ফাঁকি দিয়ে ধরাছোঁয়ার বাইরে সরে রয়েছে। যুদ্ধে মার খেয়ে পরাজয়ের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে সদরে ফিরে যাওয়া বরং ঢের বেশি কাম্য, তাতে মর্যাদার হানি নেই, পদ ও খেতাব তাতে বাড়বে বই কমবে না। কিন্তু এভাবে শুধু নিছক প্রতীক্ষায় একেবারে বাতিল হয়ে গেলে, তাঁর ভবিষ্যৎ কোন্ অন্ধকারে দিশাহারা হয়ে যাবে, কিছুই বুঝতে পারেন না তিনি, তাই হঠাৎ চারদিকের নিস্তব্ধতায় চমকে ওঠেন।

ইন্সপেক্টরের দিকে একটু অসহায়ভাবে তাকালেন কে কে বাসু।

—মাত্র এই কয়টি মানুষ দিয়ে শান্তি সভা হয় না। সদরে ফিরে গিয়ে কি রিপোর্ট দেব বলুন? অন্ততঃ আরও কিছু লোক চাই।

ইন্সপেক্টর কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে দুজন কনস্টেবলকে নির্দেশ জানালেন—যাও, গোবিন্দ কুর্‌মিকে কাঁধে তুলে নিয়ে এস। নিয়ে আসতেই হবে।

কনস্টেবল দুজন চলে যাবার পর জনতার মধ্যে ভজু আবার উস্‌খুস করতে লাগলো। কি যেন একটা কথা তার বলবার আছে। ইন্সপেক্টর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই ভজু বললো—আর একজন নতুন দাগী আছে হুজুর, তাকে খবর দিলেই আসতো।

ইন্সপেক্টর—কে?

ভজু—ভট্‌চায্‌দের ছেলে, কেশব ভটচায্‌, হালে খালাস পেয়ে গাঁয়ে এসে রয়েছে।

ইন্সপেক্টর একজন কনস্টেবলের দিকে তাকালেন। নির্দেশ দিলেন—যাও কেশব ভট্‌চাযকে ডেকে নিয়ে এস। (ক্রমশ)

পুস্তক পরিচয়

অঞ্জলি—একাঙ্ক নাটিকা; শ্রীকৃষ্ণগোপাল দত্ত প্রণীত। মূল্য আট আনা। প্রকাশক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, জয়নগর, ২৪ পরগণা।

এই একাঙ্ক নাটিকাখানা আমাদের ভাল লাগিয়াছে। লেখক ভাবকে আনন্দঘন লীলার দ্যোতনায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। এই-খানেই লেখার সার্থকতা রহিয়াছে।

ধর্মপদ—ভিক্ষু শীলভদ্র প্রণীত। মূল্য আট আনা মাত্র। প্রকাশক—মহাবোধি সোসাইটি, ৪এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ধর্মপদের পরিচয় অনাবশ্যক। বৌদ্ধজগতে এই গ্রন্থ গীতার মত উচ্চে। কিন্তু শুধু বৌদ্ধদের জনাই নয়, সমগ্র মানব সংস্কৃতির পক্ষে এই গ্রন্থ অমূল্য সম্পদস্বরূপ। ভিক্ষু শীলভদ্রের অনুবাদ সরল এবং সহজবোধ্য। তাঁহার এই অনুবাদে বৌদ্ধধর্মের মূল সূত্রগুলির সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এত সুলভ মূল্যে এ অমূল্য গ্রন্থের প্রচার বাঙলার ঘরে ঘরে হওয়া প্রয়োজন।

হ্যান্ড মেড পেপার (ইংরেজী)—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত। মূল্য আড়াই টাকা। প্রাপ্তিস্থান—খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

বর্তমানে কাগজের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। দেশী কাগজশিল্পের ব্যবসা মিলের কাগজের প্রচলনে বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেই হয়; কিন্তু দেশী এই শিল্পটি যদি বিলুপ্ত না হইত, তবে কাগজের সঙ্কট এতটা গুরুতর আকারে দেখা দিত না। দেশের কুটীর শিল্পের উজ্জীবনে সতীশবাবু অক্লান্তকর্মী। দেশপ্রাণ এই ত্যাগী সাধক এ ব্রতে তাঁহার জীবনকে সমগ্রভাবে উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত আলোচ্য গ্রন্থখানিতে বোধ হয় খাদি প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে যে প্রণালীতে কাগজ প্রস্তুত করা হইতেছে তাহার প্রকরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধারণত ছেঁড়া কাগজই দেশী কাগজ তৈয়ারীর প্রধান উপকরণ স্বরূপে ব্যবহার করা হয়। খড় বাঁশ প্রভৃতি উপরণের সাহায্যে কি ভাবে কাগজের মণ্ড প্রস্তুত করা সম্ভব হইতে পারে, শিক্ষার্থিগণ আলোচ্য পুস্তক হইতে তৎসম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। সতীশবাবুর প্রদর্শিত এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন স্থানের শিক্ষার্থীরা কাগজ প্রস্তুত করা শিখিতেছেন। কাগজের এই দুষ্প্রাপ্যতার দিনে হস্তে তৈয়ারী কাগজ সম্বন্ধে যাঁহারা আগ্রহশীল এবং যাঁহারা প্রস্তুত-প্রকরণ শিক্ষা করিতে চাহেন, এই পুস্তক তাঁহাদের প্রয়োজন সাধন করিবে। আমরা এ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

আচ্ছা বলুন তো?

১। গরম জল আগে জমবে, না ঠাণ্ডা জল আগে জমে' যাবে?

২। আপনি পাঁচ মিনিটের জন্যে যদি বৃষ্টিতে বেরোন, তাহ'লে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেই বেশী ভিজ্‌বেন, না হাঁটলে অথবা ছুটলেই অপেক্ষাকৃত বেশী ভিজ্‌বেন?

৩। ভয়ে মানুষের মুখ শাদা হ'য়ে যায় কেন?

৪। ছাদের গায়ে মাছি বস্‌লে তার পাগুলি থাকে উপরের দিকে, আর শরীরটা থাকে নীচের দিকে ঝুলে; এমন অবস্থায় মাছি নীচের দিকে পড়ে যায় না কেন?

৫। বৈদ্যুতিক তারের উপর বস্‌লে পাখি কেন তাড়িতাহত হয় না?

৬। ঘোড়া আর মানুষের মধ্যে কে বেশী ছুট্‌তে পারে?

৭। আপনার জনের মধ্যে কেউ হাঁচ্‌লে আমাদের দেশে "জীবতু" এবং ইউরোপে "God bless you"—বলার রীতি আছে। এর কারণ কি?

(উত্তর আগামী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)

সাহিত্য সংবাদ

বেহালা যুব-সম্প্রদায়
অনুষ্ঠিত

সত্যেন্দ্র স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতা

আগামী ১৬।৩।৪৫ তারিখের মধ্যে ফুলস্কেপ চার পৃষ্ঠার মধ্যে বাঙলায় লিখিয়া নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। মনোনীত রচনার লেখক-লেখিকাদিগকে একটি করিয়া রৌপ্য-পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

বিষয়ঃ—১। "গৃহকর্ম" (স্কুলের ছাত্রীদের জন্য), ২। "শিল্প" (স্কুলের ছাত্রদের জন্য), ৩। "সমাজ গঠনে নারী" (কলেজের ছাত্রীদের জন্য), ৪। "আধুনিক সভ্যতা (কলেজের ছাত্রদের জন্য)।

সম্পাদক, সাহিত্য বিভাগ: "যুব-সম্প্রদায়", রায় বাহাদুর রোড, বেহালা, দক্ষিণ কলিকাতা।

শ্রেষ্ঠত্বের নির্বাচন

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘ প্রত্যেক-বার শ্রেষ্ঠত্বের যে বিচার করেন, এ বছরে তার ফল দাঁড়িয়েছে : **ভারতীয় শ্রেষ্ঠ প্রথম দশখানি ছবি**—(১) রামশাস্ত্রী, ১৬২ পয়েণ্ট; (২) উদয়ের পথে, ১৫৯; (৩) শকুন্তলা ১১৩; (৪) ওয়াপস, ৮৫; (৫) সন্ধি ৭৫; (৬) পরখ ৬১; (৭) দাসী ও (৮) ফ্যাশন, ৪২; (৯) ছদ্মবেশী, ৩৮; (১০) জমীন, ৩২। **বিদেশী শ্রেষ্ঠ প্রথম দশখানি ছবি**—(১) সং অফ্ বার্নাডেট, ১০৯; (২) ম্যাদাম কুরী, ৮৮; (৩) সিন্স ইউ ওয়েণ্ট এওয়ে, ৮১; (৪) ফর হুম দি বেল টোল্স, ৭৪; (৫) ইট হ্যাপ্‌ন্ড ট্যু-মরো, ৪৫; (৬) কনস্‌ট্যাণ্ট নিম্ফ, ৩৫; (৭) গোইং মাই ওয়ে, ৩৪; (৮) মিশন ট্যু মস্কো, ২৯; (৯) হেভেন ক্যান ওয়েট, ২৬; (১০) জেন আয়ার ও নর্থস্টার, ২৫।

বাঙলায়—শ্রেষ্ঠ পরিচালনা : বিমল রায় (উদয়ের পথে); শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য : জ্যোতির্ময় রায় (উদয়ের পথে); শ্রেষ্ঠ আলোক-চিত্র বিমল রায় (উদয়ের পথে); শব্দযোজনা : অতুল চট্টোপাধ্যায় (উদয়ের পথে); সুর-যোজনা : অনিল বাগচী (সন্ধি); দৃশ্য-সজ্জা : সৌরেন সেন (উদয়ের পথে); অভিনেতা : রাধামোহন (উদয়ের পথে); অভিনেত্রী : সুমিত্রা (সন্ধি); পার্শ্ব-চরিত্রে : বিশ্বনাথ ভাদুড়ী (উদয়ের পথে) ও রেখা মিত্র (উদয়ের পথে); সংলাপ : জ্যোতির্ময় রায় (উদয়ের পথে); গান : শৈলেন রায় (উদয়ের পথে) ও প্রেমেন মিত্র (প্রতিকার)।

হিন্দীতে—শ্রেষ্ঠ পরিচালনা : জাগীরদার (রামশাস্ত্রী); চিত্রনাট্য : আঠবেলে (রামশাস্ত্রী); আলোকচিত্র : সুধীন মজুম-দার (ওয়াপস); শব্দযোজনা : পারমার (শকুন্তলা); সুরযোজনা : রাই বড়াল (ওয়াপস); দৃশ্যসজ্জা : বাল গজবর (শকুন্তলা); অভিনেতা : জাগীরদার (রামশাস্ত্রী); অভিনেত্রী : মেহতাব (পরখ); পার্শ্বচরিত্রে : শা নওয়াজ (হামারী বাত); অনন্ত মারাঠে (রামশাস্ত্রী) ও কমলা চ্যাটার্জী (শঙ্কর পার্বতী); সংলাপ : ভগবতীচরণ বর্মা (হামারী বাত); গান : নরেন্দ্র (জোয়ার ভাঁটা)।

ইংরাজীতে—পরিচালনা : লিও ম্যাকারে (গোইং মাই ওয়ে); অভিনেতা : রবার্ট ওয়াকার (সিন্স ইউ ওয়েণ্ট এওয়ে); অভিনেত্রী : জেনিফার জোন্স (সং অফ্ বার্নাডেট)।

নূতন ছবির পরিচয়

কাশীনাথ (নিউ থিয়েটার্স)—কাহিনী : শরৎচন্দ্র; পরিচালনা : নীতিন বসু; শব্দযোজনা : মুকুল বসু; সুর-যোজনা : পঙ্কজ মল্লিক; ভূমিকায় : অসিতবরণ, দীপক বসু, নবাব, নিমো, সুনন্দা, ভারতী, রাজলক্ষ্মী, বুদ্ধদেব, লতিকা প্রভৃতি।

ছবিখানি ক্যালকাটা ফিল্ম এক্সচেঞ্জের পরিবেশনে গত ২রা মার্চ নিউ সিনেমায় মুক্তিলাভ ক'রেছে।

১৯৪৩ সালের তোলা এই ছবিখানি ভারতের সর্বত্র দেখানো হ'য়ে যাবার পর এখানে মুক্তিলাভ করলো এতদিনে। ছবিখানি দেখার পর মনে হয় একেবারে মুক্তি না হলেই ছিল ভালো। 'কাশীনাথ' নিউ থিয়েটার্সের নাম বাড়িয়ে দিতে মোটেই সাহায্য ক'রবার মত হয়নি—এর বাঙলা সংস্করণ অথচ বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। সংলাপ এবং বদ্ উচ্চারণই এ ছবিখানিকে দুর্বল ক'রে দিয়েছে। কলাকুশলতার দিক থেকে অবশ্য প্রশংসা ছাড়া বলবার কিছু নেই। সঙ্গীতের দিক থেকেও এ ছবিখানি বাঙলার সমকক্ষ হ'তে পারেনি। বাঙলা সংস্করণে দর্শক-দের মনঃপুত না হওয়ায় কয়েকটি দৃশ্য পুনঃসম্পাদনায় বাদ দেওয়া হয়, এক্ষেত্রে দর্শকের ভাব সমান থাকা সত্ত্বেও সে দৃশ্য-গুলি কেন রাখা হ'য়েছে বোঝা গেল না।

* * * *

গত সপ্তাহে সবশুদ্ধ চারখানি ছবি মুক্তিলাভ করে—রূপবাণীতে 'অভিনয় নয়', প্যারাডাইস ও ছায়াতে 'পর্বত-পে-আপনা ডেরা', নিউ সিনেমায় 'কাশীনাথ' আর গণেশ ও পার্ক শো হাউসে 'অঙ্গুরী' যার ভূমিকায় আছেন উল্লাস ও কৌশল্যা।

বিবিধ

লক্ষ্মীসি আনন্দের প্রযোজনায় যে ছবি-খানিতে শ্রীমতী কানন অভিনয় করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন 'রুক্মিণী হরণ' উপাখ্যান থেকে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তার চিত্রনাট্য রচনা ক'রে দিয়েছেন।

* * *

শান্তারাম গান্ধীজীর জীবনী অবলম্বনে একখানি ছবি তোলার চেষ্টায় লেগেছেন। গান্ধীজী তাঁর মত দিয়েছেন কিন্তু বর্তমান রাজনীতিক হাওয়া থাকতে তা কার্যকরী হবার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

* * *

বম্বে টকীজ তাদের পরবর্তী ছবির জন্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে 'শড়কজ্ঞ' নামে একটি চিত্রনাট্য ক্রয় ক'রেছেন।

* * * *

গত সপ্তাহে ডেরা ইসমাইল খাঁর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, সেখানকার সিনেমায় মোহম্মদের জন্মতিথি সংক্রান্ত কোন ছবির প্রদর্শনে আপত্তি জানাতে গিয়ে একদল মুসলমান ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এই সূত্রে ছ'জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।

* * *

যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মে-লনের অধিবেশনে যোগদানের পর ভারতে ফিরে এসে চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম উদ্যোগী ব্যক্তি আকবর ফজলভাই এক বিবৃতির দ্বারা জানিয়েছেন যে, কয়েক মাসের মধ্যেই আমেরিকা থেকে কিছু যন্ত্রপাতি এসে পৌঁছবে। ভারতে যে বছরে ২০০ খানারও বেশী ছবি তৈরী হয় অর্থাৎ চিত্রনির্মাণে ভারতের স্থান যে যুক্ত-রাষ্ট্রের পরই এ খবর ওখানকার লোকের জানা ছিল না। চলচ্চিত্র শিল্পের সমস্ত বিভাগের প্রসারের জন্য যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কাঁচামালের আশু প্রয়োজনীয়তার কথা ওখানকার উৎপাদকদের কাছে জানাতে তারা যুদ্ধের পর ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়েছে। পুরনো যন্ত্রপাতি এখনই বদলে দেওয়া ব্যাপারে ভারতকে কোন কোটা প্রথমে দেওয়া হয়নি, পরে ভারতের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তার ব্যবস্থা হয়েছে। ওখানকার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গিয়েছে যে, যুদ্ধের পর রঙীন ছবি তোলার ব্যবস্থা করাও সম্ভব হবে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই সব বিষয়ে সাহায্য করার জন্যে এদেশে আসারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

* * * *

পৃথ্বিরাজ যে নাট্য সম্প্রদায় খুলেছে তার প্রথম অবদান 'শকুন্তলা' ১০ই মার্চ বম্বের অপেরা হাউসে মঞ্চস্থ হবে।



সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২৮শে ফেব্রুয়ারী—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের ১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেট পেশ করা হয়। বাজেটে চলতি বৎসরে (১৯৪৪-৪৫) ১৫৫ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা এবং আগামী বৎসরে (১৯৪৫-৪৬) ১৬৩ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া দেখান হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে জানান হয় যে, ত্রিপুরা জেলার মনিয়ন্দ গ্রামের অধিবাসী জগবন্ধু সেন ১৯৪৪ সালের ১৭ই অক্টোবর জনৈক আমেরিকান সৈন্যের গুলীতে আহত হইয়া পরের দিন মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

পুত্রবধূ সুমতিবালাকে আত্মহত্যা করিতে প্ররোচিত করার অভিযোগে আলীপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ ডি এন বসু সুমতিবালার শাশুড়ী শ্রীমতী নন্দরাণী দত্তকে ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

স্বগৃহে অন্তরীণ বিহারের কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের এক যুক্ত বিবৃতি বিহারের চীফ সেক্রেটারীর নিকট পাঠান হইয়াছে। উক্ত বিবৃতিতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা কখনই গঠনমূলক কার্যকে গণ-আন্দোলন আরম্ভ করিবার চেষ্টার আবরণ হিসাবে গ্রহণ করেন নাই।

১লা মার্চ—কেন্দ্রীয় পরিষদে স্বরাষ্ট্র সচিব জানান যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নিজ নিজ প্রদেশে প্রেরণ করা হইতেছে। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে এই দিন পরিষদে জানা যায় যে, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু ও লালা শঙ্করলাল ১৯৪৪ সালের ৩নং অর্ডিন্যান্স বলে কুনুরে আটক আছেন। শ্রীযুত বসুকে মাসিক হাজার টাকা পারিবারিক ভাতা দেওয়া হয়।

আসাম আইন সভার উভয় পরিষদে আসাম সরকারের ১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেট পেশ হয়। উহাতে দেখা যায় যে, আগামী বৎসরে মোট ২ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ঘাটতি হইবে।

পাঞ্জাব পরিষদে সরকার বিরোধী দলপতি লালা ভীমসেন সাচার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া পরিষদে যোগদান করায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

সৈন্যগণ কর্তৃক নারীর উপর অত্যাচার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তর হয়। এই প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে সমর বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ত্রিবেদী জানান যে, সামরিক ব্যক্তিবর্গ নারীর উপর অত্যাচারের ঘটনা বাঙলায় ও আসামে ৭১টি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্কে আইনগত বাধা দূর করার জন্য মিঃ গোবিন্দ দেশমুখ তাঁহার উত্থাপিত বিলটি একটি সিলেক্ট কমিটিতে দিবার জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, অদ্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে তাহা ২২—২১ ভোটে গৃহীত হয়।

২রা মার্চ—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গীয় পতিতাবৃত্তি-নিরোধ (সংশোধন) বিল পাশ হয়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে নিরাপত্তা বন্দী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন অথবা বিক্ষোভ-ঘটিত অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদের আশু মুক্তি দাবী করিয়া যে বে-সরকারী প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, অদ্য তাহা ৫০—৭৩ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

স্বামী সহজানন্দ নিখিল ভারত কিষাণ সভার সভাপতির পদ ত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিষাণ সভার উপর কম্যুনিস্টদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা তাঁহার এই সিদ্ধান্তের কারণ।

জাতীয় যুদ্ধ ফ্রণ্ট প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ জানাইয়া স্যার ইয়ামিন খাঁ (মুসলিম লীগ) কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে প্রস্তাব আনিয়াছিলেন, তাহা ৫৫-৪৩ ভোট গৃহীত হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সরকার পক্ষ হইতে জানান হয় যে, বর্তমানে বাঙলা দেশের জেলগুলিতে ১৮ জন মহিলা সহ মোট ১৩২২ জন নিরাপত্তা বন্দী আটক আছেন। তিনজন বন্দীর বয়স ১৮ বৎসরের কম। ১৫ জন তিন আইনে আটক আছেন।

৩রা মার্চ—নাগপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, নিষিদ্ধ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে যাহাতে কোন গঠনমূলক কার্য চালান না হয় তজ্জন্য নাগপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একটি সভায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিস্টার মিঃ এইচ ডি বসু ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

৪ঠা মার্চ—রেল স্টেশনে ডেলিভারী দিলে বাঙলা গভর্নমেণ্ট যে মূল্যে ধান্য ও চাউল খরিদ করিতে প্রস্তুত আছেন, বাঙলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগ সেই নির্দিষ্ট মূল্য ঘোষণা করিয়াছেন।

মেসার্স বৃছয়াজ কোম্পানীর নিকট গচ্ছিত নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির ৭০,০০০৲ টাকা বোম্বাই সরকার বাজেয়াপ্ত করায় উহার বিরুদ্ধে উক্ত কোম্পানী যে দরখাস্ত পেশ করিয়াছিলেন, বোম্বাই ছোট আদালতের প্রধান বিচারপতি তাহা নামঞ্জুর করিয়াছেন।

৫ই মার্চ—বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রীর পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী খাঁ বাহাদুর মহম্মদ আলী স্বীকার করেন যে, বর্তমানে বাঙলার জেলসমূহে আটক মহিলা রাজনৈতিক নিরাপত্তা বন্দীদের (মোট ১৯ জন) মধ্যে কয়েকজন বহুদিন ধরিয়া অসুখ-বিসুখে ভুগিতেছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুত বিজয় সিংহ নাহারকে দমদম সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে রাজস্ব সচিবের প্রস্তাবক্রমে বঙ্গীয় চান্দিনা প্রজাস্বত্ব বিলটি (১৯৪৫) বিবেচনার্থ একটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দলের বিশিষ্ট সদস্য শ্রীযুত কে এস গুপ্ত অদ্য পরিষদে বাজেট সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার সময় অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন এবং কিছুক্ষণ পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে স্যার আজিজুল হক বলেন যে, বাঙলার বস্ত্র-সংকট এবং বস্ত্র সংগ্রহে অক্ষমতায় নারীর আত্মহত্যার সংবাদ তিনি অবগত আছেন। তিনি বলেন, বাঙলা প্রচুর পরিমাণে কাপড় পাইয়াছে। তথাপি বাঙলায় এই পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার কোন কারণ তিনি দেখেন না।

বিদেশী সংবাদ

২৮শে ফেব্রুয়ারী—পূর্ব জার্মান রণাঙ্গন—লালফৌজ নয়স্টেটিন দখল করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গন—মার্কিন সৈন্যরা আজ ফিলিপাইনে পালাওয়ান দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে। আয়োজিমা অভিযানের আজ দশম দিবস। দশ দিনের মধ্যে মার্কিন সৈন্যেরা আয়োজিমার অর্ধেক দখল করিয়াছে।

বুখারেস্ট বেতারের এক সংবাদে প্রকাশ, রুমানিয়ার প্রধান মন্ত্রী জেনারেল রাদেস্কু পদত্যাগ করিয়াছেন।

১লা মার্চ—বার্লিন হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, মার্শাল রকোসভস্কির সৈন্যগণ ডানজিগ নগরে প্রবেশ করিয়াছে।

লর্ড সভায় ক্রিমিয়া বৈঠক সম্পর্কিত বিতর্কের উত্তর দিতে গিয়া ডোমিনিয়ন সচিব ভাইকাউণ্ট ক্যানবোর্ন ঘোষণা করেন যে, সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনের পূর্বে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে আলোচনার জন্য আহূত বৈঠকে ভারতকেও যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

অদ্য কমন্স সভায় সর্বসম্মতভাবে চার্চিল গভর্নমেণ্টের প্রতি আস্থাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ইডেন কমন্স সভায় বিতর্কে অন্যান্য কথা প্রসঙ্গে বলেন, "আমরা লুবলিন কমিটিকে পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধি বলিয়া মনে করি না।"

২রা মার্চ—লণ্ডনের এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবী জানাইবার উদ্দেশ্যে মিঃ আমেরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য একটি প্রতিনিধিমণ্ডলী গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই প্রতিনিধিমণ্ডলীতে যোগদান করিবার নিমিত্ত কমনওয়েলথ রিলেশনস সম্মেলনের (বর্তমানে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হইতেছে) অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ এ কে পিল্লাইকে আমন্ত্রণ করা হয়। মিঃ পিল্লাই এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

৩রা মার্চ—পশ্চিম জার্মান রণাঙ্গন—জার্মানরা মাস নদীর পূর্বতীরস্থ তাহাদের শেষ ঘাটিগুলি ত্যাগ করিয়াছে। জনৈক সামরিক ভাষ্যকার বলেন,—"রাইনল্যাণ্ডে জার্মানরা সম্পূর্ণরূপে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। আত্মরক্ষাব্যূহ হিসাবে সিগফ্রীড এলাকার অস্তিত্ব আর নাই।"

৪ঠা মার্চ—বৃটিশ কমনওয়েলথ রিলেসন্স কনফারেন্সের প্রতিনিধি স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় অদ্য লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের এই বিরাট সভায় বলেন যে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত ভারতে রাজনৈতিক সমস্যার কোন সমাধান হইবে না।

৫ই মার্চ—পশ্চিম জার্মান রণাঙ্গন—অদ্য প্রাতে মার্কিন ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনী কলোনে প্রবেশ করে। তাঁহারা এক্ষণে যুদ্ধ করিতে করিতে নগরীর কেন্দ্রস্থল অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। জার্মান নিউজ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, জার্মানরা কলোন ও ভেসেলের মধ্যবর্তী রাইনের সমস্ত সেতু ধ্বংস করিয়াছে।

পূর্ব জার্মান রণাঙ্গন—মার্শাল জুকভের সৈন্যগণ স্টারগার্ডের পূর্বদিকে সুদৃঢ় জার্মান রক্ষাব্যূহ ভেদ করিয়া বল্টিক সাগর তীরে কোলবের্গ এলাকায় উপনীত হইয়াছে। মার্শাল রকোশোভস্কির সৈন্যগণও বল্টিক সমুদ্রতটে পৌঁছিয়াছে এবং কোয়েসলিন অধিকার করিয়াছেন।

ব্রহ্ম রণাঙ্গন—মান্দালয়ের ৭০ মাইল দক্ষিণে মিকটিলা শহর ও ৮টি বিমান ঘাঁটি মিত্রপক্ষের করতলগত হইয়াছে।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ঃ—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশ

সূচীপত্র

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন　　　　সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ]　　শনিবার, ৩রা চৈত্র, ১৩৫১ সাল।　　Saturday, 17th March, 1945.　　[১৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

রাজবন্দীর স্বাস্থ্য

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে রাজবন্দী ও দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে সেদিন একটি বিবৃতি প্রদান করা হইয়াছে; এই বিবৃতিতে দেখা যায়, ১৯ জন রাজবন্দিনীর মধ্যে ১৩ জনই পীড়িত এবং সরকার পক্ষ যাহাই বলুন, ইঁহাদের সকলের পীড়াই গুরুতর বলিয়া মনে হয়। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা বিশেষভাবেই উদ্বেগজনক। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে শ্রীযুক্তা লীলা রায়, শ্রীযুক্তা কমলা দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্তা কিরণ চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের পীড়ার কথা ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। সরকারী বিবৃতিতে দেখা যায়, তাঁহার পীড়ার অবস্থা এখনও শোচনীয়। শ্রীযুক্তা কমলা দাশগুপ্ত মেরুদণ্ডে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহার ওজন ১০৫ পাউণ্ড হইতে ৯৯ পাউণ্ডে নামিয়াছে। শ্রীযুক্তা কিরণ চক্রবর্তীর ওজন ৯৯ পাউণ্ড হইতে ৯৪ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রাজবন্দীদের সম্বন্ধে সরকার পক্ষ যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গুপ্ত, সুধীনকুমার, শ্যামানন্দ সেন, ইঁহারা তিনজনেই ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। শ্রীযুত ভূপেন্দ্রকিশোর, রক্ষিত রায় দীর্ঘকাল চোখের পীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন। কিন্তু এইরূপ পীড়িত অবস্থা সত্ত্বেও গভর্নমেণ্ট এই সব পীড়িত রাজবন্দিনী এবং রাজবন্দীদিগকে মুক্তি দিতে সম্মত নহেন। স্যার নাজিমুদ্দীনের মতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্যই ইহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে না। গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া যাঁহারা জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে মুক্তি দান করিলে কিভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যে বিপর্যস্ত হইবে, ইহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। মানবতার দিক হইতেও ইঁহাদিগকে মুক্তি দান করা উচিত। এক্ষেত্রে স্যার নাজিমুদ্দিনের একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যাঁহারা কারাগারে এইরূপ গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, দেশের লোকের নিকট তাঁহাদের জীবনের যথেষ্টই মূল্য আছে এবং কারাগার যে তাঁহাদের বাঁচিবার পক্ষে অনুকূল স্থান নয়, স্যার নাজিমুদ্দীন নিশ্চয়ই তাহা স্বীকার করিবেন। বাঙলার মন্ত্রীরা এ বিষয়ে যেরূপ হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছেন, শুধু পরাধীন এই দেশেই তাহা সম্ভব। ইহা ছাড়া এ সম্বন্ধে আমরা বেশি কিছু বলিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ

বাঙলায় বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ উত্তরোত্তর সঙ্কটজনক আকার ধারণ করিতেছে। বস্ত্রের অভাবে মানুষ আত্মহত্যা করিয়াছে; নারীরা গৃহের বাহির হইতে পারিতেছে না; বাঙলার সমস্ত অঞ্চল হইতেই আমরা দিনের পর দিন বস্ত্র সঙ্কটের শোচনীয় খবর পাইতেছি। বাঙলার রাজধানী এই কলিকাতা শহরেও আমরা চোখের উপর দেখিতেছি, একখানা ধুতি কিংবা শাড়ীর জন্য সূর্যোদয়ের পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিপ্রহরের প্রখর সূর্যতাপ মাথায় লইয়া কাতারে কাতারে শত শত নরনারীকে দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। এই জনশ্রেণীর মধ্যে ভদ্রঘরের মহিলারা পর্যন্ত আছেন অথচ একটুকরা কাপড় ইঁহাদের মধ্যে খুব কম লোকের ভাগ্যেই মিলে। দীর্ঘ ক্লেশ ভোগ করিবার পর দোকানীদের নৈরাশ্যপূর্ণ উক্তিতে আপ্যায়িত হইয়া ইঁহাদের অধিকাংশকে ভগ্ন-মনোরথ হইয়া ফিরিতে হয়। দোকানের সামনে বস্ত্রের জন্য উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষমান ক্লান্ত শ্রান্ত জনশ্রেণীর উপর শান্তি রক্ষার দায়ে কোন কোন ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে পুলিশকে লাঠিও চালাইতে হইয়াছে। ভিড়ের চাপে তাল সামলাইতে না পারিয়া বিশেষ শ্রেণীর ধাবমান মোটর লরীর তলায় পড়িয়া সেদিন একটি লোককে প্রাণ দিতে হইয়াছে বলিয়াও জানা গিয়াছে। বুঝিতে পারি না বাঙলার শহরে মফঃস্বলে এমন ব্যাপার আরও কতদিন চলিবে? ভারত সরকারের পক্ষ হইতে স্যার আজিজুল হক সেদিন বলিয়াছেন যে, বাঙলায় গুরুতর বস্ত্র সঙ্কটের কোন কারণ নাই; কারণ, তাঁহারা বরাদ্দের অপেক্ষা গত পাঁচ মাসে বাঙলা দেশকে ৫ কোটি গজ কাপড় বেশি দিয়াছেন। বাঙলা দেশের প্রধান মন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দিন সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে একটি প্রশ্নের উত্তরে আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, বস্ত্র সরবরাহ-বিভাগের সম্পর্কিত মন্ত্রী এতৎসম্পর্কিত অবস্থার সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। সদাশয় মন্ত্রী মহোদয়ের এই বিবেচনা ও গবেষণা কতদিনে শেষ হইবে, আমরা জানি না; কিন্তু আমরা দেখিতেছি চোরাবাজারের রাজত্ব তাঁহাদের চোখের সম্মুখেই অপ্রতিহত প্রভাবে চলিতেছে। কাপড় না আসিতেছে, এমন নয়; কিন্তু মুটের মাথায় বস্তায় বস্তায় কাপড় চোরাবাজারে চলিয়া যাইতেছে। নাই বলিলে তাহার কোন হিসাব নাই বা প্রতিকার নাই। ভারত গভর্নমেণ্ট বস্ত্রের বরাদ্দ সম্বন্ধে বাঙলার উপর অবিচার করিয়াছেন; ইহা আমরা স্বীকার করি। যেখানে পাঞ্জাবের জন্য মাথা কিছু ১৮ গজ কাপড় বরাদ্দ করা হয় এবং বোম্বাইয়ের জন্য ১২ গজ বরাদ্দ হয়, সেক্ষেত্রে বাঙলার বর্ধিত লোক সংখ্যার

ক্ষেত্রে মাথা পিছু ১০ গজ কাপড়ের ব্যবস্থা করা যে একান্তই অসমীচীন ও অদূরদর্শিতার পরিচায়ক এ বিষয়ে কিছুই সন্দেহ থাকিতে পারে না; কিন্তু এক্ষেত্রেও আমাদের মনে এই প্রশ্নই বড় হইয়া দেখা দেয় যে, চোরাবাজার চলে কেন? দেশের লোকের দুঃখ-দুর্দশা বাড়াইয়া এক শ্রেণীর লোক তাহাদের রাক্ষসীবৃত্তি চরিতার্থ করিবে, আমরা ইহাই সহ্য করিতে পারি না। অনাবৃত দেহে অসভ্যের জীবন-যাপন করাই যদি এতদিনে অদৃষ্টে থাকে, তেমন জীবন বরণ করিয়া লইতেও আমরা রাজী আছি; কিন্তু এই সব সভ্য-বেশধারী দুর্বৃত্তের দৌরাত্ম্য বন্ধ হউক। আমরা দেখিতেছি, বাঙলার মন্ত্রীরা এই পাপ-ব্যবসাকে উৎখাত করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ; তাঁহাদের সকল ব্যবস্থা এবং সতর্কতাকে উপেক্ষা করিয়া বাঙলার বুকে পিশাচদের তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছে। কাপড়ের কষ্ট আমরা পাই—তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু এই লাভখোর নরপিশাচের দল নির্মম ভাবে দণ্ডিত হয়, ধিক্কৃত হয়, সর্বত্র নিন্দিত হয়—তাহাদের পিশাচবৃত্তি না চলে, আমরা ইহাই দেখিতে চাই। বাঙলার মন্ত্রীদের যদি সে ক্ষমতা না থাকে, তাহাদের শাসন-শৃঙ্খলায় যদি এমন দুর্বলতাই দেখা দিয়া থাকে যে, তাঁহারা সেজন্য কার্যত ইহার প্রতিকারে অসমর্থ, তবে তাঁহারা কতকগুলি স্বার্থান্ধ বিদেশী এবং অপদার্থ অনুগতদের ভোটের জোরে আর বৃথা আস্ফালন করিবেন না। তাঁহারা নিজেদের অসহায়ত্ব স্বীকার করুন। তাঁহারা স্বীকার করুন যে, দেশের জনসাধারণের প্রতি প্রাথমিক কর্তব্য প্রতিপালনের যোগ্যতা তাঁহাদের নাই। পরাধীন দুর্বল জাতির পক্ষে সে ক্ষেত্রে তবু কিছু সান্ত্বনার কারণ থাকিবে।

রাজপথে দুর্ঘটনা

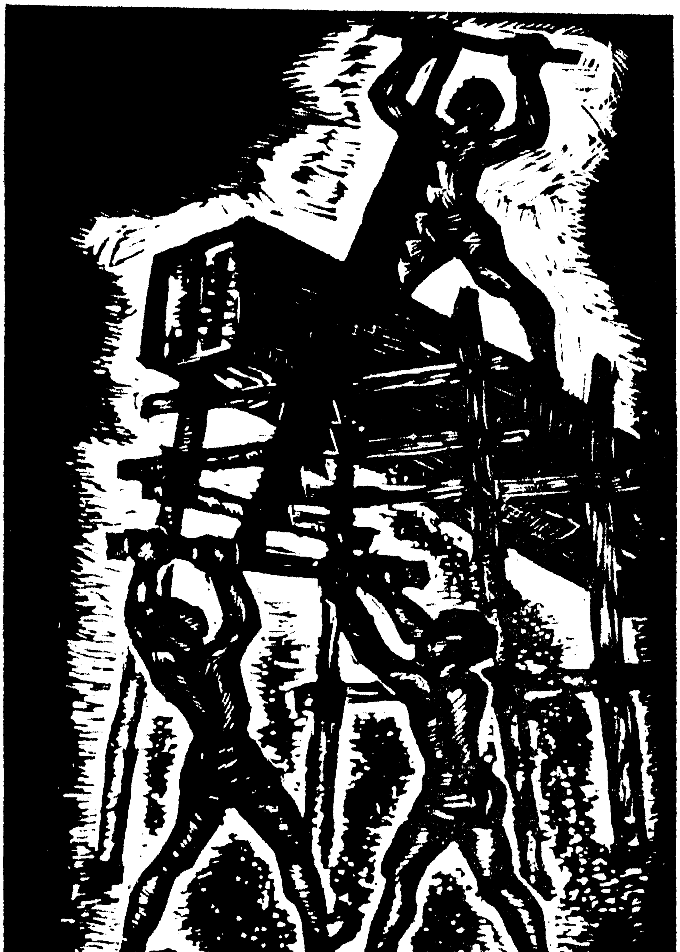
কলিকাতার রাজপথে দুর্ঘটনার সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। সেদিন বাঙলার প্রধান মন্ত্রী পথচারীদিগকে সতর্ক হইয়া চলিবার জন্য উপদেশ দিয়া বেতার-যোগে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। কলিকাতায় কয়েক বৎসর হইতে বিশেষ শ্রেণীর মোটর লরীর গতিবিধির মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। যুদ্ধের প্রয়োজনের গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, অন্তত কলিকাতার জন-বহুল অঞ্চলের মধ্যে গতিবিধির সময় এইসব মোটর লরীর গতি যদি অধিকতর সতর্ক এবং মন্থর হয়, তবে যুদ্ধ-প্রয়োজনে ক্ষতি হইবার বিশেষ কোন সম্ভাবনা থাকে না। সমর-বিভাগের কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা করিয়া [illegible] উপযুক্ত নির্দেশ প্রদান করেন [illegible] *হইলে দুর্ঘটনার অনেকটা প্রতীকার হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু বিশেষ শ্রেণীর এই মোটর লরীর সমস্যাই প্রধান সমস্যা নয়।* শহরে লোকসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং কর্ম-প্রয়োজনে পথে পথে লোকের ভিড় ও দ্রুত-গতিবিধির প্রয়োজনীয়তা সম্যক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। এক্ষেত্রে সর্বপ্রকার যানবাহনের সুনিয়ন্ত্রণ এবং জনসাধারণের গতিবিধিতে নিরাপত্তা অব্যাহত রাখিবার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি অধিক আকৃষ্ট হওয়া উচিত এবং যাহারা এতৎসম্পর্কিত বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া যানবাহন পরিচালিত করে তাহাদের প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মানুষের জীবনকে উপেক্ষা করিয়া চলিবার স্পর্ধা যেন এখানে কোন ক্রমেই কাহারও প্রশ্রয় না পায়। জনসাধারণকেও আমরা অধিক সতর্ক হইয়া চলাফেরা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। দ্রুততার গরজে তাঁহারা যেন দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া জীবনের ঝুঁকি লইয়া না বসেন; বিশেষত মহিলা ও শিশুদিগকে লইয়া যেন বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে রাজপথে যাতায়াত করেন।

কর্পোরেশন দলন

কর্পোরেশনের সঙ্গে বাঙলা সরকারের বিরোধ কেবল টাকার ব্যাপারেই শেষ হয় নাই; সম্প্রতি ইহা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। গত ৭ই মার্চ বাঙলা সরকারের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী মিঃ হল্যাণ্ড কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তার নিকট একখানা পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। এই পত্রে কর্পোরেশনকে শহরের পৌর-ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে ষোল দফা সর্ত কার্যে পরিণত করিতে বলা হইয়াছে। পৌর-ব্যবস্থা সম্পর্কে কর্পোরেশনের ত্রুটি না আছে আমরা একথা বলি না; কিন্তু বাঙলা সরকারের পক্ষ হইতে যে সব সর্ত দেওয়া হইয়াছে শুধু দাবী মাত্রেই তাহা কার্যত পালন করা সম্ভব হয় না; সেজন্য অর্থের প্রয়োজন। সরকার এই টাকার ব্যবস্থা করিয়া যদি কর্পোরেশনের উপর চাপ দিতেন, তবে তাঁহাদের আন্তরিকতায় আস্থা স্থাপন করা সম্ভব হইত; কিন্তু সে জন্য সঙ্গত কোন ব্যবস্থা তাঁহারা নির্দেশ করেন নাই; ইহাতে মনে হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা কাজ চাহেন না। প্রকৃতপক্ষে এই অজুহাতে কর্পোরেশনের উপর সরকারী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। সম্প্রতি বাঙলা দেশে নিদারুণ খাদ্যের দুর্ভিক্ষের পর বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ বাঙলা সরকারের [illegible] *বাজার ও দুর্নীতির দৌরাত্ম্যে* গোটা বাঙলায় আর্তনাদ উঠিয়াছে। খাদ্য ব্যবস্থার কার্যে ২২॥০ কোটী টাকা সরকারের হাতের ফাঁক দিয়া গলিয়া গিয়াছে; এ অবস্থায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরীর পৌর-কর্তৃত্ব যদি তাঁহাদের অধিগত হয়, তবে শহরবাসীর অবস্থা কি আকার ধারণ করিবে, আমরা শুধু সেই কথা চিন্তা করিতেছি।

পাকিস্থানের মহিমা

গত ১১ই মার্চ বাঙলার প্রধান মন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দীন কাঁকিনাড়ার মোসলেম লীগের উদ্যোগে আহূত একটি জনসভায় পাকিস্থানের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন, পাকিস্থানের আন্দোলনের সহিত জনগণের স্বার্থের সম্পর্ক নাই; তাহা কতকগুলি নবাব নাইট প্রভৃতি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরই ব্যাপার, যাঁহারা এইরূপ কথা বলেন, তাঁহাদের উক্তি সত্য নয়; পাকিস্থান যদি জনগণের স্বার্থের সহায়ক না হইত, তবে যে সব প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ, তথাকার নেতারা এই প্রস্তাব সমর্থন করিতেন না; কারণ, সে ক্ষেত্রে তাঁহাদের ব্যক্তিগতভাবে কোন স্বার্থ নাই। আমরা স্যার নাজিমুদ্দীনের এই উক্তির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। কোন প্রদেশের মন্ত্রিপদ অধিকার করাই স্বার্থের একমাত্র ক্ষেত্র নয়, ছলে বলে এবং কৌশলে নেতার মর্যাদা গড়িয়া তুলিতে পারিলে প্রতিষ্ঠাসূত্রেও অনেক স্বার্থ রহিয়াছে; মুসলমান সংখ্যা-লঘিষ্ঠ প্রদেশের তথাকথিত মুসলমান নেতারা ইহা জানেন এবং সাম্রাজ্যবাদীদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় সেই স্বার্থ সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহারা পাকিস্থান আন্দোলন সমর্থন করিয়া থাকেন। নতুবা ঐ সব প্রদেশে জনসাধারণের মধ্যে পাকিস্থান আন্দোলন যে বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পাকিস্থান আন্দোলন যে মুসলমান স্বার্থের সহায়ক নয়, সম্প্রতি সীমান্ত প্রদেশে স্যার আওরঙ্গজেব খাঁর লীগ মন্ত্রিসভার পতন হইতেই তাহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সীমান্তের অধি-বাসীদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনই মুসলমান; কিন্তু স্যার আওরঙ্গজেব পাকিস্থানী আন্দোলনের নেতাদের অন্য-তম প্রধান ব্যক্তি হইয়াও সে নীতির মহিমায় মন্ত্রিসভাকে স্থায়ী রাখিতে পারেন নাই। মুসলমান জনসাধারণের বিরুদ্ধতাতেই সেখানকার লীগ দলের প্রভুত্ব বিচূর্ণ হইয়াছে। সীমান্ত প্রদেশের মুসলমান জনসাধারণ নিজেদের স্বার্থ বোঝে না, মুসলমানদের স্বার্থ বুঝিবার ক্ষমতা শুধু তাঁহাদেরই একচেটিয়া, স্যার



কাঠচেরা শিল্পী—নরনারায়ণ (শান্তিনিকেতন)

দেশের কথা

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে আতঙ্কস্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। বিলাতের 'ডেলি মেল' পত্রের নিউইয়র্কস্থ সংবাদদাতার মতে শ্রীযুক্তা পণ্ডিত প্রকৃত তথ্যকে বিকৃত করিয়া উপস্থিত করিতেছেন এবং ব্রিটেনের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত আছেন। সংবাদদাতা ডিন বলেন, এই স্ত্রীলোকটি নগরে নগরে পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছেন এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সভায় বক্তৃতা করিয়া ব্রিটিশ বিদ্বেষ প্রচার করিতেছেন। এমন ব্যাপার ইংগ-মার্কিন সংহতি বৃদ্ধির সহায়ক হইবে না বলিয়া তাঁহার অভিমত। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সোজাসুজি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধতা করিতেছেন; সুতরাং তাঁহার কার্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দলের গাত্রদাহ সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য কিছুই নয়। ইঁহাদের এই বিক্ষোভের কারণ মিঃ ফ্রান্সিস গুন্থারের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতে পাওয়া যাইবে।

"ভারতবর্ষ ব্রিটিশরাজের মণিমুকুটের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল রত্ন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এবং মার্কিন সংবাদপত্রসমূহে এই ধরণের ভাষা এখনও ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে ভাষার ভংগীটাই শুধু আছে, কিন্তু ইহার অর্থগত তাৎপর্য কিছুই নাই। এ ভাষা প্রাণহীন। বর্তমানে ভারত সর্বপ্রকার রাজনীতিক দৌরাত্ম্য অনুষ্ঠানের লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃত সত্য হইল ইহাই, সেগুলির কোনটিই উজ্জ্বল নহে, মণিমাণিক্যও নয়। প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে মিঃ উইনস্টন চার্চিল বলিয়াছিলেন যে, ভারতের উপর হইতে কার্যত রাজনীতিক কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিবার কোন ইচ্ছা আমাদের নাই। ব্রিটিশরাজের মুকুটের উজ্জ্বল এবং মূল্যবান্ মণিটি আমরা ছুঁড়িয়া ফেলিতে চাই না। আমাদের যত উপনিবেশ আছে, অধীন রাজ্য আছে, তন্মধ্যে ভারতবর্ষই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরব এবং শক্তিস্বরূপ গণ্য হইয়া থাকে।"

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সংরক্ষণশীল সদস্য মিঃ রবার্ট বুথবী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই এই মহিমা কীর্তন করিয়া ফিলাডেলফিয়ার একটি সভাতে সেদিন শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত কর্তৃক উত্থাপিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবীর বিরুদ্ধতা করেন। তিনি বলেন, ভারতের অধীনতার জন্য ব্রিটেন দায়ী নয়; ভারতবাসীরাই সেজন্য দায়ী। ভারতবাসীদের নিজেদের ধর্মগত বিরোধ এবং জাতিভেদ প্রভৃতি কুসংস্কারের জন্যই ভারতবাসীরা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করিতে পারে না।

মিঃ গুন্থার অকাট্য যুক্তিরাজি দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই ধরণের কূটবাদ ও বাচালতাকে খণ্ডিত করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"সোজা কথা এই যে, ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতা দান করিবার অভিপ্রায় আমাদের নাই। ভারতবাসীরা যখন বলে, বেশ, অতীতে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে, তোমরা এখন আমাদিগকে স্বাধীনতা দাও; তখন ব্রিটিশের উত্তর এই যে,—না, এখন নয়, অন্য সময়ে দেখা যাইবে। ইত্যবসরে ব্রিটিশ, চেক, ওলন্দাজ ইহাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার জন্য তোমরা লড়; সংগ্রাম চালাইতে থাক,—কিন্তু তোমাদের স্বাধীনতার জন্য নয়। যদি তোমরা তোমাদের নিজেদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, তোমাদের জন্য জেলখানা রহিয়াছে—ফাঁসীকাঠ আছে।"

ভারতবাসীরা স্বাধীনতা লাভে অযোগ্য—ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্রিটিশ পক্ষের কতকগুলি যুক্তি চিরন্তন আকার ধারণ করিয়াছে; সেগুলির বিশ্লেষণ করিয়া মিঃ গুন্থার বলেন—

"ব্রিটিশ ভারতবর্ষে তাঁহাদের প্রভুত্ব অব্যাহত রাখিবার যৌক্তিকতা প্রদর্শনের জন্য তিন রকম জুজুর ভয় উপস্থিত করে। প্রথমত, মোসলেম ভীতি, সামন্ত রাজাদের ভীতি এবং বৈদেশিক আক্রমণের আতঙ্ক। প্রকৃতপক্ষে এগুলি যদি সমস্যাই হয়, তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসন এ তিনটি সমস্যার কোনটিই সমাধান করিতে সমর্থ হয় নাই। পক্ষান্তরে এগুলিকে সমধিক কদর্য করিয়া তুলিয়াছে এবং এগুলিকে স্থায়িত্ব-শক্তি দান করিয়াছে। ভারতের সম্পদ যদি ভারতবাসীদের স্বাস্থ্য, শিল্পবাণিজ্য, শিক্ষা এগুলির সমুন্নতির জন্য ব্যয় করিতে হয় এবং আইনত যদি তাহা ব্রিটিশের দ্বারা লুণ্ঠিত না হয়, তবে স্বাধীন এবং সমৃদ্ধ ভারতবাসীরা এই সব সমস্যার স্বাভাবিক ভাবেই নিজেদের মধ্যে সমাধান করিয়া লইবে।"

কিন্তু এ যে বড়ই কঠিন কথা। মিঃ চার্চিলের প্রসিদ্ধ উক্তি এক্ষেত্রে অনেকেরই মনে পড়িবে। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"আজ আমরা যদি ভারতবর্ষ হারাই, তবে আমাদের পক্ষে তাহা মারাত্মক হইবে। ঘটনাচক্রের যেরূপ পরিণতিতে এরূপ ব্যাপার সম্ভব হইবে, তাহা আমাদিগকে জগতে একটি ক্ষুদ্র শক্তিতে পরিণত করিবে। ভারতবর্ষ হারাইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যরূপ বিরাট প্রতিষ্ঠানটি তখন এক আঘাতে জীবনশূন্য হইয়া পড়িবে। সে দুর্দৈব হইতে রক্ষার পথ আর থাকিবে না। উন্মাদের যুক্তিতে ভুলিয়া অথবা ভ্রান্ত উদারতার মোহে আমরা যদি এইরূপ কাপুরুষতা দেখাই, তবে আমাদের সর্বনাশ ঘটিবে। যদি ভারতবর্ষ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করে এবং আপনারা ভারত ত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করেন, তবে আপনাদের স্বদেশের দিকচক্রবালে দুর্ভিক্ষ আপনাদিগকে অভিনন্দিত করিবে।"

আদর্শের নূতন ধোকাবাজি

কিন্তু যুদ্ধের এই আমলে, এমন ভাব খোলাখুলি ভাষায় ব্যক্ত করা চলে না। কূটনীতির সাহায্যে কাজ বাগাইয়া লইতে হয়। তাই আজকাল ব্রিটিশ শাসকদের মুখে সাম্রাজ্যের পরিবর্তে 'কমনওয়েলথ' এই নূতন শব্দটির বেশী রেওয়াজ হইয়াছে এবং ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের যে অধিকার ভারতবর্ষকে দিতে মিঃ চার্চিল আতঙ্কিত হইয়াছিলেন, আজ তাঁহার সমর্থক দলের মুখে সেই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা আমরা শুনিতে পাই। বিলাতের 'নিউজ ক্রনিকেল' পত্র ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দানের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া সম্প্রতি লিখিয়াছেন—

"ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে স্বাধীন জাতিস্বরূপে ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ আমাদের নব যৌথ রাষ্ট্রসম্মেলনের আদর্শ পালনের পথে সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা। কারণ, ভারতবর্ষের এই আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে হইলে ব্রিটিশের স্বাজাত্যবোধ এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে অবলম্বন করিয়া চলিবে না। এক নৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত বহু জাতির সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিতেই তাহা সম্ভব হইতে পারে। এই বৈপ্লবিক আদর্শ পূর্ণ করিতে হইলে কমনওয়েলথের জননায়কগণকে, বিশেষভাবে গ্রেটব্রিটেনের নেতাদিগকে প্রচুর রাজনীতিক কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। জগতে শ্বেত এবং কৃষ্ণ জাতিসমূহের মধ্যে মিলন ঘটাইতে হইবে।"

সুতরাং নূতন আদর্শের ধাপ্পা দিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের ব্যবসা চালাইয়া যাইবার চেষ্টায় আছেন। মিঃ হোরেস আলেকজেণ্ডার কূটনীতির এই নব পর্যায়ের সূচনা পূর্ব হইতেই পাইয়াছিলেন। তিনি গত বৎসর তাঁহার 'ক্রিপস প্রস্তাবে পরবর্তী ভারত' শীর্ষক পুস্তকে এই বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন—

"ডোমিনিয়ন প্যাটার্নের স্বাধীনতা দক্ষিণ আফ্রিকায় খাপ খাওয়ান কঠিন হইয়াছে, আয়র্লণ্ড ইহাতে রাজী হয় নাই। ভারতে ৪০ কোটি এশিয়াবাসীর বাস, ভারতবর্ষে ইহা যে চলিবে, এরূপ আশা আরও কম। কারণ ভারতবাসীদের রীতি-নীতি ও সংস্কারের সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের কোন হিসাবেই মিল নাই।"

আমরা দেখিলাম, মিঃ বার্ট্রাণ্ড রাসেল কিছুদিন পূর্বে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি জনসভায় ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনীতির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই বিষয়ের উপরই জোর দিয়াছেন। তিনি বলেন—

"ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দানের প্রস্তাব করা হইবে কি না, আমি জানি না; কিন্তু যদি তাহা দান করিবার প্রস্তাব করা হয়,

তবে আমি ভারতবাসীদের মনোভাব যতদূর জানি এবং বুঝি, তাহাতে আমি ইহাই বলিব যে, ভারতবাসীরা সে ক্ষমতা লাভ করিলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার প্রয়োগ করিবে। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দিতে যাওয়ায় সার্থকতা কোথায়? ভারতবর্ষ এবং গ্রেটব্রিটেনের মধ্যে বর্তমানে যে সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আন্তরিকতাপূর্ণ নয়, তাহা কৃত্রিম। একথা সত্য যে, যুদ্ধোত্তর জগতে চীন এবং ভারতবর্ষে যন্ত্রচালিত শিল্পের সমধিক সম্প্রসারণ ঘটিবে এবং সেই পথে এই দুই জাতির সমাজ-জীবনে পাশ্চাত্য-ধারার প্রবর্তন কতকটা দেখা দিবে। কতকগুলি ক্ষেত্রে ইহারা পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করিবে, ইহা ঠিক; কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেদের সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখিবার মত একটা মর্যাদাবুদ্ধিও এশিয়ার সর্বত্র জাগ্রত হইবে।"

আমরা এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া মনে করি। ভারতবর্ষ জুলু বা হটেনটটের দেশ নয়। ভারতের বহু যুগাগত সুপ্রাচীন বিরাট সংস্কৃতি রহিয়াছে। স্বাধীনতা পাইলে ভারত নিশ্চয়ই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংস্কৃতির মহিমায় গলিয়া গিয়া নিজের জাতীয় বিশিষ্টতা বিসর্জন দিবে না। জাতীয় জীবনে জাগ্রত ভারতে ঘৃণ্য পরানুকরণের যেমন প্রবৃত্তি নির্মমভাবে পিষ্ট হইবে এবং পরগাছার দল জাতীয় জীবন হইতে প্রচণ্ড আঘাতে উৎখাত হইবে।

ভণ্ডামীর চূড়ান্ত অভিনয়

মার্কিন রাষ্ট্রসচিব মিঃ স্টেটিনিয়াস সেদিন মেক্সিকো শহরে এক বক্তৃতায় আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন। তিনি বলেন—

"আমরা শান্তি-প্রতিষ্ঠার যে প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইয়াছি, তাহাতে লুকোচুরি কিছুই নাই। জগতের বৃহত্তম চতুঃশক্তি জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠান সংগঠনের কতকগুলি প্রস্তাবে নিজেরা একমত হইয়াছেন। ঐসব প্রস্তাব বিশ্ববাসী সকল জাতির কাছে বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা হইয়াছে। বিশেষজ্ঞদের লইয়া গঠিত এবং কয়েকটি জাতির প্রতিনিধিদের দ্বারা সমর্থিত কোন প্রস্তাব ইতঃপূর্বে বিশ্ববাসীর কাছে, তাহারা যাহাতে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিতে পারে, সেজন্য এমনভাবে উপস্থিত করা হয় নাই। সানফ্রান্সিসকোর বৈঠকে সম্মিলিত পক্ষে সব রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিবেন। তাঁহারা স্বাধীন জাতিস্বরূপে এই সম্মেলনে যোগদান করিবার অধিকার লাভ করিবেন।"

কিন্তু এই ধরণের বড় বড় কথা আমাদের কাছে সবই বাজে। কেম্ব্রিজের ছাত্রেরা সেদিন সভা করিয়া যে কথা বলিয়াছে, আমরা তাহারই সমর্থন করিয়া বলিব—কংগ্রেসই ভারত। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আজ কারাগারে বন্দী, এমন অবস্থায় সানফ্রান্সিস্কোর বৈঠকে যাহাই হউক, প্রকৃত ভারতের সঙ্গে তাহার যোগ থাকিবে না। এই প্রসঙ্গে আমরা ইহাও শুনিতে পাইয়াছিলাম যে, সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাকে মুক্তি দান করা হইবে। আমরা কোন দিনই এসব কথার গুরুত্ব স্বীকার করি নাই। নাগপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কংগ্রেস-কর্মীদিগকে সেদিন গঠনমূলক কার্য সম্বন্ধেও যেভাবে শাসাইয়াছেন, তাহাই সেপক্ষে প্রমাণ। এ সম্বন্ধে সহকারী ভারতসচিব লর্ড লিস্টোয়েলের সদাশয়তার সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদদাতার প্রচারকার্য সত্যই আমাদের কাছে বিরক্তিজনক হইয়া উঠিয়াছে। সানফ্রান্সিসকোর বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধিত্বের সম্বন্ধে লণ্ডনের একটি সংবাদে প্রকাশ,—

"স্যার ফিরোজ খাঁ নুন অথবা স্যার সুলতান আহম্মদ, ডাক্তার আম্বেদকর এবং একজন ভারতীয় সামন্ত-নৃপতি সম্ভবত ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপে সানফ্রান্সিসকো বৈঠকে যোগদান করিবেন। ইণ্ডিয়া অফিসের মুখপাত্র এই সংবাদের সমর্থন বা প্রতিবাদ কিছু না করিয়াই এই কথা বলেন যে, প্রতিনিধিরা সংখ্যায় তিনজন হইবেন এবং তাঁহারা নিশ্চয়ই ভারতবাসী হইবেন। তিনি এইরূপ ইঙ্গিতও করিলেন যে, এই তিনজন ভারত গভর্নমেণ্টের উচ্চপদাধিকারী হইবেন না।".

আমরা দেখিতেছি, ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী স্যার ওলাফ ক্যারো ইতিমধ্যেই এতৎসম্পর্কিত জল্পনা-কল্পনার একেবারে নিরসন করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুত কৃষ্ণমাচারীর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে, সানফ্রান্সিসকোর বৈঠকে বে-সরকারী কোন ব্যক্তি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিতে যাইবেন। ইহার পর এ সম্বন্ধে সরকার পক্ষে চূড়ান্ত ঘোষণা প্রকাশিত হইয়াছে। সপারিষদ বড়লাট সানফ্রান্সিসকোর বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য স্যার রামস্বামী মুদালিয়র, স্যার ফিরোজ খাঁ নুন এবং বরোদার ভূতপূর্ব দেওয়ান স্যার ভি টি কৃষ্ণমাচারীকে নির্বাচিত করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে, ভারত সরকারের পক্ষ হইতে তাঁহাদের চির-অনুগত এবং বিশ্বস্ত দুই 'স্যার' এবং সামন্ত-সাম্রাজ্যের পক্ষ হইতে আর এক 'স্যার' সানফ্রান্সিসকোতে দরবার দিতে যাইতেছেন। শাসন-পরিষদের সদস্যদের বেতন ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে না-মঞ্জুর হইবার পরও স্যার রামস্বামী এবং স্যার ফিরোজকে ভারতের প্রতিনিধিরূপে পাঠাইবার প্রস্তাব করাতে অন্তত কর্তাদের একটু চক্ষুলজ্জা দেখা দেওয়া উচিত ছিল; কিন্তু সে লজ্জার মাত্রা তাঁহারা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। শুনিতেছি, এই তিন 'স্যার'কে আপাতত বিলাতে গিয়া ভারতসচিবের মাস্টারীতে কিছুদিন শিক্ষা-লাভ করিতে হইবে। আমরা বলি—'গম্যতাম্ কীর্তিলাভায়'। দেশবাসীর ধিক্কার, ইঁহাদের এই নির্লজ্জ প্রভু-আনুগত্যের ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ হইবে।

জাফরুল্লার প্রস্তাব

সুতরাং কংগ্রেস-নেতাদের মুক্তির আপাততঃ কোন সম্ভাবনাই নাই। এরূপ অবস্থায় স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা সম্প্রতি ভারতের রাজনীতিক অচল অবস্থা-জনিত সমস্যার সমাধানের জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার সাফল্য সম্বন্ধে কোন সম্ভাবনা আমরা দেখিতে পাইতেছি না; কারণ, তিনি নিজে মনে এবং বুদ্ধিতে একান্ত নরম হইলেও চার্চিলী দল ইতিমধ্যেই তাঁহার প্রস্তাবে গরম হইয়া উঠিয়াছেন। স্যার মহম্মদ বিলাতের প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'স্পেক্টেটর' পত্রে তাঁহার প্রস্তাবটি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"জাপানের সহিত যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার বিরতি ঘটিবার এক বৎসরের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন দল একমত হইয়া নিজেদের শাসন-তন্ত্রসম্মত যে প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাহাতেই সম্মত হইবেন, তাঁহাদের পক্ষ হইতে অবিলম্বে এইরূপ ঘোষণা করা হউক; সেই সঙ্গে ইহাও জানানো হউক যে, নেতারা যদি নির্ধারিত ঐ সময়ের মধ্যে অনুরূপ কোন সম্মিলিত প্রস্তাব উপস্থিত করিতে না পারেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষকে অন্যান্য ঔপনিবেশিক অধিকারপ্রাপ্ত দেশের সমপর্যায়ভুক্ত করিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট নিজেরাই পার্লামেণ্টে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে উপযুক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন।

স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা ব্রিটিশের অনুগ্রহ ও অনুকম্পায় একান্ত বিশ্বাসী। তিনি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করেন, আমরা তাহা করি না। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সদিচ্ছার উপর আমাদের সিকি পয়সারও বিশ্বাস নাই। কিন্তু নরম-গরম ব্রিটিশের চরম কথা ভারতের সম্বন্ধে একই। পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় নিম্নোদ্ধৃত প্রশ্নোত্তর হইতেই সে পরিচয় পাওয়া যাইবে—

মিঃ সিনওয়েল—স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ এবং অন্যান্য মডারেট ভারতীয় নেতাদের আপোষমূলক বক্তৃতা ও বিবৃতি প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া এবং ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁহারা যে নূতন ইঙ্গিত করিতেছেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া এই সম্পর্কে উদ্যোগী হওয়া আবশ্যকবোধে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টই আপোষের উদ্দেশ্যে কোনরূপে বন্ধুত্বের মনোভাব প্রকাশ করিবেন কি?

মিঃ আমেরী—প্রত্যেক বিশিষ্ট ভারতীয় নেতার বক্তব্যের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইলে, এক্ষেত্রে এই সত্য থাকিয়া যাইতেছে যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বন্ধুত্বের মনোভাব কার্যকর হওয়ার মত কোন আপোষ-মীমাংসায়

ভারতীয় নেতৃবৃন্দ 'এখনও নিজেদের মধ্যে পেশছিতে পারেন নাই।"

জগতের মধ্যে এমন কোন দেশ নাই, যেখানে সকল দলের মধ্যে দেশের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে মতের ঐক্য ঘটিয়াছে দেখা যায়। মিঃ ফ্রান্সিস গন্থার এ কথাটা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"একথা সত্য যে, ভারতবাসীদের মধ্যে কতকগুলি লোক ইংলণ্ডের প্রভুত্বের ছায়া পরিত্যাগ করিতে না চাহিতে পারে। ১৭৭৬ সালে আমেরিকায়ও কতকগুলি লোক তাহা চাহে নাই; এখনও কতকগুলি ফরাসী জার্মানদের অধীনতাই ভালবাসে। সমগ্র জাতির সমন্বিত বৃহত্তর স্বার্থের ক্ষেত্রে এই সব লোকদের বিষয় ধর্তব্য নয়। এক্ষেত্রে দায়িত্ব ও ন্যায়সংগত অধিকারের কথা উত্থাপন করা হইয়া থাকে। ভারতশাসনে ব্রিটিশের যদি ন্যায়সংগত অধিকার থাকে, তবে পোল্যাণ্ড শাসনে জার্মানদেরও ন্যায়সংগত অধিকার আছে, আবিসিনিয়া শাসনে ইটালীয়ানদের এবং চীন শাসনে জাপানীদের অনুরূপ ন্যায়সংগত যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে; তবে আমরা কিসের জন্য যুদ্ধ করিতেছি? কেহ এমন কথা বলিয়া এ যুক্তি উড়াইয়া দিতে পারেন না যে, আপনি ঐ কথা কেন তুলিতেছেন—ভারতে ব্রিটিশ অধিকার দুইশত বৎসরের পূর্বের ব্যাপার। অতীতের কথা কেন খোঁচাইয়া তোলেন? হাঁ, শুধু এইজন্য ইহা তুলিতে হয় যে, বর্তমানের অবস্থার মূলে অতীতই কারণ-স্বরূপে রহিয়াছে। দুইশত বৎসর পূর্বের কোন কাজের ফল যদি বর্তমানে সংগত হইয়া দাঁড়ায়, তবে আমরা এইসব ডিক্টেটরদের বিরুদ্ধে কেন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি? এক্ষেত্রে তো আমাদের পক্ষে বাসায় গিয়া নিদ্রা দেওয়াই উচিত ছিল, দুইশত বৎসর পরে এই ডিক্টেটরদের পররাজ্য জয় আমাদের কার্যের ন্যায়ই ন্যায়সংগত হইয়া দাঁড়াইত।

কিন্তু দুর্বলের পক্ষে এসব যুক্তির কোন মূল্য নাই। শক্তিমানের হাতে ন্যায়ের দণ্ড থাকিবেই এবং তাঁহারা অন্যায়ের দ্বারাই অপ্রতিহত প্রভাবে তাহা পরিচালনা করিবে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কঠিন দায়িত্ব সেই যুক্তিতেই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ভারতে তাঁহাদের এই কর্তব্য পালনে কতটা প্রখরতা প্রয়োজন হইতেছে, সম্প্রতি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র এলাহাবাদের সংবাদ-দাতার একটি সংবাদে জানা যায়। সংবাদে প্রকাশ—

"লাহোর দুর্গে অবস্থানকালে শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং ডাক্তার রামমনোহর লোহিয়ার কারাকক্ষে ষোল মাসকাল সূর্যের রশ্মি প্রবেশ করে নাই এবং বহু মাস তাঁহারা সূর্যের মুখ পর্যন্ত দেখেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে একজনের পত্রে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তাঁহাদের সূর্যবিহীন দিনের অবসান ঘটিয়াছে। তাঁহারা এখন আগ্রা জেলে সূর্যের উদয় ও অস্ত দেখিতে পাইতেছেন।"

আইন ও শান্তিরক্ষার এমন কঠোর প্রয়োজন এবং তৎসম্পর্কিত আয়োজন সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা যথেষ্টই আছে। ভারত গভর্নমেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব অতীতের সে অভিজ্ঞতার বেদনা সেদিন আমাদের অন্তরে উস্কাইয়া দিয়াছেন। রাজনীতিক বন্দীদের 'মুক্তি সম্পর্কিত বিতর্কের উত্তরে স্যার ফ্রান্সিস্ মুডী বলেন,—আপনারা কি বাঙলার বিপ্লববাদীদিগকেও মুক্তি দিতে বলেন? বাঙলা সরকার তথাকার বিপ্লবী-দিগকে মুক্তি দিতেছেন না, এজন্য আপনারা নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে নিন্দা করিবেন না!

স্পেশাল ব্রাঞ্চের হাজত

বাঙলায় বিপ্লবীদের আন্দোলন নাই; কিন্তু বিপ্লব দলনের পীড়ন সমানভাবেই আছে। বাঙলার স্বাধীনতা আন্দোলনের অতীত যুগের অনেক বাথা কলিকাতা শহরের ইলিসিয়াম রো নামক রাজপথের স্মৃতির সংগে শোণিত অক্ষরে গাঁথা রহিয়াছে। বর্তমানে ইলিসিয়াম রো লর্ড সিংহ রোড এই আখ্যা লাভ করিয়াছে। কিন্তু নাম বদ্লাইলেও নীতি বদ্লায় নাই। সেদিন বংগীয় ব্যবস্থা-পরিষদে প্রধানমন্ত্রীর পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী একটি প্রশ্নের উত্তরে ১৩—১৫নং লর্ড সিংহ রোডের প্রসংগ উত্থাপন করিয়াছিলেন। স্যার হিউ স্টিফেনসন, স্যার উইলিয়াম প্রেণ্টিস এবং টেগার্টের যুগের সে অতীত কথা আমরা তুলিতে চাহি না; কিন্তু দেখিতেছি, বাঙলার মন্ত্রীরাও আধুনিক এই লর্ড সিংহ রোডের পুলিশ-ব্যবস্থায় পূর্ব রূপেই আস্থাসম্পন্ন। এতদিন পর্যন্ত এখানকার গোয়েন্দা বিভাগের বাড়িতে স্পেশাল সেল ছিল না, তাঁহারা সেই অভাব পূরণে উদ্যোগী হইয়াছেন। সুতরাং আমলাতন্ত্রের দ্বারা যাহা হয় নাই, মন্ত্রীদের তদ্বিরে তাহাই হইতেছে। এতৎসম্পর্কিত প্রশ্নোত্তরে বাঙলার স্বরাষ্ট্রসচিবের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী মিঃ মহম্মদ আলী বলিয়াছেন যে, গোয়েন্দা বিভাগের যেসব সেলে বন্দীদিগকে রাখা হয়, সেগুলির প্রত্যেকটির আয়তন লম্বা ৮ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি এবং প্রস্থে ৮ ফুট ৫ ইঞ্চি। কোন কোন ক্ষেত্রে দুই মাস পর্যন্ত বন্দীদিগকে এই সব সেলে আটক রাখা হয়। তাঁহাদিগকে জেল-হাজতে রাখিলে এই অসুবিধা হয় যে, জিজ্ঞাসাবাদ করিবার প্রয়োজন ঘটিলে তাঁহাদিগকে হাতের মাথায় পাওয়া যায় না। মিঃ মহম্মদ আলী বলেন, প্রধানমন্ত্রী কখনও এই সব সেল পরিদর্শন করিয়াছেন কি না, তাহা তিনি জানেন না; তবে তিনি নিজে কখনও স্বচক্ষে সেগুলি প্রত্যক্ষ করেন নাই। আলী সাহেবের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। প্রধানমন্ত্রী মহাশয় সরকারী পয়সায় থিয়েটার রোডে নিজের প্রাসাদ মেরামত করিতেই ব্যস্ত আছেন। ৮ ফুট চওড়া এবং ৮ ফুট লম্বা সেল পরিদর্শন করিবার সময় নিশ্চয়ই তাঁহার নাই। হতভাগ্য বন্দীদের জন্য নির্দিষ্ট এই সব সেলের স্বল্প পরিসরের মধ্যে পড়িলে তাঁহার যত্নপুষ্ট দেহে যে কষ্ট হইবে, তাহা স্বীকার করা তাঁহার ন্যায় পদস্থ ব্যক্তির পক্ষে নিশ্চয়ই শোভা পায় না। বাঙলা সরকারের এমন মতিগতি বুঝিয়া ভারত গভর্নমেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব সত্যই একথা বলিতে পারেন যে, তাঁহারা যদি রাজ-নীতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিতেও বলেন, বাঙলা সরকারের পক্ষ হইতে ঘোরতর আপত্তি উঠিবে।

দেশসেবার ব্রত

সুতরাং চালাও লীগ মন্ত্রীদের রাজত্ব। কিন্তু এদিকে গতিক বড় ভাল নয়। সিন্ধুর লীগ মন্ত্রিসভা বারবার ঝাঁকুনি খাইয়াও তাল সামলাইতে পারিতেছে না; সীমান্তের মন্ত্রিসভা এতদিনে ভাঙিয়া পড়িল। কংগ্রেসীরা এই সব কাজের জন্য দায়ী। তাহারাই দেশের লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, রাজনীতিক স্বাধীনতার দাবী করে। নহিলে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলির কোন দোষ নাই। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব ইঁহাদের গুণকীর্তন করিয়া বলেন,—

"প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টসমূহ বর্তমানে যে নীতির অনুসরণ করিতেছেন, তাহাকে ভারতের স্বার্থের বিরোধী বলা চলে না। তাঁহাদের নীতির মূলে কোন অভিসন্ধি নাই। এই সব বন্দী ভারতের স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাস করে অথবা তাহার পক্ষ সমর্থন করে বলিয়া যে তাহাদিগকে আটক রাখা হইয়াছে, এমন কথাও বলা চলে না। মিঃ জিন্না স্বায়ত্তশাসনের পক্ষ সমর্থন করেন এবং পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রীও তাহা করিয়া থাকেন। কোন মতপ্রকাশের জন্য কোন ব্যক্তিকে আটক করা হয় নাই। এদেশের লোকের বক্তৃতায় স্বাধীনতা চাই, একথা যাঁহারা জোরের সংগে বলেন, যদি তাঁহাদের সে কথার কোন মূল্য থাকিত, তবে কি মিঃ গান্ধীকে কোন কথা বলিতে অথবা কিছু লিখিতে দেওয়া হইত, শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকেই কি মার্কিন যুক্তরাজ্যে গমন করিতে দেওয়া হইত?"

ভারত-জোড়া সরকারী আওতায় স্বাধীনতার লীলাখেলা চলিতেছে। কষ্ট শুধু ভাত ও কাপড়ের—এমন অশেষবিধ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ঐ সামান্য কষ্টটুকু ধর্তব্যের মধ্যেই নয়!

জল-কল্লোল

শ্রী প্রবোধ কুমার সান্যাল

বয়স আমাদের সবেমাত্র সতেরো ছাড়িয়েছে, সুতরাং বাইরেটায় যতই সাহস থাক্ মনে মনে সকল বিষয়ে একটা আড়ষ্টতা আছে বৈ কি। জাহাজখানা নোঙর ক'রে রেঙ্গুনের ঘাটে নামতে প্রায় বেলা দশটা বাজলো। আমরা আঁচ পেলুম আশপাশে পুলিশ পাহারা আছে, তা'রা নাকি প্রত্যেক যাত্রীর ওপর কড়া নজর রাখে। বলা বাহুল্য, পুলিশের গন্ধ পেলেই আত্মগোপন করতে ইচ্ছে করে। আমরা তা'র জন্য প্রস্তুত ছিলুম।

শোনা গেল, জাহাজ ঘাটায় নামবার পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে কোথায় যেন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে। যারা ইতর যাত্রী, তাদের সারবন্দী ক'রে নেওয়া হোলো, আমাদের চলতে হোলো তাদেরই সঙ্গে। একটা শব্দ শোনা গেল, কোয়ারেণ্টাইন্! কানাকানিতে জানা গেল, সেখানে আমাদের আটক রাখবে। কেন রাখবে, কোন্ অধিকারে, কে আটকাবে আমাদের,—এসব বিচার করার আগে আমি চোখ টিপলুম রবিকে, রবি চোখ টিপলো আমাকে। সুতরাং আমরা সুযোগ খুঁজছিলুম। আমরা ভয়ে ভয়ে সাহসী হয়েছি।

বেলা আন্দাজ সাড়ে দশটায় আমরা দুজন দুদিক থেকে যে চওড়া পথটায় এসে পৌঁছলুম সেটার নাম স্পার্ক স্ট্রীট। অপরিচিত দেশ, সাগরের পার, অজানা পথ। দুজনে দুটো পুঁটলি আর চামড়ার ব্যাগ নিয়ে হেঁটে চললুম। গোড়া থেকে বুঝতে পেরেছি কাঠ আর চালের কারবার এখানে প্রচুর, তা'র চেয়ে প্রচুর সংখ্যক সুসজ্জিত পানের দোকান। পুরুষেরা বেড়াচ্ছে সিল্কের লুঙ্গি, ছোট সুন্দর জামা আর রঙ্গীন ছাতা হাতে নিয়ে, আর মেয়েরা পথের ধারে বড় বড় লম্বা লম্বা চুরুট বিক্রি করতে বসেছে। এক হাত লম্বা একটি চুরুটের দাম এক পয়সা।

আমরা পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছি, চীন জাপান আর আমেরিকার কথা ভেবেছি, কিন্তু থাকার জায়গা কোথাও পাবো কিনা সেকথা ভাবিনি। হোটেল আর বোর্ডিংয়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ ক'রে জানা গেল, আমাদের কাছে অবশিষ্ট যা টাকাকড়ি আছে তা'তে হাত খরচ বাদ দিয়ে দিন তিনেক চলতে পারে। সুতরাং সে পথ ত্যাগ ক'রে আমরা সোজা পথ ধরলুম। নামবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার সমস্যাটা যেন ঘোরাল হয়ে এলো। আমাদের ভালোমন্দ সুখদুঃখ আহারবিহারের কথা এতকাল বাড়ির লোকেরা ভেবেছে, আজ থেকে আমাদের নিজেদের সে সব ভাবতে হবে। আমরা নিরুদ্দিষ্টভাবে বহুদূর পথ হেঁটে চললুম। জ্যৈষ্ঠের শেষ হলেও কলকাতার মতন গরম এখানে নেই, অনেকটা যেন বসন্তকাল।

রবি সিগারেট খাচ্ছে, জীবন সমস্যাটা সে যেন গায়েই মাখতে চাইছে না। একটু বিমর্ষ, একটু চিন্তান্বিত। একসময় বললুম, তুই কি নার্ভাস হ'য়ে যাচ্ছিস?

নার্ভাস!—রবি বললে, মোটেই না...... এই ব'লে সে ঘন ঘন সিগারেট টানতে লাগলো। অর্থাৎ সে ভাবছে আমি কি প্রকার প্রস্তাব উত্থাপন করি, আর আমি ভাবছি সে কি ভাবে আমাকে নিয়ন্ত্রিত করে। অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এই, আমরা কেউ কারো কাছে হার মানবো না। আমরা জীবন দেখতে বেরিয়েছি!

স্টীমার থেকে নামবার সময় জাহাজের ইঞ্জিনিয়র মিঃ ভাদুড়ীর সঙ্গে আর রবির দেখা হয় নি; রামধনুর মতন তিনি মিলিয়ে গেছেন। বরং হিতেনবাবুদের কাছে জানতে পারা গিয়েছিল, এখানে কোথায় এক দুর্গা বাড়ি আছে, সেখানে নাকি বাঙালীরা জায়গা পায়। পথে মাদ্রাজী ও দক্ষিণী কুলির সংখ্যা প্রচুর। তাদেরই একজনকে প্রশ্ন করলুম, কিন্তু সন্তোষজনক জবাব পেলুম না। আশপাশে দু'একটা খাবারের দোকান দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল, ক্ষিধেও পেয়েছে,—কিন্তু রবির মুখের চেহারা দেখে আহারাদির কথাটা বলতে সাহস নেই। চলেছি তা'র পিছু পিছু আমাকে সে যেন হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে নিরুদ্দেশে। ছোট বেলা দুষ্ট বিড়ালের গলায় দড়ি বেঁধে পথ দিয়ে হিঁচড়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতুম, কতদূরে নিয়ে যাচ্ছি এ প্রশ্ন করার অধিকার বিড়ালের ছিল না। আমার গলায় এখন দড়ি নেই বটে, তবে প্রশ্ন করারও অধিকার নেই। যে-লোকটা দুটাকা সম্বল ক'রে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়ে পড়েছে, পরের মুখ চাওয়া ছাড়া তা'র গতি কোথায়? সুতরাং আমার অভিভাবকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা মেজাজ-মর্জি এবং খেয়াল-খুশি অনুযায়ী আমাকে চলতে হবে। আমার নিজের কোনও স্বকীয়তা নেই।

রবি সকল পথই আমাকে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে চিনিয়ে দিল, অর্থাৎ সে যে নিজে পথ হারিয়ে গণ্ডগোল ক'রে আমাকে অনর্থক হায়রাণ করলো, একথা তাকে বলবার যো নেই; তা'র অক্ষমতা অথবা নির্বুদ্ধিতা তাকে ধরিয়ে দিলে তা'র প্রেস্টিজের হানি হবে,—আমাকে ধমক খেয়ে মরতে হবে। ঘণ্টা দুই পরে আমরা সেই পুরনো স্পার্ক স্ট্রীটেই আবার কেমন ক'রে যেন ছিটকে এসে পড়লুম। রবি বললে, এবার চিনলি ত? দয়া ক'রে বিদেশে যেন পথ হারিয়ো না। আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকো।

আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে সে বললে, একটি কথা তোমার কানে কানে বলি,—ভদ্রলোকদের ক্ষিধে যখন তখন পায় না! তোমাকে নিয়ে আর পারি নে,—এসো।

চায়ের দোকান খুঁজতে গিয়ে আমরা পথের ওপরেই দুর্গা বাড়ির মন্দিরটি পেয়ে গেলাম। অনেককালের কথা হোলো, পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে না থাকা এখন আর অপরাধ নয়। তবে মনে আছে, মন্দিরটি নতুন নয়। ভিতরে একটি প্রতিমা রয়েছে, সেটি স্বর্ণমণ্ডিত; মূল মন্দিরের সামনের ভাগটায় নাট মন্দির। আমরা একপাশে আমাদের পুরনো দু জোড়া জুতো রেখে নাট মন্দিরে উঠে এলাম। রবি বললে, আমি লোকের কাছে আশ্রয় ভিক্ষে করতে পারব না, তুমি বলো। ওই যে লোকটা—

একটি খর্বকায় কৃশ পক্ককেশ বৃদ্ধকে পাওয়া গেল। তিনিই মন্দিরের সেবাইত। লোকটির বয়স পঞ্চান্ন থেকে পঁচাশির মধ্যে কিছু একটা হবে। মন্দিরের সংলগ্ন ছোট একটি ঘরে তাঁর বাস, সেখান থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন গামছা প'রে।

আমি সামনে এসে দাঁড়িয়ে নত দেহে একটি সাষ্টাঙ্গ নমস্কার জ্ঞাপন ক'রে হাসি-হাসি মুখে তাঁর দিকে তাকালুম। আমার নমস্কারের ভঙ্গীতে কোনও বিদ্রূপ অথবা কৃত্রিমতা মেশানো ছিল কিনা আমার এখন মনে নেই, তবে লোকটি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন বিড় বিড় ক'রে বললে। তবে কি লোকটা বাঙালী নয়? আমি সাহস ক'রে বললুম, যদি এবেলাকার মতন একটু থাকার জায়গা পাই —হেঁ হেঁ......আমরা নতুন এসেছি কিনা—

লোকটি অতি দ্রুত ভাষায় কি যেন

বললে। সেটা তিরস্কার, কি গালমন্দ, কি হিতোপদেশ, কিম্বা ভালোবাসার কথা,—কিছুই বুঝতে পারা গেল না। আমরা চ'লে যাবো, কিম্বা দাঁড়াবো, কিম্বা লোকটির সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ আলাপ করবো,—এসব কিছুই বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে দুর্গাঠাকরুণটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোকটি কোন দেশী তবে? কী ভাষা ওর? আমরা তখন বরং গ্রীক অথবা হিব্রুও বুঝতে পারি,—কিন্তু ও লোকটি একেবারেই দুর্বোধ্য।

অবশেষে নিরুপায় হয়ে লোকটির সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য আমি প্রতিমার দিকে কটাক্ষে তাকিয়ে একটা নমস্কার করলুম। কিন্তু তার এমন ফল যে ফলবে তা আগে জানি নি। লোকটা হাসলো। পৃথিবীর যে কোনও ভাষাই দুর্বোধ্য হ'তে পারে, কিন্তু হাসির একটি নিজস্ব ভাষা আছে,—যে হাসে তাকে একটি মুহূর্তেই পরিচিত ক'রে তোলে। লোকটি হাসলো,—কী কালো আর শ্যাওলাপড়া পুরণো দাঁতের পাটি, চোখ দুটো খানিকটা ট্যারা, মুখে আমাদের দুজনের মতনই বসন্তের খানা খোন্দল,—চোখে-চিবুকে-চোয়ালে কেমন একটা চাতুরীর ভাব। লোকটা হাসতেই আমরা যেন কতকটা আস্কারা ক্ষপেয়ে গেলুম।

এমন সময় জনৈক দক্ষিণী উড়িয়া এসে আমাদের বাঁচালো। সে জানালো, আমরা এবেলাকার মতন জায়গা পেয়েছি, তবে আবার বোকার মতন দাঁড়িয়ে রয়েছি কেন? কিন্তু কবিরাজ মশাই যখনই যেতে বলবেন, তখনই চ'লে যেতে হবে।

প্রশ্ন করলুম, কবিরাজ মহাশয় কোন্ জাতি?

সে বললে, বাঙালী!—

বাঙালী! রবির পেটের ভিতর থেকে হাসি ফেনায়িত হয়ে উঠলো। আমি কঠিন চক্ষে ইঙ্গিতে তাকে সতর্ক ক'রে দিলুম।

উড়িয়া বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, বাঙালী! ও'র বাড়ি চাট্‌গাঁ।

মন্দিরের আবর্জনা সন্ধান ক'রে একখানা ছেঁড়া তালপাতার চাটাই পাওয়া গেল। সেইটি এনে একপাশে পেতে আমরা আমাদের সংসার রচনা করলুম। ব্যাগ খোলা হোলো, পুঁট্‌লি এলানো হোলো। আমরা ইচ্ছাপূর্বক এমন পোষাকপরিচ্ছদ এনেছিলুম যে, সবগুলো চুরি গেলেও আমরা ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করতুম না—একটু অসুবিধা হোতো এই মাত্র। কিন্তু সর্বাগ্রে আমাদের দরকার সাবান আর স্নান। রাস্তার কল আছে সামনে, সাবান আছে দোকানে, খাবার আছে হোটেলে। রবি কেমন ক'রে রাস্তার কলের তলায় ব'সে স্নান করবে, কেমন ক'রে জামাকাপড়ে সাবান দেবে, কোথায় একটা ঘটি সংগ্রহ করা হবে, তার জুতোটা ঝেড়ে মুছে রং ক'রে দেবে কে, কাপড় শুকোতে দেওয়া হবে কোথায়, কোথায় আমরা একটু গড়িয়ে নেবো,—ইত্যাদি নানাবিধ দুশ্চিন্তায় আন্দোলিত হয়ে এক সময় রবি ব'লে উঠলো, ন্যাস্‌টি! এরকম জানলে তোর সঙ্গে আমি কিছুতেই আসতুম না। দয়া ক'রে তাড়াতাড়ি জাপান যাবার চেষ্টা করো।

বললুম, স্নানাহার ক'রে ঠাণ্ডা হয়ে ভাবা যাবে।

রবি বললে, এতলোকের মাঝখানে স্নানাহার! আমি কখনো লোকের সামনে গা খুলি নি, তা জানিস? সকলে আমাদের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রয়েছে!

তা থাকুক, সাবান কিনে কাপড় জামা কেচে স্নান ক'রে আমি যখন সুস্থ হয়ে এসে দাঁড়ালুম এবং একখণ্ড ভাঙ্গা চিরুণী আর টিনের আয়না দেখে যখন মাথা আঁচড়ে নবা বাবু সাজলুম, রবি তখন আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঈর্ষান্বিত ভাবে বললে, তাহলে তুই বলছিস আমাকেও মান খোয়াতে হবে? কিন্তু আমার কালচার?

বললুম, স্নান না করলে যদি কাল্‌চার বাঁচে ত বাঁচুক।

সোয়াইন!—ব'লে রবি উঠে দাঁড়ালো গা ঝাড়া দিয়ে। বললে, দয়া ক'রে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকো।

মনে আছে, ঘণ্টাখানেক অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলুম। রবি এর মধ্যে নিজের জুতো পরিষ্কার করেছে, জামাকাপড় থেকে বমি আর তরকারির দাগ তুলেছে সাবান দিয়ে, স্নান করেছে রাস্তার কলে, দাঁত মেজেছে পথের ধুলো দিয়ে, দুজনের কাপড়জামা মেলে দিয়েছে নাটমন্দিরের বারান্দার রেলিংয়ে,—তারপর আমাকে হাসিমুখে ডাকছে, গেট্ রেডি!

চেয়ে দেখি, মাথাটি আঁচড়েছে সে দিব্য! বললে, ক্ষিধেটি নষ্ট ক'রে ত লাভ নেই, চলো বেরিয়ে পড়ি। পেটের মধ্যে আগুনের ডেলা পাকাচ্ছে! কিন্তু যাবার আগে বলি—সাবধান, রাক্ষসের মতন গিলো না। মনে রেখো তোমার এক টাকা পোনে দশ আনার আর কিছু নেই!

চাটাইখানা পাতা রইলো, কাপড়জামাগুলো সেখানেই শুকোতে লাগলো আমরা কেবল ব্যাগটা কোনও প্রকারে কবিরাজ মশাইয়ের ঘরে জিম্মা রেখে বেরিয়ে পড়লাম।

রেঙ্গুনে আমাদের জীবনযাত্রা শুরু।—

হাইকোর্ট সামনেই। তার তিনটি চূড়া—আর কিছু মনে নেই। শহরের দ্রষ্টব্য বস্তু খুঁজে বার ক'রে দেখার জন্য একটা জ্ঞানপ্রবণতার দরকার—আমাদের সে-বয়স নয়। আমরা তখন দেখতে শিখেছি জনতা, হাটের পথ, ডাকঘর, হোটেল—এই সব। প্রথম চোখে পড়ে মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতা,—এটা কলকাতায় তখনও চোখে পড়ে না। গৃহস্থ মেয়েরা একা পথ হাঁটে, দোকান বাজার করে, জিনিস বিক্রি করে, পুরুষদের সঙ্গে সমানে দাঁড়িয়ে কথা কয়, হাসে, বিবাদ বিতর্ক করে—এটা আমাদের চোখে নতুন। অভিজাত পল্লী আমরা দেখি নি,—নদীর ধারে সান্ধ্য ভ্রমণ, আমোদপ্রমোদ, উদ্যান কিম্বা বাগান ভ্রমণ, রঙ্গজগত, ধনী সমাজের জীবনযাত্রা,—এ সব কিছুই আমরা দেখি নি। আমরা ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি জনতার ভীড়ে, ট্রাম রাস্তায়, কাঠগোলা আর কারখানার আশেপাশে, কুলী-কামিনের বস্তির আনাচে কানাচে। আমরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বেড়িয়েছি ৩০নং আর ৪০নং রাস্তায়, স্ট্রাণ্ড রোডে, ব্রুকিং স্ট্রীটে, ইরাবতীর তীরে। পথে পথে খেয়েছি রুটি-মাংস, ফল, চা—কোনও কোনও দিন ভাত অথবা 'নাপ্পি'! নাপ্পির সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি,—কেউ বলে, আরসোলা, পচা ইঁদুর, পচা ব্যাঙ—এ সব ছাড়া নাপ্পি হয় না। আমরা যা খেলুম,—তাতে এ সব পাই নি। সুখাদ্য খাবার পরে জেনেছি সেটা নাপ্পি! বমি আসে নি, বিকার দেখা দেয় নি—দিব্য সুস্থ ছিলাম। চীনারা দুই হাতে দুটো কাঠি ধ'রে ভাত লুফে খায়—এই দৃশ্যটি আমরা হোটেলে ব'সে দেখতুম। হোটেলে কোনও জাতি বিচার নেই। চীনা, জাপানী, বর্মি, দাক্ষিণী ইত্যাদিতে রেঙ্গুন ঠাসা। এদের পরেই মুসলমানের সংখ্যা বেশী ব'লে মনে হয়েছিল। হিন্দু বাঙালী ছিল ফোড়নের মতো—খুঁজে বা'র করতে হয়।

প্রথম দুদিন আমরা পরিশ্রান্ত পশুর মত ক্লান্ত হয়ে এসে নাটমন্দিরের চাটাইয়ের উপর রাত কাটালুম। বালিশ বিছানা কিছু নেই, ধুলো বালি ঝাড়া নেই—আমরা মাথার তলায় হাত রেখে নিদ্রা দিলুম। তৃতীয় দিন বৃষ্টি এলো সন্ধ্যায়, ভিজতে ভিজতে আমরা ফিরলুম। এখানে আর থাকার হুকুম নেই, কবিরাজ মশাই আগেই নোটিশ দিয়েছেন,—সুতরাং সন্ধ্যার পর আমরা সামনের রাস্তায় পায়চারি ক'রে চোরের মতন নাটমন্দিরে এসে ঢুকি, আর চাটাইখানার ওপর মড়ার মতন প'ড়ে থাকি। আজ সমস্ত রাত বৃষ্টি হচ্ছে, ভিজা বাতাসে খোলা নাটমন্দিরে শীত ধরছে, পিঠের তলায় চাটাই ঠাণ্ডা, সেদিন আহারাদিরও তেমন সুবিধা হয় নি। আকাশ যেন আজ ভেঙে পড়েছে আমাদেরই জন্যে।

আগে আমরা জানতুম না, বৃষ্টির সময় নাটমন্দিরের ছাদ চুঁইয়ে হু হু ক'রে জল পড়ে, অথবা তার দেয়ালে আছে ফাটল। এদিকে বৃষ্টির ছাট্ আসছে আমাদের গায়ে, আর মেঝের উপর দিয়ে জলধারা ছুটছে। জলের সঙ্গে আমার চিরদিনের আড়ি, সুতরাং এক সময়ে সন্দেহবশে উঠে দেশলাই জেবলে দেখি, হা হতোস্মি!

আমরা চাটাই পেতেছি নর্দমার দিকটায় এবং ছাদ ও ফাটল চোঁয়ানো জল সমস্তটাই আমাদের তালপাতার চাটাইয়ের তলা দিয়ে নিঃশব্দে প্রবাহিত হচ্ছে!

আমি বললুম, উপায়?—এই, ওঠ্—

রবি ঘুমের ঘোরে বিরক্ত হয়ে বললে, পিঠের মাস্‌ল্ ফুলিয়ে শক্ত করে রাখ, তা হ'লে আর ঠান্ডা লাগবে না।

আমি জেগে ব'সে রইলুম,—কতক্ষণে রাত পোয়াবে। কিন্তু দিদিমা বলতেন, দুঃখের রাত পোয়াতে চায় না! ভেবে দেখলুম, তখন রাত বারোটাও বাজে নি। এখনো অনেক দেরি। দেখতে দেখতে এক সময় রবি উঠে বসলো। বিমূঢ়ের মতন খানিকক্ষণ এদিক ওদিক চেয়ে বললে, ন্যাস্‌টি!—ন্যাস্‌টি শব্দটা সে কোথায় যেন শিখে এসেছে।

বললুম, শোবো কোথায়?

রবি মুখ খিঁচিয়ে উঠলো। বললে, উঠে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকো, আর এক পা রাখারও জায়গা নেই!

বললুম, যদি নিমোনিয়া হয় কে দেখবে?

রবি বললে, ভালোই হয়। তোমার পায়ে দড়ি বেঁধে ইরাবতীতে ভাসিয়ে আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দেবো।—এঃ আমার এক পাটি জুতো যে গেল জলে ডুবে!—ইস, কাপড়খানা সপসপ করছে!

আমরা উঠে বারান্দার পাড়ের উপর সে-রাত্রির মতন ব'সে রইলুম। রবি এক সময় বললে, রাত জেগে ব'সে থাকলে ক্ষিধে পায়—গত বুধবারে এমন সময় শুয়ে আছি খাটের গদিতে, মাথার ওপর পাখা ঘুরছে, সবুজ আলোটা জ্বলছে......

নিজের বাড়ির কথা সে যখন বললে, তখন আমার নিজের বাড়ির ছবিটিও আমার চোখের সামনে ফুটে উঠলো। মতি সেনের গলিতে তেলের আলোটা জ্বলছে টিপটিপ ক'রে, পাড়ার কুকুরটা একটু আগে ডেকে গেছে, পাহারাওয়ালা তখনও দূরে হেঁকে চলেছে,—আমার ঘরটি বোধ করি শূন্য! পূর্বদিকে সাহাদের বাগানের আস্তাবলে ঘোড়ার পা ঠোকার শব্দ হচ্ছে, ওদিকের নারকেল গাছে চিলের ডানার শব্দ, বাড়ির আনাচে বিড়ালের ডাক,—আর মা এতক্ষণ বোধ করি জেগে। খড়্গপুরে ফুটবল ম্যাচ্ খেলার নাম ক'রে ছয়দিন আগে বেরিয়ে পড়েছি,—সুতরাং দুটো জাগ্রত চোখ সংশয় ভরা উৎকণ্ঠায় ভ'রে রয়েছে। একটি একটি ভারাক্রান্ত দিন তাঁর চলেছে, কিন্তু তাঁর সন্তান ফিরে এলো না। তাঁর আর সব ছেলেমেয়ে সংসারী, সকলে গৃহধর্মাশ্রয়ী,—কেবল সর্বশেষ সন্তান ঘর ছাড়া, পলাতক, উচ্ছৃঙ্খল, গৃহবিরাগী। ছেলেটি চলেছে অন্ধের মতো নিয়তির দুশ্ছেদ্য আকর্ষণে, আর মা ছুটেছে তার পিছু পিছু অন্ধকারে, দুর্গমে, অরণ্যে, পর্বতে, সমুদ্রে।

বৃষ্টির ছম্‌ছমে অন্ধকারে এদিক ওদিক তাকিয়ে এক সময় আমি যেন নিশ্চিন্ত হয়ে রবির আরো কাছে স'রে এসে বসলুম। আর যাই হোক্ এবার আমি নাগালের বাইরে।

এমন সময় আকাশ ডেকে উঠলো গুরু গুরু বজ্রগর্জনে, বিদ্যুতের তরবারিখানা ঝলক দিয়ে উঠলো জাহাজঘাটার ওদিকে। রবি বললে, ওদিকে কি দেখছিস রে?

কি যেন উত্তর দিলুম মৃদুস্বরে।

কুলীগিরি করতে রবি কিছুতেই রাজী হোলো না। মিউনিসিপ্যালিটি আপিসে গেলে কুলীদের ঠিকাদার হয়ত হ'তে পারতুম,—সুবিধাও পাওয়া গেল, কিন্তু রবি বেঁকে বসলো। ট্রাম কোম্পানীর আপিসে দিন দুই যাতায়াত করলুম, কিন্তু কন্ডাক্‌টরের একটি কাজও খালি নেই। গেলুম কাঠের গোলায় আর ধানের কলে—যদি কিছু একটা জোটে। তারপর বড় পোস্ট আপিসে,—শুনেছিলুম সেখানে বাঙালীর কর্তৃত্ব,—কিন্তু সেখানে কাজ পেতে গেলে বহুদিন তদ্বির-তদারক আর বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। অথচ আমাদের দরকার অবিলম্বে কিছু নগদ টাকা। আমরা বর্মা রেলওয়ের আপিসে আনাগোনা আরম্ভ ক'রে দিলুম। একই দিনে আমরা আট-দশ জায়গায় দরখাস্ত নিয়ে নিজেরাই দেখাশোনা করি—করতে করতে বেলা পাঁচটা বেজে যায়; আপিসের ছুটির সময় সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকি, বড়বাবুরা বেরিয়ে এলে নমস্কার ক'রে তাঁদের নজরে পড়তে চাই। শেষ অবধি সবাই চ'লে গেলে আমরা নিরুপায়ের মতন একপাশে দাঁড়িয়ে থাকি এবং ঝাড়ুদাররা আমাদের শূন্যপুরী থেকে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়।

আমাদের কাঁচ কাঁচ দাড়ি-গোঁফ উঠেছে। রবি আবদার ধরলো, সে কামাবে। কিন্তু আমিই কোন্ কম? সিগারেট খেতে শিখেছি, এখন শুধু জুল্‌পিটা না কামিয়ে দাড়ি-গোঁফে ক্ষুর বুলোবার অধিকার নিশ্চয়ই হয়েছে। সুতরাং মাঝে মাঝে দুজনের দু'আনা খরচ হয়। চাকরি পেতে দেরি হচ্ছে, জাপান যেতে আরো দেরি হচ্ছে, সুতরাং আমরা একবেলা আহার ধরলুম। মোট অবশিষ্ট টাকার পরিমাণটা পাছে জানতে পারি, পাছে জেনে ভয় পাই, এজন্য সহসা দুজনে আর হিসাব নিকাশ করিনে। ধূমপানের খরচ এখন আমাদের দৈনিক চার পয়সায় নেমে এসেছে। এখনও অন্ধকার দেখছিনে, কারণ এখনও আশা ছাড়িনি।

একদিন আমরা রেঙ্গুনের বড় প্যাগোডা দেখতে গেলাম। নাম 'ফয়া'—'বড় ফয়া'। এক ত্রিকোণ পথের ধারে এই বিশাল বৌদ্ধমন্দির,—এরই স্বর্ণচূড়া দেখা যায় জাহাজ থেকে। বাইরে মন্দিরের চারিদিকে প্রকাণ্ড বাজার আর দোকানপত্র। শহরের এইটি মস্ত কেন্দ্র। আমরা ভিতরে প্রবেশ করলুম, যেন রাজবাড়িতে এলুম। ভিতরটা একটু আবছায়া অন্ধকার,—প্রায় সমস্তটাই কাঠের কাজ। বড় বড় কাঠের থাম, বিচিত্র ছবি, বিচিত্রতর কারুকার্য। বড় বড় ঘৃত-দীপ জ্বলছে, ধূপের সুগন্ধ নির্গত হচ্ছে। কত বারান্দা, কত অলিন্দ, কত পথ কত-দিকে। ভিতরটি শান্ত, অতি পবিত্র পরিবেশ। আমরা বিশাল বিস্তৃত কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলুম। সিঁড়ি যে কত, কত যে উঁচু, কত যে দীর্ঘ—অথচ কি পরিচ্ছন্ন সুন্দর। সিঁড়ির দুইধারে ফুলের সভা। ফুলওয়ালীরা বসেছে ফুলের ডালা সাজিয়ে। ফুল না নেওয়া অসভ্যতা, ফুল ছাড়া ভগবান বুদ্ধদেবকে আর কিছু দেবার নেই,—কিন্তু কোন্ ফুলওয়ালীর কাছে ফুল কিনবো? সবাই যে সুশ্রী, সকলের মুখেই যে মধুর হাসির ছবি! কা'র ফুলের বেশী সুগন্ধ।

দূরের থেকেই আমি মনে মনে একটিকে বেছে নিয়েছি, ওর কাছেই আমার ফুল কিনতে হবে। কিন্তু কাছাকাছি এসে জানলুম, রবির পক্ষপাতিত্ব আমারটিরই ওপর। মেয়েটি হাসছে, বুঝতে পেরেছে আমাদের দ্বন্দ্ব, আমাদের পক্ষপাতিত্ব। আমি স'রে দাঁড়ালুম। রবি প্রশ্ন করলো কোন্ ফুল ভালো?

মেয়েটি কি যেন বর্মিভাষায় বললে, তার ভাষা বুঝলুম না। শুধু হাসি, কুলকুলে হাসি। আমরা নবাগত, ভিন্‌দেশী—আমাদের রং ফর্সা নয়, আমরা তার ভাষা বুঝিনে, আমরা ফুলের সভায় দাঁড়িয়ে নির্বোধের মতো ফুলের ভালো-মন্দ বিচার করি,—মেয়েটি হেসেই অস্থির। মায়ের কাছে শিখেছি, মেয়েছেলের মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে নেই, কারণ মেয়েরা নাকি অপমান বোধ করে। দিদিমা বলেন, মেয়েদের যেখানে অপমান, লক্ষ্মী সেখানে চঞ্চলা। সুতরাং হাস্যমুখীর দিক থেকে যথাসম্ভব মুখ ফিরিয়ে আমি তার ফুলের ডালার দিকে তাকিয়ে রইলুম। আমাদের এই অনাবশ্যক সময়টুকু থম্‌কে দাঁড়ানো দেখে অন্য লোকরা কি ভাববে মনে ক'রে ভয়ে আমার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। খাঁদু, পুটু, মিন্টু—আমার ছোটবেলাকার খেলুনি অনেককে মনে পড়ে, এমন কি 'মহাকালী পাঠশালা'র কোনো কোনো মেয়ে আমার বোনেদের সঙ্গে খেলা করতে আসতো,—তাদেরও মনে পড়ে। কিন্তু হাসিমুখে বাঁকা চোখে কোনো তরুণী মধুরভঙ্গীতে তাকিয়ে দুটো কথা বলেছে,—এ একেবারে

নতুন। মনে হলো, এই পরদেশিনী আমার মনের কোথায় কি যেন একটা ছুঁইয়ে দিল,—সমস্তক্ষণ রি রি করতে লাগলো।

রবি বললে, তোর আর কিছু কিনতে হবে না, আমার থেকেই নিস।—এই ব'লে সে ফুলের গোছা হাতে নিয়ে পকেট থেকে একটা সিকি বার করে মেয়েটির হাতে দিল।

দাম হয়েছিল দু'আনা, সুতরাং মেয়েটি সিকি রেখে বাকি দু'আনা তুলে রবির হাতে দিতে চাইল। রবি একবার আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে হাত সরিয়ে নিল, তারপর বললে, নেই নেই, ও দু-আনা তুম লে লেও।—এইবলে রবি চ'লে যাবার চেষ্টা করলো।

তৎক্ষণাৎ মেয়েটির মুখের হাসি মিলিয়ে মুখখানা কঠিন হয়ে উঠলো এবং তখনই দু'আনা পয়সা সে ছুড়ে ফেলে দিল রবির পথের ওপরে। দৃশ্যটা অপমানজনক মনে ক'রে আমি হন হন করে এগিয়ে গেলুম, কিন্তু রবি সে-মেয়েটির মুখের কাঠিন্য লক্ষ্য ক'রে পয়সা দু'আনা তুলে নিয়ে আমার পিছু পিছু চললো। সমস্ত ব্যাপারটা অতিশয় লজ্জার সঙ্গে হজম করতে হোলো।

দেব-দর্শনের পর ফিরবার পথে আর মেয়েটির দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাবার সাহস করিনি, কিন্তু মেয়েটি যে রবির দিকে তাকিয়ে তার পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে হাসাহাসি করছিল, এটি উপলব্ধি করেছিলুম। সে-হাসি যেন পিছন থেকে ছুরির ফলার মতো গায়ে বিঁধছে।

মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, পথে এসেও সহজ হ'তে পারিনি। খানিকটা ক্ষোভ জমেছিল রবির প্রতি, কিন্তু পাছে সেটা প্রকাশ পায়, এজন্য চুপ ক'রে রইলুম। পুরুষের আচরণে মেয়েরা কোথাও অসম্মান বোধ করে এও যেমন আমি সহ্য করতে পারতুম না, তেমনি মেয়েরা কোথাও মাথা তুলে আত্মস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছে—এইটি কোথাও দেখলেই আমি যেন খুশী হতুম। রাণী লক্ষ্মীবাঈকে কি যে ভালোবাসতুম ছোটবেলা! কেন যে ছুটতুম সুভদ্রার রথের পিছু পিছু। কেন যে কাঁদতুম প্রমীলার চিতারোহণ দৃশ্যে, কেন যে উৎসাহিত আর উত্তেজিতভাবে ঘরময় পায়চারী করতুম দ্রৌপদীর এলো-চুলের দিকে তাকিয়ে, আর কেনই বা সীতার পদে পদে আত্মসমর্পণ আর সহিষ্ণুতা দেখে নিষ্ফল ক্ষোভে কাঁদতুম আড়ালে আড়ালে! রবির প্রতি আমি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলুম।

সে-রাত্রে রবি আমাকে বলছিল, তুই কেন তখন বারণ করলি নে?

বললুম, তুই দান করবি দু'আনা তোর নিজের পয়সা। আমি বারণ করবো—আমার ঘাড়ে ক'টা মাথা?

রবি কিছুক্ষণ সিগারেট টানলো। তারপর বললে, কাল দয়া ক'রে একটি কাজ করো, আমার হয়ে মেয়েটির কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে এসো।

পলকের জন্য আমার প্রাণের মধ্যে উৎসাহ জ্বলে উঠেছিল রবির প্রস্তাবে, কিন্তু তখনই বললুম, না, আমি পারবো না।

কেন পারবিনে শুনি? ও আমার dream-girl, তা জানিস?

জানলুম।

কিছুক্ষণ অবধি রবি চুপ ক'রে প'ড়ে রইলো। তারপর সিগারেটের শেষাংশটা ফেলে দিয়ে এপাশ ফিরে আমার গলা জড়িয়ে বললে, আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানিস: ইচ্ছে হচ্ছে ওর দু'পা জড়িয়ে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চেয়ে আসি।

বললুম, অপরাধের চেয়ে প্রায়শ্চিত্তটা ঘোরালো মনে হচ্ছে।

রবি হেসে উঠলো। বললে, আমি রেঙ্গুন ছেড়ে এখন কোথাও যাবো না... বর্মিভাষা শিখবো।

দিন দুই পরে আমাদের বেকারবৃত্তির এক ফাঁকে আবার আমরা বড়-ফয়া দেখতে গেলুম। উদ্দেশ্য দেবদর্শন মোটেই নয়। আজ বাইরে থেকেই ফুল কিনেছি। রবি চলেছে আমার পিছু পিছু। আমরা কোনো-দিকেই মুখ ফেরাচ্ছিনে, তবে অপাঙ্গ লক্ষ্যটা আছে সেই মেয়েটির উদ্দেশে। কিন্তু সেদিন সে-মেয়েটিকে আর দেখতে পেলুম না। দেখতে পেলে কি করতুম, আবার ফুল কিনতুম কি না—তা আমরা জানিনে। তবে গত দুই দিন থেকে মেয়েটার সেই মুখ-চোখ, হাসি আর ভাবভঙ্গি আমাদের যেন পেয়ে বসেছিল। শুধু একবার তাকে দেখলেই আমরা তৃপ্তি পেতুম। দেখতে না পেয়ে নিরাশ হলুম বটে, কিন্তু স্বস্তিও পেলুম। আমাদের নেশা কেটে গেল। আমরা বেরিয়ে এলুম পথে। বহুকাল অবধি মেয়েটাকে আমরা ভুলতে পারিনি।

পৃথিবীর চেহারা দেখতে পাচ্ছি নিষ্ঠুর। শুনতে পাওয়া যেতো, রেঙ্গুণে এলেই একটা যা হোক কাজ জুটেই যায়, এখানে চাকরিই নাকি মানুষকে খোঁজে। আমরা এই প্রকার বিশ্বাসের ওপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যপন্থা স্থির করেছিলুম। কিন্তু সেদিন আর নেই, বছর পনেরো আগে অবধি নাকি রেঙ্গুণে এলে ভাগ্য ফিরানো যেতো। অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙালীর খোঁজ পেলুম, তাঁদের অনেকেই নাকি পালিয়ে এসে এককালে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আমরাও পালিয়ে এসেছি, কিন্তু সে-যুগ এখন আর নেই। আমাদের ভবিষ্যৎ এই কয়দিনেই সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

কোথায় চাকরি?

হাইকোর্টের অলিগলিতে, মোটরের কার-খানায়, কাস্টম হাউসে, জাহাজের আপিসে, বড় বড় হোটেলে,—আমরা ধর্ণা দিলুম। জঙ্গলের আপিসে হাঁটাহাঁটি করলুম। এখানে এই রেঙ্গুণে ব'সে আমরা উন্নতি করতে চাইনে, আমরা কেবলমাত্র এখানে আহার ও আশ্রয় পাবার একটু সুবিধা পেলেই কতকটা স্থির হয়ে ভাবতে পারি, আমরা অতঃপর কী করবো। একমুঠো অন্ন, আনা চারেক হাতখরচ, কোনো বাড়ির সিঁড়ির তলা—অথবা আনাচ-কানাচ—এই হলেই যথেষ্ট। আমরা কলকাতা ছেড়ে এখানে এসেছি চাকরি পাবার জন্য নয়, চাকুরি-প্রাণ সম্প্রদায়ের মনোবৃত্তি আমাদের নয়, অনন্তকাল ধ'রে কেরানীগিরি করার ধৈর্য আমাদের নেই, দাসত্ব আমাদের কাছে ঘৃণ্য, বড়বাবুদের অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে থাকা আরো ঘৃণ্য,—তবু বর্তমান অবস্থায় বাঁচতে হ'লে, বেঁচে উঠে এখান থেকে পাড়ি দিতে গেলে চাকরি আমাদের অবশ্যই চাই। আমাদের আহারাদির ওপর টান পড়েছে। আগে রাস্তায় চলতুম মন্থরগতিতে, এখন হন্ হন্ ক'রে চ'লে যাই—কারণ, একই যাত্রায় আমাদের বহু জায়গায় যেতে হবে।

ইতিমধ্যে জনৈক পুলিসের গোয়েন্দা আমাদের খোঁজ করছিল। দিনে বা'র দুই সেই লোকটি আমাদের জন্য দুর্গাবাড়িতে আসে, কবিরাজের কাছে সন্ধান নেয়—আবার চ'লে যায়। আমরা লোকটিকে এক পানের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছি। লোকটি বাঙালী ভদ্রলোক, বয়সে প্রবীণ। ভালো গোয়েন্দা প্রায়ই বাঙালী হয়,—কারণ, বাঙালী নাকি চতুর, মস্তিষ্কজীবী। ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই বড় বড় গোয়েন্দারা বাঙালী। অপরাধীদের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি আর গতিবিধি বাঙালী মস্তিষ্কই নাকি বেশি বোঝে। এটি বাঙালীদের পক্ষে কলঙ্ক অথবা গৌরব তা বুঝবার বয়স তখনও আমাদের হয়নি। যাই হোক, গোয়েন্দার আনাগোনায় ভীত হয়ে কবিরাজ মশাই ব'লে দিয়েছেন, নাটমন্দিরে আর আমাদের থাকা হবে না। আমাদের অন্য কোথাও আশ্রয় দেখে নিতে হবে।

কিন্তু আশ্রয় কোথায়?

অনেক কষ্টে আমরা একটি বাঙালী প্রতিষ্ঠান খুঁজে বা'র করলুম। সেটি একটি গান-বাজনা আর মেলামেশার কেন্দ্র। নাম—'আর্য সঙ্গীতালয়'। সেখানে কন্সার্ট বাজে, জলসা হয়, নাটকের মহলা দেয়। আমরা সেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম। প্রথম দৃষ্টিতেই দু'চারজন ভদ্রলোক আমাদের চিনে নিলেন, আমরা পলাতক। বললেন, খোঁজখবর আগে থেকে না নিয়ে এমনভাবে চ'লে আসা আমাদের পক্ষে ভালো হয়নি। এখানে আজ-কাল চাকরি পাওয়া যায় না। তবে হ্যাঁ, চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু সুবিধে কিছু হবে কিনা বলা কঠিন।

আমাদের উদ্দীপনা এক ফঁয়ে নিবে গেল। আমরা সম্পূর্ণ ভিতরে ঢুকে আসরের মাঝখানে বসতে সাহস করলুম না,—আমাদের কাপড়চোপড় এবং চেহারার বর্তমান অবস্থা তার উপযোগীও নয়,—আমরা ঠাঁই নিলুম দরজার কাছে, যেখানে সবাই জুতো ছেড়ে ভিতরে যায়। মিঃ দাস নামক এক ভদ্রলোককেই শুধু দেখলুম, তিনি আমাদের প্রতি কিছু প্রসন্ন এবং দরদী। ভিতরে আলাপ চলছে কোন বর্মীনারীর দুর্নীতির কাহিনী এবং কোন্ সম্ভ্রান্ত বাঙালী যুবকের মদ্যপানের ইতিবৃত্ত। আমরা আড়ষ্ট হয়ে ব'সে রইলুম। ওপাশে ক্ল্যারিওনেট্ বাঁশীর সঙ্গে তবলা চলছে। তবলা চললে রবি তাল না দিয়ে থাকতে পারে না। এখানকার এই বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে ব'সেও সে তাল দিতে লাগলো। তাকে প্রায়ই দেখেছি বইয়ের মলাট বাজিয়ে, কিম্বা পার্শ্ববর্তী বন্ধুর পিঠ থাবড়ে, কিম্বা মেঝের উপর টোকা মেরে তবলার তাল দিতে। তাদের কলুটোলার বাড়িতে নাকি চিরদিন বড় বড় ওস্তাদ এসে কালোয়াতি গান গাইতো। কা'কে কালোয়াতি বলে আমি জানিনে, তবে কালোয়াতি শব্দটা রবির কাছেই আমি প্রথম শিখি। তা'র সঙ্গে এক আধবার কোনো কোনো গানের আসরে গেছি,—সেখানে কতলু খাঁ আর তিনকড়ি চম্পটির উচ্চ চীৎকার আর কর্ণপটাহ-বিদারক তবলার বাদ্য শুনে যতবার বিমর্ষ-ভাবে থেকেছি, রবি ততবার আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে নেচে নেচে বলেছে, বাহবা, বাহবা কি বোল্, বাহবা কি বোল্!—বাইরে বেরিয়ে এসে আমাকে ব্যঙ্গ ক'রে বলেছে, কিচ্ছু বুঝিস্নে তুই,—এরই নাম কালোয়াতি! একবার সে আমাকে জোর ক'রে সেতার বাজানো শেখায়, তারের মেজরাফ্ আমার আঙুলে পরিয়ে সেতারের তারের ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে টুং টাং করায়, আর নিজের মুখে সুর এনে বলে, "যাও, যাও, ফিরে যাও, মন বাঁধা যেখানে! যাও, যাও—"

আর্য সঙ্গীতালয়ে ব'সে আমাদের ঘোরালো জীবন সমস্যার বিভীষিকা যখন উপলব্ধি করছিলুম, রবি তখন তাল দিয়ে কানে কানে বললে, বাঁশী কেমন শুনচিস? দয়া ক'রে ভীমপলশ্রী গৎটা শিখে রাখো।

মিঃ দাস আমাদের হিতোপদেশ দিতে লাগলেন। সেদিনটা সেইভাবেই গেল। আমরা সেদিন শিখে এলুম কোনো কোনো ভদ্রবেশী বাঙালীর মুখে অশ্লীল ভাষা।

প্রবল বর্ষা নেমেছে আকাশ ফেটে। নাটমন্দির ছাড়া আর আমাদের কোথাও আশ্রয় নেই। সুতরাং কবিরাজকে লুকিয়ে আমরা নাটমন্দিরেই এসে আশ্রয় নিলুম। সে দুর্যোগে যে গোয়েন্দা মশাই আসবে না, এ আমরা জানতুম। ভিতরে এসে দেখি, আমাদের চাটাইখানা জলে ভাসছে। জিনিসপত্রগুলো আজো কবিরাজ মশাইয়ের কাছে জিম্মা আছে, গোয়েন্দা সেগুলো পরীক্ষাও ক'রে গেছে। কথা আছে, আমরা আমাদের ব্যাগ আর পুঁটুলি কোনো সময়ে এসে নিয়ে যাবো। তবে নাটমন্দিরে অবশ্য আর থাকবো না।

ওপাশে একখানা ছোট তক্তা ছিল, সেটি কবিরাজের আসন। আমরা চুপি চুপি সেই তক্তাখানার ওপর আশ্রয় নিলুম। কবিরাজ তখন ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছে। প্রতিমার ঘরে তালাবন্ধ।

ঘুমে আমাদের চোখ ঢুলছে। এক ভারতীয়ের দোকানে আমরা কিছু তেলে-ভাজা খাবার খেয়ে এসেছি, তার সঙ্গে এক ঘটি জল। সেগুলো পেটের মধ্যে ঘুলোচ্ছে। কিন্তু আমরা তখন নেতিয়ে পড়ছি, আর জেগে থাকার সাধ্য ছিল না। তক্তাখানার একটা পায়া ভাঙা। একদিকটা উইপোকার গর্ত। কিন্তু লম্বা চওড়ায় সেখানা আন্দাজ তিন ফুট মাত্র। অর্থাৎ কোনোদিকে শুয়েই পা ছড়াবার উপায় নেই। হাঁটু গুটিয়ে পা দুখানা ঘুমের ঘোরে দাঁড় করিয়ে রাখতেই হবে। কথা রইলো, সকলে ওঠবার আগে আমরা চৌকি ছেড়ে দিয়ে স'রে পড়বো। কবিরাজের লাঞ্ছনা আর আমাদের সহ্য হচ্ছে না।

এর পরেও আমরা দিন দুই আর্য সংগীতালয়ে গেলুম। এতদিন পরে এবার একটু আশান্বিত হয়েছি। জনৈক মিঃ চৌধুরীর শ্বশুর মহাশয় রেল কোম্পানীর অফিসের কোন্ বিভাগের বড়বাবু,—তাঁকে ধ'রে পড়লে কিছু একটা সুবিধে হতে পারে। চৌধুরী বললেন, তিনি একটু ব'লেও দিতে পারেন। তাঁর এই অনুগ্রহে আমরা উৎফুল্ল হলুম। ফিরে এসে আমরা খাবারের পয়সা থেকে সাবান কিনলুম, দাড়িগোঁফ কামালুম। আমাদের দুর্যোগের আকাশে ঈষৎ রৌপ্য-রেখা দেখতে পেয়েছি। চাকরি হওয়ামাত্র মাকে জানাবো, দিদিমাকে কাশীতে প্রণামী পাঠাবো। চাকরি হওয়ামাত্র একখানা ধুতি আর একটি জামা কিনবো—জুতো কিনবো পরের মাসে। একবেলা খাবো, সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেবো। মাস তিনেক পরে মায়ের নামে অন্তত পঁচিশ টাকা পাঠাবো। বছর খানেক অন্তত চাকরি ক'রে কোট প্যান্ট কিনবো, একজোড়া মোজা, একটা ফাউন্টেন, আর বর্মিদের মতন একখানা সিল্কের লুঙ্গি। ভেবে দেখলুম, জীবনের গোড়ায় দুঃখ আর দুর্যোগের ভিত শক্ত না হ'লে ভাগ্যের প্রাসাদ দাঁড়ায় না। আমাদের সমস্যার এতদিনে সমাধান হোলো; অবশ্য এর জন্য বেশ কিছু মূল্য দিতে হোলো বৈকি।—তারপর?—তারপর আবার জাপানের পথে সমুদ্রে সমুদ্রে! সেখান থেকে আমেরিকা তরঙ্গে তরঙ্গে! আঁধার রাত্রি ঘনিয়ে আসবে সাগরদিগন্তে, আবার দেখা দেবে স্নিগ্ধ প্রভাত! ধ্রুবতারা প্রতিবিম্বিত হবে অকূল কালো জলে,—আমরা চিনে নেবো তাকে অন্ধকার সমুদ্রের বিভীষিকার মধ্যে। আমরা চলেছি দিগ্বিজয়ে, চলেছি জীবন জোড়া দুর্গম অভিযানে......আমাদের ঘর নেই, বন্ধন নেই, মোহপাশ নেই, আমাদের পথের সীমা নেই। আমরা বার বার বন্দর খুঁজে নেবো, বার বার আমাদের দড়া দড়ি খুলে অকূলের টানে আমাদের জীবনতরী ভাসিয়ে দেবো।

ইতিমধ্যে আমরা একটি বর্মি ছোকরার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছি। ছেলেটি রোগা, ভালো মানুষ, নিরীহ প্রকৃতির। সে গৃহস্থের ছেলে। ম্যাট্রিক পাস ক'রে সে আমাদেরই মতন একটি চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার ইচ্ছে ছোট বোনকে সে পড়াবে। ছেলেটির নাম মং লা মং। আমি তার সঙ্গে ইয়েস, নো, ভেরি গুড—ইত্যাদি বলি, কিন্তু রবি তার ইংরেজি ভাষাটা ওই ছেলেটার ওপর দিয়ে শানিয়ে নেবার চেষ্টা করে। ছেলেটা থতিয়ে ইংরেজি বলে। যাই হোক, লা মংকে আমরা জানিয়ে রেখেছি, আমরা চাকরি পেলে তাকেও ঢুকিয়ে নেবার চেষ্টা করবো। রবি এও ব'লে রেখেছে, আমেরিকা যাবার সময় সে লা মংকে নিজের চাকরিটা দিয়ে যাবে। After all, সে চাকরির পরোয়া করে না। মং লা মং আমাদের পাল্লায় পড়ে তার অদূরবর্তী সৌভাগ্যের স্বপন বুনে চলেছে।

কবিরাজ আমাদের দেখলে এবার নিশ্চয় ক্ষেপে উঠবে, সুতরাং আমরা স্নান করা আর কাপড় ছাড়া বাদ দিয়ে এ' কদিন রাস্তায় রাস্তায় খেয়ে বেড়িয়ে এখানে ওখানে পথের ধারে বিশ্রাম নিচ্ছিলুম। রেঙ্গুনের রাস্তার কলের জলে কেমন একটা মিঠে স্বাদ, আমাদের অনভ্যস্ত জিহ্বা সেটা অবশ্য এতদিনে মেনে নিয়েছিল। আজ আমরা পথে একপেট জল খেয়ে বীরের গর্বে কবিরাজের নাটমন্দিরে গিয়ে উঠলুম। কবিরাজকে শান্ত করার জন্য উড়িয়াকে ডেকে আমাদের চাকরি পাবার স্থিরতাটা জানিয়ে দিলুম। এও জানিয়ে দিলুম এটা দুর্গাবাড়ি জন-সাধারণের প্রতিষ্ঠান—এখানে থাকার অধিকার কিছু আছে আমাদের। তবে যদি তিনি নিতান্তই নারাজ হন আমরা পরোয়াও করিনে। দরকার হলে আমরা স্যার মাং-থি-বা-র বাড়িতে গেস্ট হয়ে থাকবো। স্যার মাং-থি-বা রবির বাবার বন্ধু; রবিরা হলো জগৎপ্রসিদ্ধ কলুটোলার সরকার। রাজপুত্র বনে গিয়ে কাঠুরিয়ার কুটো চালার নীচে ওঠে বটে, কাঠুরিয়ার অবহেলাও কিছু সহ্য করে। তবে কাঠুরিয়া আর রাজকুমার এক পর্যায়ভুক্ত নয়—এবং রাজপুত্রের আবার সুদিন আসবে, আসতে বাধ্য। তখন যদি মন খুশী থাকে, তবে কাঠুরিয়া কিছু বকশিসও পেয়ে যেতে পারে।

কবিরাজের মুখের ওপর এ সব শুনিয়ে দিয়ে বললুম, দিন ব্যাগটা বার করে দিন।

রবির অনর্গল মিছে কথা আর বাঁকা কথা শুনে কবিরাজ একটু থতিয়ে গিয়েছিল, এবার তার নির্দেশে উড়িয়া লোকটি আমাদের ব্যাগটা বার করে আনলো। আমরা যে সাধারণ রাস্তার লোক নই, একথা লোকটা বুঝতে পেরে অনেকটা যেন হাল ছেড়ে দিল। আমরা বেশ একটু আত্মাভিমানের সঙ্গেই ব্যাগ খুলে আমাদের কাপড়-জামা বার করলুম। রবি ইচ্ছে করে তার 'বায়নকুলারটি' বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবার গুছিয়ে রেখে দিল। আমি আমার কলবিগড়ানো হাতঘড়িটাও বার করে দেখিয়ে আবার রেখে দিলুম। কবিরাজের মুখের ওপর ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ করলুম, আমরা ছদ্মবেশী ক্রোড়পতির সন্তান, পৃথিবীসুদ্ধ লোক আমাদের ভয় করে, আমাদের নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করলে দুর্গাবাড়ির এই সেবাইতের পদটি লোপ পেতে পারে। সুতরাং সাবধান।

মামা বলতেন, পাঞ্জাবী পরে চাকরি করতে গেলে সাহেবরা বিরক্ত হয়, শার্টের ওপর কোট চড়িয়ে গেলে তাদের সুনজর পড়ে। আমার সাবান কাচা মোটা জিনের কোট তখনও ভিজা—কিন্তু ভিজা কোট পরেই আমাকে বেরুতে হোলো। দিদিমা বলতেন, দুর্গানাম ক'রে বেরোলে সকল বিঘ্ন কেটে যায়। কিন্তু সোণার দুর্গা আমাদের সব ঘটনারই সাক্ষী, তিনি আমাদের সব কিছুই সকৌতুকে লক্ষ্য করছেন, ঘটা করে আর তাঁর নাম না নিলেও চলবে।

মাথাটি আঁচড়েছি বেশ চকচকে ক'রে। জামাকাপড় যথাসম্ভব ফিটফাট। ভিজা জুতো জোড়ায় একপ্রকার মেটে-মেটে চাকচিক্য। আমরা যথাসময়ে প্রস্তুত হয়ে বেরোলুম। রবি সম্প্রতি ব্রাহ্ম সমাজের সেই সরু গলিটার কোন্ বাড়িতে যেন কার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে আনাগোনা করে,—একবার কোথায় যেন বালক বালিকা উৎসবে যোগদান করেছিল,—তার মুখে বোলপুর আর মাঘোৎসবের কথা শুনেছি—সুতরাং নাটমন্দির থেকে বেরোবার সময় দুর্গা প্রতিমাকে সে নমস্কার করে গেল না। আমি বামুনের ছেলে, পূজা-অর্চনা, গঙ্গাস্নান, পাল-পার্বণ ও পৌত্তলিকতার মধ্যে মানুষ,—এগুলো আমাকে ভূতের মতন পেয়ে থাকে, সুতরাং চট করে সংস্কার মুক্ত হতে বাধে। অথচ রবির কাছে হার মানতেও আমি রাজি নই এবং তোড়জোড় করে প্রতিমা প্রণামেও আমার অশেষ লজ্জা। যারা কালীঘাটে গিয়ে গড়াগড়ি দেয়, কিম্বা ট্রামে চড়ে যাবার সময় ঠনঠনে কালীতলার কাছে এসে চোখ বুজে কাণ মলে হাত জোড় করে, কিম্বা মন্দির দেখলেই সকলের মাঝখানে চোখ বুজে বিজ বিজ করতে থাকে—তাদের দিকে তাকালে আমার হাসি ফেনিয়ে ওঠে। মারোয়াড়ীরা মাছ মাংস খায় না, কিন্তু মোহনবাগানকে জেতাবার জন্য কালীঘাটে তারা জোড়া পাঁঠাবলি মানৎ করে, জুয়াড়ীরা ঘোড়দৌড়ের মাঠে টাকা জিতে মদ খায় অথচ জেতবার আগে ভয়ে ভয়ে বৌবাজারের ফিরিঙ্গী কালীর দরজায় মাথা ঠোকে, উকীলরা মিথ্যা সাক্ষ্যকে হাকিমের দরবারে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে—অথচ ট্রামে চড়ে যাবার সময় কালীতলার কাছে ভক্তি ভরে চোখ বোজে—মুখে পান, হাতে রীফ এবং জ্বলন্ত সিগারেট। পোদ্দারের দোকানের মাথায় বসানো থাকে সিঁদুর মাখানো গণেশ ঠাকুর, ভেজাল ঘিওয়ালার জাবদা খাতায় লেখা থাকে—'শ্রীশ্রীকালীমাতার শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এই কারবার করিতেছি।'

সুতরাং রবিকে লুকিয়ে নিজেকে লুকিয়ে প্রতিমার দিকে কটাক্ষে একবার তাকিয়ে অমনি কি একটা কাজ পলকের মধ্যে সেরে হন হন করে বেরিয়ে পড়লুম। মনে জানি কি একটা যেন সংস্কারের ঋণ শোধ করছি, কিন্তু একেবারে তাচ্ছিল্য করে চলে যেতেও বাধে। এরই নাম ভূত।

আজ বর্ষার পরে সুন্দর রৌদ্রে বেলাটা ভরে আছে। আমাদের প্রাণে অসীম সাহস। জানতে পেরেছি মিঃ চৌধুরী তাঁর শ্বশুর মশাইকে বলে রেখেছেন। আমরা ভবাযুক্ত হয়ে রেল কোম্পানীর আপিস বাড়ির দোতলায় গিয়ে উঠলুম। বড়বাবু মিঃ চ্যাটার্জির ঘর খুঁজে বার করলুম।

চাপরাশি আমাদের ভিতরে নিয়ে গেল। বহুলোক ভিতরে কাজ করছে, সবাই মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকালো। বড়বাবু বসে রয়েছেন ইস্কুল মাস্টারের মতন। তাঁর রং কালো, মুখে এক জোড়া মস্ত গোঁফ, চশমার ভিতর দিয়ে দেখছি দুটো ধারালো ছোট ছোট চোখ—তাঁকে দেখে সাহস কমে যায়। আমরা কাছে গিয়ে সবিনয় নমস্কার করে দাঁড়াতেই তিনি তাঁর তীক্ষ্ম চোখ দুটো তুলে বললেন, কি চাই?

রবি বললে, আমরা কলকাতা থেকে এসেছি......

পালিয়ে!—বেশ ত, কি চাই।

আমি বললুম যদি আমাদের একটু কাজকর্ম জোটে—!

বড়বাবু মোটা গলায় বললেন, চাকরি?

রবি বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ—

পালিয়ে এলেই চাকরি হয়? চাকরি গাছে ফলে? বড়বাবু হেঁকে উঠলেন।

আমি বললুম, যদি আপনার অনুগ্রহ থাকে—

অনুগ্রহ!—বড়বাবু কর্কশ কণ্ঠে বললেন, মা-বাপকে দুঃখ দিয়ে যারা পালিয়ে আসে তাদের ওপর অনুগ্রহ? তোমাদের পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি তা জানো?

ভয়ে ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে লাগলুম। আমরা নির্বাক, নতমুখ।

বড়বাবু পুনরায় বললেন, চাকরি এখানে খালি নেই,—যাও, বেরোও।

আমরা এক পাও নড়ছিনে। মুখ তুলে বললুম, আজ্ঞে—

কাজের সময় এখন বিরক্ত করো না বলছি! চলে যাও—

বললুম, মিঃ চৌধুরী—মানে, আপনার জামাই আমাদের বলে দিয়েছেন কিনা—

তিনি উত্তপ্ত কণ্ঠে বললেন, তবে মিস্টার চৌধুরীর কাছেই যাওনা কেন?

রবি আমার পিছনে দাঁড়িয়ে কিছু বলতেই পারছে না। তোষামোদ, প্রার্থনা, মিনতি, আবেদন—এ সব কাজে সে আমাকেই আগে ঠেলে দেয়। সুতরাং আমিই বললুম, আপনার দয়া না পেলে আমাদের আর কোনো উপায় নেই, স্যার।

বটে!—চাটুয্যে বললেন, জাহাজ-পালিয়ে বদমায়েসি করতে এসেছ দুজনে বিদেশে কেমন? চালাকি পেয়েছ? মায়ে খেদানো, বাপে তাড়ানো......পাজি, রাস্কেল এখানে দাঁড়িয়ে আমার কাজ পণ্ড করতে চাও? বেরোও এখান থেকে—

এক ঘর লোক আমাদের অপমান আর লাঞ্ছনা দেখছে। রবি এক এক পা পিছোতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু আমার পা যেন আর উঠছে না। জীবনে আমার এই প্রথম বড়বাবু নামক পদার্থের অভিজ্ঞতা। রেঙ্গুনে যে উদার প্রকৃতি ও স্নেহশীল ভদ্র বাঙালী ছিল না তা নয়—কিন্তু তাঁরা আমাদের চোখে পড়েন নি—আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে ভদ্রসমাজের নীচের তলাটাই দেখে এসেছি। অতঃপর প্রবাসী বাঙালী শুনলেই আমার যেন আতঙ্ক দেখা দিত।

চাটুয্যে আমাদের কোনো প্রার্থনা ও আবেদন শুনতে চাইলেন না এবং আমাদের নতমুখের উপর তিনি যথেচ্ছ কটূক্তি ও তিরস্কার বর্ষণ করতে লাগলেন। সম্ভবত তাঁর চাকরি দেবার ক্ষমতা থাকলে তিনি আর একটু সংযত ভাষা বলতেন, কিন্তু হয়ত তাঁর ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ—কটূক্তির আড়ালে সেটি তিনি গোপন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখানে নিরাশ হলে আর আমাদের কোনো উপায় নেই—নিরাশ্রয় হয়ে অনাহারে আমাদের পথে পথে ঘুরতে হবে। এখানে আমাদের কোনো আত্মীয় কোনো বন্ধু, পরিচিত—কেউ কোথাও নেই। এখান থেকে চিঠি যায় পাঁচ দিনে, মনিঅর্ডার আসে আট দিনে। তাছাড়া দেশে আমাদের মুখ দেখাবার উপায় নেই, আমরা আমাদের কীর্তি প্রকাশ করতে পারবো না কারো কাছে। দয়া, মায়া, স্নেহ—কোথাও কিছু অবশিষ্ট রেখে আসিনি। আমরা সবাইকে প্রতারিত ক'রে এসেছি, সকলের বুকে ছুরি বসিয়ে গা ঢাকা দিয়েছি। আত্মহত্যা ছাড়া

আর আমাদের পথ নেই। সামনে মরুভূমি, নিষ্ঠুর সংসার, দয়াহীন মানুষের সমাজ, কষ্টদায়ক জীবনযাত্রা,—বড়বাবুর চেহারার ভিতর দিয়ে সবগুলো যেন এক সঙ্গে আমাদের গ্রাস করতে এলো। আমরা অন্ধকার দেখলুম।

বড়বাবু সহসা ঘণ্টা বাজিয়ে চীৎকার করলেন, চাপরাশি—!

চাপরাশি ছুটে আসছে, একটি পলকমাত্র, আমাদের সর্বশেষ প্রচেষ্টা, ভবিষ্যতের স্বপ্নজাল, আমাদের বিপন্ন জীবনের চরম গ্লানি,—আমি সহসা নতজানু হয়ে ব'সে বড়বাবুর একখানা পা দু'হাতে ধরলুম—। কান্নায় ভরা আর্তকণ্ঠে বললুম, আমাদের এমন ক'রে তাড়িয়ে দেবেন না, স্যার্—আমরা অনেক আশা ক'রে আপনার পায়ের কাছে এসেছি—

চাটুজ্যে প্রচণ্ড বিরক্তি আর তিক্ত ভাষার সঙ্গে কর্কশভাবে তাঁর পাখানা সরিয়ে নিলেন। ঠিক বুঝতে পারলুম না, তাঁর পাখানা আমার হাত দুখানাকে অপমান করলো কি না। তবে এই কথাটা সেই মুহূর্তেই মনে হলো, কাকুতিমিনতির আর কোনো দাম নেই!

অপমানিত বিবর্ণ মুখে প্রায় পঞ্চাশটি লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে দিয়ে নিজের মৃতদেহখানা টানতে টানতে হল্‌ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম। এরকম ব্যক্তির সংখ্যা খুব বেশি নয়, তাই সংসার এখনও সহনীয়।

পথে বেরিয়ে গলার ভিতর থেকে বার বার কি যেন একটা ঠেলে উঠছিল, আমি বারবার ঢোক গিলছিলুম। অনেকক্ষণ এলোমেলো পথ হাঁটবার পর রবি ধীরে ধীরে বললে, চাক্‌রি না হয় নাই হবে,—তুই ওর পায়ে হাত দিতে গেলি কেন?

আমি তখন কতকটা সহজ হয়েছি। একটু হেসে বললুম, মনে করেছিলুম, দুজনে ওর দুখানা পা ধ'রে ঝুলে পড়বো!

রবি বললে, আমি! আমি সে বান্দাই নই!—নে, এই কল্‌টা টেপ্‌, একটু জল খেয়ে নিই।

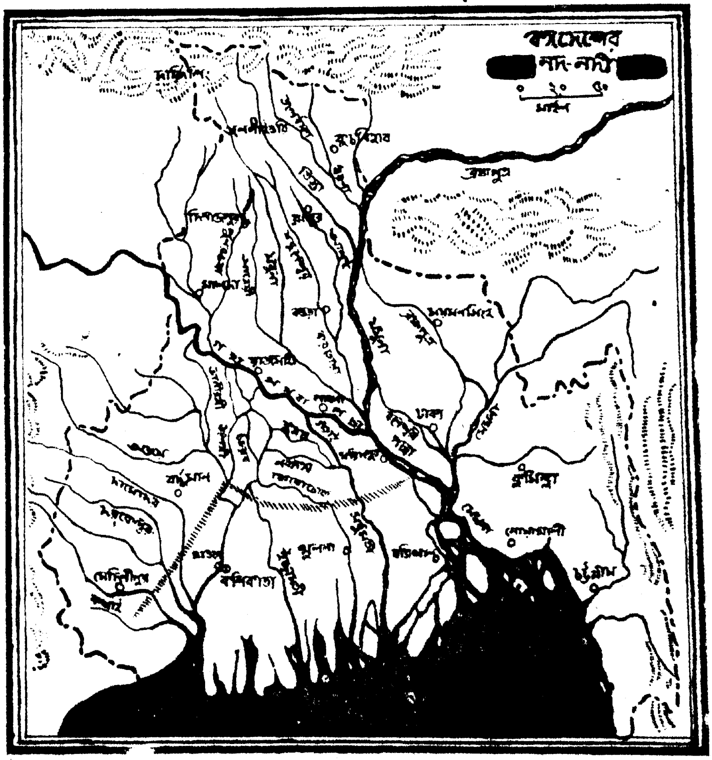
তার জল খাওয়া হ'লে আমি বললুম, দাঁড়া, আমিও একটু খাই। টেপ কল্‌টা—

বিজ্ঞানের কথা

নদীমাতৃক বাংলার ভাগীরথী

ডক্টর শ্রীকালীপদ বসু, ডি-এস্‌সি (ঢাকা), পি-এইচ্‌-ডি (মিউনিক্)

লোকের স্বাস্থ্য ও সম্পদ দেশের নদীর অবস্থান, অবস্থা এবং গতিবিধির ওপর অনেকটা নির্ভর করে। বাঙলা সম্বন্ধে এই কথাটা আরো বেশী করে খাটে। নদী-বাহিত পলিমাটী হতেই বাঙলার ভূমির উৎপত্তি এবং নদীর সাহায্যেই বহুশত বৎসরের এই দেশের মাটি ক্রমশ উঁচু হয়ে মানুষের বাসোপযোগী হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের বৃষ্টির জল, তুষারগলিত জল ও প্রস্রবণের জলের সঙ্গে নদী নিয়ে এসেছে পাহাড়ের গায়ের অনেক মাটী। মোহনার কাছে এসে নদীর গতি হয়ে গিয়েছে খুবই মন্দ, ফলে নদীবাহিত মাটী জল থেকে নীচে পড়ে জমা হতে আরম্ভ হয়েছে এবং কালক্রমে সেখানে ভূখণ্ডের সৃষ্টি হয়ে নদীর মুখ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে; তখন নদী বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেক শাখার মুখে এই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এভাবে ব-দ্বীপের সৃষ্টি ক্রমশ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। বাঙলার মাটী তারপর ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে বাসোপযোগী হয়েছে সমুদ্রের জোয়ারের সঙ্গে নেওয়া নদীর মুখের মাটীর সাহায্যে। এই মাটী নদীর অঞ্চলে জমা হয়েছে এবং পরে ভাঁটার সময় মাটীবিহীন পরিষ্কার জল সমুদ্রে ফিরে গেছে। সমুদ্রের এই জোয়ার-ভাঁটা রোজই চলছে, কিন্তু নদী পাহাড় থেকে মাটী আনছে কেবল বর্ষার কয় মাস। এভাবেই সমুদ্রগর্ভে আমাদের বাঙলা দেশের সৃষ্টি হয়েছে—এ সংগঠনে সবচেয়ে বেশী সাহায্য



করেছে গঙ্গানদী এবং গঙ্গানদীর ভাগীরথী বা হুগলীর মোহনায় এ ব-দ্বীপের সৃষ্টি খুব বেশী হয়েছে। ছোট-নাগপুর ও সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ে উৎপন্ন দামোদর, অজয় এবং রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদীও বাঙলার ভূমি গঠনে সাহায্য

করেছে। ব-দ্বীপ গঠন এখনও চলছে এবং ভবিষ্যতে এই বিষয়ে ব্রহ্মপুত্রের দান বেড়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। তিস্তা ও মহানন্দার বাহিত মাটী দ্বারাই উত্তরবঙ্গ গড়ে উঠছে।

বাঙালীর জীবনের শুভাশুভ বাঙলার নদীর সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নদীর জলের সাহায্যেই বাঙলার চাষবাস হয়ে থাকে এবং নদীর ওপর দিয়েই তার ব্যবসা-বাণিজ্যের জিনিসপত্রের চলাচল হয়। যেখানেই নদীর অবস্থা ক্ষীণ হয়েছে, সেখানেই দেখা দিয়েছে খাদ্যাভাব ও ব্যাধি। ভাগীরথীর দুরবস্থার সংগে সংগেই এসেছে মধ্য বাঙলার বর্তমান শোচনীয় অবস্থা। একশ বছর আগেও বাঙলার এই অংশ ছিল স্বাস্থ্য ও সম্পদের আবাসভূমি: এখন ভয় হয়, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে যে জলাভূমি ও জঙ্গল থেকে এর উৎপত্তি হয়েছে, সেই অবস্থাতেই সে আবার ফিরে যেতে পারে।

বাঙলার নদীগুলোকে (মানচিত্র দ্রষ্টব্য) এইভাবে ভাগ করা যেতে পারে—

(১) বারমেসে নদী [Perennial Rivers]—যেমন গংগা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা। পাহাড়ে অঞ্চলের অনেকটা জায়গার [catchment area] বৃষ্টির জল এ নদীগুলো পায়। এই অঞ্চলে খুব ঘন-নিবিষ্ট গাছপালা থাকায়, বৃষ্টি পতনের বেগ কিছুটা মন্দীভূত হয়ে অনেকটা জল মাটীর নীচে চুঁয়ে যায়। বর্ষা শেষ হয়ে গেলে শীত ও গ্রীষ্মকালে মাটীর নীচের এই জল নদীতে এসে পড়ে। কতকটা এই কারণে এবং কতকটা তুষার-গলা জল পাওয়াতে এই নদীগুলোতে বার মাসই কিছুটা জল থাকে। নদীর উৎপত্তি-স্থলে যথেষ্ট গাছপালা থাকা এজন্য দরকার এবং সেগুলো ধ্বংস করা নদীর পক্ষে খুবই ক্ষতিকর।

(২) উপনদী [Tributary Rivers]—এগুলো পর্বত প্রভৃতি হতে উৎপন্ন হয়ে জল বহন করে আনে ও অন্য একটি নদীতে পড়ে তাকে পুষ্ট করে। মহানন্দা হিমালয় থেকে বেরিয়ে উত্তরবঙ্গ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গোদাগাড়ীর নিকট গঙ্গার সংগে মিশেছে। পূর্ণভবা মহানন্দার সংগে মিলে তাকে পুষ্ট করেছে। পূর্বে তিস্তা, আত্রেয়ী ও করতোয়া নীচে মহানন্দার সঙ্গে মিশে জাফরগঞ্জ বা বর্তমান গোয়ালন্দের নিকট গংগায় মিলিত হয়েছে। বর্তমানে তিস্তা গংগাকে পরিত্যাগ করে আরো অনেক উত্তরে ব্রহ্মপুত্রের সংগে মিশে তার প্রতাপ অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এর ফলে বর্তমানে ব্রহ্মপুত্র ময়মনসিংহের ভেতর না গিয়ে যমুনার ভেতর দিয়ে তার প্রধান স্রোত চালিয়েছে। আত্রেয়ী, করতোয়া প্রভৃতি উপনদীগুলোও এখন গংগাকে ত্যাগ করে যমুনা ও গংগার সংগমস্থল গোয়ালন্দের কিছু ওপরে যমুনা বা ব্রহ্মপুত্রে এসে পড়েছে।

(৩) শাখা নদী [Spill channels]—গতিপথে নদী যখন বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়, তখন তাদের প্রত্যেককে শাখা নদী বলে। হিমালয় থেকে বেরিয়ে এসে গংগা বাঙলার দোরগোড়ায় রাজমহলের কিছু পূর্বে শাখায় বিভক্ত হয়েছে—এর সব চেয়ে পশ্চিম দিককার শাখা হোল ভাগীরথী ও সবচেয়ে পূবদিকে পদ্মা। এ-পদ্মা দিয়েই বর্তমানে গংগার প্রধান স্রোত চলছে। এর উভয়ের ভেতর আছে জলংগী, ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, গড়াই।

(৪) আর এক রকমের নদী হল পাহাড়ে খরস্রোতা নদী [Hill Torrents] পশ্চিম বংগের দামোদর অজয়, রূপনারায়ণ প্রভৃতি এই শ্রেণীর নদী। এরা ছোটনাগপুরে ও সাঁওতাল পরগণার অপেক্ষাকৃত নীচু পাহাড়-শ্রেণী থেকে বেরিয়ে ভাগীরথী বা হুগলী নদীতে এসে পড়েছে। শুধু বৃষ্টির সময়েই এদের জল খরস্রোতে প্রবাহিত হয়; এসব পাহাড়ে গাছপালা খুবই অল্প বলে বৃষ্টির জল মাটীর নীচে সঞ্চিত হতে পারে না এবং বৃষ্টি শেষ হয়ে গেলেই এদের স্রোতও অতি ক্ষীণ হয়ে যায়; তখন এরা এক রকম শুকিয়ে যায় বললেই চলে।

বর্তমান প্রবন্ধে ভাগীরথী সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করব। রাজমহলের পূবে শুতি হতে আরম্ভ করে গংগাসাগর অবধি প্রবাহিত গংগার সবচেয়ে পশ্চিম শাখার নাম ভাগীরথী। আরো কিছু পূবে গংগার আর একটি শাখা জলংগী বেরিয়েছে। জলংগী নদীয়াতে ভাগীরথীর সংগে মিশেছে—এর পর থেকে সমুদ্র অবধি ভাগীরথীকে অনেক সময় হুগলী নদী বলা হয়। যদিও আজকাল গংগার প্রধান স্রোত পদ্মা দিয়েই যাচ্ছে, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞদের মতে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্তও গঙ্গার প্রধান স্রোত ভাগীরথী দিয়েই প্রবাহিত হত এবং এর সংগে জড়িত ছিল মধ্য বাঙলার স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও বার্ণিয়ার [Bernier] এই জনপদকে মিশরের চেয়েও সমৃদ্ধিশালী বলে বর্ণনা করেছেন। এমন কি, ১৮১৫ সালেও হ্যামিল্টন সাহেব হুগলী, হাওড়া ও বর্ধমান জেলাকে অত্যন্ত উর্বর ও স্বাস্থ্যকর জায়গা বলেছেন। আজকাল এ জেলাগুলোর দুর্দশার কথা কারো অজানা নেই।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এক বক্তৃতা-প্রসংগে স্যার উইলিয়াম উইলককস্ [Sir William Willcocks] ভাগীরথীর উৎপত্তি সম্বন্ধে এক অভিনব মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে প্রথম থেকে পদ্মা দিয়েই গংগার প্রধান স্রোত বরাবর চলে এসেছে এবং গংগা নদীকে দক্ষিণ বাঙলায় দামোদর ও অজয় প্রভৃতি নদীর সংগে যোগ করে দেওয়ার জন্যে প্রাচীনকালে রাজা ভগীরথ কতকগুলো খাল কাটান, এর একটি খাল ভাগীরথী ও অপরগুলো জলংগী, মাথাভাংগা প্রভৃতি নদীরূপে পরে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু বিবিধ প্রমাণ আলোচনা করলে ভাগীরথী দিয়েই যে প্রথম গংগার প্রধান স্রোত বইত, সে বিষয়ে বিশেষ কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। প্রমাণগুলো কিছুটা বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক এবং খানিকটা লোকের ধর্মবিশ্বাস ও আচার থেকে পাওয়া যায়। ব-দ্বীপ-গঠন ভাগীরথী বা হুগলীর মোহনায়ই অনেক বেশী হয়েছে; যেখানে পদ্মা ও মেঘনার সম্মিলিত ধারা সমুদ্রে পড়েছে, সেখানে ব-দ্বীপ-গঠন অনেকটা কম—এতে বোঝা যাচ্ছে, অনেকদিন পর্যন্ত গংগার জলের বেশীর ভাগই ভাগীরথী বেয়ে সমুদ্রে পড়ত। দামোদর প্রভৃতি নদী দিয়ে এত অল্প জল ও মাটী এসেছে ও আসছে যে, তা থেকে ভাগীরথীর মোহনায় এত ব-দ্বীপ-গঠন হতে পারে না। গংগা হিন্দুর নিকট চিরদিনই পবিত্র। সাধারণত নদীর সর্বপুরাতন ধারাকেই লোকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে। ভাগীরথীর তীরে নবদ্বীপ, কাটোয়া, ত্রিবেণী, কালীঘাট, গংগাসাগর প্রভৃতি হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থস্থান। পদ্মা নদীকে কেহ পবিত্র বলে মনে করে না এবং পদ্মার তীরে কোন তীর্থস্থানও নেই। ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় ১১৬ খৃঃ প্লিনি [Pliny] ও ১৪০ খৃঃ টলেমি [Ptolemy] কর্তৃক ত্রিবেণীর উল্লেখে। ত্রিবেণী হুগলী শহরের কিছু ওপরে অবস্থিত। এখানে ভাগীরথী থেকে যমুনা ও সরস্বতী বের হয়ে গেছে—বর্তমানে সরস্বতী সম্পূর্ণ শুষ্ক, যমুনাও অতি ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। অধিকন্তু রাজা ধর্মপালের [৭৮০—৮২০ খৃঃ] খালিমপুরের তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে, গংগা রাজমহলের উত্তরেও ভাগীরথী নামে অভিহিত হত—এ থেকে বোঝা যায়, বাঙলার ভেতরে প্রধানত ভাগীরথী দিয়েই তখন স্রোত বইত। পদ্মা কখনও ভাগীরথী নামে অভিহিত হয়নি।

নদীর এরূপ গতি-পরিবর্তন ব-দ্বীপ-গঠনকারী নদীগুলোর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। গংগা পদ্মাবাহিনী হওয়ার আগে উত্তরবঙ্গের মহানন্দা, কুশী ও তিস্তা প্রভৃতি নদী নিম্ন গংগায় এসে পড়ায় গংগার জল পূবদিকে পদ্মায় যাওয়ার পথে এক প্রধান বাধার সৃষ্টি করত। পরে মহানন্দা ও কুশী যখন উত্তরবঙ্গের অন্যান্য

নদী থেকে আলাদা হয়ে আরো ওপরে গঙ্গায় এসে পড়ল, তখন পদ্মা-পথে গঙ্গার জল যাওয়ার বাধা দূর হয়ে গেল এবং ভাগীরথীর ভেতর দিয়ে গঙ্গার জলের ভাগ গেল কমে। এ ঘটনা ঘটে সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে। পদ্মা হয়ত প্রথম থেকেই ছিল, কিন্তু তখন তার প্রতাপ ছিল খুবই সামান্য। ১৪০ খৃষ্টাব্দে টলেমির গ্রন্থেও পদ্মার অস্তিত্বের আভাষ পাওয়া যায়। অনুরূপ একটি ঘটনা একশো বছর আগেও ঘটেছে। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে তিস্তা ব্রহ্মপুত্রে এসে পড়ার পর ব্রহ্মপুত্রের প্রবল স্রোত যমুনা দিয়ে চলে এবং গোয়ালন্দে পদ্মার সঙ্গে মিলে যায়। এতে গঙ্গার জলপ্রবাহে খুব বাধার সৃষ্টি হয় ও যমুনার প্রবল জলধারা গঙ্গার জল পেছনদিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। ফলে গঙ্গার জল যেতে থাকে গড়াই নদীর ভেতর দিয়ে—এই গড়াই নদী কুষ্টিয়ার কাছে গঙ্গা থেকে বের হয়েছে। ১৭৬৪ খৃঃ রেণেলের সময় গড়াই নদী ছিল অতি ক্ষীণ, এতে জল থাকত ২।১ হাত। ১৮৩৮ সালের পর থেকে এই নদী ক্রমশ প্রশস্ত ও গভীর হয়ে উঠেছে। হয়ত এই ধাক্কায় ধীরে ধীরে মাথাভাঙ্গা, জলঙ্গী ও ভাগীরথীরও উপকার হতে পারে।

বর্তমানে গঙ্গায় ভাগীরথীর মুখ এত উঁচু বালুর স্তূপে ভরে গেছে যে, শীত-কালে গঙ্গার জল ভাগীরথীতে মোটেই আসে না। বর্ষাকালে অবিশ্যি কিছু জল আসে, কিন্তু বেশীর ভাগই যায় পদ্মা দিয়ে। ফলে ভাগীরথীর শাখা সরস্বতী ও যমুনা এক রকম শুকিয়ে গেছে। ভাগীরথীর প্রথমাংশের অবস্থা খুবই খারাপ, নীচের অংশের দশাও প্রায় একরকমই হোত যদি না পশ্চিম বঙ্গের দামোদর, অজয় প্রভৃতি নদী এসে ভাগীরথীতে পড়ত। কলকাতা পোর্ট ট্রাষ্টও অনেক অর্থ ব্যয়ে এর মুখ খোলা রেখে এবং জোয়ার ভাটা চলাচল বজায় রেখে ভাগীরথীকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আগেই বলা হয়েছে গঙ্গা যখন ভাগীরথীর ভেতর দিয়ে চলত, মধ্য বঙ্গ ছিল স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ। সহস্র সহস্র মালবাহী নৌকা ভাগীরথী, জলঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা দিয়ে কলকাতায় যাতায়াত কোরতো। ১৮৫১ খৃঃ প্রকাশিত ক্যাপটেন জন ল্যাঙের (Captain John Lang) রিপোর্টে জানা যায় যে, ১৮৪৭ সালেও প্রতি ২০ দিনে প্রায় ২০০০ নৌকা প্রত্যেকে ১০০০—৩০০০ মণ শস্য, লবণ, সোরা, তুলা, চিনি নীল প্রভৃতি মাল নিয়ে এই এক একটি নদী দিয়ে যাতায়াত কোরতো। সে বছর ভাগীরথীতে শুল্ক আদায় হয়েছিলো ১,৫১,৪৮২/৯, জলঙ্গীতে ৬৩,২২২৸৩ ও মাথাভাঙ্গায় ২৪,০২৮৸৯, মোট ২,৩৮,৭৩৩৸৯ পাই।

এসব নদী শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের অর্থ, সম্পদ, স্বাস্থ্য সবই লোপ পেয়েছে—মধ্য বাঙলা হয়েছে ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি ও খাদ্যশস্য জন্মানোর সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বর্ষাশেষে ওপর থেকে নদীর মিষ্টি জল না আসার দরুণ জোয়ারের লোনা জল ক্রমশ বেশী ভেতরে ঢুকে পড়ছে এবং ভাগীরথী বা হুগলীর জলে লবণের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে কলকাতার জল সরবরাহের সমস্যা আরো জটিল করে তুলেছে। বিদ্যা-ধরী নদী শুকিয়ে যাওয়ায় কলকাতার জল নিঃসরণের ব্যবস্থার যে বিষম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার মূলে ভাগীরথীর সমস্যা জড়িত। বিদ্যাধরীর জল আসত ভাগী-রথীর শাখা যমুনা থেকে—নবী, সুতি ও নোনাগঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র নদী দিয়ে। যমুনার অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় বিদ্যাধরীর অস্তিত্বও লোপ পেয়েছে। বিদ্যাধরীর নিম্নাংশে দুধারে বাঁধ দেওয়ায় নদীগর্ভ আরো তাড়াতাড়ি উঁচু হয়ে নদীর বিনাশে সহায়তা করেছে। বর্তমানে কুলটিগঙ্গ নদীর সঙ্গে কলিকাতার জলনিঃসরণের ব্যবস্থার সংযোগ করা হচ্ছে; এ ব্যবস্থা কতদিনে কার্যকরী হবে কে জানে?

ভাগীরথীর বর্তমান এই দুরবস্থার উন্নতি করা কিরূপে সম্ভব? ইঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিকগণ এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করছেন এবং কতকগুলো উপায়ও তাঁরা সমীচীন বলে বলেছেন। প্রথমত তাঁরা বলেছেন গঙ্গাজলের অনেকটা পদ্মায় না যেয়ে যাতে ভাগীরথীর ভেতর দিয়ে চলে তার ব্যবস্থা করতে। স্যার উইলিয়ম উইলককস মনে করেন রাজমহলের কাছে গঙ্গায় একটি বাঁধ [Barrage] দিয়ে তার সাহায্যে ভাগীরথী, জলঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা নদী দিয়ে গঙ্গার জল চালানো যেতে পারে। অবিশ্যি এই প্রস্তাব খুবই ব্যয় সাপেক্ষ। নদীর গতিপথ সব সময়েই বদলে যায়, অতএব নিজের থেকেই ভাগীরথী প্রভৃতি মধ্যবঙ্গের নদীগুলোর উন্নতি হওয়া বিচিত্র নয়। যমুনা বা ব্রহ্মপুত্র এসে পদ্মার জলে ধাক্কা দিয়ে গড়াই নদীকে বড়ো করছে, মাথা-ভাঙ্গার অবস্থারও কিছু উন্নতি করেছে—হয়ত জলঙ্গী ও ভাগীরথীরও কিছু উন্নতি এতে ক্রমশ হবে। সারা পুলে পদ্মার জল বাধা পাওয়ায় সারার কিছু ওপরে অবস্থিত মাথাভাঙ্গার মুখ এবং পরে জলঙ্গী ও ভাগীরথীরও কিছু উন্নতি হওয়া সম্ভব। খুব দরকার হচ্ছে গঙ্গার প্রবাহ বার মাস ঠিক রাখা, প্লাবনে দেশের ক্ষতি বন্ধ করা এবং গঙ্গার শাখানদীগুলোর উন্নতি সাধন করা। এ কাজ করবার জন্যে Ganges River Commission গঠন করা খুবই দরকার। এই কমিশন বিভিন্ন প্রদেশ ও রেলওয়ে,—যাদের স্বার্থ বিশেষ-ভাবে গঙ্গার সঙ্গে জড়িত,—তাদের প্রতি-নিধি নিয়ে গঠিত হওয়া দরকার।

দামোদর প্রভৃতি নদীর উন্নতি হোলেও ভাগীরথীর কিছুটা উন্নতি হবে, কারণ দামোদর, অজয় প্রভৃতির জল ভাগীরথীর নিম্নদেশে এসে পড়েছে। বৃষ্টি হোলেই পাহাড় থেকে সব জল যাতে এসব নদীতে না এসে পড়ে এবং বৃষ্টির জল যাতে সঞ্চয় করে রাখা যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। এতে পশ্চিম বাঙলায় শস্যের জন্যে প্রয়োজনীয় জলও পাওয়া যাবে, অধিকন্তু দামোদর ও অজয় প্রভৃতির বন্যায় ধ্বংস-সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে। Reservoir বা জলাধারগুলো বাঙলার সমতল ক্ষেত্রে করা সম্ভব নয়, এগুলো করতে হবে ছোট-নাগপুরে ও সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ে অঞ্চলে। পশ্চিম বঙ্গের এই নদীগুলোর পূর্বাংশের বন্যা-সমস্যা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচনা সম্ভব নয়। এই বন্যার সমস্যা গুরুতর হয়েছে নদীর ধারে বাঁধের দ্বারা। ডান পাড়ের বাঁধ তুলে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বড় বড় শহর ও রেলপথ গড়ে ওঠায় বাম পাড়ের বাঁধ এখনও একেবারে তুলে দেওয়া যায় না; তবে বাঁধের মাঝে মাঝে পরিমিত পরিমাণে জল নিকাশের ব্যবস্থা করা দরকার। এতে হাওড়া হুগলী ও বর্ধমান জেলার ম্যালেরিয়া দূর হবে এবং কৃষি-কার্যেরও উন্নতি হবে। দামোদরকে যদি কলকাতার উত্তরে ভাগীরথীতে এনে ফেলা যায়, তা হলে কলকাতায় পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হবে ও কলকাতা বন্দরেরও অনেক শ্রীবৃদ্ধি হবে—কারণ তখন বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজ সহজেই বন্দরে আসতে পারবে।



ভারতীয়
সিল্ক
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট · কলিকাতা

পেখু-ভেক

অ · কৃ · ব

ইংরেজিতে একটা চমৎকার সত্য কথা আছে "Public memory is short; অর্থাৎ জনসাধারণের স্মৃতি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। জনসাধারণ অতি সহজেই ভুলিয়া যায়। আজ যাহাকে মাথার মণি করিয়া রাখিয়াছে, দু'দিন পরে হয়তো তাহার কথা মনেই থাকিবে না।

*   *   *   *

পয়সার কথাই ধরুন না কেন। ইহাকে কতদিন যাবৎ আমরা একেবারেই ভুলিয়া বসিয়া আছি একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। অথচ এমন সময় ছিল যখন ইহাকে বাদ দিয়া একটি দিনও আমাদের চলিত না। ইহারই সাহায্যে চানাচুর ও চীনাবাদাম কিনিয়াছি, এমন কি মাঝে মাঝে দারিদ্রের দুঃখে যখন প্রাণ আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে, তখন দান-খয়রাত পর্যন্ত করিয়াছি। অথচ সেই পয়সাকে আজ এমনভাবে বেমালুম ভুলিয়া আছি, ভুলেও একবার স্মরণে আনি না।

পয়সার অন্তর্ধানের পর অর্ধ আনা মুদ্রাই যখন সর্বাপেক্ষা কম দামের মুদ্রারূপে প্রচলিত হইল, তখন প্রথম প্রথম কিছুদিন পয়সার শোকে প্রাণ কাঁদিয়াছিল। ক্রমে পয়সার বিরহ সহিয়া গেল, পয়সার প্রতি যে স্নেহ ছিল, তাহা অর্ধ আনা খণ্ডে স্থানান্তরিত হইল।

কিন্তু পয়সা গেলেও পয়সার স্মৃতি রহিয়া গেল ট্রাম কোম্পানীর এক পয়সা দামের কুপনে। প্রথম প্রথম কিছুদিন ঐ কুপন দেখিলেই কুপনটি ট্রামগাড়িতে যাহার অভাব পূরণ করিতেছে, সেই অন্তর্হিত পয়সার কথা মনে পড়িত। কিন্তু পয়সার স্মৃতিচিহ্নটি ক্রমে এমন চোখ-সহা হইয়া গেল যে, কুপন দেখিলে কুপনই মনে হয়, ইহার আবির্ভাবের মূলে তাম্রমুদ্রার বিদায় বেদনার যে করুণ ইতিহাস রহিয়াছে, সেকথা আর মনে হয় না।

স্মৃতি ও স্মৃতিচিহ্নের সম্পর্কই এই রকম। প্রথম কিছুদিন স্মৃতিচিহ্নের সহিত স্মৃতি বিজড়িত থাকে; তারপর স্মৃতি আর থাকে না, স্মৃতিচিহ্নই শুধু থাকে। গড়ের মাঠে মনুমেণ্ট দেখিয়া অক্টারলোনীর কথা আজ ক'জনে মনে করে? এমন কি কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের মর্মর-মূর্তি দেখিয়া সেই মহাপুরুষের স্মৃতি ক'জনের মনে জাগে? তাই বলিতেছিলাম, শেষ পর্যন্ত স্মৃতিচিহ্নই থাকিয়া যায়, স্মৃতি থাকে না।

*   *   *   *

কিন্তু দার্শনিক তত্ত্বকথা বলিতে আসি নাই, বলিতে আসিয়াছি পয়সার কথা। যাহাকে আপনারা নির্মমভাবে ভুলিয়া বসিয়া আছেন, যাহার দেখা আবার কবে পাওয়া যাইবে, ভগবানই বলিতে পারেন, তাহার কথা মনে করাইয়া দিতে আসিয়াছি।

আমার সংগ্রহে এই পয়সা সম্বন্ধেই একটি অতি প্রাচীন কবিতা আছে; সেটি প্রাচীন বলিয়াই জানি। কত প্রাচীন বলিতে পারি না। কবিতাটিতে কবি পয়সার অন্তর্ধান সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্যরূপে ফলিয়া গিয়াছে বলিয়া কবিতাটি এত উল্লেখযোগ্য যে, উহার খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করা দরকার মনে করিতেছি:

"সর্বদা হেরিয়া মোরে দোকানে বাজারে
আমারে ভাবিছ তুচ্ছ মুদ্রার মাঝারে!
যদ্যপি ছড়ায়ে থাকি হাজার হাজার
তথাপি বক্ষেতে ধরি শ্রীমুখ রাজার।
আজি বটে সহজেতে পাইয়া আমারে
ভাবিছ 'ধাতুর গুঁড়া' কে পোছে তোমারে?
টাকা, সিকি, দুয়ানি, আনির বটে দাম;
তোমার পয়সা? ছি ছি! আরে রাম রাম!
কিন্তু বাপু, এক মাঘে শীত না ফুরায়
দিনের পিঠেতে দিন বছর ঘুরায়।
আসিবে এমন দিন, যাইব ভাগিয়া
কান্দিয়া মরিবে সবে আমারি লাগিয়া।
টাকা, আধুলি ও সিকি, দুয়ানি ও আনি
ইহাদের মিলিবে সহজে অতি জানি।
মুস্কিলে পড়িবে হায় শুধু মোর বেলা
আমারে পাইতে সবে বুঝিবেক ঠেলা।....."

*   *   *   *

উক্ত কবিতাটি লইয়া কয়েকজন সাহিত্যামোদী বন্ধুর সংগে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন, কবিতাটির ছন্দ, শব্দ-চয়ন ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, কবিতাটি কৃত্তিবাসের সমসাময়িক কোন কবির রচিত, কৃত্তিবাসের প্রভাব ইহাতে সুস্পষ্ট। এমন কি কবিতাটি কৃত্তিবাসেরই রচিত হওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

আমার মনে হয়, কবিতাটি আর যাহারি লেখা হউক না কেন, কৃত্তিবাসের লেখা নয়। কৃত্তিবাস কবিতাটি রচনা করিয়া থাকিলে ছলে, বলে বা কৌশলে নিজের নামটিকে তিনি কবিতায় শেষের দিকে জুড়িয়া দিতেনই। তখনকার দিনে রেওয়াজই ছিল রচনার মধ্যে রচয়িতা নিজের নামটি বেশ পাকা করিয়াই গাঁথিয়া দিতেন, যেন তাঁহার নামটা ভবিষ্যতে কেহ ভুলিয়া না যায়।

কৃত্তিবাসের সমসাময়িক কোন কবি এই কবিতাটি লিখিয়া থাকিলে তিনি অসাধারণ আত্মগোপনকারী বলিতে হইবে। তাঁহার নাম আবিষ্কার করিবার কোন উপায়ই আর এখন আমাদের হাতে নাই।

*   *   *   *

আপনাদের মনে সহজেই প্রশ্ন জাগিতে পারে এই প্রাচীন কবিতাটি আমি পাইলাম কোথায়? পাইয়াছিলাম গোবর্ধন বৈরাগীর ঝুলিতে। বৈরাগী আপন খেয়ালে—খেয়ালহারা হইয়া বলিলেই বোধ হয় ঠিক হয়—নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়ায়। কবে কোথায় কিভাবে এই কবিতাটি তাহার ঝুলিতে আসিয়া পড়িয়াছিল ঠিক করিয়া সে বলিতে পারে না।

কবি-বন্ধু বিদ্যাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে কবিতাটি দেখাইয়াছিলাম। বিদ্যাপতি কবিতাটি পড়িয়া তৎক্ষণাৎ কাগজ-পেন্সিল লইয়া বসিয়া যাহা লিখিয়াছিল, তাহা এই:

"আমি হারিয়ে যাবো গো,
আমি হারিয়ে যাবো।
আজ যাকে সবার চেয়ে তুচ্ছ ভাবছো
সেই সবার চেয়ে তুচ্ছ আমাকেই
সবার চেয়ে পরম প্রয়োজন ভেবে
কাঁদবে সেদিন, কাঁদবে।
আজ ভাবছো আমি ছোট,
হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় আমাকে;
সেদিন বড়, মেজো, আর সেজোদের মেলায়
বৃথাই আমাকে খুঁজবে;
ব্যর্থ বেদনায় সজল হবে চোখ
মন কাঁদবে—'সে কোথায়? সে কোথায়?'
পাবে না জবাব। কে দেবে জবাব?
আমি তখন মিলিয়ে গেছি
রূপ হতে রূপান্তরে,
জানি না ফিরবো কবে, ফিরবো কি না
রূপান্তর থেকে ফের রূপে।
বুঝবে সেদিন সামান্য কি করে'
ওঠে অসামান্যতার সীমা ছাড়িয়ে,
সুপ্রাপ্য কি করে'
অপ্রাপ্য হয়ে ওঠে।
ওগো বন্ধু!
ধেয়ে চলেছে নিত্য-ধাবমান কাল,
তাকে রুখবে এমন সাধ্য কার?
ধেয়ে আসছে সেই দিন
যেদিন আমি হারিয়ে যাবো।
আজ যাকে তুচ্ছ ভেবে
হা হা করে' হাসছো,
সেদিন তারি জন্যে
হাহাকার করে' ব্যর্থ বেদনায় কাঁদবে—
'সে কোথায়? সে কোথায়?'....."

*   *   *

তিন মিনিটে লেখা কবিতাটি আমার হাতে দিয়া বিদ্যাপতি কহিল, "এই নাও। তোমার কবিতাটি অতি-আধুনিক ভংগীতে রূপান্তরিত করে' দিলুম।"

কহিলাম, "আমার কবিতা মানে?"

বিদ্যাপতি কহিল, "কেন? কবিতাটা তোমার লেখা নয়?"

আমি কহিলাম, "আমার লেখা হ'তে যাবে কেন? এটা কোনো প্রাচীন কবির লেখা। আমি পেয়েছি গোবর্ধন বৈরাগীর ঝুলি থেকে। গোবর্ধন বৈরাগী কোথায়, কবে, কি করে কবিতাটাকে পেয়েছিলো, তা সে বলতে পারে না। আমার তো মনে হয় কৃত্তিবাসের কাছাকাছি কোনো ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা কবির লেখা। রচনার সেকেলে ভংগী দেখে বুঝতে পারছো না?"

বিদ্যাপতি কহিল, "সেকেলে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা না হাতী। তুমিও যেমন। এ কোনো একেলে বর্তমান-দ্রষ্টা ছোকরা কবির লেখা।"

*   *   *   *

বিদ্যাপতির কথাটা আমার ভাল লাগে নাই বলিয়াই তাহার সহিত আমি একমত নহি। আমি এখনো বিশ্বাস করি—বিশ্বাস করিতে ভাল লাগে বলিয়াই—যে কবিতাটি প্রাচীন এবং কোনো সুদূরদর্শী কবির রচিত।


"কন্ট্রোল রেট না হোক, গত বছর যে দরে দিয়েছিলাম তার অর্দ্ধেক দাম চাইছি"
"আমি এ দাম দেব না। আপনার নামে রিপোর্ট করব"

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ] শনিবার, ২৪শে চৈত্র, ১৩৫১ সাল। Saturday, 7th April, 1945 [২২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

জাতীয় সপ্তাহ

জাতীয় সপ্তাহ ভারতের ইতিহাসের স্মরণীয় অনুষ্ঠান, জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত নিরীহ নরনারী ও শিশুর শোণিত-ধারার অভিষেকে ভারতের স্বাধীনতা-সাধন-ব্রতের আনুষঙ্গিক এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘটে। স্বাধীনতার পথ কোনদিনই কুসুমে আবৃত নহে, পক্ষান্তরে দুর্গম ও বন্ধুর এই পথ রুধিরের দ্বারা চর্চিত থাকে। জালিয়ানওয়ালাবাগের শোণিতোৎসর্গের পর সুদীর্ঘ ২৫ বৎসরকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে; কিন্তু পশুবলের যে উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি জালিয়ানওয়ালাবাগের মূলে প্রেরণা যোগাইয়াছিল আজও তাহার অতি ঘৃণ্য রাক্ষসী পিপাসার নিবৃত্তি ঘটে নাই। পরাধীনতার প্রবল পেষণ, শোষণ ও পীড়নে ভারতের আত্মা ক্লিষ্ট ও পীড়িত। ভারতের ৪০ কোটি নরনারী আজও মানবের প্রাথমিক অধিকার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত। এতদিনেও পরাধীনতার শৃঙ্খল আমরা ছিন্ন করিতে সমর্থ হই নাই; কিন্তু সেজন্য আমাদের স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হইয়াছে, এমন কথাও বলিব না। প্রতীয়মান ব্যর্থতার বহিরার্থ-ভাবের ভিতর দিয়াও জাতীয় আন্দোলনের গতি সমগ্র জাতির মনোমূলে দুর্ণিবার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং ব্যর্থতার পথেই সার্থকতার সম্ভাবনা সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে। এ সত্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্বাধীনতা-যজ্ঞে আত্মদাতা সাধকদের শোণিতোৎসর্গ কোনদিনই ব্যর্থ হয় না। মহাত্মা গান্ধী বর্তমান বৎসরের জাতীয় সপ্তাহের উদ্বোধন উপলক্ষে আমাদিগকে সেদিন এই আশার বাণী শুনাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সাম্প্রদায়িক ঐক্য, খদ্দর এবং স্বরাজ—এই তিনটি অভীষ্ট আমাদের পূর্বাপেক্ষা সন্নিকটবর্তী হইয়াছে। এই তিনটি সাধনায় সিদ্ধ হইতে সমর্থ হইলে আমরা অবিলম্বে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব। মহাত্মাজীর উক্তি অনুসরণ করিয়া আমরাও এই পবিত্র সপ্তাহ উদ্যাপনে দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া বলি, অতীতে ভুল-ভ্রান্তি আমাদের ঘটিয়াছে এবং মানুষের গতিপথে তাহা স্বাভাবিক; কিন্তু সেগুলি আমাদিগকে যেন নিরুৎসাহিত না করে এবং আমরা যেন সমগ্র অন্তর দিয়া পরাধীনতার কলঙ্ক-কালিমা আমাদের জাতীয় জীবন হইতে বিদূরিত করিতে সমধিক সচেষ্ট হই। জালিয়ানওয়ালাবাগের বেদনা আমাদিগকে বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব লাভের অগ্নিময় প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করুক। কোন দুর্বল মুহূর্তেই যেন আমরা স্বাধীনতার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ না করি এবং সর্বস্ব ত্যাগের দ্বারাও সে আদর্শ অনুসরণ করিবার অকুতোভয় শক্তি অন্তরে পাই।

বিলাতে ও ভারতে

লর্ড ওয়াভেলের পর ভারত গভর্নমেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব স্যার ফ্রান্সিস্ মুডী এবং স্যার ওলফ ক্যারো—ইঁহারাও লণ্ডনে গমন করিয়াছেন। ইঁহারা সেখানে গিয়া ভারত সচিবের সঙ্গে কোন্ সলাপরামর্শে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা জানিবার উপায় নাই; এই সম্বন্ধে সাংবাদিক এবং রাজনীতিক মহলে নানারূপ কল্পনা ও গবেষণা চলিতেছে মাত্র। এ বিষয়ে আমাদের অভিমত আমরা ইতঃপূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। আমরা একথা পূর্বেই বলিয়াছি, যে, ভারতের রাজনীতিক অচল অবস্থাজনিত সমস্যার সমাধান করাই যদি ইহার মূলে থাকিত, তবে এখানকার ঘটনাচক্রের গতি অন্যরূপ ধারণ করিত; প্রথমত গভর্নমেণ্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে মুক্তিদান করিতেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, তাঁহারা এ পর্যন্ত তেমন নীতি অবলম্বন করেন নাই। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্য পণ্ডিত গোবিন্দ-বল্লভ পন্থকে সম্প্রতি মুক্তিদান করা হইয়াছে বটে, কিন্তু এক্ষেত্রেও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিবেচনার যুক্তিই কর্তৃপক্ষ সম্ভবত অবলম্বন করিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদিগকে তাঁহাদের স্ব স্ব প্রদেশের জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে; জাতির পক্ষে ইহা অবশ্যই সান্ত্বনার কোন কারণ নহে। আমরা জানি, অপরাপর কংগ্রেস-নেতাদের স্বাস্থ্যও সুদীর্ঘ বন্দিজীবনে থাকার ফলে বিশেষরূপে ভগ্ন হইয়াছে; ইঁহাদিগকে মুক্তিদান করিবার পথে বিশেষ কি অন্তরায় ছিল, ইহা আমাদের উপলব্ধিতে আসে না। ইহার দ্বারা আমরা শুধু ইহাই বুঝিতে পারি যে, ভারত গভর্নমেণ্ট কংগ্রেসের প্রতি তাঁহাদের মনোভাব এখনও পরিবর্তন করিতে প্রস্তুত নহেন, অথচ যুদ্ধোত্তর ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়োজন ছাড়া তাঁহাদের এই নীতির অন্য কোন অর্থ হয় না। ভারতের স্বার্থ এবং ভারতের স্বাধীনতাই যদি তাঁহাদের কাম্য হয়, তবে যুদ্ধের অবস্থা বর্তমানে যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে দেশের নিরাপত্তা রক্ষার একান্ত যুক্তিহীন অজুহাতও কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে মুক্তিদানের ক্ষেত্রে এখন আর উঠিতে পারে না; বিশেষভাবে গান্ধীজী আইন-অমান্য আন্দোলনের নীতি অবলম্বন করিবেন না, স্পষ্টভাবে এমন কথা বলিবার পরও কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে বন্দী রাখিবার নীতির কোন যৌক্তিকতাই থাকে না। সুতরাং লর্ড ওয়াভেল এবং তাঁহার অপর দুইজন শ্বেতাঙ্গ অন্তরঙ্গের বিলাত গমনে আমরা আশাশীলতার কোন কারণই দেখিতেছি না। পক্ষান্তরে ভারতে ব্রিটিশ-প্রভুত্ব দৃঢ় করিবার কোন গভীর এবং গূঢ় ষড়যন্ত্রের আভাসই ইহাতে আমরা পাইতেছি। স্যার ফ্রান্সিস্ মুডী কোনদিনই ভারতের প্রগতিমূলক আন্দোলনের সমর্থক নহেন। ভারতের রাজনীতিক অচল অবস্থা সমাধানের পথে তিনি নিরন্তর বিঘ্নই উপস্থিত করিয়াছেন এবং স্যার ওলাফ ক্যারো আগাগোড়া তাঁহার সেই নীতির নিষ্ঠার সহিত অনুগমন করিয়া থাকেন। লর্ড ওয়াভেলের পর ইঁহারা দুইজনে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতে

বিলাতে গিয়াছেন দেখিয়া আমাদের মনে ভবিষ্যতের সম্বন্ধে আশংকারই উদয় হইতেছে।

শিক্ষা সমস্যা

সম্প্রতি কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলনের সভাপতিরূপে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা নানাদিক দিয়া প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, এদেশের শিক্ষা-সমস্যা একটা বিচ্ছিন্ন সমস্যা মাত্র নহে, পরন্তু বর্তমানে আমরা যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরাধীনতার মধ্যে বাস করিতেছি, তাহার পটভূমিকায় বর্তমান শিক্ষাদর্শের প্রভাব রহিয়াছে; এবং এই শিক্ষা সমস্যা দেশের বৃহত্তম সমস্যা, জাতীয় অধোগতির একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদেশে ব্রিটিশ রাষ্ট্রতন্ত্রের এবং বণিকগণের শোষণনীতি চালু রাখিবার জন্যই কেরানীকুলের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাঁহাদের ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ করিবার জন্যই এই শিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছিল। যে শিক্ষার পিছনে কেবল এই সংকীর্ণ ও বিদেশীয়গণের স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে ক্রিয়াশীল, সে শিক্ষায় কখনও মানবসমাজে মনুষ্যত্বের জাগরণ হয় না, বরং সে শিক্ষা জাতিকে মেরুদণ্ডহীন নিরীহ জনসমষ্টিতে পরিণত করে। লর্ড হ্যালডেন বলিয়াছেন, শিক্ষা-পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা হইতেছে এই যে, তাহা জাতীয় জীবনের নানাক্ষেত্রে নেতৃবৃন্দের আবির্ভাব ঘটাইতে পারে কি না, তাহাই। শিক্ষারীতির সার্থকতার এই মানদণ্ডের দিক দিয়াও এদেশে বর্তমান শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। যে কয়েকজন নেতার আবির্ভাব এদেশে হইয়াছে, বিপুল জনসংখ্যার তুলনায় তাঁহাদের সংখ্যা নগণ্য। বিশেষত শিক্ষারীতির সুফলের জনই তাঁহাদের আবির্ভাব ঘটে নাই। তাঁহাদের স্ব স্ব প্রতিভাই তাঁহাদিগকে জনগণের পুরোভাগে স্থাপন করিয়াছে। অধ্যাপক কবীর নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির দোষ-ত্রুটি আলোচনা করিয়াছেন। এই শিক্ষাপদ্ধতি যে নিতান্তই পুঁথিগত, অন্তঃসারশূন্য এবং ইহার দ্বারা মনুষ্যত্বের বিকাশ ও চরিত্রের উন্নতিসাধন হয় না এবং সমগ্রভাবে জাতির অন্ন-বস্ত্র-সমস্যার সমাধান হয় না, তাহা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন সাধন হয় নাই এবং অদূরভবিষ্যতে যে হইবে, তাহারও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। অথচ গ্রেট ব্রিটেনের নানা সংকটকালের মধ্যেও শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার করা হইয়াছে। ১৯০২ সালে বুয়র যুদ্ধের সময় ব্যালফুর আইন দ্বারা, বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, ১৯১৮ সালে ফিসার আইন দ্বারা এবং বর্তমান মহাযুদ্ধের সংকটজনক সময়েও বাটলার আইন দ্বারা তথায় শিক্ষা-সংস্কারের চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু এদেশে শিক্ষারীতি চিরাচরিত প্রথায় অচলায়তনের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গ্রেট ব্রিটেনে শিক্ষার সংস্কার করা ব্রিটিশের স্বার্থ, কিন্তু ভারতের ব্যাপারে তাঁহাদের স্বার্থ নাই, এই কঠোর সত্যই এক্ষেত্রে মনে জাগে। এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্বাধীনতা। নানঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—তাহা ভিন্ন অন্য পথ নাই।

শ্রদ্ধা নিবেদন

গত ৩০শে মার্চ, শুক্রবার অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গবাসী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি পাঠ্যজীবনে মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকগণের অন্যতম ছিলেন এবং এতদুপলক্ষে তিনি সর্বভারতীয় লেখকগোষ্ঠীর ঘনিষ্ট সংস্রবে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অনুপম বিশ্লেষণী শক্তি ও প্রশংসনীয় বাগ্মিতার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ছাত্রনেতা হিসাবেও তিনি পরিচিত ছিলেন।

গত ২৮শে মার্চ, বুধবার সুকবি গিরিজাকুমার বসু পরলোকগমন করিয়াছেন। নিউমোনিয়া রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ফার্স্টবুকে প্রণেতা প্যারীচরণ সরকারের দৌহিত্র ছিলেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশকাল সাহিত্য সাধনায় ব্যাপৃত ছিল। তিনি অধুনালুপ্ত 'ভারতী' পত্রিকার সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি "বাতায়ন" ও "দীপালীর" সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন। তাঁহার "ধূলি" নামক কাব্য গ্রন্থখানি বাঙলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। নানাবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের সংগে তাঁহার গভীর যোগ ছিল।

আমরা এই দুইজন মনীষী, সাহিত্যসেবী ও জনহিতব্রতীর পরলোকগমনে গভীর বেদনা অনুভব করিতেছি। তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি এবং তাঁহাদের পরলোকগত আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

চরম দণ্ডের বিরুদ্ধে

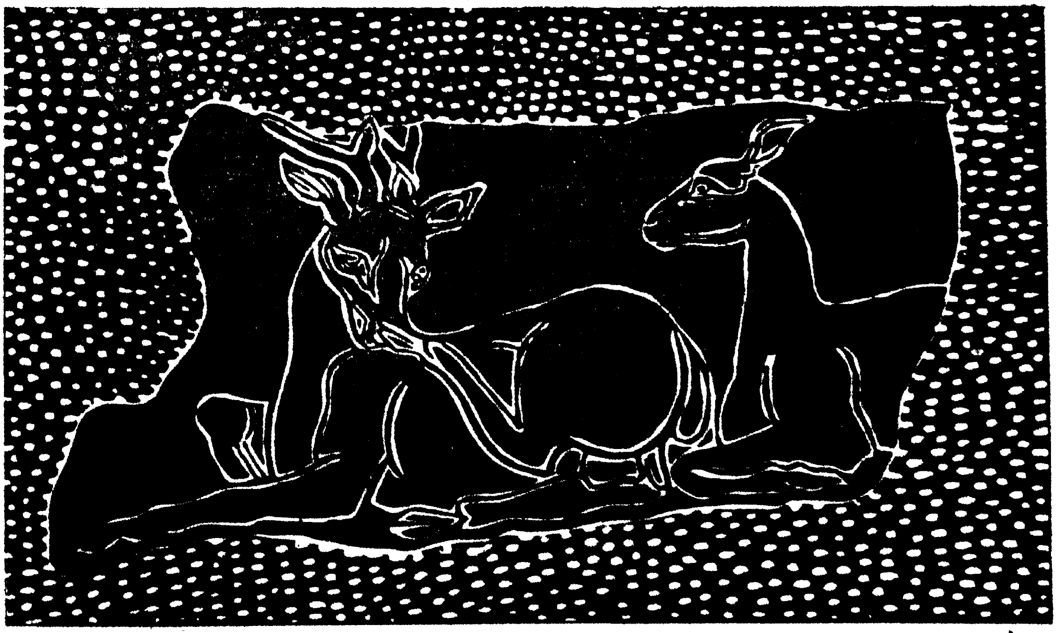
অস্তি ও চিমুরের মামলায় চরম দণ্ডে দণ্ডিত মোট ১৫ জন আসামীর পক্ষ হইতে প্রাণদণ্ড মকুবের জন্য আবেদন করা হইলে মধ্যপ্রদেশের গভর্নর ৮ জন আসামীর প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেন এবং অবশিষ্ট ৭ জনের প্রাণদণ্ড বহাল রাখেন। অতঃপর এই ৭ জনের সম্পর্কে বড়লাটের নিকট আবেদন করা হইলে তিনি এতৎসম্পর্কে হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকৃত হন এবং অবশেষে ইংলণ্ডেশ্বরের অনুকম্পা প্রার্থনা করিয়া আবেদন করা হয়। সম্প্রতি একটি সংবাদে প্রকাশ, এই আবেদনও অগ্রাহ্য হইয়াছে কিন্তু নাগপুর হাইকোর্টের আদেশে প্রাণদণ্ড বিধান সম্প্রতি স্থগিত আছে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, এই ফাঁসি অনুষ্ঠিত হইলে পূর্ব হইতেই যে তিক্ততা বিদ্যমান আছে, তাহা আরও বৃদ্ধি পাইবে। তিনি আশা করেন, যদি ভারতের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ ইহার বিরুদ্ধে উত্থিত হয়, তবে প্রাণদণ্ডাদেশ পরিত্যক্ত হইতে পারে। এই শোচনীয় প্রাণদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সর্বত্র ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে নানাস্থান হইতে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। অস্তি ও চিমুরের শোচনীয় ঘটনায় যে সমস্ত রমণী তাঁহাদের প্রিয়জন হারাইয়াছেন, তাঁহারাও এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। সম্প্রতি বোম্বাই শহরে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের যে সমস্ত সম্পাদক রহিয়াছেন, তাঁহারা এই সমস্ত চরমদণ্ডে দণ্ডিত হতভাগ্যদের প্রাণভিক্ষা করিয়া মধ্যপ্রদেশের গভর্নর, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব ও ইংলণ্ডেশ্বরের প্রাইভেটসেক্রেটারীর নিকট তার করিয়াছেন। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে অকস্মাৎ কংগ্রেসনেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করিয়া গভর্নমেণ্ট যে উত্তেজনাপূর্ণ বিক্ষুব্ধ আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন, তাহার ফলেই অস্তি ও চিমুরের মত শোচনীয় ঘটনা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই ঘটনার জন্য যাহারা দায়ী বলিয়া অভিযুক্ত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহাদের মধ্যে এই অবশিষ্ট ৭ জনের সম্পর্কে এইসব প্রতিবাদ সত্ত্বেও কোনরূপ অনুকূল বিবেচনাই করা হয় নাই। মানব-চরিত্রের সংশোধনের জন্য আমরা কঠোর দণ্ড বিধানের প্রয়োজন অস্বীকার করি না। কিন্তু প্রাণদণ্ডে সেই সংশোধনের অবসর কোথায়? তারপর, প্রাণদণ্ড বর্তমান সভ্যজগতে মধ্যযুগীয় নিষ্ঠুর বর্বরতারই পরিচায়ক। এই সমস্ত কথা বিবেচনা করিয়া এই হতভাগ্যগণের প্রাণদণ্ডাদেশ এই শেষ মুহূর্তেও যদি মকুব হয়, তবে ইংলণ্ডেশ্বরের রাজোচিত ঔদার্য ও অনুকম্পারই পরিচায়ক হইবে। ইহা বিবেচনা করিতে আমরা ইংলণ্ডেশ্বরের পরামর্শদাতৃগণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

লিনো প্রিন্ট—শান্তিনিকেতন কলাভবন



চিত্রকূট

শিল্পী : বীণাপাণি মুখার্জি



সাথী

শিল্পী : অর্চনা দাশগুপ্তা

বাঙলার গভর্নর মিঃ আর জি কেসি ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে প্রদেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। গভর্নর এতৎসম্পর্কিত একটি বিবৃতিতে বলেন—

২৮শে মার্চ, বুধবার স্যার নাজিমুদ্দিন পরিচালিত মন্ত্রিমণ্ডলী ব্যবস্থা-পরিষদে ১০৬—৯৭ ভোটে পরাজিত হন এবং কৃষি সম্পর্কীয় সমগ্র বাজেট দাবীই নামঞ্জুর হয়। প্রধান মন্ত্রী দাবী করেন যে, পরাজয়টা আকস্মিক ভোটে ঘটিয়াছে এবং সেইজন্য পরদিন তিনি অন্যান্য দাবী লইয়া শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে চাহেন। তিনি পরাজিত হইলে পদত্যাগ করিতে রাজী ছিলেন। কিন্তু পরিষদে স্পীকার এইরূপ নির্দেশ দান করেন যে, পূর্ব দিন বাজেট দাবীতে পরাজিত হইবার পর মন্ত্রিমণ্ডলী আর পরিষদে কাজ চালাইতে পারেন না। সুতরাং তিনি অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখিলেন; ফলে বাজেটের দাবীগুলি অমীমাংসিতই থাকিয়া যায়। স্পীকারের এই নির্দেশের বৈধতা ও শাসনতান্ত্রিক সংগতি সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করিব না; তবে একথা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এই প্রদেশের স্বাভাবিক শাসনযন্ত্র ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং আমি বড়লাটের সহিত একমত হইয়া ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা প্রয়োগের সিদ্ধান্ত করিয়াছি। গভর্নমেণ্টের দৈনন্দিন ও জনকল্যাণকর জরুরী কাজের প্রয়োজনে অর্থব্যয় ন্যায়সংগত হইতেছে কিনা এরূপ সন্দেহের ছায়াপাতে শাসনকার্যে যে বাধা দেখা দিবার আশংকা ছিল, ইহাতে তাহার অপনোদন হইবে। রীতিনীতির কূটতর্ক ছাড়িয়া দিলেও সমগ্রভাবে বাঙলা দেশের রাজনীতিক সমস্যা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, বাঙলার অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র অবস্থা বিশেষ সতর্কতার সহিত বিচারের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং এই বিষয়ে আমি হঠাৎ কিছু করিয়া ফেলিতে চাই না। ৯৩ ধারা অনুযায়ী আমি যে ঘোষণা করিতেছি, তদ্দ্বারা প্রদেশের বহুবিধ ও প্রয়োজনীয় কর্মসম্পাদনের উপযুক্ত জনবল ও অপরাপর সম্পদের সুব্যবস্থা করিয়া শাসনকার্য অব্যাহত রাখা যাইবে। ইতিমধ্যে এই সপ্তাহে রাজনীতিক ও শাসনতান্ত্রিক অবস্থার যে পরিণতি ঘটিয়াছে, সে সম্পর্কে আমি ধীর সুস্থে ও সতর্কতার সহিত বিচার-বিবেচনা করিব।

গভর্নরের বক্তব্যের তাৎপর্য এই যে, অবস্থার চাপে পড়িয়া নিতান্ত কর্তব্যানুরোধে তাঁহাকে বাঙলা দেশ হইতে শাসনতন্ত্র প্রত্যাহার করিতে হইল। সে অবস্থার জটিলতা আমরাও স্বীকার করি; কিন্তু শাসন-ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা যেমন তাঁহার কর্তব্য; সেইরূপ শাসনতন্ত্রের রক্ষকস্বরূপে শাসনতন্ত্র যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তদনুযায়ী বিধি-ব্যবস্থা পরিচালনা করাও তাঁহার উচিত। তিনি সে কর্তব্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন কি? গভর্নর তাঁহার বিবৃতিতে বাঙলার বর্তমান শাসনতান্ত্রিক সংকটের কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন; এক, স্যার নাজিমুদ্দিনের দাবী এবং দ্বিতীয় পরিষদের স্পীকারের রুলিং। তাঁহার বিবৃতিতে এই দুইটি ঘটনার

দেশের কথা

কাহারো কাহারো মনে এ ধারণা হওয়া অসম্ভব নয় যে, স্যার নাজিমুদ্দিনের দাবী রক্ষিত হইলে শাসনতান্ত্রিক এই সংকট দেখা না দিতেও পারিত এবং স্পীকারের নির্দেশের জন্যই ৯৩ ধারা প্রয়োগ অনিবার্য হইয়া পড়ে। কিন্তু স্যার নাজিমুদ্দিন যে দাবী করিয়াছিলেন, তাহা কি শাসনতান্ত্রিক বিধিসম্মত?

আকস্মিক ভোট

আকস্মিক ভোট, আচমকা ভোট, নাজিম-মন্ত্রিমণ্ডলী এবং তাঁহাদের সমর্থকদের মুখে আমরা এ সম্পর্কে এই একটা কথা বহুবার শুনিতে পাইয়াছি। কিন্তু কৃষি-বাজেটের সমগ্র দাবী না-মঞ্জুর হইবার ব্যাপারটাকে সত্যই কি আকস্মিক ভোট বা ইংরেজি ভাষায় 'স্ন্যাপ ভোট' বলা চলে? স্যার নাজিমুদ্দিনের আবদারে শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা ভাষা তাঁহার রুচিমত অভিনব ব্যাকরণ অনুসারে হইতে পারে না। ভোট গ্রহণের কোন সম্ভাবনা ছিল না, এমন ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের অপ্রস্তুতি অবস্থার সুযোগে ভোটে তাঁহাদিগকে অসুবিধায় ফেলাকেই বোধ হয় আকস্মিক ভোট বলা চলে। কৃষি-বিভাগের বাজেট সম্পর্কে ভোট নিশ্চয়ই তেমন অবস্থার মধ্যে গৃহীত হয় নাই। মন্ত্রিমণ্ডল ভোটে বাজেট পাশ করাইবার সুনিশ্চিত উদ্দেশ্যে সভায় গিয়াছিলেন এবং সভার আলোচনার সময় নির্ধারণও



তাঁহাদের সম্মতিক্রমেই হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে স্পীকার নৌশের আলী তাঁহার নির্দেশে বলেন—

আমি গভর্নমেণ্ট পক্ষের চীফ হুইপকে বুঝাইয়া সুজাইয়া অন্য দিনের অধিবেশনের গভর্নমেণ্টের চীফ হুইপ আমাকে জানান যে, বেলা তিনটার সময় অধিবেশন হয়, প্রধান মন্ত্রীর ইহাই ইচ্ছা, তদনুযায়ী আমি পরিষদের অধিবেশন অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় আরম্ভ হইবে ধার্য করি। প্রকৃতপক্ষে অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় পরদিন সভার অধিবেশন হইবে, আমি এই কথা ঘোষণা করিয়া আমার চেম্বারে যাইবার পর কৃষি বিভাগের মন্ত্রী খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জমুদ্দিন হোসেন আমার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, দুইটার সময় অধিবেশন ধার্য না করিয়া তিনটার সময় কেন ঠিক করা হইল। আমি তখন তাঁহাকে স্পষ্টভাবেই একথা বলিয়া দিয়াছিলাম যে, মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ইচ্ছা অনুসারেই এই সময় ধার্য করা হইয়াছে।

সুতরাং অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় যে বাজেট সম্পর্কিত আলোচনা আরম্ভ হইবে, মন্ত্রীদের ইহা অবিদিত ছিল না এবং বাজেট দাবী যখন, সেক্ষেত্রে ভোটও গৃহীত হইবে এবং সেইজনাই আলোচনা, মজলিস বসাইবার জন্য নয়, ইহাও তাঁহারা জানিতেন। সজ্ঞানেই জানিতেন, সুতরাং এক্ষেত্রে আকস্মিকতার অবসর কোথায়?

স্যার নাজিমুদ্দীনের যুক্তি

স্যার নাজিমুদ্দীন শাসনতান্ত্রিক বিধান সম্বন্ধে তাঁহার পাণ্ডিত্যের দাবী করিয়া থাকেন; পার্লামেণ্টারী কাজে তাঁহার কুড়ি-বাইশ বৎসরের অভিজ্ঞতা আছে, এই গর্ব মাঝে মাঝে তাঁহার মুখে শুনিতে পাই। অথচ সব জানিয়া বুঝিয়াও নিজেদের পরাজয় এড়াইবার জন্য তিনি আকস্মিক ভোটের বাজে যুক্তি উপস্থিত করেন। পরাজয়ের পর তিনি সাংবাদিকগণের নিকট একটি বিবৃতিতে বলেন—

পরিষদের অধিবেশন যে সেদিন অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় আরম্ভ হইবে, আমাদের দলের কোন কোন সদস্যের ইহা জানাই ছিল না। ভোট গ্রহণের কাজ সাধারণত সন্ধ্যার পর ৭টা বা ৮টার সময় আরম্ভ হয়। শাসনতান্ত্রিক বিধি অনুসারে গভর্নমেণ্টের সদস্য দলবলসহ পূর্ণ শক্তিতে যতক্ষণ সভায় সমবেত না হন, ততক্ষণ পর্যন্ত বিতর্ক চালাইয়া রাখিবার অধিকার গভর্নমেণ্টের আছে। ভোটের সময় আমাদের পক্ষের ৪ জন সদস্য আটকা পড়িয়াছিলেন, অপর ছয়জন পরে উপস্থিত হন, আর পাঁচ ছয়জন, যদি ট্রেন ধরিতে পারেন আগামীকল্য আসিয়া পোঁছিবেন।

প্রকৃতপক্ষে এসব যুক্তি বিধি-বিধান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বুদ্ধিহীনেরই যুক্তি। আইনসভার কাজ বিধি-বিধান অনুসারে পরিচালিত হয়, কোন দলের সদস্যগণ যদি ব্যক্তিগত আরাম-আয়েসের কাছে জনসাধারণের প্রতি কর্তব্যবোধকে লঘু করেন এবং সদস্য হিসাবে নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁহাদের গুরুত্ববোধ না থাকে, তবে সে দলকে পরাজিত হইতে হইবে, ইহা স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছনীয়।

মন্ত্রিদলের কৌশল

মন্ত্রিপক্ষকে আলোচনা চালাইবার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হয় নাই, তাঁহাদের এই যুক্তি; প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রিপক্ষ ঐ দিবস

করিয়াছিলেন এবং সেই অবসরে, তাঁহাদের সকল গতির চিরন্তন গতি, শ্বেতাঙ্গ সদস্যদিগকে সদলবলে জোটাইয়া আনিয়া সভায় হাজিরও করিয়াছিলেন। মিঃ নৌশের আলী তাঁহার নির্দেশে এ সম্বন্ধে বলেন—

আমি এই কথা বলিয়াছিলাম যে, আমি কৃষি বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীকে ১০ মিনিটকাল সময় দিব। বেলা ৩-৫৫ মিনিটের সময় তিনি বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। দশ মিনিট অতিক্রান্ত হইবার পর আমি তাঁহাকে থামাই নাই; শুধু ইহাই নয়, তিনি তাঁহার লেখা বক্তৃতা পড়া শেষ করিয়া যখন আসন পরিগ্রহণ করিলেন তখন ৪-৩২ মিনিট হইয়াছে। আমি তাঁহাকে এতটাই সময় দিয়াছিলাম। মন্ত্রী মহোদয়ের কথা শেষ হইবার পর মন্ত্রিপক্ষের মৌলবী আহম্মদ আলী মৃধাকে বক্তৃতা করিতে সময় দেই। মিঃ মৃধা ১৫ মিনিটকাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার কথা আমি যতটা বুঝিয়াছি, তাহাতে তিনি আলোচ্য বিষয়ের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ একটি কথাও বলেন নাই। যেসব সদস্য ঐদিন বিরোধী পক্ষে যোগদান করেন, তিনি তাঁহাদিগকে এবং সম্ভবত বিরোধী পক্ষের প্রতিই অবিরত বক্রোক্তিবাণ বর্ষণ করেন।

সুতরাং মন্ত্রিপক্ষকে আলোচনা করিবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই, এই অভিযোগের কোন মূল্যই থাকে না। কৃষি-বিভাগের দাবীর পরে পশু চিকিৎসা আছে, দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় দাবী আছে, এসব দাবী মঞ্জুর করিতে হইলেও সময়ের প্রয়োজন ইহা ছাড়া, আধ ঘণ্টা নমাজের জন্য দিতে হইবে; স্পীকারের হাতে মাত্র তিন ঘণ্টা ৪০ মিনিট সময় ছিল। এমন অবস্থায় মন্ত্রিপক্ষকে ইহার চেয়ে তিনি কি বেশী সুবিধা দিতে পারেন, আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

সংশোধন প্রস্তাবের অধিকার

স্যার নাজিমুদ্দীন এই দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন যে, সরকার পক্ষের বরাদ্দের দাবীর বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের সদস্যদেরই সংশোধনমূলক প্রস্তাব উত্থাপন করিবার অধিকার আছে। তিনি এ সম্বন্ধে স্যার আজিজুল হকের সময়কার নজির দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু স্পীকার নৌশের আলীর নির্দেশে তাঁহার যুক্তি নিঃশেষে খণ্ডিত হয়। সরকার পক্ষের এই অধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া মিঃ নৌশের আলী বলেন—

সংশোধন প্রস্তাবকে অনেকটা সরকারের কার্যের নিন্দাত্মকই বলা চলে। আমার মতে গভর্নমেন্টের পক্ষ সমর্থকদের দ্বারা সেগুলি উত্থাপিত হইতে দেওয়া কর্তব্য নয়। আমার যত দূর স্মরণ হয়, আমি যতদিন হইল স্পীকার আছি, ততদিনের মধ্যে ঐরূপ প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয় নাই। আমি এই রীতি সংগত বলিয়া মনে করি। স্যার আজিজুল হকের সময় হইতে এই রীতি চলিয়া আসিতেছে। স্যার আজিজুল হক যথোচিত বিবেচনার পর এই রীতি প্রবর্তন করেন এবং এ পর্যন্ত সে রীতির কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

সুতরাং অচরিত রীতির অনুসরণ করিয়া স্পীকার অসঙ্গত কাজ করিয়াছেন বা অধিকার হরণ করিয়াছেন, এমন কথা বলা চলে না। তিনি বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ রকম নূতন কিছু করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা মন্ত্রিমণ্ডলকে প্রকারান্তরে অসুবিধায় ফেলিয়াছেন, এমন অভিযোগের কোন কারণই এক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারে না।

ভোটের গুরুত্ব

প্রকৃতপক্ষে স্যার নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিত্ব আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার মোহে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; এজন্য সমগ্র কৃষি-বাজেট নাকচ হইবার গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কৃষি-বাজেট অগ্রাহ্য হইবার পর তিনি সেদিন অপর কোন দাবী উপস্থিত করেন নাই; কিন্তু পরদিন পরিষদে উপস্থিত হইয়া একান্ত অবৈধভাবেই পরবর্তী দাবী উপস্থিত করিতে চেষ্টা করেন এবং বলেন যে, সেক্ষেত্রে যদি কোন দাবীতে তিনি পরাজিত হন, তবে পদত্যাগ করিবেন। তাঁহার অন্তত ইহা বোঝা উচিত ছিল যে, বাজেটের একটি সমগ্র বিভাগের দাবীতে পরাজিত হওয়ার অর্থ মন্ত্রীদের বিশেষ ক্ষেত্রে অবলম্বিত কোন নীতি বা কোন বিশেষ কার্যের নিন্দা নয়, সমগ্র মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রতিই তাহাতে অনাস্থা প্রকাশিত হয়। বিশেষ কোন দফা মঞ্জুর না হইলে মন্ত্রীরা তাহাকে ততটা গুরুত্ব না দিতে পারেন; কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন গুরুত্ব না দিয়া উপায় নাই; কারণ, আইনের দিক হইতে স্পষ্ট বাধা রহিয়াছে; কারণ, আইনত কৃষি-বিভাগের দাবী মন্ত্রীরা আর সে সেসনের মধ্যে উপস্থিত করিতে পারেন না। দুই কোটি টাকার দাবী যদি মঞ্জুর না হয়, তবে টাকার অভাবে সমগ্র বিভাগের কাজই সঙ্গে সঙ্গে অচল হইয়া পড়ে। বিশেষ ক্ষমতার জোরে মন্ত্রিমণ্ডলকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া গভর্নরও তেমন দাবী মঞ্জুর করিতে পারেন না; সেক্ষেত্রে তাঁহার পক্ষে ৯৩ ধারানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করাই একান্ত হইয়া পড়ে। বাজেটের দাবী ঘোড়দৌড়ের মত অদৃষ্ট পরীক্ষার ব্যাপার নহে যে, একবার হারিয়া গেলেও পরের বারে ভোটে মন্ত্রীদের বরাত ফিরিবার সম্ভাবনা থাকে।

গভর্নরের দায়িত্ব

কৃষি-বাজেটে যেদিন ভোট গৃহীত হয়, ভোটের ফলে মন্ত্রিমণ্ডলের পরাজয় ঘটে, বাঙলার গভর্নর মিঃ কেসি সেই দিনই মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। স্যার নাজিমুদ্দীনের বিবৃতি হইতে বোঝা যায় যে, তিনি সেই দিনই গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি গভর্নরকে কি পরামর্শ দিয়াছিলেন, আমরা জানি না; তবে তিনি যে পরামর্শ প্রদান করুন, শাসনতান্ত্রিক নীতির মর্যাদার দিক হইতে স্যার নাজিমুদ্দীনকে পদত্যাগ করিতে বলাই সেক্ষেত্রে গভর্নরের একমাত্র কর্তব্য ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, গভর্নর তাহা করেন নাই। তিনি যদি গণতান্ত্রিক বিধিসম্মত এই সাধারণ পন্থা অবলম্বন করিতেন, তবে বাঙলা দেশে ৯৩ ধারার প্রয়োগ করিবার কোন প্রয়োজনই দেখা দিত না এবং শাসন-তন্ত্র অব্যাহত রাখিবার ক্ষেত্রে গভর্নরের যে কর্তব্য রহিয়াছে, তাহাও সম্যকভাবে প্রতিপালিত হইত।

বাঙলার রাজনীতিক সংকট

গভর্নর তাঁহার বিবৃতিতে বাঙলার রাজনীতিক সংকটের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং ধীরে-সুস্থে সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন বলিয়াছেন। আমরা কিন্তু তেমন সংকট কিছু দেখিতেছি না। বিরোধীপক্ষ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন; এবং কংগ্রেস দল তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় এ সম্বন্ধে বলেন—

বর্তমানে বাঙলার সম্মুখে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, সর্বদলীয় গভর্নমেন্ট গঠনের দ্বারাই ইহার একমাত্র প্রতীকার হইতে পারে। দল বিশেষের দ্বারা গঠিত মন্ত্রিমণ্ডলী দেশ হইতে দুর্নীতি এবং শাসনবিভাগ স্বজন পোষণের গ্লানি দূর করিতে পারিবে না। দুর্নীতি দূর করিবার কার্যে এবং বাঙলার অন্যান্য প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির সমাধানে কংগ্রেসী দল আনন্দের সঙ্গে সর্বদলীয় গভর্নমেন্টের সহযোগিতা করিবে।

আমরা জানি, মিঃ কেসি বাঙলার শাসন-ভার গ্রহণ করিবার পর বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সর্বদলীয় গভর্নমেন্টের প্রয়োজনীয়তাও সম্ভবত তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বর্তমানে তাঁহার সমক্ষে সেই সুযোগ দেখা দিয়াছে। জনসাধারণের সহযোগিতায় পরিচালিত মন্ত্রিমণ্ডল যদি বাঙলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে এই দুর্দিনেও এদেশের নরনারী অনেকটা আশ্বস্ত হইবে। অন্নসংকট, বস্ত্র-সংকট—দরিদ্রের শোষণ ও পীড়নে সমগ্র বাঙলা উত্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। নাজিম-মন্ত্রিমণ্ডলীর শাসনকালে—গত দুই বৎসর, এই প্রদেশের নরনারী কোন দিক হইতে কোন রকমে শান্তিলাভ করে নাই। নাজিম-মন্ত্রিমণ্ডলীর ইতিহাস প্রতিশ্রুতির উপর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গেরই ইতিহাস।

স্পীকারের নির্দেশের গুরুত্ব

প্রশ্ন উঠিয়াছে। পরিষদের শেষ দিনের অধিবেশনে বিরোধী দলের যদি সত্যই ভোটের জোর থাকিত, তবে সেদিন তাঁহারা মন্ত্রিমণ্ডলকে পুনরায় হারাইয়া দিতে পারিতেন, তাঁহারা তাহা না করিয়া স্পীকারের নির্দেশ প্রার্থনা করিলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে শেষ দিনের অধিবেশনে স্যার নাজিমুদ্দিনের কার্যের বৈধতা কোন দিক হইতেই ছিল না। শাসনতান্ত্রিক মর্যাদার দিক হইতে [illegible]

প্রতিপন্ন করা পরিষদে জনমতের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জনসাধারণের প্রতিনিধিদের পক্ষে প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য ছিল। এই কর্তব্য-বোধেই বিরোধী পক্ষ স্যার নাজিমুদ্দীনকে বাজেটের পরবর্তী কোন দাবী উত্থাপন করিতে দেন নাই এবং তাঁহারা স্পীকারের নির্দেশ দাবী করেন। বিরোধী দলের নেতা মৌলবী ফজলুল হক সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে ইহা সুস্পষ্ট করিয়াছেন। তিনি বলেন—

আমরা দেখিয়াছি যে, ঐ দিবস স্পীকারকে লইয়া মোট ২২৫জন সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং ভোটাভুটি চলিত ২২৪ জন সদস্য লইয়া। ইহার মধ্যে ১১৪ জন সদস্য আমার পক্ষে ছিলেন এবং তাঁহারা বিরোধী দলের আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। মন্ত্রিপক্ষ সমর্থনকারীদের সংখ্যা ১১০ জন ছিল; এতদনুসারে মন্ত্রিদলের অপেক্ষা বিরোধী দলের ৪ জন সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। স্পীকার কি নির্দেশ দিবেন আমরা জানিতাম না; সেজন্য আমাদের দলবল সংগ্রহ করিয়া আমরা সভায় উপস্থিত ছিলাম। আমরা ঐদিন কোন ভোটযুদ্ধে শক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন হই নাই, তাহার উত্তর এই যে, আমরা ইচ্ছা করিয়াই তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলাম, ইহার কারণ এই ছিল যে, পূর্ব দিবসের ভোটের ফলে একটি গুরুত্বসম্পন্ন শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন দেখা দেয়, সে প্রশ্নে আমরা নিজেদের অধিকার পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলাম না। আমরা ইহাই প্রতিপন্ন করিতে সংকল্পবদ্ধ ছিলাম যে, ২৮শে মার্চের ভোটেই মন্ত্রিমণ্ডলের পতন ঘটিয়াছে; শাসনতান্ত্রিক গুরুত্বসম্পন্ন সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই আমরা স্পীকারের নির্দেশ প্রার্থনা করি। স্পীকারের নির্দেশ আমাদের অনকূলে দাঁড়ায়; কিন্তু সেই নির্দেশের ফলে আমরা আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও মন্ত্রিমণ্ডলীকে দ্বিতীয়বার এবং শেষ রকমে পরাজিত করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হই।

প্রকৃতপক্ষে স্পীকার মিঃ নৌশের আলীর নির্দেশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক অধিকারের ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক নজীর সৃষ্টি করিয়াছে। জনগণের শাসনতান্ত্রিক মর্যাদাকে বর্তমান অবস্থার মধ্যেও তিনি নিজের নির্ভীক, নিরপেক্ষ এবং সুসমীচীন সিদ্ধান্তে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের ইতিহাসের একটি ঘটনা আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। রাজা প্রথম চার্লসের সময় মিঃ লেন্থাল পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় স্পীকার ছিলেন। রাজা চার্লস বলপূর্বক সভা-ভবনে প্রবেশ করিয়া পার্লামেণ্টের পাঁচজন সদস্যকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিতে বলেন। তিনি স্পীকারকে তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিতে বলেন। মিঃ স্পীকার রাজার মুখের উপর তাঁহাকে বলেন—'সভার নির্দেশ ব্যতীত আমার চোখে কিছু দেখিবার শক্তি নাই এবং জিহ্বায় কিছু বলিবারও ক্ষমতা নাই, আমি এই সভারই সেবক।' স্পীকার মিঃ নৌশের আলীও শাসনতান্ত্রিক বিধিসম্মতভাবে পরিষদের ভোটের যাহা পরিণতি, তাহাই অভ্রান্ত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে শাসনতান্ত্রিক জটিলতা কি আছে? গণতান্ত্রিক মতিগতির যাঁহারা বিরোধী, 'স্টেটসম্যান' এবং তাহারই উক্তির প্রতিধ্বনিকারী কয়েকজন অনর্থক সে প্রশ্ন তুলিয়া হৈ-চৈ করিতে ব্যস্ত।

দুর্দশার ভীষণতা

নাজিম-মন্ত্রিমণ্ডলীর আমলে বাঙলার দুর্দশা কিরূপ চরম সীমায় পেঁীছিয়াছে, সেদিন পুরুলিয়ায় বিহারপ্রবাসী বাঙালী সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশনের সভাপতি স্বরূপে শ্রীযুত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ তাঁহার কিঞ্চিৎ চিত্র প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন—

গত বৎসরের পূর্ব বৎসর মুঙ্গেরে যখন এই সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তখন বাঙলা দেশে লক্ষ লক্ষ নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল। অন্নাভাবে পীড়ন এখনও বাঙলায় চলিতেছে, তদুপরি ভীষণ বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ সেখানে দেখা দিয়াছে। আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে, আমাদের শ্রমিক, কৃষক এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অনুন্নত শ্রেণীর নরনারীর পক্ষে লজ্জা নিবারণের জন্য এক টুকরা তেনাও জুটিতেছে না। এই সামাজিক দুর্দশার সময় ভারত গভর্নমেণ্ট এবং বাঙলা গভর্নমেণ্ট পরস্পরের প্রতি দোষারোপ দ্বারা নিজেদের বিবেকের তুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা বাঙলার বাহিরে বাস করিলেও আমরা বাঙলা দেশের সংস্কৃতির সহিত যথাসাধ্য যোগসূত্র বজায় রাখিয়া চলিতে চেষ্টা করি। আমাদের ইহাই আকাঙ্ক্ষা; কিন্তু আমরা কি এক সময়ও একথা চিন্তা করি যে, যে প্রদেশের সংস্কৃতির আমরা গর্ব করি, সেখানকার নরনারীগণ তাহাদের সামাজিক ও অর্থনীতিক জীবন সম্বন্ধে উপেক্ষার দোষে দিন দিন অনিবার্য মৃত্যুর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে?

নাজিম-মন্ত্রিমণ্ডলীর দায়িত্ব

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশনে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর সেদিন দেশ-ব্যাপী এই দুর্দশার কারণ স্পষ্টতরভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—

গভর্নমেণ্টের কণ্ট্রোল ব্যবস্থা সব ব্যর্থ হইয়াছে; খরিদ্দারদের আবশ্যক জিনিসের সর্বত্র অভাব, উপযুক্ত মূল্যে খাদ্যদ্রব্য মিলে না, বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রহসন দেশের লোকের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু সব চেয়ে শোচনীয় ব্যাপার হইল এই যে, চোরাবাজারী কারবার এখনও ফাঁপিয়া উঠিতেছে। লাভখোরের দল দুই হাতে টাকা লুটিতেছে, মজুতদারেরা দেশের দুর্দশার সব রকম লাভ উঠাইয়া লইতেছে। বাঙলার অর্থসচিব বাজেট বক্তৃতার সময় স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, সর্ব-শ্রেণীর লোকের মধ্যে দুর্নীতি অবাধরূপে প্রসারলাভ করিয়াছে। দুর্নীতির গতি অবশ্যম্ভাবী আকার ধারণ করিয়াছে ইহা মানিয়া লওয়াতে গভর্নমেণ্টের গৌরব প্রকাশ পায় না। এমন স্বীকারোক্তির দ্বারা আমাদের জাতীয় চরিত্রের উপর গুরুতর বক্রোক্তি করা হইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর একথা বলিতেই হয় যে, গভর্নমেণ্ট দরিদ্রের অন্নের সংস্থান করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, তাহারা তাহাদের বস্ত্রের সংস্থান করিতে এবং চিকিৎসাসাধ্যব্যাধিসমূহ হইতে রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। ফলে দেশের খরিদ্দার সম্প্রদায় নিদারুণ দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছে। কোন দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্টের পক্ষে কি ইহা গর্বের বিষয় হইতে পারে? গভর্নমেণ্টের দোষ ত্রুটি, তাঁহাদের অযোগ্যতা এবং কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনে দক্ষতার অভাবেরই এসব ফল। আবশ্যক দ্রব্যাদি সবই একরকম গভর্নমেণ্টের কণ্ট্রোলে গিয়াছে বলা চলে, বণ্টন ব্যবস্থাও তাঁহাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় অভাব বা সরবরাহের ত্রুটি যদি ঘটে, দায়িত্ব গভর্নমেণ্টকে নিশ্চয়ই বহন করিতে হইবে। শুধু লাভখোর এবং মজুতদারদিগের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া লাভ নাই। সমাজবিরোধী এইসব কাজ নির্মমভাবে উৎখাত করাই উচিত ছিল। গভর্নমেণ্টের কর্মোদ্যমে তেমন সঙ্কল্প-শীলতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

দেশের নরনারীর প্রতি কর্তব্যবোধে জাগ্রত কোন দেশেই এমন গভর্নমেণ্ট চলিতে পারে না। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে বহু পূর্বেই নাজিম-মন্ত্রিমণ্ডলীর পতন ঘটা উচিত ছিল; কিংবা নিজেদের অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া শাসনতন্ত্রের ঠাট বজায় রাখিয়া তাঁহাদের মানে মানে সরিয়া পড়া কর্তব্য ছিল; কিন্তু স্বার্থের দায় বড় দায়। স্বার্থকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিয়া তাঁহারা তাহা করেন নাই; আজ পরিষদে প্রকাশ্যভাবে অর্ধচন্দ্র-লাঞ্ছিত হইয়াও তাঁহারা পদত্যাগের কথাটা নিজেরা বলিতেছেন না। স্যার নাজিমুদ্দীন গত ৩১শে মার্চ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের নিকট বলিয়াছেন, যে, তাঁহারা পদত্যাগ করেন নাই। মন্ত্রীর কাজ হইতে বিরত রহিয়াছেন মাত্র। 'আশা হি সুদূরতায়া'। ঢাল নাই, তলোয়ার নাই, তবু সর্দারী করিবার সাধ! আবদারের উপর আবদার মন্দ কি? শুনিতেছি মাহিনাও জুটিবে! কিন্তু তাঁহাদের মুখ দিয়া পদত্যাগের কথাটা বাহির না হইলেও কার্যত তাঁহারা পদচ্যুত হইয়াছেন। বাঙলার গভর্নর মিঃ কেসি যদি সমগ্র বাঙলার জনমতের বিরুদ্ধে পুনরায় এই সর্বজনধিক্কৃত মন্ত্রিমণ্ডলকে আমল দিতে অগ্রসর হন, কিংবা ৯৩ ধারার দীর্ঘ মেয়াদের আড়ালে স্যার নাজিমের দল মন্ত্রিগিরিতে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইবার কূট কৌশল চালাইতে সুযোগ লাভ করেন, তবে বাঙলার সমস্যা অধিকতর জটিল আকার ধারণ করিবে; শাসনতন্ত্রসম্মত স্বাভাবিক পন্থাই এক্ষেত্রে গভর্নরের পক্ষে অবলম্বন করা কর্তব্য, অর্থাৎ বিরোধী দলের নেতাকে আহবান করিয়া সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে প্রয়োজন।

জল-কল্লোল

শ্রী প্রবোধ কুমার সান্যাল

বিপদের সূচনায় সিগন্যাল দেওয়া হচ্ছে জাহাজে। ফ্ল্যাগ নামছে আর উঠছে। ইঞ্জিন ঘরের আলো বার বার চোখ টিপছে। মাঝে মাঝে ঘণ্টা বেজে উঠছে। এই হোলো নিশানা। শুনে এসেছি বঙ্গসাগর বিশ্বাসঘাতক, হঠাৎ সে ভ্রূকুটি করে প্রলয়ের, হঠাৎ কোথা থেকে ঝড় এসে নাকি দিগ্-দিগন্তকে আক্রমণ করে।

অপরাহ্ন এসে পৌঁছেছে প্রায় সন্ধ্যায়। আপার ডেক-এ আলো জ্বলছে। খালাসীরা এখানে ওখানে দ্রুত উদ্বিগ্ন আনাগোনা করে চলেছে। দড়াদড়ি সামলাচ্ছে, লোহার শিকল টানছে, তেরপল টানাটানি করছে। আমাকে ওরা বার দুই নীচে নেমে যেতে বলেছে, কিন্তু আমি একটুও নড়িনি। আমার জ্বর, আমার বমি, আমার অবসাদ। কেউ হাত ধরে তুললেও উঠতে পারবো কি না জানিনে, তার চেয়েও অনির্দিষ্ট আমার দেশে পৌঁছবার আশা। ভবিষ্যতকে দেখতে পাচ্ছি, তরঙ্গসঙ্কুল ঐ সমুদ্রের মত, ছায়াচ্ছন্ন অন্ধ অস্পষ্ট দিগন্তের মতো। মাথা তুলে দেখবার চেষ্টা করছি দূরে সমুদ্রে বিপদের নিশানার দিকে, মাথাটা আপনি নুয়ে পড়ছে জ্বরের দুর্বলতায়। বুঝতে পারছি স্বাধীন সত্তা আমার কিছু নেই, জলে ভেসে চলেছি জলেরই ইচ্ছা অনিচ্ছায়, জলের কাছে আত্মসমর্পণ করে হাল ছেড়ে দিয়ে পড়ে আছি। আমি রোগী, আমার হাসপাতালে থাকার দরকার ছিল।

খালাসীরা সহসা একবার কলরব করে উঠলো। শুনতে পেলুম, সাগরের কোন্ প্রান্তে নাকি পশুরাজের মুণ্ড উঠেছে উঁচু হয়ে কেশররাগে। এসেছে নাকি আষাঢ়, এসেছে নববর্ষার মেঘদূত। ঘন কালো একটা ভ্রূকুটি, যেন মহিষাসুর। ওরই ভিতরে রয়েছে বিদ্যুদ্দাম,—দশপ্রহরণধারিণীর তরবারি যেন ঝলক দিচ্ছে দূরে। আমার জন্ম আষাঢ়ের শেষ দিকে—অমানিশার ঘনবর্ষায়। চারিদিকে থৈ থৈ জল, বাদলের ঝঞ্ঝা ঘর-দোর কাঁপিয়ে চলেছে, আলো নিবে গেছে, দুরন্ত বাতাস আহত ব্যাঘ্রের মতো বাইরে দাপাদাপি করছে। দিদিমা গলা বাড়িয়ে মাকে ডেকে বললেন, এ ছেলে তোমার ভাল হবে না। কোথা থেকে সর্বনেশে এলো! আজ সেই জন্মের সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছি এই জাহাজে। দেখতে পাচ্ছি নিজেকে। দুটো মরা বিবর্ণ চোখ, চেহারাটা কৃশ পাণ্ডুর, সর্বাঙ্গ ভূসোকালিতে কালো,—শরীরের নানা অংশ রোগে অনড়। আমি যেন একটা নিরর্থক সৃষ্টির টুকরো,—ছিটকে এসে পড়েছি মহাশূন্যলোক থেকে অকূল সমুদ্রে।

সেই কালো মেঘ আকাশের মাঝখানে ছুটে এলো রণদামামা বাজিয়ে, আকাশ থেকে আকাশ জানালো তার বিশাল চক্রান্তের ঘোষণা,—আর নীচেকার সমুদ্র তার ক্ষিপ্তোন্মত্ত পাঞ্জা পাঠালো তরঙ্গে তরঙ্গে। আমাদের জাহাজে দোলা লাগলো, আঘাত-প্রতিঘাত লাগলো। জাহাজ উঠছে উপর দিকে রণতুরঙ্গের মতো, নামছে নীচের দিকে যেদিকে রসাতল। আবার কোথায় বেজে উঠলো পাগলা ঘণ্টা, খালাসীরা কলরোল তুলে ছুটোছুটি করতে লাগলো, নিশানা দেওয়া হচ্ছে মুহুর্মুহু, আলোটা জ্বলে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। জাহাজের রাশ টেনে ঠিক রাখা হচ্ছে। থামলে চলবে না, থামলেই জাহাজ বানচাল। আঁকাবাঁকা ছোটালে চলবে না,— আহত প্রতিহত হয়ে বিপর্যয় ঘটতে পারে। আত্মসমর্পণ করলে চলবে না, দেশলাইর বাক্সের মতো সেটা জলের খেয়ালে নেচে বেড়াবে। জাহাজকে ধরে রাখতে হবে কঠিন হাতে, আপন স্বকীয়তায়, নির্ভুল পরিচালনায়। ঝড়, বজ্র, তরঙ্গ জলোচ্ছ্বাস—জাহাজকে এদের সম্মুখীন হয়ে থাকতে হবে। পালাবার পথ নেই,—চতুর্দিকের অকূল পাথারের একই চেহারা। এড়াবার উপায় নেই,—দশ দিক থেকে বন্য হিংস্র শ্বাপদের মতো তরঙ্গের দল অবিরাম আক্রমণ করে চলেছে। পরিচালনা ও প্রতিরোধ—এই হোলো জাহাজের প্রাণের মন্ত্র।

দেখতে দেখতে ঝড় উঠলো সমুদ্রে, কালো মেঘে সমুদ্র অন্ধকার হয়ে গেল, বৃষ্টির সাপট নেমে এলো। আষাঢ় নামলো দিক্‌দিগন্তে। জাহাজখানা দিশাহারা হয়ে গেল। বাইরে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সাগরের অন্ধকার ছেড়ে চোখ দুটো সীমাবদ্ধ হয়ে রইলো ডেক-এর ওপরে, নিজের প্রাণের ভিতরে। ভয় হচ্ছে না, কারণ ভয়ের চেতনা মরে গেছে। সমুদ্র-পীড়ায় যন্ত্রণা বোধ করছিনে, কারণ আপন কণ্ঠনালী ছাড়া আর কোথাও জীবনের চিহ্ন উপলব্ধি করতে পাচ্ছিনে। বাঁচবার সম্ভাবনা নেই জানি, কারণ কঠিন রোগে আমি আক্রান্ত,—কিন্তু জীবন ও মৃত্যুর এই মাঝামাঝি সময়টাকে উত্তীর্ণ হওয়া কিছু কষ্টকর বৈকি। কোন্ মৃত্যুটা নির্বিঘ্ন, কোন্‌টার কম কষ্ট, কোন্‌টায় যন্ত্রণা নেই, কোন্‌টা হাসিমুখে বরণ করা যায়—ভাবছিলুম। ছোটবেলা চৌবাচ্চায় ডুবে গিয়েছিলুম, প্রায় এক মিনিটের একটা কঠিন স্মৃতি! নীরেন জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিল,—দম আটকে রুদ্ধশ্বাসে ভীষণ যন্ত্রণায়। আমাদের শিবুকাকা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল—তার সবুজ রংয়ের জিবটা মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল, আর নাক আর চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত! আফিঙ খেয়ে মরেছিল রতনবাবুদের বড় মেয়ে নীরদা। আমি তাকে দেখিনি, শুনেছি পেটের আর বুকের যন্ত্রণায় মরবার আগে সে বলেছিল, তার মরতে ইচ্ছা ছিল না! আর পুড়ে মরেছিল বাঙলাদেশের প্রথম কুমারী মেয়ে স্নেহলতা,—দরিদ্র পিতাকে কন্যাদায় থেকে মুক্তি দিয়ে। স্নেহলতাকে নমস্কার, তার মৃত্যু ব্যর্থ হয়নি,—এদেশের সমাজ সংস্কার সেইদিন থেকে সুরু। আমাদের উপীন মামা মরেছিল মোটরের তলায় পড়ে, কলকাতায় তখন প্রথম মোটর গাড়ী। বিধবা সুহাসিনী সহোদর ভাইয়ের লাঞ্ছনায় হতমান হয়ে রেল লাইনে গলা পেতে দিয়ে একদিন রাত্রে বেলেঘাটায় না কোথায় যেন ট্রেনের নীচে আত্মহত্যা করেছিল। নিজে জানবো না, উপলব্ধি করতে পারবো না, এমন কোন্ মৃত্যু? সুখের নিদ্রার মধ্যে যে মৃত্যু আসে নিঃশব্দে চুপি চুপি, যে-মৃত্যুর পথ চিনিনে, যাকে অনুসরণ করা যায় না, যে-সুখের নিদ্রা আর কোনদিন ভাঙ্গে না! আসুক সে প্রভঞ্জনের প্রবল তাড়নায়, পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে, দুরন্তের উদ্দামভয়াল রণরঙ্গে। আসুক সে, সে এসে আমাকে টেনে নিয়ে যাক। এই ক্লিষ্ট, ক্লান্ত, জর্জর, রুগ্ন, স্থাণু জীবনকে সে তুলে নিয়ে যাক বাইরের ওই অন্ধকার তরঙ্গমথিত সমুদ্রে, ওই বিশাল ভয়ালের পদপ্রান্তে সবল কঠিন হাতে আমাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিক; আমার শত লক্ষ ভগ্নাংশ, আমার অণু-পরমাণু ছড়িয়ে দিক ওই অনন্ত জলরাশির চূড়ায় চূড়ায়।

সহসা অন্ধকার সমুদ্র থেকে দুর্দান্ত তাড়নায় একটা জলোচ্ছ্বাস লাফিয়ে উঠে এলো ডেকের ওপর,—পলকের মধ্যে

আমাকে ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিল! পাটাতনের একটা খুঁটি আঁকড়ে ধরে তখনই আত্মরক্ষা করলুম বটে, কিন্তু আমার একমাত্র আহার্য তিন-চতুর্থাংশ পাউরুটিখানা ঢেউয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল! ওটা ছাড়া খাদ্য সম্বল আর আমার কিছু ছিল না। মনে করেছিলুম চার পয়সা দামের পাউরুটি চার দিনে ভাগ করে খাবো; পাছে কোনোবারে বেশি খেয়ে ফেলি এজন্য অনেকবার লোভ সংযত করেছিলুম। এক হাতে পাটাতনের খুঁটি আঁকড়ে অন্য হাতে এবং দুই পায়ের সাহায্যে ভাসমান পাউরুটিখানা রক্ষা করবার প্রাণপণ চেষ্টা যে করিনি তা নয়, কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে লোনা জলের প্রবাহ ওটাকে পলকের মধ্যে ভাসিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেল! এমন সময়ে ঘণ্টা বাজিয়ে ঘোষণা করা হোলো, জাহাজের রোলিং আরম্ভ হয়েছে—সাবধান! জাহাজখানা বাঁ দিকে কাৎ হয়ে পড়ছে, আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে, আবার ডান দিকে কাৎ হয়ে প্রায় জলের ওপর যেন শুয়ে পড়ছে। প্রত্যেক দফায় জলোচ্ছ্বাস উঠে পড়ছে ডেক-এর ওপর, আর আমি প্রতিরোধশক্তিহীন হয়ে জামা-কাপড়শুদ্ধ অবগাহন স্নান করছি। পাউরুটিখানা গেল, আমার প্রাণটা গেল ওর সঙ্গে, আমার চারদিন ব্যাপী জীবন-যন্ত্রণার একমাত্র সম্বল গেল, একমাত্র বন্ধুকে হারালুম। একটু আগে মৃত্যুর কথা ভাবছিলুম, আত্মহত্যার উপায় কল্পনা করছিলুম,—সেটা রুগ্ন মনের বিকৃত চিন্তাবিলাস ছাড়া কি আর কিছু? পাউরুটিখানা ছিল প্রধান আশ্রয়, ওখানাকে উপলক্ষ করে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছি, পাউরুটির ভেলায় ভেসেছি অকূলে। আমার পাউরুটি, কলুটোলার সরকারের দেওয়া মধুর পাউরুটি, লোনা-রসে ওখানা ছিল দীক্ষিত, আমি ছিলাম ওরই আশ্রিত, ওরই সুস্বাদের ভাবে বিভোর। পাউরুটিখানা যাওয়া মানে আমার অস্তিত্ব লোপ পাওয়া,—কারণ আমি আমার মোহজাল বুনে রেখেছি ওর তিন-চতুর্থ ভগ্নাংশের স্তরে স্তরে। সমুদ্রের একটি জলোচ্ছ্বাস সেদিন আমাকে সর্বস্বান্ত করে চলে গেল। এতকাল পরেও স্পষ্ট মনে পড়ছে, আমার রুগ্ন চক্ষের লোনা জল সমুদ্রের লোনায় সে রাত্রে মিশে গিয়েছিল!

জলোচ্ছ্বাস বার বার উঠে এসে আঘাত করছে আমাকে, যাবার সময় টানছে প্রবল টানে। আঁকড়ে ধরে রাখতে পাচ্ছিনে খুঁটিটা, রোগা শরীরে শক্তি জোগাচ্ছে না। জাহাজ এ পাশে কাৎ হবার সময় খুঁটি ধরে ঝুলছি, ও-পাশে কাৎ হবার সময় খুঁটিতে মাথা ঠুকে মুখ গুঁজড়ে যাচ্ছে। নাকে মুখে, কানে লোনা জল ঢুকছে। একবার আমাকে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়, আর একবার পুঁতে ফেলতে চেষ্টা করে। ওপরের ডেক-এ কেউ নেই, জলের উচ্ছ্বাসে কারো থাকারও উপায় নেই, খালাসীরাও কোথায় যেন সরে গেছে, আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঘণ্টা বাজছে বার বার, সাগর গর্জন চলছে অবিশ্রান্ত, তেরপল ছিঁড়ে পড়ছে ঝড়-বৃষ্টির উন্মাদনায়,—আর তার মাঝখানে নিরুপায় বৃহৎ জাহাজখানা আহত মথিত উৎপীড়িত প্রতিহত হতে লাগলো।

খুঁটি আঁকড়ে ধরে দুই হাত এক সময়ে অবশ হয়ে এলো,—দেহের শক্তি নয়, ইচ্ছার শক্তি এক সময়ে শিথিল হয়ে আসতে লাগলো! ভাবলুম, হাতের শক্ত মুঠো আলগা করে দেওয়া মন্দ কি? আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ওই দিকচিহ্নহীন অগাধ সমুদ্রের অন্তহীন তলে,—কেউ খোঁজ পাবে না, কেউ ফিরেও তাকাবে না,—সেই মৃত্যু ত লোভনীয়। ক্ষীরোদ সমুদ্রে অনন্তশয্যায় নারায়ণ,—সৃষ্টিকর্তা,—আর পদপ্রান্ত-বাসিনী লক্ষ্মী,—সৃষ্টিরূপিণী! নারায়ণের নাভি থেকে দাঁড়িয়ে উঠেছে রক্তকমল। মন্দ কি! চলে যাবো সাগরের নীচের তলায়,—সেখানে মুক্তার মণিকোঠা, সেখানে অপার্থিব জীবলোক,—সেখানে পাতালকন্যা তার মৎস্যগন্ধারা,—অজস্র জলচর, অনাবিষ্কৃত মহাসভ্যতার সমাধি, সেখানকার তলায় তলায় কতকালের মানুষের অপরিতৃপ্ত স্বপ্নলোক আদিম নিদ্রায় নিঃসাড় হয়ে রয়েছে। আমি সেখানে নামবো পৃথিবীর সংবাদ নিয়ে, পারিজাত কাননের সুখের বার্তা নিয়ে,—আমি নিয়ে যাবো পৃথিবীর সুখদুঃখ দৈন্য আনন্দ নিয়ে, সূর্যের হৃদপিণ্ডের ভাষা নিয়ে, অনন্ত আকাশের আশা নিয়ে। আমিও থাকবো তাদের সঙ্গে; তাদের দলেরই দলী, তাদের বলেই বলী—শুধু আমার অপরিসমাপ্ত জীবন কামনা সূর্যলোকের পথ খুঁজবে অগাধ জলের নীচের থেকে উপর তলায়—সেই কামনা জেগে উঠবে রক্তকমলের মতো,—আকাশের দিকে, অসীমের দিকে তার পদ্মদল বিকশিত থাকবে সৃষ্টির প্রাণক্ষুধার মতো। তরঙ্গে তরঙ্গে টলমল করবে সেই রক্তকমল।

প্রবল ঢেউ এবার ডেকের উপর উঠে আমাকে ধাক্কা দিয়ে হাত দুখানা খুঁটির থেকে ছিঁড়িয়ে নিল। আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল চক্ষের নিমেষে। আছাড় মারলো আমাকে ডেক-এর রেলিংয়ের ধারে,—আমি সরীসৃপের মতো মাটি আঁচড়ে উপর দিকে ওঠবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু জাহাজখানা রোলিং করে আবার আমার দেহটা গুঁজড়ে দিল ওই রেলিংয়েরই ধারে। জীবনটা কিছুতেই যেতে চায় না সংগ্রামটা কিছুতেই ফুরোয় না। মুখ দিয়ে কী নির্গত হচ্ছে,—ফেনা?—না আমারই আর্তস্বর? অন্ধকারে চোখ বেয়ে কী গড়ায়,—লোনা জল? না রক্ত? বার বার হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যায় রেলিংয়ের দিকে, বার বার সরীসৃপের মতো মুখ থুবড়ে মাটি আঁচড়ে উপর দিকে বুকে হেঁটে আসি।

এমন সময় একজন খালাসী কোথা থেকে যমদূতের মতো এগিয়ে এলো। আমার গলার কাছে কোটের বোতামশুদ্ধ মুঠো ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল হোল্ডের সিঁড়ির কাছে—যেন মস্ত রুই মাছের কানকোর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে চলা, টুঁটি টেনে ধরা। সেজ মাসিমা রাগ করে তাঁর পুত্রবধূর উদ্দেশে বলতেন, ওর কলাসিটা টেনে ছিঁড়লে তবে আমার রাগ যায়।

হোল্ডের মুখে নিয়ে গিয়ে খাড়াই সিঁড়ির ধারে রুষ্ট খালাসীটি আমাকে সহসা নীচের দিকে ঠেলে দিল। জাহাজ প্রবল দোলায় দুলছে,—আমি ব্যাধিগ্রস্ত,—ভার-সাম্য রক্ষা করা সম্ভব হোলো না। টাল সামলাতে না পেরে গড়াতে গড়াতে ছিটকে গিয়ে পড়লুম নীচের তলাকার কতকগুলি লোকের ঘাড়ে। আমার ভাগ্যে তখন আরো কিছু বাকি ছিল।

দিদিমা কথায় কথায় নিজের ভাগ্যকে স্মরণ করে বলতেন, ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে, মরণং গোমতীতীরে, অপরংবা কিং ভবিষ্যতি। অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও মানুষের একটা ভাগ্য থেকে যায়। কোনো একটি ব্রাহ্মণ গোমতীর তীর থেকে উক্ত মৃত ভবঘুরের মাথার খুলিটি উক্ত ভাগ্যলিপি পাঠ করে পরীক্ষার জন্য ঘরে এনে রেখে দিয়েছিল, ব্রাহ্মণী সেটি দেখে ঘর ঝেঁটিয়ে কোন জঞ্জালে ফেলে দিল। জঞ্জালেই তার চরম অবসান। সুতরাং জ্যোতিষী ব্রাহ্মণের দিব্যচক্ষু লাভ ঘটলো।

আমি যাদের ঘাড়ের ওপর পড়েছিলুম, তাদের একটি হোলো জনৈক উৎকলবাসী, অপর জন হলো কাবুলিওয়ালা। উড়িয়াটির উত্থানশক্তি ছিল না, সমুদ্র পীড়ায় সে অনড় তবে আঘাতের শোধ নিল সে আমার উপর পদাঘাত করে এবং সুমধুর ভাষায় পিতৃমাতৃ উচ্চারণ করে। দ্বিতীয় পদাঘাতের ভয়ে আমি তার পায়ে হাত বুলিয়ে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলুম, লাগেনি ত? কিন্তু এপাশে সেই মুহূর্তে যে আমার উপর একটি বজ্র উঁচিয়ে ছিল, সেটি লক্ষ্য করিনি। সহসা কাবুলিওয়ালার প্রচণ্ড চপেটাঘাতে আমি দিশাহারা, হয়ে মুখ থুবড়ে পড়লাম! তখনই জ্ঞান হারালুম কিনা, মনে মনে আপন চৈতন্যকে বিশ্লেষণ করতে লাগলুম! ওরা বোঝেনি, সে যুগটা আমার মৃত্যু-সাধনার যুগ; ওরা বোঝেনি—সেদিনকার উৎপীড়িত মানবাত্মার প্রাণের ভাষা শোনার জন্য জলকল্লোলের দিকে আমি কান

পেরেছিলুম। ওরা বোঝেনি, আমার শরীরের ওপর আঘাত আমার মনের দরজায় গিয়ে পৌঁছয় না। আমি মার খেয়ে কাঁদিনে, শুধু বর্বরতার অন্তর্নিহিত শক্তির স্বরূপটিকে স্পষ্ট চক্ষে দেখে নিতে চাই।

দিদিমার কথা কান পেতে শুনছি অপরংবা কিং ভবিষ্যতি। কিন্তু সেই কাবুলিওয়ালার যে মস্তিষ্ক বিকৃতি ছিল একথা অল্পক্ষণ পরেই জানলুম। সে আমার মাথা থেকে প্রথমে একমুঠো চুল টেনে ছিঁড়ে নিল। তারপর এত অল্পে খুসী না হয়ে আমার পিঠের উপরকার মাংস কয়েকটা স্থূল আঙ্গুলের সাহায্যে ছিঁড়ে নেবার চেষ্টা করলো। চেষ্টা ফলবতী হোলো না। সুতরাং সে আমার গলার কাছে একটা চাপড় বসালো। কাবুলিওয়ালার কৃতঘ্নতা প্রকাশ করা আমার এ লেখার উদ্দেশ্য নয়, আমার জন্য তার পায়ের ওপর কিছু আঘাত লেগেছিল একথা আমি ভুলিনি, ভুলবোও না। তারা স্বাধীন জাতি, আঘাতের বদলে আঘাত করতে তারা জানে ঠিক। এক সময় মুখ তুলে দেখি, লোকটা ফিক ফিক করে হাসছে, কিন্তু সে-হাসি যে পুনর্বার প্রহারের কলাকৌশল খুঁজছিল, এটি পরমুহূর্তেই জানলুম। সে আমার কানের কাছে জুলপির লোমগুলি ধরে টেনে ছিঁড়লো,—পরবর্তী কালে দুমাস আমার সে ঘা শুকোয়নি। দেশে ফিরে আবিষ্কার করেছিলুম, আমার মুখে, মাথায় পিঠে, যাবে বড় বড় কালশিরার সবুজে দাগ। আমি নিরপরাধ অথবা নিরীহ প্রাণী,—এ বিচার করার দায় সেই কাবুলিওয়ালার ছিল না। কিন্তু প্রহারের বিরুদ্ধে আমি যে প্রতিরোধ করিনে, প্রতিশোধ নিইনে, অভিযোগ জানাইনে, অপমান আর লাঞ্ছনা নিঃশব্দে সহ্য করি মুখ বুজে,—এটি তার পক্ষে কম সুযোগের কথা নয়। আশে পাশে সবাই সমুদ্র-পীড়ায় অনড়, অচেতন; নীচে প্রহরী কেউ নেই, প্রতিবাদ জানাবার লোক নেই,—পার্শ্ববর্তী কারো মৃত্যু ঘটলেও কেউ ভ্রূক্ষেপ করবে না; জাহাজের দোলায় চোখ খুলে তাকালে বমির বেগে কপালের শির ছিঁড়ে পড়ে,—এমন অবস্থায় একজন প্রতিরোধশক্তিহীন ব্যক্তিকে যথেচ্ছ উৎপীড়ন করার সুবিধা এবং স্বাধীনতা কাবুলিওয়ালাটি ত্যাগ করতে পারলো না!

রাত তখন গভীর। হয়ত বারোটা, হয়ত বা দুটো। লোকটার অবিরাম বর্বরতা আর উৎপীড়ন-কৌশল অব্যাহতভাবে চললো সমস্ত রাত ধ'রে। আমার নড়বার অথবা সরে যাবার কোনো জায়গা আশেপাশে ছিল না। কেবল সেই উৎকলবাসীটি আমার পিঠের উপর তার একখানা পায়ের গোড়ালি রেখে নিজের বমির যন্ত্রণায় আমার পিঠের উপরেই বা'র বা'র পা ঠুকতে লাগলো।

যারা যোগনিদ্রায় বসে তারা কে? কে তারা, যারা দেহের চেতনাকে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করে দেয়? কে তারা, যারা প্রাণ-মন্দিরে অধিষ্ঠিত থেকে একাগ্র তপস্যায় এক এবং অদ্বিতীয়কে নিরীক্ষণ করে উদ্ভাসিত সমগ্র সত্তায়? দেহচৈতন্য কি তাদের কিছু নেই? কিন্তু আমিও যে সেই আত্মভোলা সন্ন্যাসী। সেদিনকার সেই আঠারো বছরের ভূগোলের ভালো ছাত্র আমি—আমিও অনুভব করেছিলুম আমার হিমাদ্রি জটায় বয়ে যায় সিন্ধু আর ব্রহ্মপুত্র, ললাটে ধারা বয় গঙ্গা-যমুনার, হৃদয় প্লাবিত হয় গোদাবরী আর নর্মদার জলকল্লোলে,—কন্যাকুমারিকা আমারই পদ-প্রান্তে লুটোপুটি করে তা'র কৃষ্ণা-কবরী এলিয়ে। সরস্বতী আমার জীবনের মূল-মন্ত্র! আর আমার দেহের দুই পারে আনন্দের অশ্রুসাগর। আমি যে গাঙ্গেয়!

মিথ্যে নয়, ছোট থেকে কল্পনা করে-ছিলুম একটা বড় জীবন। সর্বব্যাপী সমগ্রতায় যেটা পরিপূর্ণ; যে জীবনটা বিরাট। আমি বনস্পতির মতো হবো—শত সহস্র পাখী বাসা বেঁধে থাকবে আমার শাখা প্রশাখায়। হিমালয়ের মতো হবো—যার বিশাল ব্যাপকতা মানব কল্পনার অতীত। লোকবসতি গড়ে উঠবে আমার স্তরে স্তরে, আমার অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে। আমার দেশের সকল নদীতে আমারই প্রাণ-ধারা প্রবাহিত হবে; মাটির তলায় থেকে আমিই মন্ত্র জোগাবো বীজ থেকে অঙ্কুরে, ফুল থেকে ফলে। অগণ্য আর অসংখ্যের ভিতরে ভিতরে আমার অস্তিত্বকেই জাগিয়ে তুলবো, আমার শক্তিই সঞ্চারিত করে দেবো। আমিই জপের আসনে বসে থাকবো জনসাধারণের অন্তরে অন্তরে। আমার অন্তর্লোকে যে বিশাল সমুদ্র, যার প্রতি মুহূর্তের রাশি রাশি চিন্তা ও ভাবনা অবিরাম তরঙ্গদলের মতো নিত্য উচ্ছ্বসিত,—আমি তার কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে জনসমুদ্রকে মন্থন করে তুলবো। একটা বিরাট চরিত্র,—অভিব্যক্তির পিপাসায় যে জর্জর, মুক্তি ক্ষুধায় যে উন্মাদ, স্বাধীনতার বাসনায় যে চিরচঞ্চল। একটা সর্বনাশা চরিত্র,—ব্যবস্থা আর শৃঙ্খলাকে চূর্ণ করে যে দাঁড়িয়ে ওঠে, নতুন জীবন-আদর্শের যে স্বাদ আনে, প্রচলনের ভিত্তিকে যে কাঁপিয়ে তোলে। একটা মহৎ বিপ্লব-বাদী,—সমুদ্র মন্থন করে যে তুলবে গরল, বিষপান করবে জনসাধারণের কল্যাণে,—রাজবুদ্ধিকে যে নষ্ট করবে, লোভীকে সংস্কৃত করে তুলবে, সম্পত্তিবাদকে ধ্বংস করবে, নতুন জীবনবেদকে প্রতিষ্ঠিত করবে, দুষ্কৃতির বিনাশের আয়োজন করবে। আমি চেয়েছিলুম সেই মহৎ উদার বর্বরতা, চেয়েছিলুম সেই সর্বনাশা কালা পাহাড়কে—বাইরের সব মন্দির ভেঙে দিয়ে প্রাণমন্দির প্রতিষ্ঠায় যে সাহায্য করবে। ভাবছিলুম, কবে একটা বর্বর জলস্তম্ভ সমুদ্রের ভিতর থেকে লাফিয়ে উঠে পুরাতন ইতিহাসকে ধরে মুছে নিয়ে যাবে? প্রবলের হাতে দুর্বলের উৎপীড়ন কবে শেষ হবে? হাজার হাজার বছর ব্যাপী বলবানের ক্ষমতাপ্রিয়তার কবে হবে অবসান? নিরীহ যারা, নির্বোধ যারা, নিরুপায় যারা—তাদের জন্য ন্যায় বিচারের তোরণদ্বার খুলবে কবে? এই যে আমার সর্বাঙ্গে নির্দয় আঘাতের চিহ্ন আঁকা, এ যেন অগণিত যুগ-যুগান্তরের উৎপীড়িত মানবাত্মার ক্ষতচিহ্ন আমি ধারণ করে রয়েছি। আমার সর্বাঙ্গের উপর দিয়ে যেন সকল যুগের ইতিহাস আর সভ্যতার পাতা উলটে গেছে। যারা মার খেয়েছে কালে কালে, যারা শ্রম করেছে মাঠে মাঠে, যাদের বুকের রক্ত গড়িয়ে পড়েছে সভ্যতার স্তরে স্তরে,—যারা মূঢ় নির্বোধ চেতনাশক্তিহীন, যারা অজ্ঞান অন্ধ, অনড়—যারা বঞ্চিত প্রতারিত অবহেলিত, যারা সেবা করেছে অনেক—অপমান ফিরে পেয়েছে তার চেয়েও বেশি,—আজ এই জাহাজের খোলের মধ্যে প্রহার-জর্জরিত হয়ে তাদের কথাই ভাবছি। মাথা উঁচু করতে গিয়ে ভাগ্যের বিড়ম্বনায় যারা নতশির, তাদের কথাই ভাবছি। তাদের কথা ভাবছি যারা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে জানে না, লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে পারে না, অন্যায়ের অপরাধের বিরুদ্ধে বিচারের যাদের আলো নেই, আশা নেই, ভাষা নেই,—তাদের কথাও মনে পড়ছে। যারা রোগে মুখ থুবড়ে মরে, যারা উপবাসে মরে ভাগ্যের প্রতি দোষ চাপিয়ে, রাষ্ট্র-চক্রান্তের প্রবল দোহনে যারা শুকিয়ে রক্তহীন হয়ে মরে, স্বেচ্ছাতন্ত্র শক্তির পায়ের তলাকার চাপে যারা বিনা প্রতিবাদে রুদ্ধকণ্ঠে মরে,—তাদের কথাই বার বার ভাবছি।

কিন্তু কাবুলিওয়ালার তাড়না থেকে আমার সহজে নিষ্কৃতি ছিল না। চেষ্টা করেছিলুম হামাগুড়ি দিয়ে তার নাগালের বাইরে যেতে। কিন্তু কোথাও সরে যেতে গেলে অন্তত পনেরোটি লোকের উপর দিয়ে মাড়িয়ে যেতে হয়,—এক ইঞ্চি জায়গা কোথাও খালি নেই। উড়িয়ার একখানা পা ছিল আমার পিঠের উপর, কিন্তু আমার ডান পা খানা ছিল বোধকরি তার নাকের ডগায়, এক সময়ে বমির যন্ত্রণায় সে আমার পায়ের উপরে বন্যজন্তুর মতো সহসা এক কামড় বসালো। আমি যন্ত্রণায় তখনই পা সরিয়ে নিলুম বটে, কিন্তু অপর একটি অচেতন প্রাণীর মাথায় আমার হাঁটুর ঠোকা লাগলো। সুতরাং বহু মানুষের সেই বিগলিত রুগ্ন ক্লিন্ন কতকগুলি দুর্গন্ধ দেহের স্থূল মাংসলতার মধ্যে আমি বন্দী হয়ে আকণ্ঠ ঘৃণায় আড়ষ্ট হয়ে রইলুম। কিন্তু ওরই মধ্যে একটু নড়বার চেষ্টা

করতেই কাবুলিওয়ালার প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত আমাকে আবার নিরস্ত করে দিল। পরদিন সকালে লক্ষ্য করেছিলুম, আমার নাকের ভিতর থেকে রক্ত গড়িয়ে এসেছিল।

জাহাজের দোলা, জাহাজের একাৎ ওকাৎ হওয়া—আমাদের স্থির থাকতে দিচ্ছে না। শুয়ে শুয়ে একজন আর একজনের ঘাড়ের উপর হিঁচড়ে উঠে পড়ছে। কেউ নড়ে যাচ্ছে, কেউ যাচ্ছে গড়িয়ে, কেউ পিছলে সরে যাচ্ছে। একটা শরীর আর একটা শরীরের ধাক্কায় আহত হচ্ছে। যেমন জন্তুরা যায় খাঁচার মধ্যে, যেমন হাঁস-মুরগীরা যায় বন্ধ চেঙ্গারিতে,—তেমনি এখানে মানুষ। এরা জীব, জীবন নয়। এরা দেহ, প্রাণ নয়। এরা বস্তু, কোনোক্রমে এদের জলে ভাসিয়ে তীরভূমিতে পার করে দেওয়া। এদের মৃত্যু ঘটলে খাতায় এদের সংখ্যা উঠবে, নাম উঠবে না। আমি এদেরই একজন, এদেরই মতন, এদেরই দুঃখ-দৈন্য, যন্ত্রণা আর উৎপীড়নে আমিও ওলোট-পালট খাচ্ছি। আমি এদেরই এক সংখ্যা।

বোধকরি জাহাজের উন্মত্ততায় টাল সামলাতে না পেরে আমার হাতের একটা চোট লেগে থাকবে কাবুলিওয়ালার পিঠে।—চোটটা এমন কিছু নয়,—কিন্তু সে মনে করলো এটি আমার ইচ্ছাকৃত। অমনি এপাশ ফিরে একপ্রকার কুটিল হাসি হেসে সে আমার চুলের মুঠি ধরলো বেশ করে বাগিয়ে। মনে পড়ে গেল মামার ওপর রাগ করে দিদিমা বলতেন, বেটার থুৎনিটা যদি বালির ওপর রগড়ে দিতে পারতুম! দিদিমা পারেনি, কাবুলিওয়ালাটা পারলো অনায়াসে। আমার চুলের মুঠি শক্ত হাতে ধরে লোকটা আমার মুখখানা কাঠের মেঝের ওপর রগড়ে দিতে লাগলো অতি আনন্দে। বাধা দেবার শক্তি আমার ছিল না।

জাহাজের প্রবল দোলা, ঝড়-বৃষ্টির প্রচণ্ড মাতামাতি, তরঙ্গের অশ্রান্ত দাপাদাপি, নৈশসাগরের ভয়ভীষণতা, বাতাসের বন্য গর্জন,—আর ভিতরে সবাই দুলছে, আছড়াচ্ছে, আর্তনাদ করছে, ওলোট-পালট খাচ্ছে, বমি আর বিষ্ঠায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। এদের মাঝখানে আমি—আমার পিঠের উপর উড়িয়া তার পায়ের গোঁড়ালি ঠুকে চলেছে অক্লান্ত, কাবুলিওয়ালা আমার রগের উপর আঘাত করে চলেছে অবিশ্রান্ত। সহসা মনে পড়ে গেল হিতোপদেশের কথা—'সদা সত্য কথা কহিবে। গুরুজনের নিকট মিথ্যা বলিবে না।' খড়্গপুরে যাবার নাম করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলুম আমেরিকার পথে। মিথ্যাকে গৌরবমণ্ডিত করতে পারিনি, সেইটিই ত সকলের বড় লজ্জা। কিন্তু লজ্জাই কি এর মধ্যে সব? একথা কি বোঝাতে পারবো না যে, জল আমাকে টেনে ছিল প্রচণ্ড টানে? আমি যে পৃথিবীর তিন ভাগ জল দেখতে বেরিয়েছিলুম, একথা কি মিথ্যে? আমি কি শুধু অবাধ্য হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি, শুধু পালিয়েছি দেশত্যাগ করে, শুধু ভাগ্য অন্বেষণের পথে পা বাড়িয়েছি—এ ছাড়া কি আমার আর কোনো পরিচয় থাকবে না? আমরা দুই বন্ধু মিলে দেখতে বেরিয়েছিলুম জীবনকে, বৃহৎ লোকযাত্রাকে, অগণিত মানবগোষ্ঠিকে—আমাদের ছিল অবারিত মুক্তি আর স্বাধীনতার পিপাসা। ভাগ্য অন্বেষণটা আমাদের কাছে বড় ছিল না, ওটায় আমাদের একমাত্র প্রয়োজন ছিল না,—নিজেকে সম্পদশালী করার, ধনাঢ্য করে তোলার বিলাসব্যসনপ্রিয় করার স্থূল লালসা একটুও ছিল না। স্বপ্ন দেখেছিলুম আমরা দুঃখজয়ী হবো, আমরা দুর্গম ও দুরারোহকে আয়ত্তের মধ্যে আনবো,—আমরা বিরাট হয়ে উঠবো, ক্ষমতাবান হবো। বর্মা, মালয়, শ্যাম, সিঙ্গাপুর—এই সব সামানার দিকে আমাদের লক্ষ্য ছিল না, এদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যাবো, এই আমরা জানতুম। আমি জানতুম অন্য কথা। আমি জানতুম, আমাদের মাণিকতলার খাল গিয়ে মিশেছে গঙ্গায়, বাগবাজার থেকে বেরিয়ে নিমতলার শ্মশানঘাটা পেরিয়ে সেই জল চলে গেছে সাগরের দিকে। সেই সাগর ছুঁয়ে রয়েছে চীন থেকে জাপান, সেখান থেকে সানফ্রান্সিসকো। আমার বাড়ীর নালায় যে জল, সেই জল নহর বেয়ে গেল কতদূরে, সেখান থেকে নদীতে, নদী গেল সাগরে। আমি ঘরে বসে জাগ্রত চক্ষে দেখতে পেতুম, আমার বাড়ির নালার সঙ্গে যোগ রয়েছে লণ্ডনের সীমাবর্তী টেমস্ নদীর, আমি দেখতুম ঠনঠনের জলের সঙ্গে যোগ দক্ষিণ সমুদ্রকূলের দ্বীপপুঞ্জের, আমি দেখতুম মাণিকতলার খাল আর আলাস্কার প্রান্তের সাগর একাকার। পৃথিবীর কোনো জল স্বাধীন একান্ত নয়। আকাশ পথ বেয়ে যে আসে, যে-জল চলে মাটির তলায় তলায়, যে-জল খাল বিলে নদীতে তড়াগে হ্রদে সাগরে মহাসাগরে—সকলের সঙ্গে সকলের যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন। সেই জল আমাকে টেনেছে বার বার,—টেনেছে অন্ধের মতো, উন্মাদের মতো। জলের নেশা ছেড়ে যত দূরে সরে গেছি, আমার দড়িতে টান পড়েছে, দড়ি ছিঁড়ে আমার প্রাণের নৌকা অকূলের দিকে পাড়ি দিয়েছে বার বার।

তন্দ্রা ঠিক নয়, অচেতন আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছি। আমার অপরিসীম ধৈর্য লক্ষ্য করে কাবুলিওয়ালাটা শেষবারের মতো আমার পিঠে দু'চারটে কিল বসিয়ে সম্প্রতি নিরস্ত হয়েছে। সে আছে এক পাশে, উঁচু পাটাতনের ঠিক নীচে। পাটাতনটার উপরে প্রায় দশ হাত লম্বা-চওড়া একখানা লোহার চাদর ঢাকা—ওগুলোর ওপর কিছু কিছু মালপত্র থাকে। কিন্তু চাদরখানা কোনোক্রমে সরালেই দেখতে পাওয়া যেতো জাহাজের নীচের তলা, প্রায় পনেরো ফুট গভীর নীচু। লোহার চাদরখানা অনেকটা যেন কৌটার ঢাক্‌নার মতো সাহায্য করছে। আমরা যেখানে আছি তার নীচেও যে আর একটা নীচের তলা রয়েছে, এটা আগে টের পাইনি। সেখানকার অবস্থা আমাদের অপেক্ষাও মন্দ, তারা বাস করছে সমুদ্র সমরেখার নীচে, অর্থাৎ জলের নীচে নিম্নতম খোলে। সেখানে আছে স্ত্রীলোক, শিশু, ভিখারী, মাড়োয়ারী, শ্রমিকশ্রেণী এবং তাদের সঙ্গে শত শত মণ মালপত্র। এবারে আর গরু ঘোড়া মহিষ ছাগল ভেড়া ইত্যাদি দেখিনি। তাদের স্থলে আমরাই আছি।

রাত কত জানবার উপায় নেই, ভোর হতে কত বাকি তাও জানিনে। আমি এখানে আসার পর থেকে একটা সম্পূর্ণ দিন চ'লে গেছে কিনা তারও ঠিক নেই। কতক্ষণ ধরে এখানে ওলোটপালট খাচ্ছি, কতকাল ধরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছি, তাই বা কে বলে? দু' ঘণ্টা হতে পারে, ছত্রিশ ঘণ্টা হলেও অবিশ্বাস করবো না। এটা রাত, না দিন; আলো না অন্ধকার; সকাল না সন্ধ্যা—কেউ জানে না। সবাই সামুদ্রিক পীড়ায় অনড়, মুমূর্ষু, হতচেতন। হাত পা কেউ নাড়ে না, পাশ ফিরে শোবার ক্ষমতার অভাব, মাঝে মাঝে শুধু বমি করে আর্তস্বরে, মৃত্যুযন্ত্রণায়,—আবার সেই বমির ওপরেই মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। চারিদিক চাপা, নিরেট, বায়ুবন্ধ, কণ্ঠরোধী। ওদিকে চলছে সমুদ্রের অবারণ রোলিং তেমনি ঝড় আর বৃষ্টি, তেমনি জাহাজের একাৎ আর ওকাৎ হওয়া। আকাশ যেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে বঙ্গসাগরে—বজ্রে, বিদ্যুতে, তরঙ্গে, উচ্ছ্বাসে বৃষ্টি তাড়নায়—দিকদিগন্ত লণ্ডভণ্ড হয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে কেউ কাঁদছে, কেউ পেটের যন্ত্রণায় মাথা ঠুকে চীৎকার করে উঠছে, কেউ নাকখৎ দিয়ে আর একজনের পায়ে জড়িয়ে বলছে, বর্ষাকালে আর সমুদ্রে নামবে না। কিন্তু যার পায়ে ধরে শপথ করা হচ্ছে সেও কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। বর্ষার বঙ্গসাগর বড় ভয়ঙ্কর।

দুজন খালাসী কি যেন কাজে নীচের দিকে নেমেছিল। তারা স্বাস্থ্যবান, প্রফুল্ল, স্বচ্ছন্দ,—যেন দেবদূত নেমে এলো উপর থেকে। তাদের কথাবার্তায় বিস্ময়বোধ করে চোখ বুজে রইলুম। শুনলুম, আগামীকাল মঙ্গলবার জাহাজ পৌঁছবে ডায়মণ্ডহারবারে। মনে মনে হিসেব করে দেখলুম, কাল রাত প্রায় দুটোর থেকে এখানে প'ড়ে আছি। কখন ভোর হয়েছে, কখন গেছে

সকাল আর মধ্যাহ্ন আর বিকাল বুঝতে পারিনি,—এখন নাকি গভীর রাত। অর্থাৎ সম্পূর্ণ একটি দিন আমাদের চেতনা থেকে লোপ পেয়ে গেছে। আমরা সবাই মূঢ়।

সেই রাত্রে কাবুলিওয়ালার ইতিহাসের আর বৈচিত্র্য কিছু পাইনি। তবে মাঝে মাঝে সে তার মাতৃভাষায় গান গেয়ে উঠেছিল এবং আমার আধমরা পিঠখানার উপরে সে তবলার বোল সেধেছিল। সংগীত শাস্ত্রে তার ব্যুৎপত্তি কতখানি ছিল জানিনে, সুরের সাধনা কবে থেকে সে করে এসেছে তাও আমার অজ্ঞাত, তবে গান গেয়েছিল সে ভালোই—সবাইকে সে জাগিয়ে তাতিয়ে তুলেছিল; আধ-মরাদের ঘা মেরে সে বাঁচিয়েছিল, এতে সন্দেহ নেই। বিস্ময়ের কথা, উড়িয়াটা অবধি উঠে বসেছিল তা'র কণ্ঠস্বরে; অবশেষে এক মাড়োয়ারি কাঁচা ঘি আর বাসি রুটি দান করে কাবুলিওয়ালাকে তখনকার মতো শান্ত করলো। কাবুলিওয়ালা সেই কাঁচা ঘি সহযোগে বাসি রুটি চিবিয়ে এক সময় ভয় দেখালো, যদি তাকে এখনই তামাক দেওয়া না হয় তবে আবার সে প্রাণের আনন্দে গান ধ'রে দেবে। আমার ইচ্ছা হোলো, মাঝ সমুদ্রে এখনই জাহাজ থামিয়ে সাঁতরে কোনো দেশে উঠে গিয়ে তার জন্য তামাক এনে দিই। সে আমাকে যদি আবার উৎপীড়ন করতে আরম্ভ করে তাও সইবে,—কিন্তু তা'র কণ্ঠসংগীত! এবার থেকে ঈশ্বরেও বিশ্বাস করবো যদি তিনি ওর সুবুদ্ধি দেন! কিন্তু হায়, সাঁতার জানিনে, তাই চুপ করে পড়ে রইলুম।

কাবুলীটা খিঁ খিঁ ক'রে হাসতে লাগলো। তার সামনের গোটা দুই দাঁত কে যেন কবে কোন্ কারণে ভেঙে দিয়েছিল। আশ্চর্য, তার বাকি ক'টা দাঁত আজও অক্ষত রয়েছে।

তামাক তাকে কেউ দিল না, সুতরাং পুনরায় সে গান ধ'রে দিল হাসিমুখে। দিদিমা বলতেন, পথে গান পায়, হরিনাম গায়! কাবুলী তা'র মাতৃভাষায় হরিনাম গান করতে লাগলো কিনা জানিনে, কিন্তু আমি আড়ষ্ট হয়ে রইলুম, সমে এসে ওর হাতের প্রচণ্ড তেহাইটা আমার দুর্বল পিঠে পড়ে কিনা। কিন্তু পড়লো না, বোধ করি দয়ালহরি আমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছিলেন।

সমুদ্রের রোলিং থামলো, তখন ভোর হয়ে গেছে। আশ্চর্য, সবাই এবার নড়ে উঠে বসেছে। আমি উঠতে পারছিলুম না,—আমার জ্বর ছিল বেশ। তা ছাড়া প্রহারের ফলে সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট। মাথা নাড়তে পারিনে, হাত দুখানা নড়তে চায় না, জুলপির পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে শুকিয়ে গেছে, মাথার এক পাশে ঘা ফুটেছে, পিঠে ব্যথা—এখানে ওখানে কালশিরার ফুলো, মুখের ওপরে কাবুলীর পাঁচ আঙুলের চাপড়ের ফলে এখনও জ্বালা করছে। ভেবেছিলুম, পুলিসের কাছে অভিযোগ জানাবো, এই উৎপীড়নের প্রতিকার করবো। কিন্তু পুলিস! পুলিসের কথা থাক্।

আমরা কোনোদিকে দেখতে পাচ্ছিনে বটে, তবুও সকাল হয়েছে। মেঘমলিন সকাল। রোলিং আর নেই, ঝড় শান্ত, জাহাজ আর কাৎ হয়না কোনদিকে,—দুর্যোগ কেটে গেছে। সকাল হয়েছে বাইরের সমুদ্রে, আকাশে রক্তিম ঘোষণা জেগেছে, সাত ঘোড়ার রথে চড়েছেন সূর্যদেব—কিন্তু এমন সকালকে অভিনন্দন জানাবো কোথা দিয়ে? এই ক্লিষ্টক্লিন্ন অন্ধ গহ্বর থেকে আমার হৃদয় ছুটে গেল নিমতলার সেই গঙ্গাতটে। সেখানে মা চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রয়েছেন পট্টবস্ত্রে। প্রভাত সূর্যের দিকে চেয়ে বলছেন, "জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণোতোস্মি দিবাকরং, শ্রীসূর্যায় নমঃ নারায়ণায় নমস্তুতে।"—মায়ের চোখ দুটো কাঁপছে স্তববন্দনায়; নিরুদ্দেশ সন্তানের কল্যাণ কামনায় অশ্রুভারাক্রান্ত তাঁর দুই চোখ। গঙ্গার নির্মল গৈরিক প্রবাহে ভেসে চলেছে তাঁর হৃদয়ের আকুল ভাবনা—সেই অশ্রু-উচ্ছ্বসিত আশীর্বাদে জাহ্নবীতে লাগলো বেদনার জোয়ার,—তারই কাঁপন এসে লাগলো যেন এই জাহাজে।

এই জাহাজে কেন রেখে যাবো অভিমান? দুর্বলের চিত্তক্ষোভ কেন রেখে যাবো কাবুলীর প্রতি? কেন অভিশাপ দিয়ে যাবো উৎকলবাসীকে? আঘাতের কথা, প্রহারের কাহিনী একদিন ভুলে যাবো, ক্ষতচিহ্নগুলি একদিন মিলিয়ে যাবে, অপমান আর লাঞ্ছনার ইতিহাস তলিয়ে যাবে একদিন বিস্মৃতির অন্ধকারে,—এরা শুধু থেকে যাবে আমার কল্পনায়। দয়া, মনুষ্যত্ব, আদর্শ, মহত্ত্ব, আনন্দ পরার্থপরতা—এরা অবশ্যই আছে সংসারে,—আমি যদি বর্বরতা আর স্বার্থপরতা দেখে থাকি, আমি যদি দেখে থাকি দুঃখবাদ আর বেদনা, আর নৈরাশ্য, যদি শুধু জেনে থাকি মানুষের হীনচিত্তের বিকার, অন্যায়ের রাজবেশ, পাশবের শক্তিমত্তা,—সে আমার নিজেরই দেখার দোষ! এদের কোনোদিন ভুলবো না, তাইতেই ত' এদের মহৎ মূল্য স্বীকার ক'রে গেলুম! এদের অপরাধ ক্ষমা করবো না কোনোদিন, একথা জানিয়ে যাবার আগে কেন নিজেকে ছোট ক'রে যাবো? না, সে আমি পারবো না কিছুতেই।

কিন্তু আমি না পারলেও,—যে শক্তি আমাকে অন্ধের মতো অকূলে টেনে এনেছে, সেই শক্তিই ভ্রূকুটি করে দাঁড়ালো কাবুলিওয়ালার প্রতি। আমি তাকে ক্ষমা করবো, কিন্তু আমি কে? আমি কতটুকু? আমার এই অহংকার কেন? রণক্ষেত্রের রথের উপর দাঁড়িয়ে পার্থসারথী বলেছিলেন, ওরে আত্মাভিমানি, তোর শক্তি কতটুকু? তোর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, দয়া, মোহ, কৃপা, বিচারবোধ—তা'র দাম যে এক কানাকড়িও নয়! তোর ক্ষমা, তোর তিতিক্ষা, তোর ঔদাসীন্য—কিন্তু তুই কতটুকু? ওদিকে যে নিঃশব্দ বেদনায় সন্তান বিচ্ছেদাতুরা মায়ের প্রাণের মন্ত্র করুণ বেদনায় নিত্য উচ্চারিত হচ্ছে,—অরণ্যে রণে দারুণে শত্রু মধ্যেহনলে সাগরে......

আর সেই দেবভূমি ভারতের আদিম যুগের সেই মহাকালের রথচক্র ঘর্ঘরের উপরে দাঁড়িয়ে চিরসারথী ব'লে চলেছেন,—বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্—সম্ভবামি যুগে যুগে!

বিকৃতমস্তিষ্ক কাবুলীওয়ালা পাশের উঁচু পাটাতনের উপর চ'ড়ে উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরেছিল। বোধ করি সে একটু দুরন্তপনাই করে থাকবে,—সহসা লোহার সেই চাদর থাপ থেকে পিছলে উলটে গেল। একটি পলক মাত্র, তারপরই কাবুলীওয়ালা সেই গহ্বরের মধ্যে নিরুদ্দেশ। সকলে হাঁ হাঁ হৈ চৈ ক'রে উঠলো। নীচের তলায় মেয়েছেলে, শিশু, বৃদ্ধ, সবাই শুয়ে, পনেরো ফুট উপর থেকে কাবুলী যদি তাদের উপর পড়ে, তবে আর রক্ষা নেই। আমরা সবাই হন্তদন্ত হয়ে উঠলুম। দেখি, সে নীচের তলায় পড়েনি, লোহার চাদরের মোটা পাড় ধরে সে মাঝশূন্যে ঝুলছে। কিন্তু তা'র নাগাল পাবার উপায় কারো ছিল না। কাবুলীওয়ালাটা চীৎকার করছে প্রাণভয়ে।

চীৎকার ও কলরোলের খবর পেয়ে জনৈক খালাসী ছুটে এসে ঘটনাস্থলে দাঁড়ালো। সহসা লোকটাকে বাঁচাবার কোনো পন্থা খুঁজে না পেয়ে খালাসী উঠলো পাটাতনের পাড়ে, সেখানকার কার্নিশের বিপদজনক ধার ঘেঁষে গিয়ে সে এক হাতে কাবুলীকে ধরলো,—তারপর কৌশলে তাকে পাড়ের কাছে এনে হিঁচড়ে টানতে লাগলো দুই হাতে। কিন্তু লোহার পাড়ের ধার ছিল ধারালো। উত্তেজনার সময় হিঁচড়ে টানতে গিয়ে কাবুলীটার কাঁধের কাছটা গিয়ে ছিল বেধে এবং সেই অবস্থায় গায়ের জোরে টেনে তাকে যখন তোলা হোলো, আমরা সবাই ভীত আতঙ্কিত চক্ষে চেয়ে দেখলুম তার পিঠের প্রায় দেড় ফুট চামড়া ছিঁড়ে কুটে কেটে মাংস ঝুলে পড়েছে। তা'র পিঠের রক্ত ছেঁড়া জামার ভিতর থেকে বেরিয়ে আমাদের উপরতলা থেকে নীচের তলায় ঝর ঝর ক'রে গড়িয়ে পড়ছে। লোকটা শক্তিমান,—জ্ঞান হারায়নি। কিন্তু তাকে ধরাধরি করে শুইয়ে দেওয়া হলো। মেঝের উপর দিয়ে রক্তের ধারা বইছে নালার

দিকে। আমার আশ্রয় ছিল তা'র কাছাকাছি, সুতরাং তার পিঠের গলিত ছিন্নভিন্ন বীভৎস মাংসপিণ্ডের চেহারাটা আমাকেই স্পষ্ট দেখতে হোলো।

আমি? আমি বসে বসে কাঁপছি ঠক ঠক ক'রে। ভুলে গেলুম আমার নিজ দেহের যন্ত্রণা, আমার ক্ষত, আমার লাঞ্ছনা আর অপমান। ভুলে গেলুম, আমি দেশের কাছাকাছি পেঁৗছেছি, আমি প্রিয়জনদের ফিরে পাবো শীঘ্রই। ভুলে গেলুম, সমস্ত দুদিন ধ'রে লোকটা পশুর মতো আমাকে অহেতুক পীড়ন করেছে। এবারে তার নিজের অসহনীয় বীভৎস যন্ত্রণা, তার করুণ কাতরোক্তি, তার প্রলাপজড়িত আর্ত-স্বর—সেদিকে চেয়ে ঝর ঝর করে আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। এত বড় অভিশাপ তাকে আমি দিইনি, এতখানি শাস্তি তার আমি কল্পনাও করিনি!

জাহাজ এবার শান্তভাবে ভেসে চলেছে। যাত্রীরা প্রায় সবাই চেতিয়ে উঠেছে, তাদের শরীরের যন্ত্রণা আর নেই। অনেকে জিনিষপত্র বাঁধাবাঁধি আরম্ভ করেছে। অনেকে টলতে টলতে উঠে সিঁড়ি বেয়ে আপার ডেক-এ উঠে যাচ্ছে। আমি নিজেও উঠে দাঁড়ালুম ধীরে ধীরে। শরীর দুর্বল, জ্বর রয়েছে, বুকে শেলষ্মার ব্যথা, সর্বাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন, মাথায় ও রগে ক্ষত—তবু কাঁপতে কাঁপতে দেয়াল ধ'রে ধ'রে আমিও গিয়ে উঠলুম আপার ডেক-এ। আমরা গঙ্গা-সাগরের মোহানার ভিতরে এসেছি।

তীরভূমির অস্পষ্ট মলিন রেখা যখন দৃষ্টিগোচর হোলো, যাত্রীদের ভিতরে সে কী উত্তেজনা! বাঁচবার আশা কেউ করেনি, জাহাজডুবি সম্পর্কে সবাই নিশ্চিত ছিল, ঝড়ের সমুদ্র যে আবার শান্ত হবে—এ ছিল কল্পনার অতীত। এখন সেই সব মৃত্যু-পথযাত্রীরা গানে গল্পে তামাসায় আনন্দে উল্লাসে মেতে উঠলো। ঘন সবুজ তীর-ভূমির রেখা যে কত আপন, কত বড় আত্মীয়—এ যেন দেখে নিলুম। জীবনের আশা আবার জেগে উঠলো।

সবাই তীরভূমির ইসারা খুঁজে পাচ্ছে, কিন্তু আমি কি আর কূল খুঁজে পাবো? আমার কূল হারালো, ঘর হারালো, পথ হারালো। যার লক্ষ্য কিছু নেই, সেই ত' ভেসে বেড়ায় এঘাট থেকে ওঘাটে, একূল থেকে ওকূলে, তারপর অকূলে। জলের অচ্ছেদ্য আকর্ষণ কি আমাকে স্থির থাকতে দেবে? আমার দেহের শত শত শিরা উপশিরাগুলি যেন অসংখ্য নদীর মতন—তারা নিত্য প্রবাহিত; আমার হৃদয় সমুদ্রে তারা নিত্য আছাড়ি পিছাড়ি খায়,—আমার প্রাণকল্লোলের সঙ্গে জলকল্লোল মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আমাকে সেই কল্লোল কি স্থির থাকতে দেবে কোনোদিন? নৌকা কি ঘাটে ভিড়ে থাকবে শান্ত হয়ে; মরণের ডাক কি আবার তাকে ডেকে নিয়ে যাবে না?

কালিঝুলিমাখা নোংরা শরীরে এবং তার চেয়েও নোংরা জামাকাপড়ে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে কতকটা যেন নিজেকে আমি বশে আনলুম। আমার পুঁটলিটা খুঁজে পেলুম অনেক পরিশ্রমে। সেটা জলে ভিজে ভারি হয়ে উঠেছে। আমার কোটের ভিতর পকেটটা এবার অনুভব করলুম, সেখানে ষোলখানা এক টাকার নোটের গোছাটা ভিজে থক্ থক্ করছে। মনে পড়ে গেল আমি বিনা টিকিটে যাচ্ছি। কিন্তু এদিকে আর ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই, আমি এসে পড়েছি আবার আমার প্রিয় গঙ্গায়। দুই পারে মাঠ, অরণ্য, গ্রাম, আঁকবাঁকা পথ—আমার রুগ্ন চক্ষু ওদের উপর দিয়ে যেন প্রিয়জনের কোমল স্পর্শ বুলিয়ে চলেছে। অপরিচিত জনপদ, অজানা গ্রাম,—তবুও উপলব্ধি করে চলেছি ওরা আমার যেন কল্পকল্পান্তরের আত্মীয়, ওরা আমার শাশ্বতকালের আনন্দের প্রতীক্। এক জায়গায় ক্লান্ত হয়ে বসে নিমীলিত চক্ষে আমি তাদের দিকে তাকিয়ে প্রাণের প্রবাহ বুলিয়ে চলেছি।

দেখতে দেখতে রোদ উঠলো, বেলা উঁচু হোলো, গরম হয়ে উঠলো জাহাজ, যাত্রীরা চঞ্চল হোলো, মধ্যাহ্ন ঘনিয়ে এলো। আমরা বদরতলা পেরিয়ে শিবপুর আর শালিমার ছাড়িয়ে খিদিরপুরের ডক পাশে রেখে আউটরাম ঘাটের দিকে মন্থরগতিতে এগিয়ে গেলুম। আবার দেখা যাচ্ছে আমাদের কল-কাতার সব প্রিয় চিহ্ন, আবার যেন হারানো বন্ধুদের খুঁজে পেলুম। একথা ভুলিনি আমার প্রথম কর্তব্য, রবির বাড়িতে খবর দেওয়া, তার কাছে টেলিগ্রাম করে আজকেই টাকা পাঠানো; তা'র চিঠিখানা পেঁৗছে দেওয়া! কিন্তু একথা ভয়ে ভয়ে ভাবছি, ভাবছি, কেমন করে এই মুখ নিয়ে সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবো।

আউটরাম ঘাটে এসে জাহাজ ধীরে ধীরে ভিড়লো, বেলা তখন দুটো। জাহাজ থেকে যখন জেঠিতে নামলুম, তখন পা ঠিক রাখতে পাচ্ছিনে। আমি তীর খুঁজে পেয়েছি, কিন্তু আমার পা দু'খানা আর চোখ দুটো যেন এখনো এসে পেঁৗছয়নি। মনে হচ্ছে আমার পায়ের মধ্যে জলকল্লোল, চোখে জলোচ্ছ্বাস। আমার পা স্থির থাকছে না, টলছে, কাঁপছে, টাল সামলাচ্ছে। আমি যেন এখনও জাহাজে, এখনও তরঙ্গের চূড়ায়, এখনও সেই ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সাগরের অশ্রান্ত দোলায়—আমার সমগ্র জীবনটাই যেন টলমল করছে, অধীর হয়ে উঠেছে জলের নেশায়। আমার ঘর, আমার পথ, আমার জীবন-মরণ, আমার ইহকাল পরকাল সমস্তটাই যেন জলে ভেসে সাত সাগরের পথে তলিয়ে গেছে!

একজন শিখ টিকিট চেকারের হাতে পনেরোখানা ভিজা এক টাকার নোট তুলে দিয়ে পুঁটলিটি খালাসীর প্রতি আমি গঙ্গার ঘাট ধরে চলে এলুম বাবুঘাটে। সেখানে পুঁটলিটি সিঁড়ির পাশে রেখে জ্বর ও শেলষ্মা সত্ত্বেও আমি মরিয়া হয়ে গঙ্গায় নেমে ডুব দিলুম।—সে যেন আমার আছাড়ি পিছাড়ি ডুব। ইচ্ছে হোলো, জাহ্নবীর এই ধারায় নিজেকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ছড়িয়ে দিই। আমার যা কিছু সব ধুয়ে মুছে যাক। ব্যাধি, গ্লানি, লাঞ্ছনা, অপমান কিছু আর না থাকে। ওরে ভাগ্যান্বেষী, তোর লোভ, তোর উচ্চাভিলাষ, তোর লাখ টাকার স্বপ্ন, তোর মনুষ্যত্ববর্জিত যত কিছু ইহলৌকিক বাসনা,—এই গোমুখীনিঃস্রাবিত প্রবাহে সমস্ত ভেসে চলে যাক্। তুই অনেক দেখেছিস, অনেক পেয়েছিস, অনেক জেনেছিস,—এবার আবার নতুন বিশ্ব-সৃষ্টির মন্ত্র এই জাহ্নবীর জলকল্লোল থেকে তুলে নিয়ে যা।

বাবুঘাটে সেদিন জনৈক উৎকলবাসী আমাকে দু'খানি বাতাসা, একটু আদা, আর কয়েকটি ছোলা খেতে দিয়েছিল। তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ছয়দিন উপবাসের পর সেই আমার প্রথম খাদ্য।

বিজ্ঞানের খুচরা খবর

খাদ্যের ঘ্রাণ পরিমাপের নূতন উপায়

কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিকরা খাদ্যের, বিশেষত মৎস্যের ঘ্রাণ পরিমাপের এক নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। এই উপায়ে নাকে শুঁকার চেয়ে বেশী নিখুঁতভাবে খাদ্যের ঘ্রাণ নির্ণয় করা যায়। প্রথমে মাছ টিনে ভরার কারখানায় ব্যবহারের জন্য ইহা তৈয়ার হয়। ভাল-মন্দ দুই রকম গন্ধই ইহাতে টের পাওয়া যায়।

এক বৎসর পর্যন্ত জ্বলমান আলোকস্তম্ভ

ওহিওর অন্তর্গত ডেটনের নিকটে রাইট ফিল্ডের গবেষণাগারে রাত্রিতে বিমান চলাচলের সময় দিগনির্ণয়ের জন্য একটি আলোক-বর্তিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার জ্বালানি ১৩টি আধারে সঞ্চিত থাকে এবং গ্যাসের আলোক যাহাতে নিভিয়া না যায়, তাহার ব্যবস্থা আছে। এই দীপ-স্তম্ভ একটানা এক বৎসর প্রজ্বলিত থাকিবে, এই সময়ের মধ্যে কোন জ্বালানির দরকার হইবে না। —মার্কিনবার্তা

আরব জগতে ইসলামের নূতন রূপ

রেজাউল করীম এম এ, বি এল

(২)

কায়রো হইতে জেরুজালেম মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। কিন্তু এই দুই নগরের মনোভাবের তুলনা করিলে মনে হইবে যে, উভয়ের মধ্যে যেন কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান রহিয়াছে। কায়রোতে যেমন নূতনভাবে, নূতন আদর্শে ও নূতনরূপে একটা নব্য ইসলাম গড়িয়া উঠিতেছে, জেরুজালেমে এখনও তাহা সম্ভব হয় নাই। রক্ষণশীল ইসলামই এখানে প্রবল। য়িহুদী, খৃষ্টান ও ইসলাম - এই তিন ধর্মের তীর্থস্থান এই নগর। এই তিন ধর্মের মধ্যে অতীতে ত বটেই, বর্তমান যুগেও বহু সংগ্রাম এবং সঙ্ঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। এই তিন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে অহরহ প্রতিযোগিতা লাগিয়াই আছে। সেইজন্য এখানে রক্ষণশীল মনোভাব খুব প্রবল। ধর্মের উদার ব্যাখ্যা করিলে ঝগড়ার কারণ কমিয়া আসে। যাহারা ঝগড়াকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়, তাহারা কিছুতেই এই উদার ব্যাখ্যা সহ্য করিবে না এবং পরন্ত পক্ষে বাধা দিবে। তবে আশার কথা এই যে, সর্বত্র একটু একটু করিয়া নবযুগের হাওয়া বহিতেছে। আজ সমগ্র প্যালেস্টাইন পরাধীন। এই পরাধীনতা স্থানীয় অধিবাসিগণের সাধারণ বিপদ। এক্ষণে পরাধীনতাকেই সর্বপ্রধান পাপ বলিয়া লোকে মনে করিতেছে। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অনেকের মনে জাগিয়াছে। নব্য যুবক সম্প্রদায় স্বাধীনতার উন্মাদনায় অস্থির হইয়াছে। তাহারা ঘোষণা করিতেছে যে, অবরোধ ও বোরকার সহিত ইসলাম ধর্মের কোন সংস্রব নাই। তাহারা মনে করে যে, সমাজের অর্ধাংশকে অবরোধের মধ্যে রাখিলে ইসলামেরই অকল্যাণ হইবে। জেরুজালেমে এতদিন ধরিয়া ধর্ম ও সংস্কৃতি অবিচ্ছেদ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু এখন একটু একটু করিয়া অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে। এক দল নব্যযুবক আজ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহারা রক্ষণশীলতা ও নব্যাদর্শ এই দুই দলের মধ্যে ভাবসামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবার পক্ষপাতী। এই ধরণের প্রচেষ্টা দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনে রীতিমত বাধা দিতেছে। কারণ ইহারা প্রাচীন সংস্কারকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইহার আধুনিক ব্যাখ্যা করিয়া এ গুলির স্থায়িত্বকে সুনিশ্চিত করিয়া তুলিতেছে। ফলে যেখানে আমূলে সংস্কারের প্রয়োজন সেখানে কোনরূপ সংস্কারই সম্ভব হইতেছে না। মুসলমান সমাজকে সম্পূর্ণভাবে নাড়া দিবার জন্য ইহারা কোনরূপ সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করিতে পারিতেছে না। অনেকে ব্যক্তিগত মত হিসাবে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, পর্দা ও ইসলাম এক বস্তু নহে। কিন্তু এই মনোভাবকে কার্যে রূপ দিতে তাহারা এখনও প্রস্তুত হয় নাই। প্যালেস্টাইন তুরস্ক অপেক্ষা মিশরের আদর্শই অধিক পছন্দ করে। এখানে ব্রিটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে লোকের দৃষ্টি জাতীয়তার উপর নিবদ্ধ। এই জাতীয়তা ধীরে ধীরে নানাভাবে সমাজের প্রত্যেক স্তরে বিপুল পরিবর্তন আনয়ন করিতেছে। জাতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন একটা বিশেষ দিন পালন করিবার ব্যাপারে দেখা যায় যে, অবরোধের অন্তরাল হইতে ললনাগণও দলে দলে বাহিরে আসিয়া প্রকাশ্য পথে এই দিনে অংশ গ্রহণ করেন। আজকাল (অবশ্য বর্তমান যুদ্ধের পূর্বে) এদেশের বহু নারী বিদেশে গিয়া উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন। এদেশেও নূতন যুগের হাওয়া লাগিয়াছে। রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে একটা চাপা আন্দোলন জাগিয়া উঠিতেছে। ট্রান্সজর্ডন প্রদেশের রক্ষণশীলতা এখনও প্রবল হইয়াই আছে। তাহার কারণ এখানে নব্য ধরণের শিক্ষা সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন সর্বত্র অনুভূত হইতেছে। কিন্তু এখনও প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে আদর্শগত বাদানুবাদ আরম্ভ হয় নাই। ধর্ম সংক্রান্ত আচারবিচার এখনও আলোচনার বিষয়ীভূত হয় নাই। মক্কা ও মদিনা নগরীতে ইবনে সৌদের প্রভাববশতঃ মানুষের স্বাধীনতার জন্য যে অভিযান আরম্ভ হইয়াছে, এখানে সে ধরণের কিছুই হয় নাই। মক্কা-মদিনা অপেক্ষা এখানে মানুষের অধিকতর স্বাধীনতা আছে। ধূমপান, শ্মশ্রুমুণ্ডন, পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রচুর স্বাধীনতা আছে। নারীদের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু কোথাও কোথাও নারীরা অবরোধ উন্মোচন করিয়া স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতেছে, এরূপ উদাহরণ বিরল নয়। উচ্চতর সমালোচনা ও নব্যভাব এখনও ইসলামের মধ্যযুগীয় রূপকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। তবে তাহার সূত্রপাত হইয়াছে।

সিরিয়া প্রদেশে নূতন যুগের আলো কিছু কিছু প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের মনোভাব এখনও মধ্যযুগীয়। এখানে মুসলিম চিন্তাধারার মধ্যে একটা উভয় সঙ্কটের ভাব লক্ষিত হয়। এদেশ সামাজিক সংস্কারের দিক হইতে এখনও মধ্যযুগের স্তর পার হয় নাই, তবে সিরিয়াতে নানা বিষয়ে সামাজিক বিবর্তনের নিদর্শন দেখা যাইতেছে। হয়ত যুগের প্রভাবে এরূপ সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু একথাও সত্য যে কতকগুলি বিপ্লবী তরুণ যুবক এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী। দেশে চিন্তাশীল লোকের অভাব নাই। নূতন আদর্শের সমর্থক শ্রেণীর লোকের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু তবুও জনসাধারণের মধ্যে রক্ষণশীল মনোভাব বেশ প্রবল। তাহারা কার্যক্ষেত্রে প্রাচীন আদর্শ মানিয়া চলে না। কিন্তু নীতিগতভাবে প্রাচীন আদর্শের সমর্থক। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক প্রভাব এ দেশের সংস্কৃতির বহু ক্ষতি সাধন করিতেছে। এই বৈদেশিক প্রভাবই এখানে সামাজিক সংস্কার প্রবর্তনের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশেও যেমন সযত্নে রক্ষণশীলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, এখানেও সেইরূপ দেওয়া হইয়া থাকে। বিদেশী শক্তির প্রভাববশত সিরিয়া তাহার রক্ষণশীলতাকে দূর করিতে পারিতেছে না। দামেস্ক নগর তাহার প্রাচীন স্মৃতি ও কীর্তির জন্য গর্ব অনুভব করে। এই গর্বই তাহার কাল হইয়াছে। প্রাচীন কীর্তির এই গর্ব ও গৌরবের অহংকারে দামেস্ক নগর রক্ষণশীল মনোভাবকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। ইহা যেন কতকটা তাহার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। তবে এই রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আলেপ্পো রক্ষণশীলতাকে ধীরে ধীরে বর্জন করিতেছে। ধর্ম অপেক্ষা অর্থনীতিই এখানকার জীবনের মর্মকেন্দ্র। তুরস্কের সামাজিক সংস্কারের কাঠামো আলেপ্পোতে বেশি পরিমাণে অবলম্বিত হইয়াছে। এই নূতন জীবনাদর্শ তাহার ধর্মীয় দিকটাকে বেশ প্রভাবিত করিয়াছে। মোটামুটি ভাবে দেখিলে মনে হইবে যে, দু'একটি নগর ব্যতীত সমগ্র সিরিয়া প্রদেশে ইসলামকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিবার ও বিচার করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়াছে। সেইজন্য কুসংস্কারপূর্ণ মধ্যযুগকে তাহারা আর আদর্শ বলিয়া মানে না। এখানকার কতিপয় পণ্ডিত কোরানের আইনকে বর্তমান যুগোপযোগী করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। যাহাতে এ যুগের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারে, সেই ভাবে তাঁহারা বহু সংস্কারের আভাস দিয়াছেন। বহু শিক্ষিত লোক এই ধারণা পোষণ করেন যে, মুসলমানের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতি চালচলন ইত্যাদি ইসলামের বিষয় নহে। সুতরাং প্রয়োজনবোধে এ সবের পরিবর্তন করিলে তাহাতে ইসলামের অবমাননা করা হয় না। সিরিয়াতে আধুনিক মতে উদারপন্থীর সংখ্যা যথেষ্ট আছে। তাঁহারা এ কথা নির্ভীকে ঘোষণা করেন যে, মধ্যযুগীয় ইসলাম ও

উন্নতির মধ্যে একটা রীতিমত সংগ্রাম চলিতেছে। একজন নব্যসিরিয়ানের নিম্নের উক্তি হইতে বুঝা যাইবে, সেখানে নব্যভাব কত গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়াছেঃ—

"As people become educated they grow more open-minded, leave their beliefs and accept the truth".

অন্য একজন নব্য যুবকের উক্তিঃ—

"No educated person can have religious conviction. He may keep religion as a cultural legacy, but not as a conscious belief".

এই দলের লোক যুগের প্রয়োজনের সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য ইসলামকে নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন না। তাঁহারা মধ্য যুগীয় ইসলামের আদর্শকে একেবারেই বাদ দিতে চান।

অন্যান্য দেশ অপেক্ষা মিশরই সিরিয়ার উপর বেশি প্রভাব বিস্তার করিতেছে। অবশ্য কতিপয় নব্যভাবাপন্ন যুবক তুরস্কের সামাজিক ও ধর্মীয় বিপ্লবকেই অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করে। কিন্তু সমগ্রভাবে মিশরের আদর্শই সেখানে অনুকৃত হয়। কেবল বেরুত ও লেবাননে পাশ্চাত্য আদর্শ অধিক মাত্রায় প্রবেশ করিয়াছে। এই পাশ্চাত্য আদর্শ তথাকার ধর্মচিন্তার মধ্যে বিপ্লব আনিয়াছে। সিরিয়াতে যতদিন রাজনৈতিক সমস্যা সমস্ত দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে থাকিবে, ততদিন খৃষ্টান ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় দেশের সমস্ত বিষয়কে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিচার করিবে। তথাকার সমস্ত সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যার আলোতে রঞ্জিত। সিরিয়াতে জাতীয়তার অর্থ হইতেছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা। ধর্ম অপেক্ষা স্বাধীনতাই সেখানে মানুষের মনকে শাসন করে, সেই জন্য ধর্ম সেখানে প্রধান সমস্যাই নহে।

মধ্য যুগের হারুন-অর-রসিদের বাগদাদ, আর আজিকার বাগদাদের মধ্যে কত পার্থক্য! এই বাগদাদ এককালে ছিল ইসলামের শিল্পকলার প্রধান কেন্দ্র! আজ সেখানে শিল্পকলা প্রধান আকর্ষণ নহে। আজ বাগদাদ উগ্র জাতীয়তার লীলাভূমি। মধ্য যুগীয় ধর্মাদর্শের প্রতি এখানে খুব কম আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। গোঁড়া ও রক্ষণশীল ইসলাম এখানে একেবারেই নাই তাহা বলা চলে না। তবে নব্যাদর্শ এখানে খুব প্রবল। "ইরাকীদের জন্য ইরাক" এই মনোভাব এখানে সকলের মনে জাগিয়াছে। ভাবপ্রবণতা অপেক্ষা কর্ম ও বাস্তবতার দিকেই ইরাকবাসীর ঝোঁক বেশি। বিগত প্রথম মহাসমরের পর হইতে এখানে রাজনীতি হইতে ধর্মকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। মিশরের মত পার্থিব কার্যের সৌকর্যার্থ এখানকার রাজা এখনও ধর্মকে ধরিয়া রাখিতে চান। কিন্তু নব্য যুবকগণের চিন্তা বিপরীতমুখী। তাহাদের কেহ কেহ অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিয়া থাকে যে, "ধর্মটা সামাজিক উন্নতির পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা নরনারীর স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ করিয়াছে। বর্তমানে কফিখানা ব্যতীত আমোদ উপভোগ করিবার আর কোন স্থান নাই।" যেসব যুবক পাশ্চাত্য জগৎ হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করে তাহারা অকুতোভয়ে মধ্য যুগীয় মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেছে। ধর্ম ও প্রগতির মধ্যে একটা সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। নব্য যুবকগণ দ্রুত উন্নতির জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাই তাহারা তাড়াতাড়ি একটা মীমাংসা করিতে চায়। বাগদাদে জাতীয়তার দাবী যে কত উগ্র এবং তাহার মধ্য যুগীয় ধর্মাদর্শের যে কত বিরোধী, তাহা নিম্নের উক্তি হইতে বুঝা যাইবে। বাগদাদের একজন নব্যভাবাপন্ন শিক্ষক সমাজের মধ্য যুগীয় মনোবৃত্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেনঃ—

"Islam is a retrogressive force, not only blocking progress but opposing nationalism; since it still emphasizes too much of the old idea of Pan-Islamism, on impossible idea to-day."

(অর্থাৎ ইসলাম আজ পশ্চাদপসরণকারী-শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। ইহা কেবল উন্নতিতে বাধা দেয় না, ইহা জাতীয়তার পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। প্রাচীন প্যানইসলামিজমের উপর অত্যধিক জোর দেয়। এই প্যানইসলামিজম আজকার যুগে একটা অসম্ভব আদর্শ)। আর একজন ইরাকী ছাত্র বলিয়াছেনঃ—

'It seems hopeless to try to do anything with Islam—the only solution is to cut loose."

(অর্থাৎ বর্তমানে ইসলামকে লইয়া কোন কাজই করা চলে না। একমাত্র পন্থা হইতেছে বন্ধন কাটিয়া দেওয়া।) কায়রোতে যেমন ইসলামের সহিত বর্তমান যুগের একটা সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা হইতেছে, এখানকার মানসিকতা সেরূপ নহে। এখানকার যুবকগণ মধ্য যুগের সম্বন্ধকে কাটিয়া দিতে চাহে। ইসলাম অপেক্ষা নব্য যুগের প্রয়োজনের ভিত্তিতে তাহারা দেশ ও সমাজকে গঠিত করিতে চায়।

ইরাকবাসীর জীবনধারাকে যে শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহা মধ্য যুগীয় ইসলাম নহে। তাহা নবযুগের উন্নতি ও অগ্রগতির আদর্শ। আজ এখানে সর্বত্র আধুনিকতা প্রাচীন রক্ষণশীল মনোভাবকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিতেছে। ইরাকে দেখা যাইতেছে যে, জাতীয় উন্নতিমূলক কার্যে যেন ইসলামের প্রয়োজন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। ইসলাম কোথাও রহিত হয় নাই। কিন্তু সর্বত্র যেন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেছে। তুরস্কের জাতীয় আদর্শ ইরাকে খুব আগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছে। যদি তরুণ আন্দোলনকে প্রতিক্রিয়াশীল দল বাধা না দিতে পারে, তবে ইরাক নব্য আদর্শকে পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিবে। তুরস্কের সংস্কারমূলক কার্যাদি দ্রুত প্রসারিত হইতেছে যেন হৃত সুযোগকে পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য দেশময় একটা আকুল আবেদনের সাড়া পাওয়া গিয়াছে।

একটি মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র কি ভাবে ইসলামের মধ্যযুগীয় আদর্শ ও কঠোর শিক্ষাকে বর্জন করিয়া পরিপূর্ণ ভাবে বর্তমান সভ্যতাকে গ্রহণ করিয়াও মূলত মুসলিম রাষ্ট্রই থাকিয়া যায় বর্তমান তুরস্ক তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইরাকের একজন কেম্ব্রিজ গ্রাজুয়েট তুরস্কের আদর্শকে প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। ইনি নব্য দলের নেতা। তাঁহার মত এই যে, মধ্য যুগীয় ইসলাম যেসব বাধা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বর্জনপূর্বক সত্যিকার ইসলামের কাঠামোর উপর দাঁড়াইয়া অগ্রসর হওয়াই একমাত্র পথ। আরবী সংবাদপত্রের মারফৎ মিশরের সংবাদ ইরাকে খুব বেশি বিস্তৃত হয় না। কিন্তু তুরস্কের সংবাদ সেখানে আগ্রহের সহিত প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়া থাকে। একটা বিশাল মরুভূমির মধ্যে অবস্থান করিলেও ইরাক আগ্রহের সহিত তুরস্কের দিকে চাহিয়া আছে। ইস্তাম্বুল ও আনকারার সহিত যেন তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। ইরাকের যে সকল যুবক বিদেশ হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে, তাহারা দেশের সমস্ত আবহাওয়াকে উদারভাবাপন্ন করিয়া তুলিতেছে। ইরাকের সর্বত্র একটা নবজাগরণের সাড়া অনুভূত হইতেছে। ইরাণের কথা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা সম্ভব হইল না। কিন্তু সেখানেও ইসলামের প্রাচীন ব্যাখ্যা আর চলে না। নূতন ইসলামকে পাইবার ও বুঝিবার আগ্রহ সেখানে দিন দিন প্রবল হইতেছে। বর্তমান মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে আরব জগতের সংবাদ এদেশে বেশি আসে না। সেইজন্য সেখানকার গত তিন চারি বৎসরের মনোভাবের কোন পরিচয় দেওয়া হইল না। আজ সমগ্র ইসলাম জগতে একটা নূতন যুগের হাওয়া বহিয়া যাইতেছে। পুরাতন জীবনাদর্শই যে পরিবর্তিত হইতেছে তাহা নহে। ইসলামের রূপও বহুলাংশে বদলাইয়া গিয়াছে। আজ আরব জগৎ বুঝিয়াছে যে, মধ্য যুগের আদর্শ এ যুগের কোন জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। পুরাতনকে ভাঙ্গিতে গিয়া হয়ত অনেক প্রয়োজনীয় আদর্শ নষ্ট করা হইতেছে। কিন্তু নূতনের নেশা কাটিয়া গেলে সব ঠিক হইয়া যাইবে। ভাঙ্গিবার সময় অত বুঝিয়া সুঝিয়া চলা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

শিক্ষা সংস্কার, শিক্ষক ও সমাজ

শ্রীঅনাথনাথ বসু

আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দিনে দিনে এত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এখনই যে এদের আমূল সংস্কার দরকার, এ বিষয়ে কি শিক্ষক, কি অভিভাবক, কি কর্তৃপক্ষ, কি দেশের জনসাধারণ, কারও মনে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু শিক্ষা-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা সকলে একমত হলেও সংস্কারের কাজ কিছুতেই অগ্রসর হচ্ছে না। একদিকে বিরোধ বেধেছে শিক্ষার ক্ষেত্রে কে কর্তৃত্ব করবে, তাই নিয়ে। আর একদিকে বলা হচ্ছে যে, এই যুদ্ধের মধ্যে আর নয়, যুদ্ধ শেষ হলেই শিক্ষা-সংস্কার শুরু করা যাবে। তার জন্য পরিকল্পনও করা হয়েছে, এমনকি, তার খরচের হিসাব পর্যন্ত করা হয়ে গিয়েছে। ভারত সরকারের এই পরিকল্পনা জনসাধারণের মধ্যে সার্জেণ্ট পরিকল্পনা নামে পরিচিত। সে পরিকল্পনা কিন্তু এখনকার জন্য নয় যুদ্ধোত্তর কালের জন্য, যুদ্ধ শেষ হলেই তবে সেটাকে কার্যে পরিণত করার চেষ্টা হবে। এখন আমাদের যুদ্ধশেষের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে কারা কর্তৃত্ব করবে, তার উপরে শিক্ষার প্রকৃতি কিছু পরিমাণ নির্ভর করবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপার নিয়ে বাঙলা দেশে যে আন্দোলন চলেছে, তার প্রয়োজনীয়তা আমি অস্বীকার করি না; কিন্তু কর্তৃত্বই শিক্ষার সবটা নয়; আমাদের শিক্ষা-সংস্কারের সমস্ত উৎসাহ যদি কর্তা-নির্বাচনের আন্দোলনেই পর্যবসিত হয়, তাহলে সেটা যে অন্যায়ই হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর সার্জেণ্ট পরিকল্পনারও আমি একজন অনুরাগী। কিন্তু আমার দুঃখ এই যে, যদি সত্যই আমরা বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে এই স্থির করে থাকি যে, এটা কিছুই নয়, এর দ্বারা দেশের ক্ষতি বই লাভ হচ্ছে না, তাহলে কেন আমরা যুদ্ধোত্তর কালের জন্য অপেক্ষা না করে এখনই আজই সংস্কার শুরু করে দিই না? যদি একথা ঠিক হয়ে থাকে যে, বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার কাঠামোটা আগাগোড়া বদলে দিতে হবে, তাহলে কেন এখনই সে কাজ আরম্ভ করে দিই না, কেন তার জন্য যুদ্ধোত্তরকালের সুদিনের আশায় বসে থাকি? যখন দেহে অস্ত্রোপচার করা ঠিক হয়ে যায়, তখন সেটা ফেলে রাখা বুদ্ধিমানের পরিচয় তো নয়ই, বরং তার ফলে রোগের প্রসার অধিকতর হয়ে দুঃখ গভীরতর এবং সংস্কার কঠিনতর হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের এদেশে আজ না হয় যুদ্ধের দোহাই দিয়ে শিক্ষা-সংস্কারের প্রস্তাব ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু ইংলণ্ডে তো সেরকম হয় না। ইংলণ্ডে বর্তমান শতাব্দীতে শিক্ষা-সংস্কারের যে বড় বড় চেষ্টা হয়েছে, সেগুলির সবই যুদ্ধের মধ্যেই হয়েছে। ১৯০২ সালে বুয়োর যুদ্ধের মধ্যে বলফুর আইন হয়; সেই আইনে ইংলণ্ডে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার ১৯১৮ সালে যখন ইউরোপে মহাযুদ্ধ চলেছে, তারই মধ্যে ফিশার আইন হয়; সে আইনে জাতীয় শিক্ষার সংজ্ঞা ব্যাপকতর ও তার ভূমি প্রশস্ততর করা হয়। আর এখনও এক বৎসর হয়নি, এই সেদিন যখন শত্রু দ্বারে এসে হানা দিচ্ছে, যখন ইংলণ্ড জীবনমৃত্যু সংগ্রামে ব্যস্ত, তারই মধ্যে বাটলার আইন করা হয়েছে। শুধু আইন করাই হয়নি, অবিলম্বে যাতে সেটা প্রয়োগ করা হয়, তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। অর্থাৎ ইংলণ্ড শিক্ষা-সংস্কারের জন্য যুদ্ধ শেষ হবার অপেক্ষায় বসে থাকে নি; এরই মধ্যে সংস্কার শুরু করে দিয়েছে।

আজ যখন আমরা নিঃসন্দেহে শিক্ষা-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েছি, তখন সংস্কার-চেষ্টা আরম্ভ করার পক্ষে এর চেয়ে প্রশস্ততর ও অনুকূলতর কাল বা সময় আর কি হতে পারে? অর্থাভাব? একথা কি ঠিক যে, অর্থই শিক্ষা-সংস্কারের সবচেয়ে বড় কথা; আমাদের শিক্ষা-সংস্কারের অনেকখানি নির্ভর করবে অর্থের উপরে। কিন্তু একথাও সত্য যে, শিক্ষা-সংস্কারের কয়েকটা কাজ আছে, যেগুলি আরম্ভ করতে অর্থের দরকার হয় না। উদাহরণস্বরূপ পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যসূচীর সংস্কার, পরীক্ষা-সংস্কার ইত্যাদির কথা বলা যেতে পারে।

আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে যে পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শিক্ষাদান করা হয়, সে পাঠ্যসূচীতে বহু ত্রুটি আছে, একথা আমরা সকলেই জানি ও বলে থাকি। বর্তমান পাঠ্যসূচী যে কালোপযোগী নয়, এটা যে অত্যন্ত পুঁথিঘেঁষা, এর ফলে ছেলেমেয়েরা বাস্তব জীবনে কর্মঠ হয়ে ওঠে না, তারা সব অবাস্তব ভাববিলাসী ও থিয়োরেটিক্যাল হয়, এ বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। সুতরাং আমরা কি এই যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে আমাদের পাঠ্যসূচীকে অধিকতর পরিমাণে ব্যবহারিক বা প্র্যাকটিক্যাল করে তুলতে পারতাম না? ছেলেমেয়েদের পুঁথির বোঝা কমিয়ে দিয়ে তাদের শিক্ষা সহজতর করে দিতে পারতাম না? যুদ্ধের জন্য কাগজ দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে, বইপত্র পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ বিদ্যালয়ে ছাত্রদের পুঁথির বোঝা তো একটুও কমল না। এটা কেন হল? এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ করি। আমার জনৈক ছাত্র-বন্ধুকে, তিনি কোন ইস্কুলের অধ্যক্ষ, আমি অনুরোধ জানিয়েছিলাম, তিনি যেন তাঁর বিদ্যালয়ের নিম্নতর শ্রেণীগুলিতে ছাত্রদের স্বাস্থ্য, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক নির্দেশ না করে দেন। তার ফলে একদিকে যেমন অভিভাবকদের বই কিনে দেবার খরচ কমবে, অন্যদিকে তেমনি ছাত্রদেরও বইয়ের বোঝা কম বইতে হবে। এই শ্রেণীগুলিতে তো মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়াই বিধি।

কিন্তু তাঁর চেষ্টা সত্ত্বেও তা হল না। শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র সকলের তরফ থেকেই আপত্তি উঠল বই নইলে পড়া হবে কেমন করে? পুঁথির উপরে আমাদের এমনই অগাধ বিশ্বাস!

একথা বলা চলবে না যে, বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটিগুলি এড়িয়ে নতুন ধরণের শিক্ষার পত্তন করবার কোন প্রস্তাব আমাদের সম্মুখে ছিল না। যুদ্ধের অনেক আগে থেকেই গান্ধীজীকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার কথা আমরা শুনে এসেছি। এই নিয়ে অনেক বাদবিতণ্ডা পর্যন্ত হয়ে গেছে। অন্যদিকে তার যত ত্রুটিই থাকুক না কেন (যদিচ আমার মতে এই পরিকল্পনায় মারাত্মক কোন ত্রুটি নাই), এ বিষয়ে সমালোচকবর্গ একমত যে, কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষা দিলে পুঁথির অত্যাচার অনেকখানি কমে এবং ছেলেমেয়েরাও সে শিক্ষার ফলে অনেকখানি বেশী পরিমাণে প্র্যাকটিক্যাল হয়ে ওঠে। সম্প্রতি পরীক্ষা করে প্রমাণ হয়েছে যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছেলেদের মধ্যে সহযোগিতা, ব্যবহারিক বুদ্ধি ইত্যাদি এমন কতকগুলি গুণ দেখা যায়, যেগুলি সাধারণ বিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠ্যসূচীর চাপে সেখানকার ছেলেমেয়েদের মনে বিকাশ লাভ করতে পায় না। অতএব রাজনীতির দিক দিয়ে বাধা যতই বড় হোক

না কেন, শিক্ষাতত্ত্বের হিসাবে বনিয়াদী পাঠ্যসূচীর ও শিক্ষাপ্রণালীর যথেষ্ট দাম আছে। সুতরাং এইভাবের শিক্ষাপ্রণালী নিয়ে পরীক্ষা করা আমাদের পক্ষে একান্ত দরকার। আমি সকলকে বনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যসূচী ভাল করে পড়ে দেখবার জন্য অনুরোধ করছি। তার থেকে আমরা অনেক নূতন ইঙ্গিত পাব। আমাদের পাঠ্যসূচীর হেরফের করে এইগুলি কাজে লাগান যেতে পারবে, এই আমার বিশ্বাস। একটা কথা, হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারটা তো নূতন নয়; গান্ধীজী সেটা আবিষ্কার করেন নি। তিনি অবশ্য পুরোপুরি বৃত্তি-মূলক হাতের কাজকে কেন্দ্র করার কথাটা নূতন বলেছেন। কিন্তু বৃত্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ-ভাবে যোগ নাই, এমন হাতের কাজকে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার বিধি অনেক দিনের পুরানো। সুতরাং যদি-বা কোনো কারণে গান্ধীজী-পরিকল্পিত বনিয়াদী শিক্ষাপ্রণালী আমাদের গ্রহণযোগ্য না-ও হয়, আমরা তো অনায়াসেই হাতে-কলমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে পারি; তার পক্ষে কোন বাধা তো নাই। অথচ এখনও পর্যন্ত সেদিকে বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

এর কারণ খুব তলিয়ে অনুসন্ধান করা দরকার। আমার মনে হয়, এর আদত কারণ হচ্ছে জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব। শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে আমরা মুখে মুখে যাই কিছু বলি না কেন, মনে মনে আমরা এখনও শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবী —সমাজদেহের এই রকম ভাগে পাকা বিশ্বাস করি। আমরা মনে করি, সমাজে এই ভাগ চিরদিন আছে ও থাকবে এবং সংখ্যা-গরিষ্ঠ একদল চিরদিনই খেটেখুটে আমাদের প্রয়োজন যোগাবে, আর আমরা বুদ্ধি-জীবীর দল তাদের চালনা করে নিয়ে যাব। ধনতান্ত্রিক এই মনোভাব আজকার এই গণতন্ত্রের যুগে আর চলবে না, একথা কি আরও স্পষ্ট করে বলা দরকার? যতদিন না আমরা সমাজে এই অন্যায় ভেদ দূর করতে পারব, যতদিন না আমরা শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীর ব্যবধান কম করত পারব, ততদিন আমাদের সমাজের স্থায়ী কল্যাণ হবে না। বিদ্যালয়জগতেও আমাদের তাই হাতের কাজের শিক্ষা ও পুঁথির শিক্ষার ভেদ ঘোচাতে হবে। তার জন্য সকলের আগে চাই আমাদের মনোভাবের আমূল পরিবর্তন। সে পরিবর্তন যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ পাঠ্য সূচীর প্রকৃত সংস্কার সম্ভব নয়।

মনে বড় আশা করেছিলাম যে, যুদ্ধের তাড়নায় আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থারও কিছু সংস্কার হবে। এই সংস্কার যে কত দরকার হয়ে উঠেছে শিক্ষকসমাজে তা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন নাই। পরীক্ষার প্রাধান্য না দূর করতে পারলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কোন সংস্কার সম্ভব হবে না, একথা আমরা সকলেই বলে থাকি। অথচ আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে কাগজ দুর্মূল্য হওয়া সত্ত্বেও আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটল না। একটা কাজ তো আমরা সহজেই করতে পারতাম, নীচের পাঁচ ছয় শ্রেণীতে তো অনায়াসেই লিখিত পরীক্ষার চাপ কমানো যেতে পারত। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি মুখে মুখে শেখান যেতে পারত, তাদের পরীক্ষাও মুখে মুখে করা যেত। কিন্তু পুঁথির মত লিখিত পরীক্ষার উপরও আমাদের বিশ্বাস অসীম। অথচ এদিকে পৃথিবীর আর সর্বত্র বর্তমান পরীক্ষা প্রণালীর অনুপযোগিতা পরীক্ষা ও গবেষণা দ্বারা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে নূতন ধরণের পরীক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হচ্ছে। সে ব্যবস্থায় বাৎসরিক একটা পরীক্ষার ফলাফলের চেয়ে শিক্ষকের রিপোর্টকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে।

আমাদের দেশে কিন্তু তা হবার উপায় নাই। যাঁরা কর্তৃপক্ষ তাঁরা অমনি বলবেন সে রকম রিপোর্ট ঠিক হবে না, তার মধ্যে ভুল থাকার সম্ভাবনা। মানুষের বিচার-মাত্রেই ভুল থাকার সম্ভাবনা এটা অস্বীকার করার উপায় নাই; কিন্তু তাই বলে যখন দেখা গেছে, পরীক্ষকভেদে একই খাতায় ১০ থেকে ৯০ পর্যন্ত নম্বর দেওয়া হয়েছে, যখন নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখি নম্বর দেওয়ার স্থিরনিশ্চিত মাপকাঠি নেই, তখন তিন ঘণ্টার একটা পরীক্ষার উপর বেশি জোর দেব, না যে-শিক্ষক সারা বৎসর ধরে ছাত্রকে দেখে এসেছেন তাঁর বিচারের উপর বেশি জোর দেব? শিক্ষকের বিচারকে না মানার মধ্যে এমন একটা ইঙ্গিত আছে যেটা শিক্ষকসমাজের পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের অনেকেই এই ধরণের ইঙ্গিত করতে পশ্চাৎপদ হন না।

এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার স্থান সম্বন্ধে সম্প্রতি যে রিপোর্ট বের হয়েছে সেটা সকলকে পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। নরউর্ড কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে যতদিন না সেকেণ্ডারী স্কুল এক্জামিনেশন একেবারে তুলে দেওয়া যায় ততদিন এর পরিচালনার ভার প্রধানত শিক্ষকদের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। এর মধ্যে দেশের শিক্ষকদের প্রতি যে গভীর বিশ্বাসের পরিচয় আছে সেটা লক্ষ্য করা দরকার।

আমার বার বার মনে হয়েছে যে, আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতার অন্যতম কারণ এই ব্যবস্থায় আমাদের শিক্ষকদের যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয়নি। আমাদের শিক্ষকদের আমরা শ্রদ্ধাও করি না, বিশ্বাসও করি না। কথাটা রূঢ় শোনাবে, কিন্তু তাহলেও না বলে উপায় নাই। আমাদের দেশে শিক্ষকেরা শিশুদের ভক্তির পাত্র, আর বাকি সকলের কৃপার পাত্র। তাঁদের আমরা অনুগ্রহের চোখে দেখি, কিন্তু তাঁদের বিশ্বাসও করি না, শ্রদ্ধাও করি না। শিক্ষকেরা পাঠ্য নির্বাচনে কর্তৃত্ব করতে পারবেন না, বিদ্যালয় পরিচালনায় তাঁদের সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হবে না, এমন কি পরীক্ষার ব্যাপারে ছাত্রদের যোগ্যতা নির্বাচনের বিষয়েও তাঁদের মতামত শ্রদ্ধেয় হবে না, এ বিচিত্র মনোভাব এই দেশেই দেখা যায়, অন্য দেশে নয়। প্রতিপক্ষ বলবেন, বিশ্বাস যে করব তার যোগ্যতা কোথায়, আমাদের শিক্ষকদের সে শিক্ষা কই? এর একটা উত্তর এই যে যদি আমাদের দেশের শিক্ষকেরা অযোগ্যই হবেন তবে কেমন করে আমরা তাঁদের হাতে আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের শিক্ষার ভার ছেড়ে দিয়েছি? শিক্ষকদের এই অপমান ঘুরে আমাদেরই উপরে এসে পড়ে সেটা বুঝবার শক্তি আমাদের নাই? বলতে পারেন শিক্ষক নির্বাচন আমরা খুব ভাল ভাবে করব; কিন্তু একবার যাঁদের শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাঁদের অপমান করার তাঁদের উপযুক্ত মর্যাদা না দেওয়ার অধিকার আর আপনাদের নাই। সমাজের যাঁরা নেতা তাঁদের একথা আজ স্পষ্ট করে শুনিয়ে দেবার দরকার আছে বলে আমি মনে করি। শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা দিতে হবে, তাঁদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করতে হবে, এইটাই হল বড় কথা।

জানি প্রত্যেক শিক্ষকই যে তাঁর পদের মর্যাদা রক্ষা করেন তা নয়; প্রত্যেকেই যে তাঁর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে যোগ্যতা থাকা দরকার তার দাবী করতে পারেন তাও নয়। কিন্তু আমি শিক্ষকসমাজ হিসাবে এই কথা বলছি। আমাদের পদের উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করতে হবে একথা সত্য, কিন্তু সমাজকেও যাতে আমরা সহজে সেই যোগ্যতা অর্জন করতে পারি তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে; নতুবা সমাজের দিক থেকে যে ত্রুটি ঘটবে তার জন্য সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার সমূহ ক্ষতি হবে। আমার এই অভিযোগ যে এদেশের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষকদের উপযুক্ত মর্যাদাও দেয়নি এবং যোগ্যতা অর্জনের পথও সুগম করে দেয়নি। সুতরাং যদি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পদে পদে ব্যর্থ হয়ে থাকে তাতে বিস্মিত হবার কারণ নাই।

আমাদের শিক্ষকদের আর্থিক দুর্গতির কথা আলোচনা করতে আমার আত্মসম্মানে বাধে। আর একথা এত সুপরিচিত যে এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নাই। এককালে অর্থ দিয়ে

মর্যাদার বিচার করা হত না; কিন্তু সেকাল অনেকদিন চলে গেছে। এখন আর প্রাচীন যুগের নজির দিলে সেটাকে মিথ্যা স্তোক বাক্য ছাড়া অন্য কিছু বলা চলে না। যে সমাজব্যবস্থায় একটা দিনমজুরেও শিক্ষকের চেয়ে বেশি উপার্জন করে সেখানে প্রাচীন আদর্শের দোহাই দেওয়া অন্যায় অপমান। সেটা আমরা আর সহ্য করতে প্রস্তুত নই। আমাদের শিক্ষকদের আর সবারই মত ভাল ভাবে বাঁচবার অধিকার আছে; হয়তো একদিক দিয়ে দেখলে আমাদের দাবী অন্যের চেয়ে বেশি, কারণ আমাদের উপর আছে জাতিগঠনের ভার। বর্তমান সমাজ সে দাবী উপেক্ষা করেছে। এর ফল তাকে ভোগ করতেই হবে। এর অন্যথা হবে না।

অর্থনীতির একটা মামুলি সূত্র হল ইনভেস্টমেণ্ট অর্থাৎ লগ্নীর অনুপাতে রিটার্ন অর্থাৎ প্রতিদানের মাত্রা বাড়ে কমে। শুধু তাই নয় খরচের একটা ন্যূনতম মাত্রা আছে যার কম খরচ করলে কোন ফলই পাওয়া যায় না। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই নীতি সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। অনুরাগ ও আদর্শবাদের স্থান এখানে অনেকখানি থাকলেও শিক্ষা ব্যাপারে আমরা যেমন খরচ করব তেমনই ফল পাব। একথা আমাদের দেশের লোককে আজ স্পষ্ট করে শুনিয়ে দেওয়া দরকার। আমরা দরিদ্র, আমাদের অভাব খুব বেশি, কিন্তু তাহলেও যদি আমরা ভাল শিক্ষা-ব্যবস্থা চাই তবে আমাদের ভালমত খরচ করতে হবে। তখন না আদর্শবাদ, না দারিদ্র্যের দোহাই দিলে চলবে। এমন কি দারিদ্র্যের অজুহাতে অন্তত যতটুকু খরচ না করলে কোন ফলই পাওয়া যায় না, আমরা যদি তার চেয়ে কম খরচ করি, তাহলে কোন প্রতিদানই পাব না। আমাদের ধারণা আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় অর্থনীতির এই সূত্রের প্রমাণ আমরা প্রতিদিন হাতে হাতে পাচ্ছি।

উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ চাই, নইলে দেশ ও সমাজের প্রয়োজনের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হবে না। সে অর্থ কোথা হতে আসবে সে চিন্তা আমার নয়, যাঁরা এদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতির কর্ণধার তাঁরা সে চিন্তা করুন; তাঁরা তার উপায় নির্ধারণ করুন। আমরা শিক্ষক-সমাজ শুধু তাঁদের কাছে আমাদের দাবী জানিয়ে রাখি। তাঁরা আমাদের কাছে যে দাবী করছেন সে দাবী তাঁরাই মেটাতে পারেন যদি তাঁরা আমাদের প্রয়োজনমত অর্থের অভাব ঘোচাতে পারেন। সে অভাব না ঘোচালে আমাদের দাবী পূর্ণ হবে না, তাঁদেরও দাবীও মিটবে না। আমি মনে করি যে-সরকার দেশে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছেন এমন জাতীয় সরকারই শুধু সে দাবী মেটাতে পারে। একথাও ঠিক যে জাতীয় সরকার না হলে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এই সত্য যেন আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারি।

পেখু-ভেক

অ·কৃ·ব

এই পর্যন্ত শুনিয়া যাঁহারা পরম রোম্যাণ্টিক কিছু আশা করিতেছেন, অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাঁহাদিগকে জানাইতেছি, রমাকান্তর চেহারা ভাল ছিল, কিন্তু মনে রোম্যান্স ছিল না। ভাবিয়াছিলাম, তাহাকে নায়ক করিয়া একটি উপন্যাস লিখিব, কিন্তু দেখিলাম, চেহারা ছাড়া আর কিছুই তাহার নায়কোচিত নহে।

তাহার নামটাও ছিল একটু বেয়াড়া রকমের। শুধু রমা নামে ডাকিলে যে ভুলটা আপনারা গোড়াতেই করিয়াছিলেন, সে ভুলটাই অনেকে করিবে। ভুলের সম্ভাবনার গোড়া মারিয়া রাখিতে হইলে পুরাপুরি রমাকান্ত বলিয়াই ডাকিতে হয়, অথচ রমা নামটা যেরূপ উচ্চারণে সহজ ও শ্রুতিমধুর, রমাকান্ত নামটা সেরূপ নহে। রমাকান্ত অপেক্ষা রমানাথ উচ্চারণের সুবিধার দিক দিয়া ভাল, কিন্তু পিতৃদত্ত নাম বদলাইতে রমাকান্ত রাজী ছিল না। ফলে আমরা তাহাকে রমা বলিয়াই ডাকিতাম এবং সে নামে ডাকিতে শুনিয়া আপনাদের মত ভুল অনেকেই করিত।

* * *

বুঝিতেছি, ইহার পর রমা-প্রসঙ্গে আপনারা আর আনন্দ পাইবেন না। সুতরাং প্রসঙ্গ পরিবর্তন প্রয়োজন।

সেদিন বন্ধু ধনপতির সহিত ধনপতি-বন্ধু অমরেশের ওখানে গিয়াছিলাম ভোরের দিকে। অমরেশ ফুটবল খেলিতে গিয়া পা মচকাইয়া বাড়িতে বিশ্রাম করিতেছিল। ধনপতি অমরেশের মচকানো পায়ের দিকে তাকাইয়া সহানুভূতির আহা, উহু করিল না। কহিল, "খেলতে গিয়ে এরকম একটু আধটু পা মচকানো ভালো। এ রকম অ্যাডভেঞ্চার না থাকলে আবার খেলা কি?"

অমরেশের মা আসিয়া কহিলেন, "কি মুস্কিল হলো দেখ দেখি! কলেজের টাইম্ হয়ে গেছে অথচ বাস এখনো আসছে না। নগেন তো কান্নাকাটি লাগিয়েছে, আজ পয়লা ঘণ্টায় কোন্ প্রফেসার নাকি ভালো ভালো নোট্ দেবে। অমরেশও পা মচকে পড়ে রইলো, এখন নগেনকে কলেজে এগিয়ে দিয়ে আসে কে?"

শুনিয়া কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিলাম। কলেজের বাসে চড়িয়া যে কলেজে যায় এবং কলেজের বাস কোনো কারণে কামাই দিলে যাহাকে কলেজে আগাইয়া দিতে যাইতে হয়, সে কেমনতরো নগেন?

আপনারাও হয় তো ভাবিতেছেন: "তাই তো! এ আবার কেমনতরো নগেন?" তাহা হইলে খুলিয়াই বলি। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে মেয়েটি। অসম্ভব ভীরু এবং লাজুক, নাম নগেন্দ্রনন্দিনী, সংক্ষেপে ডাকা হয় নগেন।

* * *

স্বীকার না করিলেও আপনারা বুঝিতেন বলিয়াই স্বীকার করিতেছি উক্ত কাহিনীটি সম্পূর্ণ আমার বানানো। কিন্তু বানানো হইলেও অসম্ভব নয়। কোনো কোনো জলজ্যান্ত মহিলাকে জানি যাঁহাদের নাম ছিল (এবং আছে) নগেন্দ্রনন্দিনী, নগেন্দ্রবালা, সুরেন্দ্রবিনোদিনী ইত্যাদি। সুরেন্দ্রবিনোদিনী নাম্নী কোনো মহিলাকে সংক্ষেপে সুরেন বলিয়া ডাকিলে কি ব্যাপার দাঁড়াইতে পারে একবার ভাবিয়া দেখুন। পাছে এরূপ বুঝিবার ভুল হয় এই ভয়েই কচি-সংসদের সভ্য লালিমা পাল তাঁহার নামের শেষে ব্রাকেটে একটি 'পুং' যোগ করিয়া দিতেন। কিন্তু মুস্কিল হয় নাম ধরিয়া ডাকিবার সময়। সে সময় তো আর পুং বা স্ত্রীং যোগ করিয়া ডাকা যায় না!

* * * * *

এবারে যে কাহিনীটি বলিব তাহা বিশ্বাস করা একটু কঠিন হইলেও, বিশ্বাস করুন, ঘটনাটি সত্য, শুধু পদবীটা ইচ্ছা করিয়াই

রমা আমাদের পাশের ফ্ল্যাটেই থাকিত। প্রথম যেদিন তাহাকে দেখিলাম, অবাক হইয়া গেলাম। ভাল চেহারা অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু অত চমৎকার চেহারা আগে কখনো দেখি নাই। তারপর যতবারই তাহাকে দেখিতে লাগিলাম, ততই তাহাকে আরো বেশী করিয়া ভাল লাগিতে লাগিল। আমি সহজে কাহারও সহিত আলাপ করি না, কিন্তু রমার সহিত আলাপ না করিয়া থাকা সহজ হইবে না বুঝিয়া একরকম গায়ে পড়িয়াই আলাপ জমাইলাম।

* * *

দোতলায় রাস্তার মুখামুখি যে ঝুলানো বারান্দাটা ছিল, তাহার দুটী সমান অংশের একটি আমাদের, অন্যটি ওপাশের ফ্ল্যাটের: দুই অংশের মাঝখানে কাঠের পার্টিশন। একদিন বিকালবেলা আমি সেই কাঠের গায়ে হেলান দিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া রাস্তার সজীব শোভা নিরীক্ষণ করিতেছি এমন সময় পার্টিশনের ওপাশে আসিয়া দাঁড়াইল রমা। আলাপের আগ্রহ আমার বরাবরই ছিল, তাছাড়া এত কাছাকাছি হইয়াও আলাপ না করাটা নিতান্ত অশোভন হইবে বলিয়া মনে হইল।

আলাপটা সুরু হইয়াছিল কি ভাবে বলি।

কহিলাম—"কি বিশ্রী গরম পড়েছে দেখেছেন?" এখন হইলে অন্য রকম প্রশ্ন করিতাম, কিন্তু তখন—আমি পনেরো বছর আগের কথা বলিতেছি—এর চেয়ে ভাল প্রশ্ন কিছু মাথায় আসে নাই।

রমা হাসিয়া কহিল, "এখানে আর কি গরম টের পান আপনারা? গরম টের পেতে হয় তো চলে যান লাহোরে।"

বাধ্য হইয়াই প্রশ্ন করিতে হইল, "আপনি লাহোরে ছিলেন বুঝি?"

"ছেলেবেলা থেকে। বাঙলাদেশে এসেছি তো এই হালে।"

এইভাবে আলাপ সুরু হইয়াছিল। তারপর কিভাবে ভাব জমিল, কিভাবে আপনি তুমিতে পরিণত হইল, তাহা সবিস্তারে বলা নিষ্প্রয়োজন।

* * * *

বদলাইয়া দিয়াছে। কোনো একটি বৃদ্ধ ভূতপূর্ব শিক্ষকের সংসার খরচ চালাইবার জন্য আরেকবার শিক্ষক হইবার প্রয়োজন হইল। তিনি খবর পাইলেন মাতঙ্গিনী বালিকা বিদ্যালয়ে (এই নামটি আমার বানানো, উদ্দেশ্য আসল নামটি গোপন রাখা) একজন শিক্ষক প্রয়োজন এবং শিক্ষক নিয়োগ ব্যাপারে যাঁহার মতামত চূড়ান্ত, তিনি পীতাম্বর পাতিতুণ্ডু লেনের (এই ঠিকানাটিও বানানো) সন্তোষজীবন রায় চৌধুরী। বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঐ ঠিকানায় উপস্থিত হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া কাতরকণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন "সন্তোষবাবু বাড়ি আছেন?" কয়েকবার ডাকার ফলে দরজা খুলিল এবং জনৈকা সহাস্যবদনা ভদ্রমহিলাকে দাঁড়ানো দেখা গেল খোলা দরজার ধারে।

বৃদ্ধ পুরু চশমার কাচের মধ্য দিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া কহিলেন "আজ্ঞে, আমি সন্তোষবাবুর সঙ্গে একটু দেখা করবো বলে অনেক-দূর থেকে আসছি। উনি আছেন কি?" ভদ্রমহিলা হাসিয়া কহিলেন, "আপনি ভেতরে আসুন। আমিই সন্তোষজীবন রায় চৌধুরী।" বৃদ্ধ আগন্তুক প্রথমটা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, পরে বিশ্বাস করিয়া বাড়ির ভিতরে গেলেন এবং বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী মিস্ সন্তোষজীবন রায় চৌধুরীর কাছে তাঁহার মৌখিক আর্জি পেশ করিলেন। তারপর কি হইল, সে আলোচনা বর্তমান ক্ষেত্রে অবান্তর।

* * *

নাম হইতেই নামের মালিকের স্বরূপ খানিকটা আন্দাজ পাওয়া গেলে অনেক ভুল এবং মনোব্যথার হাত হইতে রেহাই পাওয়া যায়। কিন্তু নাম যাহারা রাখেন তাঁহারা সাধারণত অতশত হিসাব করিয়া নাম রাখেন না। নামতত্ত্ব নিয়া মাথা ঘামান না, নাম একটা রাখিতে হয় বলিয়াই রাখেন।

ফলে কানা ছেলের নাম অনেক সময় রাখা হয় পদ্মলোচন বা কমলাক্ষ। রূপহীনার নামও রাখা হয় তিলোত্তমা। শৃগালের ডাক শুনিয়া যাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হয় তাহার নাম রাখা হয় বীরেন্দ্র, সমরেন্দ্র ইত্যাদি। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা যায় নামের সঙ্গে চেহারা বা চরিত্রের মিল রাখা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দরকার বা সম্ভব মনে হয় না।

* * * *

এবারে কল্পনা করুন হবুচন্দ্র রাজার দেশে গবুচন্দ্র মন্ত্রী আইন করিয়া দিলেন নামের সঙ্গে চেহারার অথবা চরিত্রের মিল থাকা চাই; যাহার তাহা থাকিবে না সে নাবালক হইলে তাহার অভিভাবকের এবং সে সাবালক হইলে তাহার নিজের গর্দান যাইবে। এরূপ আইন পাশ হইলে কি ব্যাপার হইবে তাহার খানিকটা মাত্র আভাস দিতেছি। যাহার নাম সাধু সে যতদিন নাবালক থাকিবে ততদিন তাহার অভিভাবকগণ সর্বদাই তটস্থ থাকিবেন পাছে কোনো ফাঁকে ছোকরা কোনো অসাধু কাজ করিয়া ফেলিয়া তাঁহাদের গর্দানহানির ব্যবস্থা করে। সাবালক হইলে সাধু নিজেই সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকিবে পাছে কোন অসাধু কাজ করিয়া বা অসাধু কথা বলিয়া ফেলিয়া তাহার গর্দান যায়।......যাহার নাম বিনয়, সে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে অবিনয়ের পরিচয় দিলেই ব্যাস্, অমনি একজনের গর্দানচ্যুতির ব্যবস্থা হইয়া গেল।......যাহার নাম সুকেশ, কোন ব্যায়রামে তাহার কেশপতন ঘটিয়া মস্তক কেশশূন্য হইলে সঙ্গে সঙ্গে রাজা হবুচন্দ্রের দপ্তরে গিয়া নাম বদলাইয়া ফেলিয়া কেশহীন মস্তকের উপযোগী নাম রেজিস্ট্রি করিতে হইবে। যাহার নাম আছে ভীমচন্দ্র, সে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া অস্থিচর্মসার হইয়া পড়িলে গর্দান বাঁচাইবার গরজেই তাহার নাম বদলাইয়া 'দুর্বলচন্দ্র' গোছের কিছু রাখিতে হইবে।

* * * *

নামের মন্দ ভালোতে অনেক কিছু যায় আসে বলিয়াই নামকরণটা একটা মস্ত বড় আর্ট। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয় নামকরণশিল্পী ছিলেন বলিয়াই নামকরণের গুরু প্রয়োজন হইলেই সম্ভব হইলে লোকে তাঁহার শরণ নিত।

আমার মনে হয় চাঁদিনী এবং অমাবস্যা রাত যদি পরস্পর নাম বদল করিত তাহা হইলে চাঁদিনীরাতের মাধুর্য কিছু কমিত এবং অমাবস্যা রাত আগেকার তুলনায় কিছুটা মধুর হইত। পাঁচু খানসামার গলি নাম বদলাইয়া ইডেন রো হইলে তাহা একটু অন্তত প্রিয়তর হইবে বই কি! যে মেয়ের প্রতি রূপ ও বর্ণের ব্যাপারে ভগবান অত্যন্ত নির্মম হইয়াছেন তাহার নামকরণের সময় পিতামাতা বুদ্ধিমান হইলে তাহার অনেক উপকার করিতে পারেন। ইহার বিপরীতটাও প্রায় সমানই সম্ভব। এক ভদ্রলোককে জানি যিনি সৌন্দর্যের প্রতি অসাধারণ ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও নামের প্রেমে পড়িয়া যাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন অন্তর ছাড়া তাঁহার অন্য কোথাও সৌন্দর্য ছিল না। ইহার বিপরীত উদাহরণ এখনও বাস্তবজীবনে পাই নাই, সুতরাং কল্পনা করিয়া নিতেছি। জনৈক গল্পের নায়ক রূপবতী নায়িকার প্রেমে পড়িলেন। দিনে দিনে চন্দ্রের কলার মত প্রেম বাড়িতে লাগিল। অবশেষে এক চাঁদিনী রাতে (প্রেমের কাহিনীতে রাতকে চাঁদিনী হইতেই হইবে) তিনি প্রথম জানিলেন নায়িকার নাম মোক্ষদাবালা! নাম শুনিয়া আপনারা মর্মাহত হইয়াছেন বুঝিতেছি। আপনাদেরই যখন এই অবস্থা তখন নায়কের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল বুঝিতেই পারেন।

* * * *

শেষ পর্যন্ত সাহিত্যেই আসা যাক। (রচনা-মাত্রকেই আমি সাহিত্য বলিতেছি, কেন না তাহা না হইলে সাহিত্যের এলাকা হইতে আমি বেচারা বাহিরে পড়িয়া যাইতে পারি)। সাহিত্য জগতে নামের গুণে অনেক অবহেলা পাওয়ার উপযোগী রচনা আদর পায় এবং নামের দোষে অনেক আদর পাইবার উপযুক্ত রচনা অবহেলা পায়। এই কারণেই আমি ঠিক করিয়াছি আমার প্রত্যেকটি রচনায় ভাবিয়া চিন্তিয়া খুব ভাল নাম দিব।

বিজ্ঞানের কথা

ঠাণ্ডা আলো

অমরজ্যোতি সেন

মা**মরা** যত রকমের আলো জ্বালাই সবেরই কিছু না কিছু উত্তাপ আছে তা সে বিজলী বাতি, মোমবাতি অথবা ণ্ঠন কিংবা প্রদীপের আলো যাই হোকনা কন। কিন্তু এমন আলো আছে যার কানোই উত্তাপ নেই, যেমন জোনাকির মালো, চাঁদের আলো, অন্ধকার রাত্রে সমুদ্রে ঢউএর দীপ্তি অথবা কতকগুলি রসায়নের মালো, যেমন ফস্ফরাস্ অথবা ক্যালসিয়াম লফাইড। এই সমস্ত আলোকে উত্তাপহীন থবা ঠাণ্ডা আলো বলা যেতে পারে।

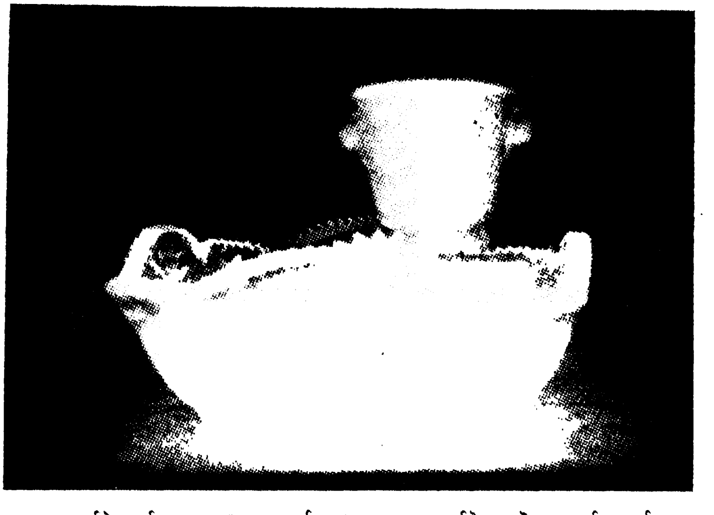
জোনাকি পোকার আলো অনেকদিন থেকেই মানুষের কৌতূহল জাগিয়ে সেছে এমন কি প্রায় দুশো বছর আগে তেরশ শতকে বিখ্যাত রাসায়নিক রবার্ট য়েল ঠাণ্ডা আলো সম্বন্ধে গবেষণা করে- ছলেন। তিনি একটি কাঁচের আধারে য়েকটি জোনাকি পোকা ছেড়ে দিয়ে ও ম্পের সাহায্যে আধারটি থেকে ক্রমশঃ বায়ু ষ্কাশিত করে লক্ষ্য করেন যে, যেমন ধারটি থেকে ক্রমশ বায়ু কমে আসে, নাকির আলোও ক্রমশঃ কমে আসে ং আধারটি সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য হলে নাকির আলোও একেবারে নিভে যায়। আজকাল পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, নাকির দীপ্যমান অংশে দুই প্রকারের রন আছে, যাদের কোনও একজন মার্কিন াপক নাম দিয়েছেন "লুসিফেরিন" এবং সিফিরেজ"। এদের রাসায়নিক প্রকৃতি কটা প্রোটিন জাতীয়, তবে দুটির মধ্যে নোটিতেই ফস্ফরাস্ নেই। লুসিফেরিন লো উৎপাদন করে এবং লুসিফিরেজ র সহায়ক, তবে অক্সিজেন এবং জলীয় পের উপস্থিতি চাই। বিনা অক্সিজেনে লো জ্বলে না।

সম্পূর্ণ শুষ্ক অবস্থায় জোনাকির দীপ্য- অংশটি জোনাকির দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন বহুদিন অবিকৃত রাখা যায় এবং পরে ক্সিজেন এবং জলীয় বাষ্পের সাহায্যে র দীপ্তি ফিরিয়ে আনা যায়।

জোনাকির এই দীপ্যমান অংশটির গঠন জটিল। এই ক্ষুদ্র অঙ্গটি জোনাকির পেটের নিম্নাংশে অবস্থিত। দীপ্য- কোষগুলির ঠিক উপরে একসার টকের প্রতিফলক আছে, যার সাহায্যে লা নীচের দিকে প্রতিফলিত হয়, ফলে লার জ্যোতি কিছু বাড়ে। দীপ্যমান ষসমূহের মধ্যেই থাকে লুসিফেরিন এবং লুসিফিরেজ আর এই কোষ সমষ্টিতেই বিক্ষিপ্ত আছে কতকগুলি সূক্ষ্ম বায়ু-কোষের জাল। যেই জোনাকির আলো জ্বলে' ওঠে অমনি এই বায়ু কোষের জালের ভেতর অক্সিজেন প্রবেশ করে এবং লুসি-ফেরিনের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ফলে আলো জ্বলে' ওঠে। এই প্রতিক্রিয়ার ফলেই আলো একবার জ্বলে একবার নেভে। যদি কোনও জোনাকির আলো স্থির থাকে তাহলে বুঝতে হবে, তার অক্সিজেন গ্রহণ ও ত্যাগ করবার যন্ত্রটি বিকল হয়েছে এবং সে ক্রমাগত অক্সিজেন গ্রহণ করে' চলেছে।

দীপ্যমান অংশ ডিমের মধ্যে বিকশিত হতে আরম্ভ করে এবং তখন থেকেই অন্ধকারে ডিমগুলিকে ক্ষীণ আলো দিতে দেখা যায়। প্রজাপতির মতো জোনাকিরও গুটি অবস্থা আছে এবং এই সময়েও জোনাকির গুটি-পোকা আলো দেয় তবে সে আলো স্থির, ঝিক্‌মিক্ করে না।

পৃথিবীর নানাদেশে নানারকম জোনাকি আছে। দক্ষিণ আমেরিকার কোনো স্থানে একরকম জোনাকি আছে যেগুলির সামনে জ্বলে সাদা আলো আর পিছনে লাল, যেন বাইসাইকেল। দক্ষিণ আমেরিকাতেই আর একরকম জোনাকি আছে, সেগুলির আলো



কাচের পাত্রটিতে রক্ষিত তেজস্কর রাসায়নিক দ্রবণ দূরের পাত্রটিকেও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে ('কেম-গ্লো' আলোকে তোলা ফটো চিত্র)

এখন প্রশ্ন, এই আলো জোনাকির কি কাজে লাগে। অন্য কি কাজে লাগে জানা না গেলেও এইটুকু জানা গেছে যে এই আলোর সাহায্যে স্ত্রী ও পুরুষ জোনাকি পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। স্ত্রী ও পুরুষ এবং শ্রেণীবিশেষে জোনাকির আলোর পার্থক্য আছে। কারও আলো হলদে মতো, কারও আলো নীল, কারও আলো অনেকক্ষণ ধরে' জ্বলে আবার কারও খুব ঘন ঘন ঝিক্‌মিক্ করে। একজন গবেষক স্ত্রী-জোনাকির আলোর অনুকরণে একটি ক্ষুদ্র ইলেকট্রিক টর্চের সাহায্যে অনেক পুরুষ জোনাকি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

জোনাকিরা বসন্তের শেষে অথবা গ্রীষ্মের গোড়ায় ডিম পাড়ে। প্রায় বাইশ দিন পরে

এত উজ্জ্বল যে স্থানীয় অধিবাসীরা বোতলের ভেতর জোনাকিগুলিকে ভরে' ঘর আলোকিত করে। নিউজিল্যাণ্ডের গুহায় একপ্রকারের সহস্র সহস্র জোনাকির সন্ধান পাওয়া যায় তারা গুহার গায়ে লেগে থাকে এবং তাদের আলো এত উজ্জ্বল যে গুহার ভেতর চলা ফেরা করতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। সুমাত্রা দ্বীপের জোনাকির আলোও খুব উজ্জ্বল। আমাদের দেশেও যখন "পুকুর ধারে লেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে" তখন তার সৌন্দর্য কেবল অনুভব করবার জন্য, কাউকে বোঝাবার জন্য নয়।

জোনাকি ছাড়া আরও কোনো প্রকার কীট-পতঙ্গ অথবা কোনো কোনো মাছ আলো

বিচ্ছুরিত করে। এক প্রকারের ব্যাকটিরিয়া পাওয়া যায় যেগুলো সমুদ্রের ধারে পচনোন্মুখ মাছ, বৃক্ষলতাদি অথবা অপর কোনো জীব দেহে জন্মায় এবং আলো দেয়। একবার এক মাংসওয়ালার দোকানে তার কাটা মাংসের উপর এই জাতীয় ব্যাকটিরিয়া কোনোক্রমে জন্মানর ফলে রাত্রে আলো বিকিরণ করত, যার ফলে নাকি সমস্ত ব্যাপারটা ভৌতিক প্রতিপন্ন হওয়ায় বেচারীর ব্যবসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই জাতীয় ব্যাকটিরিয়া কৃত্রিম উপায়ে জন্মান যায় এবং দুই দিন বয়স হলেই আলো দিতে থাকে। এই সমস্ত ব্যাকটিরিয়ার উপর তাপ, বিদ্যুৎ প্রবাহ অথবা কোনো অ্যাসিড প্রয়োগ করলে আলো দেয় না কিন্তু ক্ষার প্রয়োগে ভাল আলো দেয়। যদি কোনো উপায়ে এইপ্রকার ব্যাকটিরিয়ার একটি ঘন দলা পাকানো যায় তার আলো এত উজ্জ্বল হয় যে কয়েক ফিট দূরে ছাপার অক্ষর পড়া যায়। আমরা ভাবছি যে, আমাদের দেহের স্থান বিশেষে এই রকম কিছু কিছু ব্যাকটিরিয়ার চাষ করলে ব্ল্যাক-আউটের রাত্রে ঠোকাঠুকির হাত থেকে বাঁচা যায়। মানুষের গায়ের ঘাম অথবা প্রস্রাব থেকে কখনও কখনও আলোক বিচ্ছুরিত হয় বলে শোনা যায়; খুব সম্ভব এই জাতীয় ব্যাকটিরিয়া মানুষের শরীরে কোনো উপায়ে প্রবেশ করে। কোনো কোনো প্রকার সূক্ষ্ম ছত্রাক আলো বিকিরণ করে, দেখা গেছে।

নক্‌টিলুকা বলে একপ্রকার, এককোষী জীব সমুদ্রের জলের উপরের স্তরে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়; এগুলি আলোক বিচ্ছুরিত করে। সমুদ্রের উপর দিয়ে যখন নৌকো যায় তখন এই জীবগুলি আলোড়িত হয়, ফলে নৌকা চলে যাবার সময় আলোর রেখা রেখে যায় যা আবার কিছুক্ষণ পরে মিলিয়ে যায়। সমুদ্রের জোয়ারের সময় ঢেউ-এর সঙ্গে সঙ্গে এই জীবগুলি সময়ে সময়ে ভেসে আসে কিন্তু জোয়ারের জল সরে গেলে জীবগুলি ভিজে বালির উপর থেকে যায়। এই বালির উপর দিয়ে হাঁটলে ক্ষুদ্র পোকাগুলি নাড়া চাড়া পায়, যার ফলে বালির উপর জ্বলন্ত পদচিহ্ন থেকে যায়। গভীর সমুদ্রে কতকগুলি মাছ আছে যাদের দেহের কোনো না কোনো অংশ থেকে আলো বেরোয়। কতকগুলি মাছের গায়ে লম্বালম্বি আলোর সরু সরু ডোরা দেখা যায়, অন্ধকারে মনে হয় যেন একটি ছোট্ট ট্রেণ তার সমস্ত গাড়ীর আলো জ্বেলে অন্ধকারের বুক চিরে ছুটে চলেছে। আর এক রকমের মাছ আছে যাদের মাথার উপর একটি ছোট দণ্ড থাকে, দণ্ডের ডগায় থাকে একটি আলোর ডুম। এই আলো দেখে যখন ছোট ছোট মাছ আকৃষ্ট হয়ে তার কাছে আসে তখন সে সেই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ছোটমাছগুলিকে খেয়ে ফেলে। এছাড়া আরও নানা প্রকার ছোট বড় সামুদ্রিক এবং অসামুদ্রিক মাছ অথবা জীব আছে যারা কমবেশি আলো বিচ্ছুরিত করে। সাইপ্রিডিনা নামক কাঁকড়া জাতীয় এক-প্রকার প্রাণী আছে যারা চমৎকার নীল রং-এর আলো দেয়। অন্ধকার রাত্রে নির্জন মাঠের মাঝখানে খ্যাঁকশিয়ালের মুখের আলোয় অনেকেই ভয় পেয়েছে।

এতক্ষণ ত' গেল প্রকৃতির দানের কথা। কিন্তু মানুষও চুপ করে বসে নেই। সে চায় প্রকৃতিকে নকল করতে। সে চায় প্রকৃতির দানকে কাজে লাগাতে যেমন সে আজ বিদ্যুতকে কাজে লাগাচ্ছে। প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মানুষ ল্যাবরেটরীতে ঠান্ডা আলো প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছে। পথ দেখালেন ১৮৭৭ সালে Radziszewski "লোফিন" নামক জটিল রসায়ন আবিষ্কার করে এবং লোফিনকে অম্লজানজারিত (oxidize) করে সুন্দর পীত আলো উৎপাদন করে। লোফিনকে ভিত্তি করে আরও কয়েক প্রকার কৃত্রিম (?) আলো উৎপাদিত হয়েছে। ক্ষারের দ্রবণে পাইরোগ্যালল, ফর্মালিন এবং হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড সংযোগে এক প্রকার আলো উৎপন্ন করা যায়, যার রং পাকা কমলালেবুর খোসার রং-এর মতো। দীপ্যমান রং (luminous paint) যা ঘড়িতে সাধারণত ব্যবহার করা যায় তার নাম ক্যালসিয়াম সালফাইড। ব্রোমিন ও অ্যাসিটেলিন এই দুই প্রকার রসায়নের প্রতিক্রিয়ার ফলে, সবুজ রং-এর আলো নির্গত হয় যাকে বলা হয় ঠান্ডা শিখা।

আজ পর্যন্ত পরীক্ষার ফলে সবচেয়ে উজ্জ্বল ঠান্ডা আলো যা আবিষ্কৃত হয়েছে তার ডাক নাম দেওয়া হয়েছে "লুমিনল" ("লুমিন্যাল" নামক বিখ্যাত ঔষধ নয়) কারণ আসল নামটি খুবই খটোমটো 3-aminophthal-hydrazide. অ্যালব্রেখট নামক একজন জার্মান রাসায়নিক ১৯২৯ সালে লুমিনল আবিষ্কার করেছেন। লুমিনলকে অম্লজানজারিত করলে উজ্জ্বল নীল আলো পাওয়া যায়। লুমিনল মার্কিন মুলুককে খুব সাড়া জাগিয়েছে। একজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক লুমিনলের একরকম গুঁড়ো তৈরি করেছেন যার সঙ্গে শুধু প্রয়োজন মতো জল মেশালেই আলো পাওয়া যায়। তিনি এই গুঁড়োর নাম দিয়েছেন 'কেম-গ্লো' (Chemglo)। কেম-গ্লোর আলোয় তোলা একখানি ফটোগ্রাফ এই সঙ্গে দেওয়া হ'ল।

আজকাল নানাপ্রকার চিনি যেমন আখ, আঙুর, ফল অথবা দুধের চিনি, শ্বেতসার, টার্টারিক, ল্যাকটিক, ম্যালিক এবং সাইট্রিক অ্যাসিড নিয়ে-নানাভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে। এদের ঠিকমতো উত্তাপ প্রয়োগে অথবা ঠিকমতো উত্তাপে দ্রবীভূত করলে ও তারপর অম্লজানজারিত করলে আলো উৎপাদিত হয়, তবে সবই এখন পরীক্ষাধীন। এদের মধ্যে আশাপ্রদ হল সাইট্রিক অ্যাসিড; এর থেকে বেশ জোর আলো পাওয়া যায়।

এই সমস্ত আলো হল কোনো না কোনো প্রকার রাসায়নিক, বিশেষত জৈব রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফল। আমরা এক প্রকার ঠান্ডা আলো দেখতে পাই, যখন কেবলমাত্র বিশেষ আকারের নির্মিত কাচের নলের ভিতর বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চার করা হয় তবে এই কাচের নলগুলির ভিতর বিভিন্ন প্রকারের গ্যাস ভর্তি করা থাকে এবং এক এক প্রকার গ্যাসের জন্য এক এক রকম রং হয়। বিজ্ঞানের ব্যবহৃত আমরা যে "নিয়ন লাইট" দেখি তাহাতে কাঁচের নলে ভর্তি 'নিয়ন' নামক গ্যাস যার রং অনেকটা লাল ও নেবু রংএর মাঝামাঝি। এ ছাড়া রেডিয়াম এবং কোনো কোনো মণিমাণিক্য থেকে আলো নির্গত হয়। আমরা প্রাকৃতিক যে সমস্ত আলোকে ফস্‌ফরাস-জনিত বলি তাদের সঙ্গে ফস্‌ফরাসের কোনোই সম্বন্ধ নেই। ফস্‌ফরাসের নিজস্ব আলো আছে এবং এই কথাটির অর্থ করলে দাঁড়ায় 'আলোকবাহী'।

ঠান্ডা আলোর জগতে সর্বাপেক্ষা কৌতূহলজনক আবিষ্কার করেছেন পেন্সিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর লেস্‌লি এ চেম্বার্স শব্দতরঙ্গের সাহায্যে ঠান্ডা আলো উৎপাদন করে। তিনি কোনো একটি তরল পদার্থে একটি ধাতুর পাতলা পাত রাখেন যেটিকে বহিঃস্থ এক শক্তির সাহায্যে খুব জোরে এবং খুব ঘন ঘন কাঁপান হয়, যার ফলে আলো উৎপাদিত হয়। গ্লিসারিনে উক্তরূপ কম্পনশীল পাত রেখে এবং তাতে ৭৭° ডিগ্রি উত্তাপ প্রয়োগ করে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল আলো তিনি উৎপাদিত করতে পেরেছেন।

কিন্তু ঠান্ডা আলো নিয়ে এত গবেষণা এত পরীক্ষা কেন? তার জবাব দেবার সময় এখনও আসেনি। হার্ৎজ যখন বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উৎপন্ন করেছিলেন তখন 'কেন'র জবাব মেলেনি। জবাব মিলেছে আজ যখন আমরা ঘরে বসে রেডিওতে দেশ-বিদেশের প্রোগ্রাম শুনছি। এমন দিনও আসবে যখন ঘরে ঘরে হয়ত ঐ রকম উপায়ে উৎপাদিত আলো জ্বলবে।

ট্রামে-বাসে

স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর কলিকাতা আগমন উপলক্ষে "আজাদ" পত্রিকা 'গোড়ায় গলদ' নাম দিয়া একটি সম্পাদকীয় লিখিয়াছেন। স্যার তেজ বাহাদুরকে যে "অ-দলীয় নেতা" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, "আজাদের" কানে সেই আখ্যাটা নাকি নেহাৎ বেখাপ্পা বলিয়া বাজিয়াছে। কিন্তু ইহার পরই আজাদ লিখিতেছেন,—"রমণীর পাণিপীড়ন তো দূরের কথা, পাণিস্পর্শ না করিয়া স্বামীজী বলিয়া খ্যাতিলাভ যদি সম্ভব হয়, তখন পিছনে কোন দল বা জনমনুষ্যের ছায়া না থাকিলেও নেতা বলিয়া কেন অভিহিত হওয়া যাইবে না!" কথাগুলি অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের তাই আশঙ্কা হইতেছে, সাধারণ পাঠক হয়তো ইহার মর্মার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না। তার চাইতে স্বামীজীদের নিয়া টানা হেঁচড়া না করিয়া "আজাদ" বলিতে পারিতেন, পাকিস্থানের অস্তিত্ব না থাকিলেও "আজাদ" যদি পূর্বে পাকিস্থানের শ্রেষ্ঠ জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্র আখ্যা লাভ করিতে পারে তাহা হইলে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

* * * *

বড়লাট বাহাদুর বিমানযোগে বিলাত গমন করিয়াছেন, সুতরাং অন্যান্য Consumer's goods-এর সঙ্গে "ভারতের স্বাধীনতা" মালটিও বিমানযোগেই ভারতে



আমদানী করা হইবে এই কথা ভাবিবার কোন কারণ নাই। কেননা স্বয়ং আমেরী সাহেব জানাইয়াছেন:—
"It would be very wrong of me to encourage any assumption that quick and far reaching decisions are likely to follow the Viceroy's visit.
একটি অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ, Priority-র দাবী হিসাবে "স্বাধীনতার আগে" ম্যাঞ্চেস্টারের মিহি সুতার কাপড়ই আগে আমদানী করা হইবে।

* * * *

এই মিহি সুতার বস্ত্র আমদানী প্রসঙ্গে বিশু খুড়োর ভাষ্যটি মনে পড়িয়া গেল। আমাদের দেশ হইতে অন্যত্র বস্ত্র রপ্তানি করিয়া বিলাত হইতে মিহি কাপড় আমদানীর বিভ্রান্তকর তাৎপর্যের কথা খুড়োকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, —"আমরা ভারতবাসী এবং বিশেষ করিয়া বাঙালীরা এককালে ঢাকার মসলিন ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলাম। আমাদের



পরিধেয় বস্ত্রের সর্বগ্রাসী সংকটের মধ্যেও সদাশয় গভর্নমেণ্ট সেই কথা ভুলিয়া যান নাই। সুতরাং মসলিনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্যই মোটা কাপড় অন্যত্র রপ্তানি করিয়া এখানে মিহি কাপড়ের আমদানী করা হইতেছে।"

* * * *

যুদ্ধের ব্যাপারে যেসব এলুমিনিয়াম ব্যবহার করা হইতেছে তা দিয়া নাকি ভবিষ্যতে ঘর-বাড়ী তৈয়ার করা যাইবে। ইতিমধ্যেই পাঁচ লক্ষ টন এলুমিনিয়াম নাকি মজুত হইয়াছে। এইসব এলুমিনিয়ামের ঘরে বাস করিবার সৌভাগ্য আমাদের হইবে না। তবে শুনিয়াছি সৈন্যদের ব্যবহৃত পুরাতন তাস যত জমা হইয়া আছে, তা দিয়াও নাকি ঘর তৈয়ার করা যাইবে। আশা করি, সরকারী ইঞ্জিনিয়ারগণ আমাদের জন্য তাসের বাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনাটি করিয়া রাখিবেন।

* * * *

সিংহল অতঃপর 'শ্রীলংকা' নামে অভিহিত হইবে। আমরা লংকার শ্রীবৃদ্ধিতে অভিনন্দন জানাইতেছি। কিন্তু সর্বভারতীয় ক্রিকেট দল তাহাদের খেলার তালিকা শেষ করিয়া ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত লংকার শ্রী-তে উল্লসিত হইতে পারিতেছি না। প্রথম খেলাটি তাঁহারা যেভাবে খেলিয়াছেন, তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া সেই সুপ্রচলিত 'লংকায় গেলেই রাক্ষস হয়' প্রবাদটি একটু পরিবর্তিত হইয়া মনে জাগিতেছে—'লংকায় গেলেই কি সর্বভারতীয় দল বাঙলার মত খেলে?' একদা বাঙলার বিজয়সেনানী হেলায় লংকা জয় করিয়াছিল (অবশ্য ক্রিকেটে নয়) আশা করি আজ সর্বভারতীয় দল ক্রিকেটে হেলায় লংকা জয় করিয়া ফিরিবে!

* * * *

এদিকে আবার ডাঃ আম্বেদকারও আম পাড়িয়া খাইবার লোভ দেখাইতেছেন অর্থাৎ তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়কে তাঁহারা যে হিন্দু নহেন এই অত্যাশ্চর্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বেদ-বেদাঙ্গের জাল জুয়াচুরি সম্বন্ধে অনেক রূপকথা তিনি ছেলেদিগকে শুনাইয়াছেন, কিন্তু ইঁচড়েপাকা ছেলেরা কিছুতেই কিছু শিখিতে চাহিতেছে না। আমরা বলি গাধা পিটাইয়া ঘোড়া তৈয়ার করিবার সংকল্প যদি গুরু মহাশয় ছাড়িয়া দিতেন, তাহা হইলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হইত। তার চাইতে এই সব রূপকথা তিনি আমেরিকাতে যাইয়া প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে অর্থ এবং খ্যাতি উভয় দিকেই শ্রীবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমেরিকান রেডিয়োতে নাকি ভারত উপাখ্যান খুব জোর চলিতেছে। আম্বেদকার সাহেব তাঁহার এমন Golden voice-টিকে আমেরিকার শিশু-শিক্ষায় প্রয়োগ করিলে একটি কাজের মত কাজ হয়।

* * * *

স্যার রামস্বামী এবং স্যার ফিরোজকে স্যানফ্রান্সিসকো বৈঠকে প্রেরণের প্রস্তাব সম্বন্ধে শ্রীযুত অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার বলিয়াছেন যে, "ভারত স্বাধীনতা চায়" এই কয়টি কথা ইঁহাদের দুজনের



কেহই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিবেন না। তৎপর তিনি বলিয়াছেন যে,—
Both of them would get their first lesson in England and then be sent to the Conference.
আমরা আশা করিতেছি, দুইটি নাবালক "স্যারে"র প্রাথমিক শিক্ষা বিলাতে মণ্টেসরি প্রথায় সুসম্পন্ন হইবে এবং কি বলিতে হইবে, না হইবে তার যথারীতি হাতেখড়ি অচিরেই হইয়া যাইবে। কল্পনায় শুনিতেছি স্যার-যুগল ছড়া মুখস্থ করিতেছেন—অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে!

পুস্তক পরিচয়

মায়ের আশীর্বাদ (উপন্যাস)—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত। সরস্বতী সাহিত্য-মন্দির; প্রকাশক— পি দাশ; ২৮।৪এ, বিডন রো, কলিকাতা। দাম—২৸৹ টাকা।

অবনীনাথ রায় জমিদার। ব্রজেশ্বর তাঁহার ছেলে। অবনীনাথ অত্যাচারী এবং প্রজাপীড়ক। তিনি জিতেন চৌধুরীর জমিদারী অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন। পারমিতা জিতেন চৌধুরীর বিদুষী কন্যা। জিতেন চৌধুরী উদারচেতা, দরিদ্রের সহায়। অবনীনাথের অত্যাচার হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার দায়ে তিনি মামলায় পড়িলেন। তাঁহার দলভুক্ত প্রজাদের অনেকের জেল হইল। জিতেন চৌধুরী গৃহদাহে বিপন্ন প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে গিয়া জীবনদান করিলেন। অবনীনাথের লোকেরাই প্রজাদের ঘরে আগুন দিয়াছিল।

উপন্যাসের চরিত্রগুলি সবই সুন্দর হইয়াছে। তেজস্বিনী পারমিতার আদর্শ সকলকে অনুপ্রাণিত করে। গ্রন্থকর্ত্রী পারমিতার চরিত্রে নবযুগের প্রাণময়ী বাণী স্বদেশবাসীকে শুনাইয়াছেন এবং জনগণের প্রাণের বেদনাকে তিনি অগ্নিময়ী ভাষায় রূপ দিয়াছেন। অভিব্যক্তির ভঙ্গী সুস্পষ্ট এবং তাহা মনের উপর স্থায়ী ভাবে একটা ছাপ রাখিয়া যায়।

বিনয় সরকারের বৈঠক (বিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সংস্কৃতি)ঃ—প্রথম ভাগ,—চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জি এণ্ড কোং লিঃ, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-সংখ্যা—৭৭০, মূল্য—৬৲ টাকা।

এই বিরাট গ্রন্থখানি যে ইতিপূর্বেই বিশেষভাবে সমাদর লাভ করিয়াছে, তাহা ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশেই সুস্পষ্ট-রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির সঙ্গে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাই এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আধুনিক কালের নানা সমস্যা ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণকে অবলম্বন করিয়া প্রশ্নোত্তরের আকারে এই সমস্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আলোচনা-গুলি এমনই সুন্দরভাবে অনুলিখিত হইয়াছে যে, তাহাতে অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের বিশিষ্টতা অক্ষুণ্ণ আছে। বর্তমান সংস্করণে আরও অনেক বিষয় সংযোজিত হইয়াছে। বিষয়বস্তু অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, ভাষার দিক দিয়া গ্রন্থ-খানি কিছু সংক্ষিপ্ত হইলে ভাল হইত। বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ এই বৃহৎ গ্রন্থখানি আরও সমাদর লাভ করিবে, ইহাই আমাদের ধারণা।

কৃষি-প্রবন্ধ—শ্রীবাণেশ্বর সিংহ। প্রকাশক শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ, ১৩ ল্যান্সডাউন টেরেস, কলিকাতা। মূল্য ৩৷৷৹ ও ৫৷৷৹। লেখক কৃষি-বিষয়ে উপাধিধারী নহেন, কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দীর উর্দ্ধকাল হাতে কলমে কৃষির চর্চায় ব্যাপৃত আছেন। দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতার ফল তিনি এই গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন; কৃষিকর্ম যাঁহাদের জীবিকা, বা সখ হিসাবে যাঁহারা ফুল-ফলের বাগান করেন, সকলের নিকটই এই গ্রন্থ বিশেষ সমাদরযোগ্য। মাটির গুণাগুণ, বিভিন্ন রকম সারের উপযোগিতা, বীজের ব্যবহার, কৃষিযন্ত্রাদি ইত্যাদি বিষয় এই গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। নানারূপ শস্য, ফল ফুল প্রভৃতির চাষ সম্বন্ধেও বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

মোহানা (উপন্যাস)ঃ—শ্রীধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, ভারতী ভবন, ১১নং বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত; পৃষ্ঠাসংখ্যা ২০৭; মূল্য ৩৲ টাকা।

উপন্যাসখানিতে মজদুর আন্দোলনের একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। মজদুর আন্দোলন, তাহার আনুষঙ্গিক নানা প্রশ্ন ও সমস্যা, গান্ধীবাদ, কংগ্রেস ইত্যাদি নানা বিষয় গ্রন্থের পরিধিতে আসিয়া পড়িয়াছে। লেখক তীক্ষ্নবুদ্ধি সমালোচকের দৃষ্টি লইয়া প্রত্যেকটি বিষয় দেখিয়াছেন এবং পাঠককে ভাবিবার অবসর দিয়াছেন। ধূর্জ্জটীবাবুর রচনার অননুকরণীয় মৌলিকতা, নূতন দৃষ্টিভঙ্গি, কলা-কৌশলের আভিজাত্য তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এ উপন্যাসখানিতেও সুপরিস্ফুট। উপন্যাসখানি পাঠকসমাজে সমাদৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পঃ—শ্রীসুধাংশু-কুমার গুপ্ত এম, এ প্রণীত, ভারতী ভবন, ১১নং বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত; পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২৩; মূল্য ২৲ টাকা।

ইতালী, চেকোস্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, রাশিয়া, স্পেন, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের এগারোটি নির্বাচিত ছোট গল্পের অনুবাদ গ্রন্থখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনুবাদে মূল গল্পের রস অক্ষুণ্ণ রাখা সাধারণত দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানির অনুবাদক সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ যতদূর সম্ভব কেবল আক্ষরিকই নয়, তৎসঙ্গে তিনি মূল রচনার ভাব, সৌন্দর্যবোধ ও রসানুভূতি সুন্দররূপে অব্যাহত রাখিয়াছেন। অনুবাদের ভাষা স্বচ্ছ, সরল ও স্বচ্ছন্দগতি হইয়াছে। তাঁহার এই অনুবাদে কোথাও আড়ষ্টতা, কৃত্রিমতা ও কষ্টকল্পনা নাই। কথা-সাহিত্যের রসপিপাসু পাঠকগণ গ্রন্থখানি পাঠে আনন্দলাভ করিবেন। বিশেষতঃ ইংরেজি ভাষায় অজ্ঞতার জন্য বিদেশীয় সাহিত্য যাঁহাদের অনধিগম্য, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠে পৃথিবীর সাতটি দেশের নির্বাচিত ছোট গল্পের রসাস্বাদনে সমর্থ হইবেন।

দীনবন্ধু

গির্জাঘরের ভিতরটি স্নিগ্ধ,
সেখানে বিরাজ করে স্তব্ধতা,
রঙীন কাচের ভিতর দিয়ে সেখানে প্রবাহিত রমণীয় আলো।
এইখানে আমাদের প্রভুকে দেখি তাঁর ন্যায়াসনে,
মুখশ্রীতে বিষাদ-দুঃখ,
বিচারকের বিরাট মহিমায় তিনি মুকুটিত।
তিনি যেন বল্‌চেন,
"তোমরা যারা চলে যাচ্চ,
তোমাদের কাছে একি কিছুই নয়?
তাকাও দেখি, বলো দেখি,
কোনো দুঃখ কি আছে আমার দুঃখের তুল্য?"
পুণ্য দীক্ষা অনুষ্ঠান শেষ হোলো।
মনে জাগ্‌লে তাঁর প্রেমের গৌরব, তাঁর আশ্বাস বাণীঃ—
"এস, আমার কাছে, যারা কর্মক্লিষ্ট,
এস, যারা ভারাক্রান্ত,
আমি তোমাদের বিরাম দেব।"
এই বাক্যে শান্তি এবং আনন্দ আন্‌ল আমাদের মনে,
ক্ষণকালের জন্য সঙ্গ পেলুম তাঁর স্বর্গলোকে।

শুনলুম, "ঊর্ধ্বে তোলো তোমার হৃদয়কে।"
উত্তর দিলুম, "প্রভু, আমরা হৃদয় তুলে ধরেচি তোমারি দিকে।"
চলে এলুম বাইরে।
গির্জাঘর থেকে ফেরবার পথে
দেখা গেল সেই দীর্ঘ জনশ্রেণী।
তারা দেহকে পীড়ন ক'রে চলেচে
ক্লান্ত, আক্রান্ত গুরুভারে
তাদের জন্যে নেই স্বর্গ, নেই হৃদয়কে ঊর্ধ্বে উদ্বাহন,
ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টিতে নেই তাদের রোমাঞ্চিত আনন্দ,
নেই তাদের শান্তি, নেই বিশ্রাম।
কেবল আরামহীন পরিশ্রম দিনের পর দিন,
ক্ষুধিত, তৃষার্ত, তারা ছিন্ন বসন, জীর্ণ আবাস,
পরিপোষণহীন দেহ।
এদিকে তাঁর বিষণ্ণ দুঃখাভিভূত মুখশ্রী,
উদার বিচারের মহিমায় তিনি মুকুটিত।
গম্ভীর অভিযোগে আমাদের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন ঃ—
"আমার এই ভাইদের মধ্যে তুচ্ছতমের প্রতি যে-নির্মমতা
সে আমারই প্রতি।"

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের মৃত্যুর অনতিকাল পরে তাঁর এই কবিতাটির অনুবাদ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘদিনের সুহৃদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। বস্তুত, সাহিত্যিক বিচারে এই কবিতার যাই মূল্য হোক, এরই মধ্যে যেন দীনবন্ধুর আযৌবন সাধনার মর্ম-কথাটি নিহিত। পূজালয়ের অন্তরে যে রমণীয় আলো, কর্মক্লিষ্ট ও ভারাক্রান্তদের প্রতি তাঁর যে আশ্বাসবাণী, পূজালয়ের বাহিরে দেশদেশান্তরে সেই আলো সেই বাণী অগণ্য ক্ষুধিত, তৃষ্ণার্ত মানুষের জীবনে সার্থক করে তুলতে যৌবনকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি জীবনের প্রতিটি দিন নিয়োগ করে গিয়েছেন।

দীনবন্ধুর নামের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরাও সকলে জানেন না যে, তিনি কেম্ব্রিজের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন, অধ্যয়নকেই তপস্যা বলে গ্রহণ করলে জ্ঞানী-মনীষী সমাজে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারতেন। কিন্তু যৌবন-কাল থেকেই তিনি অন্যরূপ তপস্যার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরই তিনি ইংলণ্ডের শ্রমিক-জীবনের দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে একাত্ম হবার চেষ্টা করেন। প্রথমে কিছুকাল তিনি জাহাজ-মিস্ত্রিদের সঙ্গে বাস করেন; কিছু-দিন পরে কলেজ-মিশনের আহ্বানে তিনি লণ্ডনের এক মজুরপল্লীতে গিয়ে বাস করতে থাকেন। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন : 'এই পল্লীটিকে তস্কর-পল্লী বলা যেতে পারে; আমার ক্লাসে যে সকল যুবক যোগ দিত,



দীনবন্ধু সি এফ্ এণ্ড্রুজ্

তাদের অধিকাংশই পকেটমার ও চোর, তাদের অনেকের নাম পুলিশের কাছে সুপরিচিত। মাতলামি এই পল্লীতে খুব চলত, অনেক শনিবার মধ্যরাত্রে আমাকে গিয়ে পানোন্মত্ত নরনারীর কলহ-বিবাদ শান্ত করতে হয়েছে।' এই অঞ্চলে কিছুকাল থাকবার পর তাঁর স্বাস্থ্য ভগ্ন হবার ফলে অধ্যাপনাব্রত গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু সে কাজে তিনি শান্তি পান নি; কৈশোর থেকে তাঁর হৃদয়ের বাসনা দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করবেন, আফ্রিকায় গিয়ে অবনত জাতির সেবাব্রত গ্রহণ করবেন; কয়েক বৎসর পরেই ভারতবর্ষে যাবার সুযোগ পেয়ে তা তিনি গ্রহণ করেন। চৌত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি ভারতবর্ষে আসেন, আর সত্তর বৎসরে এই ভারতবর্ষের ধূলোতেই তাঁর দেহ মিশেছে।

দিল্লী সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজে যখন তিনি আসেন, তাঁর নিজের মতে, স্বদেশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজ স্বভাবতঃই যে সকল ধারণা পোষণ করে থাকে, তখনো সে সকল ধারণা তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি; তখনো তাঁর ধারণা ছিল, ভারতে ব্রিটিশ-শাসন বিধাতার বর। এই কলেজে পুণ্যাত্মা সুশীলকুমার রুদ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়—তিনি খৃষ্টান ছিলেন, কিন্তু স্বধর্মীদের রাজ্য-শাসননীতিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। দীনবন্ধুর মতে, এঁরই সাহচর্যে তিনি বুঝতে শেখেন যে, এক-জাতি উন্নত অপর জাতি অবনত, উন্নত জাতি অবনত জাতিকে মঙ্গলের পথে এগিয়ে দেবে, এ ধারণা কত ভ্রান্ত কি অকল্যাণকর; সুশীল রুদ্রই তাঁকে বুঝিয়ে দেন, পরশাসনের ফলে আর্থিক দিক দিয়েও ভারতবর্ষ কি প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-শাসন সম্বন্ধে নব-চেতনা লাভ প্রসঙ্গে তিনি মডার্ন রিভিউ সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে গিয়েছেন। 'আশ্চর্যের বিষয়, এ আমার কাছে তখন নূতন কথা; কারণ, আমি পূর্বে মনে

করতাম, ব্রিটিশ-শাসনের ফলে ভারতবর্ষই উপকৃত হয়েছে; একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি যে, ভারতবর্ষ অধিকার ও তার শিল্পনীতি নিয়ন্ত্রণের দ্বারা গ্রেট ব্রিটেনের বাণিজ্যিক ও আর্থিক স্বার্থ কিভাবে বিস্তার লাভ করেছে।' পরবর্তীকালে যে তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার একজন প্রধান প্রবক্তা হয়েছিলেন, একথা সর্বজন-বিদিত। অসহযোগ আন্দোলনের সময় Indian Independence নামে তিনি যে পুস্তিকা লেখেন, তাতে বলেছেন :

"I came to realise, by the force of sheer practical experience, that the process of passive acceptance of gift from England could not be relied on. Such an evolutionary process did not evolve, it only wandered round and round in a vicious circle, from which there was no escape. It, therefore, appeared to me more and more certain that the only way of self-recovery was through some vital upheaval from within. The explosive force needed for such an upheaval must be generated within the soul of India itself. It could not come through loans and gifts and grants and concessions and proclamations from without. It must come from within.

"Therefore, it was with the intense joy of mental and spiritual deliverance from an intolerable burden that I watched the actual outbreak of such an explosive force as that which actually occurred when Mahatma Gandhi spoke to the heart of India the mantram: "Be free! Be slave no more!" And the heart of India responded. In a sudden moment her fetters began to be loosened, and the pathway of freedom was opened".

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বেও তিনি লিখে গেছেন :

"I entirely agree with Prof. Seely, when he says that '*prolonged* submission to a foreign yoke is one of the most potent causes of national deterioration'. I quote from memory. The emphasis there is on the word 'prolonged'. Every year that now passes in India, without the removal of the foreign yoke, is undoubtedly an evil. It is likely to undo any benefit that may have been derived before. This was my main thesis in a series of articles which I wrote, in 1921, called 'The Immediate Need of Independence', where I emphasised the word 'immediate', and I hold fast to every word which I then wrote. Nearly twenty years have passed since that date, and hope deferred has made the heart sick. Things in India *have* deteriorated, as Prof. Seely propheseid, and the evil is rapidly increasing. This agony of subjection is eating like iron into the soul, and the strain must be relieved at once."

মৃত্যুশয্যায়ও তিনি মহাত্মাজীর কাছে আশা প্রকাশ করেছেন, 'Mohan, Swaraj is coming..'

শতাব্দীর প্রথমে ভারতবর্ষে যখন তিনি প্রথম আসেন, তখন দেশে নূতন চেতনার উন্মেষ দেখা দিয়েছে। এই জাগরণের সঙ্গে একাত্ম হতে দীনবন্ধুর বিলম্ব হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের নির্যাতন-সমস্যা প্রথম থেকেই তাঁর চিন্তা ও কর্মকে আকর্ষণ করে, ১৯১২ সালের পর থেকে তিনি এই আন্দোলনে নিজেকে বিশেষভাবে নিয়োজিত করেন।

১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় দীনবন্ধু ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের জীবনেই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শিল্পী রদেনস্টাইনের ভবনে কবি য়েট্‌স্ যেদিন ইংরেজি গীতাঞ্জলি এক সাহিত্যিক গোষ্ঠীকে পড়ে শোনান, সেদিন এণ্ড্রুজ উপস্থিত ছিলেন, অনেকবার তিনি সেই সন্ধ্যার বর্ণনা দিয়েছেন, বলেছেন, কিভাবে কবিতার ভাবে অভিভূত আবিষ্ট হয়ে চন্দ্রালোকে সেদিন রাত্রে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন : "সেই সন্ধ্যায় আমি যেন এক অনাবিষ্কৃতপূর্ব সৌন্দর্য-জগতে প্রবেশ-লাভ করেছিলাম। পথে চলতে চলতে আমার মনে পড়তে লাগল কবির ক্লান্ত মুখশ্রী, আর তাঁর কবিতার ঝঙ্কার; বারংবার আমি আবৃত্তি করতে করতে চলেছিলাম তাঁর কবিতা--'জগৎ পারাবারের তীরে শিশুরা করে মেলা'।"

এইভাবে যে পরিচয়ের সূচনা হয় তারই ফলে অ্যাণ্ড্রুজ শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন, কিন্তু দীর্ঘকাল তিনি স্থায়ী হয়ে শান্তিনিকেতনে বাস করতে পারেন নি, যদিও তাঁর বিশ্ব-পরিক্রমা থেকে অবসর পেলেই তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে আসতেন, আর, যেখানেই থাকুন বিশ্বভারতী ও তার প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের জন্য উদ্বেগ তাঁকে কখনোই বিরাম দিত না।

কি ভারতবর্ষে, কি ভারতবর্ষের বাইরে, যখন যেখানে তিনি ভারতীয়দের নির্যাতনের কথা শুনেছেন, শারীরিক দুঃখ যন্ত্রণা অবজ্ঞা করে তিনি দূরদূরান্তরে চলে গেছেন। দীর্ঘকাল ধরে তাঁর এই ব্রত-উদ্‌যাপনের কাহিনী অস্পষ্টভাবে আমরা সকলেই জানি, আর তার বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ বিবরণ কোথাও যথাযোগ্যভাবে লিপিবদ্ধ নেই, সম্ভবত কখনো লিপিবদ্ধ হবেও না--ভারতের বাহিরে নাটাল, ফিজি, কেনায়া, ব্রিটিশ গায়না; ভারতবর্ষে পাঞ্জাব, চম্পারন, চাঁদপুর, আসাম, উত্তরবঙ্গ, বস্তুত সর্বত্র, যখন যেখানে নিপীড়িত মানুষ দুঃখী মানুষের কথা শুনেছেন দীনবন্ধু সেখানে উপস্থিত।

শারীরিক দুঃখযন্ত্রণা অবজ্ঞার কথা উল্লেখ করেছি--বস্তুত দীর্ঘকাল তাঁকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সকলেই জানেন, শারীরিক আরামের প্রতি তাঁর সামান্যতম লক্ষ্যও ছিল না এবং আত্মার বলে দীপ্ত এই তপস্বী দৈহিক ক্লেশকে গণ্যই করতেন না, ঐ প্রসঙ্গ তাঁর মনে উদিতই হ'ত না। ইচ্ছা করলে যিনি রাজার মত থাকতে পারতেন, অতি সামান্য মানুষের মত তিনি দিন যাপন করতেন এবং সে সম্বন্ধে তার কোনো চেতনাই ছিল না। শান্তিনিকেতনের প্রখর রৌদ্রে সদাস্মিত মুখে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সামান্য দশ-জনের মত আহার, যত্রতত্র বাস, কারো কাছে তাঁর কোনো প্রার্থনা কোনো অভাব নেই--এ এমন দৈনন্দিন ঘটনা যে এমন কি চোখে পড়বার মতও নয়। উত্তর বঙ্গে প্লাবনের সময় সেবাকার্য উপলক্ষ্যে তিনি পতিসর থেকে সাত মাইল দূরে আত্রাই সেবাকেন্দ্রে হেঁটে সেবাকার্য সম্বন্ধে আলোচনা করে, জলস্পর্শ না করে এবং এক মুহূর্ত বিশ্রাম না করে আবার পতিসর হেঁটে ফিরে গেছেন, শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন--দ্বিপ্রহর রৌদ্রে শ্রীনিকেতন থেকে অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব শান্তি-নিকেতন হেঁটে চলে আসছেন এবং আবার ফিরে যাচ্ছেন এ দৃশ্য শান্তিনিকেতনবাসী কার না সুপরিচিত। ভাবতে বেদনা বোধ হয়, শারীরিক কুশল ও আরামের প্রতি এ রকম উদাসীন না হলে তিনি হয়ত আরো দীর্ঘকাল জীবিত থেকে ভারতবর্ষের সেবা করে যেতে পারতেন।

আমরা ধন্য যে আধুনিক যুগে খৃষ্টের এই মানবমূর্তিকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি ভারতবর্ষকে যিনি তাঁর মানস-জন্মভূমি ব'লে জেনেছিলেন; এই দেশের দুজন মানুষ, আধুনিক কালে পৃথিবীরও যাঁরা দুজন শ্রেষ্ঠ মানব, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যেই তিনি আত্মার সঙ্গী ও সহায় খুঁজে পেয়েছিলেন। ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি ব'লে বরণ করবার জন্যে, পাঞ্জাবে অত্যাচারের সময় তিনি পাঞ্জাবের এক গির্জা থেকে তাঁর স্বজাতি কর্তৃক তাড়িত হয়েছিলেন; অপরপক্ষে ইংরেজ শাসনের প্রতি জীবনের শেষ মুহূর্তে "সভ্যতার সংকটে" চরম তিরস্কার উচ্চারণ করবার সময়ও রবীন্দ্রনাথ অ্যাণ্ড্রুজের দৃষ্টান্ত ও স্মৃতিতেই সমগ্র ইংরেজ জাতির উপর বিমুখ হতে পারেননি; ভারতবর্ষের স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ নায়কও অ্যাণ্ড্রুজের মৃত্যু-মুহূর্তে আদেশ করেছেন, এক অ্যাণ্ড্রুজের ধীর্মময় জীবনের মহিমময় স্মৃতির দ্বারাই ইংরেজের সমস্ত অন্যায়ের স্মৃতি, তার প্রতি আমাদের সমস্ত বিদ্বেষ বিস্মৃত অপগত হোক, তাঁর পুণ্যস্মৃতি ভারতবর্ষে ইংরেজ ও ভারতবাসীর মিলনের পথ মোচন করুক।

গঙ্গোত্রী

সুবোধ ঘোষ

[২২]

কেশব ভট্‌চাযের কাছে আর কিছু অজানা নেই। মাধুরীর ভ্রান্তির ইতিহাস, হৃদয়ের চপলতার সংবাদ আজ কেশব ভট্‌চায শুনতে পেয়েছে। এই আঘাত সহ্য করার মত কঠিনতা আছে কেশবের। কিন্তু তার জন্য নিষ্ঠুর হওয়া উচিত নয়। মাধুরীকে ঘৃণা করার শক্তি আছে কেশবের। কিন্তু শক্তি থাকলেই কি ক্ষমা ভুলে যেতে হয়? নইলে তাকে আর এতদিন এবং আজও এত বড় করে দেখার কি অর্থ হয়?

এ দ্বন্দ্বের কোন মীমাংসা নেই। মাধুরীর মন তিক্ত হয়ে ওঠে। একমাত্র মীমাংসা হতে পারে, যদি কেশব ভট্‌চায আজ মাধুরীকে মন থেকে ঘৃণা করতে পারে।

হঠাৎ মাধুরীর হাত ধরলো কেশব,—তুমি খুব ক্লান্ত হয়েছ।

ক্ষমার আশ্বাস নেই, তবু কেশবের কথায় মাধুরীর চিন্তার বেদনাগুলি হঠাৎ ধীরে ধীরে লঘু হয়ে আসতে লাগলো।

মাধুরী বলে—তুমি মিথ্যে বল নি কেশবদা।

কেশব—কি?

মাধুরী—তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করাটাই যদি সমস্যা হয়ে থাকে, তার জন্য এখানে ভীড় করার কোন কারণ ছিল না। রাজনীতি, স্বদেশের ও স্বরাজের হুজুগের মধ্যে এই অভিনয় টেনে এনে লাভ কি?

কেশব—তবে?

মাধুরী—আমার সব হুজুগের আনন্দ তুমি নষ্ট করে দিলে। তোমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এর মধ্যে আর আসবো না।

কেশব হাসছিল—আমার কিন্তু কোন দ্বন্দ্ব নেই মাধুরী। এই হুজুগে আনন্দ নেই জেনেই আমি এসেছি। শুধু তোমাকে প্রশ্ন করবো বলেই এসেছি।

মাধুরী—তোমার প্রশ্নের কঠিন উত্তর দিতে পারবো, যদি আমার অন্তত বছর পাঁচেক জেল হয়। ফিরে এসে বলবো।

কেশব—এই তো মীরগঞ্জ থানা দেখা যাচ্ছে, আর পৌঁছতে বেশী দেরী নেই। দেখা যাক্ তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হয় কি না হয়?

মীরগঞ্জ সহরের ধোঁয়ায় ঢাকা সান্ধ্য চেহারার মধ্যে একে একে আলো ফুটে উঠেছিল। মান্দারগাঁয়ের বন্দী জনতা ক্রমেই এগিয়ে আসছিল। সহরের অবসন্ন কলরবের সঙ্গে আগন্তুক জনতার উল্লাস ধ্বনি মিশে গিয়ে চারদিকে একটা বিচিত্র ধরণের হর্ষ সৃষ্টি করছিল। মীরগঞ্জের প্রবেশ পথের বড় চকের কাছে জনতা পৌঁছুতেই পুলিশ দল ব্যস্ত হয়ে উঠলো। চারদিকের চার রাস্তা ধরে দলে দলে লোক দৌড়ে আসছিল। আজ সমস্ত দিন ধরে সারা শহরের মন একটা কৌতুহলে যেন ছটফট করছিল। সারাদিন ধরে গাঁয়ের দিক থেকে নানা খবর শহরের কানে এসে পৌঁছেছে। মৌশুমী ঝড়ের মত কোথা থেকে এক চেতনার হর্ষ দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। এক গাঁ থেকে আর এক গাঁ, এক হাট থেকে আর এক হাটে। মীরগঞ্জ শহরও আজ বিশদিন হলো উত্তেজনায় টলমল করছে—পিকেটিং, শোভাযাত্রা, প্রভাত ফেরী, বিদেশী কাপড়ের অগ্ন্যুৎসব। নিত্য ব্রতের পুলকে সারা শহর মাতোয়ারা। পাল্টা ভ্রূকুটি আর হুংকারেরও বিরাম নেই। কোতোয়ালীর গায়ে যেন গৃহদাহের জ্বালা লেগেছে। নিত্য গ্রেপ্তার আর লাঠি চার্জ।

আজ সারাদিন ধরে গাঁয়ের দিক থেকে দলে দলে লোক গ্রেপ্তার হয়ে আসছে। প্রায় একশো সাঁওতাল নরনারীকে এখনো ময়দানে বসিয়ে রাখা হয়েছে, পুলিশ পাহারা মোতায়েন আছে। গফুরাবাদ থেকে একদল চাষীকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে আসা হয়েছে। একটা পুরনো গালা কুঠিকে নতুন হাজত করা হয়েছে নতুন বন্দীদের নিয়ে এসে একে একে আটক করা হয়েছে তারই মধ্যে।

সন্ধ্যের আলো জ্বলে উঠতেই মীরগঞ্জ খবর শুনলো—এইবার আসছে, মান্দার গাঁ। সারা শহরে খবর ছড়িয়ে পড়েছে। মীরগঞ্জের জাগরণের সুর, আবেগ আর চঞ্চলতার উপঢৌকন নিয়ে এই তো মাত্র কয়েকদিন আগে মাধুরী দেবী গিয়েছেন মান্দার গাঁয়ে। মান্দার গাঁয়ের চিত্তে আন্দোলনের দোলা লেগেছে। মান্দার গাঁয়ের মুক্ত প্রাণ ছুটে এসেছে। বহুকালের অবসাদ থেকে হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে।

চকের কাছে মস্ত ভীড় জমে উঠেছিল। মীরগঞ্জ শহরের ইতিহাসে এক অভিনব দৃশ্য। গ্রামকে অভ্যর্থনা করার জন্য আজ পর্যন্ত কোনদিন সারা শহরের হৃদয় এভাবে একত্রিত হয়নি। আজ যেন শুধু হৃদয় বিনিময়ের লগ্ন। মীরগঞ্জের আত্মা ছুটে যায় মান্দার গাঁয়ে, মান্দার গাঁয়ের আত্মা ছুটে আসে মীরগঞ্জে।

স্বতন্ত্র ভারত কি জয়! চকের জনতার বুক থেকে এক ভৈরব নিনাদ উথলে পড়ছিল।

অভিনন্দনের প্রতিধ্বনিকে যেন দু'পায়ে পিষে দেবার জন্য দক্ষিণ দিক থেকে এক-শত বুটের শব্দ তড়বড় করে ছুটে এল। আবার পুলিশ লাঠি চার্জ করল। জনতার একটা অংশ যেন ধাক্কা খেয়ে এদিক ওদিক ছিটকে পড়লো।

মান্দার গাঁয়ের শোভাযাত্রা পুলিশের বেষ্টনীর আড়ালে থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চক পার হয়ে গেল। দু'পাশে কয়েকটা দোকান বাড়ীর ছাদ থেকে ঝর্ ঝর্ করে এক রাশ ফুল জনতার মাথার ওপর ছড়িয়ে পড়লো।

মধ্য রাত্রির স্তব্ধতা। মীরগঞ্জ শহরের চঞ্চলতা নিজের ক্লান্তিতে নিঝুম হয়ে আছে। কোতোয়ালী শান্ত। ময়দানে আর সাঁওতাল নরনারীর কেউ নেই। নতুন হাজতে মানুষের সাড়া নেই। কোতোয়ালীর আঙিনায় শুধু একটা পাহারাওয়ালা একা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটে।

বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মীরগঞ্জের চক পার করে দিয়ে শহরের শেষ আউটপোস্ট পর্যন্ত পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। সারাদিন ধরে হৈ হৈ করে যেন এক দিঘীর জল ছেঁকে কতগুলি মাছ ধরে নিয়ে এসে, ধুলো আর রোদে তাতিয়ে আবার তাদের জলে ছেড়ে দেওয়া হলো।

রাত্রির অন্ধকারে জেলা বোর্ডের সড়ক ধরে আবার তারা ফিরে গেল। একটা মেলা দেখার ক্লান্তি নিয়ে তারা ফিরছে সেই

উৎসাহ আর কলরব ছিল না। যাবার সময় যারা দীপশিখার মত গিয়েছিল, তারা এখন ফিরছে যেন ছোট ছোট ধোঁয়ার মূর্তি হয়ে। সেই জ্বালা নেই; সেই অস্থিরতা নেই। তাদের মনের ও মূর্তির বিষণ্ণতা রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে মিশে' গিয়েছিল।

শুধু ক্লান্তির কারণে নয়। এর চেয়ে অনেক দূরের মেলায় তারা গিয়েছে আর এসেছে। এর চেয়ে অনেক দূরের তীর্থের পথকষ্টে তাদের মুখের হাসি ম্লান করে দিতে পারে নি।

গাঁয়ে ফিরে যাবার পথে, প্রতি পদক্ষেপে তাদের যেন কাঁটা বিঁধছিল। মন ভার হয়েছিল। তার কারণ, তারা সবাই ফিরছে না। দু'একজন করে রয়ে গেছে পেছনে। তারা সহজে বা শিগ্গির আর ফিরছে না, কোতোয়ালীর হাজতে যারা রয়ে গেল।

জন দুই সাঁওতাল মাঝি, গফুরাবাদের জন তিনেক মাতব্বর চাষী, আর, মান্দার গাঁয়ের রতন আর কেশব ভট্চায। শুধু এই কয়জন রয়ে গেল পেছনে।

আর মাধুরী? সন্ধ্যে থেকে অনেক রাত্রি পর্যন্ত কোতোয়ালীর বারান্দায় একটা চেয়ারের ওপর চুপ করে বসেছিল মাধুরী। কথা বলার মত দ্বিতীয় কেউ তার ছিল না। ইনস্পেক্টার এসে মাধুরীর চোখের সামনে দিয়েই কেশব ভট্চাযকে কোতোয়ালীর ভেতর নিয়ে গেল। রাত দশটা বেজে গেল। কেশব আর বাইরে ফিরে এল না।

মাধুরী শুধু দেখছিল, সম্মুখের জগৎ জনশূন্য হয়ে গেছে। সাড়া শব্দ থেমে গেছে। আলো নিভে গেছে। চার দিকের বাতাসে ও মাটিতে শুধু গলিত অন্ধকারের ছোপ লেগে রয়েছে। কোথাও একটা ফাঁক নেই, কোথায় আবার সূর্য উঠবে বা ডুববে, আর সেদৃশ্য দেখবার ভরসা নেই।

এই রিক্ততা সহ্য করার মত শক্তি খুঁজে পাচ্ছিল না মাধুরী। তার সব অনুমান ব্যর্থ হয়ে গেছে। এক বন্ধুর পরিণামের পথে, সকল শাস্তি ও কৃচ্ছ্রতাকে বরণ করে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে, কীর্তি আর দুঃসাহসের নেশায় এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এত শীঘ্রই যে পথ ফুরিয়ে যাবে, তা কখনও মাধুরীর কল্পনায় আসে নি। পাঁচ বছর যদি জেল হয়, মাধুরীর জীবনের আখ্যা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সংসারের অনেকগুলি প্রশ্নের জবাবদিহি থেকে রেহাই পায়। যে পথে যাত্রা শুরু করেছে মাধুরী, তার একটা সমাপ্তি পাওয়া যায়।

মাধুরীর সেই কল্পনার আনন্দ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জীবন ব্যাপী এই আন্দোলন কি চলতেই থাকবে? মাধুরী ভয় পায়। আজ এই রাত্রিটুকুর জন্য দেশব্যাপী একটা মত্ত সিংহের গর্জন চুপ করে রয়েছে, কাল সকাল হ'তেই আবার দশ দিক কাঁপিয়ে জেগে উঠবে। আবার মীরগঞ্জের জনতা, মান্দার গাঁয়ের বিদ্যাপীঠের ছেলেরা দলে দলে সামনে এসে দাঁড়াবে। শত দিক থেকে এক আকুল কাজের আহ্বান ছুটে আসবে। মনে শক্তি নেই, হৃদয়ে আবেগ নেই, প্রলোভন, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা নেই, তবু ছুটে যেতে হবে। এক অসার অভিনয়ের নায়িকার মত জীবনের নকল করে শুধু দিন কেটে যাবে। জীবনের কোন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না, উত্তর দেওয়া যাবে না। কোন পরীক্ষা সফল হবে না।

সেই স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল মাধুরী—শুধু পাঁচটি বছর জেল হোক তার। ফিরে এসে শুধু একবার দেখতে হবে, কেশব ভট্চাযের চিরকালের প্রতিজ্ঞার কি দশা হয়। খোলা পৃথিবীর বুকে, সহস্র সুর, হাসি, রূপ ও রঙের মেলার মধ্যে পথ চলতে গিয়ে, কোথাও কি ভুল হবে না কেশবের? সে কি এতই অপার্থিব? কদিন থাকবে প্রতিজ্ঞার অহংকার? জেলের আড়ালে বসে, বন্ধ জীবনের বেড়ার মধ্যে সকলেই নিজের নিজের প্রতিজ্ঞাকে জপ করতে পারে। যেখানে বিপথ নেই, দ্বিতীয় পথ নেই, সেখানে পথভুল হবে না নিশ্চয়। কিন্তু, যেখানে পৃথিবীর মন মুক্ত আলোকের সাথী হয়ে ঘুরে বেড়ায়, যেখানে শীত, গ্রীষ্ম বদলায়, যেখানে ছুটাছুটির নানাপথ অবাধ হয়ে ছড়িয়ে আছে, সেখানে ভুল হওয়া কত সহজ! কেশব ভট্চাযের জীবনে এই পরীক্ষা আসুক। তারপর একদিন ফিরে এসে প্রশ্ন করা যাবে।

মাধুরীর মনে একান্তের সেই গোপন অভিলাষের ষড়যন্ত্র নিজের ব্যর্থতার ক্ষোভে এলোমেলো হয়ে ভেঙে পড়ছিল। কোন দিকে আর কোন ভরসার পথ রইল না। পৃথিবীর যত কিছু পরীক্ষা শুধু তারই জন্য যেন জমা হয়ে আছে। কোতোয়ালীর বারান্দার অন্ধকারে বসে এই ক্লান্তি অবসাদ ও রিক্ততার মধ্যেও মাধুরীর মনে আজকের বিকালের একটা দৃশ্য মনে পড়ে। অজয়দার বাড়ির সামনে মান্দার গাঁয়ের শোভাযাত্রা এসে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়েছিল। ছেলেদের জয়ধ্বনির হর্ষ শব্দে অজয়দা বাইরে বের হয়ে এলেন। কেশবও যেন আকুল হয়ে তাকিয়েছিল, কতক্ষণে অজয়দা আসে। সত্যিই এমন বন্ধু পৃথিবীতে বিরল। পাঁচ বছর আগেও এই অজয়দাকে মাধুরী কাঁদতে দেখেছে কেশবদার মামলার রায় শুনে যেদিন অজয়দা গাঁয়ে ফিরলো। কেশবদা আর অজয়দা সত্যিই ভাগ্যবান। পাঁচ বছরের পুরনো জিনিসকে তারা আজও অটুট রাখতে পেরেছে, ফিরে পেয়েছে। কিন্তু......।

কিন্তু, অজয়দার বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল বাসন্তী। সেই বাসন্তী..... বাসু। আজ কতদিন ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নেই। বাসন্তী যেন একটা স্তব্ধ আগ্রহের মত দাঁড়িয়েছিল। ওকে যেন একটা প্রতিজ্ঞার ছবির মত দেখাচ্ছিল, কোন নড়চড় নেই, অস্থিরতা নেই। বাসন্তী কি দেখছিল, কাকে দেখছিল কে জানে? শুধু কিছুদিনের জন্য আড়ালে সরে থাকতে চায় মাধুরী, কেশব ভট্চাযের অহংকার আর প্রতিজ্ঞা কত অবিচল, তার পরীক্ষা মান্দার গাঁয়েই রয়েছে। বাসন্তীকে দূর থেকে দেখে মাধুরী মনে মনে যে কথা ভেবেছিল, কোতোয়ালীর বারান্দায় বসে এই অস্বাভাবিক রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যেও সেই কথাই বার বার মনে মনে পড়ছিল।

একটা মোটর গাড়ী এসে কোতোয়ালীর ফটকে থামলো। সঞ্জীববাবু গাড়ী থেকে একজন ইনস্পেক্টরের সঙ্গে নেমে এগিয়ে এলেন।

বারান্দায় উঠেই ব্যগ্র ও কাতরভাবে ডাকলেন—চল মাধুরী।

মাধুরী একটু বিস্মিতভাবেই তাকিয়েছিল। সঞ্জীববাবু বললেন—চল, জামীন দিয়েছি।

সব দিক দিয়ে দুর্বল, কীর্তি-বিলাসিনী, সখের দেশসেবিকা মাধুরী, তবু মুখটা হঠাৎ করুণ হয়ে উঠলো। সঞ্জীববাবুর দিকে তাকিয়ে মাধুরী মনের বেদনায় যেন ছোট একটা প্রতিধ্বনি করলো—জামিন?

সঞ্জীববাবু বললেন—চল্।

(ক্রমশ)

সমর প্রসঙ্গ

সংবাদপত্রের মারফত ইউরোপীয় রণাঙ্গনের যে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তা' মিত্রপক্ষের প্রায় একটানা বিজয়ের কাহিনী। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় রণাঙ্গনেই মিত্র-বাহিনীর বিনা বাধায় অগ্রসর হওয়ার যে সব সংবাদ আসছে এবং 'জার্মানদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের অবসান,' প্রভৃতি যে সব চমকপ্রদ কথা সংবাদের মারফত পরিবেষিত হচ্ছে, তাতে একথা বুঝতে বাকী থাকে না যে জার্মানীর অবস্থা খুবই সংকটজনক। শুধু সংবাদপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রেরিত সংবাদেই নয়, মিত্রপক্ষের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মুখেও ইউরোপীয় যুদ্ধাবসানের আসন্নতা সম্বন্ধে নানারকম উক্তি শোনা যাচ্ছে। মিঃ চার্চিল বলেছেন—'সাফল্যলাভের সময় আসন্ন'। ফিল্ড মার্শাল স্মাটস্ বলেছেন—"ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হয়ে এল বলে।" রুশ সেনাপতি মার্শাল জুকভের মতে—'জয়লাভ নিকটবর্তী। তা' আরও নিকটবর্তী করার জন্য আমরা প্রাণপণ করছি।' ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ হারবার্ট মরিসন আরও বেশি জোর দিয়ে বলেছেন—"ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।" অবশ্য এসব উক্তি থেকে কতদিনে যে ঠিক ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান হবে, তার কোন সঠিক বা মোটামুটি রকমের আন্দাজও পাওয়া যায় না। তবে এ বোঝা যায় মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রনায়কেরা যেন বোঝাটা খানিকটা হালকা মনে করছেন এবং তাতে তাঁদের মনে যে আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে, তার ছোঁয়াচ মিত্রপক্ষের জনসাধারণের মনেও লেগেছে। আনন্দের উচ্ছ্বাসে সেদিন তো আমেরিকার জনসাধারণ রীতিমত একটা শান্তি উৎসবই করে ফেলেছিল বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

জার্মানীর অবস্থা যে অত্যন্ত সংকটজনক সে কথা পূর্বেই বলেছি। যাঁরা সংবাদপত্রের পাতায় একটু আধটু চোখ বুলান রণনীতির ক খ না জেনেও সে কথা বুঝতে তাঁদের কষ্ট হবে না। এরূপ সংকটে যে জার্মানী বর্তমান যুদ্ধে আর কখনও পড়ে নি তাও সকলেরই জানা কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে একটা খটকা লাগে। তা হল এই যে, প্রায় চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত অবস্থায় এক চরম বিপদের সম্মুখীন হয়েও জার্মানবাহিনী ছত্রভঙ্গ হচ্ছে না কেন, জার্মান জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লব দেখা দিচ্ছে না কেন? গত মহাযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে এ এক বিস্ময়জনক ব্যাপার বলেই মনে হয়। গত মহাযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষের সৈন্য জার্মাণীর সীমানায় প্রবেশ করে নি, সহস্র সহস্র বিমানপোত এভাবে জার্মানীকে বিধ্বস্ত করে নি, যুদ্ধও এত দীর্ঘকাল অন্তর্গত আরগনে আমেরিকান সৈন্যেরা আক্রমণ আরম্ভ করার কিছু দিনের মধ্যেই জার্মান সৈন্যদের মনোবল বিচলিত হল, তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে লাগলো, নভেম্বরের প্রথমভাগে বার্লিনে বিপ্লব দেখা দিল। ফলে জার্মাণরা যুদ্ধবিরতির আবেদন জানাল এবং ১১ই নভেম্বর ফ্রান্সের অন্তর্গত কম্পিয়ানে যুদ্ধবিরতিপত্র স্বাক্ষরিত হল। গত মহাযুদ্ধে মিত্রবাহিনী জার্মানভূমি থেকে বহুদূরে থাকতেই যা' সম্ভব হয়েছিল, বর্তমানে জার্মানীর বুকের উপরে যখন যুদ্ধ চলছে তখনও তা সম্ভব হচ্ছে না কেন? বিদেশী সংবাদ প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র ও গ্রন্থের মারফত নাৎসীবাদ-শাসিত জার্মান জনগণের যে নিরুদ্ধ অন্তর্দাহের বিবরণ আমরা জেনে এসেছি, এত অনুকূল বাতাস ও ইন্ধন পেয়েও তা প্রজ্বলিত হয়ে উঠছে না কেন? এত সুযোগসুবিধা সত্ত্বেও জার্মানীতে গণ-বিপ্লব দেখা দিচ্ছে না কেন? জার্মানী যখন প্রায় সমগ্র ইউরোপীয় ভূভাগ করতলগত করেছিল, তখন প্রায় প্রত্যেক দেশেই সে একজন করে ঘরভেদী বিভীষণের সাক্ষাৎ পেয়েছিল। পায় নি শুধু রুশিয়ায়। রুশিয়ায়, যখন জার্মানবাহিনী মস্কো থেকে পনর মাইল দূরে তখনও লালফৌজের দৃঢ়তা ভেঙে পড়ে নি, কোন বিভীষণ জাতীয় স্বার্থকে বিলিয়ে দেয় নি, রুশীয় গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কোন বিপ্লব দেখা নি। এতে আমরা গর্ব অনুভব করেছি, বলশেভিকবাদের আদর্শে গঠিত জনগণের সংহতি ও নিষ্ঠার প্রশংসা করেছি। প্রশংসা করবার অবশ্য কারণও ছিল। কিন্তু আজ জার্মান জনসাধারণও যে আচরণের দিক দিয়ে অনুরূপ শক্তির পরিচয় দিচ্ছে। হিটলারী গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে জনগণের কোন উল্লেখযোগ্য অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করেছে বলে জানা যায় নি। জার্মান সৈন্যদের মনোবলও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় নি। জার্মানীর এ শক্তির উৎস কোথায়? নাৎসীবাদের ভিত্তি শক্তিমত্ততার উপরে ও জনশোষণের উপরে প্রতিষ্ঠিত?—একথা সর্বত্র বিদিত। কিন্তু কোন 'বাদ' ভালমন্দ যাই হোক না কেন, শুধু প্রচারকার্যের জোরে জনসাধারণকে তা' গ্রহণ করানো যায় এবং তার প্রতি একান্ত নিষ্ঠাসম্পন্ন করে তোলা যায়, জার্মান জনসাধারণের এ ডাম্বার্টন ওকস্ আর ইয়াল্টা কনফারেন্সে জার্মানীকে বিভক্ত করে সামরিক শাসনাধীনে রাখবার সিদ্ধান্ত ও তার অর্থনৈতিক, সামরিক ও নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার যেসব ব্যবস্থার কথা সে জানতে পেরেছে, তাই তাকে মরণপণ সংগ্রামের দুর্জয় সংকল্পে উদ্বুদ্ধ করেছে? অথবা জার্মানীর সামরিক বল এখনও ততটা পরিমাণে আছে যাতে সে একেবারে হতাশ হবার কারণ দেখছে না? এখনও তার মনে আশার আলো ধিকি ধিকি জ্বলছে? সম্প্রতি আমেরিকার এসোসিয়েটেড প্রেস এক সংবাদে বলেছেন যে, জার্মান শ্রম-বিভাগের কর্তা রবার্ট লে 'ডার আংগ্রিফ' পত্রে এক প্রবন্ধে দাবী করেছেন যে, জার্মানীতে এখনও দু কোটি যুদ্ধক্ষম লোক আছে। তাদের অনেকে মনে-প্রাণে শ্রান্ত ও নিরুৎসাহ হলেও তাদের বিশ্বাস আছে যে, পরিণামে তারা জয়লাভ করবে। অবশ্য এখন কোন দিক দিয়েই জার্মাণীর পক্ষে জয়লাভের কোন আশা আছে বলে মনে হয় না। এখন যদি কোন কৌশলে তারা আত্মসমর্পণের অবস্থা থেকে আত্মরক্ষা করে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে যুদ্ধাবসান ঘটাতে সমর্থ হয়, তবে তাই তাদের পক্ষে জয়লাভ বলে মনে করতে হবে। কিন্তু এই দারুণ সংকট অতিক্রম করে যদি কোনভাবে সে মিত্রপক্ষকে জার্মানী থেকে যুদ্ধে হটিয়ে দিতে সমর্থ হয়, তবে তাকে সামরিক ভোজবাজি বলে মনে করা ছাড়া উপায় থাকবে না।

বর্তমানে যুদ্ধ যে অবস্থায় চলেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, জার্মানী পূর্ব রণাঙ্গনে যেরূপ প্রচণ্ডভাবে বাধা দিচ্ছে, পশ্চিম রণাঙ্গনে বাধাদানের প্রবলতা যেন তত বেশী নয়। ব্রিটিশ ও মার্কিন বাহিনী এরূপ অল্প বাধায় রাইন নদী অতিক্রম করতে পারবে, তা অনেকেই ভাবতে পারেন নি। কিন্তু যখন তাদের পক্ষে তা সম্ভব হলো, তখন অনেকেই সম্ভবত মনে করলেন, পশ্চিম রণাঙ্গনে প্রতিরোধ চালাবার ক্ষমতা জার্মানীর সম্ভবত আর নেই। এ প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণীয়। তা হল এই যে, কিছুদিন আগে জার্মানী থেকে প্রচার করা হয়েছিল যে, যদি কাউকে জার্মানী অধিকার করতে দেওয়া অনিবার্যই হয়, তবে রুশিয়াকেই অধিকার করতে দেওয়া হবে: ইংলণ্ড ও আমেরিকাকে নয়। এ যে লাল-জুজুর ভয় দেখিয়ে ইংলণ্ড ও আমেরিকাকে কাবু করবার একটা চেষ্টা মাত্র, তা আমরা পূর্বেই বলেছি। রাইন নদী অতিক্রমে মিত্রপক্ষকে জোর বাধা না দেওয়ার পিছনেও জার্মানীর অনুরূপ মতলবই কাজ করছে বলে মনে

কালকাতার রাজপথ কি পথচারার জন্য ?



ফুট্‌পাথে বুরুশওয়ালাদের ভিড়



ফুটপাথের বিড়ম্বনা—ফল ও মনোহারীর বাজার

দেখে শুনে পথ চলা কি এই পথে সম্ভব ?



রাস্তার উপর ফলের বাজার



পথের উপর হোটেল

হয়। এইভাবে ইংলণ্ড ও আমেরিকার হাতে জার্মানী ছেড়ে দেওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি করে রুশিয়াকে কাবু করার একটা চেষ্টা জার্মানীর আছে বলে মনে হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এ গুজবও রটছে যে, জার্মানী ইংলণ্ড আমেরিকার কাছে সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। কিন্তু জার্মানীর বর্তমান সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় এই কূটনীতিক চাল সফল হবার কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। জার্মানীর পশ্চিম রণাঙ্গনের বূহে যে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়নি, এবং এই রণাঙ্গনেও যে তার প্রতিরোধ প্রবলতর হয়ে উঠবে, আমেরিকার এসোসিয়েটেড্ প্রেসের এক সংবাদ থেকে তার সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। এই সংবাদে বলা হয়েছে যে, জার্মানরা অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে শেষবারের মত প্রতিরোধ করার জন্য ভেজার নদীর তীরে বূহে রচনা করছে। হিটলারের অনুপ্রেরণায় এই ব্যূহবদ্ধ সৈন্যবাহিনীর মরিয়া হয়ে পাল্টা আক্রমণ চালানও অসম্ভব নয়।

কিন্তু জার্মানীর এযুদ্ধকে মরণপণ যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু বলে অভিহিত করা চলে না। ইতিহাসে রাজপুতদের যুদ্ধের যে প্রকৃতির পরিচয় আমরা পাই এ যুদ্ধের মধ্যে সেই রকমের একটা ভ্রূক্ষেপহীন নির্ভীকতা ও রোম্যাণ্টিক সাহসিকতার পরিচয় আছে। এ যুদ্ধ মানুষের প্রশংসা অর্জন করতে পারে, যুধ্যমান জাতির সাহসিকতা, ত্যাগ ও বীরত্বের পরিচয় দিতে পারে, কিন্তু পরিণামে পরাজয়ের হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে না। জার্মানীতে যুদ্ধ বর্তমানে যে অবস্থায় এসে পেঁাছেচে তাতে জার্মানীর অধিবাসীদের দুর্ধর্ষ সংকল্প পরাজয়ের কালকে পিছিয়ে দিতে পারবে বটে, কিন্তু তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে বলে মনে হয় না। তবে এই পরাজয়কে মিত্রপক্ষের নেতারা যত আসন্ন বলে প্রচার করছেন তত নিকটবর্তী বলে আমাদের মনে হয় না। যুদ্ধ করে জার্মানীর পরাজয় ঘটাতে যদি বর্তমান বৎসর অতিক্রান্ত হয় তাতেও আমরা আশ্চর্যবোধ করবো না। কারণ জাতীয় মর্যাদারক্ষায় দৃঢ়সংকল্প, পরিণাম সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপহীন কোন জাতি যখন মরিয়া হয়ে, ইংরেজীতে থাকে বলে 'with backs to the wall' সেইভাবে যুদ্ধ করে, তখন তার পরাজয় না ঘটে তা নয়, কিন্তু যত সহজে ঘটবে বলে মনে করা যায় তত সহজে তা ঘটে না। কাজেই মিত্রপক্ষ জয়ের কাছাকাছি এসে উচ্ছ্বাসাতিশয্যে এমন কিছু না করে বসেন যাতে জয়ের সম্ভাবনা প্রতিহত বা বিলম্বিত হয়, সেদিকে মিত্রপক্ষকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ জার্মানী বর্তমানে সংকটগ্রস্ত হলেও জার্মান জাতির সমর দুর্ধর্ষতা পৃথিবীখ্যাত, রণকৌশলেও তারা পৃথিবীর কোন জাতি অপেক্ষা ন্যূন নয়। কাজেই বিপক্ষ বর্তমানে হীনবল হলেও তার শক্তিহীনতা সম্বন্ধে অতিরিক্ত উৎসাহিত হয়ে ওঠা সংগত হবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু এই অতিরিক্ত আশাবাদিতার সংবাদ আমরা কোন কোন মহল থেকে পাচ্ছি। যেমন 'সানডে এক্সপ্রেসে'র রাজনীতিক সংবাদদাতা বলেছেন—যুদ্ধ পাঁচ সপ্তাহের বেশিকাল স্থায়ী হবে না। সম্ভবত তার আগেই শেষ হবে। তিনি যুদ্ধের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে আরও বলেন—(১) সংঘবদ্ধ শক্তি হিসাবে জার্মানবাহিনী ইতঃপূর্বেই শেষ হয়ে গেছে; (২) সামরিক ও বে-সামরিক উভয় ক্ষেত্রেই নাৎসী গভর্নমেণ্ট আধিপত্য হারিয়ে ফেলেছে; (৩) জার্মান সেনাপতি ও রণাঙ্গনে অবস্থিত সৈন্যদের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে; এবং (৪) সামরিক ও বে-সামরিক উভয় প্রকারের সরবরাহ ব্যবস্থাই নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি আরও বলেছেন যে, জার্মানীর সরকারী ও অন্যান্য জনস্বার্থ সম্পর্কিত সমস্ত প্রকার ব্যবস্থা এরূপভাবে নষ্ট হয়েছে যে, মিত্রপক্ষকে নিজেদের হাতে জার্মানীর ভার গ্রহণ করে নিজেদের বিশেষজ্ঞদের হাতে এগুলি পরিচালনার ভার দিতে হবে; বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী মিত্রপক্ষের কর্মচারীদের পরিচালনায় জার্মানদের দ্বারা এসব কাজ চালান সম্ভব হবে না।

একে অতিরিক্ত আশাবাদিতার উচ্ছ্বাস বলেই আমরা মনে করি। কারণ এখনও ইউরোপীয় রণাঙ্গনে জার্মানবাহিনী যে প্রবলভাবে প্রতিরোধ চালাচ্ছে তাতে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে বলে মনে করবার কোন কারণ আছে বলে আমরা মনে করি নে। বিপক্ষের শক্তি সম্বন্ধে এই উপেক্ষা যে অযথা বিপদও টেনে আনতে পারে, সে সম্বন্ধে এই গবেষণাকারীরা সচেতন থাকলে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ও মতামত প্রকাশ একটু সংযতভাবেই করতেন। আমরা পূর্বেও বলেছি, এখনও বলছি, জার্মানীর এ যুদ্ধে জয়ের ক্ষীণতম আশাও আমরা দেখছি না। কিন্তু তাই বলে অতর্কিতপূর্ব ছাড়া এখনই সে ভেঙে পড়বে এ মনে করার কোন সংগত কারণ নেই। প্রবল শত্রু দুর্বল হয়ে পড়লেও তার সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। জার্মানী সম্বন্ধে উপেক্ষাপূর্ণ মনোবৃত্তির সৃষ্টি না হওয়াই সামরিক নীতির দিক থেকে সংগত বলে আমরা মনে করি।

ইউরোপের যুদ্ধের অবস্থা সম্বন্ধে জেনারেল আইসেনহাওয়ার গত ২৭শে মার্চ যে বিবৃতি দিয়েছেন তা' বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে একথা আমি বলতে পারি নে। ৬ই জুন থেকে জার্মানরা পরাজিত হয়ে আসছে। এত দীর্ঘকাল পরাজয় সহ্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তথাপি জার্মানরা যে কি করতে পারে তা কেউ বলতে পারে না।

তবে তিনি মনে করেন যে, নর্ম্যাণ্ডিতে অবতরণের সময়ে জার্মানরা যে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করেছিল সে রকম যুদ্ধ এখন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

তৎপর তিনি বলেন—নিজের দেশে একজন জার্মান কি করতে পারে তা কেউ জানে না। তবে যা সে করতে পারে তার সব কিছু করতেই সে চেষ্টা করছে। আমি বিশ্বাস করি যে, যেখানেই জার্মাণদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হবে সেখানেই তারা দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে।

বার্লিনে কারা আগে পেঁাছবে এ প্রশ্নের উত্তরে জেনারেল আইসেনহাওয়ার বলেন যে, দূরত্বের দিক থেকে রুশেরা সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। কারণ বার্লিন থেকে তারা ৩৩ মাইল মাত্র দূরে আছে। অথচ এদিকে আমরা আছি ৩৫০ মাইল দূরে। তবে জার্মান শক্তির অধিকাংশই ঐদিকে প্রযুক্ত হয়েছে এবং ঐদিকে যুদ্ধও খুব প্রবল হবে।

জেনারেল আইসেনহাওয়া সুদক্ষ সেনাপতি। তার কথা থেকে যুদ্ধ সম্বন্ধে যে আভাস পাওয়া যাচ্ছে তা'হল এই যে, জার্মানীর পরাজয় হবে বটে, তবে তার জন্য আরও কত কঠোর সংগ্রাম করতে হবে তা অনুমান করা কঠিন। কারণ স্বদেশরক্ষায় জার্মান সৈনারা কতটা শক্তির পরিচয় দেবে আগে থেকে তা অনুমান করা মুস্কিল। তবে তারা মানুষের পক্ষে যা সম্ভব তা করবে বলে ধরে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

—বিক্রমগুপ্ত

কপিলা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ভারী অহংকার ছিল বৈকুণ্ঠের, তার মতো গোরু চেনে না কেউ। মাঝপাড়ার হাটে গিয়ে গো-হাটার পাশ দিয়ে হাটবার সময়েই তার প্রমাণ মিলত। চেনা লোক হলে তো কথাই নেই, অচেনা ভিনদেশীও হাঁক দিয়ে বলেছে, দ্যাখো তো মোড়লের পো, হালের জন্যে এই এঁড়েটা চলবে কি না।

থমকে থেমে দাঁড়িয়েছে বৈকুণ্ঠ। একবার সগর্ব দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়েছে সমবেত জনতার ওপরে, তারপর নীরব বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে লক্ষ করেছে ছোট এঁড়েটির চোখ, লেজ, পা আর দাঁত। সংক্ষেপেই জবাব দিয়েছে, না ভাই, এ চলবে না কিছুতেই।

গোরুর মালিক হয়তো প্রতিবাদ করে উঠেছে : কেন চলবে না শুনি? দিব্যি তাজা বাছুর, লকলকে চেহারা। এ চলবে না তো কী চলবে?

অনুকম্পার হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে বৈকুণ্ঠের মুখখানা।

—শুধু লকলকে চেহারা দেখিয়েই ভোলাবে শেখের পো? ভালো হালী গোরুর ধরণই আলাদা, এক নজরে চেনা যায়। এতো 'থকলানো' জাত, এক বিঘে জমিতে লাঙল ঠেলতেই হিমসিম খেয়ে যাবে। আর যাকে যাই বলো, ওতে বৈকুণ্ঠ বর্মণকে ভোলাতে পারবে না এ বলে দিচ্ছি।

আবার উল্টোটাও ঘটেছে অনেক দিন। হাড় বেরকরা জিরজিরে গোরু, পিঠে ঘা; হাওয়ায় উল্টে পড়ে যায়। হঠাৎ পাশ দিয়ে যেতে তারই ওপরে নজর পড়েছে বৈকুণ্ঠের।

—গাই কিনবে? তা হলে এটাই নিয়ে যাও ভাই।

—ওই ওটা? ওর আছে কী? দুদিন বাদেই তো ভাগাড়ে টেনে ফেলে দিতে হবে।

—নাও না কিনে। কদিন ভালো করে জাবনা খাওয়াও, তারপরে দেখো কেমন হয়ে ওঠে ওই মড়ুঞ্চে গোরু। বিশ্বাস করে নিয়ে যাও, ঠকবে না।

বিশ্বাস করে যে নিয়েছে সত্যিই সে ঠকেনি। ব্যতিক্রম কি হয়নি কখনো? হয়তো হয়েছে দু'চারবার। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে নির্ভুল অনুমান বৈকুণ্ঠের। কী মন্ত্রবলে গোরুর নাড়ী-নক্ষত্র সে চিনেছে কে জানে, তার ভবিষ্যদ্বাণী যেন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। তাই গো-বিশারদ হিসেবে বৈকুণ্ঠের খ্যাতি মিলেছে প্রচুর, খাতির মিলেছে তার চাইতে অনেক বেশি।

আশ্চর্য—সেই বৈকুণ্ঠের নিজেরই গোরু নেই।

কেমন করে থাকবে গোরু? আধিতে চাষ করতে হয়। যা পাওয়া যায় তাতে স্বামী-স্ত্রী দুটি প্রাণীরও পেট চলে না। অবসর সময়ে জন খাটতে হয়। তাতেও কুলোয় না, আষাঢ় মাস আসবার আগেই আবার গিয়ে ধানের জন্যে দরবার করতে হয় মহাজনের কাছে। পাঁচ মণ ধান নিয়ে যাও, পরের বারে দেড়া সুদে সাড়ে সাত মণ শোধ দিয়ে যাও। কিন্তু দেড়া শোধ দিতে গিয়ে ধারের পাল্লা আবার দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়েই চলেছে ধার—গতবারে ভিটেখানা অবধি কর্জ লিখে দিতে হয়েছে। কোনদিন সমূলে যে উৎখাত করে দেবে, সেই আশঙ্কায় ঘুম হয় না রাতে।

কিন্তু তত তাগিদ নেই মহাজনের। একেবারে মেরে ফেলার চাইতে মারবার ভয়টা যে ঢের বেশি কাজ দেয়, মানুষের এই সাধারণ মনস্তত্ত্বটুকু মহাজনের অজানা নেই। অনেক বেশি বেগার পাওয়া যায়, অনেক বেশি ভীতি আর সম্মান আদায় করা চলে। এক কাঠা খটখটে জমি আর এক টুকরো ভাঙা চালা খাস করে নিলে এমন কোনো স্বর্গরাজ্য হাতে চলে আসবে না।

সুতরাং গোরু রাখবার সামর্থ্য নেই বৈকুণ্ঠের। কী খেতে দেবে, কেমন করে যত্ন করবে তাকে! খোল-ভুষি-জাবনা কিনবার পয়সা পাবে কোথায়! যেমন তেমন করে একটা গোরু এনে গোয়ালে আটকে রাখবার মতো উৎসাহ পায়না বৈকুণ্ঠ। গোরু—মা। মায়ের মতো তাকে সেবা করতে হয়, পুজো করতে হয়। নইলে মায়ের অভিশাপ লাগে, তার দীর্ঘশ্বাসে মানুষ সবংশে ধ্বংস হয়ে যায়।

নিড়ানি নিয়ে ক্ষেতে কাজ করতে করতে অকস্মাৎ আচ্ছন্ন হয়ে যায় মন। উদাস আর বিহ্বল চোখ মেলে সম্মুখের দিকে তাকায় বৈকুণ্ঠ। একটু দূরেই মস্ত একটা বাঁক নিয়েছে মহানন্দা। আর বাঁকের মুখে অনেকটা জায়গা জুড়ে প্রশস্ত গো-চারণের মাঠ। নদীর মিঠে জলের ছোঁয়াচ লেগে সরস হয়ে উঠেছে নরম লাল মাটি, তার ওপরে শ্যামল ঘাসের আস্তরণ। ঘাস, ঘাস আর ঘাস। যতদূরে চোখ যায়—মাটির আনন্দ যেন অকৃপণ শ্যামশ্রীতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। দলে দলে গোরু চরে ওখানে, বড় বড় ঘাসের আগায় তাদের ক্ষীরপুষ্ট 'পালান' ঢাকা পড়ে যায়। সমস্ত দিন ওখানে স্বেচ্ছাসুখে আহার আর রোমন্থন করে সন্ধ্যায় দল বেঁধে ঘরে ফিরে আসে। তৃপ্তিতে তাদের আয়ত কালো কালো গভীর চোখগুলো আচ্ছন্ন, ভারী ভারী নিশ্বাস ফেলে মৃদু-মন্থর গতিতে তারা এগিয়ে যায়।

আর তারই সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৈকুণ্ঠ। আজ যদি একটা গোরু তার থাকত।

কিন্তু ভগবান অন্তর্যামী। বৈকুণ্ঠের মনের কথা তিনি শুনতে পেলেন।

ঘরের লাগাও ছোট্ট একখানি ক্ষেত। বিশেষ কিছু নেই, কয়েকটা গাজর, দু-চারটে পেঁয়াজকলি, গোটাকতক বেগুনের চারা। ক্ষেতের ওপর বৈকুণ্ঠের যা মমতা, তার চাইতে ঢের বেশী তার বউ প্রিয়বালার।

সেদিন নিশিরাত্রে সেই বাগানে হুড়মুড় ক'রে বেড়া ভাঙবার শব্দ। নিশ্চয় চোরা গোরু। লাফিয়ে বেরিয়ে এল বৈকুণ্ঠ, আর্তনাদ করে পেছনে পেছনে ছুটে এল প্রিয়বালা : আমার অমন পেঁয়াজকলিগুলো বুঝি খেয়ে ফেললে!

বাগানে ঢুকতেই দেখা গেল—গোরু পালিয়েছে। ক্ষেতের অর্ধেকটা জুড়ে রেখে গেছে ক্ষুরের চিহ্ন, আর দক্ষিণ দিকের বেড়াটাকে একেবারে নামিয়ে ফেলেছে মাটিতে। কিন্তু আসামী পালালেও একটি ক্ষুদে অপরাধী বাগানের মধ্যে তখনো নিভীকভাবে দাঁড়িয়ে। লণ্ঠনের আলোয় তার নীলাভ উজ্জ্বল চোখ দুটি অসীম কৌতূহলে আর বিস্ময়ে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

একটি নতুন বাছুর। লালে আর শাদায় মেশানো গায়ের রঙ। কপালে শোভা পাচ্ছে শুভ্র একটি চন্দ্র চিহ্ন। এখনো খেতে শেখেনি, শুধু বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে চাটছে কাঁটাওয়ালা বেগুনের পাতাগুলো।

বাছুরের গায়ে লণ্ঠনের আলো পড়তেই রাগ না করে উল্লসিত হয়ে উঠল বৈকুণ্ঠ।

—আরে, এ যে ভারী পয়মন্ত বাছুর। সারা গায়ে কপিলা লক্ষণ। এ যার ঘরে থাকবে, তার অভাব হবে না কোনদিন, কখনো কষ্ট পাবে না সে।

মুখ ভার করে প্রিয়বালা বললে, তাতে তোমার কী! যার গোরু, সৌভাগ্য তার। এখন ক্ষেত থেকে তাড়িয়ে দাও, আমার অমন বেগুন গাছগুলো একেবারে শেষ করে দিয়েছে।

—না, না। —বৈকুণ্ঠ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল : এই রাত্রে তাড়িয়ে দেব কোথায়? ওর মা তো কোন্ দিকে পালিয়েছে ঠিক-ঠিকানা নেই। নতুন বাচ্চা, এখন বার করে দিলে নির্ঘাৎ শেয়ালের পেটে যাবে। আয়, এটাকে ঘরে তুলে রাখি। ওর মা যদি আসে, তখন—

—ঘর? ঘর কোথায় আছে যে রাখবে? বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে প্রিয়বালা।

—না হয় আমাদের ঘরেই থাকবে। হয়তো

একটু নোংরা করে ফেলবে, তা তুই সাফ করে দিস লক্ষ্মীটি। অবোলা জীব—

একটা তীব্র ঝাঁঝালো উত্তর দিতে গিয়েই বৈকুণ্ঠের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল প্রিয়বালা। স্বামীর দুচোখে ছলছল করে উঠেছে গভীর স্নেহ, অপরিসীম বাৎসল্য। আজ পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে, অথচ এ পর্যন্ত একটি ছেলে এলনা প্রিয়বালার কোলে। সেই অনাগত সন্তানের জন্যে বৈকুণ্ঠের সঞ্চিত স্নেহ যেন এই বাছুরটির প্রতিই উৎসারিত হয়ে উঠেছে।

পরদিন আশেপাশে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান। কিন্তু না পাওয়া গেল বাছুরের মায়ের কোন সংবাদ, না পাওয়া গেল গোরুর মালিকের কোন ঠিকানা। কোন্ দূর গ্রামের রাত-চরা গোরু—কে তার খবর রাখে?

ঘরে ফিরে বৈকুণ্ঠ বললে, ভারী মুস্কিল হল বউ।

—কেন?

কী করি এই বাছুর নিয়ে? নতুন বাচ্চা, কিছু খেতে পাবে না। মায়ের দুধ না হলে তো বাঁচানো যাবে না।

উঠোনে দাঁড়িয়ে তৃষ্ণার্ত বাছুরটা তখন প্রাণপণে মায়ের জন্যে চীৎকার করছে। স্বামীর বিপন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে প্রিয়বালা বললে, তাড়িয়ে দাও, যেদিকে খুশি চলে যাক।

—পাগল নাকি? এই বাচ্চা—তাড়িয়ে দিলে যাবে কোথায়? আচ্ছা দেখি, কোন ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। ভারী পয়মন্ত বাছুর রে, সারা গায়ে কপিলার লক্ষণ। একে কি অযত্ন করা চলে?

বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল বৈকুণ্ঠ, খানিক বাদেই ফিরে এল এক ভাঁড় দুধ নিয়ে।

—দুধ কী হবে?

—দ্যাখ্ না।

একটা শালপাতার ঠোঙা করে খানিকটা দুধ নিয়ে বাছুরটার মুখের কাছে ধরলে বৈকুণ্ঠ। প্রথম প্রথম খেতে চায় না, শুধু বিস্ময়বিহ্বল ভয়ার্ত চোখ মেলে একবার তাকায় বৈকুণ্ঠের মুখে, আর একবার ঠোঙাটার দিকে। তারপরেই চুক—চুক—চুক। দুধের স্বাদ পেয়েছে। আনন্দে চোখ জ্বলে উঠেছে; নড়ছে পেছনের ছোট্ট লেজটি। নিমেষে দুধটা শেষ করে দিয়ে একান্ত একটা সংস্কারবশেই প্রাণপণে শালপাতার ঠোঙাটাকে চিবোবার চেষ্টা করতে লাগল।

সেই কপিলা।

আজ তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না বৈকুণ্ঠের। বড় হয়ে উঠেছে, লক্ষ্মীমন্ত গোরুর সমস্ত সুলক্ষণ নিয়েই বাড়-বাড়ন্ত হয়ে উঠছে। দলের মধ্যে যখন চরে বেড়ায়, তখন কপিলাকে দেখবামাত্র চিনতে পারা যায় নির্ভুলভাবে। কপালে জ্বল জ্বল করছে চন্দ্রচিহ্ন। উজ্জ্বল মসৃণ শরীর থেকে মাছি পর্যন্ত পিছলে পড়ে। আয়ত কালো চোখের দৃষ্টিতে মাতৃত্বের নিবিড় ছায়া নেমেছে মেঘের মতো। বাচ্চা হবে কপিলার।

অথচ কত দুঃখে যে বড় করতে হয়েছে এই কপিলাকে। খোরাকীর পয়সা থেকে সে জাবনা কিনেছে কপিলার। ঘরের বেড়া ছুটিয়ে, এমন কি কুণ্ডুদের বাঁশ ঝাড় থেকে রাতারাতি বাঁশ চুরি করে এনে কপিলার জন্যে গোয়ালঘর তৈরী করে দিয়েছে। শত্রুতা করে মোমিন শেখ যখন গোরুটাকে খোঁয়াড়ে দিয়েছিল, তখন প্রিয়বালার বহু যত্নে সঞ্চিত রুপোর খাড়ু বন্ধক দিয়ে ছাড় করে আনতে হয়েছে।

প্রথম প্রথম খুব খুসি হয়নি প্রিয়বালা। ঝগড়া করেছে, অভিমান করেছে। রাগ করে বলেছে, তুমি তোমার গোরু নিয়েই থাকো, আমি বাপের বাড়িতে চললাম।

প্রতিবেশী এসে শাসিয়েছেঃ—গোরু সামলাও বৈকুণ্ঠ। আমার তিনটে কপির চারা খেয়ে ফেলেছে। আর একদিন যদি আমার ক্ষেতে ঢোকে, মেরে তা হলে গোরুর পা ভেঙে দেব।

মাঝে মাঝে বৈকুণ্ঠও ক্ষেপে উঠেছে। সংসারের নানা অভাব, নানা অশান্তির মধ্যে কাঁহাতক মাথা ঠিক রাখতে পারে মানুষ? নঃ, গোরু পোষা তার মতো গরীবের জন্যে নয়। আসছে বুধবার মাঝপাড়ার হাটে সে কপিলাকে বিক্রী করে দেবে। আট টাকা দশ টাকা—যা পাওয়া যায়। বড় ঘরটায় ছাউনি নেই, এই টাকায় সেটাকে সারিয়ে নেওয়া চলবে; প্রিয়বালার কাপড় নেই, এক জোড়া সাড়ী কিনে দেওয়া যাবে তাকে।

আর হয়তো ঠিক সেই মুহূর্তেই উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে কপিলা। স্নিগ্ধ সজল চোখ দুটি বৈকুণ্ঠের দিকে তুলে ডেকেছে—'হাম্বা'। কতখানি স্নেহ সেই ডাকের মধ্যে, কতখানি নিবিড় ভালোবাসা। মুহূর্তে সব রাগ যেন জল হয়ে গেছে বৈকুণ্ঠের। ছুটে গিয়ে সে দুহাতে কপিলার গলা জড়িয়ে ধরেছে; বলেছে, আমার কপিলা আমার লক্ষ্মী।

সেই কপিলার বাচ্চা হবে। আর কী আশ্চর্য যোগাযোগে সাত বছর পরে সন্তান সম্ভাবনা হয়েছে প্রিয়বালার। দুদিক থেকে দুটি কোল জুড়োনো, মাণিক আসছে বৈকুণ্ঠের ভাঙা ঘর আলো করতে।

এদিকে কপিলা, ওদিকে প্রিয়বালা। বৈকুণ্ঠের প্রথম সন্তান আসছে। কপিলার প্রথম দুধে সেই সন্তান মানুষ হবে, পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। লেখাপড়া শিখবে, দশজনের মধ্যে একজন হবে দু পয়সা করে আনবে। দুঃখ থাকবে না বৈকুণ্ঠের, অভাব থাকবে না এক বিন্দুও।

সেদিন অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ভাঙা ঘরের ভেতর দিয়ে চাঁদের আলো মায়া ছড়িয়েছে দারিদ্র্যের জীর্ণ শয্যার ওপরে। চমকে বৈকুণ্ঠ দেখল প্রিয়বালা তার পাশে নেই। এই রাত্রে—এমন অসময়ে কোথায় গেল সে?

বাইরে থেকে গুণ গুণ করে গানের শব্দ। ঘুম পাড়ানি গানের একটানা সুর। খোলা দরজার ভেতর দিয়ে দেখা যায় দাওয়ার খুঁটি ধরে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে প্রিয়বালা। মাঝরাতের চাঁদ যেন সমস্ত জ্যোৎস্না উজাড় করে দিয়েছে তার সর্বাঙ্গে। এত সুন্দরী নাকি প্রিয়বালা! বৈকুণ্ঠ এ তো কোনদিন কল্পনাই করতে পারে নি!

প্রিয়বালা গান গাইছে। কী গান?

"উড়কি ধানের মুড়কি দেব,
শালি-ধানের চিঁড়ে দেব,
নতুন গুড়ের পাটালি দেব,
কপিলা গাইয়ের দুধ দেব,
আয় চাঁদ আয়—"

একটা নিঃশ্বাস ফেলে নিঃশব্দে পাশ ফিরল বৈকুণ্ঠ। প্রিয়বালা টের না পায়।

কিন্তু স্বপ্ন বুঝি আর সফল হয় না। দেশে আকাল এল। এমন আকাল কেউ কখনো দেখেনি। ধান চাল যেন হাওয়ায় উড়ে গেছে। খবর এসেছে নদীর ওপারে না খেয়ে মরছে মানুষ। মন্বন্তর।

বৈকুণ্ঠের দিন চলে না। একবেলা খেলে আর একবেলা উপোস দিতে হয়। আসন্ন-মাতৃত্বা প্রিয়বালার মুখে অরুচি। কিন্তু রুচি আর অরুচির সব প্রশ্নই এখন সমান হয়ে গেছে। পেটের ভাতই যখন জুটবে না, তখন বাছ বিচারের অবকাশ কোথায়?

ভাঙা ঘর আরো বেশী করে ভেঙে পড়ে। আতঙ্কে শিউরে ওঠে বৈকুণ্ঠ। মৃত্যুর কঙ্কাল ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে দিগদিগন্তে। রুক্ষ চুলে খড়ি ওঠে, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে তাকায় আকাশের দিকে। এবার না খেয়ে মরতে হবে।

চাল নেই। মহাজনের গোলায় যা ছিল রাতারাতি অদৃশ্য। মাটির তলা ফুটো করে যেন কোটি কোটি অলক্ষ্য ইঁদুর ওঠে এসে সব কিছু এক নিশ্বাসে নিঃশেষ করেছে। প্রিয়বালা আজকাল আর বেশী চলাফেরা করতে পারে না, মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে মাটিতে। তার গায়ের প্রত্যেকটি হাড়-পাঁজরা যেন গুণে ফেলা যায়। আর মাতৃত্বের ভারগ্রস্ত দেহ কেমন অস্বাভাবিক লাগে দেখতে, কেমন একটা আকস্মিক ব্যাপার যেন।

তবু মায়ের জীর্ণ অনাহারপীড়িত দেহের আড়ালে প্রতিদিন বেড়ে চলে ভ্রূণ। কেমন করে কোথা থেকে যে সে তার প্রাণরস সঞ্চয় করে বেঁচে আছে কে জানে। দুর্ভিক্ষের সন্তান—মন্বন্তরের সন্তান। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে নবজীবনের সূর্যোদয়।

আর ওদিকে বাড়ছে কপিলার সন্তান। দেশে দুর্ভিক্ষ—তবু গো-চারণের মাঠে

দুর্ভিক্ষ নেই। দূর-দুরান্ত জুড়ে মহানন্দার বাঁকের মুখে শ্যামল ঘাস লক লক করে। শ্যামল ঘাস—নরম লাল মাটির বুক থেকে উচ্ছলিত প্রাণের আনন্দ। দলে দলে গোরু চরে, ইচ্ছে মতো খায়, ইচ্ছে মতো রোমন্থন করে। তাদের মাঝখানে কপিলাকে দেখলেই চিনতে পারা যায় বহু দূরের থেকেও। লাল রঙের নধর পরিপুষ্ট গোরু। কপালে চন্দ্র চিহ্ন। কচি শালপাতার মতো লাল টুকটুকে কাণের পাশে ছোট ছোট দুটি শিং উঠেছে। সেদিকে তাকিয়ে দুঃখ ভুলে যায় বৈকুণ্ঠ—অভাব ভুলে যায়। নিজের অজ্ঞাতেই বেরিয়ে আসে মুখ থেকে ঃ কপিলা, আমার লক্ষ্মী।

কিন্তু মন্বন্তর। মানুষের সব কিছুকে নিঃশেষে গ্রাস করবার জন্যেই যেন দেখা দিয়েছে। স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা। কারো দাম নেই কোনো, কোনো মূল্য নেই।

তিন মাস তো নয়, যেন তিনশো বছর। ছবি বদলে যায়।

অনেক সাধাসাধির পরে এল গাঁয়ের হাতুড়ে কবিরাজ। বহুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলে প্রিয়বালাকে। তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে, এ কী করেছ?

আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা পাথর হয়ে গেছে বৈকুণ্ঠের।—কী করব?

—শিগ্‌গীর ভালো ওষুধের ব্যবস্থা করো। নইলে বাঁচবে না।

—বাঁচবে না! কথাটা কাণের কাছে যেন বাজের আওয়াজের মতো গর্জে উঠল। মরে যাবে প্রিয়বালা এও কি সম্ভব! কিন্তু ভালো ওষুধ। কোথায় পাবে ভালো ওষুধ? পয়সা কই?

কবিরাজ বললে, যেমন করে হোক অন্তত পাঁচশিকে পয়সা জোটাও আপাতত। তারপরে দেখি আমি কিছু করতে পারি কি না।

কবিরাজ চলে গেল। সান্ত্বনা দেবার সময় নেই তার, বৈকুণ্ঠের অবস্থা বোঝবার মতো অবকাশ নেই। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে আধিব্যাধিও যেন হাজারখানা রূপ নিয়ে ভেঙে পড়েছে। ঘরে ঘরে রুগী, ঘরে ঘরে মুমূর্ষু মানুষ।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে বৈকুণ্ঠ। পাঁচশিকে পয়সা! ঘরে একটি দানা নেই আজ, কাল থেকে মুশুরী আর কলাই সেদ্ধ চলছে। কিন্তু—কিন্তু মরে যাবে প্রিয়বালা? এক ফোঁটা ওষুধের অভাবে সে মরে যাবে? একথা ভাবা যায় না।

জীর্ণ শয্যায় মূর্চ্ছিতের মতো পড়ে আছে প্রিয়বালা। পাশে পড়ে ঘুমুচ্ছে তার ছেলে—তার বহু প্রতীক্ষার, বহু আকাঙ্ক্ষার সন্তান। কয়েকখানা হাড়ের সমষ্টি, সমষ্টির মধ্যে এক রাশ চুল শুদ্ধ একটা প্রকাণ্ড মাথা মাত্র। এরই জন্যে এত কামনা প্রিয়বালার, এত প্রত্যাশা! একেই সে বরণ করবে শালি ধানের চিঁড়ে দিয়ে, নতুন গুড়ের পাটালী দিয়ে, কপিলা গাইয়ের দুধ দিয়ে!

বাইরে চোখ পড়ল বৈকুণ্ঠের। নতুন শাবকটি নিয়েই উঠোনে বাঁধা আছে কপিলা। ভারী সুন্দর বাচ্চা। ঠিক মায়ের মতো দেখতে, ঠিক মায়ের মতোই তার কপালেও শুভ্র চাঁদের অম্লান চিহ্ন। মনে পড়ে গেল যেদিন তার মা ঠিক এতটুকু অবস্থাতেই তার ঘরে এসে দেখা দিয়েছিল। আশায় আনন্দে সমস্ত চেতনা যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল বৈকুণ্ঠের। তার ঘরে লক্ষ্মী এসে পা দিয়েছেন, আর অভাব থাকবে না, দুঃখ থাকবে না।

অভাব থাকবে না, দুঃখ থাকবে না! ভাঙা ঘরের চালের দিকে তাকালো বৈকুণ্ঠ, তাকালো মূর্ছিত প্রিয়বালার মৃত্যুম্লান মুখের দিকে।

কিন্তু পাঁচশিকে পয়সা। হঠাৎ বৈকুণ্ঠ চমকে উঠল। ওই তো দাঁড়িয়ে আছে কপিলা আজ ওর অশৌচ ভাঙবে, আজ পাওয়া যাবে ওর প্রথম দুধ। ভেবেছিল ওই নতুন দুধে সে তার ছেলেকে মানুষ করে তুলবে, বড় করে তুলবে—

নতুন একটা ভাঁড় নিয়ে উঠোনে নেমে এল বৈকুণ্ঠ। দুধের ভারে টনটন করে উঠেছে কপিলার পরিপুষ্ট পালান—গভীর বাসন্তী রঙের বাঁটগুলো যেন ফেটে পড়ছে। প্রসন্ন প্রশান্ত দৃষ্টিতে বৈকুণ্ঠের মুখের দিক তাকিয়ে যেন আপনা থেকেই পা ফাঁক করে দাঁড়ালো কপিলা। নাও, নাও, দুয়ে নাও। যা আছে সব নাও। যা আছে সব নাও। ভেবো না, আমার ভাণ্ডার অফুরন্ত।

নতুন মাটির ভাঁড়ের মধ্যে তীরের মতো তীক্ষ্ন ধারায় দুধ পড়ছে। দুধ নয়—যেন ক্ষীর। মাটিতে পড়লে মিলিয়ে যায় না, মাথা তুলে মুক্তোর বিন্দুর মতো টলমল করে। মাখনের প্রাচুর্য ছড়ায় একটা হরিদ্রাভ দীপ্তি। সুলক্ষণা গাভীর দুধ, কপিলা গায়ের দুধ। সে তো দুধ নয়—যেন অমৃত। এক চুমুক খেলেই মানুষ অমরত্ব লাভ করতে পারে।

ঘরের মধ্যে কাঁদছে প্রিয়বালার ছেলে—বৈকুণ্ঠের প্রথম সন্তান। মায়ের স্তনে দুধ নেই। কাণ পেতে একবার শুনল বৈকুণ্ঠ, একবার তাকিয়ে দেখল ভাঁড়ের পরিপূর্ণ অমৃতের দিকে। পাক্কা দু সের। হয়তো ওই দুধে ছেলেটার—

কিন্তু না—একবিন্দু খরচ করলে চলবে না। পাঁচশিকে পয়সা চাই। শুধু তো ওষুধের নয়। ঘরে খাবার নেই, পরণে কাপড় নেই। এই দুধের পয়সা দিয়ে যদি কোনমতে কটা দিন কাটিয়ে দেওয়া চলে, যদি কোনমতে কটা দিন বেঁচে থাকতে পারা যায়।

দুধের ভাঁড় হাতে নিয়ে হন হন করে হাটতে সুরু করে দিলে বৈকুণ্ঠ। পেছন থেকে ছেলেটার ক্ষীণ কান্না তখনো ভেসে আসছে। অন্তত আড়াই ক্রোশ রাস্তা পাড়ি দিলে মহকুমা শহর।

এক পা ধুলো আর ক্ষুধার্ত ক্লান্ত দেহ নিয়ে দুধের বাজারে এসে দাঁড়ালো বৈকুণ্ঠ। পিপাসায় মাথা ঘুরছে। হাতের ভাঁড়ের মধ্যে টলমল করছে ক্ষীরের মতো কপিলা গাইয়ের দুধ। ওপরে ভাসছে মাখনের উজ্জ্বল বিন্দু। এক চুমুক খেলেই হয়তো সমস্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হয়ে যায় তার। না—না! বৈকুণ্ঠ চমকে উঠল ঃ না—না।

—এই, কতটা দুধ আছে?

—দু সের বাবু।

—ঢাল্ দেখি।

—পাঁচশিকে লাগবে বাবু।

—পাঁচশিকে!—বিস্ময়-বিহ্বল মুখে খরিদ্দার তাকালো বৈকুণ্ঠের মুখে।

—ব্যাটা, তোর সাহস তো কম নয়। ছ আনা করে কণ্ট্রোল আর তুই দর চাস দশ আনা! জেলে যাবি যে।

জেল! বৈকুণ্ঠের চোখে যেন আগুন জ্বলে গেল।

—কেন যাবো জেলে? আমার কপিলা গায়ের দুধ, ক্ষীরের মত দুধ। পাঁচশিকের কমে আমি বেচব না।

—এ ব্যাটা কেরে! বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা দেখছি?

ভিড় ঠেলে ইউনিফর্মপরা একটি মূর্তি দেখা দিল। চোখেমুখে তার কর্তব্য পালনের দীপ্ত প্রতিজ্ঞা।

—কী হয়েছে রামবাবু, ব্যাপার কী?

শহরের নাম করা ব্যবসায়ী রামবাবু। কাপড়ের কারবার, নানা জিনিসের কারবার। তাই সকলেই তাঁকে বিশেষভাবে সমীহ করে থাকে।

বৈকুণ্ঠের মাথায় যেন খুন চড়ে গেছে।

—না, আমার দুধ, আমি বেচব না দশ আনার কমে। আমার কপিলার দুধ। যার ইচ্ছে কিনবে, যার ইচ্ছে কিনবে না।

আর সহ্য হচ্ছে না ইউনিফর্মের। সোজা এগিয়ে এসে বৈকুণ্ঠের হাত চেপে ধরল।

—বটে, আচ্ছা চলো থানায়। দেখি তোমার তেজ থাকে কতক্ষণ। ব্ল্যাক মার্কেট করবে, আবার গলার জোর দ্যাখো!

খানিকটা ধস্তাধস্তি। তারপরেই একটা বজ্রমুষ্টি উড়ে এসে পড়ল বৈকুণ্ঠের মুখের ওপর। আর মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে গেল বৈকুণ্ঠ—হাত থেকে ছিটকে পড়ল ভাঁড়। কপিলা গাইয়ের ক্ষীরের মতো নতুন দুধে শহরের পাথর বাঁধানো কঠিন পথ ভেসে গেল।

প্রিয়বালার ছেলে তখনও অসহায় ক্ষীণ কণ্ঠে কাঁদছে। মায়ের স্তনে একবিন্দু দুধ নেই।

জীবনের ঝরাপাতা

শ্রীসরলা দেবী চৌধুরানী

[১৯]

জাতীয় দৈন্যের নানা দিক

নতুন মামার স্থাপিত সংগীতসমাজে বরোদার রাজা নিমন্ত্রিত হয়ে গেলেন। সেটি সেকালের বনেদী ঘরের ধনী সৌখীন পুরুষদের গান-বাজনা ও থিয়েটারের আড্ডা। একবার "বাল্মীকি প্রতিভা" অভিনয় হচ্ছিল সেখানে। তাতে বৌবাজারের যোগেন মল্লিক মহাশয় বাল্মীকি সেজেছিলেন। তাঁর পার্টে যখন গান এল—

"যাও লক্ষ্মী অলকায়!
যাও লক্ষ্মী অমরায়!
এ বনে এসোনা, এসোনা,
এসোনা এ 'দীনজন' কুটীরে—"

তিনি গাইতে গাইতে স্টেজের মধ্যিখানে বলে উঠলেন—"আমার দ্বারা এ হবে না। আমি মা লক্ষ্মীকে এ কথা বলতে পারব না, তাঁকে তাড়াতে পারব না। জন্ম জন্ম এসো মা, থেকো মা এই দীন অভাগ্যজনের কুটীরে।" —বলে' স্টেজ ছেড়ে পালালেন।

সেই ধনী ও বিলাসীদের প্রমোদগৃহে বরোদার রাজা গেলেন যখন গান-বাজনার টুঁ শব্দটি শোনা গেল না। সেদিন গোবরডাঙ্গার জমিদারপ্রমুখ বলশালী পুরুষগণের বলবীর্যের নানাপ্রকার নিদর্শন দেখান হল শুধু। বরোদাকে আর কিছু দেখান শুনান যেন বাঙালীর পক্ষে লজ্জাকর হবে, তাঁদেরও মনে তাই ঠেকল। সেদিন প্রমাণ হল দেশের ধাত বদলিয়েছে।

আর এক ব্যাপার হতে থাকল। নানা স্থান থেকে আমার কাছে দরখাস্ত আসতে লাগল তাদের দেশে আমার' ক্লাবের কতিপয় ছেলেকে পাঠাতে—তাদের ওখানে খেলাধুলো দেখান ও শেখানরও জন্যে। পুজার সময় বাঙলা দেশে বড়লোকদের ঘরে বাই নাচ আনা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের প্যাটার্ণ বদলাতে থাকল।

এই সময় আমার নিজের সম্বন্ধে নানা গুজব আমার কানে ওঠাতে থাকলেন দুই-একটি গুজবী ব্যক্তি। সবই যে প্রীতিকর হত তা নয়। আমি চুপ করে সব শুনে যেতুম, কোন মন্তব্য করতুম না। শুনতে পেলুম আমার একটা নামকরণ হয়েছে বাঙলার 'Joan of Arc'—'দেবী চৌধুরাণী' নামেও আখ্যাত হতে লাগলুম। একবার শুনলুম—রেলেতে একটা পার্সেল ধরা পড়েছে, ভিতরে বন্দুক ভরা, উপরে কারো নাম নেই। পুলিশের বিশ্বাস আমি নাকি সেগুলির আমদানী করিয়েছি—পুলিশ কিন্তু তদন্ত করতে আসেনি আমাদের বাড়িতে। আর একবার সি আর দাস আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বলে গেলেন।—"আপনি সাবধানে থাকবেন। সন্ধ্যেবেলা বালিগঞ্জে এ বাড়ি ও বাড়ি হেঁটে বেড়াতে বেরোবেন না। পুলিশ বলছে, আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন, অথচ আপনাকে ধরবার, ছোঁবার কোন উপায় পাচ্ছে না। তাই তারা এবার পরামর্শ এঁটেছে কোনদিন সন্ধ্যেবেলায় আপনি বাড়ির বাইরে বেরোলে তাদের গুণ্ডা দিয়ে আপনাকে আক্রমণ করিয়ে জাহির করে দেবে গুণ্ডারা আপনার ক্লাবেরই ছেলে—আপনিই এই সব গুণ্ডা তৈরী করেছেন।"

এইবার ভারতীতে আমার "আহিতাগ্নিকা" কবিতা বেরোল। সেটি এইঃ—

আহিতাগ্নিকা

সর্ব্বদেব সাক্ষী করি একি ব্রত করিলে গ্রহণ!
পথ যে দুর্গম একায়ন!
সুতীব্র দিবস আর সুদীর্ঘ শর্ব্বরী,
অপ্রকম্প্যচিতে
সর্ব্ব ভয় পরিহরি
পারিবে কি যেতে?
রে সুখলালিতা!
দুরাশা চালিতা!

২

দৃষ্টিবিষ সর্প সেথা জাগে অতি ভীষণ আকার!
করে নিত্য গরল উদ্গার।
ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, ক্রূর, হিংস্র পরাণী যতেক
ফিরিছে গোপনে,
আছে কণ্টক শতেক!
পারিবে সহিতে সব?
তুমি বিক্লববচনা
অশ্রু-আবিল-লোচনা!

৩

উজ্জ্বল শিখাসম হইবে কি
সত্য-সংগরা!
অতন্দ্রিতা, চিরলক্ষ্য পরা!
পারিবে সাধিতে শক্তি
রিপুনিবর্হণা!
লোকহাস, ভয়, লজ্জা, মিথ্যা বিগর্হণা
সহিবে প্রশান্ত চিতে?
অয়ি আহিতাগ্নিকা!
অতি সাহসিকা!

৪

যে অগ্নি জ্বালিলে আজি, চিরদীপ্ত
রহিবে কি তাহা?
উচ্চারিবে নিত্য স্বস্তি স্বাহা!
প্রাণাহুতি দিবে তায়! আত্মবিসর্জ্জন
নিয়ত হইবে তার সমিধ ইন্ধন!
সঙ্কল্প অটল রবে!
হবে চিরধন্যা!
অয়ি বীরম্মন্যা!

৫

পুষ্পমাসে গন্ধ-বহ যদি আনে
মোহ অভিনব,
নিদাঘ সন্ধ্যায় উঠে বেণুবীণা রব,
ময়ূরবিরুতমধু বনভুবচ্ছায়,
পুলকসমুত্থ কম্প যদি শিহরায়,
রবে অকম্পিতা তুমি!
হে আত্ম-ঈশানা
চির-অতৃষাণা!

৬

যদি ঝড়ঝঞ্ঝা উঠে, বক্ষ মাঝে
অঞ্চল আবরি,
অগ্নি রাখি দিও, জাগি সারা বিভাবরী!
আর সব নারী ভবে প্রিয় পরিজনা,
তুমি রহ শ্রেয়োনিষ্ঠ ব্রত পরায়ণা!
অনাকুলা, অনলসা, সুকঠোরজপা!
দৃঢ়পরন্তপা!

এই সময় রুশের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ বাধল। বাঙালীদের মনুষ্যত্বের পথে আর এক ডিগ্রি উঠানের জন্যে এই সুযোগটা গ্রহণপরায়ণ হলুম। খবরের কাগজে একটি বিজ্ঞপ্তি দিলুম, ইংরেজদের রেডক্রসের মত বাঙালীদেরও একটি রেডক্রস দল গঠনের জন্যে আমি সচেষ্ট—জাপানের যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে আহতদের সেবার জন্যে। যাঁরা যোগ দিতে চান নিজেদের নাম ধাম আমার কাছে

পাঠাবেন; এবং এর ব্যয় নির্বাহার্থে দশ হাজার টাকার প্রয়োজন হবে, যাঁরা অর্থ সাহায্য করতে চান তাঁদের সাহায্য সাদরে গৃহীত হবে। এর উত্তরে তিন শ'র অধিক লোকের আবেদন এল "বেঙ্গলী রেডক্রস" দলভুক্ত হবার জন্যে; এবং অর্থের দিক থেকে সব প্রথমে মোরভঞ্জের মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ অযাচিতভাবে একখানি এক হাজার টাকার চেক পাঠালেন। ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য এবং অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবেরা জানালেন তাঁরা প্রস্তুত আছেন, যখনি যত টাকার প্রয়োজন জানালে পাঠিয়ে দেবেন। দেখলুম, দেশে প্রাণের অভাব নেই, খালি জ্বালিয়ে দেবার দেশলাই কাঠি একটি চাই। এই সময় বেলুচিস্থান থেকে Colonel Yates নামে একজন ইংরেজ মিলিটারী অফিসারের একখানি চিঠি পেলুম। তিনি অনুযোগ করলেন, আমি বাঙালীদের একটা স্বতন্ত্র Ambulance Corps ম্যাঞ্চুরিয়ায় পাঠাবার জন্যে কেন প্রয়াসী হয়েছি? লর্ড কর্জনের প্রচেষ্টায় ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট থেকে যে Corps পাঠান হবে তার সঙ্গে এইটে মিলিত কেন না করি? তাছাড়া আমার Corps কি St. John Ambulance Association-এর ট্রেণিং প্রাপ্ত? তা না হলে যাওয়া নিষ্ফল—তিনি আমায় সতর্ক করে দিলেন। হয়ত এ বিষয়ে বাঙালীদের কোন স্বাধীন প্রচেষ্টা ইংরেজদের মনঃপূত ছিল না, হয়ত ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট থেকেই এ চিঠির ইঙ্গিত গিয়েছিল,—যাই হোক এর থেকে আমি একটা মস্ত শিক্ষা পেলুম। ব্যাপারটার গুরুত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা এল। আমার 'বেঙ্গলী রেডক্রস' সংগঠন ও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণের পরিকল্পনাটি শুধু ভাবের তোড়ে নির্গত একটি বস্তু। এর জন্যে নিজেদের তৈরি হওয়ার প্রধান উপকরণ কি কি তা ভাবিনি। দেশের লোকেরাও কেউ এদিকে মাথা ঘামাননি, আমায় সে সম্বন্ধে কেউ সচেতনও করেননি—একের উৎসাহেই খালি সকলের উৎসাহ প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। শুধু শতাব্দিগত ভীরুতার শিক্ষাকে দলিত করে—'শত হস্তেন বাজিনঃ' প্রভৃতি বুলি প্রত্যাখ্যান করে ভয়াবহ যুদ্ধস্থলে গোলাবন্দুকের সন্নিকটে উপস্থিত হওয়ার সাহস অবলম্বনই যে যথেষ্ট নয়, যে উদ্দেশ্যে যাওয়া সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে—আহত মুমূর্ষুদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেবার জনো যারা ডাক্তার নয় তাদের সে বিষয়ে অধীতবিদ্যা হয়ে যাওয়া যে কতদূর প্রয়োজন তা ভাবিনি। কর্নেল ইয়েট্‌সের চিঠি পেয়ে এ সম্বন্ধে জাগরণ এল। **কিন্তু St. John Ambulance Association কি বাঙালীদের শেখাবে?** সেটা British Red Cross-এর অঙ্গীভূত—তাতে ইংরেজ ও ফিরিঙ্গি ছাড়া আর কেউ শিক্ষা পায় বলে ত জানিনে। আমি তার বড়কর্তাকে একখানি চিঠি লিখে অনুরোধ করলুম আমার সঙ্গে এসে দেখা করতে, তিনি সৌজন্যতা করে এলেন। আমি তাঁকে সব অবস্থাটা খুলে বল্লুম। তিনি শুনে বল্লেন—"এ পর্যন্ত একটি বাঙালীও তাঁদের কাছে ট্রেণিংপ্রার্থী হয়ে কখন আসেনি। তাঁদের ক্লাস শুধু ইংরেজ ও ফিরিঙ্গিতেই ভরা। বাঙালীদের শেখান হবে কিনা এ বিষয়ে কোন দিন কোন প্রশ্ন উঠবার অবসরই হয়নি। আমার অনুরোধ তিনি নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন—বেঙ্গলী ambulance corpsকে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে দেবেন। সেজন্যে তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার পূর্বে অন্তত তিন মাস কলকাতায় অবস্থান করে শিক্ষা নেওয়ার দরকার।"

এই সকল পর্যালোচনা চলছে—ইতিমধ্যেই খবরের কাগজে হঠাৎ একদিন একটি খবর বেরল—জাপানী গভর্নমেণ্ট ইস্তেহার দিয়েছেন—"বহু জাতি তাঁদের প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশ করে তাঁদের আহতদের সেবার জন্যে স্ব স্ব রেডক্রস-সেবকদের পাঠাবার অভিপ্রায় জানিয়েছেন। তাঁদের সকলকে জানান হচ্ছে তাঁদের সাহায্য প্রস্তাবের জন্য জাপান কৃতজ্ঞ, কিন্তু এস্থলে কোন বিদেশীয় সাহায্য গ্রহণে তাঁরা পরাঙ্মুখ।" জাপানের তীক্ষ্ম রাজনীতি-বিচক্ষণতার ফলেই এইরূপ বিধান তাঁরা সাব্যস্ত করেছিলেন সন্দেহ নেই।

দেখা যায় সেদিনকার জাপান ও আজকেকার জাপানের প্রতি ভারতবর্ষে আমাদের দৃষ্টিকোণের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেদিন তারা সবেমাত্র এক প্রচণ্ড বলশালী য়ুরোপীয় বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করেছে—একমাত্র এসিয়াটিক জাতি তারা সমস্ত এসিয়ার মুখোজ্জ্বল করেছে এবং 'Asia is One' এই বাণীর দ্বারা সমগ্র এসিয়াকে জাগ্রত করেছে। আজ দেখি **"এসিয়া এক"** এই অভিনব বুলিটির ভিতর এক দারুণ গুলী লুকিয়ে রেখেছিল যেটা সুযোগ মত বেরিয়ে পড়ে তামাম এসিয়াকে বিব্রত করে তুলবে, সেটি হচ্ছে, 'জাপানের অধীনতায়।' আজ কয়েক বৎসর ধরে চীন মহাদেশকে জাপানের ছত্রছায়ে আনবার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় সেটা পদে পদে প্রমাণিত হচ্ছে। শ্যাম, বর্মা, মলয়দ্বীপ, কোরিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ—কোথাও তাদের এ অভিসন্ধি আর লুকোনো নেই। পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তের ক্ষুদ্র দ্বীপ ইংলণ্ডের মত পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তের ক্ষুদ্র দ্বীপ জাপানও যে সাম্রাজ্য বিস্তারের সমান অধিকারী এ বিষয়ে আর তাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ইংলণ্ড যেমন 'White Man's Burden' বহন করার মহদুদ্দেশ্যে, কেবলমাত্র পরোপকারার্থে, দেশবিদেশে নিজেদের 'ঝাণ্ডা উচা' করছেন, জাপানও—ইংলণ্ডের দক্ষতম শিষ্যটিও—তদ্রূপ 'Yellow Man's Burden' কাঁধে ওঠানোর জন্যে, প্রতিবেশীদের অতিভার লাঘবের জন্যে, কেবলমাত্র তাদেরই কল্যাণের প্রতি দৃষ্টিবান হয়ে তাদের দিকে হস্তবিস্তার করছে। ইংলণ্ডের লৌহপাশ থেকে মুক্ত হয়ে জাপানের বজ্রকুসুমের বলয় পরতে কিসের আপত্তি? এ যে এসিয়াটিক স্যাকরার হাতে গড়া স্বদেশী জিনিস! কিন্তু ভবী ভোলবার নয়! ন্যাড়া বেলতলায় দুবার যেতে নারাজ!

যুদ্ধের পর অনেক জাপানীর সমাগম হতে থাকল ভারতবর্ষে ও আমাদের পরিবারমণ্ডলে। তার মধ্যে তিন চারটির সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচয় হল। তাদের মধ্যে দুটি ইয়োকোআনা ও হিষিদা চিত্রকর, তখনি নিজেদের দেশে কিছু কিছু নামকরা, পরে ভারতবর্ষ থেকে ফিরে গিয়ে বিশেষরূপে প্রথিতনামা হন। তাঁরা আমাদের পরিবারস্থ কারো কারো ফরমাসে ভারতীয় বিষয়ের অনেকগুলি চিত্র আঁকলেন। য়ুরোপীয়দের মত ক্যানভাসের উপরে নয়, রেশমের উপর আঁকেন জাপানীরা। তাতে ভারি একটি মোলায়েম ভাব হয়। আর তাঁদের তুলির স্পর্শ যে কি সুকোমল, রঙগুলি যে কি সুমোহন হয়ে ফোটে, তা চিত্রশিল্পী মাত্রে জানেন। আমার ফরমাসে একজন ইয়োকোআনা কালী ও একজন হিষিদা সরস্বতীর ছবি আঁকলেন। সে দু'খানিই আমার ঘরে আজও বিরাজিত এবং দর্শকমাত্রের দৃষ্টি ও চিত্ত-আকর্ষক। যদি বোমা পড়ে, তবে রামের বোমাতেও যাবে, রাবণের বোমাতেও যাবে—এই ভয় মনে পোষণ করেও ছবি দুখানি রেখেছি সযত্নে যুদ্ধের আজ তিন-চার বছর ধরে নিজের বসবার ঘরেই। এ দুখানির ফটো সে সময়কার প্রবাসীতে বেরিয়েছিল—তখন ভারতী সচিত্র ছিল না। 'কালীর' ছবিটি ঠিক সচরাচর দৃষ্ট কালীর ছবি নয়। তার কল্পনায় যে নূতনত্ব ছিল তার ব্যাখ্যান দিয়েছিলুম প্রবাসীতে।

সুরেন মহাভারতের 'গীতা' কথনের সময়কার ছবি আঁকিয়েছিলেন, তাঁর প্রণীত 'সংক্ষিপ্ত মহাভারত' পুস্তকের অন্তপৃষ্ঠায় তার ফটো সন্নিবিষ্ট আছে। শ্বেত অশ্ব-যুগলের রথে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ দুজনে সমাসীন। সে ছবি শ্রীকৃষ্ণের তেজোময়ত্বের একটি আদর্শ ছবি। গগনদাদা ও অবনদাদা রাসলীলা ও অন্যান্য হাল্কা রসাত্মক বিষয়ের ছবি আঁকিয়েছিলেন। সে রাসলীলার ছবি-খানি একটু একটু মনে পড়ে—কি **অপার্থিব চন্দ্রালোক, কি আকাশবৎ সূক্ষ্ম**

বায়বীয় উত্তরীয় গোপীদের, কি নৃত্য-ভঙ্গি! এগুলি প্রকাণ্ড বড় বড় ছবি। আমার পঞ্জাব অবস্থানকালে জাপান গভর্নমেণ্টের দূত এসে তাদের আর্টিস্টের অঙ্কিত অমূল্য ছবিগুলি তাদেরই দেশে থাকা উচিত বলে সুরেনের ও গগনদাদাদের ছবিগুলি বহুমূল্যে ক্রয় করে নিয়ে গেল। আমার দুখানি আমার সঙ্গে পঞ্জাবেই ছিল—তাই বেঁচে গেছে, এখনও ভারতবর্ষেই রয়ে গেছে।

এই আর্টিস্টদের সমসাময়িককালে 'প্রিন্স হিতো' বলে জাপানী রাজবংশের একটি ছেলে আসেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন এবং ভারতবর্ষের তীর্থস্থান দেখে বেড়াচ্ছিলেন। এঁকে দেখতে অনেকটা ত্রিপুরার রাজবংশের একটি সুন্দর ছেলের মত—একটি ভারি সৌকুমার্য আছে শরীরে, মুখে ও মনে। তাঁর সরল, সাদাসিদে অথচ সবিনয় ভদ্রব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হয়েছিলেন। যেন পথহারা পথিকের মত পৃথিবীতে ফিরতেন তিনি। তাঁকে দু-একটি তথাকথিত রসিক পুরুষ তাঁদের দেশের নর্তকীদের সম্বন্ধে নানা রকম প্রশ্ন করতেন, তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকতেন। এরা ছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকান শিষ্যা মিসেস ওলেবুলের—যাঁর টাকাতেই বেলুড় মঠের ভিত্তি স্থাপিত হয়—বন্ধু, আমেরিকায় কিছুকাল অবস্থিত ও ইংরাজী শিক্ষিত একজন বিশিষ্ট লেখক, আর্ট সমালোচক ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ওকাকুরা এসেছিলেন। তিনি একজন আদর্শ সামুরাই জাপানী—চেহারায়, ধরণ-ধারণে, পোষাকে-পরিচ্ছদে, সর্বদিকে চৌকস, জাতীয়তায় ভরা, এশিয়ার ঐক্যবাদে অনুপ্রাণিত, এশিয়ার প্রতি অংশকে—শ্যাম, জাভাদি এবং ভারতবর্ষ থেকে আরম্ভ করে পারস্য পর্যন্ত প্রতি খণ্ডটিকে দেশাত্মবোধে কাণায় কাণায় ভরে দেওয়ার আগ্রহবান। তাঁর একখানি প্রসিদ্ধ বই কলিকাতায় বসেই লেখা, মিসেস ওলেবুল, মিস ম্যাকলয়েড প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে এবং নিবেদিতার টাইপিংয়ে। তাঁর বইয়ের আরম্ভের সেণ্টেন্স—'Asia is one', তার শেষ সেণ্টেন্স—'Victory from within or Death from without।' তাঁর বইয়ের অন্তর্গত ভাব ও বাণী বাঙলা থেকে পঞ্জাব পর্যন্ত মুখে মুখে প্রচার হতে থাকল, লাজপৎ রায় প্রমুখ প্রত্যেক দেশভক্তের লেখনীতে লেখনীতে প্রতিফলিত হতে লাগল।

এই সব জাপানীরাই সুরেনদার বাড়িতে অতিথি হয়ে বাস করতেন। আমাদের পরিবার ছাড়া আর এক বাঙালী পরিবারের কর্তার সঙ্গেও ওকাকুরার ভাব হল—তিনি ক্রীক্ রো'র সুবোধ মল্লিকের পিতৃব্য হেম মল্লিক। ওকাকুরা যখন জাপানে ফিরে যান, হেম মল্লিক মহাশয়ের পুত্র তাঁর সঙ্গে গেলেন।

রুশ-জাপানী যুদ্ধের পর থেকে জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষীয়দের বাণিজ্যের সংযোগ বেড়ে গেল এবং বাঙলাদেশ থেকে অনেক ছাত্ররা গিয়ে নানাবিধ শিল্প শিক্ষা করতে লাগল। সিলেটের রমানাথ রায় সে সময়ে একজন প্রসিদ্ধ জাপান প্রত্যাগত সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ফিরে এসেই আমার সঙ্গে দেখা করেন—জাপানের অনেকানেক অদ্ভুত অদ্ভুত ছোট ছোট শিল্পজাত উপহার নিয়ে এসেছিলেন মনে পড়ে, যা তৈরি করতে জাপানীদের বেশি খরচ হয় না, অথচ যার ভিতর শিল্প নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা পাওয়া যায়। জাপানের আদর্শে নানা রকম ছোট ছোট কলকারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য চালান তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। অল্পদিনেই সকলকে মর্মাহত করে তাঁর অকাল মৃত্যু হয়, দেশ একটি সুকর্মীকে হারায়। ছাত্রদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের উমেশ দত্ত মহাশয়ের দৌহিত্র সত্যসুন্দর দেব আমার কতকটা সাহায্যে একটি স্কলারশিপ পেয়ে জাপানে 'পটারি ওয়ার্কস' শিখতে যান এবং দেশে ফিরে 'বেঙ্গল পটারি' খোলেন। খুব ভাল চলছিল। নিজের দেশের পেয়ালা পিরিচে চা খেতে পেয়ে বাঙালী ধন্য বোধ করছিল। কিন্তু যতদূর জানি, ভিন্ন ভিন্ন স্বত্বাধিকারীর হাতে পড়ে পড়ে শেষে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর সময় বোধহয় এটি ফেল করে। এখন একটি লিমিটেড কোম্পানী হয়ে পঞ্জাবী ও দিল্লীওয়ালাদের শেয়ার আধিক্যে তাঁদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। সত্যসুন্দর দেব এখন রূপনারায়ণপুরে 'Behar Pottery' নাম দিয়ে ও বেলিয়াঘাটায় তাঁর পুত্র সরল দেবের Bengal porcelain Co. নামে স্বতন্ত্র পটারি ওয়ার্কস খুলেছেন। শুনতে পাই, এগুলির অবস্থাও খুব ভাল। (ক্রমশ)

আমি গান গাই

শ্রীমনসারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

আমি গান গাই,
ক্ষুধিতের এ মিছিলে কেহ গান শুনিবার নাই।
তবু গান গেয়ে চলি' প্রাণহীন শবের মেলায়;
আমার বাঁশীর সুর তান-মূর্চ্ছনায়—
জীবনে জাগাতে, চায় বাঁচিবার আনন্দ-উৎসব,—
প্রেম কলরব।

অস্থি-পঞ্জরের স্তূপ হোল বুঝি পর্বতপ্রমাণ!
যারা করে খতিয়ান—
অল্প ব্যয়ে মোটা লাভ, এই তার পরম সময়।
জীবনের শত অপচয়—
বাঁচিতে হইলে নাকি প্রয়োজন আছে—
তাহাদের কাছে!

এই হিংস্র শকুনের ভোজের সভায়—
উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ত নেশায়—
সহজ মৃত্যুর পথ। রক্তে লেখা হয় ইতিহাস—
নিয়তির এই পরিহাস—
কতদিন কতকাল অহরহঃ চলিবে ভুবনে?
ব্যথা জাগে মনে।

প্রশস্তির তরে নয়—
আমি গান গেয়ে চলি'—নহে ইহা কভু সত্য নয়।
বাঁচার আনন্দ চাই আপনার আত্মার বিকাশে,
জীবন মুখর হোক আকাশে-বাতাসে।
নব সৃষ্টি-প্রেরণায় সুরের লিখন লিখে যাই।
আমি গান গাই॥



ছবির স্বত্ব বিক্রী করা প্রযোজকদের মধ্যে আজকাল একটা রীতিতে দাঁড়িয়ে গেছে। ছোট প্রযোজকরা তো ক'রছেই, তাছাড়া বড়দের ভেতরেও আর কেউ বাকী আছে বলে দেখা যাচ্ছে না। এই বিক্রী করার রীতি আরম্ভ হয়েছে ফাটকা বাজারের ব্যবসাদারদের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে হাত দেওয়া থেকেই। একদিক থেকে স্বত্ব বিক্রী করায় প্রযোজকদের অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হতে আরম্ভ করেছে। প্রযোজকদের এখন কোনো ঝুঁকি ঘাড়ে নিতে হয় না। ছবিখানি কোন রকমে শেষ করতে পারলেই, লাভসমেত মূল টাকা তার হাতে চলে আসছে, ফলে বসে না থেকে সংগে সংগে কাজ আরম্ভ করার সুযোগও পাওয়া যাচ্ছে—আগে এদিক থেকে খুবই অসুবিধে ভোগ করতে হতো। এখন এমনও হচ্ছে যে সব ক্ষেত্রে কোন কোন প্রযোজকের না-তোলা আগামী ছবির স্বত্বও বিক্রী হয়ে যায়।

স্বত্ব বিক্রীর রীতিতে ভাল দিকের সংগে মন্দ দিকও কতকগুলি আছে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় খুব বড় কোন পরিবেশক যার হাতে থাকে অনেক ছবি তার কাছে ভাল



প্রভাত ফিল্মসের 'চাঁদ' চিত্রে নবাগতা বেগম পারা

ছবিও মার খেয়ে যায়। এইসব পরিবেশকরা টাকার জোরে ছবির পর ছবি কিনে যায় আবার তেমনি টাকা আটকে যাবার আশংকায় ছবিগুলিকে ঝটপট মুক্তি দিতেও দ্বিধা করে না। ফলে এদের হাতে ছবির 'exploitation' হয় না মোটেই—মুড়ি মিছরীর দর এরা এক করে দেয়—সম্প্রতি আমরা এর অনেকগুলি উদাহরণ পেয়েছি। এমন ছবির নাম করতে পারি যা এত কম দিন চালানো হয়েছে এবং এত কম প্রচার করা হয়েছে যে, এখানে মুক্তিলাভ করেছে কিনা অনেক চিত্রামোদী জানতেই পারেনি অথচ বাইরে সে ছবি বেশ নাম করেছে।

ছবি মুক্তি দেওয়ার জন্য চিত্রগৃহের বাছবিচার তো একেবারে উঠেই গেছে, ফলে আজ শহরের সমস্ত চিত্রগৃহই প্রথম মুক্তিগৃহে পরিণত হয়েছে—এর মধ্যে অনেক সিনেমা সুরুচিসম্পন্ন কোন ব্যক্তির পক্ষে যাওয়ার একেবারেই অযোগ্য। আগে যখন স্বত্ব বিক্রীর রীতি চালু হয়নি তখন ছবি ভাল জায়গায় মুক্তি দেওয়া বিষয়ে চাড় থাকতো প্রযোজকদের—কিন্তু এখন তাদের বলবার কিছুই থাকে না; ছবি যত জঘন্য স্থানে মুক্তিলাভ করুক, আর যত সপ্তাহই চলুক তাদের মুখ বুজে থাকতেই হয়।

অনেকক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, যেসব প্রযোজক তাদের আগত ছবির স্বত্ব বিক্রী করে দিতে সমর্থ হয়েছে তারা তাদের সেইসব ছবির দিকে মোটেই নজর রাখে না—বিক্রী যখন হয়েই গেছে তখন ভাল হোক মন্দ হোক এসে যায় না, এমনি একটা ভাব আর কি! একজন প্রযোজক পরপর কখানা অর্থকরী ছবি তুলে নাম করে যার ফলে তার পরবর্তী চারখানি ছবির স্বত্ব তোলার আগেই মোটা টাকাতে বিক্রী হয়ে যায়, কিন্তু এই চারখানি ছবির একখানিও তার পূর্বকৃতিত্বের কোন নিশানাই বহন করেনি—দেখলেই মনে হয় আগাগোড়া ফাঁকি দিয়ে কাজ সারার চেষ্টা হয়েছে। স্বত্ব বিক্রীকারী প্রযোজকদের মধ্যে এভাবটা বেশ ব্যাপক দেখা যায়। নিজে মালিক না থাকলে এরকম হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

নূতন ছবির পরিচয়

জওয়ানী (ন্যাশনাল পিকচার্স)—কাহিনী, সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : বজহৎ মির্জা চাঙগেজী; আলোকচিত্র : মিস্ত্রী বিলিমোরিয়া, শব্দ গ্রহণ : মুলগাওকর, সুরযোজনা : অনিল বিশ্বাস। ভূমিকায় : সুরেন্দ্র, এ আর কাবুলি, শংঘটাপ্রসাদ, কয়ামালি, হুস্ন বানু, গুলজার, জ্যোতি প্রভৃতি। প্রযোজক : মেহবুব। ছবিখানি ডোসানি ফিল্মসের পরিবেশনায় ৩০শে মার্চ থেকে একযোগে নিউ সিনেমা, গণেশ ও পার্ক শো হাউসে মুক্তিলাভ করেছে।

১৯৪২ সালের পুরনো ছবি 'জওয়ানী' এতদিন মুক্তিলাভ যে কেন করেনি তার কারণ অজ্ঞাত, তবে দেখার পর বলতে পারি যে লোকে যখন ছবিখানির কথা ভুলেই গিয়েছিল, তখন আবার মনে করিয়ে না দিলেও চলতো। 'জওয়ানী' তোলার সময় কাঁচা ফিল্মের তেমন টান ধরেনি না হ'লে বলতুম সব বরবাদ করা হয়েছে।

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার বিরুদ্ধে যৌবনের অভিযানই হচ্ছে 'জওয়ানী'র কাহিনী। রায় সাহেব নৌরাছীলাল পঁচাত্তর বছর বয়সে বিবাহ করা ঠিক করলেন আর পাত্রীও মিলতে দেরী হলো না—দেনদার ডাক্তার শান্তিরাম তার শিক্ষিতা আধুনিকা কন্যা কমলাকে বলি দিতে উদ্যত হলেন। এদিকে কমলার সংগে প্রেম কৃষ্ণের। কমলা বিবাহের রাত্রে পালিয়ে গিয়ে কৃষ্ণকে বিবাহ করে এবং আবার যথাসময়ে ফিরে এসে চালাকী করে রায় সাহেবের সংগে তারই পরিচারিকা গুলাবের বিবাহ দিয়ে দেয়—অথচ রায় সাহেবের ধারণা তিনি কমলাকেই বিবাহ করেছেন। শেষে এক জলসা ডেকে কমলা সব কথা প্রকাশ করে বিবাহেচ্ছু বৃদ্ধদের বিরুদ্ধে লম্বা বক্তৃতা দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটায়।

গান আর চুড়ান্ত ছ্যাবলামীই হচ্ছে ছবিখানির আকর্ষণ; গানগুলো শুনতে



কারদারের 'জীবন' চিত্রে নবাগতা সফিয়া

ভাল আর হ্যাংলামী বরদাস্তের বাইরে। অভিনয়ে কাউকেই তেমন উল্লেখ করা যায় না। আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণ কিন্তু খুব প্রশংসা করবার মত।

চাঁদ (প্রভাত ফিল্মস)—কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : ডি ডি কাশ্যপ; গান ও সংলাপ কামার জালালবাদী; আলোকচিত্র : সুরেন্দ্র পাই; শব্দ গ্রহণ : দামলে ও মীরাসাহেব; সুরযোজনা : হুস্নালাল ও ভগৎরাম। ভূমিকা : প্রেমআদীব, বালসরাম, সপ্রু, বেগম পারা, বীণা পাল, সিতারা প্রভৃতি। এম্পায়ার টকীর পরিবেশনায় ৩০শে মার্চ সেণ্ট্রালে মুক্তিলাভ করেছে।

যার যে লাইন নয় তার সেই দিকে ধাওয়াটাই যেন আজকাল রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রভাত ফিল্মস আগে এক

শান্তারামের ছাড়া আর কোন সামাজিক ছবি তোলেনি। শান্তারাম যাবার পর যারা রয়ে গেলেন তারা তুলতেন ধর্মমূলক বা ঐ ধরণের সব সাজপ্রধান ছবি—যাতে তারা নামও করেছিলেন। শান্তারামের অনুপস্থিতিতে আজ তারাই সামাজিক ছবি তোলাতেও হাত দিয়েছেন; কিন্তু সাফল্যলাভ করতে পারেননি, একবার নয়, এই নিয়ে বারবার তিনবার তারা ব্যর্থ হলেন। ফলে গত বছর 'রামশাস্ত্রী' উপহার দিয়ে প্রভাত যতখানি হারানো সম্মান ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল 'চাঁদ' ঠিক ততখানিই দুর্নাম এনে দিলে। 'চাঁদ' হচ্ছে গভর্নমেন্টের অর্ডারী 'প্রোপাগান্ডা' ছবি—সেইজন্যেই আর পাঁচ-জনের মত যাতা করে তোলা হয়েছে কি-না বলতে পারি না। 'চাঁদ' এবছরের সেরা নিকৃষ্টতম ছবি।

গল্পের নায়িকা হচ্ছেন বদমেজাজী যার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে তার ওপর বোমার ভয়ে বাড়ির সব পরিচারক একদিন চলে যায়। নায়ক তখন সেই বাড়িরই একখানি ঘরের ভাড়াটিয়া—ভাড়া না দিতে পারায় সেও গমনোদ্যত, এমন সময়ে নায়িকা নিজের নিঃসঙ্গতায় ভীতা হ'য়ে তাকে থেকে যেতে দিলে। ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রেমের উদয়। মাঝে নায়কের এক পূর্ব প্রণয়িনীর উপস্থিতি যে প্রতিহিংসা নেবার অভিপ্রায়ে নায়ক ও নায়িকার মধ্যে ভুলের প্রাচীর তুলে দিতে সক্ষম হয়। সে ভ্রম একদিন অবশ্য দূর হ'লো কিন্তু নায়িকার পিতা নায়ককে তার কন্যার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করলেন না আর সেই সংগে চালাকী ক'রে নায়ককে একথাও জানিয়ে দিলেন যে, নায়িকাও তাকে বিবাহ ক'রতে চায় না। আবার ভুলের প্রাচীর। নায়ক গেল কলকাতায়। ইতিমধ্যে নায়িকার পিতা ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে নিজের কৃত-কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়। নায়িকা চলে যায় তার প্রণয়ীর খোঁজে। কলকাতায় একদিন বোমাবর্ষণে নায়ক হয় আহত আর তাকে যে হাসপাতালে আনা হয় নায়িকা তখন সেখানকার নার্স; তারপর যথারীতি অনুতাপ, অনুশোচনা ও মিলন।

দৃশ্যাবলীর বাঁধুনী ভারী আলগা, রসকে কোথাও জমতে দেয় না। পাঞ্জাবী সুর ছবিখানি সাফল্য না হওয়ার আর একটি কারণ। নতুন অভিনেত্রী বেগম পারাকে চোখ বুঝে থাকলে লীলা দেশাই ব'লে ভুল হওয়া অস্বাভাবিক হবে না—অসাধারণ হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নায়কের ভূমিকায় প্রেম আদীব চলনসই। অভিনয় উপভোগ্য শুধু বালক রামের—ছেলেটি না থাকলে সারাক্ষণ বসে ছবি দেখাই মুস্কিল।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

এ সপ্তাহে প্যারাডাইস, উত্তরা, দীপক ও আলেয়াতে এক সংগে মুক্তিলাভ ক'রছে কারদার প্রডাকসন্সের 'জীবন' আর ভূমিকায় আছেন মেহতাব, ওয়াস্তি, নির্মলা, সফিয়া, আনোয়ার প্রভৃতি। এর গল্পটায় অভিনবত্ব আছে আর সংগীতাংশও একটা বিশেষ আকর্ষণ বলে পরিগণিত হবে।

* * *

এই শুক্রবার থেকে শ্রী ও পূরবীতে দেখানো হবে ইউরেকা পিকচার্সের 'দোটানা'—জহর, রতীন, শৈলেন চৌধুরী, রবি রায়, শ্যাম লাহা, রমা ব্যানার্জি, প্রভা এবং লতিকা এতে অভিনয় ক'রেছেন আর পরিচালনা ক'রেছেন নূতন ব্রতী অমূল্য ব্যানার্জি ও প্রতুল ঘোষ।

* * * *

নতুন নাটকের মধ্যে শ্রীরঙ্গমের 'তুলসী দাস', মিনর্ভায় 'ধাত্রী পান্না' আর স্টারে 'শতবর্ষ আগে'র মহলা দেখে মনে হয় তিনটিই বৈশাখের গোড়াতেই মুক্তিলাভ ক'রবে!

* * *

রবীন্দ্র স্মৃতি তহবীলের সাহায্যার্থে আসছে বৈশাখে কলকাতায় কতকগুলি বিশেষ প্রমোদ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে।

বিবিধ

বম্বে টকীজের আগামী ছবির নাম 'প্রতিমা'—জয়রাজের পরিচালনায়; প্রধান ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছেন স্বর্ণলতা, জ্যোতি, দিলীপ আর শা নওয়াজ।

* * *

যুক্তরাষ্ট্রের সাড়ে বারো কোটি অধিবাসীর মধ্যে সপ্তাহে গড়পড়তা সাড়ে সাত কোটি জন সিনেমা দেখে।

* * *

মঞ্জুলা, তার স্বামী করণ দিওয়ান ও তার ভাই বালক রামের কোন পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ এরা কোথায় উধাও হ'য়ে গেছে।

* * *

স্বর্ণলতা ও কেসী বিলিমোরিয়ার মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হ'য়ে গেছে—এক বছরও হয়নি বিবাহ হ'য়েছিল।

* * *

বম্বে টকীজের কাহিনী ও সংলাপ রচয়িতা বিখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক ভগবতী-চরণ বর্মা শীঘ্রই চিত্র প্রযোজনা ও পরিচালনা কাজে হাত দিচ্ছেন। তাঁর প্রথম ছবির নাম 'আকাশ দীপ' আর ভূমিকায় থাকবেন সুরৈয়া, নয়মপল্লী প্রভৃতি।

* * *

নিউইয়র্কে গত চার বছর ধরে একাদিক্রমে অভিনীত 'লাইফ উইথ ফাদার' নামক একখানি নাটকের চলচ্চিত্র স্বত্বের দাম উঠেছে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা।

* * * *

দেবকী বসু 'মেঘদূত' তোলায় ব্যস্ত থাকবেন ব'লে শেষ পর্যন্ত 'কৃষ্ণলীলা'র পরিচালনা তাঁর নির্দেশমত অপূর্ব মিত্র ক'রবেন ঠিক হ'য়েছে।

* * *

বিখ্যাত কার্টুন চিত্র নির্মাতা ওয়াল্ট ডিস্নী 'থ্রী ক্যাভেলিয়ার্স' নামে ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে একখানি ছবি তুলেছেন যাতে মানুষ শিল্পীদের সংগে পাশে পাশে থেকে তাঁর কার্টুন চরিত্র ডোনাল্ড ডাক অভিনয় করেছে। ছবিখানি দেখে সাংবাদিকরা বলছেন যে ছবির মুখে বাণী ফোটার পর এইটেই সবচেয়ে যুগান্তকারী আবিষ্কার।

সাহিত্য-সংবাদ

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

হাওড়া এসেমব্লীর সাহিত্য-বিভাগ দ্বারা পরিচালিত এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হইবে। **প্রবন্ধের বিষয়—'জাতীয়তাবোধে রবীন্দ্র-নাথের দান।'**

১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীকে রৌপ্যপদক দেওয়া হইবে। ২০০০ কথার মধ্যে সম্পূর্ণ করিতে হইবে। কোন প্রবেশ-মূল্য নাই। প্রবেশের শেষ দিন ১২ই বৈশাখ, ১৩৫২। —সাহিত্য-সম্পাদক, হাওড়া এসেমব্লী, ২৪, কালী কুণ্ডু লেন।

বেহালা যুব-সম্প্রদায় অনুষ্ঠিত সত্যেন্দ্র স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল

বিষয় — সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকা

১। "গৃহকর্ম"—কুমারী লীলা চ্যাটার্জী, শ্যামাসুন্দরী বিদ্যাপীঠ, বেহালা।
২। "শিল্প"—শ্রীরমেশচন্দ্র বিশ্বাস, রাজা সূর্যকুমার ইনস্টিটিউশন, রাজবাড়ী, ফরিদপুর।
৩। "সমাজ-গঠনে নারী"—কুমারী বেলা বসু, হুগলী কলেজ, হুগলী।
৪। "আধুনিক সভ্যতা"—শ্রীশীতলকুমার মুখোপাধ্যায়, রিপণ কলেজ, কলিকাতা।

শ্রীনির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়,
সম্পাদক, সাহিত্য বিভাগ পক্ষে।

খেলাধূলা

ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট দলের সিংহল ভ্রমণ শেষ হইয়াছে। খেলোয়াড়গণ শীঘ্রই ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবেন। ভারতীয় ক্রিকেট দল সিংহলে মাত্র পাঁচটী খেলায় যোগদান করেন। দুইটী খেলায় বিজয়ী ও তিনটী খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করিয়াছেন। ভারতীয় দল কোন খেলায় পরাজিত হন নাই সত্য, কিন্তু বিভিন্ন খেলায় যেরূপ উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবেন বলিয়া সকলে আশা করিয়াছিলেন সেইরূপ পারেন নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এমন কি যদি বলা হয় খেলোয়াড়গণ ভারতীয় ক্রীড়ামোদীদের হতাশ করিয়াছেন তাহা হইলে কোনরূপ অন্যায় হইবে না। প্রকৃতপক্ষেই সিংহলের ক্রিকেট খেলার স্ট্যান্ডার্ড খুব উচ্চস্তরের নহে, অথচ সেই দেশে গিয়া কোন ভারতীয় খেলোয়াড় কি ব্যাটিং, কি বোলিং কোন বিষয়ে চমকপ্রদ কিছু করিতে পারিলেন না, ইহা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। ইতিপূর্বে সিংহলের ভারতীয় ক্রিকেট দলের তিনটি খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্নে অবশিষ্ট দুইটি খেলার ফলাফল দেওয়া হইলঃ—

(১) ভারতীয় ক্রিকেট দলের সহিত গল ক্রিকেট দলের দুইদিনব্যাপী খেলা হয়। এই খেলায় ভারতীয় দল এক ইনিংস ও ৫৫ রাণে জয়লাভ করিয়াছেন। ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেন অমরনাথ। গল ক্রিকেট ক্লাব প্রথমে খেলিয়া ১১৬ রাণে প্রথম ইনিংস শেষ করে। পরে ভারতীয় দল খেলিতে আরম্ভ করিয়া ৫ উইকেটে ২৯২ রাণ করিতে সক্ষম হয়। অমরনাথ উক্ত রাণেই ইনিংস শেষ করিয়া গল ক্রিকেট দলকে দ্বিতীয় ইনিংস খেলিবার সুযোগ দেন। ফলে গল ক্রিকেট ক্লাব দ্বিতীয় ইনিংস ১২২ রাণে শেষ করে। নিম্নে ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

গল ক্রিকেট ক্লাব প্রথম ইনিংসঃ—১১৬ রাণ (জয়সিংহ ২২, অমরসিংহ ২৯, সালভাদু রায় ২৫; সি এস নাইডু ৩৫ রাণে ৫টি, অমরনাথ ১৪ রাণে ২টি ও মানকড় ৩৬ রাণে ২টি উইকেট পান)।

ভারতীয় ক্রিকেট দল প্রথম ইনিংসঃ—৫ উইঃ ২৯২ রাণ (নিম্বলকার ৬৪, মানকড় ৪০, অমরনাথ ৫২, হাজারী নট আউট ৬৪, আর এস মোদী ৫৪)।

গল ক্রিকেট ক্লাব দ্বিতীয় ইনিংসঃ—১২২ রাণ (জয়সিংহ ২৪, করুণারত্নে ২১; রঙ্গাচারী ২৩ রাণে ৪টি, অমরনাথ ১৬ রাণে ৩টি ও সি এস নাইডু ৩০ রাণে ২টি উইকেট পান)।

(২) ভারতীয় ক্রিকেট দলের সহিত নিখিল সিংহল ক্রিকেট দলের তিনদিনব্যাপী খেলা হইবার কথা ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রথম দিনের খেলা স্থগিত রাখিতে বাধ্য করে ও দ্বিতীয় দিনেও বেলা ১টা ৩০ মিনিটের পূর্বে খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয় নাই। বিজয় মার্চেণ্ট খেলায় অধিনায়কত্ব করেন। তিনি টসে জয়ী হইয়াও সিংহল দলকে ব্যাটিং করিতে দেন। ফলে সিংহল দল খেলা আরম্ভ করিয়া ১০৭ রাণে প্রথম ইনিংস শেষ করে। বিনু মানকড়ের মারাত্মক বোলিং সিংহল দলের এইরূপ শোচনীয় পতন সম্ভব করে। ভারতীয় দলও বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন না। প্রথম ইনিংস ১৭৯ রাণে শেষ করেন। পরে সিংহল দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিয়া দিনের শেষে ৭ উইকেটে ২২৫ রাণ করিতে সক্ষম হয়। সিংহলের খ্যাতনামা খেলোয়াড় শতশিবম শতাধিক রাণ করেন। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল—

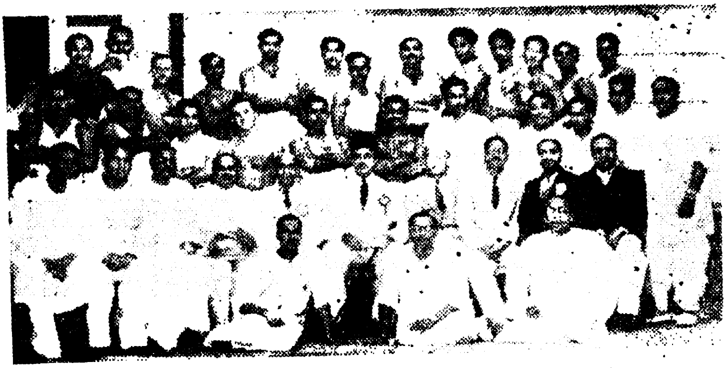
নিখিল সিংহল দল প্রথম ইনিংসঃ—১০৭ রাণ (মানকড় ৩৫ রাণে ৮টি উইকেট পান)।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রথম ইনিংসঃ—১৭৯ রাণ।

নিখিল সিংহল দ্বিতীয় ইনিংসঃ—৭ উইঃ ২২৫ রাণ (শতশিবম ১১১ রাণ)।

হকি

কলিকাতা হকি লীগের সকল খেলা এখনও শেষ হয় নাই। তবে আমরা যেরূপ আশা করিয়াছিলাম, ফলাফল একরূপ তাহাই দাঁড়াইয়াছে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব মোট ২৭ পয়েন্ট পাইয়া লীগ চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে। মহমেডান দলের এই সাফল্য প্রশংসনীয়। হকি লীগ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া এইবার প্রথমবার চ্যাম্পিয়ানশিপের গৌরব অর্জন করিল।



বাগবাজার জিমন্যাসিয়াম পরিচালিত এশিয়াটিক ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ব্যায়াম বীরগণ ও পরিচালকগণ।

তবে দুঃখের বিষয় এই দলটি বাঙলা দেশের হইলেও, ইহার অধিকাংশ খেলোয়াড়ই অবাঙালী। সুতরাং ইহাদের সাফল্যে বাঙালী খেলোয়াড়দের গৌরব অনুভব করিবার কোনই কারণ নাই।

বেটন হকি কাপ প্রতিযোগিতার তালিকায় কয়েকটি বাহিরের দলের নাম দেখিয়া সত্যই আনন্দ হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল, নিখিল ভারত অনুষ্ঠান বলিয়া এই প্রতিযোগিতার যে নাম আছে, তাহা এইবারে কতকাংশে রক্ষা পাইল। কিন্তু সম্প্রতি যে সকল সংবাদ আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহা খুবই নৈরাশ্যজনক। শোনা যাইতেছে, এই সকল দলের অনেকেই নাকি প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবে না। কেন করিবে না, জানা যায় নাই। তবে শোনা যায়, যাতায়াতের অসুবিধার জন্যই নাম দিয়া দলের পরিচালকগণ বর্তমানে পিছাইয়া যাইতেছেন। ঠিক কি কারণ জানিতে পারিলে সুখী হইব।

সন্তরণ

সন্তরণ মরসুম আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতার সন্তরণ প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালকগণ শিক্ষা ও অনুশীলনের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। কলিকাতা কর্পোরেশনের পুষ্করিণী পরিষ্কার কার্য গত তিন মাস হইতে আরম্ভ হইয়া এখনও শেষ হয় নাই। কবে হইবে, তাহারও কোন ঠিক নাই। প্রত্যেক পুষ্করিণী হইতে জল তুলিয়া ফেলা হইয়াছে। কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে অনেকেই এই সকল সন্তরণ প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত অথচ সংস্কার কার্যের জন্য সন্তরণ আরম্ভ হইতে পারিতেছে না—ইহা কেন যে তাঁহাদের দৃষ্টিতে পড়িতেছে না, বুঝি না। আর আরও আশ্চর্য লাগে সাঁতারুদের কথা যখন চিন্তা করি। তাঁহারা কি এই বৎসর একেবারেই সাঁতারে যোগদান করিবেন না?

কুস্তি

বাঙলার কুস্তি পরিচালনার ভার গ্রহণের অধিকার লইয়া বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন ও বঙ্গীয় অপেশাদার কুস্তি সঙ্ঘের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল, শোনা যাইতেছে—ইহার একটা মীমাংসা হইয়াছে। বঙ্গীয় অপেশাদার কুস্তি সঙ্ঘই অধিকার লাভ করিয়াছে। এই সংবাদ যদি সত্য হয়, আমরা অন্ততপক্ষে বিশেষ খুসী হইব। কারণ প্রকৃতপক্ষেই বাঙলা দেশে কুস্তি প্রচার ও উন্নতির পথ রচনা করিয়াছে বঙ্গীয় অপেশাদার কুস্তি সঙ্ঘ। সুতরাং সেই সঙ্ঘকে অধিকার না দিয়া খুবই অবিচার করা হইয়াছিল।

নববর্ষ উৎসব

পহেলা বৈশাখ তারিখে বাঙলার বিভিন্ন ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান নববর্ষ উৎসব পালন করিয়া থাকে। এই উৎসব পালনের প্রথম ব্যবস্থা হয় হাওড়ায় তের বৎসর পূর্বে। হাওড়ার সকল ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান একত্র হইয়া হাওড়া ফেডারেশন অফ এসোসিয়েশনস গঠন করিলে এই অনুষ্ঠান বিরাট আকার ধারণ করে ও সারা বাঙলার ক্রীড়ামোদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার পর হইতে অর্থাৎ ১৯৩৮ সাল হইতে এই অনুষ্ঠান বাঙলার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। ১৯৪১ সালে বিশ্বগ্রাসী সমরের জন্য অনুষ্ঠানের উৎসাহ একেবারে কমিয়া যায়। কেবল কলিকাতার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ইহা পালন করিতে থাকে। ১৯৪২ সালে জাতীয় ক্রীড়া-সঙ্ঘ ও কিশোর বাঙলা এই অনুষ্ঠান সারা বাঙলায় প্রচলন করিবার ভার গ্রহণ করে। ইহাদের একনিষ্ঠ প্রচারের ফলে বর্তমানে ইহা পুনরায় সারা বাঙলার ক্রীড়ামোদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আরও সুখের বিষয় যে, জাতীয় ক্রীড়া-সঙ্ঘের গঠিত কর্মসূচী অনুসরণ করিয়া সারা বাঙলায় এইবারে পহেলা বৈশাখ উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই জন্য নিখিল বঙ্গ নববর্ষ উৎসব কমিটি গঠিত হইয়াছে। আমরা এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

উৎসর্গ কবিতা

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তী

বহু কবি তাঁহাদের কাব্যের লক্ষ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর কবিতা আলোচনা করিলে আমরা কবি-মানস সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য অবগত হই।

পাঠকের সহিত কবির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। কবি কাব্য রচনা করেন কাহার জন্য —নিজের মনস্তুষ্টির জন্য, না পাঠকের পরিতৃপ্তির জন্য? তাই দেখা যায়, প্রত্যেক কবিই নিজের কাব্য-প্রচেষ্টার একটি করিয়া কৈফিয়ৎ দেন; এই কৈফিয়ৎকে তাঁহার সমগ্র কাব্যের অন্তর্নিহিত মর্মলোকের রহস্য-স্বরূপ গ্রহণ করা চলে।

কবি-রহস্য প্রকাশের এই প্রচেষ্টা কেবল এ-যুগের কাব্যেরই বিশিষ্টতা নয়, প্রাচীন কাব্যেও আমরা কবির মঙ্গলাচরণে এই আকুতির পরিচয় পাই। প্রাচীন কবিগণ দেবদেবীর উদ্দেশে তাঁহাদের কাব্য বা নাটক উৎসর্গ করিতেন এবং দেবদেবীকে প্রণাম জানাইয়া কাব্য বা নাটক রচনা আরম্ভ করিতেন। তাঁহাদের এই বন্দনা যে কাব্যে মণ্ডিত হইত, তাহা ভাবের সমৃদ্ধিতে, ভাষার গৌরবে ও ছন্দো-লালিত্যের নিপুণতায় অপূর্ব। তৎকালে এরূপ বন্দনার একটি সার্থকতাও ছিল। ইহা পাঠকের মনকে দৈনন্দিন জীবনের অভ্যস্ত পথ হইতে দূরে লইয়া যাইত এবং কাব্য উপভোগের জন্য তাহাকে প্রস্তুত করিত। উদাহরণস্বরূপ রঘুবংশের প্রথম শ্লোকটি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে:—

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ॥

বাক্য এবং অর্থের মত নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত জগতের জনক-জননীস্বরূপ পার্বতী ও শঙ্করকে বাক্য ও অর্থের সম্যক্ জ্ঞানের নিমিত্ত বন্দনা করি। শ্লোকটি পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা একটি অনির্বচনীয়তা অনুভব করি এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ব্রহ্মসাযুজ্যের, প্রকাশের অতীত সেই দুর্লভ রসানুভূতির চেতনা আমাদের মনকে স্পর্শ করিতে থাকে। অর্থগৌরবে তুলনীয় না হইলেও কাব্যাদর্শের প্রথম শ্লোকটি উল্লেখযোগ্য।

চতুর্মুখমুখাম্ভোজবনহংসবধূর্মম—
মানসে রমতাং নিত্যং সর্বশুক্লা সরস্বতী।

ব্রহ্মার বদন-কমলবনের হংসবধূরূপিণী সর্বশুক্লা সরস্বতী আমার মানসে নিত্য [illegible]

হয় না, আমাদের মনে আপনা হইতেই সর্বশুক্লা সরস্বতীর একটি অপরূপ মূর্তি ভাসিয়া উঠে।

উক্ত শ্লোকগুলিকে উৎসর্গ জাতীয় কবিতার পর্যায়ে ফেলা যায়; তাহার কারণ, এইরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াই কবি কাব্য বা নাটকের বস্তুনির্দেশ অর্থাৎ কাব্য বা নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেন। এই পরিচয়ই উৎসর্গ-কবিতার প্রাণবস্তু। বস্তু-নির্দেশই হউক বা উৎসর্গ-কবিতায় কাব্য কিংবা নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ই হউক, কবির উদ্দেশ্য বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পাঠককে খানিকটা আভাস দেওয়া। কাব্যের বেলায় কবি নিজে এবং নাটকের বেলায় সূত্রধারের সাহায্যে ইহা সাধিত হইত। যুগধর্ম কবির প্রকাশ-রীতিকে প্রভাবান্বিত করে বটে, তবে সব যুগেই কবির মন অত্যন্ত আত্মসচেতন। নিজের সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অভিমত কি, তাহা তিনি না বলিয়া পারেন না; কেহ হয়ত নিজের কথা অত্যন্ত বিনয় সহকারে বলেন, কেহ-বা আবার বিনয়ের ধার দিয়াও যান না। রঘুবংশের প্রথমে মন্দঃ কবিযশঃ-প্রার্থী কবি বলিতেছেন, কোথায় বিরাট সূর্যবংশ আর কোথায়ই-বা অল্পাশ্রয়ী তাঁহার মন? মোহবশে তিনি ভেলায় চড়িয়া দুস্তর সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী হইতেছেন! পক্ষান্তরে মালতীমাধবে ভবভূতি নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, ইহার সহিত তাহার তুলনা করিলে আমরা বিস্মিত হই। কবি বলিতেছেন—

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥

যে হেয় ব্যক্তিরা আমার কাব্যে অবজ্ঞা প্রকাশ করে, তাহারা জানে কি? সুতরাং তাহাদের জন্য আমার এই উদ্যম নহে। আমার সমকক্ষ কোন লোক ভাবিকালে জন্মিবে, বা হয়ত এখনও কোথাও আছে, তাহারই জন্য এই প্রচেষ্টা। কেননা, কালও অসীম, পৃথিবীও বিপুলা।

নিজের সম্বন্ধে এত বড় উক্তি আর কোন কবি করিয়াছেন কি না সন্দেহ। কবির অহঙ্কার অবশ্য সার্থক হইয়াছে; তাঁহার সমানধর্মা বহু পাঠক মিলিয়াছে, যাঁহাদের নিকট তাঁহার নাটক উপযুক্ত সমাদর লাভ করিয়াছে। যাহা হউক একটু তলাইয়া [illegible]

এই আত্মম্ভরিতাসূচক উক্তির মাঝে একটি গভীর সত্য নিহিত আছে। তাই এই, কবি কাব্য রচনা করেন প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারাই সমানধর্মা পাঠকের জন্য আর কাহারও জন্য নয়। এরূপ পাঠক তাঁহার সমসাময়িক হন ভাল কথা, না হইলেও ক্ষতি নাই; কেননা অনন্তকালের মধ্যে এবং বিপুলা পৃথিবীতে তাঁহার সমানধর্মা একজন পাঠক নিশ্চয়ই দেখা দিবে যাহার পরিতোষেও কবি কৃতকৃতার্থ বোধ করিতে পারিতেন।

এই ভাবে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাইব, প্রতি যুগেই কবি নিজের কথা নিজে বলেন, প্রাচীনকালে বলিতেন কাব্যের সূচনায় মঙ্গলাচরণে অথবা নাটকের প্রস্তাবনায়, আর এখন বলেন উৎসর্গ কবিতায় বা উৎসর্গ-জাতীয় কবিতায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ. ই. হাউজম্যানের একটি উৎসর্গ জাতীয় কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি:—

They say my verse is sad: no wonder;
    Its narrow measure spans
Tears of eternity and sorrow,
    Not mine, but man's.

This is for all ill-treated fellows
    Uuborn and unbegot,
For them to read when they're in trouble,
    And I am not.

এই বেদনার সুরই এ. ই. হাউজম্যানের কাব্যের মূল সুর। এইটুকু হইতেই আমরা তাঁহার কাব্যের সম্যক পরিচয় পাই। যে সমস্ত নিপীড়িত মানব এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই, কবি যখন জীবিত থাকিবেন না, গভীর দুঃখ-বেদনার মাঝে কবির কাব্য পাঠ করিয়া তাহারা সান্ত্বনালাভ করিবে। তাহারাই তো কবির সমানধর্মা, তাহাদের জন্যই তাঁহার কাব্য।

রবীন্দ্রনাথও এই ভাবে তাঁহার কাব্যের মর্ম উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার একটিমাত্র কবিতা উল্লেখ করিব, কারণ সেটি তাঁহার সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা, এক কথায় পাঠকের কাছে কবির আত্ম-পরিচিতি। মহুয়ার পাতা খুলিতেই কবির হস্তের অনুলিপি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে:—

শুধায়োনা, কবে কোন্ গান
কাহারে করিয়াছিনু দান।
    পথের ধূলার পরে
    পড়ে আছে তারি তরে
যে তাহারে দিতে পারে মান।

তুমি কি শুনেছ মোর বাণী,
হৃদয়ে নিয়েছ তারে টানি'?
    জানিনা তোমার নাম,
    তোমারেই সঁপিলাম
আমার ধ্যানের ধরাখানি॥

কবির গানগুলি ধুলোয় পড়িয়া আছে এমন একজনের প্রতীক্ষায় যে তাহার উপযুক্ত মূল্য দিতে পারিবে। কবি তাহাকে চেনেন না কিন্তু সে-ই কবির বাণী উপলব্ধি করিবে। অনন্তকালের মধ্যে এবং বিপুলা পৃথিবীতে এমনি একজন পাঠকের উদ্দেশেই তিনি তাঁহার ধ্যানের ধনস্বরূপ কাব্য উৎসর্গ করিতেছেন। এই পাঠকই কি তাঁহার সমানধর্মা নহে যাহার কথা ভবভূতি বলিয়াছেন?

নিজের কাব্য সম্বন্ধে প্রত্যেক কবির মনেই সংশয় থাকে। তাঁহার রচিত কাব্য ভবিষ্যতে সুধীবৃন্দ সমাদর করিবে কি না এ চিন্তা কবিমাত্রেরই হয়। এই বিশ্বমণ্ডলীর পরিতোষ লাভ না করিলে কোন কবিই নিজের প্রকাশকে সার্থক বলিয়া মনে করেন না। এই সংশয় এবং এই চিন্তা হইতেই উৎসর্গ কবিতা বা উৎসর্গ জাতীয় কবিতার উদ্ভব। প্রাচীন-কালে দেবদেবীকে প্রণাম জানাইয়া কবি কাব্য বা নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। আর এ যুগে কবি প্রিয়জন অথবা শ্রদ্ধার পাত্র কিংবা পাত্রীকে কাব্য সমর্পণ করিয়া রচনা আরম্ভ করেন।

নিজের কাব্যের পরিচয় এক একজন এক এক ভাবে দেন, কেহ বা কালিদাসের মত বিনীত নিবেদনে উপহাস্যতার জন্য মার্জনা ভিক্ষা করেন, কেহবা আবার ভবভূতির মত দুর্বিনীত স্পর্ধায় নিরবধি কালের গর্ভে নিহিত সমানধর্মার প্রতীক্ষায় অচঞ্চল থাকেন। কিন্তু প্রত্যেকের লক্ষ্যই পাঠকের দিকে, পাঠক যাঁহার সুর শুনিয়া মুগ্ধ হয় তিনিই বাঁচিয়া থাকেন, বাকি যাঁহারা তাঁহাদের কাব্যের কোন চিহ্নই থাকে না।

বিজ্ঞানের টুকিটাকি

নাইট্রোজেন সার নিয়ন্ত্রণ

'সায়েন্স সার্ভিসে' প্রকাশ, নিউইয়র্কের অন্তর্গত ইথাকাস্থিত কর্নেল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দুইজন বিজ্ঞানী আপেল গাছের পাতা লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। তদনুসারে নিউইয়র্ক সিটি রিসার্চ কর্পোরেশন পাতার রঙের একটি চার্ট তৈয়ার করিয়াছেন। এই চার্টে সাত রকম সবুজ রঙ আছে। আপেল উৎপাদকগণ এই চার্ট দেখিয়া গাছে নাইট্রোজেন কি পরিমাণ আছে, তাহা স্থির করিতে পারিবে। গাছে যদি নাইট্রোজেন বেশী থাকে, তবে ফল-গুলি বড় হইবে, কিন্তু রঙ ভাল হইবে না। সেই অনুসারে ফলের আকার ও বর্ণের সার দেওয়া সম্ভব হইবে। কারণ, ক্রেতাগণ ফলের রঙের দিকেই বেশী আকৃষ্ট হয়; এ পর্যন্ত ম্যাকিণ্টশ নামক আপেলের জন্যই চার্ট প্রস্তুত হইয়াছে। ইউনাইটেড স্টেটসের পূর্বাঞ্চলে ইহার বিশেষ প্রচলন আছে।

—মার্কিন বার্তা

রঞ্জনশিল্পের ক্রমবিকাশ

শ্রীভূপেশ লোচন সেন

অতি প্রাচীনকাল হইতেই সকল জাতি রঙগীন বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া আসিতেছে। রংএর প্রয়োজনীয়তা যদিও তখন বিশেষ জানা ছিল না তবুও উহার আকর্ষণ যথেষ্ট ছিল।

বিবিধ রং পর্যবেক্ষণ করিয়া মানুষের অন্তরেও রঙ্গীন জগৎ গড়িয়া তুলিবার বাসনা জাগিয়া উঠিল। রামধনুর সপ্তরশ্মির বিস্ময়কর রূপ রঞ্জন শিল্পের কল্পনা আনিয়া দিল। 'ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়'—এই ধারণায় ব্রতী হইয়া মানুষ নানাবিধ উপায়ে রঞ্জনশিল্পের ভিত্তি স্থাপন করিল।

নানা উপায়ে গাছ গাছড়ার ছাল হইতে তাহার রস নিষ্কাসন করিয়া রং উৎপাদন করিবার প্রথা বহু পুরাকালেও প্রচলিত ছিল। গাছের কষায় রসের সংস্পর্শে কাপড়ের উপর যে দাগ স্থায়িভাবে রহিল, তাহা হইতে পাকা রং আবিষ্কার করিবার ইচ্ছা প্রবলতর হইল। নীল চাষের কথা হয়তো অনেকেই শুনিয়াছেন। এই শিল্পের ভগ্নাবশেষ আজও বাঙলা দেশের বহু স্থানে দেখা যায়। Indigofera Tinctoria নামক একপ্রকার গাছ হইতে নীল রং তৈয়ারী করা হইত। সাধারণ গ্রাম্য পচন প্রণালী (Fermentation) দ্বারা নীল উৎপাদন করা হইত। এই নীল রংয়ের প্রচলন এককালে এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, শুধু ভারতে নহে, সুদূর বিদেশেও রপ্তানী হইত। নীলের চাষ করিয়া অনেকে যেমন অর্থোপার্জন করিয়াছিল তেমনই প্রাচীন ভারতের রঞ্জন শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, এই শিল্পের কল্যাণে বহু লোকের জীবিকা নির্বাহ করিবার একটা উপায় হইয়াছিল।

সমসাময়িক কালে আমেরিকায় Madder নামক গাছের শিকড় হইতে Alizarine নামক অমূল্য রং উৎপাদন করা হয়। ইহার পাকা লাল রং জগদ্বিখ্যাত; আজও অনেক স্থানে ইহার বহুল প্রচলন আছে। ইহার কিছুকাল পরেই Logwood নামক গাছের রস হইতে অতি পাকা কাল রং আবিষ্কৃত হয়। নীল, **Alizarine** ও **Logwood Extract**—এই তিনটি উদ্ভিদজাত রং প্রাচীন রঞ্জনশিল্পের উপকরণ হইয়াছিল।

ক্রমেই বিজ্ঞানের উন্নতির সংগে সংগে রঞ্জনশিল্পের নূতন আর এক অধ্যায় আরম্ভ হইল। গাছগাছড়া হইতে রং নিষ্কাসন না করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা দ্বারা উদ্ভিদজাত রংগের রাসায়নিক আভ্যন্তরিক গঠন (Chemical Structure) নির্ণয় করিয়া সেই প্রকার রং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে (Synthetically) তৈয়ারী করিবার মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। তাহারই ফলে কৃত্রিম রং-এর সৃষ্টির ফলে রঞ্জনশিল্পের নূতন এক পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। বৈজ্ঞানিক উপায়ে লব্ধ নীল (Synthetic Indigo) পৌরাণিক দেশীয় গাছের নীলকে হারাইয়া দিল। নকলের নিকট আসল হার মানিয়া বিদায় লইল। ইহার কিছুদিন পরেই যখন পার্কিন সাহেব (Perkin) আলকাত্‌রা হইতে তাঁহার জগদ্বিখ্যাত (Mauve) রং আবিষ্কার করিলেন তখন বৈজ্ঞানিক মহলে এক বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। বহু জার্মান ও ইংরেজ বৈজ্ঞানিক আলকাত্‌রা (coal-tar) হইতে নানাবিধ মনোরম রং আবিষ্কার করিলেন। সংগে সংগে রঞ্জনশিল্প ও রঞ্জনপ্রণালী পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইল।

ক্রমে যতই মানুষের রং-এর লিপ্সা বৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই নানাবিধ রং আবিষ্কারে মন নিয়োজিত হইতে লাগিল। তখন সাধারণ কাঠের জ্বালানী দ্বারা জল গরম করিয়া তাহাতে রং গুলিয়া কাপড় রং করা হইত। রং পাকা করিবার জন্য রঙের কারিগরগণ চূণ (Lime) অথবা তুঁতে (copper sulphate) ব্যবহার করিতেন। এই প্রকারে কাপড়ের রং পাকা করিবার নানাবিধ প্রণালী যেমন সৃষ্টি হইতে লাগিল তেমনই বৈজ্ঞানিকগণ রাসায়নিক উপায়ে পাকা রং তৈয়ারী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সকল গবেষণার ফলে আজ রঞ্জনশিল্পের এত দ্রুত উন্নতি হইয়াছে যে তাহা কল্পনা করা যায় না।

বিবিধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে লব্ধ পাকা রং আবিষ্কার হওয়ার সংগে সংগে রঞ্জন প্রণালীর উন্নতি হইতে লাগিল। জ্বালানী কাঠের চুলা দ্বারা জল গরম করিয়া রং করিবার সাধারণ প্রণালী ক্রমশ শেষ হইয়া আসিল। নানা প্রকার যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইল। সেই সংগে বৈদ্যুতিক শক্তি (Electric Power) আবিষ্কৃত হইলে সকল কাজই কলে চলিতে লাগিল।

এইভাবে ক্রমশ গ্রাম্য রঞ্জনাগার হইতে বিশাল মিলের কল্পনা সিদ্ধ হইল। আজ শুধু ভারত কেন পৃথিবীর সর্বত্রই বৈজ্ঞানিক উপায়ে রং করিবার নূতন প্রণালীতে বৃহৎ বৃহৎ মিল চলিতেছে। এখনও তবু আমাদের তাঁতিগণ তাহাদের নানাবিধ কারুশিল্পের (cottage industries) জন্য নিজেরাই হাতে সূতা রং করিয়া থাকে; তবে তাহা অতি সামান্য।

কৃত্রিম রঙের আবিষ্কারের ফলে শুধু তুলার কাপড়ই রং করিবার স্থান পায় নাই—রেশম, পশম, চামড়া, কাগজ প্রভৃতিও স্থান পাইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বস্ত্রাদি রঞ্জন ব্যতীত কৃত্রিম রং নানা প্রকার কাজে লাগে। নানাবিধ বহুমূল্য ঔষধ, রমণীর ওষ্ঠরঞ্জক (Lip Stick), সিন্দুর, ময়রার দোকানের মিষ্টি ও সরবৎ প্রভৃতি বিষয়ে কৃত্রিম রঙের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

রুশিয়ান বৈজ্ঞানিকগণ সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছেন যে, তুলার গাছে রঙ্গীন তুলার সৃষ্টি হইতে পারে। ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্যজনক। দুই-তিন প্রকারের রং-এর তুলা গাছে ফলিতেও দেখা গিয়াছে। জানি না, হয়তো ভবিষ্যতের রঞ্জনশিল্পে এই রঙ্গীন তুলার একটি বিশেষ স্থান থাকিবে।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আজও ভারতে বিরাটভাবে কৃত্রিম রং তৈয়ারী করিবার পরিকল্পনা সিদ্ধ হইল না। প্রতি বৎসরই বিদেশ হইতে কোটি কোটি টাকার রং এদেশে আমদানী হইতেছে। ভারতের নিজস্ব রং দ্বারা আজ আর রঞ্জনশিল্প চলিতেছে না। যদি কৃত্রিম রং তৈয়ারী করিবার কারখানা সৃষ্টি হইত, তবে যেমন একাধারে রঞ্জনশিল্পে বহু লোকের অন্নের সংস্থান হইতেছে, তেমনই ঐ সকল কারখানায় আরও অনেক লোকের জীবিকা-নির্বাহ করিবার উপায় হইত।

দেশী সংবাদ

২৭শে মার্চ—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বড়লাটের সুপারিশযুক্ত ফাইন্যান্স বিলটি ৫৭—৫০ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

ডাঃ বি এন দে'কে কলিকাতা কর্পোরেশনের স্পেশ্যাল অফিসার ও ইঞ্জিনীয়ারিং এডভাইসর হিসাবে কার্য করিতে নিষেধ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্ট এক ইনজাংশন জারী করিয়াছেন।

পাঞ্জাবের খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা এবং ব্যারিষ্টার লালা দুনিচাঁদ গতকল্য পরলোক গমন করিয়াছেন।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরের সময় ভারতের প্রধান সেনাপতি জানান যে, কলিকাতায় গৃহস্থ বাড়ীতে সামরিক লোকজনের অনধিকার প্রবেশ সম্পর্কে গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে পাঁচটি অভিযোগ জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে পাওয়া গিয়াছে।

অদ্য কলিকাতায় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটস্থ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়শন হলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক সুবৃহৎ তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে জানান হয় যে, অফিসার সহ ৪৩০০০০ ভারতীয় সৈন্য বিদেশে যুদ্ধ করিতেছে।

কলিকাতায় লরী চাপা পড়িয়া দুইজন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

২৮শে মার্চ—বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙলা সরকারের মূল বাজেটের কৃষি খাতের ব্যয়-বরাদ্দের দাবী সম্পর্কে ভোট গ্রহণের সময় স্যার নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা ৯৭—১০৬ ভোটে পরাজিত হন। ভোট গ্রহণের পূর্বে মন্ত্রিমণ্ডলীর সমর্থক দলের অনুমান ২১ জন সদস্য বিরোধী দলে গিয়া যোগদান করেন।

সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান মন্ত্রী স্যার গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লা সিন্ধুর সমস্ত কংগ্রেস কর্মীর উপর প্রদত্ত নিষেধাদেশসমূহ প্রত্যাহার করার বিষয় ঘোষণা করেন।

ওয়ার্ধায় চরকা সঙ্ঘের এক বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, যদি সম্ভব হয় ১২৫ বৎসর বাঁচিয়া তিনি জনগণের সেবা করিতে চান।

২৯শে মার্চ—বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্পীকার সৈয়দ নৌশের আলী ঘোষণা করেন যে, নূতন এক মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের কোন কাজ নিষ্পন্ন হইতে পারে না। তিনি পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখেন।

সিন্ধু গবর্ণমেণ্ট ডাঃ চৈতরাম গিদোয়ানী, অধ্যাপক ঘনশ্যাম প্রমুখ ৭ জন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীর মুক্তির আদেশ দিয়াছেন।

বাঙলার বস্ত্র দুর্ভিক্ষ প্রশমনের জন্য গতকল্য বোম্বাই হইতে ১১২৯ গাঁইট কাপড় কলিকাতায় চালান দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতায় প্রত্যহ অন্তত দশ ওয়াগন বোম্বাই কাপড় পাঠান হবে। থাকিবে।

৩০শে মার্চ—বাঙলার গভর্নর মিঃ আর জি কেসি ভারতশাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে প্রদেশের শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, পণ্ডিত গোবিন্দ-বল্লভ পন্থ ও আচার্য নরেন্দ্র দেবকে আমেদনগর ফোর্ট জেল হইতে নৈনী সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

চিমুর ও অস্তি মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ৭ জন বন্দীর তরফ হইতে সম্রাটের নিকট দয়া ভিক্ষা করিয়া যে আবেদন পাঠান হইয়াছিল, উহা

সাপ্তাহিক সংবাদ

৩১শে মার্চ—বাঙলার গভর্নর ১৯৪৫-৪৬ সালের বাৎসরিক ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করিয়াছেন এবং বাঙলার উভয় আইন সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করিয়াছেন।

গত ২৪শে মার্চ শেষ রাত্রে যশোহরের নিকট বাঘুটিয়া গ্রামে একখানি ভারী বোমারু বিমান ভাঙিয়া পড়ায় ৮ জন বে-সামরিক লোক নিহত এবং ১০ জন আহত হইয়াছে।

অদ্য মহাত্মা গান্ধী সেবাগ্রাম হইতে নাগপুরে পৌঁছিয়াছেন।

পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থকে ইংজাতনগর (বেরিলী) সেণ্ট্রাল জেলের ফটকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

বাঙলা সরকারের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বাঙলা সরকার কলিকাতা হইতে বাঙলার বিভিন্ন জেলায় বস্ত্র প্রেরণের জন্য ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করিবেন। বিভিন্ন মহকুমা হাকিমের নিকট বস্ত্রাদি প্রেরণের ব্যবস্থা করিবার জন্য ৪ জন হ্যাণ্ডলিং এজেণ্ট নিযুক্ত করা হইয়াছে।

১লা এপ্রিল—স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু মীমাংসা কমিটির পক্ষ হইতে লণ্ডনে লর্ড ওয়াভেলের নিকট এক তার প্রেরণ করিয়াছেন। উহাতে রাজনীতিক বন্দীদিগের জন্য মুক্তি, ৯৩ ধারা অনুযায়ী শাসিত প্রদেশগুলিতে জন-সাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক গভর্নমেণ্ট পুনঃ-প্রতিষ্ঠা এবং কেন্দ্রে জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবী করা হইয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের যে সকল সংবাদ-পত্রের সম্পাদক বর্তমানে বোম্বাইয়ে রহিয়াছেন, তাঁহারা সম্মিলিতভাবে চিমুর ও অস্তি মামলার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রাণভিক্ষার আবেদন জানাইয়া মধ্যপ্রদেশের গভর্নর ও ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগে তার প্রেরণ করিয়াছেন।

জাতীয় সপ্তাহ উদ্‌যাপন সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী বলেন, আমার মনে হয় যে, বহু ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও আমাদের ত্রয়ী লক্ষ্য সাম্প্রদায়িক ঐক্য, খদ্দর ও স্বরাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠার দিকে ভারত বর্তমানে যতটা আগাইয়াছে এরূপ আর কখনও হয় নাই।

২রা এপ্রিল—কলিকাতার রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে একখানি ট্যাক্সি হইতে, তিনজন ভারতীয় মহিলাকে টানিয়া বাহির করিয়া এক-খানি জিপ গাড়ীতে করিয়া লইয়া যাওয়ার এবং তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়া আসানসোলে নামাইয়া দেওয়ার সংবাদ সত্য কি না সে সম্বন্ধে অদ্য কেন্দ্রীয় পরিষদে নবাব সিদ্দিক আলি খাঁ এক প্রশ্ন করেন। উত্তরে স্যার রিচার্ড টোটেনহ্যাম বলেন যে, সরকার ঐ সম্বন্ধে কোন সংবাদ পান নাই।

বিদেশী সংবাদ

২৭শে মার্চ—পশ্চিম জার্মান রণাঙ্গন—জেনারেল আইসেন হাওয়ার আজ ঘোষণা করেন যে, জার্মানদের প্রধান আত্মরক্ষা ব্যূহ ভেদ করা ন্যায় মিত্রপক্ষের অগ্রগতি রোধ করিতে পারিবে না।

পূর্ব জার্মান রণাঙ্গন—সোভিয়েট বাহিনী পশ্চিম উপকণ্ঠ দিয়া ডানজিগে প্রবেশ করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গন—মার্কিন সৈন্যগণ খাস জাপান হইতে ৪ শত মাইলের মধ্যে অবস্থিত কেরামা দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ করিয়াছে।

২৮শে মার্চ—পশ্চিম জার্মান রণাঙ্গন—বৃটিশ সৈন্যদল রাইন হইতে ২২ মাইল দূরে লীপ খাল তীরবর্তী ডরস্টেন শহরে প্রবেশ করে।

২৯শে মার্চ—বার্নের এক সংবাদে প্রকাশ, জার্মান গভর্নমেণ্ট বার্লিন ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাতস্থানে গমন করিয়াছেন।

পশ্চিম জার্মান রণাঙ্গন—মার্কিন সৈন্যগণ বিখ্যাত শিল্পপ্রধান নগরী মানহাইম দখল করিয়াছে।

৩০শে মার্চ—পূর্ব জার্মান রণাঙ্গন—সোভিয়েট ইস্তাহারে প্রকাশ, লালফৌজ অস্ট্রিয়া সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে। কোসজেগ শহরের উত্তরে সীমান্ত অতিক্রম করা হইয়াছে। লালফৌজ জিনিয়া ও ডানজিগ বন্দর অধিকার করিয়াছে।

পশ্চিম জার্মান রণাঙ্গন—ব্রিটিশ দ্বিতীয় আর্মির সৈন্যগণ আজ কয়েকটি বড় রাস্তা ধরিয়া মধ্য জার্মানীর অভ্যন্তরে অগ্রসর হয়।

৩১শে মার্চ—মার্কিন রাষ্ট্রবিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে লুবলিনের পোলিশ গভর্নমেণ্টকে একটি আসন দিবার জন্য সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট যে অনুরোধ জানাইয়াছেন, মার্কিন গভর্নমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

পূর্ব জার্মান রণাঙ্গন—মার্শাল কনিয়েভের সৈন্যেরা সাইলেসিয়ায় রাতিবর দখল করিয়াছে। রাতিবর ওডার নদীর পশ্চিমতীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকেন্দ্র ও সুদৃঢ় প্রতিরোধ-ঘাঁটি।

১লা এপ্রিল—প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গন—মার্কিন সৈন্যগণ ওকিনাওয়াতে অবতরণ করিয়াছে। এই দ্বীপটি কিউসুর ৩২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। মার্কিন দশম আর্মির সৈন্যদল স্থল ও সমুদ্রপথে আক্রমণ সুরু করিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে স্থল ও জলপথে সম্মিলিত অভিযানে ইহাই বৃহত্তম আক্রমণ।

পশ্চিম জার্মান রণাঙ্গন—জার্মানেরা ব্যাপক-ভাবে হল্যাণ্ড ত্যাগ করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জার্মানীর অভ্যন্তরে মিত্র-পক্ষের ১২টি সাঁজোয়া ডিভিসনের তিন সহস্রাধিক ট্যাঙ্ক বিরাট অভিযান চালাইয়াছে।

পূর্ব জার্মান রণাঙ্গন—ব্রাটিশলাভা হইতে হাঙ্গেরীয়ান-যুগোশ্লাভ সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ৩ শত মাইলব্যাপী রণাঙ্গনে মার্শাল তলবুখিন ও মার্শাল মালিনভস্কির বাহিনী আক্রমণ সুরু করিয়াছে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গন—চীনা সৈন্যগণ সিপাও হইতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া চাউকমে দখল করিয়াছে।

চীন রণাঙ্গন—জাপ নিউজ এজেন্সীর সংবাদে বলা হইয়াছে যে, জাপানীরা দক্ষিণ-পশ্চিম হোনানের নানইয়াং দখল করিয়াছে। উহা মার্কিণ বিমানবহরের সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত ঘাঁটিসমূহের অন্যতম।

২রা এপ্রিল—পশ্চিম জার্মাণ রণাঙ্গন—আমেরিকান ৯ম আর্মি লিপস্টাডটের নিকটে মার্কিন ১ম আর্মির সহিত মিলিত হইয়াছে। এই মিলনের ফলে সমগ্র রুর অঞ্চল মিত্রপক্ষের লৌহবেষ্টনীতে পরিবেষ্টিত [illegible]

স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গ

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

"অশ্বিনীকুমার"

আমাদের দেহকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য যে সুসম খাদ্য)alanced diet) গ্রহণ করা দরকার তাহা াধ হয় আপনারা সকলেই অল্পবিস্তর ানেন। সেই সঙ্গে আর একটা বিষয়েও জর রাখা দরকার;—কিন্তু আমাদের াঙালীদের ভিতর, অনেকেই সে বিষয়ে জর দেন না। অথচ আমাদের দেহকে স্থ ও সবল রাখার জন্য তাহা কোন ংশেই সুসম খাদ্য অপেক্ষা কম প্রয়োজনীয় য়। ইহা হইতেছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। ই সম্বন্ধেই কয়েকটি কথা বলার জন্য এই বন্ধের অবতারণা। এখন এই পর্যন্ত ড়িয়া আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ই মন্তব্য করিবেন যে,—পরিষ্কার-রিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে আবার বলার কি াছে,—ইহা তো সকলেই জানে। কিন্তু ামি বলিব যে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বলিতে ক কি বুঝায় তাহা আপনারা অনেকেই েনেন না। আবার যাহাও-বা জানেন, াহাও সব সময় পালন করেন না। অথচ ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবেই অনেক রাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়।

এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পূর্ণরূপে ামাদের উপর নির্ভর করে। একথা সত্য ।, ছেলেবেলায় আমাদের মায়েরাই প্রথম থম আমাদের পরিষ্কার করিয়া দেন। ন্তু যখন আস্তে আস্তে বয়স বাড়িতে কে তখন আমাদের মার পক্ষে সব সময় ামাদের পরিষ্কার করিয়া দেওয়া সম্ভব ইয়া উঠে না। অতএব বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে ঙ্গে ধীরে ধীরে আমাদের নিজেদেরই রিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা করা উচিত। হাতে আমরা প্রত্যেকেই যে ব্যক্তিগত র্তব্যজ্ঞান লাভ করিব তাহা আমাদের মাজিক জীবনে একটা গভীর রেখাপাত রিবে সন্দেহ নাই। অনেকেই বলিয়া কেন যে, শহর, গ্রাম প্রভৃতির লোকালয়ের ারিপার্শ্বিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার ায়িত্ব হইতেছে Municipality অথবা orporation-এর। হ্যাঁ একথা আমরা ানি এবং মানি। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও লিলে চলিবে না যে, আমাদের যেমন Iunicipality অথবা Corporation-র নিকট দাবী আছে—সেই রকম তাহাদের াছে আমাদের যথেষ্ট দায়িত্বও আছে। বে, সে দায়িত্ব জন্মাইতে পারে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার জ্ঞান ও দায়িত্ববোধের উপর। কারণ আমরা নিজেরাই যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে যত্নবান না হই বা চেষ্টা না করি তাহা হইলে কোন Municipality অথবা Corporation কখনই আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে পারিবে না।

কেন আমরা সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিব, এখন সে বিষয়ে বিশেষ-ভাবে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। প্রথমত আমরা যদি সর্বদা অপরিষ্কৃত হইয়া থাকি তাহা হইলে কেহই আমাদের কাছে আসিবে না—সকলেই আমাদের ঘৃণা করিবে। দ্বিতীয়ত, দেহকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য আমাদের সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার। বীজাণু কাহাকে বলে তাহা বোধ হয় আপনারা জানেন। এই সমস্ত বীজাণু এত ক্ষুদ্র যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত ইহাদের শুধু চোখে দেখা যায় না। এই সব বীজাণুই আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে পীড়িত করে।

শিশুদের কোন রোগ হইলেই বুঝিতে হইবে যে, নিশ্চয়ই সেই রোগের বীজাণু তাহাদের দেহে প্রবেশ করিয়াছে। এই বীজাণুরা হয় খাদ্য ও পানীয়ের সহিত দেহে প্রবেশ করে আর না হয় নিঃশ্বাসের সহিত ঢোকে।

যে সমস্ত বীজাণু আমাদের দেহে রোগের সৃষ্টি করে ও কষ্ট দেয় তাহারা কোথায় বাস করে তাহা কি আপনারা জানেন? ইহারা নোংরা ময়লার ভিতর বাস করে। আমরা যদি ময়লা হাতে খাবার খাই তাহা হইলে সেই ময়লার সঙ্গে ঐ সব বীজাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করিবে এবং আমাদের পীড়িত করিবে। সুতরাং ঐ সমস্ত বীজাণুর হাত হইতে মুক্ত থাকিতে হইলে আমাদের সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকিলে যে কেবল আমাদের দেহের মধ্যে বীজাণু প্রবেশ করিবে তাহা নহে, আমাদের চর্মও তাহার কাজ করিতে পারিবে না। আমাদের চর্মেরও কতকগুলি নির্দিষ্ট কাজ আছে। এই চর্ম যখনই তাহার কর্তব্য কাজ ঠিক মতন করিতে পারে না তখনই আমরা নিজেদের দুর্বল বোধ করি এবং সময় সময় আমাদের দেহ অসুস্থ হইয়া পড়ে। রক্তের সমস্ত দূষিত পদার্থ দেহের বাহির করিয়া দেওয়া চর্মের একটি প্রধান কাজ। আমাদের চারিপাশে যে সমস্ত ধুলা-বালি উড়িয়া বেড়ায় তাহা আমাদের চর্মের উপর লাগিয়া একটি আবরণের সৃষ্টি করে। তাহার ফলে, আমাদের চর্মের উপরকার সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র যাহাকে "লোম-কূপ" বলে—তাহা বন্ধ হইয়া যায়। এই লোমকূপ এত ছোট যে শুধু চোখে দেখা যায় না। এই লোমকূপের ভিতর দিয়াই আমাদের দেহের ভিতরকার ময়লা ঘামের সহিত বাহির হয়। কাজেই যদি আমরা আমাদের দেহের চর্ম উত্তমরূপে পরিষ্কার না করি তাহা হইলে ঐ লোমকূপগুলি তাহাদের কাজ ভাল ভাবে করিতে পারিবে না।

অনেকেই মনে ভাবেন যে, যেহেতু সর্বদা তাঁহাদের গায়ে জামা কাপড় থাকে কাজেই তাহাদের চর্মে ধুলাবালি লাগিতে পারে না। কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভুল। কেননা বাহিরের ধুলা আমাদের গায়ে লাগিতে না পারিলেও আমাদের দেহের ভিতর হইতেই সর্বদা ময়লা বাহির হইতেছে। ঐ সব ধুলা ও ময়লার হাত হইতে আমাদের চর্মকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় খুব ভালভাবে সাবান দ্বারা সমস্ত শরীর ঘষিয়া প্রচুর জলে প্রতিদিন স্নান করা। ইহাতে আমাদের চর্মও পরিষ্কার থাকিবে এবং তাহার কাজও ভালভাবে করিতে পারিবে।

স্নান করার সময় দুটি কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমত, সর্বদা ঠাণ্ডা জলে স্নান করার অভ্যাস করা উচিত। তাহাতে কখনও সর্দি লাগিবে না এবং আমাদের সুস্থ থাকিতে সাহায্য করিবে। দ্বিতীয়ত, স্নান করার পর শুষ্ক তোয়ালে কিংবা গামছা দ্বারা উত্তমরূপে ঘষিয়া ঘষিয়া গা মুছিয়া ফেলা দরকার। ইহাতে নিজেরাও ভাল বোধ করিব এবং আমাদের দেহের চর্মও সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হইবে ও তাহার কর্তব্য কাজ ভালভাবে করিতে পারিবে।

একটা কথা আমাদের সব সময়ই মনে রাখা দরকার যে, আমাদের চর্মে সর্বদা দেহের মধ্য হইতে ময়লা বাহির হইয়া সঞ্চিত হইতেছে বলিয়া উহা অত্যন্ত রোগপ্রবণ অর্থাৎ সহজেই উহার নানা রকম

রোগ হইতে পারে। ইহা ছাড়া বায়ু হইতেও নানারকম পদার্থ সর্বদা আমাদের চর্মে লাগিতেছে। মোট কথা আমাদের চর্মে সর্বদাই বাহিরের নানা রকম পদার্থ বিশেষ করিয়া ধুলা, বালি প্রভৃতি ময়লার সংস্পর্শে আসে বলিয়া সহজেই বীজাণু দ্বারা দূষিত হইতে পারে। সুতরাং আমাদের সর্বদাই সযত্নে চর্মকে পরিষ্কার রাখা উচিত।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মানে যে শুধু আমাদের দেহ পরিষ্কার রাখা তাহা নহে। সেই সঙ্গে আমাদের দেহের প্রত্যেকটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমনকি আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ ও আমাদের নিত্য ব্যবহার্য সমস্ত জিনিস পরিষ্কার রাখা দরকার। চর্মের ন্যায় আমাদের প্রত্যেকের দাঁত এবং জিভও উত্তমরূপে পরিষ্কার করা দরকার। কেননা তাহা না হইলে জিভেও ময়লা বসিয়া রোগের সৃষ্টি করিতে পারে। আবার দাঁত ভাল করিয়া পরিষ্কার না করিলে খাদ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা সকল দাঁতের ফাঁকে জমিয়া পচিয়া থাকে। ঐ সমস্ত দূষিত জিনিস যদি আমরা পরিষ্কার করিয়া না ফেলি তাহা হইলে দাঁত ক্ষয় হইতে আরম্ভ করে। তাহার ফলে দাঁতে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। অবশ্য দাঁত ক্ষয় হইতে আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে দাঁতের যন্ত্রণা হয় তাহা নহে। যখন উহা দাঁতের স্নায়ু পর্যন্ত যাইয়া পেণছায় তখনই যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। দাঁতের ময়লার বীজাণু থেকে অনেক রোগের সৃষ্টি হয়।

কাজেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সুস্থ ও সবল থাকিতে হইলে আমাদের দেহের প্রত্যেকটা অঙ্গের যত্ন গ্রহণ করা দরকার। সেই সঙ্গে আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ, খাদ্য, পানীয় প্রভৃতি সমস্ত জিনিসই সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার। ইহাদের কোন একটিকে বাদ দিলেও আমাদের চলিবে না। সকলের উপরে দরকার আমাদের ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে জ্ঞান ও দায়িত্ব-বোধ।

বিজ্ঞানের খুচরা খবর

এক ইঞ্চি দীর্ঘ একটি রেখাকে ২৫ হাজার-ভাগে বিভক্ত করিলে যত ক্ষুদ্র হয়, পেনিসিলিন চূর্ণকে ততক্ষুদ্র করিতে হইবে।

পুরাতন রোগীর পেশীতন্তু আক্রান্ত হয় এবং সেখান পর্যন্ত রক্তস্রোত বহিতে পারে না। পেনিসিলিন চূর্ণগুলি পেশীতন্তু পর্যন্ত প্রবেশ করে। এই প্রক্রিয়ায় প্রথম চিকিৎসা করা হয় একজন নাবিককে। তাহার ফুসফুস আক্রান্ত হইয়া পরে মস্তিষ্কে পর্যন্ত আক্রান্ত হইয়াছিল। পেনিসিলিন প্রয়োগ করায় রোগ সংক্রমণ এতদূর কমে যে রোগীর ফুসফুস ফেলিয়া দেওয়া সম্ভব হয় এবং মস্তিষ্কের পীড়াও

জনপ্রবাহ ও মানস-সংস্কৃতি

ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

বাস্তব-সভ্যতার উপাদান উপকরণ এবং তাহার সঙ্গে জনপ্রবাহের সম্বন্ধের খানিকটা আভাস লইতে চেষ্টা করা গেল। এইবার মানস-সংস্কৃতি এবং জনপ্রবাহের খানিকটা সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাইতে পারে।

অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয়দের কথাই সর্বাগ্রে বলিতে হয়, কারণ ভারতীয় নিগ্রোবটুদের মানস-সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রায় কিছুই আমরা জানি না। অস্ট্রিক ভাষাভাষী প্রাচীন ও বর্তমান জনদের সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় এবং অনুমান করা যায়, তাহাতে মনে হয় ইহারা অতি সরল ও নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিল। ঐতিহাসিক যুগে ইহাদের বিবর্তন ও পরিবর্তনের গতি ও প্রকৃতি দেখিয়া মনে হয়, ইহাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও সংহতির কিছু অভাব ছিল; সহজেই ইহারা পরের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিত এবং আত্মসমর্পণ করিয়াই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিত। বারবার অধিকতর পরাক্রান্ত জাতির নিকট রাষ্ট্রীয় ও অর্থ-নৈতিক বশ্যতা স্বীকার করিয়াও যে ইহারা নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি আজ পর্যন্তও বজায় রাখিতে পারিয়াছে, তাহাতে মনে হয় এই বশ্যতা স্বীকার করিয়াও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখাই ইহাদের প্রাণশক্তির মূল। বর্তমান শবর বা সাঁওতাল, ভূমিজ বা মুণ্ডা প্রভৃতির প্রকৃতি একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলে মনে হয় ইহারা কিছুটা কল্পনাপ্রবণ, দায়িত্ববিহীন, অলস, ভাবুক এবং কতকটা কাম-পরায়ণও বটে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এত বিবর্তন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য তাহাতে বিশেষ বদলায় নাই।

এই অস্ট্রিক ভাষী আদি-অস্ট্রেলীয়েরা মানুষের একাধিক জীবনে বিশ্বাস করিত এখনও করে। কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার আত্মা কোনও পাহাড় অথবা গাছ অথবা কোন জন্তু বা পক্ষী বা অন্য কোনও জীবকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে, ইহাই ছিল ইহাদের ধারণা; পরবর্তীকালে এই ধারণাই হিন্দু পুনর্জন্মবাদ ও পরলোকবাদে রূপান্তরিত হয়। মৃতদেহ ইহারা কাপড় অথবা গাছের ছালে জড়াইয়া বৃক্ষস্কন্ধে অথবা ডালে ঝুলাইয়া রাখিত বা মাটির নীচে কবর দিয়া তাহার উপর বড় বড় পাথর সোজা করিয়া পুঁতিয়া দিত অথবা স্ত্রীলোক হইলে কবরের উপর লম্বালম্বি করিয়া শোয়াইয়া দিত, গন্দ, কোরক, খাসিয়া প্রভৃতিরা এখনও ঠিক যেমনটি করে। মৃত ব্যক্তিকে মাঝে মাঝে আহার্যও দান করিত, এখনও করে, এবং এই বিশ্বাস ও রীতিই পরবর্তী কালে হিন্দু সমাজে গৃহীত হইয়া শ্রাদ্ধাদি কার্যে মৃতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান ব্যাপারে রূপান্তরিত হয়। লিঙ্গ পূজাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়; 'লিঙ্গ' শব্দটিই ত অস্ট্রিক ভাষার দান এবং কোনও কোনও নৃতত্ত্ববিদ খাসিয়াদের সমাধির উপর যে দীর্ঘাকার পাথর দাঁড় করান এবং শোয়ান থাকে তাহাকে যথাক্রমে লিঙ্গ ও যোনি বলিয়া অনুমানও করিয়াছেন। বস্তুত পলিনেশীয় ভাষায় এখনও 'লিঙ্গ' তাহার সুপরিচিত অর্থেই ব্যবহৃত হয় এবং তাহার তুষ্টি বিধানের চেষ্টাও সুবিদিত। পুশিলুস্কি এই সম্বন্ধে বলিতেছেন,

"The phallic cults, of which we know the importance in the ancient religions of Indo-China, are generally considered to have been derived from Indian Saivism. It is more probable that the Aryans have borrowed from the aborigines of India the cult of Linga as well as the name of the idol. These popular practices despised by the brahmanas were il-known in old times. If we try to know them better, we will probably be able to see clearly why so many non-Aryan words of the family of Linga have been introduced into the language of the conquerors."*

অস্ট্রিক ভাষীরা বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, ফলমূল, ফুল, কোন বিশেষ স্থান, বিশেষ বিশেষ পশু পক্ষী ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া তাহার পূজা করিত; এখনও খাসিয়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল, শবর ইত্যাদি জাতিরা তাহা করিয়া থাকে। বাংলাদেশে পাড়াগাঁয়ে গাছ-পূজা ত এখনও বহুল প্রচলিত, বিশেষভাবে সেওড়া গাছ ও বটগাছ; আর পাথর ও পাহাড় পূজাও একেবারে অজ্ঞাত নয়। বিশেষ বিশেষ ফল ফুল মূল সম্বন্ধে যে-সব বিধি-নিষেধ আমাদের মধ্যে প্রচলিত, যে সব ফল-মূল আমাদের পূজায় অর্চনায় উৎসর্গ করা হয়, আমাদের মধ্যে যে নবান্ন উৎসব প্রচলিত ইত্যাদি, এবং আমাদের দৈনন্দিন অনেক আচার অনুষ্ঠানই এই আদিম অস্ট্রিক ভাষাভাষী জাতিদের ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত এবং একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে ইহাদের অনেকগুলিই কৃষি ও গ্রামীণ সভ্যতার স্মৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। আমাদের আচারানুষ্ঠানে, ধর্ম, সমাজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আজও ধান, কলা, হলুদ, সুপারি, নারিকেল, পান, সিন্দুর, কলাগাছ প্রভৃতি অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে; লক্ষ্যণীয় এই যে, ইহার প্রত্যেকটিই অস্ট্রিক ভাষাভাষী জাতিদের দৈনন্দিন জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। বাংলাদেশে, বিশেষভাবে পূর্ববাংলায় এক বিবাহ ব্যাপারেই 'পানিখিলি', 'গাত্রহরিদ্রা', 'গুটি-খেলা', ধান ও কড়ির স্ত্রী-আচার প্রভৃতি যে-সব অবৈদিক ও অব্রাহ্মণ্য পদ্ধতি-সুলভ অপৌরাণিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি দেখা যায় তাহাও ত এই কৃষি সভ্যতা ও কৃষি সংস্কৃতির স্মৃতিই বহন করে। ধান্যশীর্ষপূর্ণ যে লক্ষ্মীর ঘটের পূজা বাংলাদেশে প্রচলিত তাহার অনুরূপ পূজা ত এখনও ওঁরাও মুণ্ডাদের মধ্যে প্রচলিত; ইহাদের 'সরণা' দেবীর মাথায় ধান্য শীর্ষের জটার কল্পনা সুপ্রাচীন। শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে অথবা অন্য কোনো শুভ কাজের প্রারম্ভে 'আভ্যুদয়িক' করিয়া পিতৃপুরুষের যে পূজা আমরা করিয়া থাকি, তাহাও ত আমরা এই অস্ট্রিক ভাষী লোকেদের নিকট হইতে শিখিয়াছি বলিয়া মনে হয়; পিতৃপুরুষের পূজা এখনও সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, শবর, ভূমিজ, হো ইত্যাদির মধ্যে সুপ্রচলিত। শরৎকুমার রায় মহাশয় ত বলেন, "ভারতে শক্তি পূজার প্রবর্তন সম্ভবত ইহারাই প্রথম করে। ওঁরাও প্রভৃতি জাতির "চাণ্ডী" নামক দেবতার সহিত হিন্দু চণ্ডী দেবীর সাদৃশ্য দেখা যায়। অর্ধ রাত্রে উলঙ্গ হইয়া 'চাণ্ডীর' ওঁরাও অবিবাহিত যুবকপূজারী 'চাণ্ডী স্থানে' গিয়া পূজা করে।" বাংলা-দেশে হোলী উৎসব এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে

চড়ক ও ধর্ম পূজার মিশ্রিত সমন্বিত রূপ বিশ্লেষণ করিলে এমন কতকগুলি উপাদান ধরা পড়ে যাহা মূলত আর্যপূর্ব আদিম নরগোষ্ঠীদের মধ্যে এখনও প্রচলিত। নিম্নশ্রেণীর অনেক ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধেই একথা বলা যাইতে পারে।*

দ্রাবিড় ভাষী লোকেদের মানসপ্রকৃতিও ইহাদের প্রাচীন সাহিত্য ও শিল্প কলা এবং প্রাগৈতিহাসিক তাম্রপ্রস্তর যুগের ধ্বংসাবশেষ হইতে কিছু কিছু অনুমান করা যায়। মনে হয় ইহারা খুব কর্মঠ ও উদ্যমশীল, সঙ্ঘশক্তিতে দৃঢ়, শিল্প-সুনিপুণ এবং কতকটা অধ্যাত্মরহস্যসম্পন্ন প্রকৃতির লোক ছিল। প্রাচীন তামিল সাহিত্য যদি প্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে ইহাদের প্রকৃতিতে ভাবুকতার এবং সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ম বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে "সভ্যতার উন্নতির সহিত শ্রেণী-বিভাগের বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দ্রাবিড় সমাজের শ্রেণীবিভাগে সর্বোচ্চ ছিল 'মাল্লের' বা রাজা, তারপর পর্যায় অনুসারে 'বল্লাল' বা সামন্ত রাজা, তারপর 'বেল্লাল' বা ক্ষেত্রস্বামী বা কৃষক, তারপর 'বণিজ' বা ব্যবসায়ী। এই সব শ্রেণী ছিল উচ্চ বা 'মেলোর', তারপর শ্রমজীবী বা 'বিলইবলার', আর সর্বনিম্নে দাস জাতি বা 'আদিওর'। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে আবার বহু বিভাগ ছিল। উচ্চ নীচ ভেদ-প্রবণতা দ্রাবিড় নরগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল। উহাদের অস্পৃশ্যতা-বোধ ক্রমে ভারতের বর্তমান বংশগত অনমনীয় জাতিভেদ প্রথায় পরিণত হইল। সম্ভবত দ্রাবিড় নরগোষ্ঠীর মধ্যে হঠযোগের প্রচলন হওয়ায় এই অস্পৃশ্যতা-বোধ আরও প্রবল হইয়াছিল। পরিশেষে ইহারা যখন আর্য-নর্ডিক নরগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসিল, তখন দেখিল আর্যেরা শুচিপ্রবণতার জন্য অপরিচ্ছন্ন দ্রাবিড়পূর্ব নরগোষ্ঠীর সংস্পর্শ বর্জনের প্রচেষ্টা করিতেন। তাহাতে এই দ্রাবিড়দের বাহ্য শুচিবোধ আরও উত্তেজিত হইল।" শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ স্বীকার না করিয়াও বলা যাইতে পারে, দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোকদের অস্পৃশ্যতাবোধ এবং শ্রেণী-পার্থক্য পরবর্তীকালে আর্যভাষী সমাজে খানিকটা সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। যোগধর্ম ও সাধনপদ্ধতি যে ইহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহাত প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতাই অনেকটা প্রমাণ করিয়াছে।

আর্য এবং পরবর্তী পৌরাণিক হিন্দুধর্মে মূর্তিপূজা, মন্দির, পশুবলি, অনেক দেবদেবী যথা শিব ও উমা, শিবলিঙ্গ, বিষ্ণু ও শ্রী প্রভৃতি যে স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহার মূলে দ্রাবিড়ভাষী লোকদের প্রভাব প্রায় অনস্বীকার্য। যাগযজ্ঞও, যতদূর জানা যায়, ভূমধ্য নরগোষ্ঠীর মধ্যেই যেন বেশী প্রচলিত ছিল; প্রাচীন মিশরে, আসিরিয়ায় ব্যাবিলনের সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যজ্ঞবেদীর নিদর্শন কিছু কিছু মিলিয়াছে এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অরণি ও ব্রীহি, যজ্ঞের যে দুটি প্রধান উপাদানবস্তু, সেই দুইটি শব্দই সম্ভবত মূলত দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে সংপৃক্ত। অবশ্য ইহাও হইতে পারে, যাগযজ্ঞ ভারতীয় আর্যভাষী আদি নর্ডিক-দেরই উদ্ভূত ধর্মানুষ্ঠান; কিন্তু যেহেতু ভারতের অন্যান্য নর্ডিক নরগোষ্ঠীর মধ্যে তাহার প্রচলন দেখা যায় না, সেইহেতু এই অনুমান একান্ত অসংগত নাও হইতে পারে যে, ভূমধ্য নরগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসিয়াই আবেস্তীয় আর্যভাষী ও ঋগ্বেদীয় আর্য-ভাষীরা এই যাগযজ্ঞের পরিচয় লাভ করিয়াছিল এবং ঋগ্বেদীয় আর্যভাষীরা ভারতবর্ষে আসিবার আগেই তাহা হইয়া-ছিল, এমনও অসম্ভব নয়। পশুবলি যে ভূমধ্য নরগোষ্ঠী সংপৃক্ত প্রাগৈতিহাসিক

* সা-প-পত্রিকা, ৪৫ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ২৪৭ পৃ।

* Basu N. K., The Spring Festival of India, Man in India, Vol. VII, 1927, 112–85 pp.

Chattopadhyaya K. P.—The Cadak festival in Bengal, J. A. S. B. Letters, Vol. I. 1935, pp. 397—406 plates.

সিন্ধু তীরবাসী লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, মহেন-জো-দাড়োর ধ্বংসাবশেষ তাহা কতকটা প্রমাণ করিয়াছে। এই মহেন-জো-দাড়োর ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই লোকের বাসের অনুপযোগী ক্ষুদ্র বৃহৎ এমন কয়েকটি গৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে যেগুলিকে কতকটা নিঃসংশয়েই মন্দির বা পূজাস্থান ইত্যাদি বলা যায়। কেহ কেহ তাহা স্বীকারও করিয়াছেন। এক্ষেত্রেও আশ্চর্য এই যে, 'পূজন' বা 'পূজা', পুষ্প (এই শব্দ দুইটি ঋগ্বেদেই আছে) দু'টি শব্দই দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে সংপৃক্ত। লিঙ্গ পূজা এবং মাতৃকা-পূজা যে সিন্ধুতীরের প্রাগৈতিহাসিক লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহাও প্রমাণ করিয়াছে হরপ্পা-মহেন-জো-দাড়োর ধ্বংসাবশেষ। অবশ্য, এ দু'টি পূজা সর্পপূজার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অনেক আদিম অধিবাসীদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল; তবু ভারতবর্ষে ইহার যে রূপ আমরা দেখি তাহা যে আর্যভাষীরা ভারতীয় আর্যপূর্ব ও অনার্য লোকদের সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমশ গড়িয়া তুলিয়াছিল, এই অনুমানই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। লিঙ্গ পূজাই ক্রমশ শিবের সঙ্গে জড়িত হইয়া শিবলিঙ্গ ও শক্তিযোনি পূজায় রূপান্তরিত হয় এবং মাতৃকা-পূজা ও সর্পপূজা ক্রমশ যথাক্রমে শক্তি পূজায় ও মনসা পূজায়। দ্রাবিড় ভাষীদের আণ-মন্দি—পুং বানর (তামিল) দেবতার ক্রমশ বৃষকপি এবং পরবর্তীকালে হনুমান-দেবতায় রূপান্তর অসম্ভব নয়। তেমনই অসম্ভব নয় দ্রাবিড় ভাষীদের বিণ বা আকাশ দেবতার রূপান্তর বিষ্ণুতে এবং তাহা সুপ্রাচীনকালেই হয়ত হইয়াছিল। বৈদিক বিষ্ণুর যে রূপ আমরা দেখি তাহাতে যেন দ্রাবিড়ভাষীদের আকাশ-দেবতার স্পর্শ লাগিয়া আছে। শিব সম্বন্ধে একথা আরও বেশী প্রযোজ্য। শ্মশান-প্রান্তর-পর্বতের রক্ত-দেবতা একান্তই দ্রাবিড় ভাষীদের শিবন যাহার অর্থ লাল বা রক্ত এবং শেম্বু যাহার অর্থ তাম্র; ইনিই ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া আর্য দেবতা রুদ্রের সঙ্গে এক হইয়া যান। পরে শিবন=শিব, শেম্বু=শম্ভু রুদ্র-শিব এবং মহাদেবে রূপান্তর লাভ করেন। এই ধরণের সমন্বিত রূপ পৌরাণিক অনেক দেব-দেবীর মধ্যেই দেখা যায়, একথা ক্রমশ পণ্ডিতদের মধ্যে স্বীকৃতি লাভ করিতেছে! দৃষ্টান্ত বাহুল্যের আর প্রয়োজন নাই। স্বীকার না করিয়া উপায় নাই, এই সমন্বিত রূপই আর্যভাষীদের মহৎ কীর্তি এবং ভারতীয় ঐতিহ্যে তাহাদের সুমহান দান।

মহেন-জো-দাড়োর ধ্বংসাবশেষ হইতে মনে হয় সেখানকার লোকেরা মৃতদেহ কবরস্থ করিত, কেহ কেহ আবার খানিকটা পোড়াইয়া শুধু অস্থিগুলি কবরস্থ করিত।

অ্যালপোদীনারীয় নরগোষ্ঠীর মানস-সংস্কৃতি স[illegible]ন্ধে কিছুই বলিবার উপায় নাই। তবে মহেন-জো-দাড়োর উপরিতম স্তরের ধ্বংসাবশেষ হইতে মনে হয় ইহারা মৃতদেহ বা শব (এটি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর শব্দ) আগে পোড়াইয়া ভস্মশেষ একটি পাত্রে রাখিয়া তাহা কবরস্থ করিত। আগেই বলিয়াছি আর্যভাষী নর্ডিকেরা ইহাদের ভাষাজ্ঞাতি অ্যালপো-দীনারীয় লোকদের প্রীতির চক্ষে ত দেখিতই না বরং "ব্রাত্য" বা পতিত বলিয়া ঘৃণা করিত। এই "ব্রাত্য"রাও অন্যদিকে বৈদিক আর্যভাষীদের যাগযজ্ঞ, আচারানুষ্ঠান প্রভৃতিকে প্রীতির চক্ষে দেখিত না। এক কথায় এই দুই গোষ্ঠীর মানস-সংস্কৃতি একেবারেই বিভিন্ন ছিল, একথা অনুমান কতকটা নিঃসংশয়েই করা যায়।

ভারতীয় তথা বাংলা দেশের মানস-সংস্কৃতিতে মোঙ্গলীয় ভোটব্রহ্ম বা চৈনিক বা অন্য কোনও নরগোষ্ঠীর স্পর্শ বিশেষ কিছুই লাগে নাই। লাগিলেও তাহা এত ক্ষীণ যে আজ আর তাহা ধরিবার কোনই উপায় নাই।

বাংলা দেশে, শুধু বাংলা দেশেই বা কেন, সমগ্র উত্তর ভারতেই আজ শুদ্ধ নিগ্রোবটু অবলুপ্ত; বহুদিন আগেই তাহারা কোথায় যে বিলীন হইয়া গিয়াছে আজ আর তাহা বুঝিবারও উপায় নাই।

"অস্ট্রিক, মিশ্র অস্টিক ও নেগ্রিটো, দ্রাবিড়, মিশ্র দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক, মিশ্র নেগ্রিটো ও দ্রাবিড় এবং মিশ্র অস্ট্রিক-নেগ্রিটো-দ্রাবিড়, (আর্যভাষী অ্যালপো-দীনারীয়, মিশ্র অস্ট্রিক-নেগ্রিটো-দ্রাবিড়-অ্যালপো-দীনারীয়) এই সব জনগণ, যখন উত্তর ভারতের অনার্য জনরূপে নিজ মিশ্র (রক্ত, সভ্যতা,) ধর্ম ও সংস্কৃতি লইয়া বাস করিতেছে, যখন দেশ ছিল খণ্ড, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত, এবং দেশে কোনও ঐক্য-বিধায়িনী কেন্দ্রাভিমুখী শক্তিও ছিল না;—এমন সময়ে ধীরে ধীরে প্রচণ্ড শক্তিশালী, একান্তরূপে কর্মী, অপূর্ব কল্পনাশীল, disciplined বা শৃঙ্খলাসম্পন্ন, সুদৃঢ়রূপে সংঘবদ্ধ, গুণগ্রাহী কিন্তু আত্মসমাহিত, বাস্তব সভ্যতায় কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ অথচ নূতন বস্তু উপযোগী হইলে গ্রহণ করিতে সদা-চেষ্টিত, এমন আর্য (ভাষী) জাতি ভারতে দেখা দিল। আর্য(ভাষী)রা আসিয়া খণ্ড ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক-ধর্ম-রাজ্য পাশে, এক ভাষা ও এক সংস্কৃতির গ্রন্থিতে বাঁধিয়া দিল। ... ... ভারতবর্ষে তাহারা বৈদিকধর্ম ও দেবতাবাদ এবং বেদের কিছু কিছু মন্ত্র বা সূক্ত লইয়া আসিল; তাহারা আনিল তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতি; সেই সংস্কৃতিতে বাবিল ও আসুরীয় এবং পশ্চিম-এশিয়ার অন্য সভ্য (ভূমধ্য) নরগোষ্ঠীর প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।"*

শতাব্দীর পর শতাব্দীর বিরোধ-মিলনের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের বুকে আর্যভাষী আদি-নর্ডিকেরা এক সমন্বিত জন, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিল। সে-জনের রক্তবিশুদ্ধতা আর রহিল না, তাহার রক্তে বিচিত্র রক্তধারার স্রোতধ্বনি ধ্বণিত হইতে লাগিল, কোথাও ক্ষীণ কোথাও উচ্চগ্রামে। এই সমন্বিত জনের নাম হিন্দু। সে-ধর্মও আর বেদ-ব্রাহ্মণের ধর্ম রহিল না; তাহার মধ্যে বিভিন্ন বিচিত্র পূর্বতন ধর্মের আদর্শ, আচার, অনুষ্ঠান সব মিলিয়া মিশিয়া এক নূতন ধর্ম গড়িয়া উঠিল; তাহার নাম হিন্দু ধর্ম। সে-সভ্যতাও বৈদিক আর্য-ভাষীর সভ্যতা থাকিল না, বিচিত্র পূর্বতন সভ্যতার উপাদান, উপকরণ আহরণ করিয়া তাহার এক নূতন রূপ ধীরে ধীরে পৃথিবীর দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল; এই নূতন সমন্বিত সভ্যতার নাম হিন্দু সভ্যতা। আর সেই সংস্কৃতিই কি বেদ-ব্রাহ্মণের সংস্কৃতি থাকিতে পারিল? তাহার মানসলোকে কত যে পূর্বতন জন ও সংস্কৃতির সৃষ্টি-পুরাণ, দেবতাবাদ, ভয়-বিশ্বাস, ভাব-কল্পনা, স্বভাব-প্রকৃতি ইতিকথা ও কাহিনী, ধ্যান ও ধারণা আশ্রয়-লাভ করিল তাহার ইয়ত্তা নাই। সকলকে আশ্রয় দিয়া, সকলের মধ্যে আশ্রয় পাইয়া, সকলকে আত্মসাৎ করিয়া, সকলের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া এই সংস্কৃতিও এক নূতন সমন্বিত রূপ লাভ করিল; তাহার নাম হিন্দু সংস্কৃতি। আজ আবার গত সাতশত বৎসর ধরিয়া আর এক বৃহৎ সমন্বয় চলিতেছে এবং তাহার ফলে আমাদের এই বৃহৎ দেশখণ্ডে আর এক নূতন জন, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার নাম ভারতীয় জাতি, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

এই সমন্বিত জাতি, ধর্ম, সভ্যতা এবং সংস্কৃতিও একটি চলমান প্রবাহ। এই প্রবাহ আজও চলিতেছে। পরবর্তীকালে ইতিহাসের আবর্তচক্রে বারবার নূতন নূতন জন, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে বিচিত্ররূপে তাহাদের বিরোধ-মিলন ঘটিয়াছে, আজও ঘটিতেছে। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। Thesis, Antithesis, Synthesis—চলমান প্রবাহ, বিরুদ্ধ প্রবাহ, সমন্বিত প্রবাহ, ইহাই জীবনের গতিধর্ম। এই গতিধর্ম স্মৃতি ঐতিহ্যবহ; এই ধর্মই জীবনীশক্তি, প্রাণশক্তি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই ধর্মের বিকাশের দিকে তাকাইয়াই বিংশ শতাব্দীর বাঙালী কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে ঃ

রণধারা বাহি, জয়গান গাহি
উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরি পর্বত
যারা এসেছিল সবে
তারা মোর মাঝে সদাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তাদের বিচিত্র সুর।

যাহাই হউক, যে সমন্বিত জাত, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা এইমাত্র বলিলাম, তাহার জন্মনীড় হইল উত্তর ভারতের গাঙ্গেয়

*সু-কু-চট্টোপাধ্যায়—জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ২য় সং, ১৯—২০ পৃ।

প্রদেশ। তাহাদের বাহন হইল 'আর্যভাষা। এই আর্যভাষাকে আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে গাঙ্গেয় প্রদেশের ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবাহ বাংলাদেশে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-সপ্তম শতক হইতে। আদিমতম স্তরে আদি অস্ট্রেলীয়, তারপর দীর্ঘমুণ্ড ভূমধ্য নরগোষ্ঠী, গোলমুণ্ড অ্যালপো দীনারীয় নরগোষ্ঠী এবং সর্বশেষে উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় প্রদেশের মিশ্র আদি-নর্ডিক নরগোষ্ঠীর ক্ষীণ ধারা—এই কয়েকটি ধারার মিলনে বাঙালী জাতির সৃষ্টি। অ্যালপো-দীনারীয় প্রবাহ-পূর্ব আদিম বাঙালী মুখ্যত অনার্য; আর্যরক্ত প্রবাহ প্রথম আনিল অ্যালপো-দীনারীয় জাতিই; তারপর দ্বিতীয় প্রবাহ ক্ষীণ ধারায় আনিল আদি-নর্ডিকেরা, কিন্তু উত্তর ভারতেই সেই রক্ত অনার্যমিশ্র হইয়া গিয়াছিল। যাহাই হউক, উত্তর ভারতের মিশ্র আদি-নর্ডিকদের এবং কিয়ৎপরিমাণে অ্যালপো-দীনারীয়দের আর্যভাষাই সৃজ্যমান বাঙালী জনকে একটা নূতন মানসরূপ দান করিল; আদিম বাঙালীর আদি-অস্ট্রেলীয় ও দ্রাবিড় মন ও প্রকৃতির উপর '[illegible]' অ্যালপো-দীনারীয় এবং মিশ্র আদি-নর্ডিক নরগোষ্ঠীর মন ও প্রকৃতির চন্দনানুলেপ পড়িল এবং তাহাই বাঙালীকে, বাঙালী চরিত্রকে একটা স্ফুটতর বৈশিষ্ট্য দান করিল। এই বিবর্তন-পরিবর্তন একদিনে হয় নাই, হাজার বৎসরেরও (খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-সপ্তম শতক হইতে খৃষ্টপরবর্তী ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত মোটামুটি) অধিককাল ধরিয়া তাহা চলিয়াছিল। কিন্তু সে তথ্য এবং তথ্যগত বিবরণ ইতিবৃত্তের কথা; এ-অধ্যায়ে তাহার স্থান নাই।

পর পর কয়েকটি নিবন্ধে আমি যাহা করিতে চেষ্টা করিলাম, যে-ভাবে অস্ফুট অপরিস্রুত ঐতিহাসিক উষাকালের রেখাচিত্র আঁকিতে, যে-সব ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করিলাম, ঐতিহাসিকেরা সকলক্ষেত্রে তাহা স্বীকার করিবেন, আমি তাহা আশা করি না। সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট পাথুরে প্রমাণ না পাইলে সাধারণত ইতিহাসের দাবী মেটে না; অথচ যে প্রাগৈতিহাসিক কালের কাহিনী এই নিবন্ধগুলির বিষয়বস্তু সেই-কালের ঐতিহাসিক-গ্রাহ্য প্রমাণ সুদুর্লভ। তবু মানুষের জানিবার আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার; সেই দুর্নিবার আগ্রহে মানুষ নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করে; নরতত্ত্ব, জনতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব তাহার কয়েকটি উপায় মাত্র। এইসব উপায়ের সাহায্যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা এ পর্যন্ত যে-সব নির্ধারণে পৌঁছিয়াছেন, তাহাই বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া, কিছু রাখিয়া কিছু ছাঁটিয়া, কিছু বাছিয়া, নানা ইঙ্গিতগুলি ফুটাইয়া আমার এই রেখাচিত্র। ঐতিহাসিক কালে বাংলার ও বাঙালীর যে ইতিহাস আমাদের চোখের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়, তাহার সকল তথ্য, সকল ইঙ্গিত, সকল ভাব-কল্পনা, ধ্যান-ধারণা, উপাদান-উপকরণ, আচার অনুষ্ঠান, গীত-প্রকৃতি ইত্যাদি ঐতিহাসিককালের তথ্যপ্রমাণের মধ্যে পাওয়া যায় না, সে তথ্য ও প্রমাণ ঐতিহাসিক কাল অতিক্রম করিয়া প্রাগৈতিহাসিক কালের মধ্যে বিস্তৃত। বাঙালীর ইতিহাস বলিতে বসিয়া সেইজন্য সেই অস্ফুট কাল সম্বন্ধে এই সুদীর্ঘ প্রস্তাবের অবতারণা করিতে হইল। শুধু প্রাচীন নয়, আজিকার বাঙালী ও ক্ষীণালোকদীপ্ত উষার ইতিহাস যতটুকু সাধ্য জানা প্রয়োজন। এই ইতিহাস বাদ দিলে বাঙালীর ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না; এই কারণেই আমি এমনভাবে এমন ইঙ্গিতে এই ইতিহাস উপস্থিত করিলাম যাহার ফলে বাঙালীর এবং বাংলার জীবন-প্রবাহের মূল উৎস আমাদের হৃদয়মনের নিকটতর হইতে পারে। "আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যা বেলায় দীপ জ্বালার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো।" এই নিবন্ধগুলি সেই 'সকাল বেলায় সলতে পাকানো'। *

---

* এই নিবন্ধগুলি রচনায় যে-সব গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছি, তাহাদের উল্লেখ যথাস্থানে পাদটীকায় করা হইয়াছে; তবু কয়েকটি গ্রন্থ ও রচনার উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে না করিলে ঋণ-স্বীকার সম্পূর্ণ হইবে না।

Chanda. R. P.—Indo-Aryan Races.
Guha. B. S.—An outline of racial ethnology of India, in An Outline of the Field Sciences of India. Ind. Sc. Cong. Assn. 1937.
Chatterjee, S. K.—Origin and development of the Bengali Language, Vol. I. 1926.
Report on the Census of India, 1931, Vol. I, Part III Chaps.: Vol. V, Part I, Chaps. X, XI, XIII with tables. 1935.
Risely, H.—Peoples of India.
" —Tribes and Castes of Bengal, 2 Vols.
" —Anthropometric deta of Bengal, 2 Vols.
Mahalanobis, P. C.—J. A. S. B. N.S. XIII, 301—33 pp.
Chakladar, H. C.—Presidential Address, Anthro. Sec., Proc., of the Sc. Cong. XXIII 359—90 pp.
Dutta, B. N.—Collected Papers placed at my disposal.
Basu, N. K.—Collected Papers placed at my disposal.
Basu, M. N.—Collected Papers placed at my disposal.
Von Eikstedt—The history of Anthropological Research in India, being the Intro. to L. A. K. Iyer's "The Travancore tribes and castes. Vol. II. 1939.
Bagchi, P. C.—Pre-Arayan and Pre-Dravidian. (Eng. tran. of papers by Lavi, Przyluski & Block; also original papers by S. K. Chatterjee & P. C. Bagchi).
শরৎচন্দ্র রায়—ভারতের মানব ও মানবসমাজ, ব-সা-প-প, ১৩৪৫, ৪৫ ভাগ, ৪র্থ, সংখ্যা, ২০২—৬২ পৃঃ।
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাঙলা ভাষা-তত্ত্বের ভূমিকা, ২য় সং।
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ২য় সং।
Sewell, R. B. S. and Guha, B. S. Mohenjodaro and Indus Vally Civilisation, by Sir John Marshall. Vol. II. 1931.
deTerra, Helmet—Scientific Field Reports of the Yale-Cambridge North India expedition. Misc of the American Philosophical Soc. I, 1936.
Taylor, Meadows—Trans. of the Royal Irish Academy, XXIV, 1873.

ট্রামে-বাসে

ট্রামে চড়িতেই বিশু খুড়োর সঙ্গে দেখা। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া মাত্রই খুড়োর কণ্ঠ বুঝি হাহাকার করিয়া উঠিল—"ওরে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমি জানি বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা সে নির্ঘাত করবে। খাল কেটে কুমীরকে তোরা ডেকে আনিস নি।" কে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা করিবে জিজ্ঞাসা করিতেই খুড়ো একেবারে ফাটিয়া পড়িলেন—"ন্যেকু আমার কিছুই জানেন না যেন! আমার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদটা হবে কি পাড়াপড়শীর? কিন্তু এ হাসি তামাসার কথা নয়। এ সুযোগ হাতে পেলে তোদের কাকীমা কিন্তু সত্যি একটা কেলেংকারী করে বসবে!" বলিলাম—"মনে মনে যদি কাকীমার এত বিক্ষোভই জমা হয়ে থাকে যে সুযোগ পেলেই তিনি তোমায় ত্যাগ করে যাবেন, তাহলে তার বিক্ষোভকে ধামা চাপা দিয়ে রেখেই কি তুমি খুশী হবে খুড়ো?" "কি যে তোরা বাজে বকিস" বলিয়া খুড়ো বুঝি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া একটা বিড়ি ধরাইলাম।

* * * * *

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়—ট্রামের ভীড়ের আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের জন্য একজোড়া বেশী আসনের ব্যবস্থাও হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে অতঃপর ট্রামে মহিলা যাত্রীর ভীড় হয়ত একটু বাড়িবে এবং যেখানে নারীরা অবস্থান করেন সেখানেই দেবতাদের আবির্ভাবের কথাও আমাদের শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সুতরাং দেবতাদের ভীড়ও একটু-



আধটু হইবে বৈকি। মাঝখান হইতে যারা অপদেবতা তারাই শুধু আর একটু বেশী মাত্রায় বাদুড়ঝোলা হইয়া ট্রামে ভ্রমণ করিবে। ঢেঁকীর স্বর্গে গিয়াও সুখ নাই।

* * * * *

দেখিতেছি সিগারেট নিয়া আমাদের লুকোচুরি খেলার আর শেষ নাই। ছোটবেলায় গুরুজনদের ফাঁকি দিয়া সিগারেটের প্যাকেট লুকাইয়া রাখিতাম—নেশার লোভে। এইবারে গভর্নমেণ্ট এবং অগণিত নরনারীকে (নারীও আছেন বৈকি!) ফাঁকি দিয়া সিগারেটের প্যাকেট লুকাইয়া ফেলিয়াছি—টাকার লোভে। যাহা হউক অন্ন-বস্ত্রের মত সিগারেটটাও চোরাবাজারের সংস্পর্শে আসিয়া আভিজাত্যে উত্তীর্ণ হইল।

* * * * *

ফ্রাঙ্কো হাজার হাজার বাইবেল অগ্নিদগ্ধ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া একটি অভিযোগের সংবাদ আমরা সম্প্রতি পাইলাম। যাঁরা বাইবেলের মূল নীতিই পোড়াইয়া দিতেছেন তাঁরা



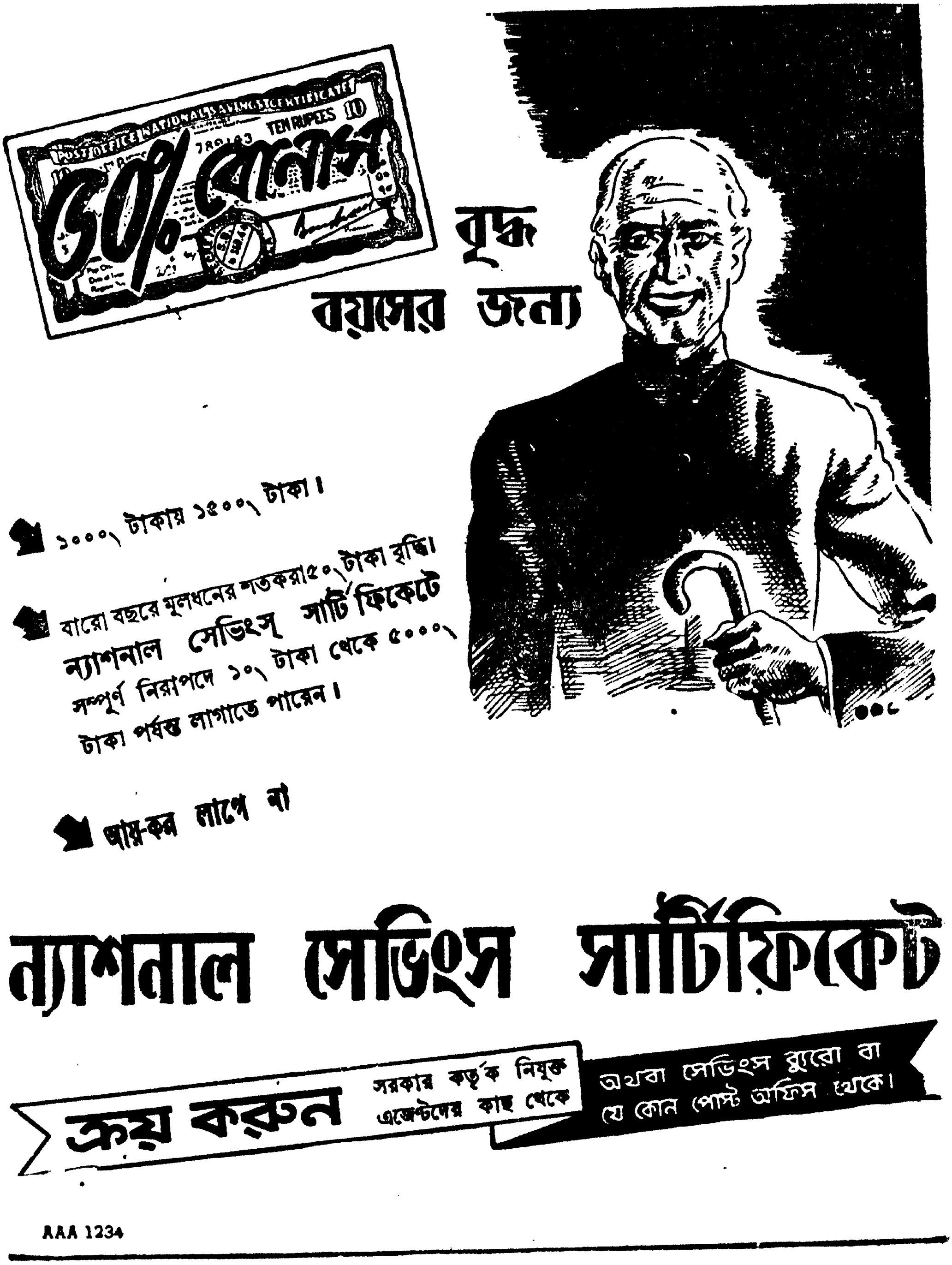
বাইবেল পোড়ানোর বিচার কিভাবে করিবেন তা তাঁরাই জানেন। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কোর এই আচরণে আমরা দুঃখিত হইলেও বিস্মিত হই নাই। একটা কথা আছে—"দরবারে না পাইয়া ঠাঁই ঘরে এসে মাগ কিলাই"।—ফ্র্যাঙ্কো নিজের প্রসিদ্ধির জন্য এর চাইতে বেশী আর কি-ই বা করিবেন। আমাদের দেশেও গীতার উপর এক হাত লইয়া—রাজনৈতিক নেতার-বাজার সরগরম রাখার চেষ্টার কথা আমরা জানি।

* * * * *

প্রধান মন্ত্রীর বাড়ী মেরামতির জন্য চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। সদাশয় গভর্নমেন্ট এই দুর্দিনে মন্ত্রী মহাশয়কে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যে দিয়া যে মহানুভবতার পরিচয় দিলেন—সত্য সত্যই তার তুলনা হয় না। কিন্তু এই কয়টি মাত্র টাকায় বাড়ীর Lime workই হইবে—"whitewash" আর হইবে না। বিরোধী দল যা-ই বলুন না কেন, আমরা প্রস্তাব করিতেছি—অতঃপর অন্যান্য মন্ত্রী



মহোদয়গণেরও বাড়ী মেরামত হইতে সিনেমা এবং ফুটবল খেলা দেখার টিকিট কাটার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাঁহাদের অলৌকিক লোকহিতব্রতের ঋণ যেন অংশতও শোধ করা হয়। টাকার কথা ভাবিবেন না, আমরা "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে" নীতিতে বিশ্বাস করি।


POST OFFICE NATIONAL SAVINGS CERTIFICATE
TEN RUPEES 10
৫০% বোনাস
বৃদ্ধ বয়সের জন্য
১০০০৲ টাকায় ১৫০০৲ টাকা।
বারো বছরে মূলধনের শতকরা ৫০৲ টাকা বৃদ্ধি।
ন্যাশনাল সেভিংস্ সার্টিফিকেটে সম্পূর্ণ নিরাপদে ১০৲ টাকা থেকে ৫০০০৲ টাকা পর্যন্ত লাগাতে পারেন।
আয়-কর লাগে না
ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট
ক্রয় করুন
সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এজেন্টদের কাছ থেকে
অথবা সেভিংস ব্যুরো বা যে কোন পোস্ট অফিস থেকে।
AAA 1234

জীবনের ঝরাপাতা

শ্রীসরলা দেবী চৌধুরানী

[১৬]

(দ্বিতীয় পর্যায়)

বাড়ি-ফেরা

কলকাতায় সংস্কৃতে এম·এ পড়তে পড়তে যে চলে এসেছিলুম, এখানে সে ক্ষতি পূরণ হতে থাকল। এখানকার সংস্কৃত কলেজের আধুনিক প্রিন্সিপ্যাল নিজে ডবল এম-এ—স্বয়ং আমায় অধ্যাপনার ভার নিলেন। এঁরই সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সংস্কৃত পুস্তকে প্রবেশ-লাভ হতে লাগল। মহীশূরের ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরীর কিউরেটার মহাদেব শাস্ত্রী এম·এ'ও আমার সাহায্যার্থে অগ্রসর হলেন। এই ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরী একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার, মহীশূর রাজ্যের একটি ভারত-বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। গবেষণাপূর্বক নানা-রকম প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের এখানে পুনরুদ্ধার ও পুনর্মুদ্রণ হয়। অনেক গ্রন্থে মহাদেব শাস্ত্রীর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের ইংরেজি ভূমিকায়। এই সকল পুস্তকের সেট উপহার দেওয়া হয় তাঁদের যাঁদের মহাদেব শাস্ত্রী জ্ঞানী বা জ্ঞান-পিপাসু এবং উপহারের যোগ্য পাত্র বিবেচনা করেন। আমার জ্ঞান-পিপাসায় তিনি নিঃসন্দেহ হওয়ায় একদিন তাঁর কাছ থেকে প্রায় এক ট্রাঙ্ক-ভরা পুস্তকাবলী এসে উপস্থিত হল। তাঁর নিজের শুভাগমনও প্রায়ই হত। আর একজন মধ্যে মধ্যে আসতেন—মাইসোর সিভিল সার্ভিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী—রামচন্দ্র রাও। খুব তীক্ষ্মবুদ্ধি, সব সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে তীব্র দৃষ্টিবান, নিঃশঙ্ক সমালোচক ও হাসিখুসি-ভরা। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল একজন আয়েঙ্গার, ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরীর কিউরেটার একজন আয়ার ও রামচন্দ্র রাও শিবাজীর ভাইয়ের সঙ্গে সমাগত দাক্ষিণাত্য প্রদেশে উপনিবেশিক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের উত্তরপুরুষ—এখন দাক্ষিণী বলেই গণ্য। মহীশূরের হোম্-পলিটিক্সের আভাস এঁ'র বিশেষ করে মনে পড়ে যাঁদের নিয়ে একটি বন্ধুমণ্ডলী গড়ে উঠল। পূর্ব-পরিচিত ডাক্তার রামস্বামী আয়েঙ্গার—নরসিং আয়েঙ্গারের ভাগিনেয়ও অবশ্যই ছিলেন, কিন্তু তিনি Intellectual আলোচনার বিশেষ ধার ধারতেন না—সেবাই ছিল তাঁর প্রধান ধর্ম। ফুলটি এটি ওটি সেটি নিয়ে আসতেন, যা আমার নয়নরুচিকর বা কাজে লাগার বস্তু হতে পারে। কলকাতায় মিসেস পি কে রায়দের গৃহে বাসজনিত এই শিক্ষা ও অভ্যাস তাঁর জন্মেছিল।

মহীশূরে আমার আসল বন্ধুত্ব হল এখানকার ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইন্সট্রাকশন মিস্টার ভাভার পত্নী ও মেয়ের সঙ্গে। ভাভারা পার্সি। তাঁদের মেয়েটি—মেহেরবাঈ পরমা সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা। বম্বে-পুণা-সাতারায়ও পার্সিদের সঙ্গে আমাদের পরিবারের মেয়েদের সহজেই খাপ খেয়ে যেত—মেজমামী ও মার অনেক পার্সি বান্ধবী হয়েছিলেন। আমারও এঁদের সঙ্গে মিল হয়ে গেল খুব। মেহেরবাঈকে দেখে আমি মধ্যে মধ্যে আশ্চর্য হতুম—বম্বের মত বৃহৎ শহরের বাইরে, পার্সি-অপ্রতুল মহীশূরের নিভৃত বনে তাঁদের অজ্ঞাতে এমন ফুলটি ফুটে আছে—কোন পার্সি দুষ্মন্ত এসে এই শকুন্তলাটিকে দেখবে কি একদিন? তাই হল। রূপকথার Prince Charming এল একদিন।

স্যার জামশেদজী টাটার জ্যেষ্ঠপুত্র দোরাব টাটা পার্শি সমাজে একটি মস্ত বড় রুই-কাৎলা জাতীয় পাত্র। স্ব স্ব মেয়ের হিতকল্পে বম্বের বড় বড় পার্শি ক্রোড়পতির পত্নীরা তাঁকে ধরার জন্যে অনেকদিন ধরে জাল পেতে আছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি ধরা দেননি। বয়স হয়ে যাচ্ছে, হবু শ্বাশুড়ীরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এমন সময় নিয়তি নিজের হাত খেললে। টাটা স্কীমের কার্য উপলক্ষে বৃদ্ধ পিতা জামশেদজী তাঁকে দিয়ে দোরাবকে মহীশূরে পাঠালে। সেখানে মেহেরবাঈকে দেখে দোরাবজী প্রেমপাশে ছিপ নয়—একেবারে বিধির নিয়ন্ত্রণে ছোঁড়া কন্দর্পের পঞ্চবাণ। মেয়ের বাপ-মার মনে একটা বাধা খটকা দিলে—দুজনের বয়সের অনেক পার্থক্য। কিন্তু প্রেমপথে সে বাধা টিঁকল না। শীঘ্রই তাদের engagement হল। সে সম্বাদ বম্বেতে যখন প্রচার হল, মহীশূরের মত অজানা শহরে অজ্ঞাত-কুলশীলের কন্যার প্রতি দোরাবজির অনুরাগের কথা বম্বের মায়েরা যখন শুনলেন তাঁর মনোনয়নকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। তাতে তাঁদের বিবাহ বন্ধ হল না। শুভদিনে শুভক্ষণে মহীশূরে মেহেরবাঈয়ের পাণিগ্রহণ করে তিনি পত্নী সহ যখন বম্বেতে এলেন এবং অচিরে "স্যার্ দোরাব" হলেন, তখন বম্বের পার্শিসমাজ লেডি দোরাব টাটাকে তাঁদের একজন মুখ্য বলে গ্রহণ করতে বাধ্য হলো।

যে সময় মেহেরার engagement হয়, আমি মহীশূরে ছিলুম না। তার চিঠিতে খবর পেলুম। দোরাবজীর মহীশূরে আসা ও তাঁদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় ভরা সে বিশ পৃষ্ঠার চিঠিখানি একটি ষোড়শী বালিকার প্রথম প্রণয়োল্লাসিত হৃদয়ের মুক্ত ছবি। বোধ হয় তার আর কোন সমবয়সী বন্ধু ছিল না যাকে এমন করে হৃদয় ভরে লিখে আরাম পান। এমন নবপুলকের দিনে এক-জন কাউকে চাই—যাকে সব বলেই সুখ—আনন্দ ও ভয় দুই-ই।

এর অনেক বৎসর পরে একবার মাত্র এঁর সঙ্গে আমার বম্বেতে দেখা হয়। তখন তিনি পুরো মাত্রায় বম্বে সমাজের অঙ্গীভূত লেডি টাটা—অনেকানেক কমিটির মধ্যে একটি স্বদেশী এক্জিবিশন কমিটির সদস্যা—মহীশূরের সেই বালিকা "মিস্ ভাভা" আর নয়। দোরাব টাটা ও লেডি টাটা দুজনেই এখন গতায়ু। তাঁরা শেষ পর্যন্ত নিঃসন্তানই ছিলেন। দোরাবের ছোট ভাই রতন টাটাও নিঃসন্তান অবস্থায় ১৯১৪-র জগৎ-যুদ্ধে জার্মান টর্পেডোর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে

বাতি দিতে কেউ নেই। তাঁর কীর্তিই তাঁর বাতি।

মহীশূরে প্রবাসকালে আর একটি পরিবারের সঙ্গে আমার সৌহার্দ্য হ'ল—তাঁরা মুসলমান ও বাঙ্গালোরে থাকেন। স্বামী ডেপুটি কলেক্টর মিস্টার সুজাতালি—ইউ পি'তে আদিবাস। স্ত্রী বাঙলার মেয়ে, তাঁর ভাইরা বাঙলায় উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। মিসেস্ সুজাতালি আমার কথা জানতে পেরে স্বয়ং একদিন বাঙ্গালোর থেকে মহীশূরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে একটা শনি-রবিবারে তাঁদের ওখানে আমার যাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করে গেলেন। একবার নয়—তাঁর পীড়াপীড়িতে এমন দু'চার বার শনি-রবিবারে তাঁদের ওখানে আমার যাওয়া-আসা ও থাকা হয়েছিল। শিক্ষিত মুসলমান পরিবারের সঙ্গে সহজেই আমার মিত্রতা জমে গেল। এস্থলে এ সৌহার্দ্যের মূলে ছিল মিসেস্ সুজাতালির বাঙলার প্রতি টান। অনেককাল পরে যখন আলিগড়ে আলিগড় ইউনিভার্সিটি দেখার জন্যে সেখানকার কর্তৃপক্ষরা আমাকে আমন্ত্রণ করেন—একটি প্রকাণ্ড শহরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যেন তার প্রতি অংশ পর্যটন করানোর মত করে আমাকে সব কিছু দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন, সেই সময় লক্ষ্য করলুম একটি যুবক সব সময়ই আমাদের সঙ্গে রয়েছে। পরে সে নিজের পরিচয় দিলে—সে বাঙলা দেশ থেকে আসা একটি মুসলমান ছাত্র। বাঙলার একজন মহিলাকে তার ইউনিভার্সিটিতে দেখে তার যে আনন্দ হয়েছে—ঘণ্টা কতকের মত তাঁর সঙ্গলাভে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে পারছে না নিজেকে। তাই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। আর একবার বর্মায় রেঙ্গুনের নিকটবর্তী পেগু শহরে প্রসিদ্ধ শয়ান বুদ্ধের মূর্তি দেখে মধ্যাহ্ন অতীত হলে রেলওয়ে রেস্তরাঁতে গিয়ে বসলুম, আমার গুজরাটি সহচর কিছু আহার্যের বন্দোবস্তর জন্যে রেস্তরাঁর রন্ধনশালায় গিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন। শুনলেন, সেদিন যা কিছু রান্না হয়েছিল, সব শেষ হয়ে গেছে—এত বেলায় আর কিছু পাবার যো নেই একটু শুকনো পাউরুটি ছাড়া। এই সময় দুজন 'Boy' বা খানসামা এল—পরস্পরের সঙ্গে বাঙলায় কথা কইছে। আমি তাদের বাঙলায় জিজ্ঞেস্ করলুম—"তোমাদের বাড়ি কোথায়? বাঙলা দেশে? তারা বিস্মিত হয়ে বললে—হ্যাঁ, ঢাকায়। আপনিও কি বাঙালী? এত দেরি করে এসেছেন—সব ত ফুরিয়ে গেছে। আচ্ছা, তবু দেখি কি করতে পারি।" ঘণ্টাখানেক বসতে হল, কিন্তু তার মধ্যে দাল ভাত মাছ তরকারি সব সুচারুরূপে রান্না হয়ে টেবিলে হাজির। বাঙালী খানসামার পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলে। যখন দাম দিতে গেলুম, মনমরা হয়ে গ্রহণ করলে—রেলওয়ে কোম্পানী নয়ত তার উপর নারাজ হতে পারে, জরিমানা করতে পারে—আমি এই ভয়ের ছবি দেখানতে নিলে।

সুজাতালিদের অনেকটা ইংরেজি রকম রওয়া সওয়া হলেও মেয়েদের পোষাকে-পরিচ্ছদে আচারে-ব্যবহারে একটা নিজস্বতা আমায় আকৃষ্ট করেছিল—যেমন অনেক বছর পরে বম্বের তায়েবজী পরিবারেও তাই দেখেশুনে আকৃষ্ট হই। মহীশূরের হিন্দু-জগৎ আমার পক্ষে একটি অভিনব জগৎ, অতীতের জগৎ, কাব্য ও চিত্রের জগৎ—আমি তার মুগ্ধ দর্শক মাত্র, মানবিকতায় তার অঙ্গীভূত নই! এখানে এক পার্শি ও এক মুসলমান গৃহের গৃহীদের সঙ্গেই আমার আধুনিকতা ও মানবিকতার জীবন্ত সংযোগ হল। দেখলুম যে, ধর্মের প্রভেদে মানুষে মানুষে মিলের কিছু আসে যায় না—মনের মানুষ তারাই হয় যাদের মনের সঙ্গে মন মেলে, ধর্মের ধ্বজা সেখানে আপনাকে খাড়া করে মানুষকে ধমক দেয় না।

মহীশূর প্রবাসে দু-চার মাস পরে সেখানে দৃষ্ট অতীতের নূতনত্ব ও মোহ যত কমে আসতে লাগল, ততই একটু একটু মন কেমন করতে আরম্ভ করল নিজের বর্তমানের জন্যে, নিজের পারিবারিক আবেষ্টনের জন্যে, পারিপার্শ্বিকের জীবন্ততার জন্যে। এখানে ১লা বৈশাখের দিন কলকাতায় নববর্ষের উৎসবের কথা মনে পড়ে, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় নিজেদের বাড়িতে ভাইবোনের মিলনের কথা মনে পড়ে। 'নৌরাত্রে' বাঙলা দেশে দুর্গাপূজার ধুমধাম ও ভাসানের ঘটা মনে পড়ে। খুশি—মিসেস্ ডি এন রায় কেন যে স্বামীর সঙ্গে প্রথম প্রথম বম্বে গিয়ে তাঁর প্র্যাক্‌টিস সেখানে খুব জমে উঠলেও, বাঁধা আয় ও আয়েস ছেড়ে কলকাতায় স্বামীকে ফেরানোর জন্যে ছট্‌ফট্ ক'রে অবশেষে ডাক্তারী তল্পিতল্পা সমেৎ তাঁকে ফিরিয়ে এনে কলকাতায় স্বগৃহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তা কতকটা বুঝতে পারলুম।

আর একটা প্রবল ধাক্কা এল। আমার বাড়ির সামনেই রাস্তার ওপারে একজন কণ্ট্রাক্টর একখানা বড় বাড়ি তুল্‌ছে—একটা ছোট বাড়ি হয়ে গেছে, তাতে কিছু কিছু লোকজন থাকে। কণ্ট্রাক্টরের একমাত্র ছেলে দুর্বৃত্ত, বাপের পয়সা দুহাতে ওড়ায়। বাপ-মা তাকে শাসনে আনতে পারে না—তারা থাকে শহরের ভিতরে ছেলের বৌকে নিয়ে, ছেলে কখন কোথায় থাকে, কোথায় যায়-আসে খোঁজ পায় না। একদিন গভীর রাত্রে আমি ঘুমিয়ে আছি—আমার পরিচারিকা—মাদ্রাজী আয়া আমার ঘরে না শুয়ে সিঁড়ির উপরেই ল্যাণ্ডিংয়ে শুয়েছে সেখানে বেশী হাওয়া যাবে ব'লে। হঠাৎ ভয়ানক চীৎকার স্বরে কাঁউ মাউ করে উঠল—তাকে মাড়িয়ে কে পাশের ঘরে ঢুকেছে—যেটা ড্রেসিংরুম। তার চেঁচামেচিতে আমি জেগে উঠে তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলুম—কি হয়েছে? সে বল্লে পাশের ঘরে লোক ঢুকেছে। ফুটপাতের

ওধারে পুলিসের একটা আউটপোস্ট ছিল—কন্‌ট্রাক্টরের বাড়িরই পাশে। আমি বারান্দায় গিয়ে 'পাহারওয়ালা' বলে ডাক দিতে দিতে দুজন বাড়ির নীচে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে কি হয়েছে? আয়া যা বলেছিল, আমি তাই বললুম। ঠিক সেই সময় ঘর থেকে নীচে লাফাতে গিয়ে পা-ভাঙ্গা লোকটাকে দেখতে পেয়ে তারা ধরে ফেল্লে। আমার বাড়িতে স্টেট থেকে দেওয়া দুজন সেপাই বা পিয়ন রাত্রে শুত। কলকাতা থেকে আমার সঙ্গে আসা বিপিন বলে একজন পুরাণো বাঙালী চাকরও নীচে শুত। তারা এতক্ষণ নিদ্রামগ্ন ছিল, পুলিসের গোলমালে তিনজন সবে জেগেছে। একজন সেপাইকে নরসিং আয়েঙ্গারের বাড়ি ও একজনকে মিস্টার ভাভার বাড়ি খবর দিয়ে পাঠালুম। তাঁরা দুজনেই এলেন সেই রাত্রে, মিস্টার ভাভার সঙ্গে তাঁর কন্যা মেহেরবাঈও এল। এঁরা আমাকে তাঁদের বাড়ি নিয়ে গেলেন তখুনি—বাকী রাতটা সেখানেই কাটলো। কন্‌ট্রাক্টারের ছেলেটার নামে পুলিস-কেস হ'ল, তার জেল হ'ল ছমাসের। ব্যাপারটা ঐখানেই শেষ হ'ল, কিন্তু মনে এর রেশের একটা বড় রকম ঢেউ অনেকদিন ধরে খেলতে লাগল। নিউস-এজেন্সীর মারফৎ খবরটা কলকাতার সংবাদপত্র মহলেও পেঁাছেছিল। 'বঙ্গবাসী'তে একটা লম্বা মন্তব্য বেরোল—মর্ম তার—"এ ঘরের মেয়ের একলা একলা বিদেশে চাকরী করতে যাওয়ার দরকারটা কি? খাওয়াপরার অভাব তো নেই; কেন খামকা নিজেকে এমন বিপদগ্রস্ত করা? এ খালি বিলিতী সভ্যতার অনুকরণ।"

ভেবে দেখলুম কথাটা কতকটা সত্য। বিলিতী গল্প পড়ে পড়ে মনের ভিতর জমে ওঠা একটা সখের হাওয়ার ঘূর্ণিতে অনেকদূর এসে পড়া আমার। দাদাদের সঙ্গে শিক্ষাদীক্ষায় সমান সুযোগ লাভ করে নরনারীর স্বায়ত্ত জীবিকা অর্জনে সমান দাবী প্রতিপন্ন করাই আমার চাকরী ক'রতে আসার মূল প্রেরণা ছিল না—চেতনার তলায় তলায় সেটা থাকলেও উপর উপর অতি প্রবলভাবে সখই তার প্রধান উপাদান ছিল। একটা Cause ধরলে মানুষ তার উপর মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে—তাতেই তার মনুষ্যত্ব। কিন্তু সখের ভিত্তি, বালুর ভিত্তি—ধ্বসে ধ্বসে যায়, স'রে স'রে যায়, সখ কিছুদিন পরে মিটে যায়। আমারো ছ'মাসের পরে মিটে আস্‌তে লাগলো।

এর উপর আর একটা দৈব উৎপাত এল—ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলুম। এখানকার সাহেব সিভিল সার্জেনের চিকিৎসা ও ঔষধপত্র চলতে থাকল। বাড়িতে এত বয়স পর্যন্ত এলোপ্যাথী ওষুধ কখনও খাইনি, তার কি রকম স্বাদ, তা জানতুমই না। বাবামহাশয় হোমিওপ্যাথির ঘোরতর বিশ্বাসী ও ভক্ত। আমাদের অল্পস্বল্প অসুখ হোক বা বেশী হোক, ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার বা ডাক্তার সলজার ছাড়া কাউকে ডাকা হয় না। বিশ বৎসর বয়সের পর জীবনে প্রথম এলোপ্যাথী ওষুধের সঙ্গে আমার শারীরিক পরিচয় হ'ল। মা'দের কাছে টেলিগ্রাম গেল। মা তখনো সেতারায় ছিলেন। সেখান থেকে তিনি এলেন অসুখে আমার তত্ত্বাবধানের জন্যে। একটু ভাল হলে সিভিল সার্জেন মাকে বল্লেন, আমায় মহীশূরে রাখা এখন সমীচীন নয়, স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া উচিত—এখানে এই সময় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশী। তিন মাসের ছুটি নিয়ে মা'র সঙ্গে প্রথমে সেতারায় গেলুম আমি। তিন মাসের পর মহীশূরে এসে আর তিনমাস থেকে এক বছর পূর্ণ হলে কাজে ইস্তফা দিয়ে ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরলুম। কলকাতায় যেখানে যাই, যার সঙ্গে দেখা হয়, সেই ঠাট্টা করে—"চাকরীর সখ মিটল? স্বাধীন হবার সখ মিটল?"

চাকরীর সখ মিটেছিল বটে, কিন্তু স্বাধীন হবার সখ মেটেনি। শুধু ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সখ ব্যাপক হয়ে জাতি ও দেশগত স্বাধীনতা সখের রূপ নিলে। সখ আর সখমাত্র রইল না, Causeএর আকার ধারণ করলে। আমার নিজের পায়ে ভর ক'রে দেশান্তরে গমন ও অবস্থানে যে মানসিক পুষ্টিবর্ধন হ'ল, সে পুষ্টি যাঁর ইচ্ছায় সাধিত হয়েছিল, তাঁরই ইচ্ছায় যন্ত্রচালিতবৎ হ'য়ে আমার জীবনতরী চলল ও দেশকে চালনা দিলে এক নূতন অজানিত পথে, যার শেষ আজও দুর্লক্ষ্য।

ক্রমশঃ

সম্প্রতিকার একটি খবর হচ্ছে যে, বম্বের প্রযোজক লক্ষ্মীদাস আনন্দ তার ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য দু'লাখ টাকাতে শ্রীমতী কাননের সঙ্গে চুক্তি করেছেন। শোনা গেল প্রেম অদীব ওয়াদীয়া মুভীটোনের আগামী চিত্র 'সরবতী আঁখে'-তে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার জন্যে আহূত হয়ে সওয়া-লাখ টাকা দাবী করেছে। কারদার ঘোষণা করেছে যে, তার পরবর্তী ছবি 'সাজাহানে' অভিনয় করার জন্য তিনটি সুন্দরীকে পঞ্চাশ হাজার করে দিতে প্রস্তুত আছে। আর চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার তো প্রযোজকরা আজকাল একটু নামকরা কেউ হলেই দিয়ে যাচ্ছে। অভিনয়-শিল্পীদের এই ভাগ্যে আমাদের বলবার কিছু থাকতো না যদি না দেখতুম যে এর ফলে সমগ্র শিক্ষাই জঘন্য বিশৃঙ্খলার আড্ডাখানা হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। এইভাবে টাকা বিলিয়ে প্রযোজকরা ছবির খরচ অনর্থক কয়েক লাখ টাকা বাড়িয়ে দিচ্ছে।



কারদার প্রডাকসন্সের 'পহ্‌লে আপ' চিত্রে শামীম ও আনওয়ার

এই বিস্ময়কর পরিমাণ টাকা দেওয়ার পিছনে কোন প্রয়োজনের তাগিদ থাকলে কথা ছিল স্বতন্ত্র, কিন্তু এক প্রচারে সাহায্য করা ছাড়া এই বিতরণের পিছনে আর কোনও যুক্তিই আমরা পাই না। লাখ্ লাখ্ টাকা দাবী করার মত কীর্তিমান কোন একজনও শিল্পী সমগ্র ভারতে আছে ব'লে আমরা বিশ্বাস করি না। তাছাড়া এই দাবী ও দেওয়ার মধ্যে কোন রকম সামঞ্জস্যও খুঁজে পাওয়া যায় না। ছবির যথার্থ নির্মাণকারী যারা অর্থাৎ পরিচালক, লেখক ও কলাকুশলীর দল, তাদের দুমুঠো অন্ন জোটাই দুষ্কর হয়



যখন, তখন যারা ছবির ব্যাপারে নির্মাণকারীদের হাতে পুতুল বৈ নয় তাদের একেবারে রাজা ক'রে দেওয়া সমর্থন করা যায় না কোন বিবেচনাতেই। টাকা যদি দিতেই হয় তো সেটা পাবার প্রধান অধিকারী নির্মাণকারীরা; ছবির সব কিছু নির্ভর ক'রে তাদেরই ওপর—কলাকুশলীদের কাজ রদ্দি হ'লে কোন অভিনয় শিল্পীরই ক্ষমতা নেই সে ছবিকে অসাফল্য থেকে বাঁচাতে পারে, অপরপক্ষে অভিনয় শিল্পীরা কোন কৃতিত্ব না দেখাতে পারলেও সে ছবিকে শুধু কলাকুশলী, পরিচালক ও লেখককে মিলে জনগণের প্রিয় ক'রে তুলতে পারে—সুতরাং ছবির ভালমন্দ আসলে যাদের ওপরে নির্ভর করে পারিশ্রমিকের মোটাভাগ পাওনা তাদেরই। অভিনয় শিল্পীদের অভাবিত পরিমাণ অর্থ পারিশ্রমিক দেওয়ার পক্ষপাতী নির্বোধ প্রযোজকদের এই খেয়াল একটা বিশ্রী বিশৃঙ্খলা আনতে আরম্ভ ক'রেছে। লাখ্ পঞ্চাশ যে সব অভিনয় শিল্পীরা পায়, দু'একশো কি দু'এক হাজার টাকার মাইনে করা কলাকুশলী, কি পরিচালকদের সে তো অগ্রাহ্য ক'রে চলবেই, তাদের কথা মেনে চলতে, ছবির খাতিরে হ'লেও তার মানে আঘাত লাগা স্বাভাবিক; তার অনেক মর্জী ও আব্দার পরিচালক ও কলাকুশলীদের মেনে চলতেই হবে, এদেরও পরে আদেশ করবারই ক্ষমতা পেয়ে যাবে সে। এমন অনেকগুলি ঘটনার কথা আমরা শুনেছি যে, সবক্ষেত্রে পরিচালক ও কলাকুশলীরা এই সব তারকাদের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে। প্রযোজক বা মালিকের কাছে নালিশ চলতেই পারে না—লাখ্ টাকার অভিনয় শিল্পীর চেয়ে নগণ্য বেতনভুক কোন কলাকুশলীকে ত্যাগ করাই যে তাঁর পক্ষে সহজ! প্রযোজকরাও কম ফাঁদে পড়েন না; অভিনয় শিল্পীর পিছনে অগাধ টাকা খাটিয়েছেন ব'লেই সেই অভিনয় শিল্পীর মেজাজের বিরুদ্ধে যাবার ক্ষমতা তাঁর আর থাকে না, তাঁকেও 'কিন্তু' হ'য়ে থাকতে হয় সর্বদাই। এই সব অনিবার্য মনোবিরোধ ছবির উৎকর্ষের পথে অন্তরায় হ'তে বাধ্য যা, ক্রমে সমগ্র শিল্পটাই দেবে উচ্ছন্নে। বম্বের খামখেয়ালী প্রযোজকরা একটু বিবেচনা শক্তির পরিচয় দেবেন কি?

নূতন ছবির পরিচয়

অভিনয় নয়

অভিনয় নয় (কালি ফিল্মস)—**রচনা ও পরিচালনা: শৈলজানন্দ, গান: কাজি নজরুল ও মোহিনী চৌধুরী; আলোকচিত্র: বিভূতি লাহা; শব্দ গ্রহণ: পরিতোষ বসু; সুরযোজনা: গিরীণ চক্রবর্তী; দৃশ্যসজ্জা: গোপী সেন। ভূমিকা: শৈলেন চৌধুরী, দেবী মুখোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, পশুপতি কুণ্ডু, সন্তোষ সিংহ, তুলসী চক্রবর্তী, মাষ্টার শম্ভু, শেফালি, রেণুকা রায়, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় মলিনা প্রভৃতি। ইষ্টার্ণ টকিজের পরিবেশনায় ছবিখানি ২রা মার্চ রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করেছে।**

গৌরবকে বাড়িয়ে যাওয়ার দিকে নজর না দিয়ে গৌরবকে আঁকড়ে ধরে রাখার দিকেই নজর রাখতে গিয়ে লোকের যে অবস্থা হয় 'অভিনয় নয়'এর পরিচালক শৈলজানন্দ পড়েছেন সেই অবস্থায়। পর পর তিনখানি ছবিতে কৃতিত্ব দেখিয়ে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করার পর তিনি ফাঁপরে পড়লেন; তার ওপর ছবির লভ্যাংশের ওপরে নিজের



'মহারথী কর্ণ' চিত্রে পৃথ্বীরাজ ও দুর্গা খোটে

পারিশ্রমিক নির্ভর করার চুক্তি থাকায় আর কথাই রইল না। প্রগতিবাদী শৈলজানন্দ (ফ্যাসিবিরোধী লেখকদের নতুন পরিবর্তিত বিশেষণ) সব ব্রত কর্তব্য ভুলে ট্যাঁকের দিকটার নজর রাখাই সাব্যস্ত ক'রে নিয়েছেন। তাঁর 'শহর থেকে দূরে' নতুন ধরণের প্রমোদ-চিত্র ব'লে অভিনন্দিত হ'য়েছিল; তাতে প্রমোদও ছিল, শিক্ষণীয় বস্তুও ছিল; তার চরিত্রগুলি ছিল জনগণের চেনা পরিচিত জন আর ঘটনাগুলি তাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনকাহিনীর প্রতিরূপ।

যুদ্ধের প্রসঙ্গ

প্রাচ্য রণাঙ্গন—মার্কিন বাহিনী প্রশান্ত মহাসাগরের ভলক্যানো দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত আয়োজিমা দ্বীপে অবতরণ করার পর থেকেই প্রবল জাপ প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। আয়োজিমা একটি ত্রিভুজাকৃতি ছোট দ্বীপ, দৈর্ঘ্যে পাঁচ মাইলের মত আর প্রস্থ সব চেয়ে যেখানে বেশি সেখানে ২ মাইলের কিছু বেশি। এই ক্ষুদ্র দ্বীপটি অধিকারে যে মার্কিন বাহিনীর এত সময় লাগছে, তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, আয়োজিমাতে জাপানীদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা যেমন দৃঢ়, লড়াইও তারা তেমনি মরিয়া হয়েই করছে। খাস জাপানী দ্বীপপুঞ্জ থেকে আয়োজিমার দূরত্ব মাত্র ৭৫০ মাইল। কাজেই জাপানকে ঘর সামলাতে হলে এখানে প্রাণপণ লড়াই করতেই হবে।

এদিকে মার্কিন বাহিনী ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অন্যতম দ্বীপ মিণ্ডানাওয়ে অবতরণ করে মিণ্ডানাওয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত জাম্বোয়াঙ্গা শহর এবং এই দ্বীপের প্রধান বিমান ঘাঁটি স্যানরোক দখল করেছে।

মিণ্ডানাও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। আকার ও গুরুত্বের দিক থেকে লুজনের পরেই মিণ্ডানাওয়ের স্থান। এই দ্বীপের আয়তন ৩৬৯০৬ বর্গ মাইল। যুদ্ধপূর্বে লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৬ লক্ষ। এ দ্বীপটি পর্বতময়, পর্বতগুলির মধ্যে অনেক আগ্নেয়গিরি আছে। আগ্নেয়গিরিগুলির মধ্যে আপো (১০,৩১২ ফুট), ম্যাকাটু-রিঙ্গ, কালায়ো এবং স্যাঙ্গুইল প্রধান। দ্বীপের অভ্যন্তরভাগ দুর্ভেদ্য অরণ্যে আচ্ছাদিত। এই দ্বীপে বহু হ্রদ ও ছোট বড় নদী আছে। প্রধান নদীর নাম রিও গ্র্যাণ্ডে। ১৫২১ সালে পর্তুগীজ পর্যটক ম্যাগেল্যান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের এই মিণ্ডানাও দ্বীপেই প্রথম অবতরণ করেছিলেন। এই দ্বীপের খনিজ সম্পদের মধ্যে তামা, কয়লা ও প্ল্যাটিনাম উল্লেখ-যোগ্য। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান, কফি, শন, আখ, তামাক প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এ ছাড়া এস্থানে গো-মহিষাদি ও ঘোড়ার ব্যবসাও বেশ বড় ছিল।

টোকিওতে মাঝে মাঝেই মার্কিন অতিকায় বিমানগুলি হানা দিচ্ছে। টোকিওর ১৫ বর্গ মাইল স্থান বোমা বর্ষণের ফলে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে বলে রয়টার সংবাদ দিয়েছেন। জাপানের রাজপ্রাসাদের এলাকায়ও নাকি আগুন লেগেছিল। আমেরিকার এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফত জানা গেছে, জাপানীরা ১৫টি অতিকায় বিমান ভূপাতিত ও ৫০টি বিমান ঘায়েল করেছে বলে দাবী

ব্রহ্ম রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষ মান্দালয়ে প্রবেশ করেছে। মান্দালয় উত্তর ব্রহ্মের প্রধান শহর। ইরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। পূর্বে মান্দালয় ব্রহ্মদেশের রাজধানী ছিল। গত কয়দিন ধরে এখানে মিত্রপক্ষের বাহিনীর সঙ্গে জাপানীদের হাতাহাতি সংগ্রাম চলেছে। এই শহরের ফোর্ট ডাফারিনই জাপানীদের প্রধান ঘাঁটি। এখানে মিত্রপক্ষকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। গোলা বর্ষণের ফলে এই দুর্গটির তিন স্থানের দেওয়াল ভেঙ্গে গেছে বলে প্রকাশ। কিন্তু তথাপি এখানে জাপানীরা মরিয়া হয়ে বাধা দিচ্ছে। ঘরে ঘরে প্রবল যুদ্ধ হচ্ছে। মান্দালয় রেঙ্গুন থেকে ৩৮৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এছাড়া শাণরাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ-কেন্দ্র মঙ্গমিও শহর মিত্রপক্ষ দখল করেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

চীনের যুদ্ধ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে বিস্ময়-জনক নীরবতার পর এত সামান্য ও অসংলগ্ন খবর আসে যে, তা থেকে সেখানকার যুদ্ধের অবস্থা ঠিক মতো আন্দাজ করা সম্ভব হয় না। তবে ঐ সব টুকরো-টাকরা খবর থেকে এটুকু বোঝা যায় যে, চীনের যুদ্ধে কোন পক্ষেরই উল্লেখযোগ্য কোন সুবিধা হচ্ছে না। চীনের যুদ্ধ সম্বন্ধে সর্বশেষ যে সংবাদ পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় যে, দক্ষিণ চীনের কিয়াংসি প্রদেশের অন্তর্গত সুইচোয়ান চীনারা পুনরধিকার করেছে। সুইচোয়ানে পূর্বে আমেরিকানদের একটি বিমানঘাঁটি ছিল। গত মাসে আমেরিকানরা এই স্থান ত্যাগ করে সরে এসেছিল। মার্কিন বিমানবহর মাঝে মাঝে জাপ অধিকৃত চীনের রেলপথগুলোর উপর বিমান আক্রমণ চালাচ্ছে বলেও জানা গেছে।

মার্শাল চিয়াং কাইশেক বলেছেন যে, চীন ভূখণ্ডে শীঘ্রই একটা প্রলয়ংকর যুদ্ধ হবে। প্রাচ্য ভূখণ্ডের যুদ্ধ যে চীন ভূখণ্ডেই তার সমাপ্তির পর্যায় শেষ করবে, তা সহজেই অনুমান করা চলে। তবে তা শীঘ্রই হবে কিনা, নিশ্চয় করে বলা শক্ত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের প্রতিনিধি সভায় ডেমোক্রেটিক পার্টির মিঃ ম্যাক্সফিল্ড ব্র্যাকেট কয়েকদিন আগে বলেছেন যে, রুশিয়া ও জাপানের মধ্যে মতভেদ এত বেশী যে, অস্ত্রের সংঘাত ছাড়া তা দূর হবার উপায় নেই। কাজেই যুদ্ধ তাদের মধ্যে অনিবার্য। চিয়াং কাইশেকের উক্তির মধ্যেও কি এ-রকম কোন

সম্প্রতি ফরাসী ইন্দোচীনে ফরাসী ইন্দোচীন বাহিনীর সঙ্গে জাপ সৈন্যদের সংঘর্ষ হয়ে গেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। ফরাসী ইন্দোচীনের গভর্নর-জেনারেল জ্যাঁ ডেকো ও অপর কয়েকজন ফরাসী নেতাকে জাপানীরা গ্রেপ্তার করেছে। জাপানীদের সামরিক কাজে বাধা সৃষ্টি করার জন্যই নাকি জাপানীদের সঙ্গে তাদের এ সংঘর্ষ বেধেছে। সাংহাইয়ে ফরাসী অঞ্চলে যেসব ফরাসী সৈন্য ও পুলিশ ছিল, জাপ সৈন্যেরা তাদের নিরস্ত্র করেছে। আরও নানা স্থানে ফরাসী সৈন্যদের সঙ্গে জাপ সৈন্যদের অল্পবিস্তর সংঘর্ষ হয়ে গেছে। উত্তর ইন্দোচীনে এখনও ফরাসী সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলেছে বলে জানা গেছে। মধ্য ও দক্ষিণাংশে তাদের প্রতিরোধ দমন করা হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। রয়টারের ভাষায়, এই সংঘর্ষকারী ফরাসী সৈন্যেরা 'দ্য গলপন্থী' গেরিলা। এ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃততর সংবাদের প্রতীক্ষায় আমরা থাকবো।

প্রাচ্য খণ্ডের যুদ্ধের অবস্থা যে জাপানের অনেকটা প্রতিকূলে, তা এ অঞ্চলের যুদ্ধের সংবাদগুলো মন দিয়ে অনুসরণ করলেই বোঝা যায়। জাপ পার্লামেণ্টে জাপানের প্রধান মন্ত্রী কুইনাকি কিওসো এক বক্তৃতায় বলেছেন যে, বর্তমান অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক। অথচ অপর-দিকে অস্থায়ী মার্কিন রাষ্ট্রসচিব মিঃ জোসেফ গ্রু তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছেন যে, মার্কিন বাহিনী টোকিওর সাত শত মাইলের মধ্যে উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও জাপানের সংগ্রামশক্তি ক্ষুন্ন করতে পারেনি। তিনি জাপানের সমর-সামর্থ্যের যে বিবরণ দিয়েছেন, তা এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন—'বিমান, ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া যান-বাহন এবং অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করবার মত শক্তি এবং অবস্থা জাপানের এখনও রয়েছে। সম্প্রতি আমরা জাপানের রণ-বিমানগুলি ধ্বংস করে যে হারে জাপ বিমানবহরের ক্ষতিসাধন করছি, ঠিক সেই হারেই ঐ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবার মত অবস্থা এখনও জাপানের আছে। বর্তমানে জাপানের ৪০ লক্ষ সৈন্য আছে। এই সংখ্যার সঙ্গে সে অনায়াসেই আরও ২০ লক্ষ সৈন্য যোগ করতে পারে। শেষোক্ত ২০ লক্ষ লোক প্রস্তুত হয়ে আছে, কিন্তু এখনও এদের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে আহ্বান করা হয় নাই। এ ছাড়াও ১৭ হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক আরও ১০ লক্ষ জাপানী আছে। জাপান প্রতি বৎসর আড়াই লক্ষ নূতন সেনা যুদ্ধে নিয়োগ করতে পারে, অথচ আমরা কিন্তু এখনও ঐ হারে জাপানী সেনা নিধন করতে পারছি না।'

দুদিকের কথাতেই স্বজাতিকে সমর-সচেতন করবার জন্য একটু আতিশয্য আছে বলে মনে হয়।

পুস্তক পরিচয়

শাশ্বত পিপাসা—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—কাত্যায়নী বুক ষ্টল, ২০৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ মূল্য চার টাকা। ডবল ক্রাউন ৩৩১ পৃষ্ঠা।

কথা-সাহিত্যিক রামপদ বাবুর 'শাশ্বত পিপাসা'র সঙ্গে বাঙলার পাঠক পাঠিকাদের অনেকেরই পরিচয় আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে এই উপন্যাসখানা 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়; তখনই এখানা রসগ্রাহী পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। 'শাশ্বত পিপাসা' এতদিন পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি; ইহাতে অনেকের পক্ষে রামপদবাবুর এই উপন্যাসখানার রস আস্বাদ করিবার সমধিক সুযোগ ঘটিবে। রামপদবাবুর এই উপন্যাসখানায় আদ্যোপান্ত তাঁহার সূক্ষ্ম রসনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিন বাঙলা দেশের একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী আমাদিগকে বলিতেছিলেন যে, রসের অনুভূতির গতি অতি দ্রুতভাবে হইয়া থাকে, দ্রুত সেই রসানুভূতিকে ভাষার বন্ধনে প্রত্যাখন চেতনাদান করা সহজ নয়। রামপদবাবুর তুলিকার সে শক্তি আছে। তিনি অনুভূতির রসকে উজ্জ্বললীলায় ফুটাইয়া চিত্তে দোলা দিবার কৌশল জানেন। 'শাশ্বত পিপাসায়' তাঁহার এই কৃতিত্বের বিশেষ পরিচয় সকলে লাভ করিবেন। তিনি আলোচ্য উপন্যাসখানাতে মাকে আঁকিয়াছেন এবং বাঙলার শ্যামল অঞ্চলে মায়ের সেই অনবদ্য মাধুরী উচ্ছল করিয়া তুলিয়াছেন; ধাত্রীরূপে ধরিত্রী আলো হইয়াছে। এই রূপের বিকাশ ও বিলাস তাঁহার লেখনীর ছন্দে হিন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার যোগমায়া মাতৃমাধুরীর পরম প্রকাশ। ন'বছরের মেয়ে যোগমায়া স্বামীর গৃহের উঠানে পা দিয়া সভয়ে শাশুড়ীর আঁচল চাপিয়া ধরিল, তখনও সে মা। তাঁহার অন্তরে জননীর বেদনা গোপন ছিল, প্রস্ফুটিত কমল দলের মত জীবনের স্তরে স্তরে তাহা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল—কমলের মতই তাহা অমল ও উজ্জ্বল। বিশ্বজননী যিনি, তিনিই যেন যোগমায়ার বুকে সাধনা করিতেছিলেন। ছেলে কোলে পাইয়া বুকে আনন্দের দোল উঠিল। যোগমায়ার মায়ের সেই আপ্যায়ন আপনার প্রাণ-রসধারায় বিশ্বের সর্বত্র সঞ্চারিত হইল। স্তন্যপানরত শিশুকে বুকে চাপিয়া যোগমায়া যে গুণ গুণ ধ্বনি তুলিল—"নারী কণ্ঠোত্থিত সেই অতি মৃদু সুর—ভাঙ্গা ঘরের বাতায়ন দিয়া—অতীত ও অনাগতকালের তরঙ্গকে স্পর্শ করিবার আগ্রহে বিপুল পৃথিবীর বুকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।" রামপদবাবুর শ্বাশ্বত-পিপাসায় সর্বত্র আমরা মায়ের এই কোমল বচনের অনুধ্যান দেখিতে পাই। বৈষ্ণব সাধকগণ বলেন, বচনের ভিতর দিয়া যে রস উদ্গীত হয়, পাদপদ্মের আলিঙ্গনে তাহা স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে। চরণ নূপুরধ্বনি সূত্রেই আমরা রসানুভূতিতে উদ্দীপ্ত সত্তাকে একান্ত করিয়া পাই। রামপদবাবুর আলোচ্য উপন্যাসখানাতে মাতৃস্নেহে আত্মনিবেদনের এই রসই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকার প্রধানত ত্রিধারাকে আশ্রয় করিয়া মাতৃমাধুরীর এই রস-চাতুরী অভিব্যক্ত করিয়াছেন। যোগমায়ার বধূজীবনের প্রথমভাগে তাহার ননদ কমলা এবং তাহার সই রাধারাণী এবং পরবর্তী জীবনে কালীতারা এবং পূর্ণিমা এজন্য এই কয়েকটি চরিত্রের পটভূমিকার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। উজ্জ্বল উচ্ছল এই মাতৃলীলার অপেক্ষাকৃত গূঢ়তর স্তরে যোগমায়ার মা লবঙ্গলতা, যোগমায়ার শাশুড়ী এবং পরম স্নেহময়ী নানাভাবে এই মাতৃ-মাধুর্যেরই প্রভাব উপলব্ধি হইবে; পরিণত বয়সের এই কয়েকটি চিত্রে মাতৃ-মাধুর্যের নির্বিশেষত্বই সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছে; শেষোক্ত চরিত্রের সংবেদনা সূক্ষ্ম অথচ তীব্র।

চাতুরীই কেবলা রীতি এবং রসের তাহাতেই স্থিতি। এই হিসাবে যোগমায়ার পরেই রাধারাণী এবং পূর্ণিমার কথা আমাদের মনে পড়ে। যোগমায়ার চরিত্রে স্রষ্টা গ্রন্থকার, যে চাতুরীর দ্রষ্টা, যোগমায়া তাহা জানে না, যোগমায়ার কাছে তাহা গোপন; এজন্যই শিল্পীর এই চাতুরী সবচেয়ে সেক্ষেত্রে মাধুরী খেলিয়াছে। রাধারাণী, কমলা ও পূর্ণিমা অপেক্ষাকৃত আত্মসচেতন, মাধুর্যের রঙ্গ তাহারা বোঝে এবং সে রঙ্গ যখন তাহাদের অঙ্গে খেলে, তখন তাহারা তাহা জানে, এতদুভয় সৃষ্টির মধ্যে এই পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু স্ফুটতর স্থূল অভিব্যক্তির এ আশ্রয় না লইলে গোপন রসকে বেদনায় চেতনা দান করা সম্ভব হয় না। বাহ্যত যোগমায়ার চরিত্রে মাতৃমাধুর্যের অগ্নিময় ঐশ্বর্যের অভাব অনেকে উপলব্ধি করিবেন এবং যোগমায়ার সঙ্গিণী রাধারাণীর চরিত্রে অপেক্ষাকৃত স্ফুটতরভাবে মাতৃপ্রেমের রৌদ্র-বিলাসের পরিচয় পাইবেন; কিন্তু রাধারাণীর চরিত্রে যে রস বাৎসল্যের বিপুল বেদনায় প্রস্ফুট—গ্রন্থকার যোগমায়ার চরিত্রে গূঢ়তর ইঙ্গিতে সেই রসকে প্রদ্যোতিত করিয়াছেন। বাঙলার স্বাভাবিক ধারার সঙ্গতিসূত্রে ইহাতে তাঁহার সৃষ্টি সমধিক সার্থকতা লাভ করিয়াছে; অল্প বলিয়া তিনি অনেক বুঝাইয়াছেন। এইরূপ পূর্ণিমার উচ্ছল মাধুরীর লীলা সকলের দৃষ্টিকে সহজেই আকৃষ্ট করিবে, কিন্তু স্রষ্টার পক্ষে তাহাই পরম বস্তু নয়। যোগমায়ার চরিত্র বিকাশের ইহা আনুষঙ্গিক বলা চলে; তথাপি বলিব, কুষ্টিয়ার এই লীলাময়ী তরুণীর প্রসঙ্গটি উপন্যাসখানাকে বেশ সরস এবং মধুর করিয়াছে। আলোচ্য উপন্যাসখানার পুরুষ চরিত্রও কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়াছে। যোগমায়ার পিতা এবং তাঁহার স্বামী রামচন্দ্রের চরিত্র-চিত্রণে গ্রন্থকার যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বাঙলার সমাজের গূঢ় বেদনা এই চরিত্রগুলির দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়া একটি অখণ্ড ধারণায় অভিব্যক্ত হইয়াছে, আর সেই বেদনার আপ্যায়ন বা সান্ত্বনাকেই রামপদবাবু মাতৃ-মাধুরীতে রূপ দিয়াছেন। মা-ই মোদের রাজা, মা-ই মোদের রাণী—রামপদবাবুর সাধনার এক্ষেত্রে ইহাই বাণী। তাঁহার এই মাতৃ-সাধনা বাঙলার সমাজের সর্বত্র শক্তি সঞ্চার করিবে। বাঙালী সে বেদনায় আপন-পর ভুলিয়া ঘরে ঘরে মাকে দেখিবে এবং মায়ের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রকে তাহার জাতীয় জীবনে সার্থক করিবে, আমরা ইহাই আশা করি।

গঙ্গোত্রী

সুবোধ ঘোষ

(১৯)

সারা মান্দার গাঁ চুপ করে আছে। সঞ্জীববাবু চুপ করে বসেছিলেন। মাধুরী চুপ করে বসেছিল। শুধু চুপচাপ এক একটি খবর আসছে। গফুরাবাদে খুব জোর হাঙ্গামা বেধেছে। দলে দলে গ্রেপ্তার হয়েছে। সাঁওতালেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুলিশের লাঠির মার খাচ্ছে। তীর ধনুক টাঙি ফেলে দিয়ে তারা চুপ করে শালবনের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। ডাকলে কাছে আসে না, মারলে নড়ে না। জেলা বোর্ডের সড়কে নতুন পুলের ওপর তিন গাঁয়ের লোক জমা হয়েছে। পুলের দুদিকে দুসার পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। অনেকে গ্রেপ্তার হয়েছে। ভীড় না হঠে গেলে, এবার মার আরম্ভ হবে।

এক একটি খবর শুনে সঞ্জীববাবু মাধুরীর দিকে তাকিয়ে দেখেন। মাধুরী মুখ নামিয়ে নেয়। চারদিকে ঝড় মেতে উঠেছে, তবু মাধুরী যেন ঝাপটা থেকে নিজেকে এড়িয়ে এক কোনে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে চাইছে। সঞ্জীববাবুর মুখের ভাব ক্রমেই মলিন ও বিমর্ষ হয়ে আসছিল। তাঁর মনের শঙ্কা ও সন্দেহটা যেন আজকের পরীক্ষার দিনে সত্য প্রমাণিত হতে চলেছে।

সঞ্জীববাবুর এতটা চিন্তা করার কোন কারণ ছিল না, যদি তিনি দেখতেন প্রতিদিনের মত একটি উৎসাহের শিখা হয়ে মাধুরী আজও ঘরের বাইরে গাঁয়ের পথে নেমে পড়েছে। ঘরের সবাইকে ডাক দিচ্ছে. ঝড়ের মুখে গাঁয়ের সকল প্রতিজ্ঞার কাঠিন্যকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পুলিশ ফৌজের আবির্ভাব গ্রামকে চুপ করিয়ে দেবে না, বরং ঘরে ঘরে শঙ্খ বেজে উঠবে। প্রতিদিনের মত মাধুরী আবার জনতার পুরোভাগে দাঁড়াবে। এই রকম একটা দৃশ্যের আশা হয়তো মনে মনে কামনা করছিলেন সঞ্জীববাবু। কিন্তু সংশয়ে ছিল, শেষ পর্যন্ত মাধুরী......।

মনে মনে একটা যন্ত্রণা অনুভব করছিলেন সঞ্জীববাবু, বিবেকের ধিক্কারের মত। আজকের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে কেশব ভটচাযের কথা যে বার বার মনে পড়ছে, তার কারণও তাই। কেশব ভটচায বিলেত যায়নি। নাই বা গিয়েছিল, কিন্তু সেই জন্য কি......। পরিতোষ বিলেত গেছে, কিন্তু আজও মাধুরীর জীবনের ইঙ্গিতের সঙ্গে তার মত পথ কর্তব্য ও আদর্শের সূত্রটি অটুট আছে কি? বার বার সন্দেহ হয় সঞ্জীববাবুর। কেশব আজ অনেক দূরে সরে গেছে, পর হয়ে গেছে। তা না হ'লে আজ মাধুরী এভাবে অসহায় হয়ে পড়তো না। হাঙ্গামার খবর শুনে চুপ করে মাটির দিকে থাকতো না।

সঞ্জীববাবু বললেন—তুই চুপ করে আছিস কেন মাধুরী?

মাধুরী—কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

সঞ্জীববাবু—তুই পারবি না।

মাধুরী চমকে উঠে প্রশ্ন করলো—কি পারবো না বাবা?

সঞ্জীববাবু—আজকের সমস্যাকে সমাধান করা তোর শক্তিতে কুলোবে না।

মাধুরী—শেষ পর্যন্ত পেরে যাব আশা আছে।

সঞ্জীববাবু হাসলেন—আমি অপেক্ষায় আছি। দেখি কতদূর কি করতে পারিস।

বিদ্যাপীঠের ছেলেরা এসে খবর দিল—রতন চৌকীদার গ্রেপ্তার হয়েছে। কোমরে দড়ি বেধে বোর্ড আফিসের বারান্দায় একটা খুঁটোর সঙ্গে বেঁধে রেখেছে রতনকে।

মাধুরী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। বিদ্যাপীঠের ছেলেরা আবার সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলো—এবার কি করতে হবে বলুন?

গফুরাবাদের চাষীরা গাঁয়ের মান রেখেছে, প্রতিজ্ঞার মর্যাদা রেখেছে। দূর ডিহির সাঁওতালেরা তাদের শপথ ভোলেনি। কিন্তু সকল আন্দোলনের যে সঞ্চারিনী শিখা, সেই মাধুরী যেন ক্লান্ত হয়ে গেছে, নিরুজ্জল প্রদীপের মত।

ছেলেরা আবার প্রশ্ন করলো—রতনকে কি এইভাবে আমরা বিদায় দেব? কি ভাববে রতন?

ছেলেরা মর্মে মর্মে লজ্জিত হয়ে পড়ছিল। মাধুরীর অন্যমনস্কতা যেন কঠিন আবরণের মত তার সত্তার সকল চঞ্চলতাকে চেপে রেখেছিল। আজকের সংকটে সত্যিকারের কাজের আহ্বান এসেছে। মাধুরীর জীবনের আদর্শের সব চেয়ে পরীক্ষা এসেছে। তার স্বদেশীর দীক্ষাকে আজ ইচ্ছে করলে সে চরমভাবে শুদ্ধ করে নিতে পারে। ইচ্ছে করলে ভুলও করতে পারে। সকলের জাগরণের ছন্দে আজ সুরের হাওয়া লাগতে পারে। সবই নির্ভর করে মাধুরীর ইচ্ছার ওপর।

মাধুরী জানে, তার মনের জড়তা এক্ষুণি নিঃশেষে উবে যাবে, যদি আজ তার একাকীত্বের গর্বকে আজ সে পরিহার করতে পারে। আজও যদি কেশবদার সামনে গিয়ে একবার দাঁড়ায়—একটি সহজ কথার দাবী জানায়—এস কেশবদা, তুমি ছাড়া গাঁয়ের কে মান রাখবে? মাধুরীর পৃথিবী বদলে যাবে সেই মুহূর্তে। সংকটের ধাঁধাঁ ঘুচে যাবে। আজকের কুয়াশা এক ঝলক আলোকে ঝলসে যাবে। পথ দেখা দেবে। সেই পথে মাধুরী আর একা নেই। তার স্বদেশী ব্রতে আর আন্দোলনের ভৈরব পরিণামের মধ্যেও হাত বাড়ালেই একটি সাথীর হাতের নির্ভর সে খুঁজে পাবে। কিন্তু...।

মাধুরীরও কোন সংশয় ছিল না। মান্দার গাঁয়ের স্বরাজের সংকল্পে যে বাধা ঘনিয়ে এসেছে, তার চেয়ে বড় দ্বন্দ্ব ছিল তার নিজেরই অন্তরে। আজ কেশবদাকে ডাকলে, বিলেতের ডাকের চিঠি ব্যর্থ হয়ে যায়। এই পথে পা দিলে, আর এক পথ মুছে যাবে।

সঞ্জীববাবু ভুল বুঝেছিলেন মাধুরীকে। মাধুরীর স্তব্ধতাকে তিনি হয়তো ভীরুতা মনে করেছিলেন। কিন্তু কিসের ভীরুতা, সঞ্জীববাবু সে ধারণা করতে পারেননি।

পরিতোষের কাছে কালও চিঠি দিয়েছে মাধুরী। ভোর হতে না হতেই যেন সেই লিপিকার প্রত্যেকটি আশ্বাস ও বাণীকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য মান্দার গাঁয়ের দুয়ারে এক পরীক্ষার সশস্ত্র মূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে। সারা মান্দার গাঁ প্রস্তুত হয়ে আছে। এই পরীক্ষার সকল আঘাতের মুখে মান্দার গাঁ তার অদৃষ্টকে পেতে দিতে প্রস্তুত হয়ে আছে। শুধু একবার শাঁখ বাজলেই হলো।

বিদ্যাপীঠের ছেলেরা অধীর হয়ে উঠছিল। কিন্তু মাধুরী সাড়া দিতে পারছিল না। পুলিশ এসে যদি সকলকে বাদ দিয়ে এক্ষুণি শুধু মাধুরীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, তবেই যেন মাধুরী মুক্তি পায়। মনে মনে তাই কামনা করছিল মাধুরী। সারা গাঁয়ের বিদ্রোহের ঝড়কে

পরিচালনা করার কৌশল ভেবে উঠতে পারে না, ভয়াবহ মনে হয় প্রতি পদে ভুল হয়ে যাবে।

জেলা বোর্ডের সড়কে ধূলো উড়ছিল। গফুরবাদের বন্দী চাষীর দল পুলিশ পাহারায় সদরে চলেছে। তাদের সহর্ষ জয়ধ্বনি শোনা যায়। বিদ্যাপীঠের ছেলেরা আরও চঞ্চল হয়ে ওঠে।

দলে দলে গ্রেপ্তার হবে, লাঠি চলবে, গুলী চলতে পারে—মান্দার গাঁয়ের মূক মুখে একটি ধ্বনি জাগতেই যে পরিণাম দেখা দেবে, মনে মনে সবই কল্পনা করতে পারছিল মাধুরী। এই ঝঞ্ঝার আবির্ভাবকে এড়িয়ে যাওয়ার একমাত্র পথ, যদি শুধু মাধুরীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ চলে যায়।

মাধুরীর মনের দ্বিধা যেন নিঃশব্দে জপের মত গাঁয়ের হৃদয়ের উচ্ছাসকে শান্ত করে রাখবার চেষ্টা করছিল।

মাধুরী বললো—কোন হাঙ্গামা করার দরকার নেই। পুলিশ যদি আমাকে গ্রেপ্তার করতে চায় করুক।

বিদ্যাপীঠের ছাত্রেরা আশ্চর্য হয়ে বললো শুধু আপনাকে গ্রেপ্তার করলে কি লাভ হলো?

প্রশ্নের উত্তরে মাধুরীর মনের ভেতরেই ধ্বনিত হলো, বিদ্যাপীঠের ছাত্রেরা তা জানে না। সব চেয়ে বড় লাভ হয়, মাধুরী আজকের সংকট থেকে মুক্তি পায়। কেশব ভটচাযের সান্নিধ্য ছেড়ে সে সরে পড়তে পারে। এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। মাধুরীর স্বদেশীয় সম্মান আর বিলেতের ডাকের চিঠির আশ্বাস, দুই সত্য অটুট থাকে।

আর তা যদি না হয়, কেশব ভট্চাযের অস্তিত্বকে যদি আবার পাশে পাশে শহরের মত গ্রহণ করতে হয়, মাধুরী জানে, আর তার মুক্তি নেই। সেই পুরাতন দিনের দাবীগুলি আবার পরিপূর্ণ বাতাসের নিঃশ্বাসে জেগে উঠবে। মান্দার গাঁয়ের অস্থির বক্ষ দিয়ে তৈয়ারী কেশব ভট্চাযের নেতৃত্বের কাছে মাধুরী টিঁকে থাকতে পারবে না। আবার পেছু পেছু চলতে হবে, পথ চেয়ে থাকতে হবে। মাধুরী সব বুঝে নিয়ে আবার সে পথে পা দিতে পারে না।

আর এক পথ ছিল। যা ইচ্ছে করুক বিদ্যাপীঠের ছেলেরা। হাঙ্গামা হোক, মান্দার গাঁয়ের স্বরাজের ব্রত চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যাক। মাধুরী আর সাড়া দিতে পারবে না। আজ এইখানেই তার ব্রত সাঙ্গ হয়ে যাক। বোর্ড অফিসের মাথায় ইউনিয়ন জ্যাক উড়তে থাকুক, ঘরে ঘরে জাতীয় পতাকা অনাদরে কুঁচকে পড়ে থাক, মাধুরীর সঙ্গে আর এসবের কোন সম্পর্ক নেই। হঠাৎ মীরগঞ্জ থেকে এসে গাঁয়ের বুকে আগুন ছুঁইয়ে দিয়েছে মাধুরী। আবার হঠাৎ সে চলে যাবে। আজই চলে গেলে ভাল। মান্দার গাঁ পড়ে থাকুক তার ভালমন্দ অদৃষ্টের উপহার নিয়ে।

এতক্ষণ গম্ভীর হয়েছিল মাধুরী। কিন্তু এইবার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। নিজের সত্তাকে এত লঘু বলে ভাবতে পারে না, বিশ্বেস করতে পারে না মাধুরী। কলেজ ছেড়ে দেওয়া, চরকা-ব্রত, দেশব্যাপী চাঞ্চল্যের প্লাবনে আত্মবিসর্জনের আনন্দের আস্বাদ, এ সবই কি তার মনের কতগুলি প্রগল্ভ ফ্যাসানের ক্ষণিক উচ্ছ্বাস? এর মধ্যে কি কোন সত্য নেই? হয়তো তার যোগ্যতা নেই, শক্তি নেই। হয়তো পদে পদে ভুল হয়, ভয় পেয়ে যেতে হয়। কিন্তু এরই মধ্যে সে যে আত্মগৌরবের প্রসন্নতা সৃষ্টি করেছে, প্রতিদিন নিভৃত চিন্তায় সকল তৃষ্ণা দিয়ে উপভোগ করে এসেছে, তাকে অস্বীকার করা যায় না। হয়তো খেলাচ্ছলেই নিজের অন্তরে এক নতুন সত্য সৃষ্টি করে ফেলেছে মাধুরী। তবুও তাকে উপেক্ষা করার মত শক্তিও যে পাওয়া যায় না। বুদ্ধির বিচার দিয়ে তাকে তুচ্ছ করলেও মন দিয়ে তাকে হেয় করা যায় না।

আবার মীরগঞ্জে ফিরে গিয়ে, আবার কলেজে ভর্তি হয়ে, আবার বিলেতের ডাকে একটি চিঠি দিয়ে পরিতোষকে খুশী করে দিয়ে……। হ্যাঁ, করতে পারলে ভাল ছিল। কিন্তু সম্ভব নয়।

বিদ্যাপীঠের ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে সঞ্জীববাবুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অর্থ আভাসে বুঝতে পেরে, বিকেলের পড়ন্ত রোদের রক্তাভ আবেদনের স্পর্শ পেয়ে মাধুরী যেন ধীরে ধীরে বিচলিত হয়ে পড়ছিল।

ছেলেদের দিকে তাকিয়ে মাধুরী বললো—চল, কেশবদার কাছে আগে যাই, পরামর্শ করি, তারপর……।

মুহূর্তের মধ্যে ছেলেদের চোখে-মুখে যেন একটা বিদ্যুতের উজ্জ্বলতা খেলা করে উঠলো। —আমরা তাই ভাবছিলাম মাধুরীদি। কেশবদা আজ আমাদের সঙ্গে থাকলে……

কথাটা শুনতে পেয়ে সঞ্জীববাবু ধড়মড় করে উঠলেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসলেন। তারপর মাধুরীর মাথায় হাত দিয়ে যেন আশীর্বাদের ভঙ্গিতে বললেন—আমিও তোকে এই কথাই বলতে চাইছিলাম মাধুরী। কালও বলেছিলাম, কিন্তু তুই বুঝতে পারিসনি।

ছেলেরা উল্লাসে কলরব করছিল। মাধুরী উঠে দাঁড়ালো। ছেলেরা তাদের মাতামাতির মধ্যে এক একবার হঠাৎ বিস্মিত হয়ে দেখতে পাচ্ছিল—মাধুরীদির চোখের কোণে জলের ফোঁটা চিক চিক করছে।

সুরু হলো শুভ অভিযান। সঞ্জীববাবু বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে রইলেন।

পুরোভাগে উঁচু জাতীয় পতাকা ফরফর করে উড়ছিল বাতাসে। পেছনে সার দিয়ে শোভাযাত্রা। তেলিপাড়া, কামারপাড়া পার হয়ে শোভাযাত্রা এগিয়ে চললো। প্রতি পাড়ায় নতুন লোক এসে শোভাযাত্রায় ভিড় করছে। শাঁখের আওয়াজে গ্রামের হৃৎপিণ্ড গম গম করছে, সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত হয়ে একে একে সবাই আসছে। কালীতলার প্রাঙ্গন পার হয়ে, ক্ষেতের আল ধরে, ভটচায বাড়ির পুকুরের কাছে এসে শোভাযাত্রা থামলো।

কেশব ভটচাযের বাড়ির ভেতর গিয়ে ঢুকলো মাধুরী।

শোভাযাত্রার হৃদয় মথিত করে আর একবার তীব্র জয়ধ্বনি উথলে পড়লো। কেশব ভটচায মাধুরীর সঙ্গে হাসতে হাসতে চলে আসছে।

কেশব একবার চারদিকে তাকিয়ে যেন কাউকে খুঁজলো। —অজয় আসেনি?

মাধুরী উত্তর দিল—না।

কেশব- চল, আগে ওকে ডেকে নিই।

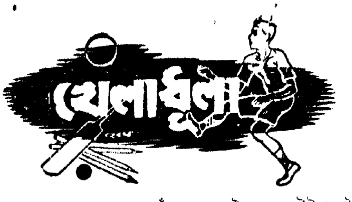
মান্দার গাঁয়ের গোপন আবেগের অন্তর থেকে যেন শত স্রোত এসে শোভাযাত্রায় মিশে গেছে। আজ আর কোন বিরোধের বেড়া কাউকে ভাগ করে রাখতে পারেনি। শোভাযাত্রার মাঝখানে দাঁড়িয়ে যে মাধব সামন্ত চীৎকার করছে, ঠিক তারই পেছনে রয়েছে হরেরাম সরকার। মামলার বাদী-বিবাদী দুই শত্রু আজ এক হয়ে মিশে গেছে। মীরগঞ্জের আদালতে আজও এই মামলার নিষ্পত্তি হয়নি, কিন্তু এখানে সব নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।

শোভাযাত্রা এগিয়ে চললো দিঘীর পাড়ের দিকে। কেশবের মা সারদা দেবী উঠোনের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। শোভাযাত্রার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কেশব আর মাধুরী পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। সারদার চোখে যেন একটা আশীর্বাদের দৃষ্টি জ্বলজ্বল করছিল।

অজয় মিত্তিরের বাগানের পাশে পৌঁছে শোভাযাত্রী জনতা একবার জয়ধ্বনি করলো। অজয় মিত্তির এসে সামনে দাঁড়ালো। চারদিকে তাকিয়ে অজয় যেন কাউকে খোঁজ করলো। পরমুহূর্তে জনতার মধ্যে মিশে গেল অজয়।

শোভাযাত্রা আরও কিছুদূর অগ্রসর হতেই একজন কনেস্টবল এসে দাঁড়ালো। বললো—এস-ডি-ও সাহেব আর ইন্সপেক্টর সাহেব কেশব ভটচাযকে ডাকছেন।

কেশব এগিয়ে এসে উত্তর দিল—হ্যাঁ, এই তো যাচ্ছি। (ক্রমশ)



ক্রিকেট

আন্তঃপ্রাদেশিক রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সকল খেলা শেষ হইয়াছে। বোম্বাই দল এই বৎসরের বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছে। বোম্বাই দল এইবার লইয়া চতুর্থবার রণজি কাপ বিজয়ী হইবার গৌরব অর্জন করিল। ইতিপূর্বে কোন প্রাদেশিক দলের পক্ষে এত অধিকবার রণজি ক্রিকেট কাপ বিজয়ী হওয়া সম্ভব হয় নাই। বোম্বাই দলের এই সাফল্য কৃতিত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয়।

ফাইনালে বোম্বাই দলের সহিত হোলকার দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। দীর্ঘ ছয় দিন খেলা চলিবার পর বোম্বাই দল খেলায় ৩৭৪ রানে জয়লাভ করিয়াছে। এই খেলায় রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় তিনটি নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিম্নে উক্ত রেকর্ডের তালিকা প্রদত্ত হইল :—

(১) এই খেলায় বোম্বাই দলের আর এস মোদী দুই ইনিংসে ৯৮ রান ও ১৫১ রান করিয়া মোট প্রতিযোগিতায় ১০০৮ রান সংগ্রহ করত ব্যক্তিগত মোট রানসংখ্যার নূতন রেকর্ড করিয়াছেন। ইতিপূর্বে মহারাষ্ট্র দলের এস ডবলিউ সোহনী ১৯৪১ সালে মোট ৫৬৫ রান সংগ্রহ করিয়া রেকর্ড করেন।



আর এস মোদী

(২) হোলকার দলের সি এস নাইডু বোম্বাই দলের দ্বিতীয় ইনিংসে মোট ৮৮ ওভার বল করিয়া এক ইনিংসের মোট ওভার বলের নূতন রেকর্ড করিয়াছেন। ইতিপূর্বে ১৯৪০-৪১ সালে মহারাষ্ট্র দলের এস জি সিন্ধে বোম্বাই দলের বিরুদ্ধে মোট ৭৫-৫ ওভার বল করিয়া রেকর্ড করেন।

(৩) ডেনিস কম্পটন ও রাওয়াল হোলকার দলের দ্বিতীয় ইনিংসের শেষ উইকেটের খেলায় একত্রে ১০৯ রান সংগ্রহ করিয়া নূতন রেকর্ড করেন।

ফাইনাল খেলায় উক্ত তিনটি নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা হওয়া ছাড়াও উভয় দলের পাঁচজন খেলোয়াড় ব্যাটিংয়ে অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। বোম্বাই দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় দলের অধিনায়ক বিজয় মার্চেণ্ট ২৭৮ রান, আর এস মোদী ১৫১ রান ও আর এস কুপার ১০৪ রান করেন। হোলকার দলের মুস্তাক আলী প্রথম ইনিংসে ১০৯ রান ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩০ রান করেন। ইতিপূর্বে কোন প্রথম শ্রেণীর খেলায় মুস্তাক আলীকে এইভাবে পর পর দুই ইনিংসে শতাধিক রান সংগ্রহ করিতে দেখা যায় নাই। দলকে পরাজয়ের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা খেলার ফলাফল হইতেই বুঝিতে পারা যায়। হোলকার দলের পক্ষে ইংলণ্ডের টেস্ট খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটন খেলেন। তিনি প্রথম ইনিংসে সুবিধা করিতে না পারিলেও দ্বিতীয় ইনিংসে শেষ পর্যন্ত খেলিয়া ২৪৯ রান করিয়া নট আউট থাকেন। শেষ সময়ে প্রত্যেক ওভারে ১০।১২ করিয়া রান সংগ্রহ [illegible] ব্যাটিংয়ের অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। একরূপ তাঁহার জন্যই শেষ উইকেটে ১০৯ রান সংগৃহীত হয় ও নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।

খেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বোম্বাই দল টসে জয়ী হইয়া প্রথম ব্যাটিং গ্রহণ করে। সমস্ত দিন ব্যাট করিয়া প্রথম দিনের শেষে ৭ উইকেটে ৩৩৮ রান করে। আর এস মোদী মাত্র দুই রানের জন্য শত রান পূর্ণ করিতে পারেন না। দ্বিতীয় দিনের মধ্যাহ্ন-ভোজের পূর্বে বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংস ৪৬২ রানে শেষ হয়। সি এস নাইডু ১৫৩ রানে



বিজয় মার্চেণ্ট



সি এস নাইডু

৬টি উইকেট লাভ করেন। হোলকার দল খেলা আরম্ভ করে ও দ্বিতীয় দিনের শেষে ৪ উইকেটে ১৯৯ রান করিতে সক্ষম হয়। মুস্তাক আলী ৭০ রান করিয়া নট আউট থাকেন। তৃতীয় দিনে মধ্যাহ্নভোজের অল্প পরেই হোলকার দলের প্রথম ইনিংস ৩৬০ রানে শেষ হয়। মুস্তাক আলী ১০৯ রান করিয়া ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বোম্বাই দলের ফাদকার ৭৫ রানে ৫টি উইকেট পান। বোম্বাই দল প্রথম ইনিংসে ১০২ রানে অগ্রগামী হইয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। তৃতীয় দিনের শেষে ২ উইকেটে ১৬৫ রান করে। আর এস মোদী ৫৯ রান ও বিজয় মার্চেণ্ট ৯ রান করিয়া নট আউট থাকেন। চতুর্থ দিনে সমস্ত দিন বোম্বাই দল ব্যাট করে ও দিনের শেষে ৩ উইকেটে ৫৪৫ রান সংগ্রহ করে। বিজয় মার্চেণ্ট আর এস মোদীর সহিত তৃতীয় উইকেটে ২২৬ রান ও আর এস কুপারের সহিত চতুর্থ উইকেটে ২০২ রান সংগ্রহ করেন। আর এস মোদী ১৫১ রান করিয়া আউট হন। কিন্তু বিজয় মার্চেণ্ট ২০৪ রান ও আর এস কুপার ৭৭ রান করিয়া নট আউট থাকেন। পঞ্চম দিনে বেলা ৩টা ১০ মিনিটের সময় বোম্বাই দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৭৬৪ রানে শেষ হয়। বিজয় মার্চেণ্ট ২৭৮ রান ও আর এস কুপার ১০৪ রান করেন। হোলকার দল ৮৬৬ রান পশ্চাতে পড়িয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। পঞ্চম দিনের শেষে ২ উইকেটে ১৭৭ রান করিতে সক্ষম হয়। মুস্তাক আলী ১০৬ রান ও ডেনিস কম্পটন ৫৫ রান করিয়া নট আউট থাকেন। ষষ্ঠ দিনের চা-পানের অল্প পরে হোলকার দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৪৯২ রানে শেষ হয়। ডেনিস কম্পটন ২৪৯ রান করিয়া নট আউট থাকেন। তিনি উক্ত রানের মধ্যে ১৯টি বাউণ্ডারী করেন। বোম্বাই দল খেলায় ৩৭৪ রানে জয়লাভ করে।

পূর্ববর্তী বিজয়ী দল :—১৯৩৪-৩৫ সালে বোম্বাই, ১৯৩৫-৩৬ সালে বোম্বাই, ১৯৩৬-৩৭ সালে নবনগর, ১৯৩৭-৩৮ সালে হায়দরাবাদ, ১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙ্গলা, ১৯৩৯-৪০ সালে মহারাষ্ট্র, ১৯৪০-৪১ সালে মহারাষ্ট্র, ১৯৪১-৪২ সালে বোম্বাই, ১৯৪২-৪৩ সালে বরোদা, ১৯৪৩-৪৪ সালে পশ্চিম ভারত রাজ্য দল।

আর এস মোদীর অপূর্ব কৃতিত্ব

বোম্বাইর তরুণ পার্শী খেলোয়াড় আর এস মোদী এই বৎসর রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলায় যেরূপ অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন ইতিপূর্বে ভারতের কোন্ খেলোয়াড়ের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই। তিনি এই বৎসরের রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলায় মোট ১,০০৮ রান সংগ্রহ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে ১৯৪১ সালে মহারাষ্ট্র দলের এস ডবলিউ সোহনী মোট ৫৬৫ রান সংগ্রহ করিয়া ব্যক্তিগত মোট রানের রেকর্ড করেন। আর এস মোদী সেই রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন। ইহ ছাড়াও তিনি প্রতিযোগিতার প্রত্যেক খেলায় কোন-না-কোন ইনিংসে শতাধিক রান সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাও একটি নূতন রেকর্ড। আর এস মোদীর বর্তমান বয়স মাত্র ২১ বৎসর। সুতরাং অদূরভবিষ্যতে তিনি ভারতের সকল বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়ের রেকর্ড ভঙ্গ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৪১ সালের পূর্বে আর এস মোদীকে ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে কেহই চিনিত না। ঐ বৎসর তিনি সর্বপ্রথম বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে খেলিয়া ২৫৩ রান করেন। বোম্বাই ক্রিকেট মহলে ইহার ফলেই তিনি পরিচিত হন। সেই বৎসর পার্শী জিমখানা পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় খেলিবার জন্য তাঁহাকে নির্বাচিত করেন। শ্রীমান মোদী নির্বাচকদের হতাশ করেন না। তিনি ১৪৪ রান করেন। ইহার পর হইতে আর এস মোদীকে বোম্বাইর প্রত্যেক খেলায় ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে দেখা যায়। নিয়মিত সাধনার ফলে চারি বৎসরের মধ্যে ব্যাটিংয়ে তিনি কিরূপ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন, তাহা রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় প্রদর্শন করিয়াছেন। অনেকের মতে আর এস মোদী অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় ডন্ ব্রাড্-ম্যানের সমপর্যায়ভুক্ত হইবার যোগ্য। ডন্ ব্রাডম্যান ইংল্যাণ্ড অস্ট্রেলিয়ার পাঁচটি টেস্ট খেলায় ১৯৩০-৩১ সালে মোট ৯৯৭ রান করিয়া যেরূপ ব্যাটিংয়ের অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আর এস মোদী এই বৎসরের রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পাঁচটি খেলায় মোট ১,০০৮ রান সংগ্রহ করিয়া তাঁহারই ন্যায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা এই তরুণ পার্শী ক্রিকেট খেলোয়াড়ের দীর্ঘ-জীবন ও উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। নিম্নে এই বৎসরের কোন্ কোন্ খেলায় মোদী কত রান করিয়াছেন, তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল :—সিন্ধু প্রদেশ দলের বিরুদ্ধে ১৬০ রান, পশ্চিম ভারত রাজ্য দলের বিরুদ্ধে ২১০ রান, বরোদা দলের বিরুদ্ধে ২৪৫ রান নট আউট ও ৩১ রান নট আউট, উত্তর ভারত দলের বিরুদ্ধে ১১৩ রান ও হোলকার দলের বিরুদ্ধে ৯৮ রান ও ১৫১ রান।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৬ই মার্চ—ইণ্ডিয়া কম্যাণ্ডের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ৩রা মার্চ শেষরাত্রে শত্রু-পক্ষের একখানি বিমান পূর্ববঙ্গের দুইটি স্থানে কয়েকটি বোমা বর্ষণ করিয়াছে। অল্প কয়েকজন লোক হতাহত হইয়াছে এবং সামান্য ক্ষতি হইয়াছে।

যুক্তপ্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নবাব মহম্মদ ইসমাইল পদত্যাগ করিয়াছেন।

কলিকাতায় মোটর দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস-কল্পে সামরিক কর্তৃপক্ষ যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বিবৃত করিতে গিয়া মেজর জেনারেল স্টুয়ার্ট কলিকাতায় সাংবাদিকদের এক বৈঠকে বলেন যে, ১৯৪৪ সালে রাস্তায় সাংঘাতিক দুর্ঘটনার ফলে মোট ১৩৬ জনের মৃত্যু হয়।

৭ই মার্চ—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বর্তমান বৎসরের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের আলোচনায় বিভিন্ন দলের সদস্যগণ এ প্রদেশে কাপড়ের দারুণ দুর্ভিক্ষের উল্লেখ করেন।

কলিকাতা নগরীর স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে নগরীর ট্যাক্সের হার শতকরা ২৷৷৹ টাকা বৃদ্ধি করিয়া বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বাঙলা সরকার কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট কতকগুলি প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন। কর্পোরেশনকে জানান হইয়াছে যে, আগামী ১৬ই মার্চের মধ্যে কর্পোরেশন যদি সেই ব্যবস্থাগুলি কার্যে পরিণত করিতে রাজী না হন, তাহা হইলে কর্পোরেশনের কার্য পরিচালনার ভার বাঙলা সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রীর পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী স্বীকার করেন যে, ভারতরক্ষা বিধির ১২৯নং বিধানবলে ধৃত কতক ব্যক্তিকে এক্ষণে গোয়েন্দা বিভাগ ও স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ পুলিশের হাজতে রাখিতে দেওয়া হইতেছে এবং তাহাদিগকে তথায় দুইমাস কাল আটক রাখা হয়।

৮ই মার্চ—গত ১৯৪০ সালের ৫ই আগস্ট তারিখে ঢাকা মেল দুর্ঘটনায় আহত হওয়ায় মৃত কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট মিঃ ভূপেন্দ্রকিশোর বসুর পত্নী শ্রীমতী কল্যাণী বসু, তিনটি নাবালক পুত্র, এক অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যা ও বৃদ্ধা মাতার পক্ষ হইতে বি এণ্ড এ রেলের মালিক সপারিষদ বড়লাটের নিকট হইতে লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবীতে কলিকাতা হাইকোর্টে যে মামলা দায়ের হইয়াছিল, অদ্য বিচারপতি সেন তাহার রায় দিয়াছেন। বিচার-পতি ক্ষতিপূরণ বাবদ বাদীপক্ষের অনুকূলে মোট ৮৬ হাজার ৪ শত টাকা ডিক্রি দিয়াছেন।

ময়মনসিংহের প্রথম অতিরিক্ত সেসন জজ মিঃ জে এন চ্যাটার্জি ময়মনসিংহের কমিউনিস্টকর্মী ভানু মজুমদারের হত্যা মামলার রায় দিয়াছেন। জজ আসামী নিমাই চন্দ এবং অপর তিনজনকে আড়াই বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

গতকল্য রাত্রে বরিশালে এক ভীষণ অগ্নি-কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। অনুমান ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

অদ্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্যসচিব স্যার আজিজুল হক জানান যে, ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে বাঙলার ছয়টি কাপড়ের কল বিভিন্ন সময়ে কয়লার অভাবের দরুণ বন্ধ থাকে। এই হেতু মোট প্রায় ২৩ কোটি ৮০ লক্ষ গজ কাপড় কম উৎপন্ন হইয়াছে।

৯ই মার্চ—অদ্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শাসন পরিষদের নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস দলের পক্ষ হইতে উত্থাপিত ছাটাই প্রস্তাব ৬১-৫৩ ভোটে গৃহীত হয়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিরোধী দলের অনু-পস্থিতিতে বাঙলা গভর্নমেণ্টের মোট ৬৫ কোটি টাকার অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ পাশ হয়।

১০ই মার্চ—ভারত সরকারের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন বিভাগের বরাদ্দ অস্বীকার করিয়া অদ্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মুসলিম লীগ দলের পক্ষ হইতে আনীত ছাটাই প্রস্তাব ৫৯—৪৮ ভোটে গৃহীত হয়।

পাঞ্জাবের হিন্দুনেতা রাজা নরেন্দ্রনাথ ৮১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

১১ই মার্চ—আকোলা এবং অন্যান্য কয়েক-স্থানে গঠনমূলক কার্যে রত কর্মীদের উপর প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী এক বিবৃতি দিয়াছেন। মহাত্মাজী বলিয়াছেন,—'জন-সাধারণের সেবা করাই কংগ্রেসকর্মীদের একমাত্র লক্ষ্য। ইহার ফলে যাহাই হউক না কেন, তাহারা নীরবে কাজ করিয়া যাইবে।'

পাটনার সংবাদে প্রকাশ, গত রাত্রে দানাপুরের লক্ষপতি ব্যবসায়ী গণেশলাল সাহু আততায়ীর পিস্তলের গুলীতে নিহত হইয়াছেন।

১২ই মার্চ—অদ্য সীমান্ত ব্যবস্থা পরিষদে সর্দার আওরঙ্গজেব মন্ত্রিসভার (লীগ মন্ত্রিসভা) বিরুদ্ধে কংগ্রেস দল কর্তৃক উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাব ২৪-১৮ ভোটে গৃহীত হয়। সর্দার আওরঙ্গজেব খাঁ গভর্নরের নিকট মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন। গভর্নর নূতন মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে আলোচনার জন্য ডাঃ খাঁ সাহেবকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।

সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী স্যার গোলাম হোসেন হিদায়েতুল্লা আজ সিন্ধুর গভর্নরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রকাশ, তিনি গভর্নরের নিকট তাঁহার মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র পেশ করেন।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অদ্যকার অধি-বেশনে বস্ত্র এবং সূতার অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে জাতীয়তাবাদী দল কর্তৃক উত্থাপিত ছাটাই প্রস্তাবটি ৫৮—৪৩ ভোটে গৃহীত হয়।

প্রদেশগুলিতে কার্যের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে শৈথিল্য সম্পর্কে খাদ্য বিভাগের কার্যের নিন্দা করিবার জন্য শ্রীযুত অনঙ্গমোহন দাম (কোনও দলভুক্ত নহেন) গত শনিবার কেন্দ্রীয় পরিষদে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, অদ্য ৫৭—৪৩ ভোটে তাহা পরিষদে গৃহীত হয়।

বিদেশী সংবাদ

৬ই মার্চ—পশ্চিম জার্মান রণাঙ্গন—লণ্ডনে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, মিত্র বাহিনী কলোন অধিকার করিয়াছে।

পূর্ব জার্মান রণাঙ্গন—মার্শাল জুকভের বাহিনীর উত্তর বাহু ওডার নদীর মোহনায় পৌঁছিয়াছে এবং কামিন অধিকার করিয়াছে।

৭ই মার্চ—লণ্ডনের 'ডেলী মেল' পত্রিকার নিউইয়র্কস্থিত সংবাদদাতা শ্রীযুত বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে 'বিভীষিকা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ইস্তাম্বুলের সংবাদে প্রকাশ, বুলগেরিয়ান প্রিন্স সিরিল, বুলগেরিয়ান রিজেন্সী কাউন্সিলের অপর দুইজন সদস্য এবং কতিপয় ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রীকে সোফিয়ায় গুলী করিয়া মারা হইয়াছে।

৮ই মার্চ—ব্রহ্ম রণাঙ্গন—মিত্রবাহিনী মান্দা-লয়ে প্রবেশ করিয়াছে। চীনা সৈন্যগণ নূতন লাসিও দখল করিয়াছে।

পশ্চিম জার্মান রণাঙ্গন—জেনারেল হজের সৈন্যেরা কলোনের দক্ষিণে রাইন নদী অতিক্রম করিয়াছে। রাইনবার্গ হইতে দক্ষিণে নয়স পর্যন্ত বিস্তৃত রাইনের পশ্চিম তীরবর্তী এলাকা হইতে মার্কিন নবম আর্মির আক্রমণে জার্মানরা বিতাড়িত হইয়াছে।

৯ই মার্চ—পশ্চিম জার্মান রণাঙ্গন—জেনারেল আইসেনহাওয়ারের সাতটি আর্মিই রাইন নদীর তীরে উপনীত হইয়াছে। কলোনের দক্ষিণে রাইনের পূর্ব তীরে জেনারেল হজের সৈন্যদল কতিপয় জার্মান শহর ও গ্রাম দখল করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গন—মার্কিন সৈন্য ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মিণ্ডানাও দ্বীপে অভিযান সুরু করিয়াছে।

১০ই মার্চ—পশ্চিম জার্মান রণাঙ্গন—মার্কিন সৈন্যদল অভিযান তরণীযোগে রাইনের পূর্ব তটে দ্বিতীয় দফায় উপস্থিত হওয়ার পর রেমাগেন সেতুমুখের ছয় মাইল উত্তর দিকবর্তী হোনেফ শহরের ঘরে ঘরে সংগ্রাম শুরু হইয়াছে। জার্মানদের ভেজেল ঘাঁটি ব্যতীত রাইনতটে মিত্রপক্ষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অদ্য প্রত্যূষে এক বিরাট মার্কিন বিমান-বহর টোকিওর উপর হানা দেয়। সহস্রাধিক টনের অগ্নিবোমা টোকিওর উপর বর্ষিত হয়। প্রকাশ যে, সমগ্র টোকিও শহরে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলে।

১১ই মার্চ—পূর্ব জার্মান রণাঙ্গন—সোভিয়েট বাহিনী ওডার মোহনার ৩৫ মাইল পূর্বস্থ বল্টিক বন্দর কোলবের্গ পরিবেষ্টন করিয়া তাহারা সেখানে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গন—মান্দালয়ের ফোর্ট ডাফারিন এলাকায় যুদ্ধ চলিতেছে এবং জাপানীরা তথায় প্রবলভাবে বাধা দিতেছে।

১২ই মার্চ—পশ্চিম জার্মান রণাঙ্গন—মিত্র বাহিনী রাইনের পশ্চিমতটবর্তী জার্মানদের ভেজেল সেতুমুখের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে। মিত্রপক্ষের রেমাগেন সেতুমুখ ৯ মাইল সম্প্রসারিত হইয়াছে। উক্ত সেতুমুখে লিনৎস সহ আরও পাঁচটি শহর অধিকৃত হইয়াছে।

পূর্ব জার্মান রণাঙ্গন—ওডার নদীতীরে জার্মানদের শক্তিশালী ঘাঁটি কুয়েস্ট্রিন লাল-ফৌজ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। কুয়েস্ট্রিন বার্লিন হইতে ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত। দুইটি প্রধান জার্মান শহর স্টেটিন ও ডানজিগ বর্তমানে ভয়াবহ রণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ঃ—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

❦ · দেশ · ❦

সূচীপত্র

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ] শনিবার, ১০ই চৈত্র, ১৩৫১ সাল। Saturday, 24th March, 1945 [২০শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

সরকারী চরমপত্রের ভাষ্য

বাঙলা গভর্নমেণ্টের ১৬ দফা প্রস্তাব অবিলম্বে কার্যে পরিণত না করিলে কর্পোরেশন বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া যে কর্পোরেশনকে হুমকি দেখাইয়া সরকারী চরমপত্র প্রদান করা হইয়াছিল, সম্প্রতি এক প্রেস নোটে তাহার অভিযোগের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, যাঁহারা সরকারী প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়াছেন, বাঙলা গভর্নমেণ্ট আশা করেন, এই প্রেসনোট পাঠে তাঁহারা তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারিবেন। এই প্রেস নোট পাঠে কাহার কি জ্ঞানোদয় হইয়াছে আমরা তাহা জানি না, কিন্তু আমাদের কথা আমরা বলিতে পারি যে, গত ৭ই মার্চ তারিখে কর্পোরেশনকে ঐরূপ একখানি চরমপত্র প্রদানের হঠাৎ কি কারণ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, সরকারী প্রস্তাবগুলি কর্পোরেশনকে যে খুব তাড়াহুড়া করিয়া কার্যে পরিণত করিতে হইবে তাহা নহে, আসলে সরকারী অভিপ্রায় ছিল যে, কর্পোরেশনকে এ সম্পর্কে মনঃস্থির করিতে বলা। সহযোগিতার ভাব লইয়া মন স্থির করিতে বলার অর্থ আমরা বুঝি, কিন্তু সেই সঙ্গে হুমকি দেখাইবার অর্থ আমাদের বুদ্ধির অগম্য। গভর্নমেণ্ট বলিতেছেন, কলিকাতা শহরের স্বাস্থ্যরক্ষামূলক ব্যাপারগুলি অনেক দিনের পুরাতন ব্যাপার। ব্যাপারগুলি পুরাতন হইতে পারে; কিন্তু সে সম্বন্ধে এতকাল নীরব থাকিয়া ক্লাসে নিদ্রারত শিক্ষকের সহসা গর্জন সহকারে বেত্র-আস্ফালনের অনুরূপ এই আকস্মিক সরকারী হুমকির অর্থ কি? প্রেসনোটে বলা হইয়াছে, এমন কতকগুলি কাজ কর্পোরেশন করিতে পারেন, যাহার জন্য অর্থ-সংগ্রহের প্রয়োজন নাই, কিন্তু গত ৭ই মার্চের সরকারী পত্রে বলা হইয়াছে, প্রস্তাবগুলি সমগ্রভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার মধ্যে এইরূপ বিচ্ছিন্নভাবে, সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের অবসর কোথায়? গভর্নমেণ্ট আরও বলিয়াছেন যে, যদি ট্যাক্স না বাড়াইয়া কর্পোরেশন আর্থিক সমস্যা দূর করিতে পারেন, তবে তাহা করুন, গভর্নমেণ্টের তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু এরূপ কথা ৭ই মার্চ তারিখের পত্রে ছিল কি? তাহাতে বরং কর বৃদ্ধি করা এবং কর্মচারিবিশেষের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা তুলিয়া দেওয়ার কথা একই সংগে গ্রহণ করিতে হইবে বলা হইয়াছে। যাহা হোক, বাঙলা গবর্নমেণ্টের ৭ই তারিখের পত্র যে আদৌ বিবেচনাপ্রসূত নহে, বরং তাহা তাঁহাদের হঠকারিতারই পরিচায়ক, এই প্রেসনোট পড়িয়াও আমাদের সেই কথাই মনে হইতেছে। এইরূপভাবে হুমকি প্রদর্শন করিলে কোন মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানই তাহা মানিয়া লইতে পারে না বরং তাহাতে সংঘর্ষই অনিবার্য হইয়া উঠে। টিকার ব্যাপারের পর হইতে কর্পোরেশনের সহিত বাঙলা গভর্নমেণ্টের ব্যাপার ক্রমশই তিক্ততর হইয়া উঠিতেছে। আমরা গভর্নমেণ্টকে এইরূপ মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া এখনও এক্ষেত্রে সহযোগিতার ভাব লইয়া অগ্রসর হইতে বলি।

যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেস আতঙ্ক

কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছি, ভারতের নানা স্থানের শাসন-কর্তৃপক্ষগণকে কংগ্রেস-আতঙ্ক জুজুর ভয়ের মত পাইয়া বসিয়াছে। নানা স্থানে কংগ্রেসকর্মিগণ কর্তৃক যে সমস্ত সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রার আয়োজন হইয়াছে, তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসকর্মী পরিষদের এক অধিবেশন বারাণসীতে অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু তথাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জানাইয়া দিয়াছেন—"ভারতরক্ষা বিধানের ৫৬ ধারার গণ্ডি হইতে প্রস্তাবিত সম্মেলনকে বাদ দেওয়া যায় না। উক্ত ধারা অনুসারে বারাণসীতে সমস্ত সভা ও শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে।" যুক্তপ্রদেশের ভূতপূর্ব মন্ত্রী এবং কংগ্রেসকর্মী পরিষদের আহ্বায়ক শ্রীযুক্ত সম্পূর্ণানন্দ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানান যে, এই সম্মেলনে গোপনীয় কিছুই নাই। প্রয়োজন মনে করিলে সি আই ডি বিভাগের লোকেরা এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকিতে পারিবে। কিন্তু তথাপি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় নাই। এরূপ অবস্থায় সম্মেলন আপাততঃ স্থগিত রাখা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সম্পূর্ণানন্দ অনুমান করেন, এই নিষেধাজ্ঞা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার নিজের দায়িত্বে প্রচার করেন নাই। সম্ভবত ইহার পিছনে প্রাদেশিক শাসন-কর্তৃপক্ষের ইঙ্গিত আছে। স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে সংকল্প পাঠ ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করা, গোরক্ষপুরে শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনকে অকারণ গ্রেপ্তার করা এবং তাহার পর কংগ্রেসকর্মী পরিষদের এই সম্মেলন নিষিদ্ধ করা—পর পর ঘটনাগুলি লক্ষ্য করিলে এই সরকারী আচরণের পশ্চাতে যে প্রাদেশিক শাসন-কর্তৃপক্ষের বিরূপ মনোভাব ক্রিয়াশীল রহিয়াছে, তাহা স্পষ্টই মনে হয়। কিন্তু কংগ্রেস যখন কোনরূপ সংঘর্ষমূলক কর্মপন্থা অনুসরণ না করিয়া বরং তাহা এড়াইয়া চলিতেছে, তখন কংগ্রেসের সহিত গভর্নমেণ্টের এরূপ আচরণের তাৎপর্য কি?

সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রিসভা

দীর্ঘকাল পরে সীমান্ত প্রদেশে আবার কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইল। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্যই বর্তমানে কারারুদ্ধ থাকায় সীমান্তের কংগ্রেসী দল কংগ্রেসের অনুমোদন লাভের সুযোগ না পাইলেও তাঁহারা এ সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী এবং তৎকালে কারারুদ্ধ খান আব্দুল গফুর খানের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। মনে হয়, তাঁহারা এই মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে আপত্তি করেন নাই। এই হিসাবে সীমান্তের কংগ্রেসী সদস্যদের লইয়া গঠিত মন্ত্রিসভাকে আমরা কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলই বলিব। বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রথমদিকে বৃটিশের ভারতীয় নীতিতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া কংগ্রেস যখন মন্ত্রিত্ব ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, অন্যান্য সাতটি প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের সঙ্গে সীমান্তের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব ও তাঁহার

সহকর্মী কংগ্রেসী মন্ত্রিগণও পদত্যাগ করেন। সীমান্ত প্রদেশের আইন পরিষদের অধিকাংশ সদস্যই কংগ্রেস দলভুক্ত বলিয়া তখন তথায় অন্য কোন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন সম্ভবপর হয় নাই এবং বাধ্য হইয়াই সীমান্তের গভর্নর ৯৩ ধারা অনুসারে শাসন-ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এই-ভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রবল দমননীতি আরম্ভ হইলে সীমান্ত প্রদেশের কয়েকজন সদস্য কারারুদ্ধ হন এবং তখন সুযোগ বুঝিয়া প্রায় দুই বৎসর পূর্বে লীগ-নেতা সর্দার ঔরঙ্গজেব খাঁ সীমান্তে তথাকথিত লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করেন। আমরা 'তথাকথিত লীগ মন্ত্রিসভা' এই জন্য বলিতেছি যে, সীমান্তের আইন পরিষদে মুসলিম লীগ সংখ্যালঘিষ্ঠ দল। সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের দ্বারা মন্ত্রিমণ্ডল গঠন এবং তাহা চালু রাখিবার মত শাসনতান্ত্রিক অনাচার সম্ভবপর হইয়াছিল একমাত্র গভর্নরেরই অনুগ্রহে। কিন্তু এই অনাচার-মূলক অনুগ্রহ আর বেশী দিন ভোগ করা তথাকথিত লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। কিছুদিন পূর্বে একটি সংবাদে জানা যায় যে, সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর লীগ প্রধান মন্ত্রী সর্দার ঔরঙ্গজেব খানকে স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসী দলের সদস্যগণকে আর অধিক দিন কারারুদ্ধ রাখিয়া তাঁহাকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করা গভর্নরের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সীমান্ত গভর্নরের এই উক্তি হইতে স্বতই মনে হয় যে, ভারতরক্ষা আইনের দিক হইতে যে-সমস্ত কংগ্রেসী সদস্যকে আটক রাখার প্রয়োজন নাই, একটা তাঁবেদার মন্ত্রিমণ্ডলকে অনাস্থা প্রস্তাব এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইতে রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ রাখা হইয়াছিল। মন্ত্রিত্বের নির্লজ্জ গৌরবের মোহে সর্দার ঔরঙ্গজেব খান কংগ্রেসী দলের পুনঃ পুনঃ চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও পরিষদের অধিবেশন ডাকিয়া অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হইতে সাহসী হন নাই। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াশীল ও জনগণের স্বার্থের প্রতি উদাসীন মন্ত্রিমণ্ডলের অনাচার ও দুর্নীতিতে ইহার সমর্থকগণ বীতশ্রদ্ধ হন এবং তাঁহাদের দলে ভাঙ্গনের সূত্রপাত হয়। অতঃপর সীমান্তের মন্ত্রিমণ্ডলের মন্ত্রিত্বের গদি আঁকড়াইয়া থাকিবার নির্লজ্জ, অসাধু এবং উৎকট প্রয়াসের অবসান হইয়াছে। ইঁহাদের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব ২৪-১৮ ভোটে গৃহীত হওয়ায় তথাকথিত লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের পতন ঘটিয়াছে। গভর্ণরের আমন্ত্রণ পাইয়া ডাঃ খান সাহেব কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। এই কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইবার পরেই সীমান্ত প্রদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিবর্তন হইয়াছে। ডাঃ খান সাহেব মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই খান আব্দুল গফুর খান ও অন্যান্য ২১ জন নিরাপত্তা আটক বন্দীকে মুক্তি দিয়াছেন। কারামুক্ত সীমান্ত নেতাকে অজস্র পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া এক মাইল দীর্ঘ এক শোভাযাত্রা সহকারে সীমান্তের প্রাদেশিক কংগ্রেস আফিসে লইয়া যাওয়া হয়। ভারতের নানাস্থানে কংগ্রেসের কর্মপ্রচেষ্টাকে খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে নির্বিচারে দমননীতি প্রয়োগ করা হইতেছে। বাঙলার লীগ মন্ত্রি-দল নিরাপত্তা বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নে হৃদয়-হীনতার পরিচয় দিতেছেন। এই অবস্থায় সীমান্তের এই ঘটনায় মনে হয় সেখানে আবার সুদিন ফিরিয়া আসিয়াছে। দেশের যাঁহারা বিশ্বাসভাজন, ত্যাগব্রতী কর্মী, তাঁহারা জনসেবার ক্ষেত্রে আবার পুরোভাগে দণ্ডায়মান হওয়ায় বর্তমান চরম দুর্দিনের নৈরাশ্য ও সংশয়ের মধ্যেও আশার আলোক দেখা দিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, সীমান্তের এই কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের প্রতিক্রিয়া অন্যান্য প্রদেশে কিরূপভাবে দেখা দিবে। সিন্ধু প্রদেশে খান বাহাদুর মৌলা বক্সের নেতৃত্বে সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠন অপেক্ষা স্যার গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লার অধিনায়কত্বে লীগ-মন্ত্রিসভা গঠনই তথাকার গবর্ণর শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছেন। কেবল পরলোকগত আল্লা বক্সের ভ্রাতা হিসাবে নহে, মৌলা বক্স স্বয়ং যে দৃঢ় চরিত্রের পরিচয় দিয়াছেন, গবর্ণর সেজন্য সম্ভবত তাঁহাকে 'নির্ভর-যোগ্য' বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। তিনি মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিকে ক্রীড়নকবৎ ব্যবহার করা সুবিধাজনক বলিয়া বুঝিয়াছেন। স্যার গোলাম হোসেন পুনঃ পুঃ ডিগবাজী খাইয়া নির্লজ্জ সুবিধাবাদীর পরিচয় দিয়াছেন, তিনি তাঁহাকেই মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে অনুমতি দিয়াছেন। কিন্তু তাহার পূর্বে তিনি সম্ভবত ভাবিয়া দেখেন নাই,—এই মন্ত্রিমণ্ডল স্থায়ী হইতে পারে কি না। সম্প্রতি প্রকাশিত ৪ জন লীগদলীয় সদস্যের বিরোধী দলে যোগদানের খবরের পর যে হিসাব পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে সিন্ধু পরিষদের ৬০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ২৯ জন স্যার গোলাম হোসেনের সমর্থক। আসাম প্রদেশেও লীগদলে যেরূপ ভাঙ্গন ধরিয়াছে, তাহাতে সাদুল্লা-মন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নহে বলিয়াই ধারণা হইতেছে। গত ১৭ই মার্চ কংগ্রেসী দল কর্তৃক আনীত একটি ছাঁটাই প্রস্তাবে স্পীকারের কাস্টিং ভোটের জোরে সাদুল্লা মন্ত্রিমণ্ডল কোন প্রকারে বাঁচিয়া গিয়াছেন। এই ভোটের ফলে মন্ত্রিসভায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে এবং জোড়াতালি দিয়া মন্ত্রিসভা মেরামত করিবার তাড়াহুড়া পড়িয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় আসামে ও সিন্ধু প্রদেশে যদি কংগ্রেসী কোয়ালিশন মন্ত্রি-মণ্ডল গঠিত হয়, তবে অনেক দুর্নীতি ও অনাচারের অবসান এবং জনগণের যথার্থ কল্যাণ সাধন হইতে পারে।

বাঙলার জনস্বাস্থ্য

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেটের চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য খাতে ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। অফিসিয়াল কংগ্রেসদলের সদস্য ডাঃ শরৎচন্দ্র মুখার্জি এক ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বিভিন্ন প্রকারের সংক্রামক ব্যাধির প্রসারের অনুপাতে পল্লী চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যাল্পতা, প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও যন্ত্রপাতির অভাব, সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাবকালে প্রয়োজনের তুলনায় সরকারী ডাক্তারের অভাব এবং ফেমিন রিলিফ হাসপাতালসমূহে ঔষধ ও পথ্যের অপ্রতুলতার কথা উল্লেখ করেন। আর একটি ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেন যে, সংক্রামক ব্যাধি দমনের জন্য গবর্ণমেণ্ট এযাবৎ যে সকল অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহা ফলদায়ক হয় নাই, বহুস্থানে কুইনাইন সুষ্ঠুভাবে বণ্টিত হয় নাই, অনেক স্থলে সাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রেরিত কুইনাইন চোরা-বাজারে উধাও হইতেছে। এজন্য যাহারা দায়ী, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন নাই। এইসব সমালোচনার উত্তরে স্বাস্থ্য সচিব খাঁ বাহাদুর জালালুদ্দিন আমেদ বলেন,—"চিকিৎসা খাতে ব্যয়ের বিভিন্ন অঙ্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রতীয়মান হইবে, পূর্বে বাঙ্গলার অধিবাসিবৃন্দের যাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, সেইরূপ চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রসার সাধন করা হইয়াছে।" কিন্তু ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধিতে বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চল যেখানে বিধ্বস্তপ্রায়, সেখানে ব্যয়বরাদ্দের অঙ্কের হিসাবের ধোঁকা দিয়া তিনি আসল সমস্যা চাপা দিতে চাহিয়াছেন। প্রকৃত কথা হইতেছে এই যে, যে অনুপাতে ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির প্রসার হইতেছে, সরকারী ব্যবস্থা তাহার তুলনায় একান্ত অপ্রচুর ও বহু ত্রুটি-বিচ্যুতিপূর্ণ। যেখানে লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণ লইয়া সমস্যা সেখানে বৃথা বাগাড়ম্বরে কোনরূপ ফল লাভ হয় না, স্বাস্থ্যসচিব নিজেও তাহা জানেন, কিন্তু অক্ষমতার লজ্জা ঢাকিতে তাঁহাদের মত মন্ত্রিগণের পক্ষে বৃথা বাকচাতুর্যের সাহায্য লইতে হয়, ইহাই সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক সত্য।

লিথোপ্রিন্ট—শান্তিনিকেতন কলাভবন



মুরগী

শিল্পীঃ বঙ্কুবিহারী দাসরায়



রামছাগল

শিল্পীঃ উষারঞ্জন দত্তগুপ্ত

চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর মন কোন্ চক্রে চক্রে ঘোরে, বুঝিয়া ওঠা কঠিন। সম্প্রতি তিনি সানফ্রান্সিসকো কনফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধিত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া সরকারী ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছেন। আচারী মহাশয়ের মতে শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই এবং নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খানকে এই পদের জন্য নির্বাচিত করা উচিত ছিল। এমন মস্তিষ্কের তারিফ করিতেই হয়; কারণ, ভারতবর্ষে এত মনীষী এবং দেশপ্রেমিক ব্যক্তি আছেন; কিন্তু এতদিন পর্যন্ত এমন বুদ্ধি কাহারও মাথায় খেলে নাই। স্বদেশে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, উদারনীতিক সঙ্ঘের বিগত অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় বাহাদুর লালা রামশরণ দাস হইতে আরম্ভ করিয়া বিদেশে সোরেনসেন, পার্ল বাক —ইঁহারা পর্যন্ত এক্ষেত্রে পণ্ডিত জওহরলাল এবং মহাত্মা গান্ধীর কথাই বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। চক্রবর্তী মহাশয় কিন্তু মহাত্মাজীর নাম উল্লেখ করেন নাই এবং সেই সঙ্গে বন্দী কংগ্রেস-নেতাদিগকেও বর্জন করিয়া প্রকারান্তরে বিদেশের সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারকার্যেরই সহায়তা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মাথায় বিশেষত্ব আছে।

কংগ্রেস-নেতাদের মুক্তি

সানফ্রান্সিসকোতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব প্রহসনে পর্যবসিত হইয়াছে। চক্রবর্তী মহাশয় বলিয়াছেন, সানফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা দলনে ব্রিটিশের বিরুদ্ধতার নীতিরই প্রতিনিধিত্ব হইবে। তাঁহার এই উক্তির সত্যতা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই এবং নবাবজাদা লিয়াকৎ আলির দ্বারাই কি ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব সম্ভব হইত। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে কংগ্রেস-লীগ মিলনের সার্থকতা আমরা দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু প্রাদেশিক ব্যাপারে তাহার বিপরীত অভিনয় চলিতেছে। লীগ-মন্ত্রিমণ্ডল কংগ্রেস-নেতাদের মুক্তির দাবী পালন করিতে কার্যকরভাবে শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন না; সেক্ষেত্রে তাঁহারা দেশের স্বার্থের বিরোধী নীতিই সমর্থন করিতেছেন; সুতরাং সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে দেশাই-লিয়াকতের মিলনের গুরুত্ব কতটুকু আছে?

ধামাধরাদের অভিনয়

রাজাগোপালাচারীয় মহাশয়ের আচরণকে কোন দিক হইতেই সমর্থন করা হইল না। স্যার তেজবাহাদুর ব্যবহারজীবী লোক। তিনি আইন মাফিক চলেন। আইনকে মাথায় রাখিয়া কথা বলেন; কিন্তু তিনিও সানফ্রান্সিসকোর প্রতিনিধিত্ব

দেশের কথা

সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নীতির তীব্র সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং এক্ষেত্রে তাঁহারা ভারতের জনমত পদদলিত করিয়াছেন, এ অভিমত তিনিও সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। বিলাতের রেলওয়ে শ্রমিক দলের নেতা মিঃ উইলিয়ম দ্রোবী এ সম্বন্ধে বলেন—

আমার বুদ্ধি বিবেচনায় আমার ইহাই বিশ্বাস যে, ভারত গভর্নমেন্ট সানফ্রান্সিস্কোর বৈঠকে তাঁহাদের নিজেদেরই ধামাধরাদিগকে নির্বাচিত করিয়াছেন। এই কয়েকজন জী-হুজুরের নির্বাচন ব্যাপারে লর্ড ওয়াভেল সুপরামর্শের দ্বারা চালিত হইয়াছেন বলিয়া আমার ধারণা হয় না। সানফ্রান্সিসকোর বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিতে হইলে চরিত্রের জোর এবং চিন্তার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। সানফ্রান্সিসকোর বৈঠকের উপর নবজগৎ-গঠন নির্ভর করে। যদি আগামী মাসের সেই বৈঠক কতকগুলি ধামাধরা লোকের দ্বারা পূর্ণ হয়, তবে সেখানে বিশেষ কিছু আশা করিবার থাকে না। ভারতের প্রতিনিধিগণ সেই শ্রেণীর লোক। তাঁহারা নিজেরাই স্বীকার করেন যে, তাঁহাদের পশ্চাতে ভারতের জনমতের সমর্থন নাই। বড়লাট এক্ষেত্রে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে যদি মুক্তি দিতে পারিতেন এবং তাঁহাকে সানফ্রান্সিসকোতে পাঠাইতেন তবে একাধারে তিনি রাজনীতিক দূরদর্শিতা ও সাহসের পরিচয় প্রদান করিতেন।

ভারত গভর্নমেন্টের এই নির্বাচন সম্বন্ধে 'চিকাগো ট্রিবিউন' পত্র লিখিয়াছেন যে, এই নির্বাচনে ধামাধরা কর্তৃত্বেরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বৈঠকের প্রতিনিধিগণ আটলাণ্টিক সনদের মনোভাব-মর্যাদা কতটা রাখিবেন, ভারত গভর্নমেন্টের এই নির্বাচন হইতেই তাহার পূর্বাভাষ পাওয়া যাইতেছে। অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বাঙলার লীগ-মন্ত্রিমণ্ডল

দৃষ্টান্তস্বরূপে বাঙলার লীগ-মন্ত্রিমণ্ডলের কথা বলা যাইতে পারে। সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুত কামিনীকুমার দত্ত রাজনীতিক বন্দীদের সম্পর্কে মন্ত্রিমণ্ডলের নীতির সমালোচনা করিয়া বলেন—

বাঙলার গভর্নমেন্ট এই অজুহাত উপস্থিত করিয়া থাকেন যে, এই সব বন্দীর মুক্তির সম্বন্ধে দায়িত্ব ভারত গভর্নমেন্টের উপর রহিয়াছে; কিন্তু ভারত গভর্নমেন্ট সম্প্রতি প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্রাদেশিক সরকারসমূহের হাতে সে দায়িত্ব আছে। একথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, কারাগারে যাঁহারা বর্তমানে অবরুদ্ধ আছেন, তাঁহারা স্বদেশপ্রেমিক। তাঁহাদের রাজনীতির সঙ্গে আমাদের সকলের মিল না থাকিতে পারে; কিন্তু তাঁহারা যে সত্যই দেশের সুসন্তান, এ সম্বন্ধে কাহারও মনে সন্দেহের অবসর নাই।"

কিন্তু এসব যুক্তির কোন সদুত্তর মন্ত্রীরা দিতে পারেন নাই; তাঁহারা কতকগুলি বাঁধা বুলি আওড়াইয়া গিয়াছেন; বলা বাহুল্য, সেগুলি বিদেশী আমলাতান্ত্রিকদের নিকট হইতেই ধার করা এবং এদেশের পুলিশের প্রেরণায় প্রভাবান্বিত।

ভারতসচিবের মনোভাব

সানফ্রান্সিসকোর ব্যাপার প্রায় চুকিয়া গেল অথচ ভারতের কারাগারের দ্বার খুলিল না। গতিক দেখিয়া সেদিন পার্লামেন্টের কমন্স সভায় শ্রমিক সদস্য মিঃ সোরেনসেন প্রশ্ন করিয়াছিলেন —কংগ্রেস-নেতাদিগকে কি অনির্দিষ্ট কালের জন্যই বন্দী অবস্থায় রাখা হইবে? উত্তরে ভারতসচিব মিঃ আমেরী বলেন—

"না, অনির্দিষ্টকালের জন্য কংগ্রেসের নেতাদিগকে বন্দী রাখিবার অভিপ্রায় গভর্নমেন্টের নাই। ভারত গভর্নমেন্ট যখন বুঝিবেন যে, তাঁহাদের মুক্তি সমরোদ্যমের কেন্দ্রস্বরূপে নিরাপত্তার পক্ষে এবং ভারতের শান্তি ও আইনরক্ষার কার্যে ব্যাঘাতক হইবে না, তখন তাঁহারা ইঁহাদের মুক্তি সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন। আমি জানিতে পারিয়াছি যে, কংগ্রেস-নেতাদিগকে ব্যাপকভাবে মুক্তিদানের সেরূপ সময় এখনও আসিয়াছে বলিয়া ভারত গভর্নমেন্ট মনে করেন না; অনেকদিন হইতেই ক্রমিকভাবে সমধিকসংখ্যক বন্দীকে মুক্তিদান করা হইতেছে।"

বাস্তবিক পক্ষে দেশের শান্তি ও আইন রক্ষার যুক্তি এক্ষেত্রে মামুলি। বর্তমানে এই সব বন্দীকে মুক্তিদান করিলে দেশের আইন ও শান্তি-রক্ষার কোনরূপ অন্তরায় ঘটিবে, আমরা এমন কোন কারণই দেখিতে পাই না। তাহা ছাড়া, আইন ও শান্তিরক্ষার প্রশ্নই বড় প্রশ্ন নয়। বাঙলা দেশে আইন ও শান্তির অবিচল আশ্রয়ে অবস্থান করিয়াও দেশের লোকের জীবন-সমস্যা কিরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, ভুক্তভোগী মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। সেদিন বাঙলার অর্থসচিব শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী স্পষ্ট ভাষাতেই একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, দুর্নীতি বাঙলায় সর্বজনীন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং প্রকারান্তরে তাঁহাকে একথাও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, সরকার এই দুর্নীতির স্রোত রোধ করিতে পারিতেছেন না। ভদ্রবেশী চোর-ডাকাতদের উপদ্রবে দেশের লোক অসহায়ত্বের চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। কি শহরে, কি মফঃস্বলে দরিদ্র এবং পীড়িতের পক্ষ লইয়া এই দুর্নীতি-দলনে অগ্রসর হইবার মত প্রাণবান্ পুরুষ নাই। ঝঞ্ঝাট এড়াইয়া নিজের নিজের স্বার্থ বুঝিয়া লইবার জন্যই সকলে ব্যস্ত।

শ্রীযুত কামিনীকুমার দত্ত সেদিন ব্যবস্থাপক সভায় এই দুঃখের কথাটা উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

"সমগ্র দেশ বর্তমানে দুষ্পূরণীয় লোভের কবলে আপতিত হইয়াছে। ঘুষখোর, লাভখোর প্রভৃতির প্রভুত্ব সর্বত্র চলিতেছে। এ অবস্থায় দেশের উদারচেতা সন্তানদের সাহায্য প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে; তাঁহারাই এই দুর্নীতিপরায়ণদের প্রবৃত্তির মুখ হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিতে সমর্থ। চোরাবাজারী এবং লাভখোরদের সমাজবিরোধী নীতির গতি অবিলম্বে রুদ্ধ করা দরকার। ইহাদিগকে উৎখাত করা প্রয়োজন এবং সেই কার্যের জন্য আমরা অবিলম্বে দেশের স্বদেশপ্রেমিক সন্তানদের মুক্তির দাবী করিতেছি।"

শান্তিরক্ষার নজীর

আইন ও শান্তিরক্ষার ঠাটবহর বাড়িয়াছে খুবই; কিন্তু এই বাহিনী যে দুর্নীতি হইতে ঊর্ধে নয়, সেদিন একটি ক্ষেত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সংবাদপত্রের একটি সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছে যে, একদল শাদা পোষাক পরিহিত কনস্টেবল সম্প্রতি দক্ষিণ কলিকাতার একটি কাপড়ের দোকানে উপস্থিত হয়। তাহারা বস্ত্রক্রয়েচ্ছু নরনারীর লাইন ভাঙিয়া দিয়া নিজেরাই লাইন বাঁধিয়া দাঁড়ায়। ইহার পর তাহারা নাকি ইউনিফর্ম-পরা সঙ্গীদের সহায়তায় দোকান হইতে বস্ত্র সংগ্রহ করে। এই সম্পর্কিত অভিযোগের পরিণতিতে কি দাঁড়ায়, আমরা দেখিবার অপেক্ষায় রহিলাম। শহরেই যদি এমন অভিযোগের কারণ ঘটে, তবে দরিদ্র বাঙলার মফঃস্বলে শান্তিরক্ষার দাপট কোথায় কি আকার ধারণ করিয়া উঠিতেছে, কিছু অনুমান করা যাইতে পারে।

স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ

কথায় আছে একের সর্বনাশ, অন্যের পৌষ মাস। দেশের দুর্দিনে সকলেই কিছু লুঠিয়া লইবার ফিকিরে আছে। ইংলণ্ড এবং আমেরিকা প্রভৃতি স্বাধীন দেশে যুদ্ধ-প্রয়োজনে দেশের যন্ত্রশিল্পের সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। এদেশে বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ; কিন্তু ইংলণ্ডে ১৯৪১ সাল হইতেই কাপড়ের রেশনিং প্রবর্তিত হইয়াছে। সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুত মনু সুবেদারের একটি প্রশ্নের উত্তরে স্যার আজিজুল হক জানাইতেছেন যে, ভারত গভর্নমেণ্ট ইংলণ্ড হইতে ১৯৪৫ সালের জন্য এক কোটি গজ পরিমিত সূক্ষ্ম সূত্র নির্মিত বস্ত্র আমদানী করিতেছেন। ইতঃপূর্বে ব্যবস্থা পরিষদের একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ভারত গভর্নমেণ্ট ভারত হইতে বিদেশে কাপড় রপ্তানী করিতেছেন। দেশের সর্বত্র কাপড়ের দুর্ভিক্ষ—অথচ সরকারী এমন দান খয়রাতীর কারবার চলিতেছে; কিন্তু আপত্তি করিবার কিছু নাই; তবে একটা কথা এই যে, বিদেশের এই প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থাটা ইংলণ্ড হইতে করিলে হইত না কি? এইভাবে ভারতের বাজারে বিলাতী কাপড় চালাইবার পথটা না খুলিলে কি চলিত না? কিন্তু তাহা চলে না। একটি খবরে প্রকাশ—

"ভারতের বাজারে ব্রিটিশ পণ্যের আমদানী সম্পর্কে সম্প্রতি লণ্ডনে হায়দারী মিশনের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের আলোচনা হইয়া গিয়াছে; এই আলোচনার ফলে ভারত হইতে বৎসরে ৬ কোটি পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্যের জন্য চাহিদা আসিবে বলিয়া বিলাতের বণিক সমাজ আশা করিতেছে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতের যন্ত্রচালিত শিল্প—বিশেষভাবে বস্ত্রশিল্পের সমুন্নতি সাধন প্রচেষ্টাকে উৎসাহদান করিবেন স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা আশা করেন, যুদ্ধের পর ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ শতকরা অন্ততঃ ৫০ হারে বৃদ্ধি পাইবে। কয়েকটি বিশিষ্ট ব্রিটিশ ফার্ম ভারতে নিজেদের ফ্যাক্টরী খুলিবেন অথবা ভারতের কতকগুলি ফার্মের সহযোগিতায় কাজ করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহাতে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিবে।"

ভারতে যদি জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তবে ভারতের শিল্প সমুন্নতির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সার্থবাহদের পক্ষে এমন নিঃস্বার্থ সদাশয়তা প্রদর্শনের সুযোগ ঘটিত না। সেদিন শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় মহাশয় বর্ধমান জেলা কিষাণ কংগ্রেসের সভাপতিস্বরূপে ঘুস্কারাতে সে কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উত্তরোত্তর শোচনীয় আকারই ধারণ করিতেছে। ভারতে যদি জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে অবস্থার উন্নতি ঘটিবার কোন সম্ভাবনাই নাই; পক্ষান্তরে বিদেশীদের স্বার্থের চাপে ভারতের জনসাধারণের দুর্দশা অধিকতর শোচনীয় আকারই ধারণ করিবে। আমাদের মনেও এই আশঙ্কাই রহিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এই যে, ভারতের বাজারকে আমেরিকার প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া শোষণের ক্ষেত্রটি সম্পূর্ণভাবে নিজেদের একচেটিয়া করিয়া রাখিবার জন্যই ব্রিটিশ পক্ষ হইতে চেষ্টা চলিতেছে এবং শোষণের এই ক্ষেত্রটি ব্রিটিশ জাতি কিছুতেই হাতছাড়া করিতে সম্মত হইবে না। ভারতের অর্থনীতিক শোষণের এই ব্যবস্থা কায়েম রাখিবার জনাই ভারতের রাজনীতিক সমস্যার সমাধানের প্রশ্ন চাপা দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে। সে চেষ্টাতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের স্বার্থ রহিয়াছে এবং তাঁহাদের সমস্ত নীতি অভ্রান্তগতিতে সেই একই উদ্দেশ্য সাধনের অভিমুখে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সুতরাং আমাদের জীবনযাত্রার বর্তমান সংকট একান্ত আকস্মিকভাবে দেখা দেয় নাই। ইহার মূলে সরকারের নীতিগত ত্রুটি রহিয়াছে এবং সে নীতি বিদেশীদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশী সরকারের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এখন আর কোনরূপ জোড়াতালিতে এ অবস্থা চাপা দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। বর্তমান বস্ত্র সংকটের সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযোজ্য। মারোয়াড়ী বণিক সভা সম্প্রতি এতৎসম্পর্কিত একটি বিবৃতিতে বলেন—

"নয়াদিল্লী হইতে প্রচারিত একটি সংবাদে ১৯৪১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী ধরা হইয়াছে; কিন্তু ইহার পরে বাঙলাদেশে বিপুলসংখ্যক সামরিকদের যে সমাগম ঘটিয়াছে এবং ব্রহ্মদেশের পতনের পর এই প্রদেশের লোকসংখ্যা যে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা হিসাবে ধরা হয় নাই। বর্ধিত লোকসংখ্যার হিসাব ধরিলে ভারত সরকারের বরাদ্দ বস্ত্রের পরিমাণ শতকরা অন্ততঃ ২৮ হারে কম হয়। ইহা ছাড়া চীন, তিব্বত, নেপাল, ভূটান এবং আসাম ও বাঙলা হইতে গোপনে বস্ত্র রপ্তানী হইতেছে। এই সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির বিষয়ও বিবেচনা করিতে হইবে। মুদ্রাস্ফীতির জন্য বড়বড় শহরের বাসিন্দাদের এক শ্রেণীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে কলিকাতার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কলিকাতার ৪০ লক্ষ অধিবাসী গড়ে মাথাপিছু বৎসরে ৫০ গজের কম কাপড় ক্রয় করে না; এই হিসাব অনুসারে এক কলিকাতা শহরেই সরকার কর্তৃক ২ কোটি লোকের কাপড় বিক্রয় হইয়া যাইতেছে এবং আসামে যাইতেছে ৮ কোটি গজ; অবশিষ্ট বাঙলার ৬॥ কোটি নরনারীর জন্য মাত্র ১৫ কোটি গজ কাপড় থাকিতেছে। সুতরাং ইহা অস্বীকার করা চলে না যে, খরিদ্দারদের এক শ্রেণী বরাদ্দের চেয়ে বেশী মাল চাহিতেছে। মাল বণ্টনের ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত না হওয়াতে এবং চোরাবাজারের জন্য সংকট গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে।

যুদ্ধের অবস্থাজনিত মুদ্রাস্ফীতির সুযোগে যাহারা এইভাবে নিজেদের স্বার্থ-পিপাসা পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, গভর্নমেণ্ট হইতে তাহাদিগকে সংযত করা উচিত। আমরা তো দেখিতেছি, কাপড়ের দোকানে কাপড় মিলে না, অথচ কলিকাতা শহরে কাপড়ের দোকান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ কি? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, চোরা বাজারের কল্যাণে ধনীর কোন অসুবিধা হইতেছে না; পক্ষান্তরে তাহাদের এক শ্রেণীর প্রশ্রয়েই চোরা বাজার চলিতেছে। পক্ষান্তরে সরকারী অশেষবিধ ব্যবস্থাও দরিদ্রকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না। কৃষ্ণনগরের খবরে দেখিতেছি, কাপড়ের অভাবে সেখানে মফঃস্বলে লোক আত্মহত্যা করিতেছে। বাঙলা জোড়া এই ব্যাপার। আইন ও শান্তিরক্ষার এমন মহিমা সত্যই আর কোনদিন দেখা যায় নাই।

শান্তির ধুয়া

কিন্তু জাতীয় গবর্ণমেণ্ট এই সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ, শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ও সেদিন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার অর্থনীতিক বক্তৃতায় একথা বলিয়াছেন। ভারতের উপর ব্রিটিশের প্রভুত্ব

সুদৃঢ় রাখিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সংকল্পবদ্ধ হইয়াছে। সেদিন মার্কিণের ব্রিটিশ দূতাবাসের উপদেষ্টা স্যার ফ্রেডারিক পাকল ইংরেজি ভাষাভাষী সঙ্ঘের সভায় কূটনীতিকের কৌশলপূর্ণ ভাষায় ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশের এই নীতির মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"গ্রেট ব্রিটেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে সম্মত আছে, ক্রীপস প্রস্তাবই তাহার প্রমাণ; কিন্তু ভারত সেভাবে স্বাধীনতালাভ করিলেও তাহার সমস্যার প্রকৃতপক্ষে কোনই সমাধান ঘটিবে না।" স্বাধীনতার এই বুলির কার্যকর কোন মূল্য নাই। ভারতবর্ষে বর্তমানে রাজনীতিক স্থৈর্যাবস্থা, আর্থিক সমৃদ্ধি, আভ্যন্তরীণ শান্তি এবং সামরিক সূত্রে নিরাপত্তা সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। ভারতের স্বার্থের সঙ্গে সকলেরই স্বার্থজড়িত রহিয়াছে, মার্কিন গভর্নমেণ্টেরও আছে; কারণ ভারতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারা যদি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, তবে ভারত গভর্নমেণ্টকে শক্তিশালী এবং পাকা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া যুদ্ধোত্তর জগতে শান্তির পক্ষে ভারতবর্ষের গুরুত্ব অনেক রহিয়াছে। ভারতবর্ষে যদি শক্তিশালী গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে এসিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল, আফগানিস্থান, পারস্য এবং আরবের শান্তিকে সুনিশ্চিত রাখিবে।

প্রচারকার্যের এই সূক্ষ্ম নীতির গতি কোন দিকে—অনেকের দৃষ্টিতেই তাহা উন্মুক্ত হইবে। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি বড় কথার আড়ালে ব্রিটিশ প্রভুত্ব ভারতে বজায় রাখাই এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য—ব্রিটিশের যুদ্ধোত্তর নীতির ইহাই স্বরূপ। সেদিন শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই দিল্লীর রোটারী ক্লাবের বক্তৃতায় সে কথাটা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—

যুদ্ধের পর জগতের অর্ধেক অংশ যদি অপরার্ধের অধিকারে বিভিন্ন স্বার্থে বিভক্ত থাকে, যদি এসিয়ার শত্রু-অধিকার হইতে মুক্ত অঞ্চল আফ্রিকা, জাভা, সুমাত্রা এগুলি তাহাদের পূর্ব প্রভুদেরই করতলগত হয়, তবে বিপুল জনবল এবং ধনবল সত্ত্বেও জগতের অবস্থা ১৯৩৯ সালের চেয়ে কোনক্রমেই ভাল হইবে না। ভারতবর্ষ যুদ্ধে লিপ্ত থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত নাই। যুদ্ধোত্তর ঐরূপ জগতে ভারতের দুঃখ-কষ্ট বৃথা যাইবে. ভারতের স্কন্ধে ২ শত কোটি টাকা ঋণভার আপতিত হইবে; তবে বলিতে হইবে যে, ভারতের সন্তানেরা শুধু অপরের স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম করিয়াছে।

চিয়াং ও চার্চিল

ইহাই যুদ্ধোত্তর ভারতের ভবিষ্যৎ। নিউ ইয়র্কের 'ওয়ার্ল্ড টেলিগ্রাম' পত্রে প্রসিদ্ধ মার্কিণ সাংবাদিক মিঃ উইলিয়ম সিমস্ সম্প্রতি লিখিয়াছেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁহাদের অধীন দেশসমূহ নিজেদের দখলে রাখিবার জন্যই সঙ্কল্পবদ্ধ আছে। পার্ল বাক নিউইয়র্ক টাইমসের ম্যাগাজিনে 'চীন ইতিহাসের দুর্দিন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ক্রিপ্স মিশনের সময় মার্শাল চিয়াং-কাইসেক এবং মিঃ চার্চিলের মধ্যে যে পত্রবিনিময় ঘটে, সে সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—

ক্রীপস মিশনের সময় ভারত সম্পর্কে চার্চিল এবং চিয়াংয়ের মধ্যে যে পত্রবিনিময় ঘটে তাহা খুবই কৌতুকপ্রদ ও বর্তমান যুদ্ধের এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঘটনা। চীনের এই নেতা সম্পূর্ণরূপেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এই মিশনের বিফলতায় এসিয়ার পক্ষে পরিণতি কি হইতে পারে, তাই তিনি বৃটিশ নীতিকে অধিকতর কার্যকর করিবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে চার্চিলকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, এই মিশনের বিফলতার মূল কারণ ভারতে পাওয়া যাইবে না, চার্চিলের প্রাচীনপন্থী এবং অনুদার ও কঠোর হৃদয়ই উহার জন্য দায়ী। আধুনিককালের গতি তিনি রুদ্ধ করিবার জন্য সংকল্পবদ্ধ হইয়াছেন; যে মনের ভাব তিনি ভাষায় ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এলাইয়া দিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীর আসনে তিনি বসেন নাই। চিয়াংয়ের পরামর্শ ভদ্রতাপূর্ণ ছিল; কিন্তু চার্চিলের উত্তর অভদ্র এবং অহঙ্কৃত ছিল। চার্চিল এই উত্তর চিয়াংয়ের কাছে পাঠান নাই; তিনি তাহা চুংকিং-এর ব্রিটিশ দূতের কাছে প্রেরণ করেন। এই চূড়ান্ত অভদ্রতা কোন মেজাজী এবং স্বৈরাচারীও করিতে পারিতেন না। এশিয়া এবং ইউরোপের সমুদ্র ও পর্বতরাজির উপর দিয়া এই উত্তেজনাপূর্ণ আলাপের অবসানে চার্চিল এবং চিয়াং উভয়েই নিজেদের অধিকৃত দেশে পূর্বাপেক্ষা অধিক স্বৈরাচারী ও পীড়কের মূর্তি ধরিয়া উঠেন। সমগ্র জগৎ এই কথোপকথনের পরিণাম ফল বহু দিন ভোগ করিবে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহাকে একটা ভীষণ ব্যাপার বলা যাইতে পারে। দুইজন বা তিনজনের ভিতরকার এমন ব্যাপারের ফল বহু পুরুষ-পরম্পরাক্রমে মানব জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করিবে।

ভারতের জন্য মরাকান্না

বিংশ শতাব্দীর নূতন ধরণের সাম্রাজ্যবাদ এইভাবে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রের লণ্ডনস্থ প্রতিনিধি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

ইঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যুদ্ধের পর তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে ভারতে ব্রিটিশের শাসননীতি ঠিক বর্তমান ধরণে চলিতে পারে না। তাঁহারা এইরূপ আশঙ্কা করিতেছেন যে, রুজভেল্ট-বিরোধী মার্কিন ধনপতিগণ, রুজভেল্টের ইঙ্গ-সোভিয়েট ঘেঁষা নীতির প্রতি প্রীতি উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা ভারতের জাতীয়তাবাদ নিজেদের অনুকূল করিবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহাদের এই ধারণা যে এইভাবে তাঁহারা জগতের বাজারে ব্রিটিশকে কোণ ঠাঁসা করিতে পারিবেন। এই অবস্থা দেখিয়া এবং মার্কিনদের অনুকূলে ভারতের মতিগতির কতকটা ঝোঁক দেখিয়া ব্রিটিশ সার্থবাহদল ইঙ্গ-ভারত সহযোগিতায় এক নূতন নীতি নির্ধারণে প্রবৃত্ত আছেন। এই জন্য স্যার জর্জ সুস্টার প্রভৃতির দলকে ভারতের কৃষিজীবিদের জন্য অশ্রু বর্ষণ করিতে দেখা যায়। যন্ত্রচালিত শিল্পোন্নতির কথা কেবল তাঁহাদের মুখে। তাঁহাদের এই সাম্রাজ্যবাদমূলক নীতি কিভাবে ভারতে সফল করা চলে সেজন্য তাঁহারা লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি স্থানের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ লইতেছেন। পাকা অর্থনীতিকগণ এ সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করিতেছেন যে, যন্ত্রশিল্পোন্নতির সহিত সমান তাল রাখিয়া কৃষির উন্নতি ঘটিলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় অনিবার্য হইয়া উঠিবে। এ ক্ষেত্রে এই দলের উত্তর এই যে, বেশ, যখন তেমন ঘটিবে, তখন দেখা যাইবে, এখন ভারতবাসীরা তাহাদের নিজেদের দেশ শাসনের যোগ্য নয়। এই দোষ আমরা তাহাদের উপর চাপাইতে পারিব এবং সেই পথে ভারতের উপর ব্রিটিশ কর্তৃত্ব দৃঢ় করবার সুযোগ ঘটিবে।

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভারত সম্পর্কিত এই নীতির কূটতত্ত্ব ব্যক্ত করিয়া সম্প্রতি নিউইয়র্কের ইণ্ডিয়া লীগের প্রেসিডেণ্ট মিঃ জে জে সিংহ লিখিয়াছেন—

মিঃ চার্চিল সেদিন বিলাতের সংরক্ষণশীলদের সভার বক্তৃতাতে বলিয়াছেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত। ভারতের ৪০ কোটি নরনারী স্বাধীনতার দাবী করে; ইহাদিগকে প্রেমের বলে কিংবা সহযোগিতার সূত্রে সাম্রাজ্যের মধ্যে রাখা হয় নাই, ব্রিটিশ সেনাদের সঙ্গীণের জোরে রাখা হইয়াছে। মিঃ চার্চিল কাহাকে বোকা বুঝাইতে চাহেন? মিঃ চার্চিল জানেন যে, সানফ্রান্সিস্কোর বৈঠকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটিশের অধীনস্থ দেশসমূহের প্রশ্ন উত্থাপন করিবে; এজন্য তিনি পূর্ব হইতে নিজের দলবল গোছাইয়া লইবার চেষ্টায় আছেন। মানব সমাজ বুঝিয়াছে যে, চার্চিলী দলের এই সাম্রাজ্যলিপ্সা তৃতীয় মহাযুদ্ধকেই সন্নিকটবর্তী করিবে; সুতরাং আমি আশা করি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বৈঠকে ভারতের এবং অন্যান্য পরাধীন দেশের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য চাপ দিবে।

অধ্যাপক হেরল্ড লাস্কি ভারতের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া সম্প্রতি 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রে লিখিয়াছেন—

"ভারতে যে অবস্থা চলিতেছে, তাহা বজায় থাকিতে দেওয়া বর্তমান অবস্থায় অসম্ভব। সেখানে বর্তমানে যে নীতি চলিতেছে, তাহা বিপজ্জনক। এই নীতির ফলে এখন ভারতের যেরূপ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, পরিশেষে গ্রেটবৃটেনের পক্ষে সেইরূপ অনিষ্ট সাধিত হইবে। আমাদের জগত এক দেশ অপর দেশের উপর অপেক্ষা করিয়া চলে। ইহার এক অংশে যাহা ঘটে, অপর অংশের উপরও তাহার প্রভাব ঘটিবে, ইহা অনিবার্য। গ্রেট ব্রিটনে যদি আজ ভারতে ব্যাপকভাবে বন্দী করবার নীতি অবলম্বনে অভ্যস্ত হয়, তবে দুইদিন আগেই হউক, আর পরেই হউক, গ্রেট ব্রিটনেও সে অনুরূপ নীতি অবলম্বনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িবে।"

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতে যে নীতি চালাইতে অভ্যস্ত, গ্রেট ব্রিটেনেও যে তাহাই চলিবে, এমন ধারণা আমাদের হয় না। এক্ষেত্রে বরাবরই ব্যত্যয় দেখা যায়, তবে আমাদের নিজেদের জন্যই আমাদের ভাবনা।

জল-কল্লোল

শ্রী প্রবোধ কুমার সান্যাল

রবি যাদের ভেতো বাঙালী বলে ব্যঙ্গ করেছিল এবং ইউরোপ-আমেরিকার বড় বড় ধাপ্পা দিয়ে যাদের অভিভূত করেছিল, সেই হিতেনবাবুদের আজ আমাদের বড় দুর্দিনে মনে পড়লো। তাঁদের ঠিকানা আমি জেনে নিয়েছিলুম। কিন্তু আজকাল আমাদের আহার ও আশ্রয়ের কোন সংস্থান নেই, এই কথাটা তাঁদের জানতে দিতে রবি কিছুতেই রাজি নয়। রবি তাঁদের জানিয়ে রেখেছে রেংগুনের ক্রোড়পতি তার বাবার বন্ধু, কলুটোলার সরকারদের হিমালয়-সদৃশ আভিজাত্য, সুইস্ গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে আমাদের নেমন্তন্ন, আমাদের জাপান-আমেরিকার পরিকল্পনা—কিন্তু আজ আমরা যে দুটি ভাতের কাঙাল, একটু থাকার জায়গার অভাবে যে পথে পথে ঘুরি, আমরা যে সর্বত্র বিতাড়িত আর লাঞ্ছিত—হিতেনবাবুদের কাছে একথা প্রকাশ করার চেয়ে কলুটোলার সরকারের আফিং খেয়ে মরাও ভালো!

কিন্তু রবি নিজেই স্টেশনে গিয়ে তিন আনায় দুখানা টিকিট কিনে ট্রেনের কামরায় উঠে বসে বললে, আমি কিন্তু কিছু বলতে পারবো না—যদি মাথা হেঁট করতে হয়, তুমি করবে। ওটা তুমি সহজেই পারো।

এই বলে মুখের একটা বিক্ষুব্ধ আওয়াজ করে আমার প্রতি অসীম ঘৃণা নিয়ে সে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল।

আমাদের গন্তব্য স্থানটির নাম থিঙাংইয়াঙ। যেমন শিয়ালদহ থেকে ঘুঘুডাঙ্গা কিংবা বেলঘরে—এই এতটা। রেংগুন শহর কলকাতার চেয়ে অনেক ছোট এবং শহরটি ছাড়ালে একবারেই সেকেলে পল্লীগ্রাম। রেংগুন বন্দরই হলো রেংগুনের সর্বপ্রধান ব্যবসায়-কেন্দ্র, নদীপথে আসে মালপত্র—সুতরাং রেলগাড়ি কেবল অনেকটা যাত্রী আনাগোনা আর আদান-প্রদানের বাহন মাত্র। গাড়িগুলি ছোট ছোট—সাজ-সজ্জা কম। আশপাশে প্রান্তর অনেকটা বনময় জলা, দূরে দেখা যায় রেঙ্গুন ব্রীজ,—অনেকটা লছমনঝোলার পুলের মতন। দেখতে দেখতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের গাড়ি এসে পৌঁছলো থিঙাংইয়াঙ স্টেশনে। পথঘাট আমরা কিছুই জানিনে। সামনেই গ্রামের পথ, ও-পাশে ছোট্ট একটি খাবার-দোকান, এদিক দিয়ে চলেছে এক গরুরগাড়ি বোঝাই বাঁশ, কয়েকজন গ্রাম্য বর্মী স্ত্রী-পুরুষ বোধ হয় হাট থেকে ফিরছে! অর্থাৎ মন্থর নিঃশব্দ গ্রাম। এ যেন ঠিক বাঙলা দেশ, কোথাও তারতম্য নেই, কোথাও বৈচিত্র্য নেই। সেই কাদা আর জঙ্গল, সেই মাছি আর মাকড়সা, সেই মশা আর ডোবা। ওরই মধ্যে একটু শুকনো পথ ধরে আমরা অগ্রসর হলুম। আমরা শেষ চেষ্টা করতে এসেছি।

বনময় চারিদিক—নিঃঝুম। ঝিঁঝির ডাক শুনছি,—তার সংগে কোন্ গাছের ডালে ডাহুক। আশপাশে ঘন জঙ্গল; দিনের বেলাতেও অন্ধকার। রোদ আছে সেই স্টেশনের দিকে, এদিকটা ঠাণ্ডা, আর কেমন যেন গা-ছমছমে ছায়ান্ধকার। আমরা ঠিক-ঠিকানাটির গোলমালে প্রায় ঘণ্টাখানেক গ্রাম্য জংগলের গোলকধাঁধায় ঘুরে এক সময় এক বাংলোর বাগানের ধারে এসে দাঁড়ালুম। প্রথমটা বিশ্বাস করা যায় না যে, এ অঞ্চলে কোথাও জন-বসতি থাকতে পারে। বড় বড় ডাকাত যদি কোন গভীর বনের ঝুপসিতে বাসা নিয়ে পুলিশের চোখ এড়িয়ে থাকতে চায়, তবে এইটিই তার উপযুক্ত জায়গা। ভাগ্য অন্বেষণের কী বিড়ম্বনা আমাদের!

বাংলোর ধারে দাঁড়িয়ে আমরা গলা ছেড়ে হিতেনবাবুকে ডাকলুম—পরমুহূর্তে একটা মস্ত কালো লোমবহুল কুকুর তীরবেগে আমাদের দিকে দৌড়ে এল। কুকুর দেখলেই চিরদিন আমার তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলির কথা মনে পড়ে, কুকুর আমার কাছে বিভীষিকা। —তার ওপর এই জানোয়ারটার গায়ে এত বেশী ঘন কালো লোম যে, ওটার চোখ দুটোও ঠাহর করা যাচ্ছে না। ওর দ্রুত-পদক্ষেপের তালে তালে প্রায় আমি জড়িত-স্বরে দুর্গানাম জপ করে ফেলেছিলুম আর কি। যাদের বাড়ি বড় বড় কুকুর পোষা আছে, আমি কোন কালেই তাদের বাড়ি যাইনে। আমার গোঁদলপাড়ার ইতিহাস রবিও জানে। কুকুরের বিষ ঝাড়াতে গিয়ে দিদিমার আট টাকা খরচ হয়েছিল। মানকুণ্ডু দিয়ে ফেরবার সময় পথের ধারে দেখেছিলুম মস্ত কেউটে সাপ। দিদিমা দুর্গানাম জপ করেছিলেন।

কুকুর ছুটে আসতেই রবি মুখের একটা শব্দ করে তাকে এবং আমাকে একসংগে শান্ত করল। বললে, ভয় কি, কুকুর কত কেথফুল জানিস? আমাদের কলুটোলার বাড়িতে মস্ত একটা ফক্সটেরিয়ার ছিল,—ব্যাটা মুখ তুলে তাকালে বাঘেও ভয় পেতো। চোখ দুটো কী কালো! হা করে নিঃশ্বাস নিত, পাগুলো থাবা থাবা......

কুকুরটার দিকে তাকিয়ে আমার গলা শুকিয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমরা যে চোর নই, এটা ওর কাছে প্রমাণ করার জন্য আমি ভয়ে-ভয়ে হাসিখুশী মুখে কথা কয়ে উঠলুম। বললুম, তুই যে বলিস, কলুটোলার বাড়ি তোর মনে নেই? তবে কুকুর দেখলি কোথায়?

রবি বললে, আরে ওই হোলো। আমি দেখিনি, দাদামশায়ের কাছে শুনেছি!

এমন সময় হিতেনবাবু বেরিয়ে এলেন। সংগে সংগে তাঁর ভাগ্নে—কি যেন নামটা। হাসিমুখে কুশল প্রশ্নাদির পর কুকুরটাকে সামলে তিনি আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। আমি বললুম, আপনাদের ভুলতে পারিনি......কী চমৎকার লোক আপনারা—

রবি কটাক্ষে আমার দিকে তাকালো, অর্থাৎ প্রথম থেকেই আমি চাটুবাক্য আরম্ভ করে দিয়েছি,—যদি কোন সুবিধা হয়! হিতেনবাবু বললেন, না না, সে কি কথা, আপনাদের কাছে আমরা কিছুই নয়। কত সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে আপনারা— ইত্যাদি।

রবি তৎক্ষণাৎ খুশী হয়ে সিগারেট ধরালো এবং সাহেবি কায়দায় সিগারেটটা নিল ঠোঁটের কোনে। আমাদের গল্পগুজব আরম্ভ হলো। রেংগুন কেমন লাগছে, বড়ফয়া দেখলুম কি না, কোথায় আছি,—বাঙালীদের সংগে কী প্রকার ঘনিষ্ঠতা হোলো, ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ভাদুড়ীর কথা—অর্থাৎ রবিকে প্রশ্ন করে তাঁরা গলগল করে মিছে কথা শুনলেন। আমাদের কাছে তখন প্রশ্ন করার অর্থই হলো মিছে কথা শোনা।

এমন সময় এক ভদ্রলোক বর্মি-পোষাকে এবং তাঁর চেহারাটাও অবিকল বর্মী—গম্ভীরভাবে বেরিয়ে এলেন। নাকের ডগা মোটা, কিন্তু খাঁদা, চোখ দুটো রাঙা, ছোট ছোট—দেখলে দুর্ভাবনা জাগে। তিনি হাসলেন না। কেবল ঘাড় নেড়ে নমস্কার নিলেন। হিতেনবাবু বললেন, উনিই আমার কাকা, এখানকার ডাক্তার। —উনি বাঙলা জানেন না।

ভদ্রলোক বিনা বাক্যব্যয়ে আবার বেরিয়ে গেলেন। আমাদের মুখের চেহারা লক্ষ্য

করে হিতেনবাবু—যতদূর আমার মনে পড়ে এতকাল পরে—বললেন, তাঁর ঠাকুরদাদার ভাই এসেছিলেন বর্মায় অল্পবয়সে। তিনি বিবাহ করেন এক বর্মী নারীকে, কাকা তাঁরই গর্ভের সন্তান। এ'র স্ত্রীও বর্মী,—এ-বাড়িতে বাঙলা ভাষার চর্চা নেই।

আমি সবিনয়ে মিষ্টকণ্ঠে বললুম, কাজকর্মের সুবিধে কেমন হলো আপনাদের ?

হিতেনবাবু নতমুখে বললেন, আপনাদের কাছে বলতে লজ্জা পাই। আমরা এসে হয়ত ভুল করেছি, কাজের কোন সুবিধে এখন হবে না। তাছাড়া 'বার্মা ফর বার্মিজ' আন্দোলন চলছে। কাকা বলছেন, মাস ছয়েক এখানে থেকে যদি চেষ্টা-চরিত্র করা যায়—কিন্তু, বিশেষ কোন আশা নেই!

রবি চুপ কবে রইলো, দুশ্চিন্তায় সিগারেট টানতে সে ভুলে গেল। আমি কিয়ৎক্ষণ পরে বললুম, ফেরবার গাড়ি পাবো ত ?

হিতেনবাবু বললেন, আধ ঘণ্টা পরে একটা গাড়ি আছে—

বললুম, কিছু যদি না মনে করেন...... এক গ্লাস খাবার জল......

একটি ছোকরা জল এনে দিল। জলের গ্লাসের ভিতরে মুখ দিয়ে ওই জলের মধ্যেই প্রতিবিম্বিত দেখলুম, ধু ধু করছে মরুভূমি। ছায়া নেই, মায়া নেই, কোথাও আলো নেই, কোথাও সুদিনের সুদূরতম সঙ্কেতও নেই। জল খেয়ে গ্লাস রেখে উঠে দাঁড়ালুম, আমাদের যেতে হবে। এই নৈরাশ্য-নিঃশ্বাসের মধ্যে আর একদণ্ডও নয়।

আশ্চর্য, বাড়িটার ভিতরটাও কেমন যেন ছমছমে নির্জন। চারিদিকে পুরনো কাঠের অপরিচিত গন্ধ,—মোটা ঠাণ্ডা কঠিন কালো-কালো কাঠ......অন্ধকারে কার চাপা চাপা পায়ের গুরু গুরু শব্দ কাঠের আনাগোনার পথে মিলিয়ে যাচ্ছে। আকাশে মেঘ করেছে, কিংবা জঙ্গলের ভিতরে আলো আসতে পারছে না, কিংবা বাংলোটা আঁধারে আবৃত—কিংবা সমস্তটাই আমাদের নিরুৎসাহ বিষণ্ণ প্রাণের মলিন প্রতিচ্ছায়া—আজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আর মনে পড়ছে না। শুধু মনে পড়ে আমাদের সেদিনকার বর্তমান জীবনের ভয়াল বিপদ ঠিক যেন বিভীষিকার মতন মুখ ব্যাদান করে রয়েছে।

হিতেনবাবুর সঙ্গে আলাপ সেরে রুদ্ধকণ্ঠে আমরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলুম।

স্টেশনে এসে পয়সা বাঁচাবার জন্য বিনা টিকিটে গোপনে আমরা রেঙ্গুনের গাড়িতে উঠে বসলুম। ফিরতে মিনিট পনেরো লাগে, কিন্তু সেই পনেরো মিনিটের কী উদ্বেগ! রবি বে-পরোয়া, মরিয়া। যদি ধরা পড়ি, তবে হাজতে গিয়ে আহার ও আশ্রয় পাব—এই তার অভিমত। আমরা সেই সময় মনেও করেছিলুম যে, আমরা বিপ্লবী দলের ছেলে, 'এই বলে পুলিশের কাছে ধর্ণা দিয়ে যদি আহার ও আশ্রয় পাই। মনে করেছিলুম, কিছু একটা চুরি করতে গিয়ে না হয় ইচ্ছে করে ধরা পড়ি। আমরা চেষ্টা করলুম, সিঙ্গাপুরের জাহাজে কোনপ্রকারে গা-ঢাকা দিয়ে উঠে জায়গা করে নিই। কিন্তু জাহাজ ঘাটায়, কুলী-এসেন্সিতে, চীনা দপ্তরে এবং জেঠিতে এত কড়াকড়ি যে, আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

রেঙ্গুন স্টেশনে এসে নামলুম। রবি আমাকে সঙ্গে নিয়ে টিকিট ঘরের কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ালো। সহসা টিকিট ঘরের ফোকরের কাছে একটি বর্মী ভদ্র-লোককে ইংরেজিতে বললে, আপনি যদি থিঙাংইয়াঙের টিকিট চান আমি দিতে পারি স্যর—

লোকটি আমাদের দিকে তাকালো। রবি বললে, আমাদের সেখানে যাবার কথা ছিল, কিন্তু যাবো না কোনো কারণে।

লোকটি বললে, আমার দু'খানা টিকিট চাই...স্ত্রী আছে সঙ্গে...

হৃদয়, অত অধীর হেয়ো না, শান্ত হও! কিন্তু আমার পা দুখানা কাঁপছে। রবি বললে, হ্যাঁ, দুখানাই আছে.—অবিশ্যি দুআনা পেলেই আমরা খুশী হবো।

লোকটি দেখলো, তাকে আর ভীড় ঠেলে টিকিট করতে হয় না। সুতরাং হাত পেতে টিকিট দুখানা নিয়ে তিন আনা পয়সা বা'র করে দিল। তারপর বললে, তোমরা ছেলে-মানুষ, তোমাদের ঠকাবো কেন?

বেশ অনুভব করলুম, তিন আনা পয়সা রবির হাতের তেলোর মধ্যে রি রি ক'রে যেন জ্বলছে। লজ্জাও যতখানি, অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যও তত বড়।

ভ্রমণটা সম্পূর্ণ হোলো বিনামূল্যে,—কিন্তু ওই তিন আনাই আমাদের সেদিনকার নৈশ-ভোজনের প্রধান সম্বল। আমার জীবনে প্রথম বিনা টিকিটে ট্রেন ভ্রমণ ব'লেই ঘটনাটা মনে আছে!

চট্টগ্রামবাসী আর একটি সুদর্শন ভদ্র-লোকের সঙ্গে কেমন ক'রে জানি না ওখানে আলাপ হয়েছিল। তাঁর নাম স্ফটিকবাবু। তাঁর কছে প্রায়ই চাকরির চেষ্টায় যেতুম। সেদিন সন্ধ্যার বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আমরা স্ফটিকবাবুর কাছে গিয়ে আমাদের নিরুপায় অবস্থার কথা জানালুম। তিনি বললেন, এত বড় শহরে যে আপনাদের দুটো কাজ জুটবে না, এ আমি বিশ্বাস করিনে। তবে কি জানেন, সুযোগ সুবিধের দরকার। দু' তিনমাস থাকলে একটা না একটা জুটেই যাবে, এই আমার মনে হয়। অবিশ্যি সমস্তটাই অনিশ্চিত।

আমরা জানতুম, আর সাতটি দিনও আমাদের চলবে না।

স্ফটিকবাবু বললেন, আপনারা এসেছেন শিয়রে সংক্রান্তি নিয়ে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কি কাজ হয় ভাই?

প্রথম বন্ধুত্বের সস্নেহ স্পর্শ। রবি তৎক্ষণাৎ বললে, দেখুন, আমাদের থাকার জায়গাও নেই!

স্ফটিকবাবু আমাদের আপাদমস্তক একবার তাকালেন। পরে বললেন, ও, তাই নাকি? তা বেশ, আপনারা আমার মেসে এসে উঠুন, থাকুন কিছুদিন। আজ ব্যস্ত আছি, কালরাত্রে আপনারা জিনিসপত্র নিয়ে আসবেন। কিন্তু হ্যাঁ, একটা কথা, চাকরি আপনাদের হবেই, এমন কথা কিন্তু দিতে পারবো না, ভাই।—এ যাত্রা হয়ত আপনাদের দেশেই ফিরে যেতে হবে।

আমরা বাধিত ও কৃতার্থ হয়ে চলে এলুম।—

আকাশ ভেঙ্গে বর্ষা নেমেছে। রেঙ্গুন শহর নিরিবিলি; পথের দোকানপাট অনেকটা বন্ধ। কোনো কোনো পানের দোকান শুধু খোলা। আমরা খুঁজে খুঁজে একটি ছোট সস্তা হোটেল বা'র করলুম। আমার শরীর ভালো ছিল না, জামাকাপড় সব ভিজে জাব,—যাহোক একটু গলাধঃকরণ করে পয়সা চুকিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

দুর্গাবাড়ির নাটমন্দির ঘন অন্ধকার। আমাদের জামা, জুতো, কাপড়—সব জলে সপ্সপ্ করছে। ওরই মধ্যে ভিজা কাপড়ে পা আর মাথা মুছে আমরা সেই ভাঙা তিন ফুট লম্বা চওড়া চৌকির উপর সন্তর্পণে বসলুম। রবি সিগারেট মুখে দিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি ধরালো—আস্তে ঘষলো, পাছে শব্দ হয়।

দাঁতের উপর দাঁত চেপে রবি বললে, তোর জন্যেই আমার এই শাস্তি!

বললুম, কেন?

চুপ্—সোয়াইন! মুখ নাড়িস নে। যখন ধমক দেবো, মাথা হেঁট্ ক'রে থাকবি। তোর জন্যেই আমার এই শাস্তি!

মাথা হেঁট্ ক'রে রইলুম।

রবি বললে, তুই আমার কানে মন্তর দিয়ে দেশছাড়া করলি, নৈলে আমার কী দরকার ছিল চাকরির খোঁজার? আমি বাবার টাকায় যেতে পারতুম না জাপানে আর আমেরিকায়? After all, আমি তোর মতন ভ্যাগাবণ্ড নই!

মুখ তুলে কি যেন বলতে যাচ্ছিলুম, রবি দাঁত কিটিয়ে বললে, ফের মাথা তোলে! চুপ—চুপ, একেবারে! এখনি কবিরাজকে ডাকবো,—দুজনে তোমার দু' কান ধ'রে বৃষ্টিতে বা'র ক'রে দিয়ে আসবো।—ধরো, মাথা হেঁট ক'রে থাও।—এই ব'লে যথারীতি জ্বলন্ত সিগারেটের এক-তৃতীয়াংশ সে আমার হাতে দিল। পুনরায় বললে, দয়া

ক'রে কাপড়জামা আগুনে বসে থাকো, আমি একটু গড়িয়ে নিই। সাবধান, চুরি ক'রে যেন সিগারেট বা'র ক'রে খেয়ো না।

বললুম, তুই ঘুমোবি, আমার ঘুম পায় না?

চুপ,—রবি তড়াং ক'রে সোজা হয়ে বসলো। বললে, দয়া ক'রে একটি কথা ভেবে দেখবে কি? কাল রাত্তিরে তোমার ডরিয়ে ওঠার জন্যে আমার ভালো ঘুম হয়নি। তাছাড়া, তোমার জ্বালায় আজ আমি বেশী খেয়ে ফেলেছি, একটু না গড়ালেই আমার চলবে না!—এই ব'লে সে পা গুটিয়ে আড় হয়ে পড়লো।

বললুম, তবে কি আমাদের ফিরে যেতে হবে?

তৎক্ষণাৎ দাঁত খিঁচিয়ে রবি আবার উঠে বসলো। বললে, এঃ, ফিরে যাবে! নাকে কান্না! তখন মনে ছিল না? ফিরে যাবার নাম করলে জিব্ টেনে বা'র করবো!—নিশ্চয় লুকিয়ে তুই পকেটে টাকা এনেছিস, নৈলে এত তেল কেন? কই, বা'র কর্, কোথায় টাকা রেখেছিস্? ফিরে যাবার গাড়িভাড়া কে দেবে?

বললুম, তুই কি ভাবছিস্ শুনি?

আমি ভাবছি তোমার মুণ্ডুটা টেনে ছিঁড়বো কবে! তোমাকে কোথাও যেতে দেবো না! এইখানে থাকবে, লেংটি পরবে, ভিক্ষে করবে, সন্নিসি হয়ে ঘুরবে—কেঁদে কেঁদে বেড়াবে খঞ্জনি বাজিয়ে—

বললুম, আর তুই?

রবি বললে, আমি? আমি কলুটোলার সরকার! একখানা চিঠি পাঠাবো আমার দিল্লীর বন্ধু জাগমোহনকে—হু হু ক'রে টাকা আসবে! After all, তোমার আশীর্বাদে ভদ্রসমাজে আমার টু-পাইস্ প্রেস্টিজ হ্যাজ!

আমার শোচনীয় পরিণাম কল্পনা ক'রে আমি যেন আঁৎকে উঠলুম। কিন্তু একটা রক্তাক্ত শিকার পথের ওপর প'ড়ে ওলোট-পালট খেলে শিকারী যেমন ক্রূর উল্লাসে সেটাকে লক্ষ্য করে, রবি তেমনি অন্ধকারে ব'সে আমার নিরুপায় মুখখানার দিকে ক্ষণে ক্ষণে কটাক্ষ করতে লাগলো।

নিঃসাড় নাটমন্দির—অন্ধকারে নিঃঝুম, যেন প্রেতপুরী। বাইরে ঝমঝম্ ক'রে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে। তালাবন্ধ প্রতিমার মুখখানা কল্পনায় দেখতে লাগলুম। ওটা কি এখনও প্রসন্ন? অন্ধকারে এখনও কি সেই সোনার মুখ জ্বলছে? রেল আপিসের বড়বাবু মিঃ চাটার্জির মুখখানার কথা ভাবলুম। সে মুখ কি তেমনি বীভৎস? তেমনি বিকৃত? ভাবতে লাগলুম, ঝড়ে লণ্ডভণ্ড সাগরতরঙ্গের চেহারা—তার সীমা নেই, আদি নেই, অন্ত নেই!

তবে কি ফিরে যেতে হবে!

তবে কি বুঝতে হবে যারা মাথা উঁচু করতে চায়, তাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে, তারা ভাসে সমুদ্রে, তারাই দোলা খায় উৎপীড়নে আর লাঞ্ছনায়?'

কিন্তু ফিরে যাবো কেমন ক'রে? আমরা সর্বস্বান্ত, রিক্ত,—আগামীকাল আমাদের উপবাস ছাড়া গতি নেই। আমরা নির্বুদ্ধিতার চোরাবালির ওপর প্রাসাদ তুলছিলুম,—সেটি রূঢ় বাস্তবতার আঘাতে ভূমিসাৎ হয়ে গেল! কিন্তু ফিরবো কেমন ক'রে?

তিন ফুট লম্বা-চওড়া তক্তা, দুজনের আঁটে না। দুজনে শুয়েছি গায়ে গায়ে এবং চারখানা পা উঁচু ক'রে রেখেছি। ঘুমের মধ্যেও সজাগ আছি, কারণ ভোরে উঠেই পালাবো। তন্দ্রায় সহসা একখানা পা খ'সে তক্তার বাইরে প'ড়ে যায়—আমরা আঁৎকে উঠি। পা ঝুলিয়ে শোওয়া যায় না, কোমর টন্‌টন্ করে। দুজনে দুজনের হাঁটুতে ঠেকো দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন আছি,—ফস্ ক'রে বাইরের পা দুখানা পিছলে যায়। অমনি আমরা আঁৎকে উঠি। মাঝে মাঝে ছোট তক্তাখানার ভাঙা পায়াটা মড়্‌মড়্ ক'রে ওঠে, অমনি আমরা চমকে উঠে এদিক-ওদিক তাকাই। কিন্তু বৃষ্টির আর বিরাম নেই। হু হু গোঁ গোঁ ক'রে ঝড়ের বাতাস চলছে বৃষ্টির সঙ্গে যোগ দিয়ে। মাথাটা ভার, চোখ দুটো জ্বলছে, মাঝে মাঝে কাশছি খুক্‌খুক্ ক'রে। কিন্তু ওই তিন ফুট তক্তা ছাড়া আর আমাদের কোথাও ঠাঁই নেই,—নাটমন্দির জলে ভাসছে। শীত করছে, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, —ভিজে জামাকাপড় স্যাঁতস্যাঁত করছে সর্বাঙ্গে,—গায়ে ঢাকা দেবার কোথাও কিছু নেই। ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরবার উপায় নেই, জায়গার অভাব,—সুতরাং চিৎ হয়ে পা উঁচু ক'রে থাকতেই হবে। যাদের মৃত্যু ঘটেছে, তারাও শ্মশানে যাবার সময় চৌদ্দপোয়া খাটিয়া পায়,—আমরা জীবিত ব্যক্তি, আমাদের সে সৌভাগ্যও নেই। রবি নিজের বুকের উপর দুই হাত রেখে চোখ বুজে আছে,—হাত দুখানা ছড়াবার মতন জায়গা নেই। তাছাড়া তা'র টাকায় আমার এই দেশভ্রমণ, তা'র পয়সায় খাই,—সুতরাং তিন ফুটের দু' ফুট একা তাকেই ছেড়ে দিয়েছি। ভোর হ'লে বাঁচি,—এর চেয়ে বৃষ্টিতে ভিজে পথে পথে বেড়ানো ভালো,—কারণ সেখানে হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচবো; কিন্তু এ বন্ধনদশা অসহ্য। ঠিক কিভাবে প'ড়ে আছি বলা কঠিন। চিৎ নয়, কাৎ নয়, উপুড় নয়—শোওয়া-বসা কোনোটাই নয়,—অমনি একরকম আছি। খানিকটা ঝুলছি শূন্যে, খানিকটা তক্তায়; অর্থাৎ একাংশ জলে, অপরাংশ ডাঙায়। জানিনে আর কতক্ষণ এইভাবে কাটাতে পারবো! ভিতরে জল, বাইরে জলপ্লাবন, আকাশে বন্যা, ইরাবতীতে প্রবল জলস্রোত, সাগরে অকূল কালো জল আকুলি-বিকুলি —আমরা দুটি নাবালক ভাসছি সকলের মাঝখানে একটি তিন ফুট লম্বা-চওড়া ভেলায় চ'ড়ে,—তার একটি পায়া আবার ভাঙা! কেমন যেন বিকার-প্রলাপের হাসি আমার মুখে ফেনিয়ে ওঠে। নিজের দেহ ছেড়ে বেরিয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের অবস্থা দেখে হাসতে থাকি।

তিন ফুট-বাই-তিন ফুট; যেদিকেই মাপি —তিন ফুট। টলস্টয়ের একটা গল্পে আছে, মানুষ জায়গা দখলের জন্য সমস্ত জীবন ধ'রে যতই ছুটোছুটি করুক, আসলে তার দরকার সাড়ে তিন হাত জমি। আমরা বাঙলা থেকে এসেছি বর্মায়, আমরা জয় করতে বেরিয়েছি চীন জাপান আমেরিকা আর ইউরোপ,—কিন্তু তিন ফুটের চেয়ে বেশি জায়গা আমরা পাচ্ছি নে। আর আমরা চাইনে ওই ইউরোপ আর আমেরিকা, চীন আর জাপান,—আজ রাত্রের সকলের বড় সংগ্রাম হোলো তিন ফুটের বিরুদ্ধে; কারণ, আমরা চাই সাড়ে তিন হাত!

তবে কি সাড়ে তিন হাত জমি বর্মায় আমাদের জন্য নেই? তবে কি নিরন্ন নিরাশ্রয় আমরা এই তিন ফুট-বাই-তিন ফুটের সংকীর্ণ জীবনের মধ্যে ব'সে আত্মগ্লানি আর অনুশোচনা নিয়ে অন্ধ নিগূঢ় নিয়তির ঋণশোধ ক'রে চলবো? তবে কি আমাদের সমস্ত চিত্তক্ষোভ, ব্যর্থতা, হতাশা, অভিশাপ, বেদনা,—আমাদের সমগ্র কষ্টক্লিষ্ট ইতিহাসটা লেখা থাকবে এই পায়াভাঙা উইপোকা-খাওয়া তিন ফুট-বাই-তিন ফুটে? তবে কি আমাদের চীন-জাপান আর ইউরোপ-আমেরিকা কণ্ঠরোধ হয়ে ম'রে প'ড়ে থাকবে এই সংকীর্ণ তিন ফুট-বাই-তিন ফুটে?

বোধ হয় আমিই একটু ন'ড়ে থাকবো, কিম্বা রবি ঘুমের ঘোরে একবার পাশ বদ্‌লাবার চেষ্টা ক'রে থাকবে—সহসা তক্তার তলার দিকে মড়-মড়-মড়াৎ শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকের তক্তার অংশ মুখ থুবড়ে ভেঙে পড়লো জলে-ভাসা মেঝের উপর। ভেলা ডুবলো সমুদ্রে। আমি ছিটকে পড়লুম, রবি ছিটকে পড়লো ঘুমের ঘোরে আমার ঘাড়ের উপর। পলকের মধ্যে দুজনে যেন দুজনের হাতে-পায়ের মধ্যে জড়িয়ে হতভম্ব বিমূঢ় হয়ে গেলুম।

ঘুমের ঘোরে দৈবদুর্বিপাক। আমি হাঁপাচ্ছি, রবি ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে। কিন্তু তক্তার মড়্‌মড় শব্দে কেউ জাগলো কি না, সেজন্য আমরা কান পেতে রইলুম কিয়ৎক্ষণ। না, কেউ জাগেনি। আর্য সংগীতালয় থেকে রবি একটা অশ্লীল গালাগাল শিখেছিল, সেটি প্রয়োগ করলো তক্তাখানার উপর, কবিরাজের উপর এবং সোনার দুর্গা-প্রতিমার উদ্দেশে। তারপর আমার কাছে স'রে এসে বললে, হ্যাঁরে?

বললুম, কি?

রবি বললে, খুব লেগেছে তোর, না?—

আচ্ছা, ঘুমের ঘোরে তুই অমন কাৎরাচ্ছিলি কেন বল্ ত? কি হয়েছে তোর?

চুপ করে রইলুম।

অন্ধকারেই রবি এক হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। বললে, আমার ওপর রাগ করেছিস, কেমন? একি, এত গরম! তোর গা যে পুড়ে যাচ্ছে রে! কখন্ থেকে জ্বর হোলো!

বললুম, ঠিক মনে পড়ছে না!

রবি বললে, নিমোনিয়ায় তোর ভয়,—এ কিন্তু নিশ্চয় নিমোনিয়া!—সর্বনাশ করলি? এখন উপায়? কেমন ক'রে ফির্‌বি? একটি টাকাও নেই যে? ডাক্তার দেখাবো কোথেকে?

কিয়ৎক্ষণ সে চুপ ক'রে রইল, তারপর বললে, আমার কথা ভাবিসনে। তোকে ছেড়ে দিয়ে জানিনে আমার কেমন ক'রে চলবে! হয়ত চলবে, হয়ত চলবে না,—কিন্তু তোকে ফিরে যেতেই হবে ভাই, অমত করিস নে। নৈলে তোর মায়ের কাছে আমি কোনো দিন মুখ নিয়ে দাঁড়াতে পারবো না।—তবে যাবার সময় ব'লে যাস, আমার ওপর তোর কোনো রাগ নেই!

বললুম, একলা আমি ফিরে যাবো না।

রবি বললে, খবরদার, তোকে যেতেই হবে!—চোখ রাঙালো সে।

না।

রবি সহসা ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, যদি না যাস্ তবে তোকে না খাইয়ে রোগে ভুগিয়ে মেরে ফেলবো।

বললুম, সেও ভালো, তোর কাছে মরবো!

তোকে লাথি মেরে খুন করবো!—রবি চেঁচাতে না পেরে দাঁতে-দাঁতে ঘষলো।

শান্তকণ্ঠে বললুম, বেশ ত, তোর হাতেই মৃত্যু হবে!—

রবি বললে, কাল শনিবার, কাল যদি তোকে জাহাজে তুলতে না পারি, তবে আমি আমার নাম বদলে ফেল্‌বো!

আমি রুগ্ন হাতে তাকে ধরতে গেলুম। সে স'রে গিয়ে বললে, খবরদার, সোয়াইন্—কাল যদি না যাও তবে রবিবার সকাল থেকে আমাকে আর দেখতে পাবে না।

বললুম, আমি গেলে তোর চল্‌বে?

রবি বললে, তুই না গেলে আমার আরো অচল হবে!

কিন্তু টাকা?

টাকা! মাটি ফুঁড়ে আমি টাকা তুলবো,—আমি কলুটোলার সরকার!—এই ব'লে সে কাছে এসে আমার হাত ধ'রে আবার বললে, আমাকে শুধু গাল দিতেই দেখেছিস, আমাকে কোনোদিন দেখলিনে!

আমি তার হাতের মধ্যে চুপ ক'রে রইলুম। আমরা আবাল্য বন্ধু!

আমাকে জোর ক'রে তাড়াবার উদ্দেশ্য রবির কিছু ছিল বৈকি! সে নিজেও ফিরে যেতে চায়, অথচ তার যাবার মুখ নেই। বাপের প্রতি তার অতিশয় শ্রদ্ধা, অথচ তাকে সে প্রতারিত ক'রে পালিয়ে এসেছে। ইউরোপ আমেরিকার নেশা তা'র কেটে গেছে, এখন ঘরের জন্য তার মন কাঁদছে। বর্মায় আর তার ভালো লাগছে না, এখান থেকে পালাতে পারলে সে বাঁচে। তার ইচ্ছে আমি কলকাতায় ফিরে তার দুর্দশার কথা বলি তার মা-বাবার কাছে, খুব বাড়িয়ে ফেনিয়ে করুণভাবে যেন বলি—যদি তাঁদের মন গলে। আর যদি তাঁরা কাতর না হয়ে ক্রুদ্ধ হন্, তবে আমি যেন যেমন ক'রেই হোক্ কিছু টাকা টেলিগ্রাম ক'রে পাঠাই। সাত দিনের মধ্যে টাকা না এলে সে সুইসাইড্ করবে। স্ফটিকবাবুর ঠিকানাটা আমি রেখে দিলুম।

চায়ের দোকানে ব'সে রবি বললে, একখানা চিঠি বাবাকে লিখে তোর হাতে দিই, কি বলিস্?

ধমক খাবার ভয়ে আমি চুপ ক'রে রইলুম। রবি বললে, তুই ত' বাঙলা লিখিস, কায়দা ক'রে লিখে দে'না একখানা চিঠি! দেখিস্, বাবার চিঠি......ভুল বাঙলা লিখিস্ নে।

বললুম, তুই নিজে লেখ্ না?

চোখ পাকিয়ে রবি বললে, আমি জীবনে কখনো বাঙলা লিখিনি, তা জানিস? I hate your language.

হোটেলে ব'সেই বাঙলায় একখানা চিঠি লিখে তার হাতে দিলুম। সে নিবিষ্টমনে প'ড়ে চিঠিখানা কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিল। বললে, এই জন্যেই তুই সেবার বাঙলা কম্পোজিশনে ফেল্ করেছিলি! Rather, ভুল ইংরেজি লিখবি, কিন্তু বাংলা লিখবিনে। দয়া ক'রে আমার এ উপদেশটি চিরকাল মনে রেখো। এই ব'লে সে 'মাইডিয়ার ড্যাডি—' সম্ভাষণ ক'রে বাপের কাছে একখানা চিঠি লিখতে ব'সে গেল।

চিঠি শেষ হ'লে রবি বললে, এই চিঠি প'ড়ে সবাই কাঁদবে, দেখিস। এই দ্যাখ্ Contemplation শব্দটা এতদিন পরে ঢুকিয়ে দিতে পারলুম। কি রে, তোর কি জ্বর বাড়লো?

বললুম, কালকের চেয়ে একটু বেড়েছে বোধ হয়।

চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। সকাল তখন সাতটা বাজে। আমরা ভাবলুম, স্ফটিকবাবুর কাছে কেঁদে পড়ি, যদি গোটা পঁচিশেক টাকা তিনি দেন। কিন্তু লোকটি মিষ্ট প্রকৃতির ব'লেই হয়ত আমাদের লজ্জা হোলো। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, জাহাজ ছাড়বে সাড়ে দশটায়। সুতরাং সময় আমাদের মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টা। বলতে গেলে দুদিন আমাদের যা'তা খেয়ে কাটছে—কিন্তু পুঁজির চেহারা দেখে আহার করতে আর সাহস নেই। আমার বেশ জ্বর, গায়ে-পিঠে ব্যথা, বুকে সর্দিকাসি—ক্ষুধা তৃষ্ণা একেবারেই নেই, রুচি ম'রে গেছে। রবি মাঝে মাঝে, অর্থাৎ দিনে পাঁচ সাতবার চা পেলেই খুশী। ওর মধ্যে দুধের আর চিনির ভাগ আছে!

আর্য সঙ্গীতালয়ে আর যাবো না, তা ছাড়া টাকা ধার দেবার মতনও ওখানে কেউ নেই। আর, আমাদের লোকে টাকা দেবেই বা কেন? আমরা জুতো জামা কাপড়ের দিকে তাকালুম। রবি বললে, জামা কাপড় বিক্রীর চেয়ে আত্মহত্যা ভালো! অর্থাৎ মুস্কিল হয়েছে এই, আমার সর্বপ্রকার পরিকল্পনাই রবির আভিজাত্যে আঘাত করছে। রেঙ্গুনে বাসকালে সে অন্ততপক্ষে হাজার খানেক বার আমার কাছে আত্মহত্যার ভয় দেখালো। যারা বার বার শুধু ভয় দেখায়, তারা যে আত্মহত্যা করে না—এ বুঝতে পারতুম। কিন্তু সত্যি সত্যি একবার ক'রে ফেললে আমি দাঁড়াবো কোন্ চুলোয়? সুতরাং চুপ ক'রে তা'র নির্দেশ মানতুম। পরবর্তীকালে রবি সুইসাইডের ভয় দেখিয়ে তা'র মায়ের কাছে অনেক টাকা আদায় করেছিল। আমি সুইসাইডের ভয় দেখাবার মানুষ খুঁজে পেতুম না। মা রাগ ক'রে নিজেই বলতেন, তুই নিপাত যা, গলায় দড়ি দিয়ে ডুবে মর্—

আমি কলা দেখিয়ে পালিয়ে যেতুম,—একবারও মরিনি!

সময় আমাদের আসন্ন, দেখতে দেখতে বেলা বাড়ছে। রেঙ্গুন শহরের প্রান্তে এসে এক বস্তির পাড়ায় ঢুকে এক পানের দোকানে খোঁজ নিয়ে জানলুম, কাছাকাছি এক 'পন-শপ্' অর্থাৎ বন্ধকী দোকান আছে। আমাদের দুজনের দুটো হাতঘড়ি, আর বায়নকুলারটির ওপর রবি বাজি ধ'রে বসেছিল। আমার কল্-বিগড়ানো রেডিয়ম ঘড়িটার নতুন দাম ছিল নাকি সাত টাকা। রবির ঘড়ির দাম পচাত্তর আর বায়নকুলারটির ইংরেজি দাম হোলো, উনিশ পাউন্ড। তখন পাউন্ডের দাম পনেরো টাকা। অর্থাৎ সব মিলিয়ে নতুন দাম সাড়ে তিন শো টাকার ওপর। কিন্তু প্রশ্ন উঠলো, আমাদের কাছে এগুলি দেখলে প্রথমতঃ চোরাই মাল ব'লে সন্দেহ করবে কিনা। আমি বললুম, ধরা পড়লে ভালোই, হাজতে গিয়ে থাকা-খাওয়া পাবো!

রবি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, চুরির দায়ে ধরা পড়বো? বাবার মাথা হেঁট হওয়ার আগে আত্মহত্যা করবো, তা জানিস?

আমরা পানওলার কাছে আমাদের দুর্দশার কাহিনী নিবেদন করলুম। পানওলা একটি লোক সঙ্গে দিয়ে আমাদের পাঠালো। আমরা বললুম, এ জিনিসগুলি বাঁধা রেখে যদি অন্তত শ'খানেক টাকা পাই, তবে পাঁচ টাকা আমরা পানওলাকে

বকশিস দেবো। লোকটি সোৎসাহে আমাদের নিয়ে গেল একটি করোগেটের চালার নীচে।

অত্যন্ত গরীব লোকেরা সেখানে ভিড় করেছে। গৃহস্থ মেয়ে-পুরুষ দু'চারজনও নানাবিধ বন্ধকী দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে সেখানে ঘিরে রয়েছে,—দুজন নিম্ন-শ্রেণীর মাতাল পাশে দাঁড়িয়ে প্রলাপ বকছে। একটা কাঠের ফোকরের মুখে দাঁড়িয়ে সকলেই হাত পেতে টাকা চাইছে, কিম্বা নিচ্ছে। দিদিমা বলতেন, লজ্জা, মান, ভয়—তিন থাকতে নয়! সুতরাং তিনটি পদার্থ দূরে সরিয়ে রেখে আমাদের জিনিসগুলি ফোকরের কাছে বাড়িয়ে দিলুম। ভিতরে একটি লোকের শুধু মুণ্ডটা দেখতে পাচ্ছি। লোকটা বর্মী, কি চীনা, কি মুসলমান—কি কোন্ জাত বুঝতে পারলুম না। আমাদের তিনটি জিনিস নাড়াচাড়া ক'রে বললে, পাঁচ টাকা আর দশ টাকা!—এই ব'লে আমার কল্-বিগড়ানো ঘড়িটি ছুড়ে আমার হাতে ফিরিয়ে দিল। এটির দাম কিছু নেই।

মাত্র পনেরো টাকায় অত দামের দুটো জিনিস?—অসম্ভব! আমি ফিরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। রবি শুনেই একটা অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করলো বন্ধকী দোকানটার উদ্দেশে। বরং না খেয়ে রোগে ভুগে মরবো,—কিন্তু সাড়ে তিন শো টাকার মাল পনেরো টাকায় বাঁধা রাখবো না। আমরা চ'লে গেলুম একদিকের পথ ধ'রে। আমরা চীন জাপানের পথে বেরিয়েছি দুঃসাহসিক অভিযানে, আমরা ধরাকে সরা জ্ঞান ক'রে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছি—তাই সেদিন পথের মাঝখানে অতি কষ্টে কান্না চেপে রইলুম। ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছলুম জলাশয়ের ধারে এক বাগানে। একখানা বেঞ্চে বসে আমি হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে রইলুম। মাথার যন্ত্রণায় ও প্রবল জ্বরে আর একটুও হাঁটতে পারছিনে। রবি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বা'র ক'রে সিগারেট ধরাতে গেল, কিন্তু বুড়ো আঙুলে দিয়ে তলার দিকে টিপে মোড়কটি তুলে সে পরীক্ষা ক'রে দেখলো, আর একটি সিগারেটও নেই। আমাকে গোপন ক'রে সে আস্তে প্যাকেটটা ওদিকে ছুড়ে ফেলে দিল। কী বিরক্তি, কী হতাশা তার মুখে!

দূরে কোথায় ঘণ্টা ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং ক'রে ন'টা বাজলো।

আস্তে আস্তে রবি পকেট থেকে বা'র করলো দু'টাকা আর তিন পয়সা। আমি তখন জ্বরে ধুকছি, বেঞ্চে শুয়ে পড়ার চেষ্টায় আছি। রবি আমার দিকে একবার তাকিয়ে বললে, এই নে তুই ডাক্তার দেখা, ওষুধ খা—যেমন ক'রে পারিস ভালো হয়ে ওঠ—এই আমাদের শেষ সম্বল! তা হোক—তুই সেরে ওঠ—

বললুম তারপর?

তারপর—ফটিকবাবু!

দু'টাকা তিন পয়সা তা'র পকেটে জোর ক'রে রেখে দিয়ে বললুম, চল্, এগুলো নিয়ে ফটিকবাবুর কাছে, কিম্বা আর্য সঙ্গীতালয়ে রেখে কিছু টাকার চেষ্টা করি। আমরা চোরও নই, এগুলোর দামও কম নয়!

রবি অত্যন্ত পরিশ্রান্তভাবে উঠে দাঁড়ালো। বললে, এবার তুই আমাকে চালা, আমি আর তোকে চালাবো না। —দাঁড়া, রিক্‌স ডাকি। —এই এই রিক্‌স ......না, তোকে আর কিছুতেই হাঁটাবোনা—

রিক্‌স ডেকে রবি আমাকে হাত ধ'রে তুলে বসালো, নিজে উঠে বসলো পাশে।

রিক্‌স চলছে ঠুং ঠুং ক'রে। আমি চোখ বুজে কাৎ হয়ে পড়েছি। অনেকদূর পথ। রবি পাথর হয়ে গেছে আমার অবস্থা লক্ষ্য ক'রে। তা'র আত্মাভিমান মিলিয়ে গেছে! তার ঘন ঘন ইংরেজি বুলি, তা'র লাখোলাখো টাকার গল্প, আমার প্রতি তা'র শাসন, তা'র 'উচ্ছে ভেজে পটল' ব'লে চালানো, তা'র কাল্‌চার আর 'আফ্‌টার-অল্'—কোথায় তলিয়ে গেছে। তা'র মুখ শুকনো, সে গম্ভীর, তা'র চেহারাটা ভেতো বাঙালী!

কিন্তু বড়রাস্তায় প'ড়ে স্ফটিকবাবুর মেসের কাছাকাছি এসেই রবি আবার বেঁকে বসলো। বললে, না, এখানকার বাঙালী ভদ্রলোকদের কাছে আমি কিছুতেই আর মাথা হেঁট করতে পারবো না, তোকেও করতে দেবো না। এদের খুব চিনেছি।—এই রিক্‌স......

রিক্‌স থমকে দাঁড়ালো। আমার আর বাক্‌বিতণ্ডার সাধ্য নেই। বললুম, তাহলে কি করা যায়?

চল্ ফিরে 'পন্-শপে'—পনেরো টাকাই সই। তোর জাহাজ ভাড়াটা হ'লেই চলবে। —এই রিক্‌স উধার চালাও......

রিক্‌স আবার মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চললো। আমি স্তম্ভিত, হতবাক্!—কিয়ৎক্ষণ পরে এখানে রবির একা দিন যাপনের কথাটা মনে ক'রে বললুম, তোর চলবে কি ক'রে?

সে আমি চালিয়ে নেব। তোর ভাববার দরকার নেই।

বললুম, এই রিক্সর ভাড়াই বা দিবি কোত্থেকে?

রিক্সর ভাড়া রবির মনে ছিল না, চুপ করে রইল। কিন্তু গাড়ি চলতে লাগল সেই পন-শপের দিকে। রবি কিয়ৎক্ষণ কি যেন ভেবে বললে, এতদিন তোর সামনে না হয় কুলিগিরি করতে পারিনি......আড়ালেও কি পারব না?

বললুম, কিন্তু তোর যে অত কষ্ট সহ্য করা অভ্যাস নেই রে।

রবি আমার দিকে পলকের জন্য তাকাল, আমার কাছে মিষ্টকথা শোনারও অভ্যাস নেই তার। সম্ভবত তার নাকের কোঁড়াটা জ্বালা করে চোখ দুটো একটু ঝাপসা হয়ে এল। তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে ভাঙ্গা আওয়াজে বললে, সোয়াইন, সেণ্টি-মেণ্টাল ফুল। —এই বলে হঠাৎ সে হেসে উঠল। ভাব গোপন করল।

'পন-শপে' এসে পৌঁছলুম প্রায় বেলা দশটা। লোকের ভিড় তখন কিছু কম। আমার কল-বিগড়ানো হাত-ঘড়িটা এবারেও ফেরৎ দিয়ে বললে, ও-দুটো পনেরো টাকা।

রবি এবার তার আভিজাত্যের খোলস খুলে আমাকে সরিয়ে ফোঁকরের মধ্যে মরিয়ার মতো মুখ দিয়ে বললে, বাবুজি, আপনার মেহেরবাণী, দয়া করে আর কুছ টাকা আমাদের দিজিয়ে। বহুৎ—বহুৎ দরকার—

লোকটা কিছুতেই দিতে চায় না। অবশেষে রবির পীড়াপীড়ি আর একান্ত কাকুতি-মিনতির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আর একটি টাকা মাত্র বেশী দিল। সাড়ে তিনশো টাকার জিনিস বাঁধা রেখে মাত্র ষোলটি টাকা। তখনও ছোট ছোট এক টাকার নোট চলতি রয়েছে, সেই ষোলখানা ময়লা ঘৃণ্য অপমানজনক নোট হাতে নিয়ে রবি প্রথমে বললে, কিসের লজ্জা, চুরি ত' করিনি! Rather, আমাদের ঠকিয়ে কম টাকা দিল! তা দিক্, after all, লোকটা বাঁচালো! —নে—

এই বলে রবি আমার জিন্সের কোটের ভেতর পকেটে ষোলখানা নোটই সযত্নে রেখে দিল। বললুম, আমার ভাড়া লাগবে পনেরো টাকা—একটা টাকা তুই অন্তত রেখে দে—

চুপ,—রবি এবার যেন উৎসাহিতভাবে আমাকে ধমক দিল। বললে, আমার ব্যবস্থা মাথা হেঁট করে শুনবে, প্রতিবাদ করবে না। আটশো-নশো মাইল সমুদ্রে যাবি—চারদিন জাহাজে—একটা টাকা হাতে না থাকলে তোর চলবে কেমন করে? সোয়াইন্—

একটু থেকে পুনরায় বললে, দয়া করে এইটি দেখো যে জাহাজে মরে থেকো না... যে অসুখ তোমার! কলকাতায় নেমেই চিঠিখানা বাবাকে দিবি—

রিক্স আমাদের নিয়ে জাহাজঘাটার দিকে ছুটতে লাগল। এখান থেকে প্রায় দু' মাইল পথ, কাপড়ের পুঁটলি সঙ্গেই আছে, দুর্গাবাড়িতে আর প্রয়োজন নেই—রবি ছুটিয়ে দিল রিক্সকে বকশিস্ কবুল করে। ছুট—ছুট—ছুট......

জাহাজঘাটায় যখন এসে পৌঁছলাম, দেখি জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে। এখন দশটা পঁয়ত্রিশ। জাহাজ জেঠি ছেড়ে ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে নদীর মাঝখানে যাচ্ছে। কিন্তু টিকিট? টিকিট যে করা হয়নি! কোথায় টিকিট পাওয়া যায়? ওদিকে জাহাজ যাচ্ছে নাগালের বাইরে! ছুটোছুটি করতে

লাগলুম—টিকিট-ঘর পাচ্ছিনে খুঁজে। আর সময় নেই, ছুটছে রবি, ছুটছি আমি—আর টিকিট করা সম্ভব নয়, জাহাজ চলেছে...... কেমন করে ধরি......তবে কি যাওয়া হবে না? আবার চারদিন অপেক্ষা করব?

ছুটতে ছুটতে নেমে এলাম। সামনের ঘাটে একখানা শাম্পান্—চাঁদের মতো নৌকা। কত নিবি শাম্পান্? জাহাজ ধরিয়ে দিতে হবে কিন্তু......

শাম্পানের মাঝি বললে, না পারব না জাহাজ ধরাতে—

চীৎকার করলুম, রবি......এই রবি—ওখানে কী কচ্ছিস? শীগগির আয়—

রবি ছুটতে ছুটতে এল। বললে, এই নে—পাউরুটিখানা পকেটে রাখ্—তোকে আর কিছু খাওয়াতে পারলুম না।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালুম পলকের জন্য! হৃদয় আর মানবতার একি খেলা নদীর কূলে! এ-বন্ধুর ঋণ শুধবো কেমন করে? এ সব দিল, নিল না কিছু—এর ভার কেমন করে বইবো? কিন্তু আর সময় নেই, পাউরুটিখানা পকেটে পুরে সেই অনিচ্ছুক শাম্পানেই উঠে বললুম, চেষ্টা কর, যদি ধরাতে পারিস, বকশিস্ দেব!

রিক্স ভাড়া গেছে বার আনা, পাউরুটি এক আনা, এক আনা সিগারেট, তার ওপর শাম্পানের ভাড়া আর বকশিস্। আমি জানি রবি আজ নিঃস্ব হল!

শাম্পান্ ছোটে নেচে নেচে, ভয়ে ত্রস্ত। আগে শাম্পান্ চড়িনি; এখন দেখছি, এর মধ্যে বসে ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন। কেবলই টলে পড়ছি, কেবলই কাৎ হয়ে যাচ্ছি! শাম্পান্ তার ল্যাজ তুলে একবার দাঁড়িয়ে ওঠে, আবার ডুবে যায়। কিন্তু জাহাজ ভেসে যায়, শাম্পান্ ছোটে তার পিছু পিছু। নদীতে ঢেউ আছে, তবে জাহাজের গতিবেগ কম। শাম্পান্ এল প্রাণপণ চেষ্টায় জাহাজের কাছাকাছি। অনেক উঁচু থেকে জাহাজের গা বেয়ে দড়ি-বাঁধা কাঠের সিঁড়ি নেমে এসেছে জলের কাছাকাছি। ছোট্ রে শাম্পান্—ছুঁতে হবে ওই দড়িটাকে। আর একটু......আর একটু...... আর একটু ছোট্......আর একটু নাগালের মধ্যে আয়—ছোট্ রে শাম্পান্—,

আমরা চীৎকার করছি। ঘোড়দৌড়ের মাঠে ছুটন্ত ঘোড়াকে উৎসাহিত করার জন্য যেমন উন্মাদের মতো অশ্বভক্তরা চেঁচায়—তেমনি আমরা। এমন সময় দেখি, সেই উপর থেকে খালাসীরা দড়িতে টান দিয়ে সিঁড়িটা তুলে নিচ্ছে।

রবি আমার নাম ধরে চীৎকার করে বললে, পারবিনে?

ভুলে গেলুম আমার জ্বর, আমার দুর্বলতা আর অক্ষমতা, ভুলে গেলুম পুটলি আর পাউরুটি—পলকের মধ্যে শাম্পানের ওপর টলতে টলতে দাঁড়িয়ে চলন্ত জাহাজের গায়ে-লাগানো দড়ির সিঁড়িটার ওপর লাফিয়ে, ঝাঁপিয়ে ধরে ফেললুম। ভারসাম্য আর দূরত্বের মাত্রা বোধ একচুল এদিক-ওদিক হলে সেদিন আমার নিশ্চিত সলিল সমাধি!

দড়ির সিঁড়ির সঙ্গে জড়িয়ে কপিকলের সাহায্যে—যেমন কুয়োর ভিতর থেকে বালতি ওঠে—তেমনিভাবে ঘর্ঘর শব্দে ভিতর দিয়ে উঠে গেলুম জাহাজের আপার ডেক-এ। জাহাজ তখন চলছে, খালাসীরা আমাকে দেখে হতবাক। ছিপ তুলতে গিয়ে যেন কৈ-মাছ কাণকোয় বেধে উঠে এসেছে। তারা আমাকে এসে ঘিরল।

তা ঘিরুক, ততক্ষণ অনেক ওপর থেকে নীচের নদীতে চেয়ে দেখছি, দূরে রবির ছোট শাম্পানটি ধীরে ধীরে ফিরে চলেছে রেঙ্গুনের ঘাটের দিকে। আমি ভাবাবেগ সামলাতে না পেরে একটু যেন উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিলুম। কিন্তু তারপর সেদিন যে-আমার সবচেয়ে প্রিয় আর সর্বাপেক্ষা আপন—তার সেই ছোট শাম্পানটির দিকে তাকিয়ে মনে মনে জড়িত-কম্পিত স্বরে বললুম, কলুটোলার সরকার, এ-জীবনের প্রথম নমস্কার তোমাকেই জানালুম।

* * * * *

ওইটুকু পরিশ্রমেই হাঁপাচ্ছিলুম, দাঁড়াবার শক্তি ছিল না। খালাসীরা আমাকে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে গেল এক সাহেবের কাছে, তিনি ক্যাপ্টেন। আমার অসুখ, টিকিট করার সময় পাইনি, জাহাজ ভাড়া আমার সঙ্গেই আছে, এসেছিলুম চাকরি খুঁজতে, আমি বাঙালী, বাড়ি আমার কলকাতায়—বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নের জবাব দিয়ে নিষ্কৃতি পেলুম। কথা রইল, জাহাজ ভাড়া চাইলেই আমি দিয়ে দেব।

ইরাবতী নদীর মোহনার দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি। জাহাজ চলেছে শান্ত, অথচ আগেকার অপেক্ষা দ্রুতগতিতে। আবার অনেকদিন পরে নদীর খোলা বাতাস গায়ে লাগল। এ জাহাজখানা আগেকার চেয়ে বোধ হয় একটু বড়ই হবে। নাম—'এস এস এডাভানা'। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলুম, ডেক-এর ওপর বাঙালী যাত্রী চোখে পড়ল না, যাত্রীর সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত কম। এখন বর্ষাকাল।

আমার রাঙা চোখ বুজে আসছে মাথার যন্ত্রণায়, পা দুখানার ওপর শরীরের ভার আর সইছে না। একবার অতিকষ্টে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে একটি বেশ নির্জন জায়গা দখল করে বসে পড়লাম। এ-জায়গাটা চিমনীর ঠিক নীচে এবং নিয়মিত বাষ্প ওঠে বলে কাঠের মেঝেটা একটু গরম। বাতাসের প্রবলতায় ইতিমধ্যেই আমার শীত ধরেছিল, এবার একটু গরম পেয়ে অনেকটা যেন আরাম পেলুম।

চোখ চেয়ে থাকার সাধ্য আর আমার ছিল না, বসে থাকার শক্তি তার চেয়েও কম। সুতরাং নদীর দুই পারে প্রাকৃতিক শোভা-দর্শন আপাতত স্থগিত রেখে পুটলি আর পাউরুটিখানা সামলে আমি শুয়ে পড়লুম—ধুলো, বালি, অপরিচ্ছন্নতা, অভব্যতা, কৌলিন্য আর ব্রাহ্মণত্ব—এগুলোর কথাও পরে ভাবা যাবে। বর্ষাকাল হলেও আজ আকাশ পরিচ্ছন্ন, বাইরে বেশ রোদ রয়েছে। বাতাস বড় মধুর, শরীরের সমস্ত গ্লানি যেন মুছে নেয়। চোখ বন্ধ করে আমি পড়ে রইলুম। জাহাজ চলল হু হু করে।

রেঙ্গুনের ঘাটে রবি নামল এতক্ষণে। সে টের পায়নি, চলেছে উদাসীন হয়ে—আমি চলছি তার পিছু পিছু। শাম্পান্ আর রিক্স-র ভাড়া চুকিয়ে দেবার পর তার আর কোন সংস্থান নেই, এবার- তার উপবাস। দুর্গাবাড়ি থেকে সে বেরিয়ে চলল, আমি চললুম তার পিছু পিছু। 'বড়ফয়া'তে সে গেল, যদি সেই ফুল-ওয়ালী তরুণীটিকে একবার দেখতে পায়—কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। রবি সেই জলাশয়-ঘেরা বাগানে এসে বসল। তার কোন কাজ নেই, তার দিন কাটছে না। সে সর্বস্বান্ত। সে উদ্ভ্রান্তভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে থাকে ধূলি-ধূসর পথে-পথে।

এর পর আর কোন ছবি আমি আঁকতে পারলুম না আমার ক্লান্ত কল্পনায়, তাই তাকে মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে আমি যেন একটা ছায়াচ্ছন্ন বিষণ্ণ নিদ্রার আবিলতার অতলতলে তলিয়ে গেলুম। হয়ত এই সময়টায় আমাকে ডাক্তার দেখাবার দরকার ছিল। যাই হোক, আর কোনদিন আমি উঠে দাঁড়াতে পারব, একথা ভেবে আমি শুইনি।

দিন দুই পেটে বিশেষ কিছু পড়েনি, সুতরাং পাউরুটিখানা এই জাহাজপথে আমার সর্বপ্রধান সম্বল। একটি টাকা আমার কাছে বেশী আছে বটে, কিন্তু এই চারদিনের কোন সময়ে সেটি উঠে গিয়ে ভাঙাতে হবে, কিংবা কিছু কিনতে হবে—এ পরিশ্রম আমার সইবে না। আমি অনড় হয়ে পড়ে রইলুম। একথা ভেবে নিলুম, চার পয়সার পাউরুটির এক-চতুর্থাংশ এক-এক দিনে খাব—এতটুকু কমবেশী যেন না হয়। নিজেকে আমি সতর্ক করে রাখলুম—খবরদার, লোভীর মতন যেন বেশী কামড় দিও না! অতএব ঘুমোবার আগে আমি পাউরুটির একাংশ শুকনো মুখে চিবিয়ে ছিলুম। গিলতে গিয়ে গলায় সে-রুটি বেধে গিয়েছিল।

ঘোলাটে ঘুমের ঘন আবিলতায় যেন ডুব দিয়েছি। কী দেখছি তার মধ্যে? বোবা, নীরন্ধ্র, নিবিড় তমিস্রালোক। তার সেই অনড়, অকম্প আবিলতা—যেন পাষাণ ভার চাপিয়েছে আমার বুকের উপর। তলিয়ে যাচ্ছি আরও নীচে—অচেতন অসূর্যম্পশ্য-লোকে। সেখানে আশা নেই, আলো নেই,

চৈতন্য নেই—শুধু সর্বগ্রাসী আঁধার। ক্ষীণ নিবিড় অস্পষ্ট কল্লোলের মধ্যে শুনছি চাপা চাপা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না—, অভিমানী আশাহতরা যেমন সর্বহারা হয়ে আড়ালে গিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে; যেন কার মনোবিকারের অসংলগ্ন প্রলাপ বিজ বিজ করছে সেই তলাকার ঘন কল্লোলে! কে যেন কার টুঁটি টিপে জলে ডুবিয়ে মেরেছে, তার শেষ আর্তস্বর এখনও বুগ বুগ করছে জলের তলায়। সে মরে গেল রুদ্ধশ্বাসে, রুদ্ধকণ্ঠে......চোখ দিয়ে তার রক্ত গড়ালো,—

ঘুম ভেঙ্গে গেল।

চোখ কাঁপছে—নিমীলিত রাঙাজবা! প্রলয়কালের আসন্ন রূপ দেখে দেবাদিদেব কেমন করে তাকিয়েছিলেন? সে-চক্ষু কি ছিল জ্বরে জরোজরো, জরাময়? আমি কোথায়? কী দেখছি? কে আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে? নিয়তি? মৃত্যুর ভেলায়?

নিজেকে কোথা থেকে যেন প্রবল টানে ছিঁড়ে নিয়ে ধীরে ধীরে সজাগ হয়ে তাকালুম। অপরাহ্ন ছায়ামলিন হয়ে এসেছে। নদীর মোহনায় এসে পড়েছি, তরঙ্গের দোলা লাগছে জাহাজে। পিছনের নদী অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমরা এখন সমুদ্রে। খালাসীরা তৎপর হয়ে রয়েছে। এখন বর্ষাকাল। সবাই সতর্ক।

ভয়ানক উত্তাপ পিঠের তলায়, বয়লারের তাপ লাগছে। এত তাপ যে, সইতে পারা যায় না। আমি উঠে কয়েক হাত হামাগুড়ি দিয়ে স'রে যাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু একি, আমার সর্বাঙ্গ কালো, ঘন মোলায়েম কালোয় আমি যে ঢাকা! কয়েক ঘণ্টা ধ'রে আমার সর্বাঙ্গে চিমনির ভুসো অবিশ্রান্ত ঝরে পড়ছে। আমার মাথা মুখ জামা কাপড় হাত পা—কয়লা-খনির মজুরের চেয়েও কালো! নিজের কিম্ভূতকিমাকার চেহারা দেখে আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারলুম না—কেবল দূরে স'রে গিয়ে কোঁচার পাট খুলে আমার পরম প্রিয় পাউরুটির গা থেকে ভুসোকালি মুছে দিতে লাগলুম। তারপর এক সময় সেই পাউরুটিখানিতে একবার একটুখানি কামড় দিয়ে সেটি কোলের মধ্যে নিয়ে আবার মুখ থুবড়ে শুয়ে পড়লুম। জ্বর বেড়েই চলেছে। এদিকে জাহাজটি দুলছে, যতদূর সম্ভব মাটি আঁচড়ে পড়ে রইলুম চোখ বুজে।

সহসা নিজের কানে কানে বললুম, কেন কেন তোর বাঁচার এই প্রাণান্তকর চেষ্টা? এ ভীরুতা, এ রুগ্নের দুর্বলতা—এর নাম মরণোন্মুখতা—এর মোহজাল কাটিয়ে উঠে দাঁড়া। বেঁচে থেকে বার বার মৃত্যু ভালো নয়, একবার মৃত্যু হোক তোর সাগর-তরঙ্গচূড়ার আঘাতে। নে, উঠে দাঁড়া, পতাকা তুলে ধর। জলের নিগূঢ় কল্লোল কান পেতে শোন, ওর থেকে জীবনের দীক্ষামন্ত্র তুলে নে। 'যারা মৃত্যুভয়ভীরু, ভাগ্যের দ্বারে লাঞ্ছিত, অপমানে নতশির, মনুষ্যত্বে খর্ব—তাদের ধ্বজা বয়ে চল্। তাদের আহ্বান করে বল, মাভৈঃ। তুই না বাল্যকালে দুঃসাহসের ধ্যান করেছিলি, দুর্গমের স্বপ্ন দেখেছিলি? তুই না ভেবেছিলি দেশ থেকে তাড়াবি ভীরুতার অপবাদ, কাপুরুষতার অপযশ? তুই না সেই?

দোলা দিল সাগরে, সেই দোলায় বৃহৎ জাহাজ চঞ্চল হয়ে উঠল। আমি থরথর করে কাঁপছিলুম। সমুদ্রের ঢেউ লেহন করে নিয়েছে আকাশের সবটুকু আলো,—এমনকি, বিবর্ণ বিমর্ষ আভাটুকুও আর কোথাও নেই। কেন কাঁপন লাগে আমার প্রাণে? কেন ওই মথিত বিক্ষুব্ধ জলোচ্ছ্বাস বারংবার আমার তটে ভাঙন ধরায়? তবে কি বহুসংখ্যক জীবনের অশ্রান্ত স্পন্দন আমার সত্তার মধ্যে ধ্বনিত হয়? তবে কি আমার মধ্যে অগণ্য প্রাণ স্ফুরিত হয় অজস্র ধারায়, আর আমি কেবল কি সেই সংহত সম্মিলিত শক্তির আধারযন্ত্র? বহুকে কেন এমন উপলব্ধি করি সকল দেহে মনে, বহু জীবনের কাহিনী কেন জলবিম্বের মতো ফুটে ওঠে আমার প্রাণ-প্রবাহের ভিতর থেকে? কেন বুকের মধ্যে বার বার কোটি কোটি নক্ষত্রদল ফুটে ওঠে?

থাক্ দার্শনিকতা। এবার বল ত, এ-যাত্রায় কী দেখে এলে? মানুষকে কি কোথাও দেখলে বড়? কিম্বা তারা কোথাও বড় হ'য়ে উঠতে চাইছে,—তোমার মনের মতন? উত্তর দিলুম, বড় কাকে বলে? কে তোমার বিরাট চরিত্র? কেমন মানুষ দেখলে তুমি খুশি হ'তে?

—

দেখে এলুম ক্ষুধার অন্ন খুঁটে খাবার জন্য সেই জীবন-মরণ সংগ্রাম! সেই পদদলিত মনুষ্যত্বের কান্না, সেই বলবান আর অক্ষমের দলাদলি, সেই দেবতা ও অসুর। ভূগোলে পড়েছি, সমুদ্রের ভিতর থেকে মাথা তুলে উঠে দাঁড়ায় বিশাল জলস্তম্ভ, সে ছুটে যায় বায়ুবেগে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে—ধ্বংস করে সামনে যা কিছু পায়; তারপর এক সময়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে তার মৃত্যু ঘটে। জলস্তম্ভের বদলে ওই অন্ধকার সমুদ্রের পাঁজরের ভিতর থেকে এক মহাপুরুষ উঠে দাঁড়ায় না কেন—যার মতো বিশাল চেহারা পৃথিবীতে নেই? বিরাট পুরুষ তুমি,—বিরাট চরিত্র তুমি, তোমার হাতে আর একবার সৃষ্টি হোক্ এই বিশ্ব-পৃথিবী, মানুষের এই দুঃসহ দ্বন্দ্বের তুমি প্রতিকার করো, তুমি নূতন হাতে ধারণ করো এই বিশ্বজীবনের কল্যাণ-দায়িত্ব!

ছোটবেলা আমাদের বাড়িতে একখানা পুরনো উইধরা বই প্রায়ই চোখে পড়তো। সেখানা থাকতো মাঝের ঘরের পূর্বদিককার কুলুঙ্গিতে। বইখানার নাম—"The Nihilist." বাইরের ইংরেজি বই পড়তেও তখন যেমন শিখিনি, Nihilist শব্দটার মানেও তেমনি জানতুম না। অনেক কাল পরে অভিধান খুঁজে ওই শব্দটার অর্থ বার করলুম। আমাকে পেয়ে বসেছিল নিহিলিজম্। ওই শব্দটা কেমন যেন মাধুর্য ছড়িয়ে দিত আমার মনেপ্রাণে। কোথাও মানুষের অপমান, কোথাও পদদলন, কোথাও অনাচার, কোথাও শৃংখলা আর ব্যবস্থার অজুহাতে অক্ষমের উপরে জুলুম, কোথাও সমাজনীতির নামে কন্যাদায়গ্রস্তকে উৎপীড়ন, কোথাও স্ত্রীলোকের কপালে কলংক এঁকে দিয়ে তার প্রতি অমানুষিকতা,—অমনি আমার মনে প'ড়ে যেতো ওই নিহিলিজম্ শব্দটা। ওটাকে আমি লালন করতুম মনে মনে। ওটাকে আমি হেদোর জলে ভাসিয়ে ওর খেলা দেখতুম, ওটাকে গঙ্গার মাঝখানে পালতোলা নৌকায় ছুঁড়িয়ে ছেড়ে দিতুম—ও যেখানে খুশি যাক। আমি নির্জনে বসে ভাবতুম, সকল প্রকার ব্যবস্থার মধ্যে বিশৃংখলা এনে দেবো, প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত আদর্শের বিরুদ্ধে দেশজোড়া সংশয় এনে দেবো, মানুষের প্রচলিত বিশ্বাস, ধর্ম আর অভ্যস্ত চিন্তাধারা নষ্ট ক'রে দেবো। আমি নিহিলিস্ট, আমার দ্বিতীয় কেউ নেই, আমার পথে কেউ চলে না, আমার মতন ক'রে কেউ ভাবে না, আমার আদর্শ কেউ স্পর্শ করে না, চিন্তার রাজ্যে আমার চেয়ে দুঃসাহসের পরিচয় কেউ দেয় না। আমি নীতি-দুর্নীতি মানিনে, অভ্যাস আর ঐতিহ্যকে স্বীকার করিনে, চরিত্রবত্তার চলিত আদর্শকে বিশ্বাস করিনে, সমাজ-ভব্যতাকে মেনে চলিনে,—আমি নিহিলিস্ট্। আমার দল নেই, দলাদলি নেই, অনুসৃতি নেই, আন্দোলন নেই,—আমি শুধু বিশ্বাস করিনে, স্বীকার করিনে। আমি নিহিলিস্ট্।

আমি গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করতে থাকতুম বহু শতাব্দীর অনাচার আমার মধ্যে পুঞ্জিত, যুগে যুগে ইতিহাস তার রক্তাক্ত পদচিহ্ন আমার ভিতরে চিহ্নিত ক'রে গেছে, দিল্লী-পাণিপথ-পলাশী আমার ভিতরে ব'সে আলো নিবিয়ে কাঁদে,—লক্ষ্মীবাঈয়ের এলোচুল জ্বালে-লাল হয়ে ওঠে। কত সভ্যতার অপমৃত্যু ঘটেছে আমার মধ্যে, কত জাতির কত কংকালকে আমি অনুভব করি আমার হৃদয়ের বিশাল রণক্ষেত্রে! কত যন্ত্রণায় কালো-হওয়া কত মুখ, ক্ষুধায় বিশীর্ণ প্রাণের কত দগ্ধীভূত মরণ, কত দলিত-মথিত জীবনের শেষ অবশেষ! কেন মনে হয় আমার প্রাণের ক্ষেত্রটাই কুরুক্ষেত্র,—সেখানে কত ভাবনা ও বাসনার 'পরস্পর-

বিরোধী দল, কত আদর্শ ও নীতির অক্লান্ত সংগ্রাম, কত বঞ্চিতের ক্ষুধিতের নিত্য বিক্ষোভ! শক্তি ও মুক্তির জন্য যুদ্ধ, বর্বর বিনাশের জন্য যুদ্ধ, দুষ্কৃতের অন্যায় ধ্বংস ক'রে কল্যাণবুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুদ্ধ! সেই সব ভগ্ন ব্যথাতুরের কঙ্কাল দাঁড়িয়ে ওঠে আমার মাটির নীচের থেকে,—তাদের অপ্রকাশিত বাণী অঙ্কুরিত স্ফুরিত হয়ে ওঠে,—তাদের জীবন-পরিকল্পনা আজ আশ্রয় চাইছে একজন নিহিলিস্টের মধ্যে! সেই নিহিলিস্ট উঠে আসুক ওই অন্ধকার তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সাগরের ভিতর থেকে জল-স্তম্ভের মতো, বর্বর বিরাট মহাপুরুষের মতো।

সেই রাত আমার কাটলো জ্বরের প্রলাপের ঘোরে।

আজ সকালটা থম্‌থমে। বাতাস কিছু ঠাণ্ডা, কিছু প্রবল। সামনে চেয়ে দেখছি আবার সেই অন্তহীন আশাহীন সমুদ্র। আমার অবসন্ন চোখে পাণ্ডুর দৃষ্টি। আকাশ মেঘমলিন। ডেকের উপরে লোকজন কম। খালাসীরা দিগন্তের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখে যাচ্ছে। জাহাজে শিগ্‌নাল দেওয়া আছে।

কখন বমি করেছি, কতবার বমি হয়েছে, মনে পড়ে না। আমি কেবল অকর্মণ্যভাবে সেদিকে একবার তাকালুম। জ্বর রয়েছে বেশ, তার চেয়ে বেশি অবসাদ আর ক্লান্তি! এখনও অনেক জল, এখনও অগাধ জল। দেশে ফিরে গিয়ে কেমন ক'রে দাঁড়াবো, কেমন ক'রে মুখ দেখাবো—সে-চিন্তা এখন মনে নেই। সমুদ্রের বর্ণ এখন ঘন নীল নয়, একপ্রকার মেটে সবুজ,—যেন ভ্রূকুটিকরাল। ওর তলার দিকটায় অস্বস্তি, কিম্বা ওপর দিকটায় অশান্তি, ঠিক বুঝা কঠিন। কিন্তু অবিরাম দুরন্তপনায় সমুদ্র থৈ-থৈ-কার। মেঘের সংকেত পেলে সমুদ্রের সর্বাঙ্গের চেহারা যায় বদলে—যেন দস্যুর সহযোগিতার সংবাদ এসে পৌঁছয় দানবের দরবারে,—তারপর দুই মিলিত শক্তির উচ্ছৃঙ্খল বর্বরতায় স্বর্গের দেবতারা অবধি করযোড়ে দণ্ডায়মান; সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যায়!

একজন খালাসী আমাকে জানিয়ে গেল, আমি যেন 'হোল্ডের' মধ্যে নেমে যাই। ডেক-এর উপরে কোনো যাত্রীর পক্ষে আর থাকা চলবে না। প্রশ্ন করবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু সে লোকটার দাঁড়াবার সময় নেই। আমার পক্ষে উঠে দাঁড়ানো তখন মস্ত পরিশ্রম, আর একজনের সাহায্য পেলে ভালো হতো। কিন্তু সাহায্য করবে কে? আজ রবি নেই, আমি একা।

কানাকানিতে জানতে পারলুম, আজ ভোর থেকে জাহাজের ডগায় ঘন ঘন বিপদসূচক সংকেত করা হচ্ছে। আভাস পাওয়া যাচ্ছে আতঙ্কের। কি হয় কি হয়!

বিজ্ঞানের কথা

পাখীর পরিযান

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র গোস্বামী, এম, এস-সি

কৌতূহলী বলেই মানুষ আজ এত উন্নত। প্রকৃতির রহস্য অবগত হবার জন্য মানুষ সর্বদাই চেষ্টা করে এসেছে। তার ফলেই আজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সৃষ্টি হয়েছে। প্রাণিবিদ্যার একটা প্রধান শাখা হ'ল Ornithology বা পক্ষিতত্ত্ব। মানুষের ধারণা-শক্তি যেদিন থেকেই উন্নত হয়েছে সেদিন সে পাখী সম্বন্ধে চিন্তা করে এসেছে। কোথা থেকে এরা আসে, কোথায় এরা যায়, আবার প্রতি বছর ঠিক সময়ে ফিরেই বা আসে কেন, সময়ের এত নির্ভুল বিচারই বা এরা কিভাবে করে, রাত্রে কুয়াশায় এবং পথহীন বিশাল সমুদ্রে এরা পথ খুঁজে নেয় কি করে, সঙ্গীহীন হয়েও প্রথম যাত্রাতেই পাখীর ছানারা কি করে নিজেদের প্রজাতির (species) শীতকালীন আবাসস্থলে উপস্থিত হয়—ইত্যাদি অনেক প্রশ্নই আমাদের মনে জাগে। অনুরূপ প্রতি প্রশ্নের জন্যই নানান মীমাংসার অবতারণা করা হয়। কিন্তু আমরা আজ পর্যন্ত এর নির্ভুল ও সম্পূর্ণ মীমাংসা করে উঠতে পারিনি। অবশ্য সুখের বিষয় এই যে সমস্যার সমাধান না করতে পারলেও, অন্ততঃ আমাদের ধারণা অসম্ভব বা অল্প-সম্ভব পথ থেকে সরিয়ে আনতে পেরেছি।

পাখীর পরিযান (Migration) সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে পাখী বিষয়ক দু একটি কথা বলা উচিত বলে মনে করি। "A bird is known by its feathers" এই ইংরেজি প্রবচনটি শুধু প্রবচন হিসাবে নয়, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও সত্য। পালকই পাখীর প্রধান লক্ষণ। আকাশে ওড়ার ক্ষমতা অবশ্য সব পাখীরই নেই। অপর পক্ষে উড়তে পারে, এরকম পাখী ছাড়াও অন্য জীব বর্তমান। বাদুড়, উড়ন্ত লেমুর, উড়ুক্কু গিরগিটি, এমন কি আকাশে ওড়া মাছের কথাও আমরা জানি। অবশ্য বাদুড় ছাড়া বাকী কারও পাখীর মত ওড়বার ক্ষমতা নেই। কিন্তু পালক আছে শুধু পাখীদেরই। ডিম পাড়া ও দু'পায়ে হাঁটা একমাত্র পাখীদেরই বৈশিষ্ট্য নয়, কেন না কোন কোন স্তন্যপায়ী জীবদের মধ্যেও এই লক্ষণগুলি প্রকটিত। জীব-জগতে স্তন্যপায়ীদের পূর্বেই পাখীর স্থান। কিন্তু সরীসৃপদের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য অধিকতর স্পষ্ট। বিবর্তনবাদের ছাত্রদের মতে প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপরাই পাখীর পূর্বপুরুষ। মতান্তরে এই সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে যে সরীসৃপ ও পাখী একই কুল হ'তে উদ্ভূত।(১) জার্মানীতে যে আদিম পাখীর ফসিল পাওয়া গেছে (Archaeopteryx lithographica), তাতে দাঁত, দীর্ঘ হাড়-বিশিষ্ট লেজ, প্রভৃতি সরীসৃপের বহু লক্ষণ বিদ্যমান। পাখীর বিষয়ে আর একটি কথা বলা দরকার,—এদের শরীরের উত্তাপ; ১১২° ফারেনহিট উত্তাপ আর কোনো জীবের নেই। অবশ্য পাখীর আভ্যন্তরীণ শারীর-সংস্থানেও যে অনেক খুঁটিনাটি বিশেষত্ব আছে, তা না বললেও চলে।

যদিও পাখীর পরিযান বা অভিপ্রয়াণের বৈজ্ঞানিক আলোচনা মাত্র গত পঞ্চাশ বছর থেকে সুরু হয়েছে, তবুও প্রাচীনদের যে এ বিষয়ে অল্প-বিস্তর জানা ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কয়েক বছর আগে ডাঃ সত্যচরণ লাহা রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় পাখীর অভিপ্রয়াণ ও কালিদাসের পাখী সম্বন্ধে দু'টি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।(২) তাতে তিনি স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন যে কালিদাস এ বিষয়ে অনেক তথ্যই জানতেন। রাজহাঁসেরা আকাশে নতুন মেঘ দেখলেই চঞ্চল হয়ে উঠে, এ কথা তাঁর কাব্যে বহু উল্লিখিত। পক্ষি-তত্ত্বের আধুনিক ছাত্ররাও একথা স্বীকার করেন যে পরিযানের কয়েক দিন পূর্বে পাখীরা অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠে।

কিন্তু প্রাচীনকালে অনেকেই 'পাখীর

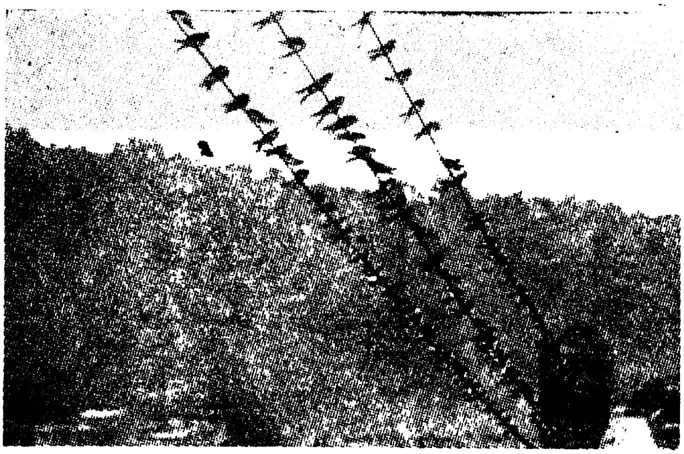


সুইফ্ট

(1) Gerhard Heilmann—Origin of Birds.
(2) Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal—XX 1924.

পরিযান বিষয়ে ভ্রান্ত এবং হাস্যোদ্দীপক ধারণা পোষণ করতেন। নতুন নতুন ঋতুতে আমরা নতুন নতুন পাখীর ঝাঁক দেখতে অভ্যস্ত। শরৎকালের মানস-সরোবরগামী মরাল বা বসন্তের কোকিল, এদের নামের সংগে অল্প-বিস্তর বা চাক্ষুষ পরিচয় আমাদের আছে। কিন্তু শরৎকালের হাঁস যে হঠাৎ বসন্তকালের কোকিলে পরিণত হয়—এ মুগ্ধবোধে বিশ্বাস আমাদের নেই। ঋতু পরিবর্তনের সংগে সংগে পাখীরাও রূপান্তরিত হয় এ ভ্রান্ত ধারণা কেবল প্রাচীনদেরই নয়, প্রাচীন ইউরোপীয় পণ্ডিতদেরও ছিল। এমন কি মহামতি য়্যারিস্টটলও বিশ্বাস করতেন যে, লাল-বুকে রবিন শীতসমাগমে রেডস্টার্ট-এ রূপান্তরিত হয়।

সরীসৃপেরা শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্য



এক ঝাঁক সোয়ালো পরিযানের পূর্বে টেলিগ্রাফের তারের উপর অপেক্ষা করছে।

গর্তের ভিতর অলসভাবে পড়ে থাকে—যাকে ইংরেজীতে Hibernation বা বাংলা পরিভাষায় শীতস্তম্ভ বলা হয়। প্রাচীন-কালে ইউরোপে অনেক লোকেই বিশ্বাস করতেন যে পাখীরাও শীতকালটা এইভাবে কাটায়। অনেক পাখীকেই মাঝে মাঝে জলাভূমি বা কাদায় অর্ধমৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই হল উপরোক্ত বিশ্বাসের মূল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। অভিপ্রয়াণের পথে ঝড়বৃষ্টিতে পরিশ্রান্ত হয়ে যে ঐ পাখীরা ওখানে পড়তে পারে—এ কথা তাঁরা চিন্তা করতেন না। এই বিশ্বাস ইউরোপে একশ' বছরেরও ওপর প্রচলিত ছিল। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ইলিয়ট কু (Elliot Coues) কেবল সোয়ালো পাখীর শীতস্তম্ভ সম্বন্ধে লেখা একশ' প'চাত্তরখানিরও বেশি বই আবিষ্কার করেছেন।

১৭০৩ খৃষ্টাব্দে কোন ইউরোপীয় লিখেছিলেন যে পরিযায়ী পাখীরা শীত-কালে চন্দ্রলোকে চলে যায়। তিনি হিসাব করে বলেছিলেন যে পাখীদের চাঁদে পৌছতে পুরো ষাটদিন লাগে। পরিযানের প্রারম্ভেই পাখীরা চাঁদের দিকে তাকিয়ে দিক স্থির করে নেয় এবং সোজা উড়ে গিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে পৌছয়। তিনি আরো লিখেছেন, যে উড়ন্ত পাখীরা যখন খুসী ইচ্ছামত উড়ন্ত অবস্থাতেই ঘুমোতে সক্ষম। পাখী সম্বন্ধে আমাদের দেশেও অতিকথা প্রচলিত, যেমন রকা পাখীর আজগুবী ডিম পাড়া।

পরিযান বা অভিপ্রয়াণ শুধু পাখীদেরই একান্ত করে নিজস্ব নয়। অন্য জীবের মধ্যেও সুনিয়মিত পরিযান লক্ষিত হয়। উত্তর-পশ্চিম ভারতে পঙ্গপাল বাহিনী প্রতি দশ বা বার বছর অন্তর শস্যের ভীষণ ক্ষতি করে। তা' ছাড়া, পঙ্গপাল প্রতি বছর বর্ষাকালে পাঞ্জাব এবং রাজ-পুতানায় আসে এবং শীতে আবার বেলুচিস্থান, দক্ষিণ পারস্য এবং সম্ভবত আরব দেশেও ফিরে যায়।

অনেক মাছও নিয়মিতভাবে তাদের বাসস্থান বদলায়। আমাদের দেশের ইলিশ মাছ বঙ্গোপসাগরের বাসিন্দা; কিন্তু বছর বছর প্রজননের জন্য তারা ব্রহ্মপুত্র আর গঙ্গাতে চলে আসে। ঈল মাছের পরিযান কিন্তু ঠিক বিপরীতভাবে হয়। তারা সাধারণত নদীতে থাকে, কিন্তু প্রজননের জন্য সমুদ্রে অভিপ্রয়াণ করে।

সাধারণ গমনাগমন বা আসা যাওয়া মাত্রই কিন্তু পরিযান নয়। বাসা বাঁধবার উপযুক্ত স্থান না পেয়ে কোন পাখী যখন কয়েক মাইল দূরে অন্য জায়গায় চলে যায়, তাকে পরিযান বলা চলে না। কোন পাখী বিশেষ কারণ-বশত বহু দূরে স্থায়িভাবে চলে যেতে পারে। একেও পরিযান আখ্যা দেওয়া হয় না। প্রকৃত অভিপ্রয়াণ বা পরিযান ঋতু পরি-বর্তনের সংগে নিয়মিতভাবে সম্পর্কিত এবং এই উদ্দেশ্যে প্রজাতির সব পাখীই যোগ দেয়।

পাখীর পরিযান নানা প্রকৃতির হতে পারে। **(ক) ঊর্ধ্বাধ পরিযান (Vertical migration)**—হিমালয় ও আমেরিকার রকি ও এন্ডিজ পাহাড়ে সচরাচর এই জাতীয় পরিযান দেখা যায়। রেডস্টার্ট পাখী হিমা-লয়ের নদী বা ঝর্নার ধারে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে আট হাজার থেকে চৌদ্দ হাজার ফিট উঁচুতে এদের ছানা হয়; আর শীতকালে আট হাজার থেকে দু' হাজার ফিট নীচুতে নেমে আসে। রকি পাহাড়ের লম্বা লেজওয়ালা চিকাডি পাখীরা মাত্র আট হাজার ফিটের ভেতরই পরিযান করে। এর চেয়ে নিকট-বর্তী পরিযানে কোন পাখী অভ্যস্ত কিনা আমাদের জানা নেই।

(খ) **নিকটবর্তী অনুভূমিক পরিযান** (Near-by horizontal migration)—এক্ষেত্রে পাখীরা সমান্তরালভাবেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়া আসা করে। কিন্তু শীতাবাস ও প্রজননভূমি দুটিই কাছাকাছি হয়ে থাকে। কিস্তফেরারী পাখী ইউরোপের উত্তরাংশে ডিম পাড়ে ও শাবক পালন করে। শীতকালে এরা ইউরোপের দক্ষিণাংশে অথবা আফ্রিকার উত্তরতম প্রদেশে চলে যায়।

(গ) **দূরবর্তী অনুভূমিক পরিযান** (Distal horizontal migration)—শীতাবাস ও প্রজনন ভূমি পরস্পরের বহু দূরে হ'লে পরিযানকে দূরবর্তী অনুভূমিক আখ্যা দেওয়া হয়। এই জাতীয় পরিযানে আমরা অনেক আশ্চর্যজনক কথা জানতে পারি। উদাহরণস্বরূপ ছোট চটপটে ও চঞ্চল খঞ্জনের কথা বলা যেতে পারে। এরা সাইবেরিয়ার পূর্ব অংশে ডিম পাড়ে, কিন্তু শীতকালে এদের হিমালয়ের পাদদেশে আসাম থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। বাদামী রঙের শ্রাইক পাখীদেরও প্রজনন ভূমি হল পূর্ব সাইবেরিয়ায়। কিন্তু শীতকালে ভারত ও সিংহলের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় এরা চলে আসে—দু হাজার থেকে তিন হাজার মাইল দূরে।

(ঘ) **নিরক্ষীয়-লঙ্ঘী পরিযান** (Trans-equatorial migration)—এ পর্যন্ত আমরা শুধু বিষুব রেখার একার্ধে আবদ্ধ পরিযানের কথা আলোচনা করেছি। কিন্তু অনেক পাখীই তাদের পরিযানে নিরক্ষ রেখার এক দিকের দেশ থেকে অন্য দিকের দেশে চলে যায়। সোয়ালো পাখী ইউরোপ এবং হিমালয়ে ডিম পাড়ে। শীতকালে ইউরোপের পাখীরা দক্ষিণ আফ্রিকায় আসে। সেখানে তারা শীতের বদলে নিদাঘ উপভোগ করে। হিমালয়ের সোয়ালোর শীতাবাস ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ।

(ঙ) **গ্রীষ্মমণ্ডলবর্তী পরিযান** (Migration within the tropics)—কতকগুলি পাখী গ্রীষ্মমণ্ডলের ভিতরেই পরিযান কার্য সম্পন্ন করে। এই প্রকার পরিযানের সঙ্গে শীত বা গ্রীষ্মের কোন যোগ নেই। আবহাওয়ার আর্দ্রতাই হ'ল মুখ্য কথা। চওড়া ঠোঁটওয়ালা রোলার পাখী মাদাগাস্কার দ্বীপে ডিসেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত ডিম পাড়ে। আবার জুন থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ওদের কঙ্গো উপত্যকায় দেখতে পাওয়া যায়।

(চ) **সমুদ্র-লঙ্ঘী পরিযান** (Trans-oceanic migration)—পাখীরা যে পরিযান পথে শুধু মহাদেশই অতিক্রম করে তা নয়; মহাসমুদ্রকেও কোন কোন পাখী বিঘ্নের মধ্যে গণ্য করে না। আমেরিকায় সোনালী প্লোভার নামক একরকম পাখী আছে। এদের কোন কোন প্রজাতি লাব্রাডোর থেকে দক্ষিণ আমেরিকায় ও কেউ কেউ আলাস্কা ও হাওয়াই প্রভৃতি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে পর্যন্ত পরিযান করে। দেখা যায় যে, আড়াই হাজার বা তিন হাজার মাইল এরা অক্লেশে অতিক্রম করতে পারে। স্থলের পাখীদের মধ্যে দূর-উড্ডয়ন-ক্ষমতা সোনালী প্লোভারেরই বোধ হয় সব চেয়ে বেশী।

(ছ) **না ওড়া পরিযান** (Flightless migration)—অনেক পাখীই যে উড়তে পারে না তা আমরা জানি। কিন্তু তাদের মধ্যেও যে পরিযাত্রী পাখী আছে তা হয়তো অনেকেই জানেন না। পেঙ্গুইন পাখীর নিবাস দক্ষিণ মেরুতে। তারা শীতকালে উত্তরে কয়েক শত মাইল সাঁতরে আসে—উদ্দেশ্য, বরফের উপর শীতকাল কাটানো। গরমের দিনে আবার দক্ষিণে ফিরে যায়। এরা এদের বেশীর ভাগ পথই সাঁতার কেটে অতিক্রম করে। কিন্তু নিজেদের বাসস্থানে পেঁছবার কিছু আগে থেকেই এরা পায়ে হেঁটে আসে।

পাখীর পরিযানমূলক চর্চা করতে হ'লে কতকগুলি বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া দরকার। কেবল পর্যবেক্ষণ করেও এ বিষয়ে চর্চা করা যায়। ধরুন, আমরা বছরের পর বছর শীতকালে কোন এক পাখীকে বাঙলায় দেখতে পাই; কিন্তু বর্ষায় বা গ্রীষ্মে আর এদের পাত্তা পাওয়া যায় না। অন্য পর্যবেক্ষকরা কিন্তু বলেন যে, গ্রীষ্মকালে এদের সাইবেরিয়াতে দেখা যায়, আর সেখানেই এরা ডিম পাড়ে। তাহলে আমরা সহজেই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, এই জাতীয় পাখীরা সাইবেরিয়ার বাসিন্দা ও কেবল শীতের মৌসুমে এরা আমাদের দেশে অভিপ্রয়াণ করে। পরিযান পথের স্থান এইভাবে পরিযান বিষয়ে আলোচনা করবার পক্ষে বিশেষ সুবিধার। উত্তর সমুদ্র দেশে অবস্থিত হেলিগোল্যান্ড-এর পক্ষিপর্যবেক্ষণ মান মন্দির পৃথিবী বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ জর্মানিক পক্ষিতত্ত্ববিদ্ হেইনরিখ গাটকের (Heinrich Gatke) নাম চিরদিনের জন্য এই মানমন্দিরের সঙ্গে জড়িত হয়ে রইল। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এই পদ্ধতিতে পাখী সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা হয়ে থাকে। দুঃখের বিষয়, ভারতে এ জাতীয় কোন মানমন্দির নেই। অথচ ভারত মহাসাগরের পশ্চিমাংশে আরব উপসাগর প্রভৃতিতে অবস্থিত অনেক দ্বীপ এই কাজের বিশেষ উপযোগী। (১)

পাখীর পরিযান অনুশীলনের আর একটি পদ্ধতি হল Bird banding বা Bird ringing অর্থাৎ পাখীকে আংটি পরানো। এ উদ্দেশ্যে একটি হাল্কা অথচ স্থায়ী মাধ্যম ব্যবহার করা আবশ্যক। এলুমিনিয়ামের আংটি এ কাজে বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পাখীরা যখন ছোট থাকে তখনই অথবা বড় পাখীকে ফাঁদে ধরে তার একটি পায়ে এলুমিনিয়ামের ছোট একটি আংটি পরানো হয়। এই আংটি পরানো পাখীটিকে ফিরে পাওয়া গেলে কোথায় খবর দিতে হবে তার ঠিকানা ওতেই লেখা থাকে। তা ছাড়া এ কাজে নিযুক্ত লোকের সুবিধার জন্য বিশেষ কোন সাংখ্যক নির্দেশ বা অভিজ্ঞান এই আংটিটিতে মুদ্রিত থাকে। যদি কেউ এই আংটি-চিহ্নিত পাখীদের জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরেন এবং তাঁর যদি কিছুমাত্র জনহিতৈষণা থাকে, তাহলে এ আংটিটি তিনি নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেনই। অবশ্য কোথায় এবং কখন পাখীটিকে পাওয়া গেল সে খবরও জানানো হয়। এই উপায়ে পরিযান সম্পর্কিত আবশ্যক তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করা হয় এবং মানচিত্র ত আছেই—তার সাহায্যেই পরিযান পথ নির্ণীত হয়। বলা বাহুল্য, আংটিওয়ালা পাখীদের বেশীর ভাগেরই কোন খবর পাওয়া যায় না। সাধারণত শতকরা দু' তিনটি মাত্র পাখীর সন্ধান মেলে।



শত শত গ্যানেট এইভাবে একত্র বাস করে।

আংটি-পরানো পাখী পরিযান-ব্যাপারে কত নূতন তথ্য বয়ে এনেছে তা লিখে শেষ করা যায় না। অতি প্রাচীনকালেও মানুষ এই উপায়ে পাখীর বিষয়ে জানতে চেষ্টা করেছে। মার্কিনী Bureau of Biological Survey-র এফ সি লিঙ্কনের (F. C. Lincoln) মতে জর্মানীতে ১৭১০ খৃষ্টাব্দে যে আংটি পরানো সারসটি ধরা পড়ে, সেটিই প্রথম আংটি পরানো পাখী। গর্ডন আইমার (Gordon Aymer) বলেন যে আমেরিকায় ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে, কি আরো আগে পাখীকে প্রথম আংটি পরানো সুরু করা হয়। তাঁর মতে ঐ সালে কতকগুলি ফিবিস পাখীর ছানাকে আংটি পরিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ও এমন কি দুটো আংটি ফেরত পাওয়াও গেছল। তিনি আরও বলেন যে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে শুধু আমেরিকাতেই দু' হাজারেরও বেশি লোক এই কাজে সহযোগিতা করেন। আমেরিকাতে ঐ বছর পর্যন্ত আংটি পরানো পাখীর সংখ্যা ১,১২৩,৫২৮এ গিয়ে ঠেকে। এর মধ্যে ৬৩,৫৬৮টি পাখীকে বাঁচা বা মরা অবস্থায় ধরা হয়েছিল। এ হিসাব হ'তে দেখা যায় যে প্রতি বিশটি আংটির মধ্যে একটি ফেরত পাওয়া যায়। এ কাজ যে বেশ

(1) Roonwal—Science & Culture.

* মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট *

যুদ্ধ চলছে

আর তার ফলে অসংখ্য লোক হতাহত হচ্ছে। আহতদের তো চিকিৎসার দরকার। দলে দলে সামরিক ডাক্তারেরা তাই এদের পরিচর্যার ভার নিয়ে নিজেদের পেশাকে সার্থক করছেন। তারা বুঝতে শিখেছেন যে এইভাবে সৈন্যদের চিকিৎসা করে তারা যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করছেন তা সাধারণ বেসামরিক কাজে কখনোই সম্ভব হত না। আই এ. এম্. সি.তে কাজের জন্য অবিলম্বে আরো গ্র্যাজুয়েট চাই। এখনই আবেদন করুন।

যোগ্যতা : প্রার্থীদের যুক্তরাজ্যে (য়ুনাইটেড কিংডাম্) রেজিস্ট্রি করা অথবা 'মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া' কর্তৃক অনুমোদিত ডাক্তারী উপাধি থাকা চাই। যে-সব রেজিস্টার্ড ডাক্তারদের অনুমোদিত বিদেশী উপাধি অথবা নিম্নলিখিত উপাধি আছে তারাও এই কাজের যোগ্য—ডি. এম্. অ্যাণ্ড এস্ (মাদ্রাজ), এল্. এম্. অ্যাণ্ড এস্. (স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি, পাঞ্জাব), এম্. সি. পি. অ্যাণ্ড এস্. (বোম্বাই), এম্. এম্. এফ. (বাংলা), এম্. এস্. এম্. এফ. (ইউ. পি., পাঞ্জাব) অথবা এম্. বি. বি. এস্. (মহিশূর ও ওসমানিয়া)। প্রার্থীদের বয়স সাধারণ ক্ষেত্রে ৪৫ বছরের নিচে হওয়া চাই এবং স্বাস্থ্য যুদ্ধের কাজের উপযুক্ত হওয়া চাই। নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রথমে আই. এম্. এস্. এ নেওয়া হবে তার পরেই তাঁদের আই.এ.এম্. সি.র কাজে নিযুক্ত করা হবে। এখানে তাঁরা আই. এম্. এস্. অফিসারদের প্রাপ্য সুবিধে গুলি সবই পাবেন।

বেতন : লেফটেন্যাণ্টের পদে মাসিক ৪৫০৲ টাকা থেকে লেফটেন্যাণ্ট কর্নেলের পদে ১,৩৫০৲ টাকা পর্যন্ত। যাঁরা বিশিষ্ট স্পেশালিস্ট (বিশেষজ্ঞ) হিসেবে নিযুক্ত হন তাঁদের মেজরের পদ দেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট মাইনের উপরে ১০০৲ টাকা বেশি দেওয়া হয়। অন্য স্পেশালিস্টদের, গ্রেড অনুযায়ী যারা নিযুক্ত হন, ১০৲ টাকা বেশি দেওয়া হয় এবং মেজরের পদমর্যাদা দেওয়া হয় না। কর্তৃস্থপদের কাজের জন্য মাইনের উপরে ৩০৲ থেকে ২৪০৲ টাকা পর্যন্ত বেশি দেওয়া হয়। পোযাকপরিচ্ছদের জন্য ৭৩৩৲ টাকা। অগ্রিম বেতন ৩০০৲ টাকা পর্যন্ত নিয়োগের প্রথমেই দেওয়া হয়। চলতি নিয়ম অনুযায়ী এলাওয়েন্স : ভারতের বাইরে যেতে হলে ১৫০৲ থেকে ৪০০৲ টাকা পর্যন্ত এলাওয়েন্স দেওয়া হয়। ট্রাভেলিং এলাওয়েন্স ও লীভ কনসেশান্ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অন্যান্য অফিসারদের মতোই পাওয়া যায়। প্রথম বছর কাজের জন্য ২০০০৲ কিংবা ১০০০৲ টাকা গ্র্যাটুইটি (অফিসারটি ১৯৪০ সালের ১লা জানুয়ারির আগে না পরে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন সেই অনুযায়ী) এবং তার পর থেকে প্রত্যেক বছর কাজের জন্য এক মাসের মাইনে হিসেবে গ্র্যাটুইটি দেওয়া হয়। শারীরিক অক্ষমতার জন্য পেনশান, পরিবার ও বিধবা স্ত্রীর ভরণপোষণ ও সন্তানের শিক্ষার খরচ সবই আই. এম্. এস্. রেগুলেশান্ অনুযায়ী দেওয়া হয়।

সামরিক কাজের উপকারিতা : আই. এ. এম্. সি. তে যারা কাজ করবেন তারা আধুনিকতম সরঞ্জামের সাহায্যে আধুনিকতম প্রথায় চিকিৎসা করবার সুযোগ পেয়ে যুদ্ধের পর বেসামরিক কাজে সাধারণ ডাক্তারদের চেয়ে যে বেশি দক্ষতা দেখাতে পারবেন সেবিষয় নিঃসন্দেহ। বিস্তারিত খবরাখবর নিম্নলিখিত অফিসারদের কাছ থেকে পাবেন : প্রাদেশিক 'মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে'র কর্তাদের কাছে (বেসামরিক হাসপাতালের সার্জন জেনারেল বা ইন্সপেক্টার জেনারেল); ভারতীয় সামরিক হাসপাতালের কর্তাদের কাছে ; জি. এইচ. কিউ. নিউ দিল্লীতে "ডিরেক্টার অব মেডিক্যাল সার্ভিসেস্"এর কাছে অথবা নিউ দিল্লীতে "ডিরেক্টার জেনারেল, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস"এর কাছে।

Indian Army Medical Corps

প্রশংসনীয় ও আশাপ্রদ, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

১৯২৬ সালে মধ্য ভারতের, ধারের মহারাজা এ কাজে অল্প দিনের জন্য হাত দেন এবং বোম্বাই জীববৃত্তান্ত সমিতি (Bombay Natural History Society) পরে, ১৯২৯ সাল হ'তে দু'বছরের জন্য এ কাজ আশাতীত সাফল্যের সংগে চালিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, এ কাজ অল্প দিন পরেই পরিহৃত হয়। মার্কিনের মতন ভারত সরকারের মধ্যস্থতায় এ কাজ কবে আবার সুরু করা হ'বে সে শুভ দিনের আশায় আমরা উৎসুক হ'য়ে রইলুম।

আংটির পুনরুদ্ধারের ইতিহাস থেকে পাখীর সুদীর্ঘ পরিযানের ইতিকথা আমরা আন্দাজ করতে পারি। ১৯২৮ সালের ২৩এ জুলাই মেরুপ্রদেশের টার্ন পাখীর একটি ছানাকে লাব্রাডোরে আংটি পরানো হয়েছিল। ঐ বছরের ১৪ই নবেম্বর সেটিকে নাটালের সিপ্‌ষ্টোন বন্দরের কাছে পাওয়া যায়। এই দুই জায়গার দূরত্ব সব চেয়ে সোজা পথেও আট হাজার মাইল; পাখীটি যে পথ নিয়েছিল, সে পথে সম্ভবত এই দূরত্ব ন' হাজার মাইল হবে। পাখীটির বয়স তখন সবে চার মাস! সামুদ্রিক পাখীর মধ্যে, এই পাখীটিকেই আমরা দীর্ঘ পথচারী বলে জানি।

পাখীরা প্রত্যহ কত দূরে যেতে পারে, প্রজাতি ভেদে তার তারতম্য লক্ষিত হয়। অধ্যাপক কুক (W. W. Cooke) পাখীর পরিযান বিষয়ে একজন নামকরা পণ্ডিত; তাঁর মতে মিসিসিপি উপত্যকার ওপর দিয়ে যে ছোট পাখীর দল উড়ে চলে, তারা প্রতিদিন গড়ে তেইশ মাইল উড়তে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণতম অংশ থেকে চার হাজার মাইল দূরে, উত্তর-পশ্চিম আলাস্কায় পরিযাত্রিক থ্রাস্ পাখীরা প্রতিদিন গড়ে একশ' ত্রিশ মাইল করে ওড়ে—এ অভিমত ডাঃ আলেকজেণ্ডার ওয়েটমোরের (Dr. Alexender Wetmore)।

এই প্রসংগে পাখীরা কত উঁচুতে উড়তে পারে, তার একটা ফিরিস্তি দেওয়া হয়তো অসংগত হবে না। যারা বড় বড় হিসাবের সংখ্যা দেখে আনন্দিত হন তাঁরা এর থেকে আনন্দের খোরাক পাবেন। টমসনের মতে সবচেয়ে উচুঁতে ওড়া পাখীর তালিকা নীচে দেওয়া গেল।

সোয়ালো	...	১,৪৬২ ফুট।
বক	...	১,৬২৫ ফুট।
ঈগল	...	৯,৭৫০ ফুট।

ইংলণ্ডের রাজকীয় বিমান বাহিনীর কর্তৃপক্ষেরা জানিয়েছেন যে, তারা দাঁড়কাক এগারো হাজার, হাঁস সাড়ে-সাত হাজার এবং রাজহাঁসকে সাতশ' ফুট ওপরে উড়তে দেখেছেন।

প্রথম বিশ্ব মহাসমরে ফরাসী যুদ্ধক্ষেত্রে বৈমানিকেরা রাজহাঁসকে ন' হাজার ফুট্ উচুঁতে উড়তে দেখেছিলেন। ১৯২১ সালের এভারেস্ট অভিযানের সময় ডাঃ ওয়ালাস্টন (Dr. A. F. R. Wollaston) লেমারগিয়ার পাখীকে চব্বিশ থেকে পঁচিশ হাজার ফুট্ ঊর্ধ্বে বিচরণ করতে দেখেন।

কিন্তু সবচেয়ে উচুঁতে যে পাখীটিকে দেখতে পাওয়া গেছল, সে হ'ল আমাদের দেশে, ডেরাডুনে। একজন বিজ্ঞানী সূর্যের আলোকচিত্র তুলছিলেন, হঠাৎ তাঁর ক্যামেরায় একটি রাজহাঁস ধরা পড়ে। পরে হিসাব করে দেখা গেছে যে এই হাঁসটি উনত্রিশ হাজার ফুট্ অর্থাৎ প্রায় ৫ই মাইল উপরে ছিল।

পাখীরা বছরের পর বছর নির্ভুল ভাবে একই জায়গায় বারে বারে ফিরে আসে। সময়ের বেলাও এদের হিসাব নির্ভুল। ১৯০৪ সাল থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত সুইফ্‌ট্ পাখীর গমনাগমন বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। ফলে দেখা গেছে যে প্রতি বছরেই এপ্রিল মাসের বারই থেকে সাতাশের মধ্যে এরা নিজের জায়গায় এসে পেঁছয়। সাধারণত কিন্তু এদের উপস্থিতির দিন হ'ল এপ্রিলের বিশ তারিখ। সুতরাং খুব বেশি করে হ'লেও, এদের উপস্থিতির সময় সাত বা আট দিনের এদিক-ওদিক হয় না। পাখীদের সময় জ্ঞানের চেয়েও স্থান সম্পর্কে ধারণা আরও আশ্চর্যতর ও নির্ভুল। ভারতীয় পক্ষিপর্যবেক্ষক রুনেওয়াল কোনও প্রবন্ধে লিখেছেন যে অনেক পাখীকে কেবল একই জায়গায় নয়, এমন কি একই বাসায় ফিরে আসতে দেখা গেছে।

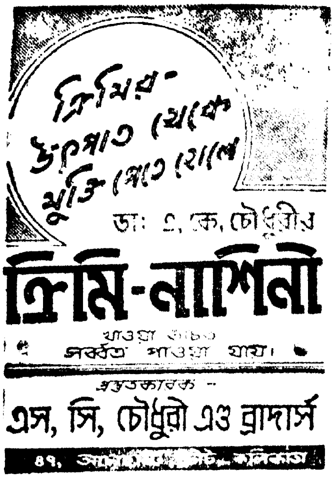
ভেবে অবাক লাগে, পাখীরা কিছু না খেয়ে, আর কোথাও বিশ্রাম না নিয়ে মহাসমুদ্রের ওপর দিয়ে দিনের পর দিন কিভাবে উড়ে চলে? অনুমান করা হয় পরিযানের আগে পাখীরা নিজেদের শরীরে যে চর্বি সঞ্চয় করে রাখে, তারই ওপর নির্ভর করে তারা এই কার্য সম্পন্ন করে। মরুভূমির উটের নির্জলা পথ চলার মতন, সাহিত্যিক উপমায় পরিযাত্রিক পাখীর এই দুঃসহ দৃষ্টান্তও বোধকরি একদিন গৃহীত হবে। প্লোভার পাখীর পরিযানের আগে গায়ে পুরু এক স্তর চর্বি জমা হয়ে উঠে, কিন্তু পরিযান পর্বের শেষে সে সঞ্চিত চর্বির তহবিল আর দেখা যায় না।

পরিযাত্রিক প্রণালী ও পথের বিঘ্ন সম্বন্ধে আমরা অনেকেই বিশেষ কিছু জানি না। বেশির ভাগ পাখীরই পরিযাত্রার সময় দিনে নয়, রাত্রে। সুতরাং এদের অনেককেই পর্যবেক্ষণ করবার সুবিধা আমরা পাই না। সব পাখীই হাঁসের মত দল বেঁধে পরিযানে নামে না। বহু প্রজাতি ছোটো ছোটো দল বেঁধে, এমন কি একাই, পরিযানে চলে। পাখীর পরিযানের অন্তরায় খুব কম বললেই চলে। অনেক সময় কিন্তু আমরা কল্পনাও করতে পারি না এমন সব জিনিস পরিযানের বাধা-স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। আলোক-স্তম্ভ নৌ-যান আর নাবিকদের প্রাণ রক্ষা করে, সত্য, কিন্তু পাখীদের পক্ষে তা মারাত্মক বিশেষ। প্রতিবছর হাজার হাজার পাখী রাতের আঁধারে আলোকস্তম্ভে ধাক্কা খেয়ে মরণ ডেকে আনে। রঙীন আলোয় কিন্তু এদের তেমন কিছু অসুবিধা হয় না, যতটা হয় কুয়াসায়। এখানে মজার কথা হ'ল এই, পাখীদের প্রজনন-ভূমি বা শীতাবাস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকলেও, পথের বাধা ও বিঘ্ন বিষয়ে জ্ঞান তেমন টনটনে নয়।

পাখীরা বরাবরই তাদের পূর্বপুরুষদের পদরেণুপূত পরিযান পথ অনুসরণ করে। অবশ্য ঝড়-বৃষ্টি কখনো কখনো এদের পথচ্যুত যে করে না, এমন নয়। পাখীরা বছরের পর বছর একই পথ দিয়ে আসা-যাওয়া করার ফলে, পাখীর ব্যবসায়ের পক্ষেও যথেষ্ট সুবিধার কারণ ঘটে। অজস্র কোয়েল পাখী প্রতিবছর মৃত্যুমুখে পড়ার কারণ হ'ল এই যে, নির্দিষ্ট পথ দিয়ে তারা আসা-যাওয়া করে। পরিযাত্রী প্রজাতি বিশেষের কিন্তু গমনাগমনের পথ এক ও অভিন্ন নয়; অনেকে ফেরার বেলায় ঘুরো, দূর পথ বেছে নেয়। একই পথে যাওয়া-আসার ফলে প্রচুর খাবার পাওয়ার সম্ভাবনা অল্প বলে, তারা বোধ হয় ভিন্ন পথ নির্বাচন করে।

পাখীর পরিযান পথ আলোচনা করা একটি সমস্যার বিষয়। অনেক জীবতত্ত্ববিদের মত এই যে লব্ধ-গুণ (aquired characters) বংশানুক্রমে বর্তায় না। লব্ধগুণের উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ (Inheritance of aquired characters) পরীক্ষা করে প্রমাণ করা যায়নি সত্য; কিন্তু অপ্রমাণিতও হয়নি। পাখীর ছানারা প্রথম যাত্রাতেই সংগীহীন হয়ে পূর্বপুরুষের পথ দিয়ে নিজেদের শীতাবাসে গিয়ে উপস্থিত হয়। এ যে কি ক'রে সম্ভব হ'তে পারে তার মীমাংসা করতে গেলেই, লব্ধগুণের উত্তরলব্ধি বা উত্তরাধিকার স্বীকার করতে হয়। গৃহবাসী সোয়ালো পাখীরা ইংরেজি প্রবাদের কাক নয়, তারা সোজা পথ ছেড়ে আরও দু' হাজার মাইল বেশি লম্বা পথ দিয়ে পরিযান সফর করে। সোয়ালোর এই অদ্ভুত স্বভাবের রহস্য উন্মোচন করা যায়, যদি আমরা লব্ধগুণের উত্তরলব্ধি মেনে নিই। ডাঃ চ্যাপম্যান (Dr. Frank M. Chapman) এ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন ও এই মতের তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক।

পাখীদের সম্বন্ধে আর একটি আশ্চর্যের কথা হ'ল—এদের দিক নির্ণয় জ্ঞান। এরা যেভাবে অন্ধকার, কুয়াসায় পথ খুঁজে,



ক্রিমির উৎপাত থেকে মুক্তি পেতে হোলে
ডাঃ এ, কে, চৌধুরীর
ক্রিমি-নাশিনী
সর্বত্র পাওয়া যায়।
প্রস্তুতকারক —
এস, সি, চৌধুরী এণ্ড ব্রাদার্স
৪৭,

হাজার হাজার মাইল দূরে গন্তব্য স্থানে গিয়ে উপস্থিত হয়, তাতে পাখীদের অভিমুখ্য-প্রতীতি (Sense of direction) প্রবল বলেই মনে হয়। কোন্ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সাহায্যে পাখীদের এই প্রতীতি জন্মায়, তা স্থির করবার জন্য বহু চেষ্টাই হয়েছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে প্রচেষ্টা বিশেষভাবে জয়যুক্ত হয়নি।

আমরা যে পঞ্চেন্দ্রিয়ের কথা জানি, তাতে এ সমস্যার সমাধান হয় না। তীব্র ঘ্রাণশক্তি-সম্পন্ন প্রাণীর তুলনায় পাখীদের নাক গন্ধ ব্যাপারে প্রখর নয়। প্রখর ঘ্রাণশক্তির জন্য নাসারন্ধ্র সরস, মাংসল এবং ঠোঁটের আগে হওয়া দরকার। পাখীর নাক কিন্তু মাংসহীন ঠোঁটের আগে দুটো ছিদ্র মাত্র। প্রাপ্তবয়স্ক পেলিকান এবং গ্যানেট পাখীদের আবার এ ছিদ্র দুটিও বন্ধ থাকে। শকুনদের ঘ্রাণশক্তি সম্বন্ধে আমরা অনেক কথাই বলে থাকি। সম্ভবত এও একটি পাখীদের বিষয়ে ভ্রান্ত মনগড়া ধারণা। খাদ্যবস্তু দিয়ে, চোখ বেঁধে, শকুনকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এদের ঘ্রাণশক্তি তীক্ষ্ম তো নয়ই, বরং ঠিক তার উল্টো।

স্পর্শশক্তির জন্য পাখীকে পালকের ওপর নির্ভর করতে হয়; কারণ, মাংসহীন ঠোঁট বা নখ দিয়ে খুব ভালভাবে অনুভব করা চলে না। কিন্তু আমরা জানি, পাখীদের এরকম কোন অভ্যাস নেই।

শ্রবণশক্তি অবশ্য পাখীদের ভাল রকমেই আছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, পাখীদের গান গাইবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও অনেক পাখী শুধু শব্দের প্রখরতাই বুঝতে পারে—শব্দের চারিত্রিক বিভিন্নতা সম্বন্ধে তারা বিশেষ ওয়াকিবহাল নয়।

পাখীর চোখ যে মানুষের চেয়ে অনেক প্রখর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি যতই প্রবল হ'ক না কেন, রাত্রে, কুয়াসায় বা প্রথম পরিযানে তা কোন কাজে লাগতে পারে না। পেঙ্গুইন পাখীরা সমুদ্রের ওপরে ওড়ে না। সুতরাং তাদের পরিযানেও দৃষ্টিশক্তি বিশেষ সাহায্য করে না। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, সাগর-পারী পাখীদের পরিযানকালে দৃষ্টিশক্তিই প্রধান অবলম্বন। গর্ডন আইমারের মতে, পাখীরা সমুদ্রের জলের রঙ, ঢেউয়ের প্রকৃতি অথবা সামুদ্রিক প্রাণীদের রূপ দেখে পরিযানের পথ স্থির করে।

কিন্তু এত গবেষণা সত্ত্বেও পাখীদের পরিযান-পথ-সন্ধানী ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে নির্ভুলভাবে আমরা যে জেনেছি, একথা বলা চলে না। কোথায় যে এই "ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের" অস্তিত্ব, তা নিশ্চিতরূপে বলা এখনো সম্ভবপর হয় নি। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন যে, পাখীর এই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে পৃথিবীর চুম্বকশক্তির সম্বন্ধ আছে।

বৈমানিক লিণ্ডেনবার্গ প্যারীতে যাবার সময় তাঁর উড়ো-জাহাজে একটি আবেশ-কুণ্ডলী (Induction coil) নিয়ে যান। পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্র থেকে এই যন্ত্রটিতে সামান্য বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হ'ত। সুতরাং যখনই বিমানটি অন্য দিক পরিবর্তন করত, তখনই এই যন্ত্রটিতে কম বা বেশি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হ'ত এবং বিদ্যুৎ প্রবাহের এই তারতম্যতা একটি ডায়ালে (Dial) দর্শিত হ'ত। পক্ষিতত্ত্ববিদেরা আজ অনেক বছর ধরেই অনুমান করে এসেছেন যে, পাখীদেরও হয়তো এরকম কোনো অতিরিক্ত "অঙ্গ" আছে, যার দ্বারা তারা পৃথিবীর চুম্বকরেখা নির্ণয় করতে পারে।

সাম্প্রতিক জৈব-পদার্থবিদ্যায় (Biophysics) বিশ্বাস করা হয় যে, প্রত্যেকটি পেশী সঞ্চালন, এমনকি চোখে প্রতিবিম্ব গ্রহণও স্নায়ুতন্ত্রে বৈদ্যুতিক প্রবাহের বেগ-সঞ্চার (Transmission of electric impulse) মাত্র। তাহ'লে পাখীদের বেলায় উপরোক্ত বিদ্যুৎ-চুম্বকীয়-প্রকল্প (Electro-magnetic hypothesis) সত্য হওয়া অসম্ভব নয়। বার্তাবহ পায়রারা কোথাও যাবার আগে, বৃত্তাকারে কিছুক্ষণ ঘোরে; এতে মনে করা যেতে পারে যে, এইভাবে তারা পৃথিবীর চুম্বক-রেখা "অনুভব" করে দিক নির্ণয় করে নেয়।

বিশদ পরীক্ষার দ্বারা কিন্তু এখনো এই মতবাদ সমর্থিত হয়নি। অবশ্য সম্প্রতি এমন কতকগুলি পরীক্ষণ হয়েছে যার দ্বারা এই প্রশ্নে হয়তো কিছু আলোকপাত হলেও হ'তে পারে। আমেরিকায় কোন এক বেতার-কেন্দ্রে (WKBN, Youngstown) "ট্রান্সমিসনে"র সময় অনেকগুলি পাখীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। পাখীরা নিজেদের দিক স্থির করে নিতে পারে নি। বেতার প্রবাহের শক্তি যতই বেশি করা হয়েছিল, দিক নির্ণয় করতে তারা ততই অধিক বেগ পেয়েছিল। এর দ্বারা উপরোক্ত মতবাদ হয়তো সমর্থন করা যেতে পারে। বৈদ্যুতিক ঝড়ের সময় পায়রাদের পথ হারাতে দেখা যায়। এ অভিজ্ঞতাকেও "বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় প্রকল্পে"র অনুকূলে দাঁড় করানো যেতে পারে।

কিসের ওপর নির্ভর করে যে পাখীরা এত নিয়মিতভাবে পরিযান করে, সেদিন পর্যন্তও তা চিন্তার বিষয় ছিল। সম্প্রতি গেল কয়েক বছরের মধ্যে এ বিষয়ে অনেক কিছু জানা গেছে। বাইরের পারিপার্শ্বিকের থেকে কোন প্রেরণা ও শারীর সংস্থানে উদ্ভূত "পরিবর্তনে"র যোগাযোগের ফলে পাখীরা অভিযানে বেরোয়—এই অনেকের মত।

বাইরের প্রেরণার কথা আলোচনা করতে গিয়ে রোয়ান (Rowan) বলেন যে, কেবল খাদ্যাভাব পরিযানের প্রেরণা আনতে পারে না। তাঁর মতে, তাপেরও পরিযানের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ নেই; কারণ, তাপ যখন তখনই পরিবর্তন হয়; কিন্তু পরিযান সুনিয়মিত ও সুনির্দিষ্ট। বায়ুর চাপও পরিযানের মূল প্রেরণা হ'তে পারে না; তাহ'লে বছরের যে কোন সময়েই পাখীরা পরিযানে বের হ'ত।

ঋতুভেদে, নিয়মিতভাবে দিনমানও কম-বেশি হয়। এর ওপর নির্ভর করেই রোয়ান কতকগুলি চিত্তাকর্ষক পরীক্ষণ করেছেন। কৃত্রিমভাবে দিনমান কম-বেশি করে তিনি দেখিয়েছেন যে, দিনমানের পরিমাণেই প্রধানত পরিযানের প্রেরণা আনে। (১)

পাখীর পরিযান সম্পর্কে নানাজাতীয় সমস্যা এখনো বিদ্যমান। এগুলি সমাধান করতে হলে, পাখীর যৌন-প্রবৃত্তি, তাদের খাদ্যসমস্যা, ঘরবাঁধার প্রবৃত্তি এবং আবহাওয়াগত অবস্থা—এই বিষয়গুলিকে সমবেত বা পৃথকভাবে বিচার করা দরকার। এই জাতীয় বিবিধ সমস্যা বোধ করি পাখীর আংটি-পরানোর অভিজ্ঞতার সঙ্গে জীব-রসায়ন (Biochemistry) ও জৈব-পদার্থবিদ্যার গবেষণার যোগে সার্থক হবে।

(1) William Rowan—Riddle of migration.

অনুবাদসাহিত্য

পলাতক

(অনুবাদ গল্প)

টমাস ম্যান

এই সেই স্যানাটোরিয়াম্ ইন্ফ্রিড্! সূর্য যখন পশ্চিম দিগন্তে বিলীয়মান—কুয়াসা-স্তিমিত সন্ধ্যার অন্ধকার ছায়া যখন নামছে, তখন এই জনবিরল গিরি এবং বনভূমিবেষ্টিত জায়গাটায় এসে দাঁড়ালে সকলের আগে যে বিরাট প্রাসাদের মতো বাড়িটা আপনার চোখে পড়বে, নিঃসন্দেহে জানবেন সেইটাই স্যানাটোরিয়াম্ ইন্ফ্রিড। সন্ধ্যার কথা বললাম, তার কারণ সন্ধ্যার শিখরের বিপরীত আলোকেই আমি এই স্যানাটোরিয়ামকে প্রথম দেখি।

এর কথা আপনারা আশা করি ইতিপূর্বেই বহুবার শুনেছেন। কতো দূর-দূরান্তর থেকে যে রোগীরা এখানে আসেন, তার ঠিক নেই। অবশ্য খরচ অনেক বেশি। তা হোক্, তবু এর সুনাম এখন একটু একটু করে সমস্ত ইউরোপেই ছড়িয়ে পড়ছে বলতে পারেন। রোগীরা এখানে এসে সুস্থ হন, সান্ত্বনা পান মনে, টিউবারক্যুলোসিসের নির্মম কবল থেকে অনেককেই মুক্তি দিতে পেরেছে এই স্যানাটোরিয়াম্। সেই গৌরব এবং সুখ্যাতির দিকে চেয়ে চেয়ে তাঁদের দুর্বল ফুস্ফুস্গুলি আনন্দে ভরে ওঠে—আশায় আশায় তাঁরা পথ হাঁটেন।

সমস্ত প্রতিষ্ঠানটিকে পরিচালনা করেন ডক্টর লীন্ডার। মুখে তাঁর ঘন সুদীর্ঘ শ্মশ্রু, কোঁক্ড়ানো কালো চুল, অত্যন্ত গম্ভীর আর মার্জিত রুচিসম্পন্ন একটি নিটোল ব্যক্তিত্ব। চশমার পেবল্ দুটো অসম্ভব রকম মোটা আর ঝক্ঝকে।

আর আছেন মিসেস্ অস্ট্রেলো। অদ্ভুত কর্মিৎকর্মা এবং সুনিপুণা ব্যবস্থাপিকা বলা যায় তাঁকে। এই তিনি করিডোরে দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলছেন, পরমুহূর্তেই দেখবেন স্টোর-রুমের পরিচারিকা ‘স্পাজ্’কে কি একটা নির্দেশ দিচ্ছেন এবং তার পরের মুহূর্তেই নিজে মই বেয়ে উঠে সেলফ্ থেকে পাড়ছেন কনডেন্সড্ মিল্কের একটা কৌটো। সমস্ত রান্নাঘর এবং স্টোর-রুম তাঁর তত্ত্বাবধানে।

মাঝে মাঝে মৃত্যুও আসে এখানে। অত্যন্ত শান্তভাবে, নিঃশব্দ চরণে। এই বিরাট ইন্ফ্রিডের সুগভীর গাম্ভীর্য তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, যেসব রোগীরা বিপদজনক অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলো, তাদেরই হয়তো একজনের হৃৎস্পন্দন বন্ধ হলো, কিন্তু কোনো ছায়া পড়লো না তার কোথাও এমনকি পাশের ঘরের ভদ্রলোকটিও সে খবর জানতে পারলেন না!

তবে হ্যাঁ, যখন কোনো নতুন অতিথি আসেন, তখন সমস্ত বাড়িতে একটা সাড়া পড়ে। পোর্টার গেটের ঘণ্টাটা বাজায়, ডক্টর লীন্ডার নিজে নেমে আসেন নীচে—পিছনে আসেন মিসেস্ অস্ট্রেলো। স্বাগত অভ্যর্থনায় অতিথিকে সম্মানিত করেন তাঁরা। ইন্ফ্রিডের ঘরে ঘরে নতুন অতিথি সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ হয়ে যায়।

* * *

এই রকমই একটি দিনে, জানুয়ারীর প্রথম দিনে বিখ্যাত এ সি ক্লোটেরজেন এন্ড কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা মিস্টার ক্লোটেরজেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হলেন। ভদ্রলোকের স্ত্রীর অসুখ যথাসময়ে ধরা পড়েছে এই যা রক্ষে—ডক্টর লীন্ডার আশ্বাস দিলেন, বললেন, এখানে থাকলেই সেরে যাবে—চিন্তার কোনো কারণ নেই।

ইন্ফ্রিডের অধিবাসী এবং অধিবাসিনীরা এই নবাগতার সম্বন্ধে অতিমাত্রায় উৎসুক হয়ে উঠছেন দেখা গেলো, সকলেই সকলকে সুযোগ মতো চোখ-ইসারা করেন, বলেন, জানা গেলো কিছু?

মিসেস্ ক্লোটেরজেন্-এর জন্যে যে ঘর নির্দিষ্ট হয়েছিল, ঠিক তার পাশের ঘরেই এক ভদ্রলোক কিছুদিন হোল এসেছেন। ভদ্রলোকটি নাকি লেখক। দীর্ঘ একহারা গড়ন—খুব কম কথা বলেন, রীতিমতো খেয়ালী বলা যায়। খুব গম্ভীর। দেখা গেলো এই নূতন রোগিণীর আবির্ভাবে তাঁরও সেই কঠিন গাম্ভীর্যের দেওয়ালে কিছু যেন ফাটল ধরছে, তিনিও দুলছেন। এককথায়, সমস্ত ইন্ফ্রিড্ যেন আকস্মিকভাবেই এই ভদ্রমহিলার ইতিবৃত্তের জন্যে সচেতন হয়ে উঠলো।

অবশেষে পুরো দুদিন পরে উদ্ঘাটিত হলো সেই ভদ্রমহিলার ইতিকথা। জন্ম তাঁর ব্রেমেন-এ, তারপরে ভাগ্যের নানা ঘাতপ্রতিঘাতে যৌবনে এসে দেখা হোল বিখ্যাত ব্যবসায়ী মিস্টার ক্লোটেরজেন-এর সঙ্গে। এখন তিনি তাঁর অর্ধাঙ্গিণী। বেশ কাটছিলো দিন। কিন্তু কিছুকাল আগে একটি পুত্র সন্তানকে পৃথিবীতে এনে শ্রীমতী ক্লোটেরজেন্ সেই যে ভেঙে পড়েছেন, বহুবিধ যত্নে এবং চিকিৎসাতেও সে ভাঙা শরীর আর জোড়া লাগেনি—সেই থেকেই তাঁর বুকের অসুখ—তারপরে ডাক্তারের পরামর্শে তাঁর স্বামী তাঁকে এখানে নিয়ে এসেছেন ইত্যাদি।

মিস্টার ক্লোটেরজেন ইন্ফ্রিডে থাকতে পারলেন না। এক সপ্তাহ পরে তাঁর স্ত্রীকে এখানে রেখে তিনি সমুদ্র পাড়ি দিলেন—কর্তব্য তাঁর গুরু—যে ব্যবসায় তাঁর ক্রমবর্ধমান, যে কোনো কারণেই হোক্ তাকে সুদীর্ঘকাল অবহেলা করবার মতো আলস্য তাঁর রক্তে নেই! তিনি চলে গেলেন।

আরো কিছুদিন পার হোল। জানা গেলো লেখকটির নাম নাকি স্পাইনেল। অদ্ভুত লোক—এমন উচ্ছ্বাসপ্রবণ মানুষ মিসেস্ ক্লোটেরজেন এর আগে আর কখনো দেখেন নি। প্রথম প্রথম ভারি অদ্ভুত লাগতো তাঁর—আর সত্যি কথা বলতে কোনো নামকরা লেখকের মুখোমুখি তিনি কখনো হননি। রীতিমতো এ একটা রহস্য বলা যায়।

একদিন আলাপ হোল। বেশ লোক কথাবার্তাগুলি ভারি সরল। মন্দ লাগলো না তাকে মিসেস্ ক্লোটেরজেনের। এমন খেয়ালী আর উদাসীন!

দু'একজন নাকি ওঁর ঘরে গিয়ে ঢুকে দেখে এসেছে, ভারি অগোছালো লোকটা—বই জামা-কাপড় সব এদিকে ওদিকে ছড়ানো—আর টেবিলের ওপরে একখানা খাতা খোলা। কি যেন একটা নতুন উপন্যাস লিখছেন তিনি এখানে এসে—মিসেস্ ক্লোটেরজেন গিয়েও একদিন সেই খোলা খাতাটা দেখে এসেছেন।

—আচ্ছা মিস্টার স্পাইনেল, একদিন তিনি জিগ্যেস করলেন, আপনি সত্যি বলুন তো—এই ইন্ফ্রিডে এতো দিন ধরে কি জন্যে রয়েছেন? কি অসুখ আপনার?

—অসুখ? না, অসুখ আর কি—খানিকটা ইলেক্ট্রিক ট্রিট্মেণ্ট করাবার জন্যে এসেছি—তবে আসল কথা কি জানেন, আমি জানতে চাই মানুষকে—আমি দেখতে চাই জীবন!

—ও, তাই নাকি?

—হ্যাঁ ম্যাডাম, আপনি জানেন না—এই ইন্ফ্রিড্ আমার কাছে একটা বিরাট সাম্রাজ্যের মতো—জানেন, এখানে এসে পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে ভারি একটা পরি-

বর্তনের পালা সুরু হয়েছে। তারপর একটু থেমে বল্লে, আমার সব কথা বোধ হয় বুঝতে পারছেন না মাদাম!

—খুব পারছি। হাসতে হাসতে তিনি উত্তর দিলেন, সব সময়ে যে বুঝি—তা নয়, তবে চেষ্টা করলেই পারি। ব'লে আবার হাসলেন।

দিন কাটতে লাগলো। দেখা গেলো তাঁদের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা চমৎকার অন্তরংগতার স্রোত নামছে—তারপরে সেটা একদিন অপূর্ব রূপ নিলো।

খুব ভোরে উঠে স্পাইনেল কোথায় যেন গিয়েছিলো সেদিন। ক্রমেই সে সোজা ঢুকলো তার ঘরে। বললো, জানেন মিসেস্ ক্লোটেরজেন, আজ বেড়াতে গিয়ে অপূর্ব একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখে এলাম। ব'লে ছড়িটা রেখে সে একটা চেয়ারের ওপরে ব'সে পড়লো।

—বটে, কি রকম মিস্টার স্পাইনেল?

—ওঃ, ভারি সুন্দরী।

—তবু, বলুন না একটু।

—বা, তা আমি কি ক'রে বলবো—আমি তো আর তাকে খুব ভালো ক'রে দেখিনি। সে দূর দিয়ে যাচ্ছিলো, তাকে একবারখানি চকিতের জন্যে দেখে নিলাম, তারপরে আর আমি তার দিকে তাকাইনি। কি জানি, যদি আমার এই ভালোলাগাটুকু, আবার তাকে দেখলে সব নষ্ট হয়ে যায়।

মুখে রুমাল চাপা দিয়ে মিসেস্ ক্লোটের-জেন ততক্ষণে হেসে গড়িয়ে পড়েছেন। বললেন, হায় হায়, আপনি এইভাবে বুঝি খুব সুন্দরী কাউকে লক্ষ্য করেন?

—হ্যাঁ মাদাম। একটু অপ্রস্তুত হোয়ে পড়লো স্পাইনেল। বুঝলেন কিনা—

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, খুব বুঝেছি—আপনাদের মতো লেখকেরাই এমন কাণ্ড করতে পারেন—মা গো, এ আমি ভাবতেও পারি না—আপনি এমন লোক!

এক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হোয়ে দাঁড়ালো স্পাইনেল। তারপরে হাসলো একটু। বললে, তবে হ্যাঁ, একটি মুখ আমি দেখেছি যা আমি কখনো ভুলতে পারবো না, যা আমার চিরকাল মনে থাকবে, যা আমার—ব'লে একটু থেমে বল্লে, সে কে জানেন?

—কে? কম্পিত গলায় সে বললে।

—সে তুমি—তুমি! ব'লে আর দাঁড়ালো না স্পাইনেল। দড়াম ক'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে করিডোরের ওদিকে চলে গেলো।

সমস্ত ইন্ফ্রিড্ স্তব্ধ হয়ে এদের গতি-ভংগি লক্ষ্য করতে লাগলো। ডক্টর লীনডার-এর চোখেও এটা এড়ালো না।

একদিন স্পাইনেল জিগ্যেস্ করলে, আচ্ছা সত্যি ক'রে বলো, তোমার নাম কি?

—কেন আমার নাম তো ক্লোটেরজেন।

— [illegible]—স্পাইনেল বললো, আমি বলছি, তোমার কুমারীজীবনে যে নাম ছিলো তাই।

হো হো ক'রে হেসে উঠলো সে, বললে, কেন ক্লোটেরজেন নামটা তোমার ভালো লাগে না?

—একটুও না। কি বিশ্রী উচ্চারণ ওর—আর তারপরে ওটা তো তোমার স্বামীর নামের অংশ—দূর, বিশ্রী!

—বেশ, হাসতে হাসতে সে বললে, আচ্ছা ধরো, আমার নাম যদি হয় গেব্রিয়েল একফ্?

—ওঃ, সে খুব ভালো নাম। আমার খুব পছন্দ হয় এ নাম—আচ্ছা, এবার বলো তোমার বাবা কোথায়?—মা আছেন কি না?

—না, খুব ছোটবেলায় মা মারা গেছেন। একটু থেমে গেব্রিয়েল বলতে আরম্ভ করলো—আমার বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী, কিন্তু সেটাই তাঁর বড়ো পরিচয় নয়—তিনি ছিলেন সত্যিকারের আর্টিস্ট।

আর্টিস্ট?

—হ্যাঁ, আর্টিস্ট—একটু হাসলো সে, বললে, খুব ভালো ভায়োলিন বাজাতে পারতেন বাবা, আমাকেও তা শিখিয়েছিলেন—আমরা দুজনে প্রায়ই বাজাতাম।

—আশ্চর্য! শিল্পীর বংশে তুমি জন্মেছো?

—হ্যাঁ, একটু হেসে সে বললে, আমাদের বাড়ির কাছে একটা ঝরণা ছিলো, আমি সেখানে ব'সে প্রায়ই বাজাতাম, আমার বন্ধুরা আমাকে ঘিরে বসতো।

—বাঃ, কি চমৎকার! স্পাইনেল প্রায় হাততালি দিয়ে উঠলো,—তুমি নিশ্চয়ই গান গাইতে তখন?

—না, আমি শুধু বাজাতাম, আমি আর আমার ছ'জন বন্ধু।

—বাঃ বাঃ, কি চমৎকার!—সত্যি তুমি একবার ভেবে দ্যাখো কি চমৎকার দৃশ্য!

—এতো ভাল লাগলো তোমার এটা?

—লাগবে না। মনে করো তুমি আর তোমার ছ'জন বন্ধু—আর তুমি তার মধ্যে ব'সে আছো মহারাণীর মতো—

—যাও!

—আরে হ্যাঁ, সত্যি, তুমি বিশ্বাস করো আমি স্পষ্ট চোখের ওপরে সব দেখতে পাচ্ছি—আর একটা সোনার মুকুট জ্বলছে তোমার মাথায়—আহা, সে যে কি সুন্দর!

—ধোৎ, আচ্ছা বুদ্ধি তোমার!—সোনার মুকুট আবার আমি পরলাম কখন!

—প'রেছিলে বৈকি!—স্পাইনেল হেসে উঠলো, বললে, সেটা জ্বলজ্বল্ ক'রে জ্বলছিলো—আমার মতো চোখ যদি থাকতো তাহ'লে বুঝতে পারতে, ব'লে হো হো করে সে আবার হেসে উঠলো।

—সে জানে! —যাক্ শোনো, ঠিক সেই সময়েই সেইখানেই আমার স্বামীর সংগে প্রথম দেখা হয়।

—বলো কি? হঠাৎ স্পাইনেলের চোখ ম্লান হয়ে এল।

—হ্যাঁ, কি একটা ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি আমার বাবার কাছে এসে ছিলেন। তারপর সেখানে আমাকে দেখে তাঁর খুব পছন্দ হয়—তারপরে বিয়ে করেন।

—তুমি সেই বিয়েতে রাজি হলে?

—হলাম বৈকি!

—আর তারপরে তুমি তোমার সেই বন্ধু, সেই ঝরণা—সেই বাগান স-ব ছেড়ে দিয়ে তোমার স্বামীর সংগে চলে এলে?

—এলাম তো, আবার হাসলো গেব্রিয়েল, বললে, তাতে তোমার এতো অবাক্ হবার কি আছে?

—এ বিয়েতে সুখী হলে তুমি?

—হোয়েছি বইকি! যখন আমার কোলে আমার ছেলে এনটন এল—তখন বুঝলাম, পৃথিবী আরও কতো সুন্দর—আরও কতো চমৎকার!

ও, তা হবে—স্পাইনেলের কথার স্রোতে হঠাৎ সেদিন তাল ভংগ হলো। সে উঠে পড়ল।

আর একদিন।

সন্ধ্যে হয়ে আসছিল, হঠাৎ স্পাইনেল ঘরে ঢুকল, বললে, আজ তোমাকে একটা অনুরোধ করব, রাখবে তো?

—কি বলো?

—তোমাকে সেই কুমারী জীবনে আবার ফিরে যেতে হবে। মানে তুমি যেসব সুর বাজাতে, যেসব গান গাইতে, তাই আবার বাজাও—আমি শুনবো।

—সেসব কি আমার মনে আছে?

—আচ্ছা, তুমি চেষ্টা কর না।

—বেশ, বলে গেব্রিয়েল পিয়ানোর কাছে গিয়ে বসল—তারপরে বাজাতে আরম্ভ করল। কয়েক ঘণ্টা পার হয়ে গেল, তন্ময় হয়ে গেব্রিয়েল বাজিয়ে চলল, আর স্তব্ধ হয়ে বসে শুনতে লাগল স্পাইনেল, একটার পর একটা সুর বেজে চলল—

তারপরে এক সময়ে স্পাইনেল তার আরও কাছে উঠে এল—সুরে সুরে তাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে মনে হল, তার-পরে হঠাৎ বলল, থাম, থাম গেব্রিয়েল, আর আমি পারছি না, তুমি আর বাজিও না ওরকম করে, বলে এগিয়ে এসে তার দুই হাত চেপে ধরল।

ডাক্তার লীনডার তখন দরজার ওধার দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন- আস্তে সেখান থেকে সরে গেলেন।

জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে মিস্টার ক্লোটের-জেন এসে উপস্থিত হলেন, বললেন, হঠাৎ আমাকে তার করলেন, ব্যাপার কি?

—কারণ আছে বৈকি, আপনার এখন কিছুদিন স্ত্রীর কাছে থাকা উচিত। ডক্টর লীনডার বললেন।

—থাকা ত উচিত! বিরক্তিতে ক্লোটেরজেন

ফেটে পড়ল. জানেন, এতে আমার ব্যবসায়ের কতো ক্ষতি হয়—তারওপরে এই রেল ভাড়া—

স্পাইনেল তার জানালা দিয়ে বসে বসে সব দেখলো। একবারও বাইরে এল না।

পরের দিন মস্ত বড়ো একটা কাগজ টেনে নিয়ে স্পাইনেল চিঠি লিখতে বসল। চিঠিটা লেখা হল মিস্টার ক্লোটেরজেনকে।

লিখলে—

তোমাকে আজ আমার এই চিঠি লিখতে হচ্ছে বলে অত্যন্ত দুঃখবোধ করছি—অনেক চেষ্টা করেও আমি তোমাকে এ-চিঠি না লিখে থাকতে পারলাম না। কারণ, তোমার সম্পর্কিত এই ঘটনা দিনরাত আমার শারীরিক যন্ত্রণার মতো মনে হচ্ছে।

আমি তোমাকে আজ একটা কথা বলব। তুমি কি সেই ছোট্ট বাগানটার কথা স্মরণ করতে পার? —তোমার কি মনে পড়ে সেই ঝরণার কথা—যেখানে একদিন সাতটি মেয়ে বসে গান গাইত—সেই অভূতপূর্ব সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত করে, তাদের মধ্যে সব থেকে সুন্দরী যে মেয়েটি, তাকে কি তুমি ডাকাতের মতো ছিনিয়ে নিয়ে আসনি? ছি—ছি—ছি, এ তুমি কি করলে? একটু লজ্জা হল না তোমার—এমন একটি নিটোল সৌন্দর্য—তাকে তুমি ভেঙে ছত্রখান করে দিলে! তাকে নিয়ে এসে তুমি করলে স্ত্রী—দিলে মাতৃত্ব, ফেললে সংসারের নির্মম যন্ত্রে—হত্যা করলে একজন শিল্পীকে? বর্বর তুমি। —চাষার মতো রুচি তোমার! তুমি চাষা, তাই তুমি এরকম করতে পারলে. ছি—ছি—ছি. জানো, আমি তোমাকে আর তোমার ছেলেকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করি—আর সেই কথা জানাবার জন্যেই আজ এই চিঠি লিখলাম—তুমি পশু—তুমি যে কী, তা আমি ভাবতেও পারছি না। —ডেটলিভ স্পাইনেল।

চিঠিটা লিখে স্ট্যাম্প লাগিয়ে নিজেই গিয়ে পোস্ট করে দিয়ে এল সে।

* * *

সন্ধ্যার আগেই মিস্টার ক্লোটেরজেন এসে স্পাইনেলের ঘরে ঢুকল—হাতে তার সেই চিঠি। নমস্কার করে বললে, এ-চিঠি আপনি লিখেছেন?

স্পাইনেল লিখেছিল, বললে, হ্যাঁ!

ও, তা বেশ, কিন্তু দেখুন এটা তো আমাকে হাতেই দিতে পারতেন—আচ্ছা বোকামি তো আপনার! —যাই হোক, আপনি কি বলতে চান বলুন তো?

—যা চাই, তাতো চিঠিতেই আছে।

—হ্যাঁ তা আছে—কিন্তু শোনো, তাঁর গলা গম্ভীর হয়ে উঠল বললে, এর জন্যে তোমাকে আমি রীতিমতো শিক্ষা দিতে চাই জানো—ভীরু, কাপুরুষ কোথাকার, আমার স্ত্রীর ব্যাপারে তোমার এতো মাথা-ব্যথা কেন শুনি?

—একটু সাবধান হয়ে কথা বলবেন। স্পাইনেল বললে।

—সাট্ আপ! রাস্কেল কোথাকার।

কথায় কথায় হঠাৎ প্রায় একটা খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে উঠল।

এমন সময়ে একটা নার্স চীৎকার করতে করতে ছুটে এল। ডাকলে, মিস্টার ক্লোটেরজেন—ক্লোটেরজেন!

—কে?

শীগগির দরজা খুলুন—আপনার স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন—তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে—শীগগির আসুন একবার—

এ্যাঁ—মিস্টার ক্লোটেরজেন মুহূর্তে শাদা হয়ে গেলেন। বললেন, সে কি! চল—চল। কাঁপতে কাঁপতে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

* * *

এর দুদিন পরের ঘটনা। গেব্রিয়েল এখন বেশ ভালোই আছে। স্পাইনেলের সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় একরকম বন্ধ। দেখা হলেও সামান্য দু-একটা কথা ছাড়া আগের মতো সে অন্তরঙ্গতায় নেমে আসত না—কেমন একটা পরিবর্তন এসেছে তার।

সব লক্ষ্য করছিল স্পাইনেল, তবু সে ভেবেছিল, গেব্রিয়েল তাকে বুঝবে—তার এই যে বিক্ষোভ—তাকে সে মন দিয়ে অনুভব করবে।

ম্লান অপরাহ্ণ স্তিমিত হয়ে আসছে। সূর্য ডুবে গেল। জানলার ধারে চুপ করে স্পাইনেল বসেছিল—হঠাৎ দেখলে মিস্টার ক্লোটেরজেন আর গেব্রিয়েল নীচের লনটার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসছে—খুব হাসছে দুজনে—গেব্রিয়েল বাঁ-হাত দিয়ে ক্লোটরজেনের একটা হাত পরম আদরে জড়িয়ে ধরেছে, আর ডান হাত দিয়ে ঠেলছে একটা প্যারাম্বুলেটার—খুসীর আনন্দে তারা যেন ভেসে চলেছে।

মুহূর্তে স্পাইনেলের সমস্ত শরীরে কেমন যেন একটা অবসাদ নামল। ভারী হাস্যকর মনে হল পৃথিবীটাকে—তাড়াতাড়ি টুপী আর ছড়িটা সে তুলে নিলে—তারপরে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল—ওরা হাসতে হাসতে সেই দিকেই এগিয়ে আসছে—গেব্রিয়েল লক্ষ্যও করল না তার দিকে—গল্প করতে করতে তারা চলে গেল।

আর স্পাইনেল কম্পিতবক্ষে বাইরে রাস্তার ওপরে এসে দাঁড়াল—তারপরে চলতে আরম্ভ করল—তারপরে আরও একটু জোরে—তারপরে আরও জোরে।

তার মনের মধ্যে কে যেন তাকে তখন নিরন্তর ধাক্কা দিচ্ছে, চীৎকার করে বলছে, পালাও—পালাও! কাপুরুষ কোথাকার! —আরও জোরে হাঁট, আরও জোরে—কী তোমার দাম পৃথিবীতে? কী তোমার মতের মূল্য? পালাও—পালাও!

দ্রুত পায়ে স্পাইনেল সামনের দিকে হাঁটতে লাগল। পিছনে গম্ভীর দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে রইল স্যানাটোরিয়াম্ ইনফ্রিড!

অস্ত-সূর্যের সোনালী আভায় দূরের পাহাড়গুলি তখন ঝিকমিক করছে!

অনুবাদক—নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

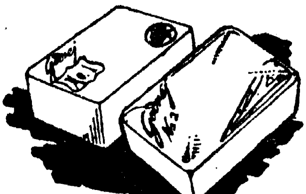
সর্বপ্রকার রুচি অনুযায়ী

Godrej চাবি মার্কা

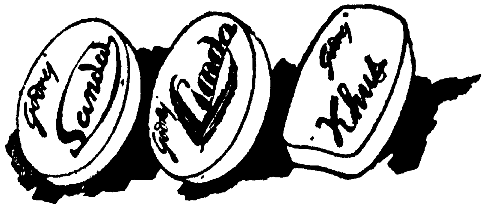
গডরেজের

নানাজাতীয় প্রসাধন সাবান

গডরেজ সর্বপ্রকার রুচিকেই নানাজাতীয় প্রসাধন সাবান দ্বারা প্রয়োজন পূর্ণ ও সন্তুষ্ট করে বলিয়া স্বকীয় গুণে আজ গডরেজের নানা জাতীয় প্রসাধন সাবান জনপ্রিয় ও বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। অঙ্গরাগ ও প্রসাধনী রচনার মধ্য দিয়া অবলুপ্ত প্রায় ভারতীয় রূপচর্চার পদ্ধতি অবলম্বনে বিশুদ্ধ ভারতীয় উপাদানে, ভারতীয় আবেষ্টনে, প্রকৃতির দান "তৈল ও গন্ধসার" দ্বারা জান্তব চর্বি-বর্জিত প্রসাধন সাবান প্রস্তুতি গডরেজই প্রথম প্রবর্তন করেন এবং ইঁহারাই প্রবর্তক হিসাবে প্রথম অনুভব করেন যে, জান্তব চর্বি ছাড়াও শুধু ভারতীয় তৈল ও গন্ধসার দ্বারা শ্রেষ্ঠ প্রসাধন সাবান তৈয়ারি হইতে পারে ও আজ ২৫ বৎসর ধরিয়া অবলুপ্তপ্রায় ভারতীয় রূপচর্চার ধারা সংরক্ষণের সবিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। আজ আমরা গর্বিত যে, আমাদের প্রচেষ্টা এই জান্তব চর্বিবর্জিত স্বদেশী প্রসাধন সাবান গুণে ও গন্ধে, মূল্যের সুলভতায় যে কোনো উচ্চশ্রেণীর বিদেশী সাবান হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ভারতে ও ভারতের বাহিরে বিশেষরূপে প্রশংসিত ও সমাদৃত। এই স্বদেশী মূলধনে, স্বদেশীয় শ্রমে, স্বদেশী ভাবাদর্শে সুনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানটির প্রসাধন সাবান সর্বত্রই আজকাল পাওয়া যায়। আপনারও শ্রেণীবর্ধনে, সর্বরুচি উপযোগী গডরেজের নানা জাতীয় প্রসাধন সাবান ব্যবহার করিয়া প্রকৃত ভারতীয়দের মত, অবলুপ্তপ্রায় প্রাচীন ভারতের বিশেষত্ব পবিত্রতা ও সুশ্রীতার অনুশীলন করুন।



নং ১ নং ২



স্যাণ্ডাল মিমডা খস



টার্কিশ বাথ ফ্যামিলি



'ভাট্নি'



শেভিং 'রাউণ্ড' শেভিং ষ্টিক

গডরেজ্ সোপস, লিমিটেড—কলিকাতা (১০২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট); পাটনা (ষ্টেশন রোড)।

আমরা পুরাণে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল পাতাল প্রভৃতি সপ্তপাতালের কথা শুনিয়াছি। বর্তমান যুগে বাঙলায় "চোরাবাজার" নামে একটি অষ্টম পাতাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাহির হইতে প্রেরিত বস্ত্র বাঙলার মাটির সংস্পর্শে আসিয়াই সেই নূতন পাতালে আত্মগোপন করিয়া ফেলিতেছে। দ্রৌপদীর লজ্জাহারী মধুসূদন ছাড়া এই মহাগহ্বর হইতে বস্ত্র উদ্ধার করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। সুতরাং অশ্রু-অন্ধ নয়নে তাঁহারই অনুগ্রহ কামনা করা ছাড়া আর গতি নাই। মহাভারতের কাহিনীতে যাঁদের বিশ্বাস নাই—তাঁরা "নীলাম্বরে কি বা কাজ" বলিয়া রাস্তায় বাহির হইতে পারেন। অবশ্য মুনাফা-খোররূপী কীচক তাহাতে জব্দ হইবেন বলিয়া আশা করার কোন কারণ নাই।

* * * * *

বাঙলা সরকার কলিকাতা কর্পোরেশনকে নগরবাসীর সুবিধার জন্য কতকগুলি বিধি ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়াছেন এবং সেই নির্দেশ প্রতিপালিত না হইলে অবিলম্বে কর্পোরেশনের কর্মভার ছিনাইয়া লইবার হুমকি দিয়াছেন। এই হুমকি কার্যে পরিণত হইলে কাহার কি সুবিধা অসুবিধা হইবে সেই বিচার করা আমাদের পক্ষে শক্ত। তবে নাগরিকদের তরফ হইতে বলা যায় যে, তাঁহাদের এই রদবদলে কোনই লাভ ক্ষতি নাই। তাঁহারা কর্পোরেশনের রামের হাতে না মরিয়া—সরকারী রাবণের হাতে মরিবেন মাত্র!

* * * * *

কিন্তু একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে? মহামান্য নিজাম বাহাদুরের সঙ্গে লর্ড ওয়াভেলের সাক্ষাৎকারের সময়



আলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে নাকি জানা গিয়াছে যে, নিজাম বাহাদুর পাকিস্থান পরিকল্পনার বিরোধী। আমরা এতই হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছি যে "কংগ্রেসের শো-বয় নিজাম বাহাদুর" শীর্ষক লীগ-দলীয়ের প্রচার পুস্তিকা হাতে-না-আসা পর্যন্ত কোন রকম টীকাটীপ্পনী করিতেই ভরসা পাইতেছি না।

* * *

ট্রামে-বাসে

প্রচার প্রসঙ্গে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর কথা মনে পড়িয়া গেল। শ্রীমতী এক শহর হইতে অন্য শহরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাজার হাজার শ্রোতার সম্মুখে ভারতের প্রসঙ্গ নিয়া বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন—এই দৃশ্যটি নাকি রীতিমত একটি "Menace" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কথাটা বলিয়াছেন 'ডেইলি মেলের' সংবাদদাতা। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই বক্তৃতায় ইঙ্গ-আমেরিকান সম্বন্ধে



নাকি শিথিল হইবার আশঙ্কা আছে। চোরাবালির উপর ঘর বাঁধিলে সেই ঘর টিকিতে পারে না। কিন্তু আমরা ভাবিতেছি অন্য কথা। "ডেইলি মেলের" সংবাদটার উপরই ফলাও করিয়া কাগজে কাগজে টীকা টীপ্পনী করা হইল। কিন্তু লীগদলীয় কাগজ কলিকাতার Morning Newsও যে দস্তুরমত Daily Mail-এর মতই আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। একটি জোরালো সম্পাদকীয়তে আমেরিকায় কংগ্রেসের এই অপপ্রচারের পাল্টা জবাব দেবার জন্য লীগপক্ষ হইতে উপযুক্ত প্রচারক প্রেরণের পরামর্শ Morning Newsও দিয়াছেন। উপযুক্ত লোকের অভাব লীগদলে নাই। তবু যদিও অভাব হয় তাহা হইলে আমরা Mr. Beverly Nicholsকে এই কার্যভার গ্রহণের অনুরোধ জানাইতে পরামর্শ দিতেছি। কায়েদে আজমের অনুরোধ হয়ত তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না!

* * *

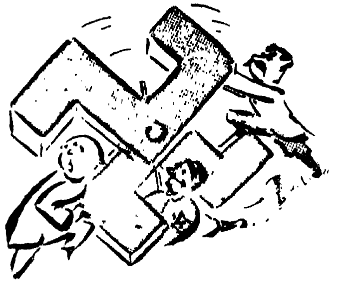
আজাদ' ব্যবস্থা পরিষদে 'বিরোধীদলের পৃষ্ঠপ্রদর্শন' নাম দিয়া সম্পাদকীয় লিখিয়াছেন। আমরা আজাদের সঙ্গে একমত, কেন না কার্যকালে দেখা গেল—এই পৃষ্ঠপ্রদর্শনকে সরকার পক্ষীয়েরা অবলীলাক্রমে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্যয়বরাদ্দের আলোচনার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন নাই তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া গেল। Wodehouse-এর ভাষায় yesser ব্যাপারটা 'yes' করিয়াছেন আর Nodder করিয়াছেন Nod সুতরাং কোটি কোটি টাকার বাজেট চোখের পলকে পাশ হইয়া গেল। সরকারী লোক বিরোধী দলের মত হস্তীমূর্খ নয়। বিষয়বস্তু যত জটিলই হউক না কেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁদের এক মুহূর্তের বেশি সময় লাগে না।

* * *

আলোচনা শুনিয়া বিশু খুড়ো বলিলেন —"নিকুচি করেছে জার্মানীর! খবর হলো সাতক্ষীরার জামাতাজীবনের। তিনি গুন্ডার সাহায্যে শ্বশুরবাড়ী থেকে বউ আনতে গিয়ে মার খেয়ে ফিরে এসেছেন। বউ কিছুতেই পতি-দেবতার সঙ্গে ফিরে যেতে রাজী নয়।" খুড়ো আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে খুড়োর মনোভাবের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেই বলিলেন—"এ দুটো কি এক হলো রে? কোথায় তোদের কাকীমা—আর কোথায় কোন অজ পাড়াগাঁয়ের কোন মেয়ে? ভাবিতেছি এমনি করিয়াই বুঝি আমরা রাও কমিটিতে সাক্ষ্য দিয়া আসিলাম!"

* * *

ব্রিটেনের জয়যাত্রা বন্ধ করিবার জন্য জার্মানী তার নিজের নাক কাটিয়া ফেলিবেন। রিবেনট্রপ একটি সাংবাদিক সম্মেলনে নাকি বলিয়াছেন যে, তাঁরা রাশিয়াকে পূর্ব দ্বার ছাড়িয়া দিবে কিন্তু পশ্চিম দ্বারে বৃটেনকে ঠেকাইতে



প্রাণপণ যুদ্ধ করিবেন। রাশিয়ার প্রাধান্যে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন অপদস্থ হইবে। নাক-কাটার এই অভিনব, অস্ত্রই বোধ হয় জার্মানীর "V"-Z অস্ত্র! কিন্তু আমরা ভাবিতেছি খাঁটি আর্য সন্তান হইয়া তাঁরা শুধু পূর্ব আর পশ্চিম দ্বারের কথাই ভাবিলেন? দক্ষিণ দ্বারের অধিপতি যমের কথা কি একবারও মনে পড়িল না? একেই বলে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি!

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

মানুষের পরমায়ু আগেকার যুগে
ছিল, আজকালকার যুগে কম
ওয়া উচিতই বা কত? অবশ্য
হিসেবেই এটা বলা যেতে
ন্ম আর ব্যক্তিগত জীবন
্রত্যেকের পরমায়ু স্বতন্ত্র
বে অন্যান্য জীবের সম
ম্বন্ধেও তেমনি প
মোটামুটি একটি
কিন্তু এখন যেমন
আছে, আগেকার য
আগেকার দিনের
বলা চলে না।
দিনে মানুষ
এখনকার যুগে
কমে যাচ্ছে
দ্রান্ত। শ
খুব বে
জোর ক
কেবল ক
পারি।
তেমন স
অন্যান্য
রীতিতে
দেখা
আমে
শতাব্দ
গড়পড়
এক
মাত্র
ঊনবি
গেছে
গড়ে
৪৭
মধ্যে
দেখা
৫৯
যতদি
বেড়ে
শ
আমে
তাদের
জন
জন ব
২৫০০
অর্থাৎ

নীচে. তার
ার স্থানে
র আত্ম-
ার৲ হার
লাখে
৪।
ব

বেঁচে থাকার মেয়াদ আছে, ততদিন পর্যন্তই আনন্দ পাবে। জীবনের প্রত্যেক বয়সেরই যেমন একটা নিজস্ব আনন্দ আছে, বৃদ্ধ বয়সেরও তেমনি একটা স্বতন্ত্র রকমের আনন্দ আছে। যেমন ছেলেবেলায় খেলা-ধুলার নির্বোধ আনন্দ, কৈশোরে স্কুলে যাবার ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হুটোপুটি করার নির্মল আনন্দ, যৌবনে বিবাহাদির আমানুষিক মত্ততার আনন্দ, মধ্য-বয়সে র্মকুশলতা ও সন্তান পালন করবার সতেজ ন্দ, তেমনি শেষ বয়সের জন্যও কিছু অতীত আনন্দের স্মৃতি নিয়ে অবসরের সময় বিমল আনন্দেই ীপ যখন স্তিমিত হয়ে আসে, হতে মনের সমস্ত পারি-ন্ত হয়ে ওঠে; জীবনের তখন এক বিশেষ রূপে তখন অতীত, বর্তমান া ও নির্লিপ্ত চোখে ায়; মৃত্যু আসন্ন ় না। তাছাড়া, শেষ ছ, সারা জীবনের াশ করার কাজ, থেকে কিছু ফল ানুষ যে কোন হয়ে অকর্মণ্য প্রায় নয়।

বর

ঃসারী

রিচালক ঘোষণা (বায়ু া পুরা পি-৮০ ় রকম া গতি লারের বিমান ভাবিত ঃ ইহা তেছে। ইহা রিতে, সহজ। যখানে প-৮০ মনিট। (ধূম-ী নল-। উহা বিমান ব্যবহৃত বার মত

জীবনের ঝরাপাতা

শ্রীসরলা দেবী চৌধুরাণী

[১৭]

দ্বিতীয় পর্যায়

রুদ্রবীণ

বড়মামার হতে আরম্ভে রবিমামা ভারতীর যে বীণাকে আবাহন করলেন—

শুধাই ঐ গো ভারতী তোমায়
তোমার ও বীণা নীরব কেন ?
ভারতের এই গগন ভরিয়া
ও বীণা আর না বাজে না কেন ?

তার প্রায় পঁচিশোর্ধ কয়েক বৎসর পরে দাক্ষিণাত্য থেকে ফেরা আমার অঙ্গুলির প্রথম সঞ্চালনে ভারতীর সেই বীণা রুদ্রবীণ হয়ে বেজে উঠল। শঙ্করের ভেরী নাদিত করে লেখনী আমার বাঙালীকে 'মৃত্যু-চর্চায়' আহ্বান করলে। এবার আমার হাতের প্রথম প্রবন্ধই হল তাই। সেই আমার বীণের প্রথম ঝঙ্কার। যে বাঙালী পৈতৃক প্রাণটি বাঁচিয়ে রাখতেই সদা তৎপর, বীণা তাদের ডেকে বললে,—মৃত্যুকে যেচে বরণ করতে শেখ, অগত্যা তার কবলিত হয়ো না। তাকে স্পর্ধা কর, তার সম্মুখীন হও—খেলায় ধূলায়, আমোদে প্রমোদে, শিকারে বিহারে, বিজ্ঞানে সজ্ঞানে, প্লেগে জনসেবায়, আগুনে লোক-উদ্ধারে, জলেতে আত্ম-প্রাণপণে পরপ্রাণ রক্ষায়। ভূগোল শেখ ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণে—মানচিত্রে অঙ্গুলি সঞ্চারণে নয়। পাড়ি দাও সমুদ্রে, চলে যাও সাহারার মরুতে, চড় তুঙ্গে এভারেস্টের শৃঙ্গে,—সেকালের ভারতীয় সন্ন্যাসী পর্যটকদের লোটা-কম্বল মাত্র সহায় হয়ে কিংবা একালের শ্বেতপুঙ্গবদের অনেক তোড়জোড়ের মধ্যে প্রধান যেটি সেইটি সম্বল করে—সুস্থ ও সবল শরীর। মানুষের সব চেয়ে বড় পুঁজি সেইটি—বলিষ্ঠ ও সুসুস্থ শরীর। সে জন্যে চাই বাঙালীর ভারতের অন্যান্য জাতির মত নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চা। এই হল আমার রুদ্রবীণের দ্বিতীয় ঝঙ্কার।

দ্বিপুদাদার মেজভাই, অরুদাদা উর্দু-নবীশ ছিলেন। হিন্দুস্থানী বেশ বলতেন, আর উর্দু বইও পড়তেন উচ্চারণে ঠিক জোরদার দিয়ে। কুস্তি প্রভৃতি কসরতের দ্বারা প্রথম যৌবনে শরীরটাও বেশ কায়দায় রেখেছিলেন। তিনি দু-একবার বম্বে অঞ্চলে যান মেজমামার কাছে। গল্প করতেন বম্বে থেকে ফেরার পথে গাড়ি যখন পশ্চিম ও বেহারের স্টেশনে স্টেশনে থাকত, জোর গম্ভীর গলায় কুলিরা স্টেশনের নাম হাঁকত—জব্বল-পো-র, ইলাহা-বা-দ, বক্স-র পট-না-া-া !—

রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় পেয়ে উঠতে হত, বুঝি ডাকাত পড়েছে। আর গাড়ি যেমন বাঙলায় পেঁছিল, মিহিগলায় টক করে একটুখানি আওয়াজ বেরল—'কনু জংশন !' 'বদ্ধোমান !' আর যারা ডাকছে তারা দেখতে এমন ক্ষীণজীবী—যেন একটা টোকা মারলেই এখনি পড়ে যাবে। অরু-দাদার বর্ণনা যে খাঁটি সত্য, তা বিদেশ থেকে প্রত্যাগমনকালে আমাদের সকলেরই অনুভব হত। বাঙালী কুলিরাও মানুষ, আর পশ্চিমের কুলিরাও মানুষ—কিন্তু দেখতে কত তফাৎ ! এবার এই ভোজপুরী মরাঠি পাঞ্জাবি সকলের সঙ্গে বাঙালীর চেহারাগত দৌর্বল্যের পাহাড়কে সমভূম করে দিতে হবে—এইতে পড়ল আমার প্রথম দৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে চোখে লাগল শুধু শরীরগত দৌর্বল্য হটালে হবে না বাঙালীর মন থেকে ভীরুতা অপসারিত করতে হবে। দেখা যায়, পশ্চিম ও পাঞ্জাবের বড় বড় পালোয়ানেরাও সাহেব-ভীতিতে ভরা। এই সাদা চামড়ার ভয় সরাতে হবে।

তাই ডমরুতে একটা ঘা দিয়ে রুদ্রের বীণা বাজল তৃতীয় তারে ঝঙ্কার দিয়ে আমার হাতে—'বিলিতি ঘুষি বনাম দেশী কিল' এই রাগে। ভারতীর পৃষ্ঠায় আমন্ত্রণ করলুম—রেলেতে স্টীমারে, পথে-ঘাটে, যেখানে সেখানে গোরা-সৈনিক বা সিভিলিয়ানদের হাতে স্ত্রী, ভগ্নী, কন্যা বা নিজের অপমানে মুহ্যমান হয়ে আদালতে নালিশের আশ্রয় না নিয়ে—অপমানিত ক্ষুব্ধ মানী ব্যক্তি স্বহস্তে তখনি তখনি অপমানের প্রতিকার নিয়েছে—সেই সকল ইতিবৃত্তের ধারাবাহিক বর্ণনা পাঠাতে। তাঁরা পাঠালেন ও তাঁদের ইতিবৃত্ত ভারতীতে বেরতে থাকল। পাঠকমণ্ডলীর মনে, লুকান আগুন ধুঁকিয়ে ধুঁকিয়ে জ্বলে উঠল প্রবল তেজে। কোথা দিয়ে কোন্ হাওয়া বইছে, হঠাৎ যেন কেউ ঠাহর করে উঠতে পারে না। যে সাহিত্যের আঙ্গিনা ছিল কোমল আস্তরণ পাতা কমলালয়া সরস্বতীর নিকুঞ্জ, তা হল শ্মশানবাসী রুদ্রের ভীম নর্তনভূমি, আর তার তালে তালে সকলের পা আপনিই পড়ছে—ইচ্ছ করুক আর না করুক। দলে দলে স্কুল-কলেজের ছেলেরা আমার সঙ্গে দেখা করতে আরম্ভ করলে—বয়স্কেরাও পিছিয়ে রইলেন না—অনেকেই, যাঁরা পরে নামজাদা হয়েছিলেন। আমি তাঁদের থেকে বেছে বেছে একটি অন্তরঙ্গ দল গঠন করলুম। ভারতবর্ষের একখানি মানচিত্র তাদের সামনে রেখে সেটিকে প্রণাম করিয়ে শপথ করাতুম তনু মন ধন দিয়ে এই ভারতের সেবা করবে। শেষে তাদের হাতে একটি রাখি বেঁধে দিতুম, তাদের আত্ম-নিবেদনের সাক্ষী বা Badge। হুমায়ুন যেমন এক রাজপুত কন্যার রাখি গ্রহণ করে তার হয়ে বিপদ বরণ স্বীকার করেছিলেন, ছেলেদের তেমনি আমার হাতে এ রাখি-গ্রহণ মাতৃভূমির সেবা গ্রহণের জন্যে বিপদ বরণের স্বীকৃতি। আমার রাখি-বাঁধা দলটি একটি গুপ্ত সমিতি নয়; তবু সংকল্প মনে মনে রাখলেই উদ্যাপনের দৃঢ়তা হয় বলে মুখে মুখে রটান বারণ ছিল।

তত্রাচ নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের কাছে খবরটা পেঁছিল। তিনি রঙ্গরসে, আমোদে কৌতুকে অনেককে টানতেন।

আশু চৌধুরীর আমার প্রতি ভারি স্নেহ ও শ্রদ্ধা। তিনি আমায় একদিন বললেন—'সরলা সাবধান হয়ো। নাটোরের বৈঠকে

বলাবলি চলছে—সরলা দেবী দেশের ছেলেদের বীর করে তুলবেন বলে তাদের হাতে একটা করে লাল সুতো বেঁধে বেঁধে দিচ্ছেন। এতে পুলিশের কান খাড়া হচ্ছে।'

বছর কত পরে বঙ্গবিভঙ্গের দিনে এই লাল সুতোর রাখিবন্ধন দেশময় ছড়াল—রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে নাটোরও তাতে বাঁধা পড়লেন।

যেসব ছেলেরা তখন আমার কাছে আসত তার মধ্যে মণিলাল গাঙ্গুলী বলে একটি ছেলে ছিল। সে Dawn পত্রিকার সম্পাদক সতীশ মুখুয্যের ভাগিনেয়। সতীশবাবুও মাঝে মাঝে এসেছেন। মণিলালের সাহিত্যের দিকে একটু ঝোঁক ছিল। তার পরিচালিত একটা সাহিত্য সমিতি ছিল ভবানীপুরের ছেলেদের। সে একদিন আমায় অনুরোধ করলে তাদের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিন আসছে আমি যেন তাতে সভানেতৃত্ব করি। যদিও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে এসেছি—কিন্তু কলকাতা সহরে ছেলেদের সভায় উপস্থিত হওয়া ও সভানেতৃত্ব করা তখন আমার কল্পনার বাইরে। আমি ইতস্ততঃ করতে লাগলুম। সে আবার পীড়াপীড়ি করাতে আমি একটু ভেবে তাকে বললুম—'আচ্ছা, তোমাদের সভায় সভানেত্রীত্ব করতে যাব—এটাকে যদি তোমাদের সাহিত্যালোচনার সাম্বৎসরিক না করে সেদিন তোমাদের সভা থেকে 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' কর, আর দিনটা আরও পিছিয়ে ১লা বৈশাখে ফেল, যেদিন প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। সভায় কোন বক্তৃতাদি রেখ না। সমস্ত কলকাতা ঘুরে খুঁজে বের কর কোথায় কোন্ বাঙালী ছেলে কুস্তি জানে, তলোয়ার খেলতে পারে, বক্সিং করে, লাঠি চালায়। তাদের খেলার প্রদর্শনী কর—আর আমি তাদের এক-একটি বিষয়ে এক-একটি মেডেল দেব। একটিমাত্র প্রবন্ধ পাঠ হবে—সে তোমাদের সাহিত্য-সভার সাম্বৎসরিক রিপোর্ট নয়—প্রতাপাদিত্যের জীবনী। বই আনাও—পড় তাঁর জীবনী, তার সার শোনাও সভায়।'

মণিলাল রাজি হল। তলোয়ার খেলা দেখানর জন্যে তাদের পাড়ার বাঙালী হয়ে-যাওয়া রাজপুত ছেলে হরদয়ালকে যোগাড় করলে, কুস্তির জন্যে মসজিদবাড়ির গুহ-দের ছেলেরা এল, বক্সিংয়ের জন্যে ভূপেন বসুর ভাইপো শৈলেন বসুর দলবল এবং লাঠির জন্যে দু-চারজন লোক কোথা হতে সংগ্রহ হল। আমি যেভাবে বলেছিলুম, সেইভাবে সভার কার্যক্রম পরিচালিত হল। কেবল আরম্ভে মণিলালের অনুরোধে আমাকে দিয়ে প্রতাপাদিত্যের একটি উদ্বোধনের দ্বারা সভার 'atmosphere' তৈরি করে দেওয়া হল। তারপরে মণিলাল-লিখিত তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠের পরই নানা রকম খেলাধুলো চলল ও শেষে আমার হাতে মেডেল বিতরণ। সেই মেডেলের একদিকে খোদা ছিল—"দেবাঃ দুর্বলঘাতকাঃ"

সভায় কলকাতার সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা প্রায় সবাই উপস্থিত ছিলেন। 'সঞ্জীবনী' লিখলেন—'কলিকাতার বুকের উপর যুবক-সভায় একটি মহিলা সভানেত্রীত্ব করিতেছেন দেখিয়া ধন্য হইলাম।' 'বঙ্গবাসী'র লেখার সার,—'মরি মরি কি দেখিলাম! এ কি সভা! বক্তিমে নয়, টেবিল চাপড়া-চাপড়ি নয়—শুধু বঙ্গবীরের স্মৃতি আবাহন, বঙ্গ-যুবকদের কঠিন হস্তে অস্ত্রধারণ ও তাদের নেত্রী এক বঙ্গললনা—ব্রাহ্মণ কুমারীর সুকোমল হস্তে পুরস্কার বিতরণ। দেবী দশভুজা কি আজ সশরীরে অবতীর্ণা হইলেন? ব্রাহ্মণের ঘরে কন্যা জাগিয়াছে, বঙ্গের গৌরবের দিন ফিরিয়াছে।'

বিপিন পাল তাঁর Young India-তে টিপ্পনী করলেন—

"As Necessity is the Mother of Invention, Sarala Devi is the mother of Pratapaditya to meet the necessity of a Hero for Bengal"!

দেশের লোকে এ টিপ্পনীতে ভড়কালে না। বাঙালীর নিবিড়তম মর্মদেশে প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ হল। তার প্রথম বহির্বিকাশ দেখা দিলে প্রোফেসর ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদের প্রতাপাদিত্য নাটক রচনায় ও স্টার থিয়েটারে রাতের পর রাত তার অভিনয় পরিচালনায়। দেখাদেখি রেষারেষি মিনার্ভায় অমর দত্তের 'প্রতাপাদিত্য'রও আবির্ভাব হল।

তীর এসে বিঁধল আমার বুকে রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে—সাক্ষাতে নয়, দীনেশ সেনের মারফতে। দীনেশ সেন একদিন তাঁর দূত হয়ে এসে আমায় বললেন—'আপনার মামা ভীষণ চটে গেছেন আপনার উপর।'

'কেন?'

'আপনি তাঁর 'বৌঠাকরাণীর হাটে' চিত্রিত প্রতাপাদিত্যের ঘৃণ্যতা অপলাপ করে আর এক প্রতাপাদিত্যকে দেশের মনে আধিপত্য করাচ্ছেন। তাঁর মতে, প্রতাপাদিত্য কখন কোন জাতির Hero-worship-এর যোগ্য হতে পারে না।'

আমি দীনেশবাবুকে বললুম—'আপনি তাঁকে বলবেন, আমি ত প্রতাপাদিত্যকে moral মানুষের আদর্শ বলে খাড়া করতে যাইনি—তাঁর পিতৃব্য-হনন প্রভৃতির সমর্থন করিনি। তিনি যে Politically Great ছিলেন, বাঙলার শিবাজী ছিলেন, মোগল-বাদশার বিরুদ্ধে একলা এক হিন্দু জমিদার খাড়া হয়ে বাঙলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, নিজের নামের শিক্কা চালিয়েছিলেন—সেই পৌরুষ, সেই সাহসিকতার হিসেবে তিনি যে গৌরবার্হ, তাই প্রতিষ্ঠা করেছি। এতে যদি ইতিহাস-গত কোন ভুল থাকে তিনি সংশোধন করে দিন, আমি মাথা পেতে স্বীকার করে নেব।'

এর উত্তর নিয়ে দীনেশ সেন আর পুনরাগমন করেন নি। বাঙালীর বীরপুজা চলতে থাকল। অতঃপর আমি 'বঙ্গের বীর' সীরিজের ছোট ছোট পুস্তকাবলী বের করতে আরম্ভ করলুম। এবার প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্যের উৎসবের আয়োজন করলুম। সেকালে সুরেন বাঁড়ুজ্যের 'Bengalee' বাঙালী পরিচালিত মুখ্য ইংরেজি পত্র। 'Bengalee'তে খুব উৎসাহের সঙ্গে আমার আয়োজিত সব অনুষ্ঠানের রিপোর্ট বেরতে লাগল। উদয়াদিত্য-উৎসবের ঘোষণায় বেঙ্গলি এইভাবে লিখলেন—'সরলা দেবী দেশের উপর নতুন নতুন 'surprise spring' করছেন—আমরা তাঁর সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে হাঁফিয়ে পড়ছি। রোজ ভোরে উঠে মনে হয়—অতঃ কিম্?"

নজর পড়েছিল আমার যে রাজপুত বীর-বালক বাদল প্রভৃতির কীর্তি পড়ে আমরা বাঙালীরা অভিভূত হই, তাদের গৌরবে গৌরবানুভব করি, কবিতা বানাই, কিন্তু বাঙালীর ঘরের ছেলে উদয়াদিত্য যে মোগলদের বিরুদ্ধে বাঙালীর স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টায় সম্মুখ-সমরে দেহপাত করেছিলেন—তার খবর কিছুই রাখিনে। তার স্মৃতি বাঙালী যুবকের ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত করে দেওয়ার দরকার। আমার কাছে তখন যেসব ছেলেরা আনা-গোনা করতেন, তার মধ্যে অনেক বি-এ, এম-এ ছিলেন, কলেজের প্রোফেসরও ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র সেন তার মধ্যে একটি। ইনিই উদয়াদিত্য-উৎসব সম্পাদনের ভার নিলেন। আমি ইণ্ডিয়ান মিররের এডিটর ও এলবার্ট হলের অন্যতম ট্রাস্টী বন্ধ নরেন্দ্রনাথ সেনকে লিখে, টাকা পাঠিয়ে হল ভাড়া করিয়ে দিলুম উৎসবের জন্যে। উদয়াদিত্যের কোন ছবি ত নেই। উৎসব-গৃহে তাঁর পরিচায়ক কি থাকতে পারে? ভেবে দেখলুম ক্ষত্রিয় বীরের আত্মার প্রতিরূপ তাঁর তরবারি। সুতরাং একখানি তরবারি স্টেজের উপর থাকবে,—সভাসীনেরা উদয়াদিত্যকে স্মরণ করে তাতেই পুষ্পাঞ্জলি দেবে। সব আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে, একজন হিন্দুস্থানী জমিদারের কাছ থেকে হীরা-জহরতের হাণ্ডিলওয়ালা সুন্দর ঝকঝকে একটি তলোয়ার যোগাড় হয়েছে, ক্ষীরোদ বিদ্যা-বিনোদ প্রেসিডেণ্টের আসন গ্রহণ করবেন স্থির হয়েছে, হ্যাণ্ডবিল প্রচুরভাবে ছড়ান হয়েছে, বিকেল চারটেতে মিটিং, আয়োজন-কারীরা বেলা দশটা থেকে সেখানে মোতায়েন—এমন সময় ঠিক বারটার সময় দৌড়তে দৌড়তে শ্রীশবাবু বালিগঞ্জে এসে

হাজির—তখন আমরা কাশিয়াবাগান থেকে বালিগঞ্জে উঠে এসেছি। এসে বললেন—'নরেন সেন লোকের হাতে চিঠি পাঠিয়েছেন এলবার্ট হলে মিটিং হতে পারবে না। কারণ, তিনি শুনেছেন, ছেলেরা নাকি তলোয়ার পুজো করবে। এসব ভয়াবহ রাজবিদ্রোহাত্মক কাজ—তাতে তিনি অনুমতি দিতে পারেন না।'

আমি শ্রীশবাবুকে বললুম—'যত টাকাই লাগুক, অন্য কোন স্থান, কোন থিয়েটারের স্টেজ হোক, যাই হোক, ভাড়া করে হাতে রাখুন। আমি ইতিমধ্যে নরেনবাবুকেও চিঠি লিখে দেখছি ফের এলবার্ট হলেই করাতে পারি কিনা।'

আমি বন্ধকে লিখলুম—'আপনি পরম হিন্দু—ভাল করেই জানেন হিন্দুর পুজো তিন রকমে হয়—ঘটে পটে ও খজ্ঞে। পটের অভাবে এক বীর ক্ষত্রিয়ের আত্মার প্রতিনিধি-স্বরূপে বাঙালী ছেলেরা খজ্ঞে তাঁর পুজোর আয়োজন করেছে—এক হিন্দুস্থানী রাজা খুশী হয়ে সেজন্যে নিজের তলোয়ার তাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। আজ আপনি তাদের এ-পুজো যদি বন্ধ করেন, সংবাদপত্রের সূত্রে সমস্ত ভারতবর্ষে ঢিঢি পড়ে যাবে সবাই বলবে বাঙালী যুবকেরা খড়্গপুজো করতে চেয়েছিল, একজন নেতৃস্থানীয় বাঙালী বৃদ্ধ হিন্দু তাতে বাধা দিয়েছেন, তাঁর অতিমাত্রার রাজভক্তি তাতে রাজ-দ্রোহিতার গন্ধ পেয়ে থরহরি কম্পমান হয়েছে, তাঁর তথাকথিত হিন্দুত্বের পরীক্ষায় আজ তিনি সম্পূর্ণভাবে fail করেছেন।

এই ত একদিকে দেশের লোকের ধিক্কার—আর একদিকে মামলায় ফেঁসে যাবেন। আপনি উদয়াদিত্য-উৎসব হবে জেনে-শুনে আজ চারদিন থেকে টাকা গ্রহণ করে Albert Hall ভাড়া দিয়েছেন। টাকা এখনও ফেরাননি। এ অবস্থায় হঠাৎ শেষ মুহূর্তে ছেলেদের উৎসব বন্ধ করলে তারা আপনার নামে ক্ষতিপূরণের মকদ্দমা আনতে পারে। আইনতঃ আপনি দায়ী। অতএব সব দিক থেকেই আপনার পক্ষে বিজ্ঞোচিত কাজ হবে ছেলেদের উৎসব এখানে হতে দেওয়া।"

বৃদ্ধ আমার চিঠি পেয়ে লিখলেন—"তবে তাই হোক। ছেলেরা উৎসব করুক। কিন্তু এর জন্যে সব দায়িত্ব আপনার।" নিজের স্কন্ধের দৌর্বল্য স্বীকার করে তাঁর কন্যাসমা দেশের এক বালিকার স্কন্ধে দায়িত্বর বোঝা চাপিয়ে বৃদ্ধ হাত ধুয়ে বসলেন। ইতিমধ্যে আমার কাছে খবর এসে গেছে যে, শ্রীশবাবু দ্বিগুণ টাকা স্বীকার করে হ্যারিসন রোডের উপর এলবার্ট হলের অতি সন্নিকটেই এলফ্রেড থিয়েটারের স্টেজ ভাড়া নিয়েছেন। আমার কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে গেল তাঁর দূত এসে। থিয়েটারের মাড়োয়ারী স্বত্বাধি-কারীকে তাঁরা খুলে বলেছিলেন—"আমরা তলোয়ার পুজো করব জেনে রেখো।" মাড়োয়ারী বললে—"আপনারা পুজো করেন নাচেন, কুঁদেন সে আপনারা জানেন। আমার কি? আমার ভাড়া পাওয়া নিয়ে কথা, সেটা হাতে হাতে পেলেই হল।" হাতে হাতেই পেলে। তারপর শ্রীশবাবুর কাছে যখন নরেন সেনের স্বীকৃতি পত্র পাঠালুম তখন আর তাঁরা এলবার্ট হলে ফিরে যেতে রাজী হলেন না। সভা এলফ্রেড থিয়েটারেই হল। এলবার্ট হলের সামনে ভলান্টিয়ার রেখে দেওয়া হল—হ্যান্ডবিল অনুসারে সেখানে যেমন যেমন লোক সমাগত হয় তাদের এলফ্রেড থিয়েটারে পাঠান হয়।

উদয়াদিত্যের উদ্বোধন প্রথমে কৃত হল প্রেসিডেন্টের দ্বারা আমার পাঠান লেখা পড়ে', আমি নিজে যাইনি। তারপর ক্ষীরোদবাবুর অভিভাষণ হল, সব শেষে তলোয়ারের সম্মুখে পুষ্পাঞ্জলি। ক্ষীরোদ-বাবুর অভিভাষণের সারমর্ম ছিল—মৎস্য পুরাণের সেই কাহিনী যাতে ঋষির হাতে আসা একটি ক্ষুদ্র কূপের মীনকে ঋষি এক সরোবরে ফেলে দিতে তার সরোবরব্যাপী বৃহৎ কায়া হল। সেখান থেকে তুলে সমুদ্রে ফেলতে তার কায়া বর্ধিত হতে হতে সে অনন্তব্যাপী হল। তখন ঋষির হাতে পড়া ক্ষুদ্র কূপের সেই ছোট্ট মৎস্যটি বলেন—"আমায় দেখ, আমি অনন্ত।" ক্ষীরোদবাবু ভবিষ্যতে দৃষ্টি বিস্তার করে বললেন—"আজকের এই ক্ষুদ্র উৎসবের পরিকল্পনা-রূপী মৎস্যটি একদিন সমগ্র বাঙালী জাতির মধ্যে কায়াবিস্তার করে বাঙালীকে বীরত্বে বিপুল করে পরিদৃশ্যমান হবে।" তাঁর সে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সত্য হয়েছে কি না, আমার সাধনা সিদ্ধ হয়েছে কি না দেশ তার পরিচয় পেয়েছে।

বাঙলার বাইরে এক বছর থেকে মহারাষ্ট্রীয় ও দাক্ষিণাত্যের লোকেদের সংস্পর্শে এসে আমার স্বদেশপ্রীতির পরিধিটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছিল। শঙ্করাচার্য যে ভারতবর্ষকে উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম এই চতুর্দিকে চারটি ধামের বা তীর্থক্ষেত্রের বন্ধনীতে ঐক্যডোরে বেঁধেছিলেন সেই ভারতবর্ষ আমার বুকে আধিপত্য স্থাপন করেছিল। সেই সমগ্র ভারতের উপলব্ধিময় হয়েছিলুম—বঙ্গ যার পূর্ব প্রান্ত। বাঙলাকে বাকী প্রান্তগুলির সঙ্গে সমান লাইনে মাথা খাড়া করে দাঁড় করাতে হবে বটে, কিন্তু বাকী প্রান্তগুলিকে ভুললে চলবে না। তাই ওয়াকার প্রেসিডেন্টশিপে সেবার বিডন স্ট্রীটে যখন কংগ্রেস বসল তাতে গাওয়ার জন্যে আমার সমস্ত সত্তা মন্থন করে গান বেরল—

অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী
গাও আজি হিন্দুস্থান!

এর নতুনত্ব সকলেরই হৃদয়স্পর্শী হল। রবীন্দ্রনাথ নিজে এর সমজদার হয়ে গাওয়ানর ভার নিলেন। সেবার কংগ্রেসে প্যান্ডালের বাইরে ও ভিতরে সব শুদ্ধ তিনশ ভলান্টিয়ার ছিল। সুরেন বাঁড়ুয্যের বক্তৃতা যেদিন বিকেলে হবে সেদিন প্যান্ডালের বাইরের ভলান্টিয়াররা তাদের পোস্ট ছেড়ে নিয়ম ও শাসন ভঙ্গ করে সুরেন বাঁড়ুয্যের বাগ্মিতার ধারা শোনার আগ্রহে ভিতরে হুড়মুড় করে ঢুকে Visitors' Seats দখল করে বসে পড়ল। দিবাবসানে ভুপেন বোস তাদের একত্র করে এজন্যে খুব ধমক দিলেন। তারা চটে সবাই মিলে বিদ্রোহী হয়ে বললে—আগামী কালকের অধিবেশনে তারা কেউ আর ভলান্টিয়ারী করতে আসবে না। সেই সময় কেন জানিনে ভুপেন বসু আমায় ডেকে বললেন—"তুমি এদের একটু বুঝিয়ে বল।"

আমার মাথায় আর কোন বুদ্ধি যুটল না—আমি তাদের ডেকে শুধু বললুম—"দেখ তোমরা সব ভলান্টিয়রেরা কাল আরম্ভের গানটার কোরাসে যোগ দিও। প্যান্ডালের ভিতরে বাইরে যে দিকে যেখানে যে থাক দাঁড়িয়ে বা বসে সবাই এককণ্ঠে সমস্বরে কোরাস গেয়ে উঠবে। আগে সব গানটা শিখে নাও আজ এক্ষুনি আমার কাছে, তাহলে কাল গাইতে পারবে।" রাত ১০টা পর্যন্ত আমি তাদের গানটা গাইয়ে গাইয়ে পাকা করিয়ে দিলুম। গানের রসে ভুলে তারা ঠান্ডা হয়ে গেল। তুফানের জলে তেল ঢালা হল। তার পরদিন আর কোন গোলমাল হল না। যথাসময়ে প্যান্ডালের প্রত্যেক দিক থেকে একটা মহারব গুঞ্জিয়ে উঠল—

গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাষে
নমো হিন্দুস্থান!
হর হর হর—জয় হিন্দুস্থান!
সৎশ্রী অকাল হিন্দুস্থান!
আল্লা হো আকবর—হিন্দুস্থান!
নমো হিন্দুস্থান!

সকলের ভিতর একটা পুলক সঞ্চারণ করলে।

সেদিনকার অভিজ্ঞতায় আমার মনে একটা কথার উদয় হল,—এই যে বছর বছর যেখানে কংগ্রেস হয় সেখানে সাময়িক-ভাবে একদল ভলান্টিয়ারদের কুচকাওয়াজ করিয়ে গড়ে তোলা হয়—তারপরে তারা ছড়ি ভঙ্গ হয়ে যে যেখানে চলে যায়, আর শাসন নিয়মের ধার ধারে না, এ জিনিসগুলো তাদের মজ্জাগত হয় না—এতে অনেকটা অযথা শক্তিক্ষয় করা হয়। এর চেয়ে যদি স্থায়ীভাবে একটা 'ভলান্টিয়ার কোর' গড়ে তাদের বারোমাস হপ্তায় একদিন করে অন্তত drill ও discipline শিক্ষা দেওয়া হয়

অনেক কাজ হয়। এবারকার কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ারের কাপ্তেন যে ছিল সে আমাদের বেথুন কলেজের সংস্কৃত পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত মশায়ের দৌহিত্র—পরে মোহিনীবাবুর জামাতা হয়। আমি তাকে ডেকে সেই প্রস্তাব করলুম, সে রাজী হল। কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হলে যখন একদিন সমস্ত ভলাণ্টিয়ারদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান হল আমাদের বাড়িতে, সেইদিন এই ভলাণ্টিয়ার কোরের গোড়াপত্তন হল।

ইতিমধ্যে আমার হাতে রুডিয়ার্ড কিপ্লিংয়ের একখানা ছোট গল্পের বই এসে পড়েছিল। তার একটা গল্পে আছে—ভারত সীমান্তে পাঠানদের মুলুকে একজন বাঙালী আই-সি-এস সাহেব ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত হয়েছেন। সমস্ত ডিস্ট্রিক্টের ভার তাঁর উপর। একবার যখন পাঠানরা হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে খুন-খারাপী ও লুটতরাজ আরম্ভ করলে তখন বাঙালী ডেপুটি কমিশনার সাহেব দুষ্কৃতের শাসন ও সুকৃত প্রজার পালনে রত না থেকে কোথায় পলাতক হলেন কেউ পাত্তা পেলে না। শেষে পাঠান চরেরা খুঁজে খুঁজে তাঁকে বের করলে যেখানে ভয়ে কম্পমান হয়ে লুকিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। তাঁকে ধরে ফেলে এক কোপে তাঁর গলাটা কেটে মুণ্ডটা একটা শূলের উপর গেঁথে সারা শহরময় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগল—"বাঙালী গিদ্দর" (শৃগাল)। এই গল্পটা পড়তে পড়তে লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে আমার রক্ত টগবগ করতে থাকল। কি করতে পারি আমি এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য? কিপ্লিংকে একখানা চিঠি লিখলুম, তার মর্ম—"আমার জাতিকে তুমি যে কলঙ্কিত করেছ সে কলঙ্ক ঘোচানর জন্যে আমি তোমাকে আহ্বান করছি—আমার ভাইদের একজন কারও সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে। পাঁচ বৎসর সময় দিচ্ছি তোমায়। বন্দুকে হোক, তলোয়ার হোক, যে কোন অস্ত্র তুমি ইচ্ছে কর নিজেকে তাতেই অভ্যস্ত করে নাও—আজ হতে পাঁচ বছর পরে সে তাতেই তোমাকে যুদ্ধদান করবে।"

ঠিকানা জানিনে কোথায় পাঠাব। সন্ধান করতে করতে বিলম্ব হতে লাগল। এর ভিতর কটকে যাওয়ার জন্যে একটা তাগাদা এল। সেখানে উড়িষ্যার দেশভক্ত মধুসূদন দাসের সঙ্গে পরিচয় হল, তিনি প্রায় বাঙালী। কথায় কথায় তাঁকে একদিন ঐ প্রেরিতব্য চিঠির কথা বললুম। চিঠিখানা সঙ্গেই ছিল, তাঁকে পড়ে শোনালুম। তিনি বিজ্ঞ পুরুষ, পরামর্শ দিলেন—"ওকে যখন পাঁচ বছর সময় দিচ্ছেন, নিজেও পাঁচ বছর সময় নিয়ে অপেক্ষা করুন। এই পাঁচ বছরে বাঙালী ছেলেদের তৈরী করে নিন, সব রকম অস্ত্র চর্চায় পারদর্শী করে তুলুন। একটা নাম ডাক হোক তাদের। তারপর কিপ্লিংকে Challenge পাঠাবেন। সেইটেই সঙ্গত হবে।" আমি কথাটার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করলুম। কলকাতায় ফিরে এসে সন্ধান করে করে শ্রীরামপুরের উকীল মহেন্দ্র লাহিড়ীর বাড়ির ছেলেদের কাছে তাদের তলোয়ার ও গৎকা প্রভৃতির শিক্ষক প্রোফেসর মার্তাজা বলে' একজন মুসলমান ওস্তাদের খবর পেলুম। তাকে ডেকে আমাদের বাড়িতে পাড়ার ছেলেদের একটা ব্যায়াম ক্লাব খুলে মোটা মাইনে দিয়ে তার শিক্ষক নিযুক্ত করলুম। তখন আমরা কাশিয়াবাগান থেকে উঠে ২৬নং সার্কুলার রোডে এসেছি। এ বাড়িতে সামনে একটা বড় Lawn আছে, আর পিছন দিকে পুকুর ধারে একটা ছোটখাট চৌকোনা জায়গা আছে, সেখানে ছেলেরা নানারকম অস্ত্র শিক্ষা করে। ক্লাবের সব খরচ মার্তাজার মাইনে, বক্সিংয়ের দস্তানা, গৎকা, ঢাল, ছোরা, তলোয়ার, বড় লাঠি ও ছোট লাঠি প্রভৃতি সবেরই খরচ আমি দিই। ভবানীপুরের ছেলেরা আসে, শেখে। আমি বসে থাকি চেয়ারে এক পাশে, সামনে টেবিল পেতে একটা খাতায় প্রতিদিন ছেলেদের হাজরি লিখি। ক্রমে ক্রমে এই ক্লাবের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, দূরে দূরে থেকেও ছেলেরা আসতে লাগল এবং কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় এই রকম ক্লাব খুলে গেল। পুলিন দাস এলেন ঢাকা থেকে 'অনুশীলন সমিতি'র সর্দার হয়ে। অধিকাংশ ক্লাবই আমার কাছ থেকে কিছু না কিছু সাহায্য পেত, জিনিসে বা টাকায়—'অনুশীলন সমিতি'ও পেত, এবং সব ক্লাবরই যে যখন পারে এক একবার করে মার্তাজাকে শিক্ষক করে নিয়ে যেতে লাগল।

ক্রমশ

নূতন ছবির পরিচয়

আয়না (ডি আর প্রডাকসন্স)—কাহিনীঃ [illegible]ভুলাল দ্বিবেদী, পরিচালনাঃ ইয়ুসুফ, গানঃ পণ্ডিত ফণি ও নাকবী, আলোকচিত্রঃ এ আজ-মরী, শব্দযোজনাঃ বি ভি দাভে, সুরযোজনাঃ রফী ও আলি খাঁ; ভূমিকাঃ ইয়াকুব, গোপ, ত্রিলোক কাপুর, মীর্জা মুশরফ, হুস্ন বানু, কৌশল্যা, যশোধরা কাটজু, সুলোচনা চ্যাটার্জী, রাজকুমারী শুক্লা প্রভৃতি। ছবিখানি রেডিয়েন্ট পিকচার্সের পরিবেশনায় ১৬ই মার্চ প্রভাত, ছায়া ও ম্যাজেস্টিক সিনেমায় মুক্তিলাভ ক'রেচে।

গৃহলক্ষ্মীরা লক্ষ্মীমন্ত না হলে গৃহের যে হাল হয়, তাই প্রতিফলিত হয়েছে এই 'আয়না'তে। কাহিনীকার হচ্ছেন প্রথম শ্রেণীর গুজরাটি নাট্যকার এবং এই তাঁর প্রথম চিত্রাবদান। সংসারে শান্তি অশান্তির মূল যে কোথায় তার নির্দেশ দেবার চেষ্টা হয়েছে কাহিনীতে। নিতান্তই মামুলী ঘরসংসারের কথা দজ্জাল শাশুড়ী, কলহপ্রিয়া ননদিনী, নির্বিকার গৃহকর্তা, অত্যাচারিতা পুত্রবধূ, বিপথগামী পুত্র—এদেরই নিয়ে যতসব ঘটনা এবং সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে। ছবিখানিতে আহা মরি কিছু নেই, আর দূরে ছাই করবার মতও নয়।

কবিতা (প্রকাশ পিকচার্স)—পরিচালনাঃ পারমার এবং মহেন্দ্রনাথ, আলোকচিত্রঃ কাকুদে, শব্দযোজনাঃ টি দাভে, সুরযোজনাঃ শংকর মেটা; ভূমিকায়ঃ জীবন, উমাকান্ত, বদরী-প্রসাদ, রতনমালা, কান্তাকুমারী প্রভৃতি। এভারগ্রীন পিকচার্সের পরিবেশনায় গত ৯ই মার্চ শ্রী ও দীপকে মুক্তিলাভ ক'রেছে।

ধর্মমূলক ছবি তোলাতেই প্রকাশ পিকচার্সের নাম, এখন দেখছি সামাজিক ছবিতেও তারা কম যায় না। ছবির সকল বিভাগেই বেশ উন্নত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে 'কবিতা' খুব উপভোগ্য একখানা ছবিতে পরিণত হয়েছে। উঁচু দরের আর্ট বা অসাধারণ কৃতিত্ব যদিও কোন বিষয়েই দেখা গেল না, কিন্তু সব দিকেরই একটা সৌষ্ঠব রূপ ফুটে উঠেছে: ভাঁড়ামো অবান্তর জিনিষ, সবই আছে তবে সেগুলোই বড় কথা নয়। দু ঘণ্টা হাল্কা রস বিতরণ-কারী ছবি হিসেবে কবিতা খুবই জনপ্রিয় হবার মত ছবি।

কাহিনী হচ্ছে নারীজীবন নামক এক পত্রিকার সম্পাদিকা সুধা দেবী, তস্যা ভ্রাতা চুণীলাল, কবিতা রচয়িত্রী মালতী দেবী আর লেখক ও চিত্রকর বিজয়কুমারকে নিয়ে। মালতী ও বিজয়কুমার একই দিনে নারী-জীবন অফিসে চাকরীর খোঁজে আসে; পথে জুতো বদল এবং সেই নিয়ে রোষ, পরে চাকরী হতে আলাপ, ঘনিষ্ঠতা এবং প্রেম। অপরদিকে সুধা দেবীর নজর বিজয়ের উপরে, আর চুণীলাল চেয়েছিল মালতীকে। সুধা বিজয়কে পাবার জন্যে মালতীর ওপরে কাগজের সব ভার ছেড়ে বিজয়কে নিজের সেক্রেটারী করে নিয়ে বাইরে বাইরে বেড়াতে



লাগলো। এই নিয়েই মালতী আর বিজয়ের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেল; চুণীলাল এই ফাঁকে মালতীকে বিবাহ করার চেষ্টায় ব্রতী হলো, কিন্তু পারলে না। সুধা শেষে তার ভুল বুঝলে এবং মালতী ও বিজয়ের মিলন হলো।

নানা হাস্যোদ্দীপক ঘটনার মধ্যে দিয়ে তরতরগতিতে কাহিনীটি এগিয়ে যায়; বিন্যাসের মধ্যে একটু অভিনবত্বও আছে। অভিনয়ে চুণীলালের ভূমিকায় জীবনই সবচেয়ে নজরে পড়েন; রতনমালায় মালতীও মন্দ নয়। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সুঅভিনীত। গানগুলি শ্রুতিমধুর, সংলাপ বেশ ঝরঝরে; কলাকৌশলের দিক থেকেও ছবিখানি চকচকে।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

মঞ্চজগতের দুটি আগামী আকর্ষণ হচ্ছে শ্রীরঙ্গমে 'তুলসীদাস' আর ষ্টারে 'শতবর্ষ আগে'। প্রথমটি ভক্তিমূলক, আর পরেরটি সিপাহী বিদ্রোহের সময়কার ঘটনা নিয়ে ঐতিহাসিক নাটক। অপর তিনটি মঞ্চর মধ্যে কালিকা থিয়েটার 'মাটির ঘর' মঞ্চস্থ করার আয়োজন করছে।

* * * * *

এই সপ্তাহের একমাত্র মুক্তি হচ্ছে নিউ সিনেমা ও গণেশ টকীতে ন্যাশনাল ষ্টুডিওর তিন বছর আগেকার ছবি 'জওয়ানী'।

* * * * *

নিউ টকীজের নতুন বাঙলা ছবি 'বন্দিতা'র মুক্তি তারিখও ঘনিয়ে এসেছে। এসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায় মিনার, ছবিঘর ও বিজলীতে একযোগে দেখান হবে।

বিবিধ

প্রমথেশ বড়ুয়া নিউ টকীজের হিন্দী ছবি 'পহচান'-এর কাজ গত সপ্তাহে আরম্ভ করে দিয়েছেন। কাহিনীটি নেওয়া হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' থেকে। নামভূমিকায় বড়ুয়া নিজেই অবতরণ করবেন; যমুনাও থাকবেন একটি প্রধান ভূমিকায়, তাছাড়া জনকয়েক শিল্পী বম্বে থেকে আমদানী করা হবে।

* * * * *

ঠনঠনেতে একটি নতুন চিত্রগৃহ তৈরী প্রায় শেষ হয়ে এলো। এছাড়া আরও দুটি চিত্রগৃহ—একটি ধর্মতলা অঞ্চলে হিন্দী ছবির জন্যে এবং অপরটি বাঙলা ছবির জন্যে দক্ষিণ কলিকাতায় অচিরেই নির্মাণারম্ভ হবার সম্ভাবনা আছে।

* * * *

শ্রীমতী কানন অভিনীত লক্ষ্মীদাস আনন্দের 'কৃষ্ণলীলা' ছবির পরিচালনা দেবকী বসুর হাতে যাবে বলে 'দেশ'-এর খবরটাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়েছে।

* * * *

অশোককুমার ও লীলা দেশাইয়ের স্বতন্ত্রভাবে ছবি তোলার লাইসেন্স প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে।

কোন এক বিশু সেন 'ইণ্ডিয়া ফাইটস' নামে ভারতীয় সৈন্যদের এই যুদ্ধে বীরত্ব কাহিনী নিয়ে লণ্ডনে একখানা ছবি তুলছেন।

* * * * *

সর্বভারতীয় স্বত্ব এভারগ্রীন পিকচার্সের কাছে বিক্রিত হয়ে পাঞ্চোলী আর্ট পিকচার্সের 'শিরী ফরহাদ' একটা নতুন রেকর্ড করলে।

* * * * *

স্মৃতি বিশ্বাস লাহোরে তার দ্বিতীয় ছবি প্রধান পিকচার্সের 'ধমকী'তে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে।

* * * *

মেহতাব প্রযোজিত ছবি 'সাথীর' চিত্রগ্রহণ সেণ্ট্রাল ষ্টুডিওতে আরম্ভ হয়েছে।

* * * *

সরকারী চাপে দিল্লীর চিত্রগৃহগুলিকে ভব্য করে তোলার ব্যবস্থা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ চিত্রগৃহগুলিকে সংশোধন করার যে নির্দেশ দিয়েছেন তা হচ্ছেঃ (১) প্রত্যেক সিনেমাতে পর্দা আর দর্শকের বসবার সবচেয়ে আগের সারির মধ্যে অন্ততঃ ১৫ ফিট ব্যবধান থাকা চাই, যাতে কোন দর্শককে চোখকে পীড়ন করে ছবি না দেখতে হয়; (২) দু সারি সীটের মাঝে অন্ততঃ ১৫ ইঞ্চি জায়গা ছেড়ে রাখতে হবে, যাতে আরামে বসা ও যাতায়াত করার স্থান পর্যাপ্ত হয়; এই নিয়মে প্রতি সিট জায়গা নেবে মোট ৩৬ ইঞ্চি এবং তা দর্শকদের আরামদায়কই হবে; (৩) ওপরের দুটো পরিবর্তন সাধন করতে সিনেমাগুলির সীট সংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগ কমে যাবে, এতে হলের ভিতর ভীড় কমবে এবং আবহাওয়া স্বাস্থ্যপূর্ণ হবে; (৪) প্রত্যেক

১০ সীটের জন্যে কম করে ৩টি মূত্রত্যাগ
ান ও ১টি শৌচাগার রাখতে হবে; (৫)
ত্যক শো শেষ হলে কম করে ১৫ মিনিট
া খালি রাখতে হবে, যাতে ভালরকম
ফাই হয়; এই সংগে পরের শো আরম্ভ
ার অন্ততঃ ৩০ মিনিট আগে টিকিট
ক্রী আরম্ভ করতে হবে অর্থাৎ একটা
া-এর পর অপর শো-র মাঝে ৪৫ মিনিট
ময়ের ব্যবধান রাখতে হবে; এছাড়া
পাশের রাস্তা চওড়া করা, যাওয়া ও
াসার ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা করা, প্রশস্ত লবি
রা ইত্যাদির নির্দেশও আছে। এটা ঠিক
নর্দেশ নয়, হুকুম—কারণ অমান্যে সাজা
বার হুমকী আছে। এইসব পরিবর্তন
রতে যে খরচ হবে এবং সীট কমিয়ে
দতে যে আয় কমে যাবে, তা পূরণ করতে
দল্লীর সিনেমাগুলি ১লা এপ্রিল থেকে
ার আনার শ্রেণী তুলে দিয়েছে।

কিশোর চলচ্চিত্র

শ্রীসুলতা কর

কিশোর-কিশোরীদের দেখবার উপযুক্ত ছবি হওয়া যে একান্ত বাঞ্ছনীয় একথা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন। মহৎ আদর্শ, উচ্চ আকাঙ্ক্ষাভরা ছবি ছোটদের কোমল মনে যে ছাপ ফেলবে, তাহা তাদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তুলতে বিশেষ সাহায্য করবে।

কিশোর-কিশোরীরা যদি দেখে কলম্বাস কেমন করে আমেরিকা আবিষ্কার করছে বা উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুতে অভিযাত্রী দল কেমন করে নব নব আবিষ্কারের সন্ধানে দুর্গম পথে ছুটে চলেছে, তবে তাদের মনে জেগে উঠবে সাহস, শক্তি, অজানার সন্ধানে যাত্রা করবার দুঃসাহস। যদি তাদের "ঠাকুরদাদার ঝুলি", "দাদামশায়ের থলে" এই রকম ভাল ভাল রূপকথা থেকে ছবি তৈরী করে দেখান হয়, তবে তাদের কল্পনা-শক্তি বেড়ে যাবে। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষীদের জীবনী থেকে নাটকীয় উপাদান নিয়ে ছবি তৈরী করে দেখালে তাদের মনে বড় হবার, বড় কাজ করবার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠবে। তেমনি আবার ইউরোপের ছেলেমেয়েদের কিভাবে নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়, স্বাস্থ্যের উন্নতি করবার জন্য কি ভাবে ছাত্রছাত্রীদের ড্রিল করান হয়, সাঁতার দিতে শেখান হয়, ছুটীর সময় পাহাড়ে পর্বতে পায়ে হেঁটে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়, এসব দেখালে তাদের মনে শিক্ষার সম্বন্ধে, স্বাস্থ্যচর্চার সম্বন্ধে নূতন নূতন আদর্শ জেগে উঠবে। কাজেই কিশোরোপযোগী ছবি জাতি গঠনের দিক দিয়া কতখানি উপযোগী, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

ভাল ছবি যেমন ছোটদের চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে, খারাপ ছবিও ঠিক তেমনি প্রভাব বিস্তার করে।

বর্তমানে যে সব বাংলা ছবি দেখান হয়, তাদের মধ্যে দু'একখানি ছাড়া অধিকাংশই অতি নিম্নস্তরের। এসব ছবির মধ্যে না আছে কোন মহৎ আদর্শ, উচ্চ ভাব কিংবা না আছে কোন উচ্চাঙ্গের রসসৃষ্টির প্রয়াস। নিম্নস্তরের ন্যাকামী, হাল্কাসুরের গান ও কতকগুলি রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক মতবাদের কপচান বুলি নিয়ে যে রস পরিবেষণ করা হচ্ছে, ভাল ছবির অভাবে কিশোর-কিশোরীরা দিনের পর দিন তাই দেখে চলেছে।

আর এই সব নিম্নস্তরের ছবির বিষময় প্রভাব তাদের চরিত্রকে কলুষিত করে তুলছে।

একটু ভাবলেই বোঝা যায় জাতীয় জীবনে কিশোর চলচ্চিত্রের মূল্য কত বেশী। ভাল ছবি কিশোরদের চরিত্রকে সুগঠিত করে যেমন জাতিকে উন্নতির পথে নিয়ে যাবে, খারাপ ছবি তেমনই তাদের চরিত্রের অবনতি ঘটিয়ে জাতীয় উন্নতির বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াবে।

এছাড়া কিশোর চলচ্চিত্রের আরও মূল্য আছে। পাঠ্য পুস্তকে যে কথা কিশোর-কিশোরীরা হাজারবার মুখস্থ করে, শিক্ষক যাহা তাদের বার বার বোঝান, সেই কথা সেই ভাব যদি একবার মাত্র ছবির পর্দায় রূপে রসে ঝলমল করে ফুটে ওঠে, তবে তাহা ছোটদের মনের পর্দায় চিরকালের মত গাঁথা হয়ে যায়।

ইউরোপ জাতিকে গড়ে দিতে চায়। তাই তারা তাদের কিশোর কিশোরীর শিক্ষার দিকে, চরিত্র গঠনের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখে। ওদেশে ছোটদের উপযুক্ত ছবি দেখান ত হয়ই, তাছাড়া আলাদা প্রেক্ষাগৃহ পর্যন্ত রয়েছে। ওখানে চলচ্চিত্রে নিত্য নূতন আবিষ্কার হচ্ছে। পাশ্চাত্যের 'মিকি মাউস্' আজ সারা জগতের বালক-বালিকার একান্ত প্রিয় হয়ে উঠে তাদের কল্পনা-শক্তিকে উদ্দীপ্ত করে তুলছে।

আমাদের দেশের সিনেমা কোম্পানী হয়ত ভাবেন যে, এরকম ছবি দেখালে তাঁদের আর্থিক ক্ষতি হবে। কিন্তু তাহা সত্য নাও হতে পারে।

'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে' এ দু'খানি বই যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। বাংলাদেশে অসংখ্য কিশোর-কিশোরী নিত্য ছবি দেখছে। কিশোর চলচ্চিত্র যদি তাদের প্রিয় হয়ে ওঠে, তবে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা কোথায়?

হিন্দু বয়েজ স্কুলের ছাত্র সমিতির ছাত্রেরা এই আন্দোলন সুরু করেছে। কিশোরদের দাবী যখন তাদের নিজেদের দিক থেকে উঠে, তখনই বোঝা যায় জাতীয় জীবনে প্রাণের সাড়া এসেছে। আশা করি, সিনেমা কর্তৃপক্ষ এ দাবীতে সাড়া দিয়ে জাতীয় জীবনকে উন্নতির পথে চলতে সাহায্য করবেন।

লেখু-গেক

অ·কৃ·ব

আপনারা অনেকেই হয়তো খবর রাখেন না আমি মাঝে মাঝে ফুটপথশ্রয়ী জ্যোতিষীদের কাছে হাত দেখাইয়া থাকি। ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য নহে, কেননা ইহারা ভবিষ্যৎ বলিতে পারে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না।

* * * *

ইহারা ভবিষ্যৎ বলিতে পারে জানিলে আমি কখনই ইহাদের কাছে হাত পাতিতাম না। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার মনে মনে একটা বড় ভয় আছে, তাই ভবিষ্যৎ আমি জানিতে চাই না। ভবিষ্যৎ যদি প্রিয় হয় তাহা হইলে সে সম্বন্ধে একটি ইংরাজী বচন মনে পড়িবে Trust no future however pleasant অর্থাৎ ভবিষ্যৎ যত মধুরই হউক না কেন, তাহাকে বিশ্বাস করিও না। ভবিষ্যৎকে মধুর জানিয়াও যদি অবিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে, মধুর ভবিষ্যৎ জানিয়া লাভ কি? অপরপক্ষে, ভবিষ্যৎ যদি অপ্রিয় হয় তাহা হইলে পূর্ব হইতেই মিছামিছি মন খারাপ করিয়া বসিয়া থাকায় কি লাভ আছে?

* * * * *

জ্যোতিষ বিদ্যাটাকে বোগাস্ বলিয়া আমি উড়াইয়া দিতে চাই না বটে, কিন্তু এ বিদ্যাটি কোনোদিন পূর্ণাঙ্গ এবং সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হইবে বলিয়াও আমি মনে করি না। ভগবানই হইতে দিবেন না, কেননা মানুষকে পুরাপুরি ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা হইতে দিলে ভগবানকে অনেক হাংগামা পোহাইতে হইবে।

প্রথমে ধরা যাক জীবন-বীমা। জীবন-বীমা কোম্পানীতে ডাক্তারের আর প্রয়োজন থাকিবে না, জ্যোতিষী থাকিলেই চলিবে। আপনি কোনো কোম্পানীতে বীমা করিতে গেলেই বীমা কোম্পানীর জ্যোতিষী আপনার হাত দেখিয়া রিপোর্ট দিবে আপনি আর কতদিন বাঁচিবেন। রিপোর্টে যদি দেখা যায় আপনার আয়ু ফুরাইতে এখনো অনেক বছর বাকী আছে তাহা হইলে বীমা কোম্পানী সানন্দে আপনার জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। কিন্তু যদি দেখা যায় আপনার তিরোভাবের সময় আসন্ন তাহা হইলে বীমা কোম্পানী হয় বিষণ্ণ নেত্রে আপনাকে বাহিরে যাইবার রাস্তা দেখাইয়া দিবে অথবা অসাধারণ পুরু রকমের প্রিমিয়াম হাঁকিয়া বসিবে।

* * * * *

অপরপক্ষে আপনি যদি আপনার জ্যোতিষীকে হাত দেখাইয়া জানিতে পারেন আপনি আরো বহুদিন বাঁচিবেন তাহা হইলে "দত্তোর! অ্যাদ্দিন ধরে প্রিমিয়াম দিয়ে মরবে কোন…" ইত্যাদি বলিয়া আপনি বীমা কোম্পানীর ছায়াও মাড়াইবেন না। কিন্তু যদি জানিতে পারেন আপনার পটল তুলিবার আর বেশীদিন দেরী নাই তাহা হইলে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আপনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ট্যাক্সী করিয়াই হয়তো বীমা কোম্পানীতে ছুটিবেন।

* * * *

তারপর ধরুন ডাক্তার ও রোগীর কথা। রোগীর বাড়ির জ্যোতিষী যদি রোগীর হাত দেখিয়া বলিত "এ রোগী এযাত্রা কিছুতেই বাঁচিবে না" তবে শেষ পর্যন্ত রোগী মরিত, এবং ডাক্তারের ভিজিট্, ঔষধের খরচা ইত্যাদি বাঁচিত। ফলে বহু ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার এবং ডিসপেনসারীর আয় কমিত। জ্যোতিষী যদি হাত দেখিয়া বলিত রোগী বাঁচিবে, তাহা হইলে রোগীর বাড়ির লোক বড়লোক হইলে হয়তো ডাক্তার ডাকিত, কিন্তু গরীব বা মধ্যবিত্ত হইলে বলিত "বাঁচবেই তো। অনর্থক খরচা করে ডাক্তার ডেকে আর দরকার কি?"

* * * *

ছাত্রদের [illegible] যাহারা জ্যোতিষীর কাছে হাত দেখাইয়া, [illegible] হইত তাহারা কিছুতেই পাশ করিতে পারিবে না তাহারা কি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিস দাখিল করিয়া পরীক্ষা দিতে যাইত মনে করেন? সহস্র সহস্র ভাবী ফেলকারী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়কে কলা দেখাইয়া পরীক্ষার ফিসের টাকা অন্য কাজে লাগাইত। এভাবে প্রতি বৎসরই যদি পরীক্ষার্থী ছাত্র এবং পরীক্ষার্থিনী ছাত্রীগণ জ্যোতিষীকে হাত দেখাইয়া পরীক্ষা দেওয়া না দেওয়া স্থির করিত, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ভাণ্ডারের কি অবস্থা হইত একবার ভাবিয়া দেখুন।

* * * *

ইহা ছাড়া আরও ভাবিবার আছে। যে ছাত্ররা চোখ বুজিয়া আই এ, বি এ, এম এ পড়িয়া যায় তাহারা প্রায় সকলেই পাশ-পরবর্তী ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন দেখে। কলেজে ঢুকিবার আগে ইহারা যদি জ্যোতিষীকে হাত দেখাইয়া লইত তাহা হইলে কি ব্যাপার হইত একবার চিন্তা করুন। যাহারা ভবিষ্যতে এম এ পাশ করিয়া ফ্যা ফ্যা করিয়া বেড়াইত তাহাদের অনেকেই আই এ পাশও করিত না।

* * * *

এভাবে উদাহরণ আরো অনেক দেওয়া যাইত, কিন্তু আর উদাহরণের দরকার আছে বলিয়া মনে করি না। এবার সেই ফুটপাথের জ্যোতিষীদের কথায় ফিরিয়া আসা যাক, যাহাদের কাছে আমি মাঝে মাঝে হাত দেখাইয়া থাকি। ইহারা এমনভাবে আমার হাতের দিকে তাকাইয়া মৃদু গভীর হাসির সহিত মাথা নাড়েন যেন আমার ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ছবি হইয়া আমার হাতের রেখায় রেখায় নাচিতেছে।

* * * * * *

আমার ডান হাতের তালুর মধ্যস্থতায় এই জাতীয় একজন জ্যোতিষীর সহিত আমার যাহা হইয়াছিল তাহাকে শুধু পরিচয় বলিলে খাট করা হয়, হৃদ্যতা বলিলে খানিকটা বোঝা যায়। ভদ্রলোক জনৈক বৃদ্ধ বাঙালী ব্রাহ্মণ। যে পার্কে বেড়াইতাম তাহার অন্যতম প্রবেশদ্বারের অনতিদূরে ফুটপাথে চাদর বিছাইয়া তিনি বসিতেন। সম্মুখে বড় একফালি কাগজে নানারকমের নক্সা আঁকা থাকিত।

* * *

কয়েকদিন হস্ত প্রদর্শক ভবিষ্যৎ জ্ঞানভিক্ষুদের পাশে বসিয়া কাঁচুমাচু হইয়া বৃদ্ধ জ্যোতিষীর হাত দেখা দেখিলাম। এই কৌতূহলী লোকগুলি প্রত্যেকেই এক একটি সিকির বিনিময়ে অনেক মিষ্টিকথা শুনিয়া যাইত এবং শুনিয়া বিস্মিতও হইত, খুশীও হইত। প্রথম প্রথম আমিও যে বিস্মিত হই নাই তাহা নহে, কিন্তু পরে স্থিরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম বৃদ্ধ জ্যোতিষীর কথাগুলির অধিকাংশই দ্ব্যর্থবোধক এবং যে কথাগুলি সেরূপ নহে সেগুলি কম বেশী প্রত্যেকের জীবনেই সত্য। বুঝিলাম বৃদ্ধ জ্যোতিষ বিদ্যা যাহা জানেন তাহার চেয়ে অনেক বেশী জানেন মনস্তত্ত্ব। যাহার হাত দেখেন, কথার ফাঁকে ফাঁকে কৌশলে তাহার মনের কথাগুলি জানিয়া নিয়া ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারেন। কয়েকদিন পর আমি সসঙ্কোচে বৃদ্ধকে হাত দেখাইলাম নিরালায়, ভিড় কমিয়া গেলে। কহিলাম "আমার হাতখানা একটু দয়া করে দেখে দেবেন ঠাকুর। আমি বড় দুঃখী।" জ্যোতিষী ঠাকুরের মুখ দেখিয়া মনে হইয়াছিল তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিবেন, "আপনি বড় ভাগ্যবান।" আমার কথা শুনিয়াই তাহার হাস্যোদ্যত মুখ মুহূর্তে বিষণ্ণ হইয়া গেল। তিনি আমার হাতটা এদিকে ওদিকে উলটাইয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন, "হুঁ, মনটা একটু খারাপ যাচ্ছে বটে।"

তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়া কহিলাম "আপনি ঠিকই ধরেছেন।" ইহার পর তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন, আমার স্ত্রী ভগবানের কৃপায় এ যাত্রা ভালই হইয়া যাইবেন, যদিও ফাঁড়া একটা আছে বটে………ইত্যাদি। মাত্র চার আনা দক্ষিণার বিনিময়ে বৃদ্ধ জ্যোতিষীর মুখনিঃসৃত অনেকগুলি ফাঁকি উপভোগ করিলাম। কয়েকদিন এভাবে তাঁহাকে হাত দেখাইলাম এবং আমার যে স্ত্রী এখনো ভবিষ্যতে আছেন (সত্য সত্যই আছেন কি না ভগবানই জানেন) তিনি যে তাঁহার বর্তমান অসুস্থতা হইতে মুক্তিলাভ করিবেনই, এ আশ্বাস নানাভাবে প্রতিদিনই শুনিয়া কান জুড়াইলাম।

* * * *

একদিন ঠিক করিলাম, বৃদ্ধের হাঁড়ি হাটের মাঝখানে ভাঙিয়া দিব। হাত দেখার আসরটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় আমি স্পষ্টভাবায় জানাইয়া দিলাম, আমার যে স্ত্রী সম্বন্ধে এত কথা তিনি এই কয়েকদিন ধরিয়া বলিয়াছেন, তিনি কে এবং কোথায়, তাহা এখনো আমি জানি না। অর্থাৎ সরল ভাষায় আমি এখনো অবিবাহিত।

হাটের মাঝখানে বৃদ্ধ জ্যোতিষীর হাঁড়ি ভাঙিয়া দিলাম। পরমুহূর্তে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া মনে হইল, না ভাঙিলেই ভাল করিতাম। ঐ মুখে বেদনার যে ছবি দেখিয়াছিলাম, তাহা জীবনে কখনো ভুলিতে পারিব না। "দেখি, দেখি, তাই তো। এই রেখাটা দেখতে একটু ভুল হয়ে গিয়েছিলো। ঐ একটু ভুলের জন্যেই……তাই তো……" ইত্যাদি বলিয়া বৃদ্ধ বুঝাইতে চাহিলেন, জ্যোতিষ অতি সূক্ষ্ম ব্যাপার, একটু সামান্য এদিক ওদিক হইলে ভুলটা হইয়া দাঁড়ায় পর্বতপ্রমাণ। কিন্তু আত্মসমর্থন করিতে গিয়া তিনি নিজেকে আরো হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিলেন।

* * *

বলা বোধ হয় বাহুল্য, সেদিন ইহার পর হাতদেখার আসর আর জমিল না। অসুস্থতার অজুহাতে—এবং অজুহাতটা বোধ হয় অসত্য নয়—বৃদ্ধ তল্পীতল্পা গুটাইয়া লইয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। পরে জানিলাম, বৃদ্ধের সংসারে আর দুটি প্রাণী—এক বৃদ্ধা সহধর্মিণী, আর একটি মাতৃহারা শিশু নাতনী; ইহাদের একমাত্র নির্ভর এই মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ জ্যোতিষীর উপার্জন বৃদ্ধের করুণ কাহিনী শুনিয়া মনটা গভীর অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল—কেন তাহাকে এভাবে দুঃখ দিলাম?

* * *

পরদিন বৃদ্ধের খোঁজে আসিলাম, কিন্তু বৃদ্ধের দেখা পাইলাম না। তাহার পর বহুদিন বৃদ্ধের খোঁজ করিয়াছি, কিন্তু খোঁজ আজিও পাই নাই। কে জানে, তিনি বর্তমানে ইহলোকে না পরলোকে? কে জানে তাহার বৃদ্ধা সহধর্মিণী এবং শিশু নাতনীটি এখন কি অবস্থায় কাহার আশ্রয়ে আছে? জীবনে কত মুখ দেখিয়াছি, কত মুখ ভুলিয়াছি, কিন্তু সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীর লজ্জা-বেদনা-মলিন মুখ এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। ঐ বৃদ্ধের কথা মনে করিয়াই এখনো মাঝে মাঝে ফুটপাথের ধারে বসিয়া জ্যোতিষীদের কাছে হাত দেখাইয়া থাকি, কিন্তু হাটে কাহারো হাঁড়ি ভাঙিবার কথা চিন্তাও করি না।

ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট দল সিংহল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি ভারতীয় দলের যাত্রার প্রাক্কালে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন—এই দল সম্পূর্ণভাবে নিখিল ভারতীয় দল বলা না গেলেও এইটুকু বলিতে পারি যে, সিংহলের কোন খেলায় পরাজিত হইবে না। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং সকল বিষয় কৃতিত্ব-সম্পন্ন খেলোয়াড় এই দলে আছে। অধিকাংশ খেলোয়াড় তরুণ। ভবিষ্যতে নিখিল ভারত দল যখন গঠিত হইবে ও বিদেশে ভ্রমণ করিবে তখন তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই খেলিতে দেখা যাইবে।" ডাঃ সুব্বারায়ণের এই উক্তি আমরাও সমর্থন করি। সিংহলে অনেক বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় আছেন। তাঁহাদের ক্রীড়ানৈপুণ্য কোন অংশে যে ভারতের বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের অপেক্ষা নিম্নস্তরের নহে, ইহা সম্প্রতি জয়বিক্রম ও শতশিবমের খেলা দেখিয়াই বুঝা গিয়াছে। তবে এটা ঠিক, এই দুইটি খেলোয়াড়ের সমতুল্য খেলোয়াড় সিংহলে অধিক নাই। সুতরাং ভারতীয় দল সিংহলের প্রত্যেক খেলায় দেশের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে, এই বিষয়ে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই।

ভারতীয় দলের দেশত্যাগের পূর্বে মাদ্রাজে একটি প্রদর্শনী খেলায় যোগদান করিতে হয়। এই খেলার ফলাফল খুব আশাপ্রদ না হইলেও দর্শনযোগ্য হয়। এই খেলাটি তিনদিনব্যাপী হয় ও খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ভারতীয় দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন মাদ্রাজের গভর্নরের দল। এই দলটি মহীশূর, হায়দরাবাদ ও মাদ্রাজ এই তিনটি প্রাদেশিক দলের বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণ দ্বারা গঠিত হয়। একমাত্র অমরনাথ এই খেলায় ব্যাটিংয়ে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

নিখিল ভারত দল প্রথম ইনিংসঃ—৩৭১ রাণ (বিনু মানকড় ৭০, মুস্তাক আলী ৫৪, অমরনাথ ৭৭, আর এস মোদী ৩৮, সি এস নাইডু ৫৮; রঙ্গচারী ৭৪ রাণে ৬টি উইকেট পান)।

মাদ্রাজ গভর্নরের দলের প্রথম ইনিংসঃ—২২১ রাণ (রাম সিং ৬০, গোপালন ৪৬; সারভাতে ৩৫ রাণে ৪টি, বিজয় হাজারী ৩৬ রাণে ৩টি ও অমরনাথ ১৯ রাণে ২টি উইকেট পান)।

নিখিল ভারত দল দ্বিতীয় ইনিংসঃ—৬ উইঃ ২১৯ রাণ (ডিক্লেয়ার্ড) (কিষেণচাঁদ ৩০, অমরনাথ ১০০ রাণ নট আউট, বিজয় মার্চেণ্ট ৪০ রাণ নট আউট; গোলাম আমেদ ৫৬ রাণে ৩টি ও রামসিং ৬৯ রাণে ২টি উইকেট পান)।

মাদ্রাজ গভর্নরের দলের দ্বিতীয় ইনিংসঃ—৬ উইঃ ১৯৬ রাণ (পালিয়া ৬৮, জনষ্টন ৩৫, গোপালন নট আউট ২৫; মুস্তাক আলী ২১ রাণে ২টি ও আর মোদী ২৭ রাণে ২টি উইকেট পান)।

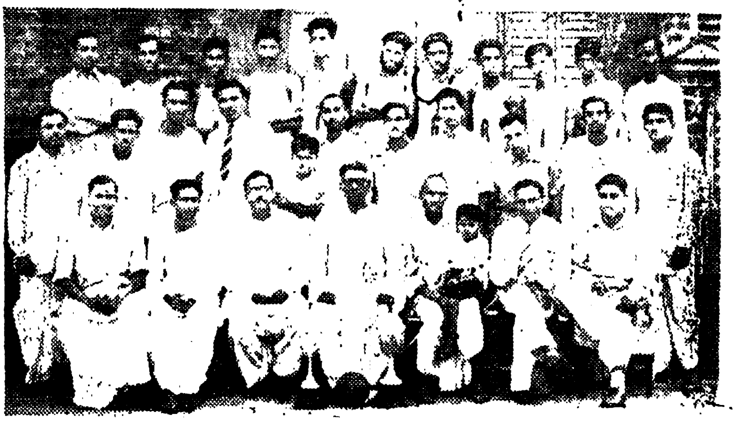
হকি

কলিকাতা হকি লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ান কে হইবে এই আলোচনা ক্রীড়ামোদীদের বিশেষভাবে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ ভারতীয় দুইটি জনপ্রিয় দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। গত বৎসরের চ্যাম্পিয়ান পোর্ট কমিশনার্স দল শেষ পর্যন্ত তাহাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে কি না বলা কঠিন। তবে বর্তমানে প্রতিযোগিতা যেরূপ অবস্থায়



দাঁড়াইয়াছে তাহাতে বলা চলে, পোর্ট দলের চ্যাম্পিয়ান না হইবার সম্ভাবনাই বেশী। এই বিষয়ে মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং এই দুইটি ভারতীয় দলেরই অবস্থা পোর্ট দল অপেক্ষা অনেক ভাল। এই দুইটি দলের মধ্যে কে চ্যাম্পিয়ান হইবে তাহা এখনও জোর করিয়া বলা যায় না।

যে দলই চ্যাম্পিয়ান হউক আমরা কিন্তু লীগ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলা দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। বিশিষ্ট দলসমূহের পরিচালকগণ অবাঙালী খেলোয়াড় দ্বারা দলের শক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে স্ট্যাণ্ডার্ড উন্নততর হয় নাই। ক্রীড়াকৌশলের কথা



জেলা ভলিবল চ্যাম্পিয়ান হাওড়া দলের খেলোয়াড়গণ ও পরিচালকগণ

ভুলিয়া অনেক খেলোয়াড়কেই অযথা দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করিতে দেখা গিয়াছে।

ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে বাঙলার হকি খেলার সুনাম ছিল। কিন্তু বর্তমানে বাঙলার হকি খেলায় সেই গৌরব আর নাই। নিখিল ভারত দল যদি বর্তমানে গঠিত হয়, বাঙলার কোন খেলোয়াড়ই স্থান পাইবেন না ইহা জোর করিয়াই বলা চলে।

এই যখন বাঙলার হকি খেলার বর্তমান অবস্থা, তখন কি করিয়া পূর্ব গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার জন্য পরিচালকগণের চেষ্টা করা কি খুব অন্যায় হইবে? পরিচালকগণ এই বিষয় কোনরূপ চিন্তা করেন বলিয়া মনে হয় না। তাহা যদি করিতেন তবে এই সম্পর্কে আলাপ-আলোচনাও হইত। কিন্তু তাঁহাদের কেবল বিভিন্ন প্রতিযোগিতা কিরূপে শেষ করা যাইবে এই আলোচনা করিতেই বেশী ব্যস্ত দেখা যাইতেছে। আর প্রতিযোগিতা পরিচালনায় তাঁহাদের যে কিরূপ সুনাম হইয়াছে তাহাও ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেটন হকি কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদানকারীর তালিকাই বিশেষ-ভাবে প্রমাণিত করে। ১০ বৎসর পূর্বেও বেটন কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার জন্য ভারতের সকল প্রদেশের হকি দল চঞ্চল হইয়া উঠিত। বর্তমানে সেই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার মত উৎসাহ আর বাঙলার বাহিরের দলসমূহের নাই। ইহা কি খুব পরিতাপের বিষয় নহে?

ভারোত্তোলন

বাগবাজার জিমন্যাসিয়াম পরিচালিত এসিয়াটিক ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার এই বৎসরের অনুষ্ঠান দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। পরিচালকগণ এই প্রতিযোগিতাটিকে ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা হিসাবে পরিগণিত করিবার দিকে যে পুনরায় দৃষ্টি দিয়াছেন তাহা মাদ্রাজ, অন্ধ্র, তাঞ্জোর প্রভৃতি স্থানের ব্যায়ামবীরদের যোগদান হইতেই বুঝিতে পারা গেল। আমরা পূর্বে বহুবার বলিয়াছি যে, পরিচালকগণের উচিত প্রচারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া। প্রতিযোগিতার নাম হইবে "এশিয়াটিক" অথচ প্রতিযোগিতা শেষ হইবে কেবল বাঙলার ব্যায়ামবীরদের লইয়া ইহা খুবই দুঃখের বিষয়।

এই বৎসরের প্রতিযোগিতার স্ট্যাণ্ডার্ডও উন্নততর হইয়াছে। বাঙালী ব্যায়ামবীরগণ নিখিল ভারত অলিম্পিক অনুষ্ঠানে যে সুনাম অর্জন করিয়াছেন,—তাহা রক্ষা করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার প্রমাণ এই প্রতিযোগিতায় পাওয়া গিয়াছে। হেভী ওয়েটে হেম মুখার্জির সাফল্য প্রশংসনীয়। নিম্নে প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

ব্যাণ্টম ওয়েটঃ—এ বাভাসা (তাঞ্জোর) প্রেস ১৩৫ পাউণ্ড, স্ন্যাচ ১২৫ পাউণ্ড, ক্লিন ও জার্ক ১৮৫ পাউণ্ড; মোট ৪৪৫ পাউণ্ড।

ফেদার ওয়েটঃ—বৈদ্যনাথ ঘোষ (বজরঙ্গ ব্যায়ামাগার) প্রেস ১৫৫ পাউণ্ড, স্ন্যাচ ১৬০ পাউণ্ড, ক্লিন এণ্ড জার্ক ২০৫ পাউণ্ড, মোট ৫২০ পাউণ্ড।

লাইট ওয়েটঃ—সামুয়েল চেঙ্গ (ইউ এস এ) প্রেস ১৫০ পাউণ্ড, স্ন্যাচ ১৮৫½ পাউণ্ড, ক্লিন এণ্ড জার্ক ২২৫ পাউণ্ড, মোট ৫৬০½ পাউণ্ড।

মিডল ওয়েটঃ—ভিক্টর চেওদি (মল্লিকস্ হেলথ হোম) প্রেস ১৯০ পাউণ্ড, স্ন্যাচ ১৯৫ পাউণ্ড, ক্লিন এণ্ড জার্ক ২৭৫ পাউণ্ড, মোট ৬৬০ পাউণ্ড।

লাইট হেভী ওয়েটঃ—এস বিশ্বাস (আশুতোষ কলেজ) প্রেস ১৬৫ পাউণ্ড, স্ন্যাচ ১৬৫ পাউণ্ড, ক্লিন এণ্ড জার্ক ২১০ পাউণ্ড, মোট ৫৪০ পাউণ্ড।

হেভী ওয়েটঃ—হেম মুখার্জি (আশুতোষ কলেজ) প্রেস ২০০ পাউণ্ড, স্ন্যাচ ১৮০ পাউণ্ড, ক্লিন এণ্ড জার্ক ২৬০ পাউণ্ড; মোট ৬৪০ পাউণ্ড।

গঙ্গোত্রী

সুবোধ ঘোষ

(১৯)

দিঘীরপাড়ের মাঠে পেঁছলো শোভাযাত্রা। পুলিশ ফৌজ উঠে দাঁড়ালো। এস-ডি-ও কে কে বাসু এগিয়ে এসে পুলিশ ফৌজের ঈশান কোণে শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। লাঠিধারী কনস্টেবলেরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে লম্বা হাঁক দিচ্ছিল—এক দুই তিন চার...। হেডমাস্টার দিনমণি বিশ্বাস একটা চারপয়সা টুল হাতে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এলেন. এস-ডি-ও সাহেবের পেছনে রাখলেন। বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ভূদেব চাটুয্যে আরও ব্যস্তভাবে দৌড়ে এলেন একটা হাত-পাখা নিয়ে। কে কে বাসুর ঘাড় বেয়ে ঘাম পড়ছিল। ভূদেব চাটুয্যে ব্যাকুলভাবে হাওয়া দিতে সুরু করলেন।

কোমরবাঁধা হয়ে খোঁয়াড়ের জন্তুর মত বোর্ড অফিসের বারান্দায় রতন বসেছিল বিমর্ষভাবে। আগত শোভাযাত্রার উল্লাস-ভরা মূর্তির দিকে তাকিয়েও তার মুখে কোন প্রসন্নতার আভাস ফুটে উঠছিল না। রতন যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। চোখের চাউনীতে উদাস ভাব। কপালে দুশ্চিন্তার কুঞ্চন। শোভাযাত্রার দিকে যেন অনেক দূরে থেকে নির্লিপ্তভাবে রতন তাকিয়েছিল। মাঝে মাঝে অজ্ঞাতসারেই তার দৃষ্টি পড়ছিল ভজুর দিকে। ভজুর কুৎসিত চেহারা যেন আজ আলোকে চকচক করছে। ভজুর ব্যস্ততার সীমা ছিল না। একবার ভূদেব চাটুয্যের কাছে গিয়ে প্রণিপাত জানায়. ফিসফিস করে কি সব রহস্যভরা কথা বলে। আবার দৌড়ে যায় ইনস্পেক্টর-বাবুর কাছে, বিচলিত কুকুরের মত একেবারে হাটু ঘেঁসে যেন আদরের আবদার নিয়ে বসে।

রতনের চোখ জ্বলে ওঠে, দৃষ্টি পড়তে থাকে। অন্য কোন অপমান ও নির্যাতনের কথা ভাবছে না রতন। মুখের ওপর কালশিটে দাগগুলিও এখন আর দপ্ দপ্ করে যন্ত্রণা দেয় না। দড়ির বাঁধনে কোন বেদনা নেই। চাকরী গেল, জেল হবে, মার হবে—কোন কিছুর ভাবনা নেই রতনের মনে। ওসব একেবারে ভুলে গেছে রতন।

শুধু মনে আছে, গোবিন্দপুরের সেই ভলান্টিয়ার ছেলেটির কথা—কিছু ভাবনা করো না রতন. তুমি স্বরাজের চৌকীদার হবে। কথাটা বিশ্বাস করতে কেন জানি বড় ভাল লাগছিল রতনের। আজ এই মুহূর্তে, বোর্ড অফিসের বারান্দায় দড়িবাঁধা হয়েও বন্দী বন্য প্রাণীর মত রতন যেন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে সেই স্বপ্ন দেখছে। চোখ মেলে তাকালে কোন ভরসার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। তার উদ্ভট স্বপ্নকে বিদ্রূপ করে, তার দুরাশাকে পরাভূত করে, চারদিকে ভ্রূকুটি থম্ থম্ করছে। আশা করার আর কিছু নেই। তবু ভাবতে ভাল লাগে রতনের। মনের গোপনে এই স্বপ্ন দেখার একটা অদ্ভুত গর্ব যেন আনাগোনা করে। এরই মধ্যে সাফল্যের তৃপ্তি পায় রতন। খুসী হয়ে ওঠে।

শুধু বিমর্ষ হয়ে ওঠে, ভজুর মূর্তিটা চোখে পড়লে। ভজুর ষড়যন্ত্র একে একে তার সকল গর্বকে ভুয়ো করে দিচ্ছে। এবার ভজুই চৌকীদার হবে। না হয়ে পারে না. ইনস্পেক্টরবাবু যেভাবে ভজুকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, তাতে আর কিছু অস্পষ্ট রইল না। রতনের মনে হয়, তার মৃত্যুর আগেই যেন চিতে সাজানোর কাজ আরম্ভ হয়েছে। ভজু কাজ সারছে। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত এই সুযোগকে ভজু কায়মনে আঁকড়ে ধরেছে। বহুদিনের আগের সেই পরাভবের প্রতিশোধ নিচ্ছে ভজু। টাকার জোরে, ঘুসের জোরে রতন দরিদ্র ভজুকে হারিয়ে দিতে পেরেছিল। সেদিন ভজু ছিল শত্রু আর প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু ভজু হার মানেনি. আজ আবার তার শত্রুতার সকল গর্ব ও সংকল্প নিয়ে ভজু উঠে পড়ে লেগেছে। রতনের এক একবার ইচ্ছে হচ্ছিল, ভজুকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেসা করে—কেন রে বাউরীর পো. এত সাধ কেন তোর? কি মধু আছে চৌকীদারীতে?

ভজুর ওপর রাগ আর ব্যর্থ প্রতিহিংসার আক্রোশ নিয়েই রতন মাঝে মাঝে বিষণ্ণ হয়ে পড়ছিল। নইলে, মন খারাপ করার মত আজ আর কোন আঘাত নেই। চৌকীদার জীবনের সকল অনাচারের স্মৃতি আজও সে ভোলেনি। বহু পাপ সে নিজে হাতে পুষেছে। বহু অমঙ্গলকে একটা সিকি-আধুলির বিনিময়ে সে প্রশ্রয় দিয়েছে। গাঁয়ের বহু মঙ্গলকে সে অপমান করেছে। এই তো সেদিন, কেশব ভট্চাযের মত মানুষকেও কী অপমান করেছে সে। প্রত্যেকটি অপকীর্তির ইতিহাস স্মরণ করতে পারে. কিন্তু তার জন্য আজ সত্যি তার মনে কোন বেদনা নেই; রতন খুসী হয়, সে প্রায়শ্চিত্ত করতে পেরেছে। সে শুদ্ধ হতে পেরেছে। মান্দার গাঁয়ের অলক্ষ্য দেবতা আজ তার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

চমকে উঠলো রতন। সত্যিই দেবতা ক্ষমা করে দিয়েছেন, যেন আকাশবাণীর মত সেই সত্য ধ্বনিত হচ্ছে।

শোভাযাত্রী জনতা জয়ধ্বনি করছিল—জয় রতন সর্দার কি জয়! আনন্দের আতিশয্যে রতনের চোখ জলে ভরে গেল। এক একটি জয়ধ্বনির ঝাপ্টায় যেন তার সকল অপরাধের মালিন্য উড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। রতনের জীবনের অন্ধকার রাত্রির পালা যেন ফুৎকারে উড়ে যাচ্ছে। ভোর হয়ে গেছে। এই সূর্য আর ডুববে না, আর রাত্রি আসবে না। আর উপায় নেই তার। আর চেষ্টা করলেও সেই প্রেতচ্ছায়ার জীবনে যে ফিরে যেতে পারবে না, ফিরে যাবার সব অধিকার বাতিল করে দিচ্ছে এই শোভাযাত্রী জনতার জয়ধ্বনি। এর মধ্যে কে না আছে? মাধুরীদিদি আছেন. কেশব ভট্চাযের মত মানুষ আছে। বামুনপাড়া কায়েতপাড়ার ছেলেরাও আছে। মান্দার গাঁয়ের জীবনে এত বড় ঘটনা কখনো ঘটেনি. এর চেয়ে অভিনব বাণী কোনদিন ঘোষিত হয়নি। ছোটলোক রতন সর্দারকে আজ জয়ধ্বনি দিয়ে অভিনন্দন জানায় বড় ছোট সবাই। ঠিক বলেছে গোবিন্দপুরের ভলান্টিয়ার ছেলেটি, গান্ধীজীর আশীর্বাদে পৃথিবী বদলে যাবে। রতন আজ চোখের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছে, পৃথিবী বদলে যাচ্ছে। নইলে এত অকপট মায়া, এত বুকভরা ক্ষমা, কোত্থেকে এল গাঁয়ের হৃদয়ে? এত সম্মান কোথা থেকে এল রতন সর্দারের অদৃষ্টে?

জনতা মাঠের ওপর একটা পতাকা দাঁড় করিয়ে ঘিরে দাঁড়ালো। আজ রতন সর্দারকে অজস্র সম্মানে তারা বিদায় দিবে, সদরের পথে, কারাগারের পথে। মান্দার গাঁয়ের নতুন সংগ্রামের জীবনে প্রথম সৈনিক বন্দী হয়েছে—রতন সর্দার। তাকে হেলাফেলা করে বিদায় দেওয়া যায় না। তার যাবার পথে কৌড়ি ছড়াতে হবে, শাঁখ বাজাতে হবে। জয়ধ্বনি করে গাঁয়ের সীমা পর্যন্ত যেতে হবে পেছু পেছু

"দেশ" এর নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১৩, ষাণ্মাসিক—৬।৷৹

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার, সাধারণত নিম্নলিখিতরূপ ঃ—

সাধারণ পৃষ্ঠা—এক বৎসরের চুক্তিতে
১০০" ও তদূর্ধ্ব ... ৩, প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার
৫০"—৯৯" ... ৩।৷৹ " " " "

সাময়িক বিজ্ঞাপন
৪, টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার
বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জানা যাইবে।

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্বক ছবি সংগে পাঠাইবেন অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

সম্পাদক—"দেশ"
১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কেশব ভট্‌চায মাত্র তার বক্তৃতা আরম্ভ করেছে—আজ আমার সৌভাগ্য যে, পাঁচ বছর পরে আবার আমি......।

পুলিশদল জনতাকে ঘিরে ফেললো। কে কে বাসু সরে গিয়ে আবার সেই অফিসের বারান্দায় টুলের উপর বসলেন। ভূদেব চাটুয্যে জোরে জোরে বাতাস করলেন।

ইনস্পেক্টর জনতার চারদিকে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে পায়চারী করছিলেন। এক অতি সতর্ক কর্তব্যের প্রেরণায় যেন ছটফট করছিলেন। তিনি ভয়ংকরভাবে প্রস্তুত হয়েছেন। জনতার অবিরল জয়ধ্বনি আর উত্তেজনার জোয়ার বেঁধে দিয়ে, মাঝে মাঝে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখছিলেন।

ইনস্পেক্টর একটু শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। ঘোষণা করলেন—সকলকেই গ্রেপ্তার করা হলো।

জনতার উল্লাস দ্বিগুণবেগে উৎসারিত হয়ে যেন প্রত্যুত্তর দিল। কিছুক্ষণের মত জনতায় হর্ষ থামছিল না। এখুনি এক নতুন অভিযান আরম্ভ হবে। মান্দার গাঁ থেকে মীরপুর—মোট সাড়ে পাঁচ ক্রোশ। সারা পথ ধুলো উড়িয়ে, দু'পাশের গাঁ আর বস্তির হৃদয়ে নতুন মন্ত্র শোনাতে শোনাতে জনতা চলে যাবে। এমন সুযোগ পাওয়া যাবে, কেউ কল্পনা করতে পারেনি।

ভীড় থেকে একটু দূরে সরে দাঁড়িয়েছিল ভজু। ভজুর চাঞ্চল্য থেমে গেছে। একটু হতভম্ব হয়ে গেছে। এই উন্মাদনার অর্থ বুঝতে পারছিল না ভজু।

ভজু আর একটু পেছনে সরে গিয়ে যেন ক্লান্ত হয়ে বসলো। পীড়িত মানুষের মুখের মত তার চোখে মুখে একটা যন্ত্রণার ছাপ লেগেছিল। অনেক আশায় অনেক দূর এগিয়ে এসে ভজু যেন আবার পথ হারিয়ে ফেলেছে। সেদিনও পিকেটিংয়ের সময় সঞ্জীববাবুর মেয়ে মাধুরী হাতযোড় করে পথ ভুলিয়ে দিয়েছে। যে পথে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল ভজু। সে পথে যেতে পারেনি। ভয় পেয়ে, লজ্জা পেয়ে, ক্ষেতের আল ধরে দৌড়ে যেতে হয়েছিল। সত্যিই ভজু কোন দিকে পথ করতে পারেনি। সেই গোপন অভিমানে তার ফুসফুস যেন পুড়ে পুড়ে জ্বলছিল। রতন স্বদেশী হয়ে গেছে, ঠাকুরমশাই গ্রেপ্তার হলো—সবাই যেন পাগল হয়ে গেছে, চোর-ডাকাত না হয়েও সবাই জেলে যেতে চায়, সবাই দাগী হয়ে গেল। এত দাগীকে কে পাহারা দেবে? কে ঘুম ভাঙিয়ে হাজিরা নেবে?

আর কাউকে চায় না ভজু, শুধু এই অহংকারী ঠাকুরমশাই, আর রতন মণ্ডল। জীবনে অন্তত এমন একটি দিনের গভীর রাত্রির অন্ধকার পেতে চায় ভজু, যেদিন ওদের স্বপ্ন থেকে হাঁক দিয়ে সে টেনে তুলবে, হাজিরা নিয়ে ছেড়ে দেবে। অবাধে ঘুম পেতে মাসের দস্তুরি দেড়টি টাকা দাবী করবে। সে আশার নেশা যেন হঠাৎ ছিঁড়ে গেছে। ভজুর নিরুৎসাহ মূর্তির মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভজু হঠাৎ দেখতে পেল—রতন ইসারা করে ডাকছে।

ভজু বিস্মিত হয়ে এগিয়ে এল। রতন বললো—আমি চললাম রে ভজু।

রতনের গলার স্বর যেন কথক ঠাকুরের গানের সুরের মত একটা ভক্তি লেগে রয়েছে। ভজু আশ্চর্য হয়ে বুঝবার চেষ্টা করছিল। রতনাও কেমন হয়ে গেছে।

রতন বললো—তুই আর চাটুয্যার সঙ্গে মিশামিশি করিস না ভজু।

ভজু বিদ্রুপ করে বললো—তোর ভয় নাই রে রতন। আমি আর চৌকিদার হব নাই, হতে পারলাম না।

রতন—ক্যানে?

ভজু—পঞ্চাশটা টাকা চাই। তার কমে উহারা মানছে না।

রতন একটুখানি ভেবে নিল। তারপর বললো—তুই সত্যিই চৌকিদারী করবি ভজু?

ভজু—পেলে করতাম।

রতন—তবে তাই করিস।

ভজু—কিন্তু টাকা?

রতন—শিবু পোদ্দারের কাছে আমি টাকা পাই। উহাকে আমি চিঠি দিয়ে বলে দেব, যেন তোকে পঞ্চাশটা টাকা দেয়।

ভজু রতনের মুখের দিকে বোকার মত তাকিয়ে রইল। তার বিশবস্ত সংসারের পরিচিত নিয়ম-কানুনগুলিও যেন উল্টে-পাল্টে যাচ্ছে। চরমভাবে বিশ্বাস নষ্ট করছে শত্রু রতন মণ্ডল। একটি কথায় ভজুকে একেবারে অসহায় করে দিয়েছে। এতক্ষণ ভজুর আকাঙ্ক্ষার পথ ঠিক ঠিক চেনা ছিল, রতন আবার পথ ভুল করিয়ে দিয়েছে। বিদায় নেবার আগে রতন ভজুকে সুখী করে যাচ্ছে।

এস-ডি-ও কে কে বসু আগে আগে হেঁটে চললেন। কোমরে দড়ি-বাঁধা রতন চলেছে পেছনে, সঙ্গে একজন কনস্টেবল দড়ির একটা প্রান্ত মুঠো করে ধরে আছে। তার পেছনে বন্দী জনতা। বিদ্যাপীঠের ছেলেদের উল্লাসধ্বনির সঙ্গে পথচলা ধুলো মিশে গিয়ে অভিযানের রূপ আরও বিচিত্র হয়ে উঠছিল।

জনতার পেছনে আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছিল কেশব ভটচায। ক্ষণিকের জন্য একটা নিরর্থক বিষণ্ণতার স্পর্শ কেশবের ভাবনা মেদুর করে রেখেছিল—আবার গাঁ ছেড়ে যেতে হলো। মাত্র কটি দিন আগে যে পথে যে আগ্রহ নিয়ে সে মান্দার গাঁয়ে ফিরেছিল, আজ হঠাৎ সেই পথেই চলে যেতে হচ্ছে, সব কিছু পেছনে ফেলে।

কেশবের হঠাৎ মনে পড়ে—তার ভুল হয়েছে। আজ আর সব কিছু পেছনে ফেলে সে চলে যাচ্ছে না। পেছনে পেছনে সে আসছে। জীবনে এত বড় ঘটনার অনুগ্রহ কোন দিন হবে, কল্পনা করতে পারেনি কেশব। এর জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু কেশবের সকল বিষণ্ণতা মুহূর্তে মুছে গিয়ে তার মনের আকাশে সহস্র নক্ষত্রের দীপ্তি ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে। মাধুরী তারই সঙ্গে চলেছে।

পেছন দিকে তাকিয়ে কেশব বললো—পিছিয়ে পড়ছো কেন?

মাধুরী এগিয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গে চললো। কেশব গলার স্বর নামিয়ে বললো—পাশে পাশে হাঁটতে লজ্জা করছিল বুঝি?

মাধুরী কোন উত্তর দিল না।

বন্দী জনতার অনেক পেছনে বুটের শব্দে হুলপাট করে চলেছিল পুলিশ ফৌজ। পড়ন্ত রোদের স্নিগ্ধ আলোকের আশীর্বাদ নিয়ে মান্দার গাঁয়ের হৃদয়ের একদল মুখর প্রতিধ্বনি যেন বন্দী হয়ে চলেছে।

একেবারে পেছনে, ছিন্ন ধূলিজালের ভেতর দিয়ে তাকালে দেখা যায়, একটি মূর্তি একা একা অনুসরণ করে আসছে। সত্যিই ভজু একা পড়ে গেছে, অসহায় হয়ে গেছে। তার আসবার কোন প্রয়োজন নেই। তবু সে আসছে। (ক্রমশ)

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১৩ই মার্চ—কলিকাতা কর্পোরেশনের এক বিশেষ অধিবেশনে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া শতকরা আড়াই টাকা ট্যাক্স বৃদ্ধির জন্য এবং কর্পোরেশনের অর্থ স্বাস্থ্য এবং কার্য-পরিচালনা ব্যবস্থাদি সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সরকারপক্ষের পুনরায় পরাজয় ঘটে। এইদিন শাসনকার্য পরিচালনায় ব্যয় সঙ্কোচের দাবী করিয়া ইউরোপীয়ান দল কর্তৃক আনীত ছাটাই প্রস্তাব পরিষদে ৫৭-৩৭ ভোটে গৃহীত হয়।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদে দেওয়ানী আদালত ও আইন সংক্রান্ত বে-সরকারী বিল সম্পর্কে ভোট গ্রহণের ফলে সাদুল্লা মন্ত্রিসভার ২৬-২৯ ভোটে প্রথম পরাজয় ঘটে।

বিহার গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ প্রমুখ পাঁচজন কংগ্রেস নেতার উপর যে অন্তরীণ আদেশ জারী করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন।

১৯৪০ সালের ৫ই আগষ্ট তারিখে ঢাকা মেল দুর্ঘটনার দায়িত্ব রেল কর্তৃপক্ষের বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া গতকল্য কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ সেন ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন দরখাস্তকারীদের অনুকূলে ২ লক্ষ ১৯ হাজার ৮৫৮৲ টাকা ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করিয়াছেন।

১৪ই মার্চ—সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। সীমান্তের গবর্ণর ডাঃ খাঁ সাহেবকে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিতে আহবান করেন এবং ডাঃ খাঁ সহেব তাহাতে সম্মত হন। মন্ত্রিমণ্ডলীতে গ্রহণের জন্য তিনি লালা ভঞ্জুরাম গান্ধী এবং খাঁ মহম্মদ আব্বাস খাঁর নাম প্রস্তাব করেন। গবর্ণর দুইটি নামই মানিয়া লন।

সিন্ধুর নবগঠিত লীগ মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করিয়াছে। স্যার গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লা (প্রধান মন্ত্রী), মীর গোলামালী খান, পীর ইলাহিবক্স, মহম্মদ আলিসা, শ্রীযুত নিচলদাস ভাজিরাণী এবং মুন্সী গোবিন্দরামকে লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রধান মন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দীন ১৯৪৫ সালের ফৌজদারী দণ্ড-বিধি (বঙ্গীয় সংশোধন) বিল উত্থাপন করেন। এই বিলে সহকারী পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টার এবং হেড কনেষ্টবলদের উপরও বে-আইনী জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার ক্ষমতা অর্পণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক পরিকল্পনা সম্পর্কে সরকারী মনোভাব ব্যক্ত করেন।

অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন।

১৫ই মার্চ—বিগত ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের বৎসরে বাঙ্গলার প্রতি জেলায় মোট কত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গলা সরকারের পক্ষ হইতে এক বিবৃতি দাখিল করা হয়।

বাঙ্গলা প্রদেশের সকল জমিদারী স্বত্ব সরকার কর্তৃক ক্রয় করা সম্পর্কে ফ্লাউড কমিশন যে সুপারিশ করিয়াছিলেন, বাঙ্গলা সরকার তাহা কার্যে পরিণত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

গত ৬ই মার্চ আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলের সিগ্রিগেশন ওয়ার্ডে নিরাপত্তা বন্দীদের উপর মারপিটের কথা লইয়া অদ্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তর হয়।

১৬ই মার্চ—সীমান্তে নবগঠিত কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী শপথ গ্রহণ করিয়া কার্যভার গ্রহণ করেন। ডাঃ খাঁ সাহেব প্রধান মন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ করিয়াই খাঁ আব্দুল গফুর খাঁ এবং অন্য আটজন বন্দীকে অবিলম্বে মুক্তি দিবার আদেশ দেন।

বারাণসীর জেলা ম্যাজিষ্টেট যুক্তপ্রাদেশিক কংগ্রেসসেবী সম্মেলনের উপর এক নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে জানান হয় যে, ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত দশ মাসে কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ২ হাজার ১ শত ৪৪জন দুঃস্থ ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

১৭ই মার্চ—খাঁ আবদুল গফুর খাঁ এবং অপর দশজন নিরাপত্তা বন্দী হরিপুর জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

বাঙ্গলা সরকার জনস্বাস্থ্য অর্ডিন্যান্স (জরুরী বিধানাবলী) বলে এক আদেশ জারী করিয়া কর্পোরেশনের কার্য পরিচালনাদি সম্পর্কে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কর্পোরেশনকে নির্দেশ দিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট আলোচনা-কালে শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার এক ছাটাই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বাঙ্গলায় সমবায় ভিত্তিতে তাঁতশিল্পকে গড়িয়া তুলিতে গবর্ণ-মেণ্টের অক্ষমতার সমালোচনা করেন।

লাহোরে জাতীয় উদারনৈতিক সঙ্ঘের পঞ্চ-বিংশ অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভাপতি শ্রীযুত বেঙ্কটরাম শাস্ত্রী তাঁহার অভিভাষণে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভারতকে অবিলম্বে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবী করেন।

১৮ই মার্চ—লাহোরে জাতীয় উদারনৈতিক সম্মেলনের রজত-জয়ন্তী অধিবেশন শেষ হইয়াছে। কেন্দ্রে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন, ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ সমেত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯শে মার্চ—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ স্থানান্তরিত হইবার নিমিত্ত অনুরোধ জানান নাই। ভারত সরকারই তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বেজওয়াদার সংবাদে প্রকাশ, অন্ধ্র ও তামিলনাদের প্রতিনিধিদল সম্প্রতি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাহাদিগকে বলেন যে, যতদিন কংগ্রেস সভাপতি এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ আটক থাকিবেন, ততদিন কোন নিখিল ভারত কংগ্রেস বা নিখিল ভারত কিষাণ প্রতিষ্ঠান গঠন করা উচিত নহে।

চিমুর ও অস্তি বন্দীদিগের ফাঁসি স্থগিত রাখা হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১৩ই মার্চ—প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গন—মার্কিন সৈন্যগণ মিণ্ডানাওয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে জাম্বোয়াদা শহর অধিকার করিয়াছে।

১৪ই মার্চ—ব্রহ্ম রণাঙ্গন—মিত্রবাহিনী মান্দালয় হইতে ৪০ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত পার্বত্য নগর মেমিয়ো অধিকার করিয়াছে।

পূর্ব জার্মান রণাঙ্গন—লালফৌজ চেকো-শ্লোভাকিয়ায় বুদাপেস্টের ৭৫ মাইল উত্তরে ও দানিয়ুব হইতে ৫৫ মাইল দূরে আলতসোল দখল করিয়াছে।

১৫ই মার্চ—অদ্য কমন্স সভায় শ্রমিক দলের মিঃ সোরেনসেনের এক প্রশ্নের উত্তরে মিঃ আমেরী বলেন যে, কংগ্রেস নেতৃবর্গকে অনির্দিষ্টকাল আটক রাখা হইবে না।

লণ্ডনে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ডিউক অব্ উইণ্ডসর এপ্রিলের শেষ হইতে বাহামার গবর্ণরের পদত্যাগ করিয়াছেন।

ষ্টকহলমের সংবাদে প্রকাশ, ষ্টকহলমের রাজনীতিবিদগণের মারফৎ জার্মানী মিত্রপক্ষের নিকট শান্তির প্রস্তাব পাঠাইয়াছিল, উহা সরাসরি অগ্রাহ্য হইয়াছে।

১৬ই মার্চ—পূর্ব জার্মান রণাঙ্গন—মার্শাল রকোসভস্কির বাহিনী জিনিয়া বন্দরে প্রবেশ করিয়াছে। কোলবের্গে অবরুদ্ধ জার্মানদের ধ্বংস করা হইতেছে এবং সোভিয়েট বাহিনী শহরের পূর্বাংশে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কোলবের্গ ষ্টেটিনের ৬৮ মাইল উত্তর-পূর্বে ও বার্লিনের ১৪৮ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।

জাপ সরকার টোকিও, ইয়োকোহামা, নাগোয়া, ওসাকা ও কোব—জাপানের এই পাঁচটি বৃহত্তম শহর হইতে অপ্রয়োজনীয় লোকদিগকে স্থানান্তরিত করার অনুরোধ জানাইয়া এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন।

১৭ই মার্চ—পূর্ব জার্মান রণাঙ্গন—বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ, গত ১২ দিন ধরিয়া জার্মানরা যে পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছিল, উহা প্রতিহত করিয়া মার্শাল তলবুখিনের বাহিনী বালাটন হ্রদ ও দানিয়ুবের মধ্যে এক ব্যাপক আক্রমণ সুরু করিয়াছে।

১৮ই মার্চ—পূর্ব জার্মান রণাঙ্গন—সোভিয়েট বাহিনী পোমেরানিয়ার বল্টিক উপকূলে কোলবের্গ বন্দর অধিকার করিয়াছে। লালফৌজ ব্র্যাণ্ডেনবুর্গ শহরও অধিকার করিয়াছে। ইহা কোয়েনিগস্‌বার্গের ১০ মাইল দূরে অবস্থিত।

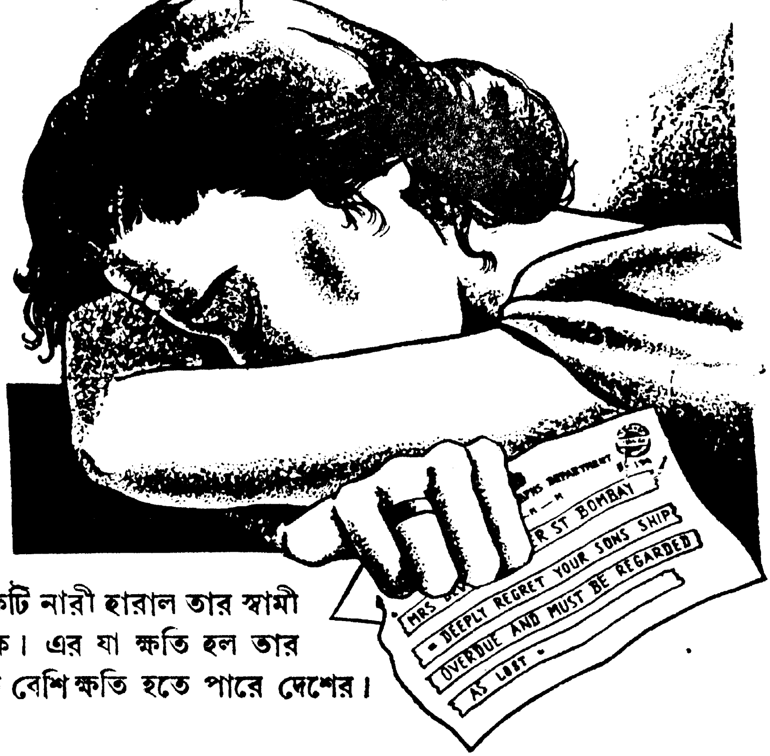
পশ্চিম জার্মান রণাঙ্গন—জেনারেল প্যাটনের তৃতীয় আর্মি কোবলেনৎস দখল করিয়াছে।

মিত্রপক্ষের ১৩ শতাধিক বোমারু বিমান বার্লিনের উপর দিবাভাগে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়।

১৯শে মার্চ—পূর্ব জার্মান রণাঙ্গন—জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষের ইস্তাহারে লালফৌজের তিনটি বড় রকম আক্রমণের উল্লেখ করা হইয়াছে। একটা আক্রমণ চলিতেছে—হাঙ্গেরীতে বালাটন হ্রদ ও দানিয়ুবের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। এই রণাঙ্গনে জার্মাণরা কঠোর আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে ব্যাপৃত আছে। অপর এক আক্রমণ চলিয়াছে উত্তর সাইলেসিয়ায়। তৃতীয় আক্রমণ চলিয়াছে ডানজিগ উপকূলে।

পশ্চিম জার্মান রণাঙ্গন—মার্কিন বাহিনী সাররুকেনের দক্ষিণ-পূর্বে সীগফ্রীড ব্যূহ ভেদ করিয়াছে।

কেউ একজন মুখ খুললো

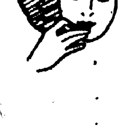


...আরও একটি নারী হারাল তার স্বামী অথবা পুত্রকে। এর যা ক্ষতি হল তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হতে পারে দেশের।

অনেক পুত্রহারা জননী ও স্বামীহারা স্ত্রী এইরকম একটি টেলিগ্রাম পেয়ে শোকের সাগরে ডুবেছেন। ওই জাহাজটিতে হয়ত ত্রিশ জন প্রাণ হারিয়েছে। এই সাহসী নাবিকদের সঙ্গে তলিয়ে গেছে হাজার হাজার টনের জিনিসপত্র। সে জিনিস হয়তো ছিল খাদ্য অথবা জ্বরাক্রান্ত অঞ্চলের জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় দামী ওষুধ। ওষুধের অভাবে হয়তো আরও হাজার হাজার মানুষের মরণ নিশ্চিত হয়ে গেল।

এত সব ঘটল কেউ একজন মুখ খুলেছিল বলে—

আমাদের শত্রুর চরদের বিরুদ্ধে আমরা এই অস্ত্র কাজে লাগাতে পারি—চুপ থাকা। অসাবধানে উচ্চারিত কথা তারা আমাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে পারে এবং লাগাচ্ছেও। কথা বলায় এবং লেখায় সাবধান থাকবেন কারণ ওদের ধৈর্য অসীম ; যতক্ষণ না একটা স্পষ্ট রূপ পায় ততক্ষণ পর্যন্ত ওরা টুকরো টুকরো কথা বা লেখা নিয়ে জোড়া দেবার চেষ্টা করে। তারপর এর সাহায্যে ওরা আমাদের মালবাহী জাহাজের নাবিকদের প্রাণ নাশ করে এবং আমাদের আমদানি জিনিসপত্র নষ্ট করে।



জাহাজ, সৈন্যদের গতিবিধি, নতুন রাস্তা, রেলপথ বা এরোড্রোম নিয়ে আলোচনা করা সম্পর্কে বিশেষভাবে সাবধান থাকবেন। এমন কি কারখানার কাজের খবরও ওদের কাছে বিশেষ মূল্যবান।

ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট কর্তৃক প্রচারিত

আপনার জন্য যেন বিপদ না ঘটে

AAA 1340

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালকঃ—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন — সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ] শনিবার, ১৭ই চৈত্র, ১৩৫১ সাল। Saturday, 31st March, 1945 [২১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

লর্ড ওয়াভেলের ব্রত

লর্ড ওয়াভেলের আকস্মিকভাবে উড়োজাহাজযোগে বিলাতে গমন সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। শুনিতেছি, ভারতের বড়লাট লণ্ডন শহরে পদার্পণ করিয়া ইণ্ডিয়া আফিসে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছেন; সুতরাং ভারতসচিব মিঃ আমেরীর সঙ্গে তাঁহার যে পরামর্শ চলিতেছে, ইহাও বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু কি বিষয়ে সেই পরামর্শ ইহাই অদ্যাবধি রহস্যস্বরূপ রহিয়াছে। ব্রিটিশ জাতির আন্তরিক অনুগ্রহ এবং ঔদার্য সম্বন্ধে যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহারা বলিতেছেন,



এবার ভারতের স্বাধীনতা লাভের দিন সত্যই নিকটবর্তী হইয়াছে এবং লর্ড ওয়াভেলের চেষ্টায়, আর সেই সঙ্গে সোসিয়ালিস্ট সহকারী ভারতসচিব লর্ড লিস্টোয়েলের সুপারিশের জোরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রভৃতি কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের মুক্তি অদূর ভবিষ্যতে সুনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য, ভারতশাসনে ব্রিটিশের কূটনীতি এবং সে নীতির গূঢ় গতির রীতির সহিত যাঁহারা পরিচিত আছেন, তাঁহারা কেহই লর্ড ওয়াভেলের বিলাত গমনের মধ্যে আকস্মিক এমন কিছু পরিবর্তন আশা করিতে পারেন না। ভারতের রাজনীতিক অচল অবস্থার প্রকৃতভাবে সমাধান করাই যদি লর্ড ওয়াভেলের উদ্দেশ্য থাকিত, তবে সেজন্য তাঁহাকে ভারতসচিবের গোপন কক্ষে গিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সে সমস্যা-সমাধানের পথ এতই সুস্পষ্ট যে, তন্নিমিত্ত লর্ড ওয়াভেল এতটা কষ্ট স্বীকার না করিলেও পারিতেন। আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস এই যে, সরলভাবে এবং কার্যকররূপে ভারতের রাজনীতিক সমস্যা সমাধানের একান্ত কোন উদ্দেশ্য এই উদ্যমের ভিতর নাই; পক্ষান্তরে অধিকতর কূট কৌশলে ভারতের দাবীকে প্রতিহত করিবার অভিপ্রায়ই ইহার মূলে রহিয়াছে। সেই কৌশল কিভাবে প্রয়োগ করিলে ব্রিটিশের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, সেই পন্থা উদ্ভাবনের জন্যই এইরূপ গম্ভীর এবং গোপন পরামর্শের প্রয়োজন হইয়াছে। ভারতবাসীদের স্বাধীনতার দাবীর জন্য ব্রিটিশের ভারত-শাসন-নীতি সম্পর্কে সম্মিলিত শক্তিবর্গের মধ্যে আন্তর্জাতিক সমস্যা সৃষ্টি করিবার হয়ত কিছু আশঙ্কা দেখা দিয়াছে; তাহা ছাড়া, বিলাতের নূতন নির্বাচনে চার্চিল প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দলের জোর অক্ষুণ্ণ রাখিবার ক্ষেত্রে কতকগুলি সমস্যাও দেখা দিতে পারে। এইসব বিষয়ে বিবেচনা করিয়া চার্চিল-আমেরী দল ভারত সম্বন্ধে নূতন রকমে ধাপ্পাবাজী চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; বাহ্যত ভারতবাসীদিগকে কিছু ক্ষমতা দানের অজুহাতে ব্রিটিশ স্বার্থকে সুদৃঢ় করাই তাঁহাদের এক্ষেত্রে প্রয়োজন; লর্ড ওয়াভেলের বিলাত গমনের মূলে এই প্রয়োজনই কাজ করিতেছে। এ সম্বন্ধে আশাশীলদের কল্পনা-গবেষণা একেবারেই অবান্তর কথা। আজ চার্চিল-আমেরীর দল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইবেন, কোন মূর্খও একথা বিশ্বাস করিতে পারিবে না। নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁহাদের লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে রাজস্ব বিলের পুনর্বিবেচনাও নাকচ হইয়াছে; কিন্তু ইহাও নূতন কিছু নয়। 'ভিটো'র জোরে তাহা মঞ্জুর হইবে এবং ভারতের শাসন-নীতি সনাতন ধারাতেই চলিবে। ভারতবাসীদিগের হাতে কিছু ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবার নামে, যুদ্ধোত্তর বাণিজ্য-প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ভারতের শোষণ-স্বার্থ ব্রিটিশের পক্ষে অব্যাহত রাখিবার জন্যই তাঁহারা সমধিক আগ্রহপরায়ণ হইবেন, ইহাই স্বাভাবিক এবং লর্ড ওয়াভেলের এই ব্রতের তাহাই ফল। কিন্তু ভারতবাসীদিগকে এই কৌশলে বিড়ম্বিত করা চলিবে না এবং ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদমূলক নীতির মর্মও এমন কৌশলে বিশ্বের দৃষ্টিতে চাপা দেওয়া সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে তেমন কূট-কৌশলের ফলে ভারতের স্বাধীনতাকামী সন্তানদলের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সংঘর্ষ সমধিক তীব্র আকারই ধারণ করিবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সে চেষ্টায় স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্ক্ষার যে আগুন ভারতবাসীদের অন্তরে জ্বলিতেছে, তাহা দ্বিগুণ হইয়া উঠিবে। সেই আগুনের প্রলয়-লীলায় সংকীর্ণ স্বার্থসেবীদের শেষের সম্বলটুকুও ভস্মীভূত হইয়া যাইবে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত তাহার অশেষবিধ কৃতপাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

রেশনিংয়ে নূতন ব্যবস্থা

বাঙলা দেশের রেশনিং বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এ সি হার্টলী শহরের রেশন ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী ২রা এপ্রিল হইতে মাথাপিছু চিনির বরাদ্দ দেড় পোয়া হইতে কমাইয়া ১ পোয়া করা হইবে; সুতরাং দেখিতেছি, রেশনিং ব্যবস্থার প্রথম দফা এই সংস্কারে শহরবাসীদের সুবিধার চেয়ে অসুবিধার কারণই বেশী ঘটিবে এবং অবস্থার ইহাতে উন্নতি না ঘটিয়া বরং এতদিন পরে অধিকতর অবনতি ঘটিল। শহরে দুধ নাই, অতঃপর চিনি জোগাড় করাও প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে দুর্ঘট হইবে এবং সেক্ষেত্রে

চোরাবাজারের দ্বারই উন্মুক্ত হইবে। মিঃ হাট্‌লী আমাদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছেন; তিনি বলিতেছেন, চিনি কমিল বটে, কিন্তু চাউল পাইবে। এপ্রিল মাসের শেষাশেষি রেশনিংয়ের দোকানে নগদ ২৫৲ টাকা মণ দরে মিহি চাউল পাওয়া যাইবে; ইহা ছাড়া বর্তমানে ১৬।০ দরে যে চাউল পাওয়া যাইতেছে, তদপেক্ষা সস্তাদরে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ধরণের চাউল সরবরাহ করার সম্বন্ধেও কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করিতেছেন। বর্তমানে যে চাউল যে দরে পাওয়া যাইতেছে, সে চাউল সেই দরে পাওয়া যাইবে কি না, সরকারী ঘোষণায় তাহা জানা যায় না। বলা বাহুল্য, সরকারী এই ঘোষণায় রেশনিংয়ের বর্তমান কদর্য চাউলে অভ্যস্ত শহরবাসীদের পক্ষে এতদিন পরে উল্লসিত হইবার কোন কারণই আমরা দেখিতে পাইতেছি না। শহরে বর্তমানে যে দরে চাউল ক্রয় করিতে হয়, বাঙলার কোথায়ও তত উচ্চদরে চাউল বিক্রীত হয় না। আমরা যতদূর খবর রাখি, তাহাতে জানি, বাঙলা দেশের সর্বোৎকৃষ্ট চাউলও বর্তমানে ১২৲ টাকা মণ দরে বিক্রীত হইতেছে। দিনাজপুর জেলা মিহি চাউলের জন্য প্রসিদ্ধ; দিনাজপুর রাইস্ মিল এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী জানাইতেছেন যে, ১৯৪৩ সালের শেষভাগে গভর্নমেণ্ট ঐ জেলা হইতে ১৬৲ টাকা মণ দরে উৎকৃষ্ট গোবিন্দভোগ চাউল ক্রয় করিয়াছেন; আজকাল চাউলের দর আরও কমিয়াছে। এ অবস্থাতেও শহরবাসীদের জন্য ২৫৲ টাকা মণ দরে উৎকৃষ্ট চাউলের ব্যবস্থা করা হইতেছে এমন ঘোষণায় সরকারী রেশন ব্যবস্থার মহিমায় সত্যই আমরা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি! কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে স্বল্প মূল্যের চাউলের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারেন। তাঁহারা বলিবেন, বেশী দরে দেবভোগ্য চাউল বোম্বাইয়ের ধনীদের মত যাহারা সংগ্রহ করিতে না পারিবে, তাহাদের জন্য সস্তায় চাউলেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে; কিন্তু এই সস্তার কোন অবস্থা সরকারী ঘোষণায় তাহা জানা যায় না। বর্তমান মূল্যের অপেক্ষা সুলভে যে চাউল সরবরাহ করা হইবে, তাহা মানুষের খাদ্যের উপযুক্ত হইবে কি না, এ বিষয়ে আমাদের মনে এখনও সন্দেহ থাকিয়া যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে রেশনিং ব্যবস্থায় যে চাউল দেওয়া হইতেছে, তাহার মণ ১৬।০ আনা ধার্য হওয়ার পক্ষে যেমন কোন যুক্তি নাই, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট চাউলের মূল্য প্রতি মণ ২৫৲ টাকা ধার্য করা তেমনই অযৌক্তিক। সাধারণ বাজার দরের অপেক্ষা রেশনিংয়ের এমন উচ্চহার নির্ধারণে ব্যাপারটা আগাগোড়া দেশের এই দুর্দিনে সরকারের দিক হইতে একটা অনুচিত রকম লাভের কারবারে পরিণত হইয়াছে।

পরাধীনতার অপমান

'ইণ্ডিয়ান ইমিগ্রেশন বিলে'র আলোচনা রিপাবলিকান দলের বিরুদ্ধতায় অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হইয়াছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতির সমর্থনের পর সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বৎসরে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় ভারতীয়গণের বসবাস ও অধিকার প্রদানের জন্য আইন অবিলম্বে পাশ হইবে। কিন্তু এইভাবে প্রস্তাবিত বিলটির আলোচনা স্থগিত হওয়ায় যথেষ্ট নৈরাশ্যের সঞ্চার হইয়াছে এবং ইহাতে ভারতে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হইবে। বিলটি স্থগিত রাখিবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া রিপাবলিকান দলের মিঃ লিওনার্ড এলেন্ বলিয়াছেন:

> "চীন আমাদের মিত্র ও স্বাধীন জাতি। ভারত স্বাধীন নয়। সেখানকার রাজনীতিক অবস্থাও বিশৃঙ্খল। আমার মতে ভারতীয়কে নাগরিক অধিকার দান করা এই দেশের পক্ষে বিপজ্জনক।"

ভারত স্বাধীন নয়, এবং এই পরাধীনতার অপমান ও হীনতার জন্যই ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত স্বাধীন দেশে নাগরিক অধিকারের কৌলিন্য লাভ করিতে পারিবে না, সরল ভাষায় মিঃ লিওনার্ড এলেনের বক্তব্য ইহাই। তজ্জন্য রাজনীতিক অবস্থার বিশৃঙ্খলার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই রাজনীতিক অবস্থার বিশৃঙ্খলা অর্থে মিঃ এলেন কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহা জানি না। তবে যদি তিনি ইহার অর্থে ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়া থাকেন, তবে আমরা বলিব, মিঃ এলেন জাগিয়া ঘুমাইতেছেন। ভারতের স্বাধীনতা লাভের অন্তরায়ের অজুহাত স্বরূপ যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কথা অসঙ্গত জোরের সঙ্গে বলা হয়, বাস্তবিকপক্ষে তাহার অস্তিত্ব নাই। দুই একজন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রসাদপুষ্ট নির্লজ্জ সুবিধাবাদী সাম্প্রদায়িক সমস্যার ধুয়া তোলেন; তাঁহারা কে, এবং এই সমস্যা কাহাদের সৃষ্টি, তাহা আমেরিকায় শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও অন্যান্য বিশিষ্ট ভারতীয়গণ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে মিঃ লিওনার্ড এলেন রাজনীতিক অবস্থার বিশৃঙ্খলার কথা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তাঁহাদের মত অনুদার প্রকৃতি অদূরদর্শী ব্যক্তি যে অন্ধ অহমিকার দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন তাহা ধূলিসাৎ করিয়া না দিতে পারিলে তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হইবে না। ভারত স্বাধীন হইলে সম-মর্যাদাসম্পন্ন দেশ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভারতীয়গণের নাগরিক অধিকারদানে বাধ্য করা ভারতের পক্ষে অসম্ভব ছিল না; মিঃ এলেন সম্ভবতঃ সে সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। ভারত পরাধীন বলিয়াই তাহাকে এইরূপে অপমান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে। একমাত্র স্বাধীনতাই ভারতের পরাধীনতার এই নিদারুণ অপমান ও গ্লানি ঘুচাইতে পারে।

মন্ত্রিদলের পরাজয়

গত ১৪ই চৈত্র বুধবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কৃষি সম্পর্কিত বাজেটের দাবীতে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের পরাজয় ঘটিয়াছে। দাবীর পক্ষে ৯৭ ভোট এবং বিরুদ্ধে ১০৬টি ভোট হয়। ১৭ জন শ্বেতাঙ্গ সদস্য একযোগে যথারীতি মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের অবিমৃষ্যকারিতাপূর্ণ নীতির দৌড় চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, আমরা কয়েক দিন পূর্ব হইতেই ইহার প্রতিক্রিয়ার অনুমান করিতেছিলাম। তথাপি এই আঘাত যেন কতকটা আকস্মিকভাবেই তাঁহাদের উপর আপতিত হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলীর কর্মনীতি বাঙলার নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রগতিবিরোধী নীতিকে উন্মুক্ত করিয়াছে; আসাম এমনকি, সিন্ধু প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলীও রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি, দুর্নীতি দলন প্রভৃতি ব্যাপারে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলীকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। বাঙলাদেশের কোন সমস্যা সমাধানেই এই মন্ত্রিমণ্ডলী কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহাদের চোখের সম্মুখেই দেশের বুকের উপর দিয়া দুর্নীতির স্রোত বহিয়া চলিয়াছে; অন্নহীন, বস্ত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন দুর্গত নরনারীর আর্তনাদ বাঙলার আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া তুলিয়াছে, এতদিন পরে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। শ্বেতাঙ্গদের ভোটেই বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের প্রধান সম্বল ছিল; কিন্তু সে সম্বল সত্ত্বেও তাঁহারা পর্যাপ্তসংখ্যক ভোটে পরাজিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রতি দেশবাসীর অনাস্থা বুধবারের ভোটে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ়ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ সংরক্ষণমূলক কৌশলে গঠিত; জনমতের অভিব্যক্তি সেখানে খুব সহজ নয়। সে অবস্থাতেও মন্ত্রিমণ্ডল একটি দুইটি নয়, নয় ভোটে পরাজিত হইয়াছেন। ইহার পর তাঁহাদের পক্ষে পদত্যাগ করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের নিজেদের কথা বলিতে গেলে বর্তমান শাসনতন্ত্রের প্রতিই আমাদের কোন আস্থা নাই, সেইরূপ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের যে অভিনয় এই শাসনতন্ত্রের আশ্রয়ে চলিতেছে, তৎসম্বন্ধেও আমরা বিশেষ কোনরূপ আশা পোষণ করি না। তথাপি স্যার নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রিমণ্ডলের এই পরাজয়ে দেশব্যাপী দুর্নীতি ও অনাচারের বিরুদ্ধে জাতির বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের যে বিক্ষোভ প্রকাশ পাইয়াছে, আমরা তাহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

দেশের কথা

বাঙলার বিগত দুর্ভিক্ষ মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল এ বিষয়ে অনেকেই একমত। লক্ষ্ণৌয়ের 'পাইওনিয়র' পত্র বাঙলায় বস্ত্র-সঙ্কটের আলোচনা করিয়া সম্প্রতি এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই দুর্ভিক্ষ সম্পূর্ণভাবে না হইলেও অন্ততঃ আংশিকভাবে এবং বহুলাংশে মানুষের দ্বারা সৃষ্ট। সহযোগী 'পাইওনীয়ারে'র মত এই যে, এ সম্পর্কে শাসনবিভাগও দুর্নীতি হইতে মুক্ত নহেন এবং বাঙলার এই শোচনীয় অবস্থা সমগ্র শাসন বিভাগের নিন্দার কারণ সৃষ্টি করিয়াছে। এদিকে বাঙলার অসামরিক বিভাগের মন্ত্রী অবস্থার গুরুত্ব এমনভাবে স্বীকার করিতেছেন না। তিনি সেদিন সাংবাদিকগণের বৈঠকে এ সম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করেন, তাহাতে বলেন—

ব্যবস্থা যতটা গুরুতর নয়, তাহার অপেক্ষা অধিক গুরুতর করিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইতেছে, আমি ইহার নিন্দা না করিয়া পারি না। অভাব যদি ঘটিয়াই থাকে, তবে আমাদের কর্তব্য হইল, উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হাতে যাহা আছে, তাহার সদ্ব্যবহার করা, দেশের লোককে আতঙ্কের মধ্যে ফেলা উচিত নয়। বস্ত্রের অভাবকে বাড়াইয়া দুর্ভিক্ষে পরিণত করা হইতেছে; ইহার আগে পিছে চলিতেছে, সমাজ বিরোধী অনাচার। আমি জানি যে, অভাব খুবই দেখা দিয়াছে এবং আমি ইহাও জানি যে, কোন কোন স্থানে বস্ত্রের শুধু অভাবই ঘটে নাই, বাজারে কাপড় পাওয়াই যাইতেছে না। তথাপি চাহিদা নিশ্চয়ই এতটা গুরুতর আকার ধারণ করে নাই যে, আজ যদি লোকে কাপড় না পায় তবে, কাল হইতে তাহারা উলঙ্গ অবস্থায় থাকিবে; আমি অবস্থা বিশেষভাবে জানিয়াই একথা বলিতেছি যে, স্বাভাবিক অবস্থাতেও এদেশে এমন পরিবার আছে এবং এমন লোক এদেশে থাকে, যাহারা যথেষ্ট জোড়া কাপড় সংগ্রহ করিতে পারে না।

মিঃ সুরাবর্দীর এই মন্তব্য পাঠ করিয়া ফরিদপুরের একজন শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেটের কথা মনে পড়িতেছে; তিনি দুর্ভিক্ষের অভিযোগের উত্তর শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, গাছে যতদিন পর্যন্ত পাতা আছে, ততদিন এদেশে দুর্ভিক্ষ হইতেই পারে না। আমরা শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেটের সেই দৃষ্টি ও মিঃ সুরাবর্দীর দৃষ্টির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখিতেছি না।

কাপড়ের দোকানে হানা

অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের মত গত ২৫শে মার্চ রবিবার শতাধিক পুলিশ বাহিনী কলিকাতায় বড়বাজার, জোড়াবাগান, বহুবাজার ষ্ট্রীট, হেয়ার ষ্ট্রীট অঞ্চলে প্রায় তিন হাজার কাপড়ের দোকানে হানা দেয়। এইসব দোকানে খানাতল্লাসীর ফলে তিনশত গাইটের অধিক অননুমোদিত কাপড় ধরা পড়িয়াছে বলিয়া শোনা যায়। এই তল্লাসীর আশ্চর্য সাফল্যে উল্লসিত হইয়া পুলিশ কর্মচারীরা কেহ কেহ বলিয়াছিলেন,—"কে বলে কলিকাতায় কাপড়ের দুর্ভিক্ষ?" কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কাপড়ের দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে; ইহার কারণ কি? কর্তৃপক্ষ এতদিন পর্যন্ত কোন্ আশায় রণ-পয়োধির লহরী গণনা করিতেছিলেন এবং সেই সুযোগে চোরা-বাজারী কারবার চলিতেছিল? মিঃ সুরাবর্দী তক্তপোষের নীচে পূর্বে যেমন ধান চাউল পাইয়াছিলেন, এবারও তেমনি কাপড় পাইয়াছেন! কিন্তু আমাদের কষ্ট তাহাতে দূর হইবে কি? প্রকৃত প্রস্তাবে শুধু তিন হাজার গাইট চোরা কাপড় উদ্ধারেই এ সমস্যা মিটিবে না—যথাযোগ্য সরবরাহ এবং বণ্টন ব্যবস্থার উপরই তাহা নির্ভর করিতেছে। বাঙলা সরকার এপর্যন্ত পাকাপাকি তেমন ব্যবস্থা যে করিয়াছেন, এমন ভরসা দিতে পারেন নাই, তাঁহারা এখনও ভবিষ্যতের ভরসা দিতেছেন। অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া আমাদিগকে আপাতত অর্ধনগ্নদেহেই অবস্থান করিতে হইবে, কারণ কাপড়ের কারবার বন্ধ হইয়াছে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে কে বলিবে! ভারত সরকার হইতে প্রত্যহ ১৫ গাড়ি করিয়া কাপড় কলিকাতায় আসিতেছে; কিন্তু পথের মাঝেই কোন্ দিকে যাইবে, কে জানে? মোটের উপর, আমাদের অদৃষ্টে এখন কাপড় মিলিবে না —কখন কি ভাবে মিলিবে, তাহাও সন্দেহের বিষয়। সরকারী ব্যবস্থার এমনই তাৎপর্য!

বস্ত্রের রেশনিং

কিছুদিনের মধ্যেই কাপড়ের রেশনিং প্রবর্তিত হইতেছে, মিঃ সুরাবর্দী আমাদিগকে এই আশ্বাস দান করিয়াছেন। কিন্তু চিনি, কেরোসিন তেল, লবণ এসব ক্ষেত্রে রেশনিং ব্যবস্থার ফল যে কি আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে অসামরিক বিভাগের মন্ত্রীর এ আশ্বাসেও আমরা ভরসা কিছুই পাইতেছি না। মিঃ সুরাবর্দী বলিয়াছেন যে, তিনি অল্পদিনের মধ্যেই মফঃস্বলে অধিক পরিমাণে চিনি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন এবং ১লা এপ্রিল হইতে সরিষার তেলের দুঃখ দূর হইবে। তাঁহার অতীতের প্রতিশ্রুতির মত এসব প্রতিশ্রুতিও আমাদের মনে কোনই গুরুত্ব সঞ্চার করে না।

বস্ত্র সঙ্কটের গুরুত্ব

অবস্থার গুরুত্বের যেখানে উপলব্ধির অভাব, সেখানে প্রতিকারের কার্যকর নীতির প্রস্তাবও তেমন টিকে না ইহাই মনে হয়, কিংবা প্রতিকার ব্যবস্থা উপযুক্ত হয় না; কারণ দেশবাসীর দুঃখকষ্টের সম্বন্ধে বেদনাই এক্ষেত্রে প্রতিকার-পন্থা নির্ধারণে আন্তরিক প্রেরণা জোগায়। মিঃ সুরাবর্দী আজ পুলিশের দলবল লইয়া চোরাবাজার দখল করিতে বাহির হইয়াছেন; কিন্তু এতদিন পর্যন্ত এই সমস্যাকে তিনি লঘুভাবেই দেখিয়াছেন। নিখিল ভারতীয় মহিলা সমিতি সম্প্রতি তাঁহাদের একটি বিবৃতিতে বাঙলার বস্ত্র-সঙ্কটের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলেন—

বাঙলার বস্ত্রের দুর্ভিক্ষের তীব্রতা ১৯৪৩ সালের খাদ্যের দুর্ভিক্ষকেও প্রায় ছাড়াইয়া গিয়াছে। মাথা পিছু ১০ গজ কাপড়ের বরাদ্দ, সকলের পক্ষে বিশেষভাবে নারীদের পক্ষে খুবই কম। অন্যান্য প্রদেশের বরাদ্দ বাঙলাদেশের অপেক্ষা অধিক কেন করা হইল আমাদের পক্ষে ইহা বুদ্ধির অগম্য। কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে ভারতের বিশেষভাবে বাঙলার প্রয়োজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আমরা ইহাই শুনিতেছি যে, বস্ত্রের অভাবের জন্য বর্তমানের এই বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নাই; চোরা-বাজারের জন্যই ইহা ঘটিয়াছে; যদি তাহাই হয়, তবে এতদিনের মধ্যেও গভর্নমেণ্ট চোরাবাজার দমন করিতে সমর্থ হইলেন না, ইহা বিস্ময়ের বিষয়। যদি এজন্য তাহাদের প্রকৃত আন্তরিকতা থাকিত, তবে ইহা সম্ভব হইত কি? কাপড়ের জন্য লাইন, বন্দী অবস্থায় দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে করিতে নরনারীরা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে এবং মোটর চাপা পর্যন্ত পড়িয়াছে, এমন খবরও আমরা পাইয়াছি। বস্ত্রের সঙ্কট কতটা শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে এই সব ঘটনা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা এই আশা করি যে, কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে রেশনিং ব্যবস্থার সাহায্যে বাঙলাদেশের সর্বত্র যাহাতে লোকে কাপড় সহজে ক্রয় করিতে পারে এবং মাথাপিছু কাপড়ের বরাদ্দ বৃদ্ধি পায়, এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।"

বাঙলাদেশের মাথাপিছু ১৮ গজ কাপড় দাবী করিয়া সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে মাথাপিছু ১০ গজ কাপড়ের বরাদ্দের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া মিঃ হুমায়ুন কবীর বলেন—

"মাথাপিছু ১০ গজ কাপড়ের অর্থ প্রত্যেকের জন্য এক জোড়া ধুতি ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ অবস্থায় খালি গায়ে থাকিতে হইবে। মিঃ সুরাবর্দী বস্ত্র-বর্জন আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন কি না জানি না। কুড়ি বৎসর পরে তিনি কি পুনরায় তাঁহার পূর্বতন রাজনীতিক মতবাদে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন? নিষ্ঠাবান্ কংগ্রেস কর্মীস্বরূপে তাঁহার রাজনীতিক জীবন আরম্ভ হয়। খদ্দরের কটিবাসই ভারতের বস্ত্রসমস্যার সমাধানের উপায়। ১০ গজ কাপড় বরাদ্দ করিয়া মিঃ সুরাবর্দী কি এতদিন পরে এই সত্যই সমর্থন করিতেছেন? যেদিন মিঃ সুরাবর্দী, এই সভার শ্বেতাঙ্গ সদস্যগণ, এমন কি মাননীয় প্রেসিডেণ্ট মহোদয়ও শুভ্র খদ্দরের কটিবাসে ভূষিত হইয়া সভায় যোগ দিবেন, আমি সেই দিনের জন্য আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।"

মিঃ কবীর যে আশা করিয়াছেন, দারিদ্র্যের নিমিত্ত তেমন বেদনাই যদি এদেশের সমাজ-জীবনে আন্তরিক হইত, তবে সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের দুর্দশা লইয়া পাপ-ব্যবসা চালাইবার দুষ্প্রবৃত্তির এমন তান্ডব আমরা সর্বত্র দেখিতে পাইতাম না।

শাসন-বিভাগের দুর্নীতি

আমরাও স্বীকার করি রেশনের ব্যবস্থা মন্দ নহে। এসব ক্ষেত্রে সেই ব্যবস্থাই অন্যান্য দেশেও অবলম্বিত হইয়া থাকে। কিন্তু দেখিতেছি এদেশে সরকারী ব্যবস্থার মধ্যেও দুর্নীতি প্রভাব বিস্তার করিতেছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার শ্বেতাঙ্গ সদস্য মিঃ ডবলিউ লেড-ল মন্ত্রিদলের সমর্থক হইয়াও সরকারী নিয়োগ নীতির সমর্থন করিয়া উক্তিতে পারেন নাই। তিনি ক্ষেত্র বিশেষে মন্ত্রীদের দল-পোষণের নীতির সন্ধান পাইয়াছেন। সরকারী বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে লোক নিয়োগ সম্বন্ধে রাজনীতিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং আশ্রিত-পোষণের নীতি সর্বভাবে পরিবর্জিত হয়, সেজন্য তিনি কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করিতে মন্ত্রিমণ্ডলীকে পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের শ্বেতাঙ্গ সদস্য মিঃ ডি গ্ল্যাডিং এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলেন—

আমার বিশ্বাস এই যে, সরকারী বিভাগে পূর্বাপেক্ষা অধিক দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে এবং যে সব বিভাগের এতদিন পর্যন্ত সততার খ্যাতি ছিল, সে সব বিভাগের অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে ইহা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই দুর্নীতি রোধ করিবার জন্য অভিযুক্ত কর্মচারীদিগের বিচার করিবার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত হওয়া দরকার; দ্বিতীয়তঃ এতৎসম্পর্কিত অপরাধের বিচারের জন্য আইনটি অর্ডিন্যান্সে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন; নিজেদের নির্দোষিতা প্রমাণের ভার অভিযুক্ত কর্মচারী-দের উপর আইনত থাকা কর্তব্য। তৃতীয়ত কর্মচারীদের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা সরকারের থাকা দরকার। তাহাদের ব্যাঙ্কের হিসাব সরকার পরীক্ষা করিতে পারিবেন, এ ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই সব অপরাধের সন্ধানের জন্য উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন গোয়েন্দা বিভাগ রাখিতে হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, দুর্নীতির বিভীষিকা শুধু ডক্টর নলিনাক্ষ সান্যাল কিংবা শ্রীযুত অতুলচন্দ্র সেন বা রায়বাহাদুর শ্রীযুত কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কেই অভিভূত করে নাই, শ্বেতাঙ্গ সমাজেও সে সত্য শঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছে।

সরকারপক্ষের উক্তি ও যুক্তি

প্রধান মন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দীন এবং সরবরাহসচিব মিঃ সুরাবর্দী এই দুইজনেই প্রতিপক্ষের অভিযোগের উত্তরে কতকগুলি চোখা চোখা কথা বলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা ইহা তলাইয়া বুঝেন নাই যে, শুধু যুক্তিহীন একান্ত অবান্তর ফাঁকা কথার জোরে অভিযোগ খণ্ডন হয় না। "ভয়-গর্বোচ্চারণমেব পাণ্ডিত্যহেতু" ঃ—বিরুদ্ধ-পুরাণের মতে মূর্খের দেশেই ইহা শোভা পায়। ঢাকা জেলার বস্ত্র বণ্টন-ব্যবস্থার জন্য যাঁহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে, তিনি ঐ ঢাকার নবাব পরিবারের লোক এবং অপরাপর কতকগুলি দায়িত্বসম্পন্ন পদে যে সেই পরিবারের লোককে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং মন্ত্রীদের পক্ষভুক্ত কতকগুলি লোককে যে কণ্ট্রাক্টের কাজ দেওয়া হইয়াছে, স্যার নাজিমুদ্দীন একথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। মিঃ সুরাবর্দীর উক্তি এক্ষেত্রে সর্বাধিক স্পষ্ট। তিনি উত্তেজিত-ভাবে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিয়া বলেন—

মিঃ সেলিম এইরূপভাবে কারবার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বা ব্যবসা করিতেছেন, ইহা কি অপরাধ? ঢাকার নবাব পরিবারের দুইজন সদস্য ঘটনাক্রমে বাঙলার মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এজন্য নবাব পরিবারের কোন সদস্যের পক্ষে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া অথবা সরকারী চাকুরী গ্রহণ করা কি অপরাধের বিষয়? তাঁহারা যদি অপরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে না চাহেন, তাহা কি দোষের হইবে?"

সুরাবর্দি সাহেবের এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব—না, দোষের কিছুই নয়! বর্তমানের বাজারে যাঁহার পক্ষে যেমন করিয়া সম্ভব কিছু করিয়া লইতে পারিলেই সুবিধা। ঢাকার বিখ্যাত নবাব পরিবারের কোন কোন সদস্যকে পরিবারের কৃতী ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত, এখন বিদ্যার জোর না থাকিলেও বাঙলার বর্তমান অবস্থায় তাঁহারা নিজেরা উপার্জনশীল হইয়াছেন। ইহা তো ভাল কথা; আর ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন অভিজ্ঞতা না থাকিলেও তাঁহারা যে সরকারী কণ্ট্রাক্টরী পাইয়াছেন এবং ব্যবসা করিতেছেন ইহাও সুখের বিষয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিবে শুধু এই যে, ব্যবসা সম্বন্ধে যাহাদের অভিজ্ঞতা আছে, শুধু তাহাদিগকেই লাইসেন্স দেওয়ার জন্য ভারত গভর্নমেণ্টের নির্দেশ ছিল। এ সব ক্ষেত্রে তাহা প্রতিপালিত হইয়াছে কি? মিঃ সুরাবর্দি আরও বলিয়াছেন যে, ১৯৪২ সালে ২০ হাজার লোককে কাপড়ের ব্যবসা করিবার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়, ১৯৪৪ সালে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৮০ হাজারে উঠিয়াছে। কিন্তু লাইসেন্স এইভাবে বৃদ্ধি করার ফলে কাপড়ের বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটা উচিত ছিল, তাহা হইয়াছে কি? তাহা তো হয়ই নাই; পক্ষান্তরে প্রকৃতপক্ষে কাপড়ই প্রকাশ্য বাজার হইতে অদৃশ্য হইয়াছে; মিঃ সুরাবর্দি এই রহস্য উদ্ঘাটন করেন নাই।

দায়িত্ব কাহার?

বস্ত্রের রেশনিং সার্থক করিতে হইলে বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণে সততা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, আমদানী বাড়াইতে হইবে। আমরা একথা পূর্বেও বলিয়াছি এবং আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, দেশজোড়া দুর্নীতির যে স্রোত চলিতেছে, তাহাকে রোধ করিতে হইলে জনহিতব্রত সেবাপরায়ণ কর্মীদের প্রভাব শাসন-নীতিতে প্রত্যক্ষভাবে থাকা প্রয়োজন; মহৎ আদর্শের প্রেরণা দেশের সর্বত্র জাগাইয়া তোলা দরকার; কিন্তু বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল সে পন্থা অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন। ডাক্তার খান সাহেব উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া যে দৃঢ়তা এবং সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন, বাঙলার মন্ত্রীদের সে সাহস নাই। দেশ-সেবাব্রতী রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দান করিয়া দেশব্যাপী দুর্নীতির সমস্যার সম্মুখীন হইতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এ সম্বন্ধে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী সেদিন বলিয়াছেন—

"ব্যবস্থা পরিষদের যে সব সদস্য বর্তমানে রাজবন্দীস্বরূপে আছেন, তাহাদিগকে পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত হইতে দেওয়া সম্ভব নয়; যেজন্য তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হইতেছে না, সেজন্যই তাহাদিগকে সভায় উপস্থিত হইতেও দেওয়া যায় না। তাঁহারা সভায় উপস্থিত হইবেন, অথচ অপর সদস্যদের সঙ্গে মিশিবেন না, এক কোণে তফাৎ থাকিবেন, এমন বলা চলে না; কারণ, একবার তাঁহারা সভায় আনীত হইলে তাঁহারা আইনত নিজেরা অধিকার লাভ করিবেন। অন্য কোন প্রদেশে যে এইসব সদস্যদিগকে আইনসভায় উপস্থিত হইতে দেওয়া হইয়াছে, এরূপ নজীর নাই। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহাদিগকে উপস্থিত হইতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। রাজনীতিক বন্দীদিগকে কতকগুলি কারণে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয় না। যুদ্ধের অবস্থার জন্য এই আশঙ্কা ঘটে যে, ভারতের সীমান্ত অঞ্চলের অবস্থা যদি খারাপ হয়, তবে সামরিক কর্তৃপক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা এবং সমরসম্ভার প্রেরণের চেষ্টা করিতে পারেন; সেক্ষেত্রে এই সব লোক ধ্বংস নীতি অবলম্বনের দ্বারা অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে। একথা অস্বীকার করা চলে না যে, জাপানীদের সঙ্গে অন্তত একজন বাঙালী আছেন, যিনি বেতারযোগে প্রত্যহ এই কথা বলিতেছেন যে, তোমরা প্রস্তুত হইয়া থাক, আমি যখন ওখানে যাইব, তখন তোমরা এইভাবে আমাকে সাহায্য করিবে। এই সভার সদস্যগণ, যাঁহারা রেডিও শুনিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুকে প্রত্যহ উপদেশ দিতে শুনিয়াছেন। তাঁহারা ইহাও জানেন যে, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু অপরপক্ষে যোগদান করিবার পূর্বে এইসব লোকের তিনি প্রীতি এবং শ্রদ্ধার অধিকারী ছিলেন। আতঙ্কের কারণ যখন রহিয়াছে, সে অবস্থায় গভর্নমেণ্টের পক্ষে কি তেমন ঝুঁকি লওয়া সঙ্গত হইতে পারে?"

স্যার নাজিমুদ্দিন অমূলাতঙ্কসুলভ কতকগুলি বাঁধাবুলিই এক্ষেত্রে আওড়াইয়া-ছেন। যুদ্ধের অবস্থার খোঁজ যাঁহারা রাখেন, তাঁহারাই জানেন, আশঙ্কার বাস্তব কারণ কিছুই নাই। আসাম সরকার কয়েক-জন কংগ্রেস-নেতাকে বন্দী থাকা অবস্থাতেও ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিতে এক সময় অনুমতি প্রদান করিয়া-ছিলেন; কিন্তু তাহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য

বিপর্যস্ত হয় নাই। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির বিরুদ্ধে স্যার নাজিমুদ্দিন আজ যে যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন, কিছুদিন পূর্বে সর্দার আওরংজেব খানও অনুরূপ যুক্তিই উপস্থিত করিয়াছিলেন; কিন্তু আজ ডাক্তার খান সাহেবের চেষ্টায় ভারত গভর্নমেণ্টের আদেশে বন্দী সীমান্ত-নেতা খান আব্দুল গফুর খাঁও মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ভারত গভর্নমেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব স্যার ফ্রান্সিস মুডী সেদিন স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়া দিয়াছেন যে, সীমান্তের নবগঠিত গভর্নমেণ্টের মতে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তিদান করা বর্তমানে নিরাপদ; এজন্যই তথাকার বন্দিগণ মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এ ব্যাপারের জন্য ভারত গভর্নমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের পরামর্শ লইতেও হয় নাই। যদি ভারত সরকারের কাছে তাঁহারা পরামর্শ চাহিতেন, তবে তাঁহারা বরং বিরক্ত বোধই করিতেন।

আসামে নূতন মন্ত্রিমণ্ডল

সুতরাং সামান্য কয়েকজন ব্যতীত অধিকাংশ বন্দীদের দায়িত্ব প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের হাতেই আছে এবং তাঁহারা মনে করিলেই তাঁহাদিগকে মুক্তি দিতে পারেন। বাঙলার রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে স্যার নাজিমুদ্দিন নিরাপত্তার যে মামুলী যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা যে একান্তই ভিত্তিহীন, আসামের নবগঠিত সম্মিলিত মন্ত্রিমণ্ডলের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। আসামের নূতন মন্ত্রিমণ্ডল নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন—

(১) ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে; (ক) বর্তমানে আসামে যেসব নিরাপত্তা বন্দী আছেন, তাঁহাদের দুই-তৃতীয়াংশকে ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে মুক্তিদান করা হইবে। আসাম ব্যবস্থা পরিষদের বন্দী সকল সদস্য এবং বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীদিগকে অবিলম্বে মুক্তিদান করা হইবে। অবশিষ্ট নিরাপত্তা বন্দীকে যথাসম্ভব সত্বর মুক্তি দেওয়া হইবে; কিন্তু এই সময়ের মেয়াদ কোন ক্রমেই জুন মাসের পরে যাইবে না।

(খ) দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দীদিগকেও অবিলম্বে মুক্তিদান করা হইবে; শুধু যাঁহারা ধ্বংসমূলক কার্য প্রভৃতি গুরুতর রকমে নিন্দিত অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেই এইভাবে মুক্তি দেওয়া হইবে না; তাঁহাদের বিষয়েও পুনর্বিবেচনা করা হইবে এবং তাঁহাদের কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া পরে দোষের বিচার অনুসারে তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে।

(গ) সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সব নিষেধাজ্ঞা আছে, সংরক্ষিত অঞ্চল এবং লক্ষ্মীপুর জেলার সদর মহকুমা ব্যতীত অন্য সব জায়গা হইতে সেগুলি প্রত্যাহার করা হইবে। কিন্তু ডিব্রুগড় শহর এবং খাউয়াং অঞ্চলের দক্ষিণ দিকে ঐ মহকুমার উত্তর অঞ্চলে সিসি ও ভেখাজ মৌজাগুলিতে এইরূপ কোন নিষেধবিধি থাকিবে না। স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান বা আইনসভার নির্বাচন সম্পর্কে কোন স্থানেই সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা প্রভৃতি নিষিদ্ধ হইবে না।

(ঘ) আসামে কোন কংগ্রেস কমিটির উপর যদি এখনও নিষিধবিধি থাকে, তাহা অবিলম্বে প্রত্যাহৃত হইবে।

(ঙ) ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদের উপর যে সব নিষেধবিধি আছে, সেগুলি অবিলম্বে প্রত্যাহৃত হইবে। কয়েকটি ক্ষেত্রে মাত্র পরীক্ষা-সাপেক্ষ ব্যতীত অপর সকল রাজনৈতিক বন্দীর সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

(২) শস্য সংগ্রহ এবং সরবরাহ সম্বন্ধে সরকারী ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করিয়া যাহাতে জনসাধারণের প্রতি সরবরাহ ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা করা হইবে এবং দুর্নীতির উৎখাত সাধন করিয়া এই ক্ষেত্রে জনসাধারণের সমধিক সহযোগিতা গ্রহণ করা হইবে।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং শাসন বিভাগের দুর্নীতি দলন আসামের নূতন মন্ত্রিসভা গঠনে এই দুইটি বিষয়ের উপরই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। আসামের কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈয়ের প্রতি এ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশ এই যে,—"যাহাই ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় তাহাই করিয়া দুর্নীতি দলন করুন।" নবগঠিত আসামের মন্ত্রিসভার সমর্থনের নীতি ঘোষণা করিয়া শ্রীযুক্ত বরদলৈ বলেন—

"আসামের প্রধান মন্ত্রী ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যেভাবে অগ্রসর হইয়াছেন, আমি সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি। আমাদের বিশ্বাস এই যে, এই একটিমাত্র প্রশ্নের সঙ্গে দেশের বর্তমান বহুবিধ দুর্গতি জড়িত রহিয়াছে। আমি এই সভায় অনেকবার একথা বলিয়াছি যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অভাবের জন্যই শাসনবিভাগে এবং সমাজজীবনের সর্বত্র দুর্নীতি এতটা প্রসার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। মানবজীবনের সমুন্নতি সাধনের জন্য আমি সর্ববিধ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সমর্থক। আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি এবং রাজনৈতিক কর্মীদের উপর হইতে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার ও সভা-সমিতি প্রভৃতির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রদেশে নূতন যুগের পত্তন হইবে এবং আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা অতঃপর মন্ত্রিমণ্ডলকে সমর্থন করিব।"

বাঙলার রাজনৈতিক অবস্থা আসামের অপেক্ষা স্বতন্ত্র নয়; পক্ষান্তরে যুদ্ধজনিত অবস্থার দিক হইতে এখনও আসামের গুরুত্ব বাঙলাদেশের অপেক্ষা অনেক বেশী। বাঙলারই পাশে আসামের রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দান করিলে যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিপর্যস্ত না হয়, তবে বাঙলাদেশে তাহা ঘটিবে এমন যুক্তির কোন মূল্য আছে বলিয়াই আমরা মনে করি না।

সমস্যার জটিলতা

কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বা আসামের মন্ত্রিসভার এই পরিবর্তন সমগ্রভাবে ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থা-জনিত সমস্যার সমাধানে যে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে, আমরা ইহা মনে করি না। প্রাদেশিক বিশেষ অবস্থার চাপে পড়িয়া দুই একটি প্রদেশের কংগ্রেস-কর্মিগণ সাময়িক ভাবে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন; কিন্তু সমগ্রভাবে ভারতের সম্বন্ধে কংগ্রেসের মূলনীতির পরিবর্তনের কোন কারণই ঘটে নাই। ভারত শাসন সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নীতির যতদিন পরিবর্তন না ঘটিবে এবং ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁহারা স্বীকার না করিবেন, ততদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক জটিল অবস্থার সমাধান হইবে না। অথচ সরকারের তেমন শুভবুদ্ধির কোন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। সেদিনও ভারত গভর্নমেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব স্যার ফ্রান্সিস মুডী কংগ্রেসকে আক্রমণ করিয়া বলিয়াছেন—

"কংগ্রেস উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছে, ইহা দ্বারা নিশ্চিত হয় না যে, কংগ্রেস ১৯৪২ সালে দেশের সর্বত্র যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিল, সে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে। কংগ্রেসী দলের সহিত যাঁহাদের মতের মিল ঘটে না, তাঁহারা তাঁহাদিগকে ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা নিজেদের বশে আনিতে চেষ্টা করেন এবং দেশের শাসনতন্ত্রকে এলাইয়া দেওয়াই তাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহারা সমগ্র ভারতের সম্বন্ধে নীতিগতভাবে তাঁহাদের এই পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়াছেন, ভারত গভর্নমেণ্ট এবং প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টসমূহ সুস্পষ্টভাবে ইহার পরিচয় পাইতে চাহেন।"

স্যার ফ্রান্সিসের এই উক্তিতে সাম্রাজ্যবাদীদের ভেদনীতির সনাতন কারসাজী রক্ষিত হইয়াছে। কংগ্রেসী দল কর্তৃক অপর দলের প্রতি পীড়ননীতি প্রয়োগের অভিসন্ধিমূলক ভ্রান্ত অভিযোগই সেক্ষেত্রে প্রমাণ। কংগ্রেস অপর দলের উপর কোন ক্ষেত্রে পীড়ন-নীতি কোথায় কিভাবে প্রয়োগ করিয়াছে, স্পষ্টভাবে একথা বলিবার সাহস ইঁহাদের নাই। অস্পষ্ট অভিযোগের কৌশলে কংগ্রেসের স্বাধীনতার আন্দোলনের বিরুদ্ধে দলবিশেষকে উত্তেজিত করিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই তাঁহারা এইভাবে কূটকৌশল প্রয়োগ করিতেছেন। সুতরাং ভারত স্বাধীনতা লাভ করে, ইহা তাঁহারা চাহেন না। ইহাদের এমন মতিগতি বিদ্যমান থাকিতে সমস্যার সমাধান ঘটিবে, এমন সম্ভাবনা কিছুই দেখা যায় না এবং কঠোরতর সংগ্রামের পথেই ভারতের স্বাধীনতাকামীদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

ট্রামে-বাসে

একটি সংবাদে প্রকাশ, লর্ড হ্যালিফক্স আমেরিকান-ইন্ডিয়ানদের নেতা (Chief) নির্বাচিত হইয়াছেন। অতঃপর একটি চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে তিনি নাকি তথায় শান্তির পাইপে (Peace Pipe) ধূমপান করিবেন। এই দেশীয় ইন্ডিয়ানদের নেতারূপে মিঃ আমেরিকে নেতা নির্বাচিত করিয়া পাঠাইলে আমরা খাঁটি অম্বুরি



তামাক দিয়া তাঁহার সম্বর্ধনা করিব। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বাদবিসম্বাদের কোন মীমাংসাই আমরা এপর্যন্ত করিতে পারিলাম না। আমেরি সাহেবের অম্বুরির ধোঁয়ায় যদি একটা সুরাহা হয়, তাহা হইলে ভারত কৃতার্থ হইয়া যাইবে!

* * * *

আমাদের সহযাত্রী শ্যামাদাস অফিসে যাওয়ার মুখে ট্রামে চড়িয়া সাধারণতঃ কোন আলাপ আলোচনায় যোগ দেয় না। কেননা, দিবানিদ্রার জন্য এই সময়টুকুই সে বরাদ্দ করিয়া রাখিয়াছে। এই মন্তব্যে ট্রাম কোম্পানী হয়ত উৎফুল্ল হইয়া বলিবেন যে, "এইবারে আর কেহ কোন কথা বলিতে পারিবেন না। আমাদের সুব্যবস্থায় মানুষ এখন ট্রামে ঘুমাইয়াও যাইতে পারে।" ট্রাম কোম্পানীকে তাহা হইলে আমাদের তরফ হইতে বলিতে হয় যে, 'মানুষের মধ্যে যারা জীববিশেষের গুণ অর্জন করিয়াছে ঘুম শুধু তাদের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু সে কথা থাক। কেননা আলোচনাটা ট্রামের নয়, "হুশিয়ারী হপ্তার"! এই ব্যাপারে শ্যামাদাসের মত জীবেরও ঘুম চটিয়া গিয়াছে। শ্যামাদাস হাত-পা নাড়িয়া বলিতে থাকে—"আরে দেখেশুনে পথ চলার নির্দেশে কি আর অবস্থার উন্নতি হবে? সঙ্গে সঙ্গে দেখেশুনে গাড়ী চালাবার নির্দেশেরও যে প্রয়োজন। কিন্তু সে দিক থেকে তো কর্তারা কোন চেষ্টাই করছেন না।" শ্যামাদাসের মুখের কথা প্রায় কাড়িয়া লইয়া বিশু খুড়ো বলেন,—"করছেন বৈকি। এই বস্ত্র সংকটটাকে আরো একটু তীব্র করে তুলতে পারলে গোটা পথ চলার বালাইটাই যাবে ঘুচে। তখন ফাঁকা রাস্তায় বিশেষ করে অবিশেষ লরি-বাস "মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নেই ভুবনে" বলে—যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারবে।"

* * * *

তন্তুবায়দিগকে সুতা সরবরাহে সরকার বাহাদুরের অক্ষমতা নিয়া বঙ্গীয় আইন পরিষদে অনেক নিন্দাসূচক বাক্-বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"সরকারী নীতির নিন্দা কিছু আর নতুন কথা নয় এবং আমরা'ও প্রায় সব সময়েই বিরোধী দলকেই সমর্থন করি। এই সুতোর ব্যাপারে কিন্তু সরকার পক্ষকে সমর্থন না করে পারছিনে। এমন একদিন আসবে যখন বিরোধী দলের নিন্দাবাদের প্রয়োজন হবে না—মন্ত্রিমণ্ডল নিজের নিন্দা নিজেরাই করবেন। আত্মশাসনের সেই সুলভ মুহূর্তে দড়ির প্রয়োজন যদি হয়, সেই ভেবেই এরা সুতো মজুত করে রাখছেন।" খুড়োর রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টিতে বিমুগ্ধ হইয়া গেলাম এবং নিজের আসনখানা ছাড়িয়া দিয়া খুড়োকে বসিতে দিলাম।

* * * *

যুদ্ধের শেষের আটদিন হিটলার যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিবেন, তাহার জন্য তিনি পূর্ব হইতেই ভগবৎ সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া রাখিয়াছেন। এই সংবাদটির উপর পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তর জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে, কিন্তু উক্ত কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে কেহই কোন



সঠিক সিদ্ধান্তে পেঁছিতে পারিতেছেন না। আমরা অগত্যা বিশু খুড়োর শরণাপন্ন হইলাম। তিনি বলিলেন—"হিটলার শ্রীভগবানের কাছে একটি নরমেধ যজ্ঞের মানৎ করিয়াছিলেন। আর্য-সন্তান হিসাবে এই মানৎ আদায় করিতে না পারা মহাপাপ। যুদ্ধের শেষ আটদিন হিটলার সেই যজ্ঞভূমিতে শুধু নাকে খৎ দিয়া বেড়াইতে মনস্থ করিয়াছেন। নরমেধের বদলে নাকে খতের জন্যই তিনি ক্ষমা চাহিয়াছেন।" আমরা সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম—"পরিষ্কার, অতি পরিষ্কার!"

* * * * *

কিন্তু আপাততঃ সেই আলোচনা স্থগিত রাখিতে হইল, কেননা এদিকে আই এফ এ-র ঘরানা ব্যাপারে সবই অপরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মিঃ পিক্ পদত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাকে 'ফাউল' করা হইয়াছে বলিয়া এক পক্ষ চীৎকার করিতেছেন—অন্যপক্ষ চেঁচাইয়া বলিতেছেন, "আলবৎ না।" আমরা আই



এফ এ'র মাঠে চেঁচাইবার জন্য গলা শানাইতেছি, সুতরাং অফিসের গোলযোগে গলাযোগ করিতে পারিতেছি না। একটি গুজবে প্রকাশ, প্রেসিডেণ্টরূপে স্যার নাজিমুদ্দিনের নির্বাচনই নাকি মিঃ পিকের পদত্যাগের কারণ; কেননা, তাঁর (মিঃ পিকের) বিশ্বাস স্যার নাজিমুদ্দিন ফুটবল সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। ব্যাপার সত্যি হইলে আমরা বলি—তর্কাতর্কি না করিয়া আগতপ্রায় ফুটবল মরসুমে মন্ত্রী মহাশয়কে একদিন সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিসাবে খেলাইলেই তো সন্দেহ ভঞ্জন হইয়া যায়।

* * * * *

প্রসঙ্গত মনে পড়িয়া গেল, "বর্মা কাপ ফাইনেল" খেলা নাকি কোন রকম শব্দ না করিয়া শেষ হইয়াছে। পূর্ণ নব্বুই মিনিট খেলাতে এক ফুটবলে লাথির শব্দ ছাড়া—দর্শক বা খেলোয়াড়দের মধ্যে কেহ কোন টু শব্দটি পর্যন্ত করে নাই এমন কি রেফারীর বাঁশী পর্যন্ত কেহ শুনিতে পায় নাই। কারণস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, খেলার মাঠের অপর দিকে মাত্র দুইশত গজের মধ্যেই নাকি জাপানীরা অবস্থান করিতেছিল। সুতরাং কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বিনা শব্দে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এদের মনের জোর আছে বই কি! কিন্তু ভাবিতেছি, মোহনবাগান গোল করিলে দুইশত গজ কেন শত্রু যদি রাইফেল হাতে লইয়া এক গ্যালারিতে পাশেও বসিয়া থাকে, তাহা হইলেও মুক্তকচ্ছ হইয়া ধেই নৃত্য করিতে আমরা পশ্চাৎপদ হইব না। মিত্রপক্ষ শুধু যুদ্ধ করিতেই শিখিলেন, কিন্তু ফুটবল খেলার পূর্ণ আনন্দটুকু উপভোগ করিতে শিখিলেন না।



অজস্র প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, আসামী গিরধারী গোপ বর্তমান মামলার বহুদিন আগে থেকেই হিংস্র হয়ে উঠেছিল। বর্তমান মামলা আসামীর সেই বিকৃত জীবন ও স্বভাবের চরম পরিণাম। পৃথিবীতে পত্নী-নির্যাতক নামে এক ধরণের লোক দেখা যায়, আসামী গিরধারী বোধ হয় নিষ্ঠুরতায় সেই অপমানবদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর অন্যতম। প্রতিদিন ও প্রতি কথায় সে তার স্ত্রীকে অকথ্য প্রহার অত্যাচার ও নির্যাতন করতো।"

চারজন অ্যাসেসর অবিচল আগ্রহ নিয়ে ছোট ছোট বিষণ্ণ পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে বসেছিল, দায়রা জজের রায় শুনছিল।

রায় পড়তে পড়তে দু'তিন মিনিট পর পর দায়রা জজ যেন ঢোঁক গিলবার জন্য থেমে যাচ্ছিলেন। রুদ্ধ শ্বাসবায়ু মুক্ত করে দিয়ে নতুন বাতাসে দম ভরে নিচ্ছিলেন।

একটা শব্দহীন ভীড় আদালত কক্ষে জমাট হয়েছিল। প্রাণের ধুকপুক শব্দগুলি যেন প্রত্যেকের বুকের কোটরে আড়ষ্ট হয়ে আছে। প্রত্যেকের নিশ্বাস থেকে, প্রত্যেকের চোখের দৃষ্টি থেকে কিছুক্ষণের জন্য সকল চঞ্চলতার ধর্ম নির্বাসিত। একটু নড়ে উঠলেই যেন এই মুহূর্তের শোকাক্রান্ত ছন্দের লয় ক্ষুণ্ণ হবে। শুধু ব্যস্ত হয়েছিল পাংখাকুলি—মেজের ওপর প্রায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে, যেন আক্রোশের সঙ্গে অবিরাম পাখার দড়ি টেনে চলেছে। এজলাসের মাথার ওপর পাখার ঝালর একঘেয়ে শব্দ করে চলেছে—ঝটপট, ঝটপট ঝটপট। আজকের কাহিনীর সকল যন্ত্রণাকে যেন ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিতে চায়।

এক একটা বিরামের পর, রায় পড়তে গিয়ে দায়রা জজের গলাটা অস্পষ্টভাবে ঘড়ঘড় করে, পরমুহূর্তেই বেশ স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে ওঠে।

"আসামী গিরধারী গোপের এই হিংস্রতার পিছনে একটা ইতিহাস আছে। আসামী ইচ্ছা করেই নিজেকে হিংস্র করেছিল, বেশ ভেবে-চিন্তে সে এই পথ ধরেছিল, তার মনের ভেতর একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। আসামী গিরধারী তার প্রতিবেশী সহদেব গোপের তরুণী পত্নী শনিচরীর প্রতি আকৃষ্ট ছিল। হাবেভাবে, ইঙ্গিতে এবং স্পষ্ট ভাষায় সে বহুবার শনিচরীর প্রতি প্রণয় প্রস্তাব করেছে। গিরধারীর ধারণা হয় যে, তার নিজ বিবাহিত পত্নী রাধিয়া যতদিন তার ঘরে আছে, ততদিন তার অভিলাষ সফল হবার আশা নেই। রাধিয়া তার পথের কাঁটা। রাধিয়ার ওপর আসামীর সকল অত্যাচারের রহস্য হলো, পথের কাঁটাকে সে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল।

"আসামী বলেছে যে, সে তার স্ত্রী রাধিয়ার চরিত্রে সন্দেহ করতো। আসামীর সব সময় আশঙ্কা ছিল যে, রাধিয়া তাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টায় আছে। সেই হেতু আসামী তাকে মারধর করেছে, তাড়িয়ে দিতে চেয়েছে। আসামীর স্ত্রী রাধিয়া জেরার উত্তরে বলেছে যে, আসামী তাকে কখনো মারধর করে নি। এই দুই উক্তিই অবিশ্বাস্য।"

মুখ তুলে তাকালো গিরধারী। কাঠের খাঁচার মত আসামীর ডক, তার মধ্যে গুটিসুটি হয়ে সম্মুখের ঘটনার স্পর্শ থেকে নিজেকে আড়াল করে, চুপ করে বসেছিল গিরধারী গোপ। জজ সাহেবের বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে একমাত্র ওরই যেন এতক্ষণ কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু হঠাৎ মুখ তুলে তাকিয়েছে গিরধারী। ওর দু'চোখে একটা অদ্ভুত রকমের কৌতূহল ফুটে উঠেছে। তার সমগ্র জীবনের এলোমেলো অর্থহীন ভাঙা-টুকরো ভাষাগুলি সুন্দর একটা কাহিনী হয়ে গেছে। হোক্ না ইংরেজি ভাষা, প্রত্যেকটি ধ্বনিতে একটা নতুনত্ব আছে। রাধিয়া! রাধিয়া! জজসাহেব উচ্চারণ করছেন—এই নামটার কোন ইংরেজি করা যায় না। ঐ নামটাকে বদ্লানো যায় না।

"শেষ পর্যন্ত রাধিয়া টিঁকে থাকতে পারে নি। আসামীর হাতে নিগ্রহ অসহ্য হওয়ায় সে বাপের বাড়ি চলে যায়। তারপর একমাসের মধ্যেই ঘটনা অন্যদিকে মোড় ফিরে।

"আসামীর প্রস্তাবে শনিচরী রাজী হয় নি। গত অক্টোবরের পয়লা তারিখে, ভোর-বেলার কুয়াশার মধ্যে শনিচরী জল আনবার জন্য কলসী হাতে গ্রামের বড় ইঁদারার দিকে চলেছিল। পথের পাশে আখের ক্ষেতের ভেতর আসামী গিরধারী একটা হেঁসো নিয়ে অপেক্ষায় ছিল। ঠিক হিংস্র প্যান্থারের মত গিরধারী আখের ক্ষেত থেকে লাফ দিয়ে বের হয়, শনিচরীর গলার ওপর হেঁসো দিয়ে তিনটে পোঁচ দেয়। শনিচরী সেইখানে দাঁড়িয়ে একবার চীৎকার করে, তারপরেই প্রাণহীন হয়ে পড়ে যায়।

"গিরধারী গোপ যখন পালিয়ে যাচ্ছিল, গ্রামের তিনজন চাষী তাকে দেখতে পায় ও চিনতে পারে। আসামী ফেরার হয়। পাঁচদিন পরে কাটিহার বাজারে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

"আসামী তিনবার অপরাধ স্বীকার করেছে, তিনবার অপরাধ অস্বীকার করেছে। সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ ও তদন্তের হিসাব নিলে এ বিষয়ে তিলমাত্র সংশয় থাকে না এবং সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, গিরধারী গোপ শনিচরীকে প্রতিহিংসাবশে খুন করেছে।

এক্ষেত্রে আসামীর প্রতি সুবিচার করার

জন্যই আমি তাকে চরম দণ্ড—প্রাণদণ্ড দিলাম।

ঝটপট, ঝটপট, ঝটপট—ঝালর লাগানো প্রকাণ্ড পাখাটা সশব্দে দুলছিল। আদালত ঘরে আর কোন শব্দ ছিল না। জনতা শুধু নিষ্পলক চোখে তাকিয়েছিল গিরধারী গোপের মূর্তিটার দিকে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স, রোগা চেহারার গিরধারী। চোখের কোণ দুটো কালো, যেন বেশ মোটা করে সুর্মা লেপে দেওয়া হয়েছে। দুহাতে হাঁটু দুটোকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে পা দোলাচ্ছিল গিরধারী।

জজসাহেবের গলা ঘড়ঘড় করে উঠলো,—হিন্দী ভাষায় বললেন—"আসামী গিরধারী গোপ, তোমার অপরাধ সবুদ হয়েছে, তুমি মুসাম্মত শনিচরীকে খুন করেছ। মহামান্য সরকারের ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার নির্দেশমত আমি তোমাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম। তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে, যতক্ষণ না তোমার প্রাণ বাহির হয়।"

—বহুৎ আচ্ছা।

গিরধারী উত্তর দিল। শানিত বিদ্রুপের হিংসামাখা একটা ক্ষুদ্র প্রতিধ্বনি ক্ষণিকের জন্য যেন আদালত ঘরের স্তব্ধতাকে খান্ খান্ করে দিল। ডকের চারদিকে পুলিসেরা উঠে দাঁড়ালো। উকিল-মোক্তারের দল একে একে আসন ছেড়ে বাইরে চলে গেল। জনতা টলমল্ করে একবার ডকের দিকে কৌতূহলের আবেগে ঝুঁকে পড়লো। পুলিস বাধা দিয়ে জনতা সরিয়ে দিতে লাগলো—আগে চলো ! আগে চলো ! রাস্তা ছাড়ো, খবরদার !

কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়া, গিরধারী গোপ আদালত-ঘর ছেড়ে হেঁটে চললো। তার অগ্রপিছু দুদিকে প্রহরী। দুপাশে তিন তিনজন করে বন্দুকধারী পুলিস। গিরধারীর প্রতিটি পদক্ষেপ শান্ত ও নির্ভুল। প্রহরীদের উৎকণ্ঠা ও ব্যস্তার সীমা ছিল না। আদালতের সিঁড়ি থেকে অপেক্ষমান হাজতগামী পুলিস-লরীটা পর্যন্ত বড় জোর দেড়শো গজ পথ। এইটুকু পথ পার হতে হাবিলদার তিনবার অ্যাটেনসন আর দশবার লেফ্‌ট রাইট হাঁক দিল। ধুপ্-ধাপ বুট ঠোকাঠুকি চললো। তবু এতদিনের প্যারেডে অভ্যস্ত পায়ের কদম বার বার ভুল হয়ে যায়। এদিকে দু'জন হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে যায় তো ওদিকে একজন হোঁচট খেয়ে পেছনে পড়ে থাকে। গিরধারীর কোমরের দড়ির এক প্রান্ত শক্ত করে মুঠোয় ধরে এমন জোয়ান চেহারার সিপাহীটাও মিছামিছি হাঁপায়। হাবিলদারের হাতের ছড়ির ইঙ্গিতের তালে তালে বন্দুকধারীরা শরীর দুলিয়ে এক ঢঙে কদম ফেলার চেষ্টা করে। স্বেদাক্ত কপালের রগ দপ্ দপ্ করে কাঁপে। বড় বেশী উৎকণ্ঠা, বড় বেশী উদ্বেগ, ভয়ানক রকমের দায়িত্ব। সাধারণ আসামী নয়। এক জঘন্য খুনের আসামী, এইমাত্র তার পরমায়ু নীলামে বিকিয়ে গেছে; তাই তার আজ এত দাম। তাই এত সাবধানতা। রোগা গিরধারী গোপের ছোট ফুসফুসটাকে লোহার আবরণ দিয়ে ঘিরে নিয়ে যেতে পারলেই ভাল ছিল। ওর গায়ে যেন এক কণা ধুলো না লাগে, ওর কানে যেন পাখির ডাকের শব্দ না পৌঁছয়। কে জানে কোথা থেকে কোন্ ফাঁকে কোন বে-আইনী সূর্যের রক্তমাখা আলোক ওর চোখের দৃষ্টিকে উতলা করে দেবে। হয়তো থমকে দাঁড়াবে, আকাশের দিকে তাকাবে, নড়তে চাইবে না। গিরধারীর জীবনে আজ এই পৃথিবীর রূপরসগন্ধ স্পর্শ অবান্তর হয়ে গেছে। আলগোছে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে গিরধারীকে। ফাঁসীর আসামীর বুক যেন আনন্দে দুলে না ওঠে—ছিঁড়ে যেতে পারে। যেন চমকে না ওঠে—ফেটে পড়তে পারে। এত বড় মামলার ঘটা, আইনদুরুস্ত পৃথিবীর এত বন্দোবস্ত সব ভেস্তে যাবে। কোন রোগীকে, কোন মুমূর্ষুকে, কোন আহতকে এত সতর্ক সমাদরে কোন দিন তারা বহন করেনি।

পুলিশ লরীর ভেতর পা দিয়েই গিরধারী একবার বাইরের দিকে উঁকি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলো। কাউকে যেন সে খুঁজছে।

হাবিলদার ব্যস্তভাবে বললো—উঁহু, বসে পড়। দেখবার মত কিছু নেই।

গিরধারী হেসে ফেললো—আপনি ঠিক বলেছেন হাবিলদার সাহেব। আর দেখবার কিছু নেই, কেউ আসেনি।

আদালত এলাকার সীমা ছাড়িয়ে পুলিশ লরী দ্রুত বেগে দৌড়ে চলেছিল। প্রহরীরা যেন একটু স্বস্তি ফিরে পেয়েছে। আসামী লোক ভাল। কোন দৌরাত্ম্য করলো না। আসামী একেবারেই ছিঁচকাঁদুনে নয়, একবারও একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েনি, হাহুতাশ করেনি। এই ধরণের আসামীর হেপাজত নিতে বেশ ভাল লাগে। কোন হাঙ্গামা সইতে হয় না।

মাথার পাগড়ী খুলে পাশে রাখলো সেপাইরা। কপালের ঘাম মুছলো। গিরধারীর দিকে একটু করুণাভরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তারা বার বার তাকিয়ে দেখছিল। লোকটার প্রাণ বেশ পোক্ত ধাতুতে তৈরী। একটুও ঘাবড়ায় নি।

অর্জুন সিং বলে—শেষ পর্যন্ত এই রকম দেমাক নিয়ে টিঁকতে পারলে ভাল। কোন কষ্ট পাবে না।

হাবিলদার সন্দিগ্ধভাবে উত্তর দেয়—হুঁ।

ভগীরথী পাণ্ডে হাতের চেটোয় এক টিপ খৈনি নিয়ে জোরে জোরে মলতে আরম্ভ করে। প্রসঙ্গে যোগ দেয়—হ্যাঁ, আর ঘাবড়ে গিয়ে লাভ কি? জোরসে রাম নাম কর, সুখসে ঝুলে পড়। ডর করার কিছু নেই।

ঠোঁট কুঁচকে গিরধারী আর একবার হাসলো। সেপাইদের দিকে তাকিয়ে যেন একটু তাচ্ছিল্য করেই বললো—আপনারা কেন এত মাথা ঘামাচ্ছেন? মনে হচ্ছে, আপনারাই ঘাবড়ে গেছেন। বড় বেশী প্রেম দেখাচ্ছেন। কিন্তু জেনে রাখুন, আমি ফাঁসি যাব না।

সিপাহীরা একটু অপ্রস্তুত হয়ে শুকনো-ভাবে হাসতে লাগলো—মাপ কর ভাইয়া। বেশ, তোমার কথাই সত্যি। তোমার সঙ্গে তর্ক করার ইচ্ছে নেই আমাদের।

হাবিলদার গিরধারীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তীব্র একটা দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে রইল। তার পরেই পাশের সেপাইয়ের কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বললো—দেখছো তো ওষুধ ধরে গেছে। এরই মধ্যে মাথার গোলমাল সুরু হলো। হতেই হবে, মানুষ তো আর লোহার তৈরী নয়।

কনেস্টবল সাকির আলী বলে—বোধ হয় আপীল করবে বলে ঠিক করেছে।

হাবিলদার ঠাট্টা করে—হুঁ, আপীল করবে! ওর সংসার বিক্রী করলে দশটা টাকাও হবে না। এক নম্বরের দরিদ্দর, আপীল করবে কোথা থেকে?

অর্জুন সিং—তবে ও কি বলতে চায়?

হাবিলদার—বলছে ওর মাথা আর মুণ্ডু। বুদ্ধি বিগড়ে যাচ্ছে, আর কদিনের মধ্যেই...।

গিরধারী এক টিপ খৈনি চায়। হাবিলদার একটু সহৃদয়ভাবেই আপত্তি করে—মাপ কর বাবা।

গিরধারী আবার ঠাট্টা করে—দিয়ে ফেলুন সিপাহিজী, আমি এখনি মরছি না। কোন ভয় নেই আপনাদের হাজত পর্যন্ত বেঁচে বেঁচেই পৌঁছে যাব। আপনার মাথার পাথর নেমে যাবে।

সেপাইরা সবাই চুপ করে থাকে। হাবিলদার বলে—আমাদের কাছে মেহেরবাণী করে কিছু চেয়ো না গিরধারী। এই তো আর কিছুক্ষণের মধ্যে হাজত পৌঁছে যাবে। জেলরবাবুর কাছে আর্জি করো, যা চাইবে সব পাবে।

গিরধারী অহংকারের সুরে উত্তর দিল—কিছু আমি চাইব না। কিছু দরকার নেই। আমি সব পেয়ে গেছি। বড় খুসী লাগছে সিপাহিজী।

প্রহরী পুলিশদের মধ্যে কানাকানি আলোচনা হয়—এত টনটনে জ্ঞান ভাল নয়। এরাই শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ে। এখন তো শুধু জেদের জোরে ফরফর করছে—লম্বা লম্বা বুলি ঝাড়ছে। আর দুটো দিন পার হোক, অন্ধ ভঁইসের মত গয়াদে মাথা ঠুকবে, আর গোঁ গোঁ করবে। ফাঁসির শাস্তি, এ কি ঠাট্টার কথা রে ভাই।

গিরধারী বলে—আমি সব শুনতে পাচ্ছি

সিপাইজি। যত খুসী আপশোষ করুন আপনারা। কিন্তু আমি জানি, আমার ফাঁসি হবে না।

গিরধারীর কথাবার্তায় পাগলামির কোন আভাষ নেই। কিন্তু এত জোরগলায় সে যে কথা বলছে, সেটা প্রলাপ ছাড়া আর কি হতে পারে? প্রহরীদের সংশয় আর কৌতূহল এক সঙ্গে মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠছিল। কোথা থেকে এই বিশ্বাস পেল গিরধারী?

মোটর লরি একটা চক পার হয়ে বাঁ দিকে মোড় ঘুরালো। মুখ ঘুরিয়ে ডান-দিকের পথের দিকে যেন একটা তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি প্রসারিত করে গিরধারী কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। লাল কাঁকরের একটা কাঁচা সড়ক চলে গেছে এঁকে বেঁকে, দুপাশে দুসার আম শাল আর তেঁতুলের ছায়া নিয়ে। অবাধ অবারিত মাঠের বুকের ওপর দিয়ে সড়কটা ডাইনে বাঁয়ে এক একটা ছোট ছোট গ্রাম ছুঁয়ে চলে গেছে—দিগন্তরের কোণে গিয়ে যেন মিলিয়ে গেছে।

গিরধারী জিজ্ঞেসা করলো—এই রাস্তা কোনদিকে গেছে হাবিলদার সাহেব?

হাবিলদার—অনেক দূর চলে গেছে। রফিনগরের বাজার ছাড়িয়ে, বাবুঘাট থানা পার হয়ে একেবারে মুঙ্গের জেলায় গিয়ে পড়েছে। কেন বল তো?

গিরধারী—ছেদিতালাও গাঁ এই পথে পড়ে?

হাবিলদার—হাঁ। কিন্তু ছেদিতালাওয়ের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

গিরধারী—আমার শ্বশুরার ঐ গাঁয়ে।

প্রহরীর দল চাপা স্বরে এক সঙ্গে আপশোষ করলো—আরে তোমার শ্বশুরার!

গিরধারী মুখ ঘুরিয়ে আবার ছেদি-তালাওয়ের কাঁচা সড়কের দিকে স্থির দৃষ্টি তুলে তাকিয়েছিল। পুলিসদের কোন মন্তব্য বোধহয় কানে শুনতে পাচ্ছিল না গিরধারী। দূর সর্পিল পথের মাটির সঙ্গে গিরধারীর সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম যেন পাকে পাকে জড়িয়ে পড়েছে। ওর চোখেমুখে সেইরকম একটা মুগ্ধ আবেশ থমথম করছিল।

আবার সোজা হয়ে বসতেই অর্জুন সিং প্রশ্ন করলো—সত্যি কথা বলতো গিরধারী, মেয়েটাকে তুমি খুন করেছিলে।

গিরধারী—হ্যাঁ, আমি আগেই ওকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, একদিন সব দেনা-পাওনার হিসাব নেব। যেদিন সুবিধা পেলাম, হিসেব নিয়ে নিলাম।

হাবিলদার—বড় ভুল করেছিলে গিরধারী।

গিরধারী যেন ভুল বুঝতে পেরেছে, তেমনি অনুশোচনার সুরে জবাব দিল—হাঁ, হাবিলদার সাহেব, রাত্রিবেলায় একটু নিরালা জায়গাতেই কাজ খতম করা উচিত ছিল, কিন্তু সকাল হয়ে গেছে বুঝতে পেরেও রাগকে বোঝাতে পারলাম না। লোকে দেখে ফেললো। নইলে......।

খুন করেছে, তার জন্য কোন অনুতাপ নেই গিরধারীর মনে। এবিষয়ে সে নিজেকে আজও নির্ভুল মনে করে। শুধু ভুল—সে ধরা পড়ে গেছে। অপরাধীর দীনতা লজ্জা ও মর্মপীড়ার কোন চিহ্ন আবিষ্কার করা যায় না গিরধারীর কথায়।

সাকির আলি আশ্চর্য হয়ে বলে—আমি বাস্তবিক এই কথা ভেবে আশ্চর্য হই, আজ পর্যন্ত কোন ফাঁসীর আসামীকে তার কসুরের জন্য দুঃখ করতে দেখলাম না।

হাবিলদার—আর দুঃখ করার মত ওদের মন থাকে না ভাই। নিজের কসুরের কথা ওরা একদম ভুলে যায়।

অর্জুন সিং বলে—ফাঁসির হুকুম না হলে, মানুষের মত মনটা তবু থাকে। নিজেকে পাপী বলে বুঝতে পারে, এক আধটুকু আপশোস করেও। কিন্তু......।

হাবিলদার একটু সম্ভ্রম ও সংকোচে আমতা আমতা করে বলে—একটা প্রশ্ন করবো গিরধারী, মাপ করো ভাই।

গিরধারী—বলুন।

হাবিলদার—তোমার জেনানা রাধিয়া কি সত্যিই খারাপ হয়ে গিয়েছিল?

গিরধারীর মুখটা কঠিন হয়ে উঠলো, শান্তভাবে বললো—সেখবর সে জানে আর আমি জানি। আপনাদের শুনে কি লাভ?

হাবিলদার তীক্ষ্ন মেজাজে বেশ চড়া গলায় বিদ্রূপ করলো—আরে তুমি তো দুনিয়াকে সেখবর শুনিয়ে দিয়েছ। নিজেই আদালতে আর পুলিসের কাছে বলেছ যে......।

গিরধারীর মুখটা অসহায়ের মত করুণ ও বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। যেন অনুনয়ের সুরে প্রশ্ন করলো—হ্যাঁ, মেহেরবাণী করে বলুন তো হাবিলদার সাহেব, আমি কি বলেছি। আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

হাবিলদার—তুমি বলেছ যে, তোমার জেনানা রাধিয়া তোমাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করতো।

কথাগুলিকে যেন মনের সব আগ্রহ দিয়ে বরণ করে নিচ্ছিল গিরধারী। শুনতে শুনতে সারা মুখে এক বিচিত্র ধরণের পরি-তৃপ্তির উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়ছিল। নৌকার ঘুমন্ত যাত্রী যদি হঠাৎ জেগে উঠে ঘাটের মাটি নিকটে দেখতে পায়, সকল ভরসার আনন্দে দীর্ঘ অপেক্ষার ক্লান্তি মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যায়, গিরধারীর দৃষ্টি সেই রকমের। এক প্রচণ্ড অন্ধকারের স্রোতের টানে অবধারিত অন্তিমের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে, কিন্তু গিরধারীর মনে কোন শঙ্কা নেই, তার হাতের মুঠোয় যেন একটা শক্ত কাছির অবলম্বন রয়েছে—দূরে তটভূমির হৃদয়ের এক কঠিন আশ্বাসের সঙ্গে বাঁধা। মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে আরও দূরে, মুঙ্গের রোডের এক পাশে ছেদি-তালাও গ্রাম। গিরধারীকে ফাঁসির অপমান ও বেদনা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে, মিঠাতালাওয়ের এক মেটে ঘরের নিভৃতে একটা বুকভরা আকুলতা এখন প্রস্তুত হচ্ছে, উপায় খুঁজে বার করছে। সব বুঝতে পেরেছে রাধিয়া, এতখানি বুদ্ধি তার আছে।

সাকির আলি প্রশ্ন করে—কথাটা কি সত্যি?

গিরধারী প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠে। ঘোর মিথ্যার আবরণ দিয়ে ঢাকা এই কথার অর্থটা কি ধরা পড়ে গেল? সামলে নিয়ে বেশ শান্তভাবেই গিরধারী উত্তর দেয়—সত্যি না মিথ্যে, সেখবর আমি জানি আর সে জানে।

হাবিলদার মন্তব্য করে—এটা কিন্তু একেবারে মিথ্যে কথা বলেছ গিরধারী। নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য জঘন্য একটা মিথ্যে কথা বললে, কিন্তু কোন লাভ হলো না, না বাঁচলো নিজের প্রাণ, না রইল নিজের স্ত্রীর ইজ্জৎ।

অর্জুন সিং কর্কশভাবে বলে—একবার ভেবে দেখলে না, কি ভাবলো তোমার বউ। বেচারী নিজের কানে তোমার ঐ কথা শুনেছে।

অনুযোগ আর ধিক্কার শুনে গিরধারী একটুও কুণ্ঠিত হয় না, তার চেহারায় উৎফুল্লতা যেন নতুন বিশ্বাসে আরও সজীব হয়ে ওঠে। মনের ভেতর আদালত ঘরের ছবিটা অস্পষ্টভাবে দেখতে পায়। কালো কালো কতকগুলি নরমুণ্ড তাকে ঘিরে ধরে আছে। জজ আর উকীলেরা প্রশ্ন করছে, প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে গিরধারী—রাধিয়া আমাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করতো। আমি জানি একদিন না একদিন বিষ খাওয়াবে। আমি তাই......।

আদালত ঘরের এক কোণে নতমুখ আঁচল দিয়ে ঢেকে বদ্রী চাচার পাশে চুপ করে বসেছিল রাধিয়া। গিরধারীর প্রলাপ শুনতে পেল। চোখ তুলে তাকালো গিরধারীর ধূর্ত মূর্তিটার দিকে। কয়েকটি মুহূর্তের মত চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে রইল। সব বুঝতে পেরেছে রাধিয়া। গিরধারীর শেষ কামনার নিবিড় আগ্রহ ঐ প্রলাপের আড়ালে কী স্পষ্ট ইসারা দিচ্ছে। রাধিয়ার হাতের কাঁচের চুড়িগুলি একবার শব্দ করে ওঠে। গিরধারীর সকল উদ্বেগ এক সাফল্যের গর্বে নিশ্চিহ্ন হয়ে উড়ে যায়। ফাঁসির মৃত্যুর অসম্মান থেকে গিরধারীর অন্তরাত্মা উদ্ধার পাবার জন্য যার কাছে আবেদন জানাচ্ছে, সেই আবছা ভাষার ষড়যন্ত্র পৃথিবী ধরতে না পারুক, রাধিয়া নিশ্চয় ধরেছে।

জেলের ফটক দেখা যায়। বুড়ো বটের ছায়ায় ফটকের দাঁতগুলি অস্পষ্ট হয়ে আছে। ওপরে বটের পাতার আড়ালে শত শত বাদুড় ঝুলছে। নীচে বন্দুক কাঁধে

শান্ত্রী পাইচারী করে। ফটকের পাশে একটা কাঠের ত্রিভুজের মধ্যে পেতলের ঘণ্টা ঝুলছে।

মোটর লরী ক্রমে মন্থর হয়ে ফটকের সামনে এসে একেবারে থামলো। থপ্ থপ্ করে মাথায় পাগড়ী গুঁজে, লাঠি খাতা বন্দুক আর গিরধারীকে নিয়ে প্রহরীরা বুড়ো বটের ছায়ায় দাঁড়ালো।

অর্জুন সিংয়ের মনটা একটু করুণাপ্রবণ রোমান্টিক ধরণের। গিরধারীর পাশে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বললো—আর সময় নেই গিরধারী। এইবার আমাদের হেপাজত ছেড়ে তোমাকে ভেতরে ঢুকে পড়তে হবে। ধরিত্রীকে প্রণাম করে নাও।

গিরধারী বিস্মিতভাবে অর্জুন সিংয়ের দিকে তাকালো। অর্জুন সিং বললো—সবাই করে ভাইয়া। নাও, তাড়াতাড়ি একটু ধুলো কপালে ঠেকিয়ে নাও। আর সুযোগ পাবে না।

ফটকের ছোট দরজাটা তখন কঁকিয়ে কঁকিয়ে খুলছে, গিরধারীর জীবনের রথ এসে পথের শেষে পেঁাছে গেছে। পেছনের দুনিয়ার মাটী সরে যাবে এই মুহূর্তে। গিরধারীর জীবনে আর উল্টোরথের আশা নেই, চাকা ভেঙে গেছে। লোহার গরাদের ওপারে এক গভীর লুপ্তির জলকুণ্ড লুকিয়ে আছে, সেখানে প্রণাম করার মত মাটী পাওয়া যাবে না। অর্জুন সিং দুঃখিত হয়েই দেখছিল, গিরধারী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

হাবিলদার বললো—চল।

ঢং ঢং করে পাঁচটার ঘণ্টা বাজলো। বুড়ো বটের ছায়া লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ লরির ইঞ্জিনটা স্টার্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফোঁপাচ্ছিল। ফটকের মুখ থেকে বের হয়ে এসে প্রহরীর দল অলস-ভাবে আবার লরীর ভেতর একে একে উঠে বসলো—হাবিলদার, অর্জুন সিং, সাকির আলি......। গিরধারী নেই, জ্যান্ত গিরধারীর বাসি প্রাণ জেলরের কাছে জমা দিয়ে শুধু রসিদ নিয়ে ফিরে চললো প্রহরীর দল।

মোটর লরিটা আচমকা একবার বাম্প্ করে দ্রুত দৌড়ে চলে গেল।

পাঁচ হাত লম্বা পাঁচ হাত চওড়া নিরেট পাথর আর কংক্রীটের গাঁথুনি দিয়ে তৈরী খুপরির মধ্যে ভাগলপুরী কম্বলের ওপর শুয়ে সে রাত্রে গিরধারী কি স্বপ্ন দেখেছিল, তা কেউ জানে না। কিন্তু সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জেলের প্রত্যেক কর্মচারী, ওয়ার্ডার, শান্ত্রী আর কয়েদী বুঝতে পারলো—এক অতি দুর্দান্ত ফাঁসীর আসামীর আবির্ভাব হয়েছে। জেলর থেকে আরম্ভ করে ওয়ার্ডার, শান্ত্রী আর ডাক্তার—সবাইকে যাচ্ছেতাই টিট্‌কারী দিয়েছে, গালাগালি করেছে। একেবারে বেপরোয়া আসামী। মেথরের সঙ্গে রসিকতা করে শালা সম্পর্ক পাতিয়েছে। স্থূলাকার শান্ত্রী পাঁড়েজীর একটা নতুন নামকরণ করেছে—বীর বৃকোদর।

তাঁতঘরের কয়েদীরা কাজ করতে করতে তখনো শুনতে পাচ্ছিল, সেলের মধ্যে ফাঁসীর আসামী গিরধারী গলা খুলে গান গাইছে—"নজরিয়া লুভায় লিয়ে যায়, মন তির্‌ছি! হাঁরে মন তির্‌ছি!"

কে জানে কিসের স্বপ্নে মাতোয়ারা হয়ে আছে গিরধারী। সারাদিন গোলমাল করে। চীৎকার ক'রে বলে—কোন্ শালা আমার ফাঁসি দেয় দেখ্‌বো।

বিদ্রূপ করে বলে—আহা! কত সখ। দড়িতে ঝুলিয়ে মারবে। পাগলা কুত্তা পেয়েছে, না?

প্রতিদিন খাবার নিয়ে হাঙ্গামা করে গিরধারী। এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়েই থু থু করে ফেলে দেয়।

সন্ধ্যে হতেই চেঁচামিচি আরম্ভ করে—মশারী চাই। উঃ কি ভয়ানক মশা! যেমন জেলের লোকগুলি তেমনি মশাগুলি।

শান্ত্রী পাঁড়েজি মেজাজের ধৈর্য কষ্ট করে অটুট রাখে। শান্তভাবেই বোঝাতে চেষ্টা করে—এই রকম গোলমাল করো না, সব পাবে। ঘুমোও, ঘুমোও।

আরও কিছুক্ষণ দাপাদাপি করে একটু শান্ত হয় গিরধারী, ঝিমোতে থাকে, তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। গরাদের বাইরে পাঁড়েজির একটানা প্রহরা ও বুটের শব্দ অন্ধকারে মচ্‌মচ্ করে। ঘণ্টা বাজে। পাহারা বদল হয়। ঘুমন্ত গিরধারীর বুকের প্রতিটি স্পন্দনকে সযত্নে পাহারা দেবার জন্য নতুন শান্ত্রী আসে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বসে গিরধারী। জিজ্ঞেস করে—কত রাত হলো?

—এগারটা। চুপ করে ঘুমোও। শান্ত্রী দিল্‌বর মিঞা উত্তর দেয়।

গিরধারী তবু জেগে জেগে কিছুক্ষণ উসখুস করে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে অঘোরে। সমস্ত পৃথিবীর জীবনযন্ত্রের ছন্দের সঙ্গে নিশ্বাস প্রশ্বাসে তাল রেখে কোটী কোটী মানুষের মত ঘুমোতে থাকে গিরধারী।

দু'মিনিট পরেই জেগে ওঠে; শান্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে—খুব ভাল ঘুম হলো সিপাহীজী! আঃ

দিল্‌বর মিঞা বলে—আবার ঘুমাও।

গিরধারী বিরক্ত হয়ে ওঠে—আর কত ঘুমোব সিপাহিজী!

লাল চিঠি এসে গেছে—হাইকোর্টের সহি এসে গেছে। ওয়ার্ডার আর শান্ত্রীরা সকলেই সেখবর রাখে। গিরধারীর আয়ুর মুহূর্তগুলির মাত্রা বাঁধা হয়ে গেছে।

ব্যারাকের রসুইঘরে রান্না করতে করতে সিপাইরা আলোচনা করে—দুদিন থেকে গিরধারী গোপ একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আরও ঠাণ্ডা হওয়া এখনো বাকী আছে। এখনো কিছু কিছু ইয়ার্কি করে।

—এখনো ওর বিশ্বাস যে ওর ফাঁসি হবে না।

—তাই ভাল, তাই ভাল। ঐ বিশ্বাস নিয়েই বাকী কটা দিন পার করে দিক্।

—যাই বল, গিরধারী গোপ কিন্তু বড় শক্ত খুনী। এদের যাওয়াই ভাল।

—আরে নেহি ভাই, তাতে কোন লাভ হয় না।

—সব খুনীর যদি ফাঁসি হতো তবে না হয় বলা যেতো যে একটা নিয়ম আছে।

—যারা খুন করে ধরা পড়ে, তারই শুধু ফাঁসী হয়।

—ভেজাল খাবার খাইয়ে কত লোককে খুন করা হচ্ছে, তাদের তো কই ফাঁসি হয় না?

—উল্টো তাদের লাইসেন্স দেওয়া হয়।

—গাঁজা আফিম খেয়ে কত লোক রক্ত শুকিয়ে মরে যায়। কই, কেউ তো বাধা দেয় না, বিচার করে না?

—কত লোকে ফুর্তি করে মোটর গাড়ি চালিয়ে কত লোক মারে।

—কিন্তু জেনেশুনে তো মারে না ভাই, ভুল করে মারে।

—আরে হাঁ হাঁ। সব খুনই ভুল করে হয়। মেজাজের ভুল।

শান্ত্রী পাঁড়েজি পাহারায় এসে দেখে, গিরধারী ধীর স্থির হয়ে বসে আছে। এই রকম দৃশ্যই পাঁড়েজি আশা করেছিল। মৃত্যুর ফাঁদে পড়ে প্রত্যেক অভিশপ্ত প্রাণ প্রথম কয়েকটা দিন যেন দুরন্ত হয়ে ওঠে, বিদ্রোহ করে। তার পরেই ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ে। শত আশ্বাসে ও প্রেরণায় তখন তাকে আর ঠেলে তোলা যায় না।

পাঁড়েজি বললো—খবর তো এসে গেছে গিরধারী।

গিরধারী—হ্যাঁ পাঁড়েজি।

পাঁড়েজি—বাস্, ভয় করবার কিছু নেই। প্রেমসে রাম নাম কর।

গিরধারী শান্ত ভাবেই উত্তর দিল—আপনি সান্ত্বনা দেবেন না পাঁড়েজি, আমার ফাঁসি হবে না।

শান্ত্রী পাঁড়েজি চুপ করে গেল। এখনো মুক্তির স্বপ্ন দেখছে গিরধারী। সব দিকে এত টন্‌টনে জ্ঞান, শুধু এই একটি ক্ষেত্রে একেবারে অপোগণ্ড শিশুর মত সে বোকা। এর কোন কারণ খুঁজে পায় না পাঁড়েজি। হয়তো মাথায় দোষ দেখা দিয়েছে গিরধারীর।

গিরধারী বলে—আমাকে এক টুকরো খড়ি যোগাড় করে দিতে পারেন পাঁড়েজি?

পাঁড়েজি—কেন?

গিরধারী—ছবি আঁকবো।

পাঁড়েজি—জেলর বাবুকে বলবো।

গিরধারী—জেলের গরুগুলি এত রোগা কেন পাঁড়েজি?

পাঁড়েজি—[illegible]।

গিরধারী—নিশ্চয় ভাল করে খাওয়ানো হয় না।

পাঁড়েজি—জানি না, আমি গয়লা নই।

গিরধারী—জেলরবাবু আসুক, আচ্ছা করে শুনিয়ে দেব।

গিরধারী কয়েকটা দিন আর গান গায়নি। শুধু বার বার প্রশ্ন করে—কটা বেজেছে সিপাহিজী? আজ কত তারিখ?

ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক এক সময় নিঝুম হয়ে থাকে গিরধারী। অন্তর্লোকের পথে যেন কারও পায়ের শব্দ শুনছে। সে আসছে, সে এতক্ষণ রওনা হয়ে গেছে। আর কত দেরী করবে? ছেদিতালাও থেকে লাল কাঁকরের সড়ক ধরে হেঁটে হেঁটে শান্তিময় মৃত্যুর উপঢৌকন নিয়ে রাধিয়া আসবেই। তার ইসারা বুঝতে কি ভুল করবে রাধিয়া? অসম্ভব। খুব চালাক মেয়ে রাধিয়া। জীবনের সব কাজে রাধিয়া গিরধারীকে সাহায্য করেছে। শুধু একটি ক্ষেত্রে পারেনি। রাধিয়ার জীবনের তৃপ্তির একটি মাত্র অভিশাপ, একটি মাত্র বাধা, তাকেও হেসো দিয়ে নির্মূল করে দিয়েছে গিরধারী। তবে আর কেন? এখন তো পথে আর কোন কাঁটা নেই। স্বচ্ছন্দে রাধিয়া চলে আসতে পারে।

গিরধারীর বিশ্বাস অবিচল থাকে। রাধিয়া ঠিক সময় মত পেঁাছে যাবে। ফাঁসীর মৃত্যু থেকে রাধিয়া তাকে মুক্তি দেবে।

গিরধারী স্বপ্ন বোধ হয় মিথ্যে হতে চলেছে। জেলর ও ডাক্তার এলেন সেলের কাছে। গিরধারীর ওজন নেওয়া হলো।

কোন প্রশ্ন করার আগেই জেলর জানিয়ে দিলেন—কাল তোমার ফাঁসির দিন, গিরধারী গোপ।

গিরধারী চুপ করে রইল। জেলর বললেন—যা খেতে টেতে চাও বল, সব মিলেগা।

গিরধারী জবাব দিল—কিছু না।

সেলের দরজা বন্ধ হলো।

দুপুর পর্যন্ত সেলের মেজের ওপর গিরধারীর শীর্ণ মূর্তিটা কুঁকড়ে পড়েছিল। দেয়াল মেজে ছাত—সব নিরেট, কোথাও একটা ফুটো নেই যে সাপ হয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়। কয়েদীদের খাওয়া হয়ে গেছে, কাকের ঝাঁক এঁটো খাওয়ার জন্য কলরব করে উড়ে বেড়াচ্ছে বাইরে—শব্দ শোনা যায়।

সেলের দরজা খুলে দিলবর মিঞা এসে খবর দিল—মোলাকাতে চল। তোমার জেনানা এসেছে।

না, স্বপ্ন মিথ্যে হয়নি। এক লাফে উঠে দাঁড়ালো গিরধারী। মেজের ওপর কম্বলটাকে এক লাথি মেরে পেছনে সরিয়ে দিল। গিরধারী যেন সব বন্ধন ছিন্ন করে চলেছে। আর এখানে ফিরে আসতে হবে না।

অফিস ঘরের পাশে, একটা গরাদের ওপারে এসে বসলো গিরধারী। একজন ওয়ার্ডারের সঙ্গে রাধিয়া ঢুকলো অফিস ঘরে।

এক দৌড়ে এসে গরাদের ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো রাধিয়া। মেজের ওপর ঢিপ করে একটা প্রণাম করলো।

ফুঁপিয়ে কাঁদছিল রাধিয়া। চরম বেদনা ও হতাশার একটা প্রতিধ্বনি যেন টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। রাধিয়া বলছিল—ছিনিয়ে নিলে গো। তোমার খাবার ছিনিয়ে নিলে।

অতি নগন্য খাবার জিনিস, একটুখানি গুড়ের হালুয়া আর একটা পেঁড়া পাতায় মুড়ে নিয়ে এসেছিল রাধিয়া। কিন্তু সে সাধ সফল হয়নি। ফটকের শান্ত্রীর কাছে জমা রেখে আসতে হয়েছে।

জেলর রাধিয়াকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন—এর জন্যে এত কান্না কেন? আরও ভাল খাবারের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। তুমিই নাম কর, কি খাওয়াতে চাও। রসগোল্লা জিলিপী......।

গিরধারী তাকিয়েছিল অদ্ভুত ভাবে। একটা মৃত মানুষের মূর্তির মধ্যে চোখের কোটর দুটো যেন হাঁ করে রয়েছে। সে দৃষ্টিতে কোন অর্থ নেই, ভাষা নেই, আবেগ নেই, জ্যোতি নেই। আজ এতদিনে সত্যিকারের ফাঁসির হুকুম শুনতে পেয়েছে গিরধারী। রাধিয়া নিজের হাতের তৈরী মধুর মৃত্যুর উপহার হাতের নাগালে পেঁাছলো না। গিরধারীর মেরুদণ্ডটা কাঁপছে, বেঁকে যাচ্ছে, কট্‌কট্‌ করে বাজছে, জীবনকাঠি ভাঙছে।

ভয়ার্ত ছোট ছেলের মত হাঁউ হাঁউ কেঁদে উঠলো গিরধারী। —বাঁচাও রে বাবা! বাঁচিয়ে দে রে বাবা!

সবাইকে আশ্চর্য করলো গিরধারী। অদ্ভুত। গিরধারীর মত এত শক্ত আসামী, হঠাৎ এভাবে ভেঙে পড়ে কেন?

কেরাণীবাবু ঘড়ি দেখলেন। মোলাকাতের সময় শেষ হয়ে গেছে। দুজন ওয়ার্ডার রাধিয়ার হাত ধরে ফটকের বাইরে টেনে নিয়ে গেল।

সমস্ত জেলের কয়েদী আশ্চর্য হয়ে শুনলো ফাঁসির আসামী গিরধারীর ব্যাকুল চীৎকার আর কান্না। বধ্যভূমির গন্ধ পেয়ে একটা পশু যেন সেলের ভেতর আর্তনাদ করছে।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। শান্ত্রী পাঁড়েজি পাহারায় আছে। কান্না থামিয়ে গিরধারী কম্বলের ওপর মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছিল।

রাত্রি আর অন্ধকার ক্রমে ঘনিয়ে উঠলো। সব নম্বর বন্ধ হলো। দেখা যায়, কলঘর থেকে একটু দূরে খোলা মাঠের ওপর নতুন একটা বাতি জ্বলছে। ফাঁসির তক্তা পাহারা দিচ্ছে শান্ত্রী। ঠিক আছে, সব ঠিক আছে।

দড়ি পরীক্ষা হয়ে গেছে। তিন মণ ওজনের বালির বস্তা ঝুলিয়ে দড়ির শক্তি টেস্ট করা হয়েছে। পোষা অজগরের মত চর্বি-মাখানো দড়িটা এখন গুটিয়ে পাকিয়ে পড়ে আছে অফিস ঘরের একটা সিন্দুকে—তালাবন্ধ হয়ে।

আর এক নম্বরের কুঠুরিতে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছে জহ্লাদ বংশী দোসাদ। ফাঁসি প্রতি পাঁচ টাকা রেট। আজ রাত শেষ হয়ে সকাল হতেই বংশী দোসাদের রোজগারের হিসাবে পাঁচ টাকা জমা হবে।

জেলখানার মাথার ওপরের অন্ধকারে পাখার বাতাস দিয়ে, বুড়ো বটের পাতার ভীড় ছেড়ে মাঝে মাঝে বাদুড়ের ঝাঁক উড়ছিল। টর্চ হাতে নিয়ে জেলর আর হাবিলদার শান্ত্রী রাউণ্ড দিয়ে গেলেন। সব ঘুমিয়ে পড়েছে, প্রত্যেকটি নম্বর নিঝুম। তাঁতখানা কলঘর, ঘানি—তারপর বাঁ দিকে ঘুরে ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে সেলের কাছে পেঁাছলেন।

গিরধারী উঠে বসে সেলাম জানালো।

জেলর জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছ? ঘুম হয়েছে?

গিরধারী—হাঁ, বাবু।

জেলর—তবিয়ৎ ভাল আছে।

গিরধারী—হাঁ বাবু।

জেলর—খেয়েছ?

গিরধারী—হাঁ বাবু।

জেলর—বেশ বেশ। এখনও অনেক রাত আছে ঘুমোও।

জেলরবাবু চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে আর একবার দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেসা করলেন—তোমার কিছু বলবার আছে?

গিরধারী চুপ করে রইল। তার পর বললো—না।

জেলরবাবু চলে যাচ্ছিলেন। গিরধারী ডাকলো—বাবু!

জেলর—বল।

গিরধারী—রোজ রাত্রিবেলা বাইরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান হয় শুনতে পাই, কে গায়?

জেলর—আমার মেয়েরা গায়?

গিরধারী—আজ কিন্তু দিদিদের গান শুনতে পেলাম না বাবু।

জেলর একটু অপ্রস্তুত হয়ে কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বাইরে চলে গেলেন। সেলের সামনে ডবল শান্ত্রীর পাহারা অন্ধকার আগলে দাঁড়িয়ে রইল।

গিরধারী নিঃশব্দে বসে রইল। শান্ত্রী পাঁড়েজি বললেন—ঘুমোবার চেষ্টা কর গিরধারী।

গিরধারী বললো—কিছু তুলসীবচন শোনাতে পারেন পাঁড়েজি?

পাঁড়েজি—রাম নাম কর, গিরধারী।

তুলসীদাসের সার হলো রাম নাম। কোন ভয় নেই।

সীতারাম! সীতারাম! নিশ্বাসের সঙ্গে আস্তে আস্তে নাম উচ্চারণ করলো গিরধারী।

ভোরের আবছা অন্ধকারে জেল কম্পাউন্ডের বাইরে সড়কের ওপর গাছ তলায় চুপ করে বসে ছিল রাধিয়া। একটা কুপিতা নিশাচরী মূর্তি যেন সময় গুণতে গুণতে ভোর করে ফেলেছে। আর পালিয়ে যেতে পারেনি। রাধিয়ার কাপড় ধুলোয় লাল হয়ে গেছে। রুক্ষ চুলগুলি এলোমেলো হয়ে আছে। সারা রাত যেন জেলখানার প্রত্যেকটি শব্দকে উৎকর্ণ হয়ে পাহারা দিয়েছে, চোখের পলক ফেলেনি। চোখ দুটো ফুলে লাল হয়ে আছে। রাধিয়ার আঁচলে কয়েকটি শ্বেতকৌড়ি আর খই পুঁটলি করে বাঁধা। পাশে একটা মেটে কলসী, জলে ভরা।

ফটকের আলো নিভলো। জেলখানার মাঝখানে একটা গাছের মাথায় সারা রাত আলোর ছটা লেগেছিল। সে আলোও নিভেছে, রাধিয়া দেখতে পায়।

ফটকের ভেতর দিয়ে লোক আসা যাওয়া করছে। ভোরের কাকের দল শব্দ করে পূবে আকাশের দিকে ছুটেছে।

সীতারাম! সীতারাম! সীতারাম!

মানুষের বুক থেকে একটা আর্ত মন্ত্রের শব্দ ছিটকে বের হয়ে জেলখানার বাতাসে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।

রাধিয়া জলের কলসী হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ফটকের দিকে এগিয়ে চললো।

সীতারাম! সীতারাম! সীতারা......।

এক অদৃশ্য সেতারের তার হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। হুমম্—হ্যাঁচ্‌কা টানে একটা ভাষাহীন বোবা যন্ত্রণা যেন নিমেষের মধ্যে পৃথিবীর বুকের ভেতর ঢুকে পড়লো।

ফটকের কাছে একটা গরুর গাড়ি দাঁড়িয়েছিল লাস বয়ে নেবার জন্য। রাধিয়া ফটকের কাছে এসে দাঁড়াতেই শান্ত্রী বললো—বসো, লাস আসছে।

লাস এল—কম্বলে জড়ানো গিরধারী।

রাধিয়া বললো—কম্বল সরাও। আমি ওকে একবার দেখবো।

ডোমেরা কম্বলের ঢাকা সরিয়ে দিতেই, চমকে কপালে হাত দিয়ে এক ঠায় দাঁড়িয়ে রইল রাধিয়া। গিরধারীর আধ হাত লম্বা জিভ আর দড়ির মত লিকলিকে গলাটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ দুটো জোরে ঘসে নিয়ে চারিদিকে তাকালো।

সমস্ত পৃথিবীকেই আড়চোখে একবার দেখে নিল রাধিয়া। বুক ফেটে চরম ধিক্কার বের হয়ে এল—ছি ছি, একি চেহারা করে দিয়েছে রে। এর চেয়ে আমার বিষের হালুয়া যে ঢের ভাল ছিল রে!

বলতে বলতে কেঁদে ফেললো রাধিয়া।

কি বলছে? কি বলছে? ওয়ার্ডারেরা একে একে এসে রাধিয়াকে ঘিরে দাঁড়ালো।

এক আছাড় দিয়ে জলের কলসীটা ফটকের সামনে ফাটিয়ে দিল রাধিয়া। আঁচল থেকে শ্বেতকৌড়ি আর খই বের করে ছিটিয়ে দিল।

শেষ ব্রত সাঙ্গ হয়েছে রাধিয়ার। রাধিয়া আর ফিরে তাকালো না। ওয়ার্ডারদের পাশ কাটিয়ে দৌড়ে চলে যাবার জন্য চেষ্টা করলো।

ওয়ার্ডারেরা বললো—দাঁড়াও, পালিয়ো না। জেলরবাবু আসুক, পুলিশ আসুক। ইস্, কী সাংঘাতিক মেয়েমানুষ।

জীবনের ঝরাপাতা

শ্রীসরলা দেবী চৌধুরানী

[১৮]

ছেলেবেলা থেকে আমরা রবিমামার গান গাইতুম—

এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি,
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি,
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে
কে তারে উদ্ধার করিবে।
হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া,
তোমারেও তাই গিয়েছে ভুলিয়া।
তুমি চাও পিতা তুমি চাও চাও,
এ দীনতা পাপ এ দুঃখ ঘুচাও,
ললাটের কলঙ্ক মুছাও মুছাও
নহিলে এদেশ থাকে না।"

বড় হয়ে দেখলুম বাঙলার ললাটে প্রধান কলঙ্ক হচ্ছে কাপুরুষতার—সেইটিই মুছতে হবে। হাতে অস্ত্র ধরলেই ভীরুতা যায় না। কিন্তু অস্ত্রচালনার বিদ্যা জানা থাকলে ভরসা থাকে আততায়ীর শরীরে ঠিক কোন জয়গাটি বাঁচিয়ে কোন জায়গায় মারলে সে মরবে না, শুধু ঘা খেয়ে হতবল হবে। হয়ত তাতে মারপিটের দায়ে ধরা পড়তে হতে পারে, কিন্তু খুনের দায়ে নয়। এই ভরসাই সাহস দেয় অস্ত্রবিৎকে অস্ত্র চালাতে। কুকুরেরও দাঁত আছে, বেড়ালেরও নখ আছে, আক্রমণ করলে একটি পোকামাকড়ও কামড়ায়—শুধু বাঙালীই কি সাত চড়েও রা কাড়বে না? এত মনুষ্যত্বের অভাব তার চিরকাল? এত হীনতা?

আর একটা জিনিস দেখলুম। হাতের ও মনের দুইয়ের একসঙ্গে ক্রিয়া চাই। লাঠি চালাতে শিখলেও মনের muscles-এর অকর্মণ্যতা অনেক দিন ধরে পুরুষানুক্রমে বাঙালীর চলে এসেছে, সেটাকে সরিয়ে ঠেলে ফেলে মনকে কর্মপ্রমুখ করে কাজে ঝাঁপ দেওয়ানর অভ্যেস না করলে মনের হুকুম বিনা দরকারের সময় লাঠিবিদের হাত উঠবে না। বীরেরা বলেছিলেন—"বলং বলং বাহুবলং।" সঙ্গে সঙ্গে ধীরেরা শিখিয়েছিলেন—"ব্রহ্মতেজো বলং বলং।" অর্থাৎ মন ও শরীর পরস্পর পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়া করে। আমি ঝোঁকের মাথায় দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়েই আমার জাতিকে বলবীর্যে বলীয়ান করে গড়ে তোলার জন্যে তৎপর হইনি। এ বিষয়ে ইংলণ্ডের বড় বড় মনীষী Educationist-দের মতেরও যথেষ্ট অনুসন্ধানপরায়ণ হয়েছিলুম। তাঁদের একজনের পুস্তক পেলুম :—

Physical weakness is a crime—against yourself and those who depend on you. Weaklings are despised and a Weakling Nation is doomed. The decline of ancient Greece and Rome which rapidly fell from the pinnacle of supreme civilization was due to physical neglect and abuse of the inflexible laws of Nature. A physically weak nation is drained out mentally, its feet are on the downward path and it will end up on the scrap-heap if it does not act before it is too late. To change from a weakling to a

perfect man build yourself up, clear your befuddled brain and develop your muscles. The one great test of manliness is—Courage, both mental and physical. Your mind alone is the maker of your physical future and your physical strength insures a high moral standard.

ইংরেজীতে প্রবাদ আছে—

"The battles of England are fought and won in the fields of Eton."

Etonএ ফুটবল ক্রিকেট খেলতে খেলতে একদলের তার বিরুদ্ধ দলের সঙ্গে যে মারপিটের অভ্যাস হয়, সেই অভ্যাস ইংরেজকে স্বদেশ-রক্ষার্থ বা পরদেশ-বিজয়ার্থ যুদ্ধে তৎপর করে। কলকাতায় মোহনবাগান তখনো ময়দানে নামেনি। সেকালে মেডিক্যাল কলেজের ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে হিন্দু কলেজের ছেলেদেরই খেলা চলত এবং অনেক সময় দুদলে রক্তারক্তি খুনোখুনিও হত শোনা যায়—হিন্দু কলেজের ছেলেরা প্রতিবারই পরাস্ত প্রতিপন্ন হত। এবারে আমার ক্লাবের ছেলেদের কাছে গল্প শুনলুম আগের দিন মাঠেতে হিন্দু ছেলেরাই খেলায় জিতেছিল, Umpire-এর অপক্ষপাত নির্ধারণও তাই হয়েছিল, কিন্তু তার পরে ফিরিঙ্গি ছেলেরা আক্রোশে দল বেঁধে একপাল উন্মত্ত ষাঁড়ের মত যেমন তাদের তাড়া করলে তারা পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে—"যঃ পলায়তি স জীবতি"—এই নীতির অনুসরণে। একটা হিন্দু ছেলেও তাদের সম্মুখীন হল না। আমি বর্ণনাকারীদের জিজ্ঞেস করলুম—"তোমরা কজন ছিলে? কি করলে?" তারা বল্লে—"আমরা দশবারো-জন ছিলুম। আমরা কি করতে পারি? আমরাও সরে পড়লুম।"

আমি তাদের ধিক্কার দিয়ে উঠলুম। বল্লুম—"বৃথা তোমাদের অস্ত্রবিদ্যা শেখা, বৃথা তোমাদের এখানে লাঠি ঘোরান। কাল থেকে এধার এসো না।" তারা লজ্জিত হয়ে অবনত মস্তকে রইল। তারপরে মাঠে খেলায় জিতেও ফিরিঙ্গির তাড়নায় বাঙ্গালীদের পলায়ন উপলক্ষে ভারতীতে আমার প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ বেরতে থাকল। মহাভারত থেকে সেই কাহিনী শোনালুম যাতে পাওয়া যায়—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র অনিরুদ্ধ রাজা সাম্বর সঙ্গে যুদ্ধে আহত ও সংজ্ঞাশূন্য হলে তাঁর সারথি যখন তাঁকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক হয়, তিনি সংজ্ঞালাভ করে জানতে পেরে তাকে ভর্ৎসনা করে বলেন—"এ কি করলে? আমার নাম চিরকালের জন্যে বীরসমাজ থেকে মুছে দিলে? যদুকুল-বৃদ্ধেরা কি বলবেন? আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছি শুনে আমার পিতা-পিতৃব্যেরা কি মনে করবেন? যদুকুল-ললনারা কি আমায় কাপুরুষ কুলকলঙ্ক বলে ঘৃণা করবেন না? ফিরাও ফিরাও রথ—আমায় যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে চল, ফের সারথি।"

বাঙ্গালী ছেলেদের বল্লুম—"তোমরা সেই ভারতের সন্তান, যাদের ধমনীতে আজও তোমাদের পূর্বগত ভারতবালক অনিরুদ্ধের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। সে রক্ত কলঙ্কিত কোরো না, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিও না। যদি উদারভাবে বল, ক্ষমা করে এসেছ তাদের, তবে জেনো অক্ষমের ধর্ম নয় ক্ষমা। আগে ক্ষমা করবার অধিকারী হও, প্রবল হও, বলবত্তর হও, তবে তোমার চেয়ে যে হীনবল, তার প্রতি দয়া কোরো, তাকে ক্ষমা কোরো—তার আগে ক্ষমা করা ভীরুতার কাপুরুষতার নামান্তর।" দুতিন মাস পরে একটি ছেলে আগুয়ান হয়ে—চোর-বাগানের বসু পরিবারের শৈলেন বসু—আর পাঁচ দশটি ছেলের সঙ্গে আমাকে প্রণাম করে বল্লে—"মা চল্লুম—ছ' মাস পরে আবার আসব।"

"কোথায় যাচ্ছ?"

তারা বল্লে—"কাল আবার মাঠে খেলা আছে। এবার আর ফিরিঙ্গিদের প্রহার ভয়ে আমরা পলাতক হবো না—উত্তম মধ্যম না দিয়ে ছাড়ব না। তার দরুণ যদি জেলে যেতে হয় যাব—আইনেতে ছ' মাসের বেশি সে ধারায় সাজা নেই—তাই বলছি ছ' মাস পরে আপনার শ্রীচরণে আবার আসব।"

তারা গেল, ফিরলেও সমুন্নত মস্তকে পরের দিন, ফিরিঙ্গিরাই এবার পলাতক হয়েছিল, কাউকে জেলে যেতে হয়নি।

সে সময় স্টেট্‌সম্যানের এডিটর ছিলেন র‍্যাটক্লিফ সাহেব। তাঁর সঙ্গে ডিনারে, ইভনিং পার্টিতে মধ্যে মধ্যে দেখা হত, আমার কার্যকলাপ তাঁর অবিদিত ছিল না, কখন কখন সে সম্বন্ধে আমার সঙ্গে তাঁর খোলাখুলি আলোচনাও হত। মোহনবাগান যে বছর গোরাদের বিরুদ্ধে ফুটবলে প্রথম জিতলে, সে বছর তিনি বিলাতে ও আমি পাঞ্জাবে। "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান"-এর সম্পাদকপদে অধিষ্ঠিত তখন তিনি। গোরাদের বিরুদ্ধে বাঙালীদের অভূতপূর্ব জিতের খবরটা "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে" দিয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন—"আমরা জানি এ ঘটনায় সব চেয়ে বেশি আনন্দিত যিনি হবেন তিনি হচ্ছেন—সরলা দেবী—বাঙলার একটি নন্দিনী।"

বলেছি নানা জায়গা থেকে নানা ছেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত সে সময়। কেউ কেউ বলত তার মধ্যে পুলিশের গুপ্তচরও আছে। তাতে আমি ভয় পেতুম না, কারণ আমার লুকোবার কিছুই ছিল না। একদিন মৈমনসিং থেকে দুটি ছেলে এল—কেদার চক্রবর্তী ও তার সহচর ব্রজেন গাঙ্গুলী—পরে স্বদেশী গায়ক বলে যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বল্লে সুহৃদ সমিতি নামে একটি দল বাঁধা তারা কয়েকটি ছেলে একটি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে যে গবর্ণমেন্টের চাকরী খুঁজবে না, নিজেরা একটা বড় রকম জমি নিয়ে স্বহস্তে চাষবাস করে নিজেদের প্রতিপালন করবে। সে জন্যে তাদের পাঁচশ টাকা মূলধনের দরকার। সুরেন বাঁড়ুয্যে প্রভৃতি দেশের অনেক নেতাদের কাছে গিয়ে নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে ঐ পাঁচশ টাকা ধার চেয়েছে—বছর দুয়েকের মধ্যে টাকাটা ফিরিয়ে দিতে পারবে এই আশাও প্রকাশ করেছে। কিন্তু কেউ তাদের বিশ্বাস করে টাকা দেননি। শেষে আমার কাছে এসেছে, যদি আমি দেশের ছেলেদের প্রতি বিশ্বাস রাখি, টাকা দিই। জমি প্রায় যোগাড় হয়েছে—মৈমনসিং গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর অনুগ্রহে। তিনি আসাম প্রদেশের পাদতলস্থ তাঁর জমি থেকে প্রায় এক হাজার বিঘা তাদের lease দিতে প্রস্তুত আছেন যদি নিজেরা চাষবাস করে। কিন্তু হাল যোৎ গরু ও বীজ প্রভৃতির জন্যে পাঁচশ টাকা গোড়ায় সংগ্রহ না হলে জমি নেওয়া তাদের বৃথা তাই এখনো নেয়নি। বড় আশা করে আমার কাছে এসেছে। আমি কি দেব তাদের টাকা? তাদের দলে বিশটি ছেলে আছে যারা এই কাজের জন্যে প্রস্তুত।

আমি স্থির জেনে নিয়েছিলুম দেশের ছেলেদের মানুষ করে তোলার যে কাজে আমি নেমেছি তাতে ফিরে পাবার আশা না রেখেই অনেক সময় টাকা ঢালতে হবে। সেগুলো হিসেবের খাতাতে bad debts-এর ঘরেই ফেলতে হবে। আমরা অনেকেই অনেকদিন ধরে প্লাটফর্মে প্রেসে অনুযোগ আনছি, চাকরী ছাড়া বাঙালী ছেলেদের কি গত্যন্তর নেই? স্বাধীন জীবিকার কোন পথই নেই? আমাদেরই সকলের অনুপ্রেরণায় এই ছেলেরা একটা পথ খুঁজে নিয়েছে। এখন যদি তাদের নিরুৎসাহ করি, প্রয়োজনকালে টাকার সাহায্য দিয়ে তাদের সেই পথে অগ্রসর করে না দিই তবে আমাদের নিজেদের উক্তিতে নিজেদেরই অবিশ্বাস প্রমাণ করা হবে না কি? টাকাটা ঋণ বলেই দেব, কিন্তু ঋণ ফিরে পাবার আশা রাখব না—এই মনস্থ করলুম। হতে পারে এই ছেলেরা ঠগ, হতে পারে সরলমনে চেষ্টা করেও এরা কৃতকার্য হবে না—টাকাগুলি জলেই যাবে, তবু এইভাবে কোন কোন দিকে টাকা ডোবানর জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি কেদার চক্রবর্তীকে বল্লুম—"দেব আমি টাকা, কিন্তু ব্রজেন রায়চৌধুরী যে তোমাদের জমি দিতে প্রস্তুত আছেন, সে বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে তাঁর পত্র ব্যবহার দেখতে চাই।"

এক সপ্তাহ পরে তারা ফিরে এসে বল্লে—"ব্রজেনবাবু এখন আমাদের নামে জমি দিতে অস্বীকার করছেন। আপনি আমাদের মাথার উপর দাঁড়িয়েছেন জেনে বলছেন আপনাকে দেবেন জমি, আমাদের নয়, সে বিষয়ে আপনার সঙ্গে লেখাপড়া করতে প্রস্তুত আছেন।" তারপরে তাঁর স্বদেশপ্রেমিক সেক্রেটারী মনোমোহন ভট্টাচার্যের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রবাবু স্বয়ং এসে আমার সঙ্গে দেখা করে সব ঠিক করলেন।

জমি আমার নামেই লেখাপড়া হল। জোৎ হালি সব আমার টাকায় আমার নামেই কেনা হল। ছেলেরা চালাবে ও যে ফসল হবে তার দ্বারা নিজেদের প্রতিপালন করবে। দুইএক বছরে যখন আমায় টাকাটা ফিরিয়ে দিতে পারবে তখন সব কিছুর মালিক তারাই হবে। এই থেকে সুহৃদ সমিতির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সংযোগ হল।

এবার আমার দৃষ্টি গেল বাঙলায় একটি জাতীয় উৎসবের দিন নির্দিষ্ট করার দিকে। যেমন মহরমের দিন মুসলমানদের নানা-রকম অস্ত্রচালনার প্রদর্শনী চলে পথে-ঘাটে, তার জন্যে সারা বৎসর ধরে নানা আখড়ায় নানা নেতার অধীনে নানা দল সেগুলি ভাঁজতে থাকে; যেমন রামলীলা ও দশেরা বা বিজয়া দশমীর দিন বঙ্গেতর হিন্দু-ভারতে বীরোচিত . নানা খেলাধুলো চলে, বাঙলায় সেই রকম, চালাতে হবে—কোন্ দিন? ওসব দেশের দশেরা আমাদের বিজয়া দশমীর মত . নয়, তাতে প্রতিমার ভাসানের পর্ব নেই। আমাদের ভাসানের দিন সবাই তারই আয়োজনে ব্যস্ত, সেদিন খেলাধুলোর বিশেষ অনুষ্ঠানের অবসর হবে না বাঙালী-দের। অথচ ঐ শারদীয় ঋতুতে যে সময়ে শমীবৃক্ষ থেকে তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে পাণ্ডবরা বীরভোগা বসুন্ধরায় অভিযানে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন সেই সময়েই বাঙালীদের বলবীর্য সাধনার জাতীয় উৎসব না হলে বাকী সব হিন্দুদের সঙ্গে তারা ঐক্য সূত্রে বাঁধা হবে না। এইরূপ দ্বিধায় দোদুল্যমান যখন তখন বাঙালীর পঞ্জিকা হলেন আমার সহায়। হঠাৎ একদিন এ বছর দুর্গা পুজোর ছুটি কবে থেকে আরম্ভ হবে তাই জানার জন্যে পঞ্জিকার পাতা উল্টাতে উল্টাতে চোখে পড়ে গেল দুর্গাপুজোর অষ্টমীর আর একটি নাম "বীরাষ্টমী", এবং সেদিন "বীরাষ্টমী ব্রত" পালন করা ও ব্রতকথা শোনানর বিধান। আমায় আর নতুন করে কোন দিন উদ্ভাবন করতে হল না, যা চাচ্ছিলুম পেয়ে গেলুম। বহুকাল ধরে বাঙলা দেশের সংস্কারে যা রয়েছে কিন্তু বাঙালীর ব্যবহার থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে তারই পুনরুদ্ধার করা। বাঙালী মায়েদের বীরমাতা হওয়ার লক্ষ্য পথে আবার নিয়ে আসা, সে বিষয়ে তাদের ব্রতের পুনঃ-প্রচলন করা। ভীরু বাঙালী মাঁদের হাত দিয়েই ছেলের রক্ষা বন্ধন করিয়ে মায়ের নিজমুখে "বীরোভব" বলে ছেলেকে বীরোচিত খেলা-ধুলায় কাজেকর্মে প্রবৃত্তি দেওয়ান। মাতায় পুত্রে মিলিত হয়ে দেশকে গৌরবশিখরে সমুন্নত রাখার প্রকৃষ্ট সাধনা যে দেশের ধর্মোৎসবের একটি অঙ্গ ছিল—সে দেশ আজ এত হীন এত পতিত হয়ে আছে কেমন করে? আমার প্রাণ কেঁদে উঠল। আজ আমার দেশের অনেক ছেলে 'মা' বলে। মা জেনে আগে থাকতেই আমি তাদের কারো কারো হাতে রক্ষাবন্ধন করেছিলুম। এখন যখন জানলুম ঐ দিনে এদেশের দেশাচারই ঐ, মায়ের কর্তব্যই ঐ, তখন ক্লাবে ক্লাবে সকল খেলোয়াড়ের হাতেই ঐদিন রাখী বেঁধে তাদের লোকসমক্ষে খেলায় প্রবৃত্ত করানই হল আমার ধর্ম—আমার প্রতি দেশমাতৃকার এইটিই আদেশ, নয়ত পঞ্জিকার ঐ পৃষ্ঠাটির প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ালেন কেন?

সেই থেকে আধুনিক বীরাষ্টমী উৎসবের সূচনা হল। সেই বছরই মহাষ্টমীর দিন ২৬নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের মাঠে ছেলেদের অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শনী ঘোষণা করা হল। কলকাতায় যত ক্লাব আমার জানা ছিল সকলের কাছে আমন্ত্রণ গেল—তাঁরা যেন উৎসবে যোগদান করেন ও খেলার প্রতি-যোগিতায় নামেন। মুর্শিদাবাদের Dowager নবাব-বেগম সাহেবার কন্যা সুজাতালি বেগের পত্নী আমার বন্ধু ছিলেন। লেসের পরদা-ঘেরা একটা প্লাটফর্মের ভিতর আমার মা ও মাসিমাদের সঙ্গে তাঁকে বসিয়ে শেষে পরদার ভিতর থেকে বাড়ান তাঁর হাত দিয়ে উৎসব প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করালুম—কাউকে মুষ্টিযুদ্ধের জন্যে দস্তানা, কাউকে ছোরা, কাউকে লাঠি এবং প্রত্যেককেই একটি করে 'বীরাষ্টমী পদক'—তার এক পিঠে লেখা "বীরোভব"—এক পিঠে "দেবাঃ দুর্বলঘাতকাঃ"। বীরাষ্টমী উৎসবের একটি অনুষ্ঠান পদ্ধতিও প্রস্তুত হল। তার প্রধানাঙ্গ হচ্ছে একটি ফুলের মালায় সজ্জিত তলোয়ারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেশের পূর্ব পূর্ব বীরগণের বন্দনা-স্তোত্র ও তাঁদের নাম উচ্চারণ করে করে তরবারিতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান। সে স্তোত্রটি এইঃ—

বীরাষ্টম্যাং মহাতিথৌ পূর্বে পূর্বগতান্ বীরান্
নমস্কুর্য ভক্তিপূর্বং পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্॥
বীরকুলাগ্রগণ্যং শ্রীকৃষ্ণ-নন্দনন্দনম্

বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্॥
সানুজং শ্রীরামচন্দ্রং রঘুকুলপতিশ্রেষ্ঠং
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্॥
ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণার্জুন-ভীমান্ সর্বপিতামহান্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্॥
ইন্দ্রজয়ী মহাশূরং মেঘনাদরিপুত্রাসম্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্॥
রাজপুতকুলগর্বং প্রতাপমহাপ্রতাপম্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্॥
ছত্রপতি মহাবীরম্ মহারাষ্ট্রকুলনায়কম্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্॥
পঞ্জাবকেশরীং বীরং রণজিৎ ইতি খ্যাতং
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্॥
বঙ্গাধিপং মহাশৌর্যং প্রতাপাদিত্য বীরেষাম্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্॥
ক্ষত্রবংশসমুদ্ভূতং বঙ্গজং রায় সীতারামম্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্॥
এতৎ-সর্বেবান্ পূর্বগতান্ পদে পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্মঃ বয়ম্ অদ্য নমোনমঃ॥

যখন এক এক জনের নাম উচ্চারণ করে করে পুষ্পাঞ্জলি প্রক্ষেপ হত, একটা ভীষণ উত্তেজনায় সমস্ত সভামণ্ডলী জাগ্রত হত। এই স্তোত্রটির রচয়িতা খিদিরপুরের সেকালের প্রসিদ্ধ স্বদেশী আশুতোষ ঘোষ। বিভিন্ন খেলার মধ্যে মধ্যে এক একটি জাতীয় সঙ্গীতও সকলের উৎসাহ প্রদীপ্ত করে রাখত।

'বীরাষ্টমী'র উৎসব বাঙ্গলায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। যে সব দেশভক্তেরা কলকাতায় এসে যোগদান করতে পারতেন না, তাঁরা স্ব স্ব নিবাস স্থানে এর অনুষ্ঠান আরম্ভ করলেন। আমার উপদেশ ছিল—যে গ্রামে আর কিছু করার সুবিধে নেই, সেখানে এই 'বীরাষ্টমী'কে উপলক্ষ্য করে মহাষ্টমীর দিন ছেলেরা যেন গ্রামের পুকুরে শুধু সন্তরণেরই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। মোট কথা এই তিথিটিতে কোন না কোন রকম শারীরিক বলবীর্যের অনুষ্ঠান চাই, আর মায়ের হাতের রাখী নেওয়া চাই।

সেই সময় সময় একবার বরোদার গায়-কোয়ার ও তাঁর রাণী দার্জিলিঙ থেকে কলকাতা হয়ে বরোদায় প্রত্যাগমন করবেন শুনতে পেলুম। আমি তাঁদের একটি অপরাহ্নে আমাদের বাড়িতে চায়ে নিমন্ত্রণ করলুম। তাঁরা যখন এলেন, আমার ক্লাবের ছেলেরা স্ব স্ব অস্ত্র হাতে তাঁদের Guard of honour দিলে এবং চা-পানের পর মাঠে তাদের অস্ত্রখেলা প্রদর্শন করলুম। মহারাজাকে গল্প করলুম প্রায় ৭।৮ বছর আগে সোলাপুরে তাঁর সভাপতিত্বে মহারাষ্ট্রীয় ক্লাবের খেলা দেখে আমার মনে এই ক্লাব খোলার প্রথম সূচনা হয়েছিল। বাড়ির ভিতরে উঠতে প্রথম ঘরেই জাপানী আর্টিস্টের হাতে আঁকা আমার ফরমাসী কালীর একটি অপূর্ব মূর্তি ছিল—সেখানি আজও আছে আমার বাড়িতে। ঘরের অন্যান্য দেওয়ালে আমার মা-বাবার ছবির সঙ্গে সঙ্গে আমারও একখানা বড় ছবি ছিল—খোলা চুলের প্রাচুর্যে বোধ হয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা—সে ছবি অনেক জায়গায় বেরিয়েছে, বোধ হয় যোগেন গুপ্ত মহাশয়ের "বঙ্গের মহিলা কবি" পুস্তকেও আছে। বরোদা রাজকে আমি কালীর ছবির দিকে নিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখতে বললুম। তিনি আমার ছবির দিকে ফিরে হেসে বললেন—"কোন্ কালী দেখব? এই কালী না ঐ কালী?"

ক্রমশ

অনুবাদসাহিত্য

কালো আদমীর শহর জীবন

(অনুবাদ গল্প)

ফে কিং

ডিনি হেসেছিল প্রথমত ট্রেনের জন্যে। শ্বেতাঙ্গদের যন্ত্র এত তাড়াতাড়ি চলে! এই গাড়ীই তাকে তার হাইভেল্ডের ছোট গ্রাম থেকে ডারবানে বয়ে এনেছিল। ট্রেনে ভ্রমণ সে পুরোপুরি উপভোগ করেছিল। শ্বেতাঙ্গদের যাদুবিদ্যার প্রশংসা করতে হয়। এত অল্প সময়ে এত দূরে আসা! সত্যি তার খুব ভাল লেগেছিল। স্টেশনে নেমে সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছিল। এত লোক সে এর আগে কখনও দেখেনি। তার মাথা ঘুরে গেছিল। লোকে আর মোটর গাড়ীতে স্টেশনের ওধারের পথগুলো নদীর স্রোতের মত ভেসে গেছে।

তার এক দূর সম্পর্কের ভাই স্টেশনে এসে তার সঙ্গে দেখা করেছিল। তারা দুজনে এক সঙ্গে ব্যারাকে গেছিল। যে ছোট শহরটিকে তারা ব্যারাক বলত প্রথম দেখার পর সেটি তার ভাল লেগেছিল। সেখানে অনেক লোক ছিল—সব তারই মত কালো এবং শীঘ্রই তাদের মধ্যে তার অনেক বন্ধু জুটেছিল। গান বাজনারও অবকাশ ছিল। সবই তার ভাল লেগেছিল। পরেরদিন সে ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করতে গেছিল। সে পুরো এক সপ্তাহ কাজ করেছিল। তারপর প্রভু তাকে দিয়েছিল দশটি শিলিং। তার মনে হয়েছিল যে এক সপ্তাহ কাজের পক্ষে এ অর্থ যথেষ্ট।

তারা কালো আদমীদের বাজারে গেছিল; সেখানে মুনিসিপ্যাল বিয়ার হলে প্রচুর বিয়ার কিনতে পারা যায়। সে দেখল তার পকেটের টাকা জলের মত খরচ হয়ে গেল।

কিন্তু সে সুখী হয়েছিল।

এখনও ডিনি হাসল।

পাঁচ বছর আগে সে শহরে এসেছিল। সেই সুখের সপ্তাহের পর পাঁচ বছর কেটে গেছে। এখন আবার এসেছে তার ছোট ভাই। সে স্টেশনে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করল এবং লোভুর মুখে বিস্ময় ও উত্তেজনার ছাপ দেখে সে হাসল।

"তুমি তবে এবার শহরে বাসা বাঁধছ?" সেই ভাইয়ের লাল টিনের ট্রাঙ্কটি কাঁধে উঠিয়ে প্রশ্ন করল।

ছোট ভাই জবাব দিল: "লোকে বলে টাকা এখানে জলের মত। আমাদের ঘাড়ে খুব ট্যাক্সের চাপ পড়ছে। সমস্ত গরু-বাছুর ত দূর হয়েছে—এবার জমিও যাচ্ছে। শুধু উপত্যকায় ছোট একখণ্ড জমি আছে। নদীর কাছের জমি খণ্ডের খাজনা দিতে পারি না। কাজেই বুড়ো আমায় শহরে টাকা রোজগার করতে পাঠালে—তুমি ত আর আজকাল টাকা পাঠাও না। ওঃ! এ জায়গাটা কত বড়! গণ্ডগোলে আমি ভয় পেয়ে যাচ্ছি।"

ডিনি আবার হাসল। কিন্তু হাসির শব্দে সুখের লেশমাত্র নেই।

"শহরে টাকা তবে জলের মত?" সে বলল।

"তারা বলে আর আমরা বিশ্বাস করি।"

"সে কথা সত্য। শহরে যথেষ্ট টাকা আছে। কিন্তু তোমার জন্যে নেই। শহরে কালো আদমীর পথে যা কিছু টাকা আসে তা ধরার জন্যে তাকে দেওয়া হয় চালুনি। সে টাকা রাখতে পারে না। সে টাকা সর্বদাই চালুনির ছিদ্রপথে শ্বেতাঙ্গদের হাতে চলে যায়—ট্যাক্স, ভাড়া এবং অন্যান্য হাজার রকমে।"

"কিন্তু আমি কাজ করব......" লোভু তাড়াতাড়ি বলল।

"আমার দিকে তাকাও" তার ভাই পাল্টা জবাব দিল। "আমি কি কাজ করি না? আমার পরণে এ সব কি? এগুলো কি মানুষের পোষাক? আমি সারাদিন রিক্সা টানি এবং মাঝে মাঝে যখন চড়নদার পাই না, তখন ভাড়ার খোঁজে সারা রাত ঘুরে বেড়াই। এখানে মানুষের মনুষ্যত্ব নেই। সে ঘোড়ার মত খাটে—খেটে যা পায় তা দিয়ে তার রিক্সা ভাড়া শোধ হয়, রিক্সাও তার নিজের নয়; জনাকীর্ণ ব্যারাকে থাকার জন্যে সীট ভাড়া দিতে হয়—খাবার খরচ, বিয়রের খরচ, ট্যাক্স এবং জরিমানা ত আছেই। তুমি ঠিকই বলেছ—শহরে টাকা, জলের মত। কিন্তু এস আমরা অনাবশ্যকভাবে দাঁড়িয়ে থাকার দরুণ পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগেই এখান থেকে সরে পড়ি। ধরা পড়লে তোমার দশ শিলিং জরিমানা হবে—আমারও দশ শিলিং জরিমানা হবে। আমার হাতে মোটেই টাকা নেই।"

"কিন্তু আমরা ত কোন অন্যায় করছি না? তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?" লোভু সবিস্ময়ে বলে উঠল।

"তুমি শীঘ্রই সে কথা বুঝতে পারবে। এখন চলে এস।"

তারা তাড়াতাড়ি করে স্টেশনের বাইরে এল। ডিনি তার চারদিকের কোন জিনিসের দিকেই নজর দিচ্ছিল না—লোভু অবিশ্বাসী চোখে সবিস্ময়ে প্রত্যেকটি জিনিসের দিকে তাকাচ্ছিল। উত্তেজনায় সে প্রায় একটি শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিল আর কি! সে ক্ষমা চাওয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল। ডিনি তার হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে চলল।

"তোমার হয়েছে কি" লোভু রেগে বলল।

"বোকা, অমন কাজ আর কখনও করো না," তার ভাই তীক্ষ্ণ স্বরে জবাব দিল। "তোমার কি এত শীঘ্রই জেলে যাবার ইচ্ছা হয়েছে?"

লোভু তার পিছনে পিছনে চলল। বহু বৎসরের ছাড়াছাড়ি এবং শহর তার দাদাকে পর করে তুলেছে।

ডিনি পথ দেখিয়ে তাকে তার নিজের রিক্সার কাছে নিয়ে গেল।

"তুমি এইটা টান?" লোভু সবিস্ময়ে বলল। এখনই সে কেবল পুরোপুরি বুঝতে পারল ডিনির পোষাক ও কথাবার্তার কি অর্থ।

ডিনি ভুরু কোঁচকিয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

"এস, রিক্সায় চড়," সে সহসা বলল। "আমরা এখানে দাঁড়িয়ে সময়ের অপব্যয় করছি!"

সে ভাইয়ের বাক্স রিক্সায় তুলে নিল এবং লোভু সন্তর্পণে চড়ে বসল।

ডিনি রিক্সার ডাণ্ডা দুটি তুলে নিয়ে জনাকীর্ণ পথে চলতে সুরু সুরু করলে লোভু সাবধানে মন্তব্য করল: "মনে হয় তুমি এ শহরটি পছন্দ কর না।"

"আমি যখন এখানে এসেছিলাম সে দিনটাই ছিল খারাপ।"

"কিন্তু তুমি ত গ্রামে ফিরে যাওনি।"

"তুমি পরে এর কারণ বুঝবে," ডিনি বলল। "শহর যে হাত দিয়ে তোমায় ধরে সে হাতটা শয়তানের—তোমায় যাদু করে।"

ডিনি ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে পথ চলছিল। তার ভাই রিক্সার দুই পাশ ধরে সোজা হয়ে বসে মৃদু মৃদু হাসছিল আর নতুন কোন জিনিস দেখলেই বিস্ময়োক্তি

করছিল। রিক্সার ডাণ্ডা দুটো ধরে দৌড়তে দৌড়তে ডিনিও মৃদু মৃদু হাসছিল—ভাবছিল সে যখন প্রথম শহরে এসেছিল তখন তার কি রকম অদ্ভুত লেগেছিল। কি অদ্ভুত, আর কি বিস্ময়কর!

তারা অন্যান্য রিক্সাওয়ালাদের ছেড়ে যাচ্ছিল। কেউ কেউ খালি রিক্সা টেনে মাথা নামিয়ে ধীরে ধীরে চলেছে। অন্যেরা চড়নদার নিয়ে ডাণ্ডা দুটির মধ্যে লাফিয়ে চলেছে—শ্বেতাঙ্গ যাত্রীদের আনন্দের জন্যে তারা যেন কসরৎ দেখাচ্ছে। যখনই কোন রিক্সা তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখনই ডিনি রিক্সাওয়ালার সঙ্গে আলাপ করছিল।

"কি রকম চলছে? একি তোমার আজকের প্রথম ভাড়া?" ডিনিকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে।

"এ আমার ভাড়া নয়। এটি আমার ভাই—গ্রাম থেকে এসেছে"। সে পিছন দিকে তাকিয়ে বলল, "সে বলে এই সহরে টাকা নাকি জলের মত। ও কিছু টাকা রোজগার করতে এসেছে।"

এই কথায় হাসির হর্‌রা পড়ে গেল।

"টাকা জলের মত! সে শীঘ্রই দেখবে! হয়ত আমরা সহরে শুধু অনাবৃষ্টিই দেখি। হয়ত ও যখন সহরে এসেছে তখন বৃষ্টি হবে......টাকা জলের মত!"

অথবা কোন ভাগ্যবান রিক্সাওয়ালা মৃদু হেসে পিছনে তার রিক্সার উপর বসা চড়নদারের দিকে তাকিয়ে বলল: "আজ আমার পক্ষে দিনটা ভালই গেছে। সৌভাগ্যের দিন!"

লোভু টাকা জলের স্রোতের মত বয়ে যাওয়া সম্বন্ধে যা বলছিল, সেকথা ডিনি তাদের বলায়, তারা সবাই হাসল।

এতে লোভু বিব্রত হয়ে রেগে গেল।

"এ লোকগুলো হাসে কেন?" সে জানতে চাইল।

তার ভাই জবাব দিল: "ওরা হাসছে, তার কারণ তুমি আজ যা বলছ, ওরাও প্রথমে সহরে এসে তা-ই বলেছিল।"

"তাতে হয়েছে কি?"

"একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা!"

লোভু নিজকে টেনে সোজা করল—রাগে তার স্বর চড়ে গেল।

"তাদের মনুষ্যত্ব নেই বলে এবং তারা রাস্তায় রাস্তায় রিক্সা টেনে বেড়ায় বলে তারা মনে করে যে, প্রত্যেকেই তাদের মতন। আমি তাদের দেখিয়ে দেব। আমি পুরুষ-সুলভ কাজে ভয় করি না। আমি শীঘ্রই প্রচুর অর্থ রোজগার করব—তখন দেখা যাবে কে হাসে।"

ডিনি রাগ করল না। সে মৃদু হেসে মাথা নাড়ল।

"লোভু, আমিও এই কথাই বলেছিলাম—কিন্তু পাঁচ বছর বড় দীর্ঘ কাল। এর মধ্যে অনেক কিছু শেখা যায়।"

কিছু পরে সে অনেকগুলো রিক্সার কাছে এসে তার রিক্সাটা নামাল একটা নর্দামার পাশে—সেখানে একটি লোক বসেছিল। লোভু রিক্সা থেকে নেমে জড়সড় হয়ে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

"ব্যবসা কেমন চলছে?"

"খারাপ, খারাপ। আজ আমার ভাড়ার টাকাও জোটেনি," এই কথা বলে ডিনি অন্য সবাইর দিকে ফিরল।

"এ হচ্ছে আমার বাবার কনিষ্ঠ পুত্র," সে লোভুকে টেনে সামনে এনে বলল। তারপর দুজন বিবেচক বন্ধু সরে বসে তার জন্যে যে জায়গাটা করেছিল, সেখানে সে বসে পড়ল। "এ সহরে নতুন এসেছে। ও ভাবে সহরে টাকা জলের মত। টাকা জলের মত—বুঝলে?"

তারা নাচুনে চোখে মিট মিট করে তার দিকে তাকিয়ে সবাই একযোগে হেসে উঠল। যুবক রেগে-মেগে চুপ করে রইল। এরা সহরের লোক; তারা ভুল করলেও তারা সবাই তার চেয়ে বয়সে বড়। সে তাদের দেখিয়ে দেবে—হ্যাঁ সে শীঘ্রই তাদের দেখিয়ে দেবে।

একজন রিক্সাওয়ালা নস্য নিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বলল: "হ্যাঁ, আমি যখন সহরে এসেছিলাম, তখন আমিও ওই ধারণা নিয়েই এসেছিলাম। ট্যাক্স দেবার পক্ষে যথেষ্ট টাকা রোজগার করব—বউয়ের গয়নার জন্যে টাকা জমাব। আমি খুব পরিশ্রম সুরু করেছিলাম। আমি সব রকম কাজ করতাম। তারপর এক রাতে আমার ব্যারাকে পুলিশ এসে হাজির হল—কে যেন আমার পাশটা চুরি করেছিল। কাজেই ওরা আমায় এক মাসের জেল দিল। তারপর যখন বেরিয়ে এলাম—তখনও একটা না একটা বিভ্রাট লেগেই রইল—নতুন পাশ কেনা, ট্যাক্স দেওয়া এবং বেকারত্ব। সব সময়েই একটা না একটা বিভ্রাট। আর এখন এই আগুন বুকে নিয়ে দিনরাত মেয়েদের রিক্সা টেনে বেড়াচ্ছি। এটা ঋণ শোধ করছি—বউয়ের জন্যে গয়না কেনার পয়সা আর থাকে না। সে হয়ত এতদিন অন্য লোকের কাছে গেছে......টাকা জলের মত! সেও দেখতেই পাবে!"

আর একটি লোক বলল: "আমি একমাস এক শ্বেতাঙ্গের অধীনে প্রচুর খেটেছিলাম। সে বলেছিল সে আমায় এক পাউণ্ড দেবে। যখন মাস শেষ হল সে বলল যে, পরের মাসে সে আমায় দু পাউণ্ড দেবে, কারণ তখন তার হাতে টাকা ছিল না। দ্বিতীয় মাসও যখন গেল, তখনও সে আমায় টাকা দেয় না। কাজেই আমি তাকে মার লাগালাম। ওরা আমায় তিন মাসের জেল দিল আর ছয়বার বেত্রাঘাত করল। এভাবে কি টাকা রোজগার করা যায়? শহরে সব সময়ই এই অবস্থা!"

অন্যেরাও তাদের কাহিনী বলল। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বলার ছিল। তারা তাড়াতাড়ি কথা বলছিল—তাদের কথায় আবেগ আর তিক্ততা—তাদের হাত এবং চোখ দুটোই চঞ্চল। এমনইভাবে পথের কোণে বসে রইল—কেউ পাইপ খাচ্ছে, কেউ নিচ্ছে নস্য, আবার কেউ বা পাথরের কুচি নিয়ে জুয়ার মত এক ধরণের খেলা খেলছে।

পথের ওধার থেকে একজন শ্বেতাঙ্গ শিস্ দিয়ে হাত নাড়ল। তারা সবাই শব্দ করে উঠে দাঁড়াল এবং রিক্সা নিয়ে মোটা শ্বেতাঙ্গটির আদেশ পালনের জন্যে ছুটল। শ্বেতাঙ্গটি কিছুক্ষণ তাদের নিয়ে খেলল। একবার সে একে পছন্দ করে, আবার মন বদলিয়ে আর একজনকে পছন্দ করে, আবার মন বদলায়। তারা সবাই তাদের ছোট ছোট ঘণ্টা নাড়ছিল এবং প্রত্যেকে নিজের নিজের শব্দ করে শ্বেতাঙ্গটির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিল। তাদের মধ্যে একজন মুখে চিন্তার কালি মেখে ফিরে দাঁড়াল। শ্বেতাঙ্গটি হেসে তাকেই ডেকে ফেরাল এবং তার রিক্সায় চড়ে বসল। অন্য সবাই স্ট্যাণ্ডে ফিরে এল।

ডিনি ভাইয়ের দিকে তাকাল।

"এস", সে বলল, "আমি যেখানে থাকি তোমাকে সেই ব্যারাকে নিয়ে যাই। আমি তোমাকে আমার পাশে একটা বিছানা দেব। তুমি কাজ না পাওয়া পর্যন্ত আমার যা কিছু আছে স্বচ্ছন্দে তার ভাগ নিতে পার। এস রিক্সায় ওঠ।"

লোভু আদেশ পালন করল।

রাস্তা দিয়ে দৌড়ে যেতে ডিনি ভাইয়ের মুখের দিকে ফিরে তাকাল। তার মুখ স্থির গম্ভীর। একাগ্রতা উঠে গেছে—তার চোখে সন্দেহের ছায়া।

ডিনি যেন বাতাসে ভেসে চলতে চলতে হেসে উঠল। ডিনির হাসিতে সুখ ছিল না।*

---

* [দক্ষিণ আফ্রিকার লেখিকা ফে কিং-এর (Fay King) একটি গল্পের অনুবাদ]

অনুবাদক: গোপাল ভৌমিক

ওয়ারেন হেষ্টিংস ও গীতা

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

গীতার শিক্ষা ও দীক্ষা সহস্র সহস্র বৎসর ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ভগবৎ-সাধনায় অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে। গীতার গভীর দার্শনিক তত্ত্ব, কর্ম ও জ্ঞানযোগের ব্যাখ্যা সমগ্র বিশ্বের সুধীজনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তনের যুগে ইংরেজ রাজকর্মচারীরা ও ধর্মযাজকগণ ভারতের সংস্কৃতি ও ধর্মশাস্ত্রের সহিত পরিচয় লাভ করিতে আরম্ভ করেন, তখন হইতেই প্রাচ্য জ্ঞান অন্বেষণকারী পাশ্চাত্য জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিগণ গীতার মর্ম-কথার সন্ধান পাইয়া গীতার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠেন।

একশত ষাট বৎসর পূর্বে ভারতে প্রথম ইংরেজ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস্ সাহেব গীতার মহিমা উপলব্ধি করিয়া গীতার ইংরেজি অনুবাদ মুদ্রিত করিবার জন্য উদ্যোগী হন। চার্লস উইলকিনস্ নামে এক বিশিষ্ট জ্ঞানী ও ব্যবসায়ী ইংরেজ, তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়াতে হেস্টিংস সাহেবের পরামর্শে কলিকাতা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি-মানসে হেস্টিংস্ সাহেবের নব-আবিষ্কৃত বারাণসী ধামে গমন করেন। তিনি ভারতের ধর্ম-সাধনার, শাস্ত্রালোচনার ও সাধকদের কেন্দ্রস্থান কাশীধামে অবস্থিতিকালে হিন্দু ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রের সহিত পরিচিত হন। সেই শাস্ত্র-মন্থনকালে গীতাই তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

বন্ধুবর হেস্টিংস্ সাহেবের উৎসাহে উইলকিনস্ সাহেব গীতার সমগ্র অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রত্যেক শ্লোক সরল ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের চেষ্টায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টার্সের উদ্যোগে লন্ডন মহানগরীতে গীতার সেই অনুবাদ ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। সেই পুস্তকের ১৭৮৫ সালের ৩০শে মে তারিখে লিখিত যে মুখবন্ধ মুদ্রিত আছে, তাহা পাঠ করিলে গীতা তখনকার পাশ্চাত্য সুধী-সমাজের যে কতখানি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা উপলব্ধি করা যায়। তাহাতে লেখা আছে—.

"The antiquity of the original and the veneration in which it hath been held for so many ages, by a very considerable portion of the human race, must render it one of the greatest curiosities ever presented to the litarary world."

এই গীতাই বিদেশীয় ভাষায় সর্বপ্রথম অনূদিত ও মুদ্রিত ভারতীয় গ্রন্থ। তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস্ সাহেব গীতার ইংরেজি ভাষায় অনূদিত গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিবার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টার্সের প্রথম সভ্য ন্যাথিন্যাল স্মিথ্ সাহেবকে সুদীর্ঘ পত্র (মুদ্রিত ডবল ক্রাউন সাইজের ১৫ পৃঃ ডেসপ্যাচ) লিখিয়াছিলেন। এই পত্রখানি তিনি ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর বেনারস হইতে লিখিয়াছিলেন এবং ৩রা ডিসেম্বর অতিরিক্ত আর একখানি পত্রসহ কলিকাতা হইতে লন্ডনে পাঠান। সেই গীতার একখানি সংস্করণ এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে আছে।

এই পত্রে যে ওয়ারেন হেস্টিংস্ পররাজ্য ও ধন হরণের জন্য নানা অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারই স্বজাতীয় এড্মাণ্ড বার্ক দ্বারা পার্লামেন্টে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন গীতার প্রতি সেই যোদ্ধা ওয়ারেন হেস্টিংসের শ্রদ্ধা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। গীতার মহিমা বর্ণনা করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, গীতা হিন্দুদের নৈতিক উন্নতি, সাহিত্য-সৃষ্টি ও পৌরাণিক রহস্যভেদের আশ্চর্যজনক প্রামাণিক গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ—

(A very curious specimen of the literature, the Mythology and Morality of the ancient Hindoos.")

গীতা যে মহাভারতের নানা রত্নরাজির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন, তাহাও তিনি লিখিয়াছেন। মহাভারত চারি সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত পৃথিবীর একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, সেকথাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, যদিও ইউরোপের সভ্যতা, ধর্মাচরণ ও নৈতিক ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তথাপি গীতার শিক্ষা, দীক্ষা আমাদের ধর্ম-সাধনায় ও নৈতিক কর্তব্য-পালনে বিশেষ সহায়তা করিবে।

("it will appeal to revealed tenets of religion and moral duty in our own quarter of the globe, which in respect of the general diffusion and common participation of arts and sciences, may be now considered as one community".)

তিনি ব্রাহ্মণদের একনিষ্ঠা, উন্নত চরিত্র ও গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন—

"It is also to be observed that the Brahmans are enjoined to perform a kind of spiritual discipline not, I believe, unknown to some of the religious orders of Christians in the Roman Church. This consists in devoting a certain period of time to the contemplation of duty, his attributes and the moral duties of life. It is required to the exercise, not only that they divert their minds of all sensual desire, but that their attention be abstracted from every external object, and absorbed, with very sense, in the prescribed subject of their meditation".

হেস্টিংস্ সাহেব অতি শ্রদ্ধা সহকারে লিখিয়াছেন, ব্রাহ্মণদের একাগ্রচিত্ততা সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আর নাই। তিনি সেই শ্লোকের অনুবাদও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি
সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য
মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥ ৫৭॥
কচ্চিদেৎ শ্রুতং পার্থ
ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ
প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয়॥ ৭২॥

কার্যের ফলাফল বা উদ্দেশ্য হইতে মনকে পৃথক্ রাখিয়া যে কঠোর সাধনা, এবং যে সাধনার বিষয় তাঁহার নিজের দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও সাধকরাও উপলব্ধি করিতে সক্ষম নহেন, ভারতের সাধকরা সে সাধনা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া প্রশংসা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন।

"But if we are told that there have been men who were successively for ages past in the daily habit of abstracted contemplation begun in the earliest period of youth, and continued in many of the maturity of age, each adding some portion of the knowledge to the store accumulated by his predecessors;....as the mind ever gather strength like the body by exercise, so in such an exercise it may in each have acquired the faculty which they aspired, and that their collective studies may have led them to the discovery of new tracks and combinations of sentiments totally different from the doctrines with which the learned of other nations are acquainted."

গীতার মৌলিকত্ব, ভাবের গভীরতা ও অভিনবত্ব, দার্শনিক তত্ত্বের উচ্চভাব, বলিষ্ঠ যুক্তিতর্ক এবং বলিবার অপূর্ব কৌশল সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করিয়া হেস্টিংস সাহেব বলিয়াছেন—

"..the Geeta a performance of great originality; of sublimity of conception, reasoning and diction almost unequalled; and a single exception,

among all the known religions of mankind, of a theology accurately corresponding with that of Christian dispensation, and most powerfully illustrating its foundamental doctrines".

তিনি ইউরোপের যে কোন শ্রেষ্ঠ রচনার সহিত গীতার মূল্যে তুলনা করিতে চান নাই। গীতার শিক্ষা-দীক্ষা ও সাহিত্যিক গুণাবলী জগতে অননুকরণীয় এবং চিরকালই তাহা অননুকরণীয় বলিয়া হেস্টিংস্ সাহেব মনে করেন।

হেস্টিংস্ সাহেব তাঁহার দীর্ঘ পত্রে তাঁহার দেশবাসীকে জানাইয়াছেন যে, গীতা পাঠে কেবল যে তাঁহাদের রাজ্যশাসনকারী কর্মচারীরা তাঁহাদের চরিত্র গঠনকল্পে উপকৃত হইবেন তাহা নহে, সমস্ত বিশ্ববাসী উপকৃত হইবে। তাঁহার ধারণা যে, কেবল অসির সাহায্যে বা বাহুবলে রাজ্য-শাসন প্রজাপালন করা সম্ভব নয়। প্রজাগণের আচার-ব্যবহার, ধর্ম, দর্শন, সামাজিক অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি না জানিলে কোন বিদেশীয় রাজকর্মচারী দেশীয় লোকদের উপর প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন না। রাজকর্মচারিগণ অধ্যয়নে গীতার সেই সব গুণের অধিকারী হইতে পারিবে, মানবিকতায় ও বদান্যতার সহিত রাজ্যশাসন করিতে পারিবে। তিনি লিখিয়াছেন—

"Nor is the cultivation of Language and Science, for such are the studies to which I allude, useful only forming the moral character and habits of the service. Every accumulation of knowledge, and especially such as is obtained by social communication with people over whom we exercise a dominion founded on the right of conquest, is useful to the State; it is the gain of the humanity, in the specific instances which I have stated, it attracts and conciliate distant affections: it lessens the weight of the chain by which the natives are held in subjection; and it imprints on the heart of our own countrymen the sense and obligation of benevolence, even in England this effect of it is greatly wanting."

পরিশিষ্টে তিনি গীতার অনুবাদের ও অনুবাদকের প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহার এই উক্তি তখনকার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মনে গীতার প্রতি শ্রদ্ধা উদ্রেক করিয়াছিল। এই অনুবাদের দ্বারা বিশ্বের জ্ঞানরাজ্যের অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্রের একটি পথ উন্মোচিত হইবে, তাহাও বলিয়াছেন—

"It may, in the first event clear the way to a wide and unexplored field of the fruitful knowledge."

ওয়ারেন হেসিংস এতদসম্পর্কে যে মনোভাব দেখাইয়াছেন, তাহা আজকালকার শাসনকর্তা ও বিদেশীয় রাজনীতিকদের মধ্যে তাহার একান্ত অভাব, তাহারই ফলে বিশ্বে অশান্তির তাণ্ডবলীলা চলিতেছে। বাস্তবিক গীতার শিক্ষা-দীক্ষার অনুশীলনই জগতের শান্তি ও ভারতের মুক্তি আনিবে।

আলডাশ্ হাক্সলী

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

উদীয়মান ইংরেজ লেখকগণের মধ্যে আলডাশ্ হাক্সলীকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার বয়স এখন কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসর মাত্র; কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি পঁচিশ-ত্রিশখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া শিক্ষিত জগতে সম্মানিত ও স্মরণীয় হইয়াছেন। সকল দেশের আধুনিক সুলেখকগণ হাক্সলীর বাক্যোদ্ধারপূর্বক স্ব স্ব রচনাবলীকে উজ্জ্বল করেন। বর্তমান মহাসমরের কিছু পূর্ব হইতেই তিনি আমেরিকার কালিফোর্নিয়া শহরে বাস করিতেছেন। কয়েকখানি নাটক, নভেলও তিনি লিখিয়াছেন; তবে সারগর্ভ গ্রন্থ রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। প্রথম জীবনে যখন যৌবনের জোয়ার আসিয়াছিল, তখন তিনি সংশয়বাদী, জড়বাদী ছিলেন। পরে তিনি হিন্দু দর্শনের সংস্পর্শে আসিয়া আস্তিক হইয়া পড়িয়াছেন। মানব-মনে বহু বিরুদ্ধ মত কিরূপ ভাবে পাশাপাশি বাস করে, সেই তত্ত্বটি তাঁহার বিস্তৃত রচনাবলীতে পরিস্ফুট।



ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক টমাস হাক্সলীর তিনি পৌত্র। লিওনার্ড হাক্সলীর তৃতীয় পুত্র আলডাশ্ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম জুলিয়া আর্ণল্ড। জুলিয়া বিখ্যাত লেখক ও সাহিত্যিক ম্যাথিউ আর্ণল্ডের ভ্রাতুষ্পুত্রী। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ শিক্ষালয়, রাগবী হাইস্কুলের জনপ্রিয় হেডমাস্টার ও ধর্মযাজক টমাস আর্ণল্ডের পৌত্রী ছিলেন জুলিয়া। আলডাশ্ হাক্সলীর পিতা লিওনার্ড হাক্সলী ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। লিওনার্ড স্কটল্যাণ্ডের সেণ্ট এণ্ড্রুজ ইউনিভার্সিটিতে গ্রীক ভাষার সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। তিনি মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে উক্ত অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। লিওনার্ড বহু বৎসর একটি পত্রিকার সম্পাদক ও একটি পুস্তকপ্রকাশকের পরামর্শদাতা ছিলেন। আলডাশ্ হাক্সলীর পিতামহ টমাস হেনরী হাক্সলী বিগত শতাব্দীতে ডারউইনের মতবাদ প্রচার করিয়া অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আলডাশ্ জন্মগ্রহণ করেন। তাহা উচ্চ চিন্তা ও সাহিত্য-চর্চায় আলোকিত ছিল। পূর্বপুরুষগণের সাহিত্যিক প্রতিভার অধিকতর বিকাশ আলডাশের মধ্যে দৃষ্ট হয়। তিনি তাঁহার বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন এবং অসাধারণ অধ্যবসায়ে তাহা আরও উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জুলিয়ান একজন জীবতত্ত্বজ্ঞ বৈজ্ঞানিকরূপে জগদ্বিখ্যাত।

আলডাশ্ অক্সফোর্ডের ইটন স্কুলে ও বেলিয়ল কলেজে অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জুলিয়ানের মত বাল্যে তাঁহার বিজ্ঞান-চর্চায় অতিশয় আগ্রহ ছিল, কিন্তু নেত্ররোগে প্রায় দীর্ঘ তিন বৎসর অধ্যয়নে অসমর্থ হওয়ায় তিনি বিজ্ঞান-চর্চা ত্যাগ করিয়া সাহিত্য অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। অক্সফোর্ডের আবহাওয়া তিনি খুব পছন্দ করিতেন, কারণ তথায় স্বাধীনভাবে পুস্তকপাঠের বিশেষ সুযোগ ছিল। তিনি অক্সফোর্ডে সপ্তাহে দুইটির অধিক বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন না। তিনি কর্মবিমুখ ও অধ্যয়নপ্রিয় ছিলেন এবং ছাত্র-জীবনে নানা বিষয়ের গ্রন্থ পাঠে নিবিষ্ট থাকিতেন। রাস্কিন ও ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের লেখা তাঁহার প্রিয়পাঠ্য ছিল। ঔপন্যাসিক ডি এইচ লরেন্সের প্রভাব তাঁহার উপর বিশেষভাবে পতিত হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আলডাশ্ মেরিয়া নিশ নাম্নী জনৈকা বেলজিয়াম-দেশীয় নারীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার একটিমাত্র পুত্রসন্তান আছে। ইংলণ্ডের বাহিরেই তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি ফ্রান্স, ইতালি, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে অনেক বৎসর কাটাইয়াছেন। ভারত ও ব্রহ্মদেশের ভ্রমণ-কাহিনী তিনি তাঁহার 'জেস্টিং পাইলেট' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই বই লিখিবার সময় তিনি ভারতীয় ভাবধারার সহিত পরিচিত ছিলেন না; তাই তাহাতে লিখিয়াছিলেন, 'ঈশ্বর ও ধর্ম লইয়াই আছে বলিয়াই পরকাল-সর্বস্ব ভারতের এই দুরবস্থা। আমার যদি কয়েক লক্ষ পাউণ্ড থাকিত, আমি ভারতে একটি নাস্তিক সমিতি স্থাপন করিতাম। উক্ত সমিতি ভারতবাসীর ঐহিক দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া তাহাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করিত।' কিন্তু কয়েক বৎসরের পরেই তাঁহার সেই মত পরিবর্তিত হয়। তখন তিনি লিখিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্যের উন্মত্ত-প্রায় কর্মমূলক উত্তেজনার পরমৌষধ গীতোক্ত অনাসক্তি যোগ। এই যোগ অভ্যাস করিলে পাশ্চাত্য ধ্বংসমুখী কর্মোন্মাদনা হইতে রক্ষা পাইবে।

পিতার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা এবং মাতার সাহিত্য-প্রতিভা মিলিত হইয়া আলডাশের মনে এক অভিনব চিন্তাস্রোত সৃষ্টি করিয়াছে। চিন্তার উদারতা, জ্ঞানের বহুমুখিতা ও ভাষায় স্বচ্ছন্দ গতি তাঁহার রচনার অলংকার। আকৃতিতে তিনি পুরোপুরি ইংরেজ। তাঁহার দীর্ঘদেহ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ঘন চুল, আজানুলম্বিত বাহু, সুমিষ্ট স্বর এবং অমায়িক ব্যবহার দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কথা বলিবার সময় তিনি হাঁটুদ্বয় হাতে বেষ্টন করিয়া বসেন। তাঁহার ভদ্র হাসির মধ্যে হর্ষ অপেক্ষা বিমর্ষভাই প্রকটিত হয়। তিনি অসাধারণ কথা-শিল্পী এবং সাহিত্য-সৃষ্টিই তাহার প্রধান ব্যবসায়। অক্সফোর্ডে অবস্থান কালে তিনি অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার গদ্য রচনাই সমধিক। যে ধর্মভাব তাঁহার মনে সুপ্ত ছিল, তাহা সম্প্রতি জাগ্রত হইয়াছে। মানুষের যেটি দুর্বলতা, তাহাই বয়োবৃদ্ধির ও অভিজ্ঞতালাভের সঙ্গে সঙ্গে সবলতায় পরিণত হয়। গত পাঁচ-ছয় বৎসর আমেরিকায় প্রবাসে আলডাশ্ তথায় রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বেদান্ত-আন্দোলনের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। তিনি এখন বেদান্তে-বিশ্বাসী এবং ধর্মের গূঢ় রহস্যের বিষয় তিনি এখন প্রায়ই

লেখেন। 'এণ্ডস এণ্ড মিনস' (Ends and Means) নামক গ্রন্থই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা মনে হয়। উক্ত পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে তিনি 'আদর্শ মানব কে' এই বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন যুগে প্রচলিত আদর্শ-মানবের সংজ্ঞাসমূহ সমালোচনাপূর্বক তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে গীতোক্ত অনাসক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিই আদর্শ মানব। তাঁহার মতে জীবনে অনাসক্তির ভাব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলে মানুষ জীবনের উৎকর্ষলাভে অক্ষম। যিনি যতই অনাসক্ত, তাঁহার জীবন ততই উচ্চ ও মহান্।

প্রায় ১৮ বৎসর পূর্বে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে আলডাশ স্বীয় মনোভাব এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, 'আমি বহির্মুখী, অধ্যয়ননিষ্ঠ মানুষ। জড়বাদিগণ অন্তর্মুখী জীবনের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তাহার মর্ম আমি বুঝি।' ১৯৪৪ সালে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানার্জন সর্বাধিক সমৃদ্ধ হইলে তিনি লিখিয়াছেন, 'ঈশ্বর, গড্, আল্লা বা ব্রহ্ম নামক পরমতত্ত্ব নিশ্চয়ই আছেন। তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে জগদ্ব্যাপ্ত। তাঁহাকে জানা ও ভালবাসা সম্ভব। তাঁহার সহিত ঐক্যানুভূতিও লাভ করা যায়। এই অনুভূতিই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য।' উক্ত উক্তি হইতে বোঝা যায়, আলডাশ্ কত গভীরভাবে হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত। রামকৃষ্ণ মিশনের যে সকল সন্ন্যাসী আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলের সঙ্গে আলডাশ্ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে'র যে সমগ্র ইংরেজি অনুবাদ গত বৎসর নিউইয়র্কস্থিত রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আলডাশ একটি সুন্দর মনোজ্ঞ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। এই ভূমিকায় তিনি বলেন, 'পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের সুগভীর ও সুসংক্ষ্য সরল কথোপকথন পাঠ করিলে নম্রতা, পরমতসহিষ্ণুতা ও উদারতায় গভীর শিক্ষালাভ হয়। এইরূপ কথোপকথন জগতের ধর্মসাহিত্যে অপূর্ব ও বিরল।'

আলডাশের মনে বহুমুখী ও বিরুদ্ধভাবরাশির অসাধারণ সমাবেশ। তিনি বলেন, প্রত্যেক মানবমনে এইরূপ সমাবেশ অবশ্যম্ভাবী। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'ডু হোয়াট ইউ উইল' (Do what you will) নামক প্রবন্ধপূর্ণ গ্রন্থে তিনি জীবন-পূজার কথা লিখিয়াছেন সংযম রূপ উপচার দ্বারা জীবন-পূজার. তিনি আন্তরিক পক্ষপাতী। সংযম জীবনের ভিত্তি হইলে মানব নির্ভীকভাবে জীবনপথে চলিতে ও অগ্রসর হইতে পারে। আলডাশের দৃষ্টিভঙ্গি উদার ও চিন্তাশীলতা অপূর্বরসময়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'ক্রোম ইয়োলো' (Chrome yellow) গ্রন্থে তাঁহার নৈতিক উৎসাহেরই অনাস্থার পশ্চাতে ভাবগাম্ভীর্য লুক্কায়িত। জীবনের সাবলীল গতি ও স্বাধীন বিকাশের উদার ধর্ম তিনি উক্ত উপন্যাসে প্রচার করিয়াছেন। রিমবাউ, লাফোর্গ, আনাতোল ফ্রান্স প্রভৃতি ফরাসী মনীষিগণের চিন্তার প্রভাব তাঁহার 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড' (Brave New World) ইত্যাদি গ্রন্থে সুস্পষ্ট। তাঁহার বহু রচনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, 'তিনি লাজুক, লোক-ব্যবহারে অপটু। সমাজের কর্মচাঞ্চল্য হইতে দূরে নিভৃতে থাকিয়া চিন্তাজগতে মগ্ন হইতে তিনি সদা প্রচেষ্ট।' দৃষ্টি-ক্ষীণতার জন্য তিনি চশমা ব্যবহার করিতেন। সম্প্রতি তাঁহার এই অসুখ হইতে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। আমেরিকান চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ বেটস প্রাকৃতিক উপায়ে দৃষ্টিক্ষীণতা দূরে করিবার ও চশমা পরিত্যাগের যে সহজ সরল পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই অদ্ভুত উপায়েই আলডাশ্ পূর্ণদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। তিনি "Art of Seeing" নামক বইতে উক্ত পদ্ধতির চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়াছেন।

আলডাশের আধুনিকতম উপন্যাসের নাম 'টাইম মাস্ট হ্যাভ এ স্টপ' (Time Must Have a Stop)। পুস্তকের এই নামটি তিনি সেক্সপীয়ারের একটি বাক্য হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। এই পুস্তকের এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন, 'অনন্তের আলোচনা ব্যতীত চিন্তা শৃঙ্খলমুক্ত ও সম্বন্ধ হয় না। অসীমের দিব্য স্পর্শেই চিন্তার পরিপূর্ণ প্রকাশ হয়। দৃষ্টি অসীমমুখী হইলে কাল আর আমাদের জীবনকে উদ্দেশ্যহীন ও ব্যর্থ করিতে পারিবে না। অসীমের চিন্তা মনে যতই স্থান পাইবে, ততই অজ্ঞানের অন্ধকার দূরে হইবে ও মন জ্ঞানোজ্জ্বল হইবে। পরমতত্ত্ব কালাতীত সত্তাবিশেষ, এই পরমার্থ সত্তার সন্ধানে মন যতই আকুল হয়, ততই কালবদ্ধ জীবনের সকল সমস্যার সমাধান ও সকল বন্ধন শিথিল হয়।' ঔপন্যাসিক আলডাশ্ বর্তমানে একজন দার্শনিক হইয়াছেন। দার্শনিকগণের মতই তিনি দর্শনের জটিল তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা করিতে পারেন। তিনি বলেন, 'পাশ্চাত্যে ধর্ম ও দর্শন বিচ্ছিন্ন; কিন্তু ভারতে উহারা একীভূত! স্বস্বরূপানুসন্ধানই প্রকৃত ভক্তি।' শঙ্করাচার্যের বেদান্তমতে তিনি বিশ্বাসী। তিনি বলেন, 'এই তত্ত্ব আমরা যতদিন বিস্মৃত থাকিব, ততদিন আমাদের জীবন বিপন্ন ও অন্ধকারমগ্ন থাকিবে।'

গত বৎসর আলডাশ্ হাক্সলীর একখানি সুচিন্তিত ও সুলিখিত বই প্রকাশিত হইয়াছে। বইখানির নাম 'গ্রে এমিনেন্স', (Grey Eminence) ইহাতে ফাদার জোসেফ নামক এক ফরাসী দেশীয় পাদ্রীর জীবনচরিত আলোচিত হইয়াছে। ফ্রান্সের রাজার প্রধান মন্ত্রী রিচেলুর প্রধান সহকারী ও পরামর্শদাতা ছিলেন জোসেফ। জোসেফ সুপণ্ডিত, একনিষ্ঠ সাধক হইয়াও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন স্বধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। রাজনীতি ও ধর্ম জোসেফের মনে যে প্রবল দ্বন্দ্বসৃষ্টি করিয়াছিল, আলডাশের নিপুণ লেখনীতে তাহাই চিত্রিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইয়াও পাদ্রী জোসেফ অন্তিম সময়ে অনুভব করিয়াছিলেন ব্যর্থতার তীব্র যন্ত্রণা। ব্যর্থতার আগুনে জ্বলিত জ্বলিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। আলডাশ্ জোসেফের জীবন বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, 'ধর্মজীবনে রাষ্ট্রনৈতিক কর্ম অন্তরায়স্বরূপ। কর্ম-ব্যস্ততায় ঈশ্বর-বিস্মৃতি উপস্থিত হয়। ভাগবত কর্মেও এইরূপ অপকারক ব্যস্ততা আসে। সুতরাং ঈশ্বরসাধনায় কর্মব্যস্ততা পরিহার করিতে হইবে। মানব-মন যতটুকু অন্তর্মুখীন হয়, ততটুকু সৎকর্ম সে করিতে পারে। বহির্মুখ জীবনে সৎকর্ম করিতে যাইলেও অসৎ কর্মই হয়। যে কর্ম ভগবানকে ভুলাইয়া দেয়, তাহা অকর্ম। প্রবর্তকদিগের পক্ষে কর্ম নিরাপদ নহে। উপাসনাময় মন দ্বারাই সৎকর্ম সম্ভব।'

আলডাশ্ বলেন, 'যিনি এক সময় ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি সব সময় ভদ্রলোক থাকিবেন।' মানুষ কিরূপে ঐতিহাসিক দৃষ্টিশূন্য হয়, তাহা উপহাস করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, 'ইতিহাসকে আমরা এইভাবে দেখি, যেন গতকল্য উহার আরম্ভ হইয়াছে। 'প্রত্যেক মানুষ ইতিহাসের এক-একটি ক্ষুদ্র টুকরা। এই টুকরাগুলি অসামান্য এবং ইহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না। অধিকাংশ টুকরাই সাধারণ শ্রেণীর। অসাধারণ টুকরা অত্যন্ত বিরল। কিন্তু ইতিহাসে অসম্ভব কিছুই নহে।' 'আমাদের হৃদয়ে যে দেবভাব সুপ্ত আছে, তাহা জাগ্রত হইতে যে শক্তি বাধা প্রদান করে এবং যাহা স্বার্থপরতা বা ক্ষুদ্রভাব পুষ্ট করে, তাহাই শয়তান। শয়তান প্রত্যেকের মনে লুক্কায়িত আছে।' আলডাশ্ খৃষ্টান হইয়াও এইভাবে বেদান্তের আলোকে খৃস্টান ধর্মতত্ত্বের উদার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আলেকজাণ্ডার হেণ্ডারসন "Aldous Huxley: An Interpretation" নামক যে ইংরেজী গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে আলডাশের গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

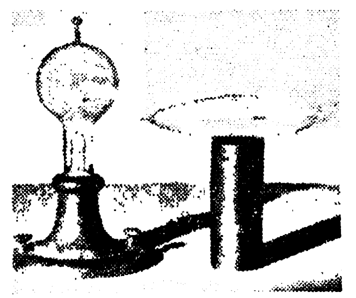

শ্রীকল্যাণ
জেম কেমিক্যাল · কলিকাতা

বিজ্ঞানের কথা

বৈদ্যুতিক আলোর ক্রমবিকাশ

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

অনেক দিন পূর্বে কোনও একখানি বিলাতী পত্রিকায় একটি সুন্দর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। চিত্রে দেখান হইয়াছিল যে, মাইপোষে দুগ্ধপান নিরত তড়িৎ-শিশুকে দেখিয়া 'কিং কোল' এবং 'কিং-গ্যাস' কানাকানি করিতেছে—এখনই যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে এই শিশু বড় হইয়া উঠিলে ইহার প্রভাবে আমাদের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে ম্লান হইয়া যাইবে। সেই তড়িৎ-শিশু আজ যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহার অপরিসীম প্রভাব সর্বত্র সুস্পষ্ট। এই তড়িৎ-শক্তি যে কত বিচিত্র কৌশলে কত রকম কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার হিসাব দেওয়া দুষ্কর। কাজেই এস্থলে তড়িৎ শক্তির ব্যবহার বৈচিত্র্যের কথা বাদ

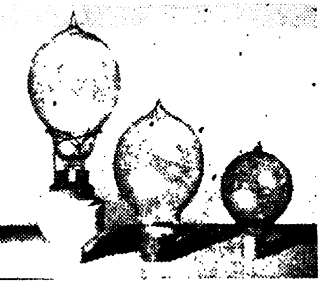


বামদিকে—এডিসনের ল্যাম্প (১৮৭৯ খৃঃ)
ডানদিকে—সোয়ান ল্যাম্প (১৮৭৮ খৃঃ)

দিয়া আলোক উৎপাদনে ইহা কি ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে, সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

স্মরণাতীত কাল হইতেই মানুষ অগ্নি-প্রজ্বলিত করিয়া অন্ধকার দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে। উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে ক্রমে ক্রমে তাহারা তেল, চর্বি ও অন্যান্য সহজ দাহ্য পদার্থের সহায়তায় বিবিধ কৌশলে স্থির অগ্নি-শিখা উৎপাদনে সমর্থ হয়। আজও সে ব্যবস্থার যথেষ্ট প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। অনেককাল পরে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় সহজ দাহ্য গ্যাস আবিষ্কৃত হইবার পর গ্যাসের আলোর প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু বৈদ্যুতিক আলোর আবির্ভাবে অন্য সকল রকমের আলোর প্রভাব খর্ব হইয়া যায়। আর্থিক সুবিধা, কার্যকারিতা এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে বৈদ্যুতিক বাতির শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদী। এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতে প্রায় শতাধিক বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। এই দীর্ঘ দিনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস অতীব বিচিত্র। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইবে মাত্র।

যে কোন কার্যই সম্পাদিত হউক—তাহার মূলে থাকে শক্তি। কার্যের দ্বারাই আমরা শক্তির অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। নিছক শক্তি আমরা দেখিতেও পাই না বা বুঝিতে পারি না। বিদ্যুৎ বা তড়িৎ এইরূপ একপ্রকার শক্তি। শক্তি-তত্ত্বের উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক আলোচনার কথা বাদ দিয়া আমরা বলিতে পারি—এই বিদ্যুৎ শক্তিটা কিরূপ বা তাহার স্বরূপ কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু ইহার সাহায্যে বিবিধ কার্য সম্পাদিত হইতে দেখিয়া আমরা বিদ্যুৎ শক্তির অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। যখন বৈদ্যুতিক আলোর সুইচ টিপিয়া দেওয়া হয়, তখন এই বিদ্যুৎ শক্তিই আলোতে রূপান্তরিত হইয়া আমাদের চোখে তীব্র আলোর অনুভূতি জন্মায়। বিভিন্ন কৌশলে বৈদ্যুতিক-শক্তিকে আলোয় পরিবর্তিত করা যাইতে পারে। সাধারণ উপায়ে অর্ধ পরিচালক বা উচ্চ প্রতিবন্ধকতাবিশিষ্ট পদার্থনির্মিত তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত করাইয়া আলোক উৎপাদিত হইয়া থাকে। ডায়নামো, ব্যাটারী প্রভৃতি প্রত্যেক তড়িতোৎপাদক যন্ত্রেরই পজিটিভ এবং নিগেটিভ নামে দুইটি তড়িৎপ্রান্ত থাকে। তার-সংযোগে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে তড়িৎ স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে। সাধারণ চাপে বা ভোল্টেজের তড়িৎ স্রোতের পক্ষে শুষ্ক বাতাস সম্পূর্ণ অপরিচালক। কাজেই তারের মধ্যে সামান্য ব্যবধান বা ফাঁক থাকিলেও অতটুকু বাতাসের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হইতে পারে না। যদি কোন উচ্চ প্রতিবন্ধকতা বিশিষ্ট অথবা অর্ধ পরিচালক পদার্থের সূক্ষ্ম অথচ লম্বা তার দিয়া উক্ত ব্যবধান বা ফাঁকা স্থানকে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া যায়, তবে তড়িৎ-স্রোত অর্ধ-পরিচালক তারের মধ্য দিয়া তীব্র বেগে প্রবাহিত হইবার চেষ্টা করে। ফলে ক্রমশ উহা গরম হইতে হইতে অবশেষে আলো বিকিরণ করিতে থাকে। সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি ধাতব পদার্থ তড়িৎ-স্রোতের উত্তম পরিচালক। কাজেই তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হইলে উহারা সহজে গরম হয় না। অবশ্য বহন ক্ষমতার অতিরিক্ত চাপে বিদ্যুৎ-শক্তি প্রবাহিত হইলে তাহাও মুহূর্তের মধ্যেই জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতে পারে। বৈদ্যুতিক বাতির গোড়ার দিকে দুইটি ক্ষুদ্রাকার উঁচুস্থান দেখিতে পাওয়া যাইবে। বাতির ভিতরের জড়ানো তারের দুই প্রান্ত ঐ দুইটি উঁচু স্থানের সহিত সংলগ্ন থাকে। 'সকেটে' লাগাইয়া দিলেই বাহিরের তামার তারের 'পজিটিভ' ও 'নিগেটিভ' প্রান্তের সহিত বাতির প্রান্তদ্বয় সংলগ্ন হইয়া যায়। তখন তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হইলে বাতির ভিতরের তার বা ফিলামেণ্ট জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু ইহা ছাড়াও অন্যান্য উপায়ে বৈদ্যুতিক শক্তিকে আলোয় রূপান্তরিত করা যাইতে পারে। পূর্বে বলিয়াছি—'পজিটিভ' ও 'নিগেটিভ' প্রান্ত সংযোজক তারের মধ্যে কোথাও একটু ব্যবধান বা ফাঁক থাকিলে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হইতে পারে না; কিন্তু সাধারণ চাপের তড়িৎ প্রবাহের পরিমাণ বাড়াইয়া অথবা পরিমাণ কম হইলেও চাপ বাড়াইয়া দিলে উভয়



নানাপ্রকারের কার্বন ল্যাম্প (১৮৮০—৯০ খৃঃ)

তারের ফাঁকের মধ্যে তীব্র আলোর উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। দুইটি কার্বন-প্রান্তের ফাঁকের মধ্যে এইরূপে যে আলোক উৎপন্ন হয় তাহা আর্ক-লাইট নামে পরিচিত। 'আর্ক' শব্দে বৃত্তাংশ বুঝায়। দুইটি কার্বন পেন্সিলের ব্যবধানস্থলে উৎপন্ন আলোর রেখা বৃত্তাংশের মত বাঁকিয়া থাকে বলিয়াই ইহাকে আর্ক-লাইট বলা হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই কার্বন আর্কই সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক আলোর প্রতিষ্ঠা অর্জন করে এবং আজও পর্যন্ত ইহা সমভাবেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রয়েল ইনষ্টিটিউটে এক বক্তৃতার সময় স্যার হামফ্রি ডেভি বৈদ্যুতিক শক্তিকে আলোকে রূপান্তরিত করিবার এক অপূর্ব পরীক্ষা দেখাইয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া দেন। পরীক্ষাটা আর কিছুই নহে—সামান্য ব্যবধানে স্থাপিত দুইটি কার্বন পেন্সিলের ভিতর দিয়া তড়িৎ-স্রোত পরিচালনা করিলেই উভয় পেন্সিলের ব্যবধান স্থলে বৃত্তাংশের মত একটি তীব্র আলোকরেখা

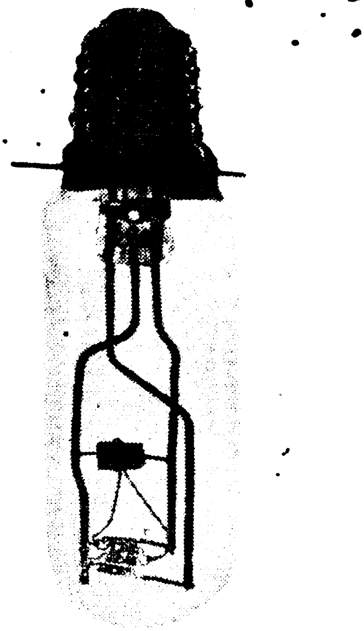
উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই ধরণের বৈদ্যুতিক বাতি কার্বন-আর্ক নামে পরিচিত। কিন্তু সে সময়ে সহজ উপায়ে প্রয়োজনানুরূপ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা না থাকায়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহা কার্যকরী হইতে পারে নাই। বৈদ্যুতিক শক্তির কার্যকারিতা এবং ইহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা বুঝাইবার জন্যই কেবলমাত্র পরীক্ষা প্রদর্শন করা চলিত। কিন্তু ১৮৩১ সালে ফ্যারাডে কর্তৃক তড়িৎ উৎপাদক ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক ইনডাকসন মেসিন উদ্ভাবিত হইবার পর হইতে বৈদ্যুতিক আলো দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ফ্যারাডে উদ্ভাবিত যান্ত্রিক কৌশলে প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গেই



বামদিকে—ট্যান্টেলাম নামক দুষ্প্রাপ্য ধাতু-নির্মিত বৈদ্যুতিক ল্যাম্প (১৯০৫ খৃঃ)
ডানদিকে—লেন্ ফক্সের ল্যাম্প (১৮৮২ খৃঃ)

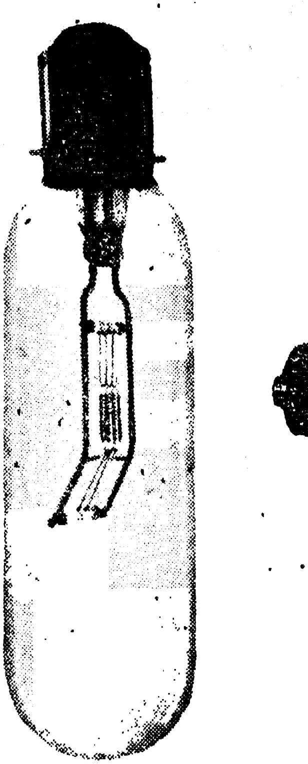
যথেষ্ট পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হওয়ায় ডেভি প্রদর্শিত আর্ক-লাইটকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য অনেকেই উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। ইহার ফলে পরবর্তীকালে আর্ক-লাইটের বহুবিধ উন্নতি সাধিত হয় এবং বর্তমানে প্রচলিত 'পয়েণ্টো-লাইটে'র উদ্ভব ঘটে। 'পয়েণ্টো-লাইট' এক রকমের আর্ক-লাইট। কিন্তু কার্বন আর্কে যেমন কাচ গোলকের প্রয়োজন হয় না—উন্মুক্ত স্থানেই প্রজ্বলিত করা হয়, পয়েণ্টো-লাইট সেরূপ নহে। ইহা সাধারণ বৈদ্যুতিক বাতির মতই কাচ-গোলকের অভ্যন্তরে জ্বলে। তাছাড়া কার্বন পেন্সিলের পরিবর্তে প্রান্তদ্বয়ে প্ল্যাটিনাম বর্তুল ব্যবহৃত হয়। এই বাতি জ্বালিবার কায়দাও সাধারণ বৈদ্যুতিক বাতি হইতে ভিন্ন রকমের। ইহাতে দুইটি বিভিন্ন পথে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হইবার ব্যবস্থা থাকে। প্রথমে সুইচ টিপিয়া ধরিলে সাধারণ একটি তার কুণ্ডলী আলোকিত হইয়া উঠে এবং কিছুক্ষণ বাদেই আলোটা যেন লাফাইয়া ফাঁকা স্থানটুকু অতিক্রম করিয়া অপর প্ল্যাটিনাম বর্তুলে উপস্থিত হয়। সুইচটি ছাড়িয়া দিলেই প্রথম আলোটি নিবিয়া যায় এবং শূন্য স্থানের আলো-রেখাটি বৃত্তাংশের আকারে স্থির-ভাবে তীব্র আলো বিকিরণ করিতে থাকে।

যাহা হউক, কার্বন-আর্ক এবং তড়িতোৎপাদক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইবার পরেও অনেক কাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ-আলো উৎপাদনের কোন সুবিধাজনক উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই। কোন ধাতব পদার্থকে তাপ প্রয়োগ করিতে থাকিলে, অতিমাত্রায় উত্তপ্ত হইয়া প্রথমে যেমন তাহা রক্তবর্ণ পরে ক্রমশ শ্বেতবর্ণের আলোক বিকিরণ করিতে থাকে, খুব সরু তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিচালিত করিলেও ঠিক সেরূপ অবস্থাই ঘটিতে দেখা যায়। অবশ্য যে পদার্থের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহ পরিচালিত হয় তাহার তড়িৎ-স্রোত প্রতিবন্ধকতার ক্ষমতার উপরই আলোর ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে। তাছাড়া সরু, মোটা প্রভৃতি বিভিন্ন আয়তনের প্রশ্নও রহিয়াছে। এই কারণেই সুপরিচালক ধাতব তারের মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ পরিচালিত হইলেও তাহাতে আলোর অভিব্যক্তি ঘটে না। এই তথ্য আবিষ্কৃত হইবার ফলেই প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষুদ্রাকার বৈদ্যুতিক-বাতির উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছিল। ১৮৪৫ সালে জে ডবলিউ ষ্টার পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন—প্ল্যাটিনামের অতি সূক্ষ্ম তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-স্রোত পরিচালিত করিলে তাহা অতিমাত্রায় উত্তপ্ত হইয়া উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করে। কিন্তু প্ল্যাটিনামের তড়িৎ-প্রতিবন্ধকতা শক্তি কম বলিয়া আলোর অনুপাতে অত্যধিক মাত্রায় তড়িৎ-শক্তি ক্ষয় হইয়া যায়। আলো জ্বলে বটে; কিন্তু খরচ হয় অত্যধিক। কাজেই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহা সম্পূর্ণ অচল। কেমন করিয়া বৈদ্যুতিক শক্তির অপচয় নিবারণ করিয়া প্রয়োজনানুরূপ উজ্জ্বল আলো পাওয়া যাইতে পারে, সেইজন্য বিভিন্ন উপায়ে গবেষণা চলিতে লাগিল। বাতির ভিতরের 'ফিলামেণ্ট' বা তারের উন্নতি সাধন করাই হইল গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য। অর্থাৎ প্ল্যাটিনামের পরিবর্তে এমন কোন পদার্থের 'ফিলামেণ্ট' তৈয়ারী করা যায় কিনা যাহা প্ল্যাটিনাম অপেক্ষাও অধিক উত্তাপ সহ্য করিতে পারে, অথচ তড়িৎ পরিচালন ক্ষমতাও থাকে খুব কম। অবশ্য ডেভির 'আর্ক-লাইটের' পরীক্ষা হইতে এ বিষয়ে কার্বনের উপযোগিতা বুঝিতে পারা গিয়াছিল; তথাপি অস্‌মিয়াম, 'ট্যাণ্টেলাম', 'টাংস্টেন' প্রভৃতি বিবিধ পদার্থের 'ফিলামেণ্ট' লইয়া পরীক্ষা করিবার পর দেখা গেল যে, কার্বনই এই ধরণের 'ফিলামেণ্টে'র পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী। অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষা কার্বন অত্যধিক উত্তাপে ইহা 'টাংস্টেন' অপেক্ষা তাড়াতাড়ি বিশ্লিষ্ট হইয়া উবিয়া যায়। তথাপি ইহা অনুত্তম তড়িৎ পরিচালক এবং অত্যধিক উত্তাপ সহনশীল বলিয়া বিভিন্ন রকমের জৈব পদার্থের অঙ্গার হইতে 'ফিলামেণ্ট' তৈয়ারী করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে আমেরিকায় এডিসন এবং ইংল্যাণ্ডে সোয়ান একই সময়ে, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 'কার্বন-ফিলামেণ্টে'র বিজলী বাতি প্রস্তুত করিতে কৃতকার্য হইলেন। তাঁহারা সাধারণ সুতা, পার্চমেণ্ট, বাঁশের সূক্ষ্ম তন্তু এবং কৃত্রিম রেশমের মত এক-প্রকার পদার্থকে অঙ্গারে পরিণত করিবার পর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দৃঢ় করিয়া বিজলী বাতি নির্মাণে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। উভয়ের এই আবিষ্কারের ফলস্বরূপ কিছুকাল পরে 'এডিসোয়ান' এই যুক্ত নামীয় বিজলী বাতি বাজারে বাহির হয়।



আলোক-বিচ্ছুরক প্রজেক্টর ল্যাম্প

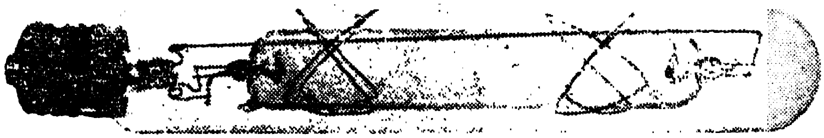
ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই সম্বন্ধে আর একটি নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইবার ফলে বৈদ্যুতিক বাতি আরও দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, বায়ুপূর্ণ কাচ গোলকের মধ্যে 'ফিলামেণ্ট' প্রজ্বলিত হইবার পর অতিরিক্ত উত্তাপে কার্বন 'অক্সিডাইজড্' হইয়া উবিয়া যায়। কিন্তু বায়ুশূন্য কাচ গোলকের মধ্যে 'ফিলামেণ্ট' অবিকৃত থাকে; অধিকন্তু আলোর ঔজ্জ্বল্যও বৃদ্ধি পায়। কাজেই 'এডিসোয়ান' বিজলী বাতির 'ফিলামেণ্টের' চতুর্দিকে কাচের বেষ্টনী ঘিরিয়া তাহাকে বায়ুশূন্য করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এই সম্পর্কে কাচ বর্তুল নির্মাণ দক্ষতা এবং তাহা যথাযথভাবে বায়ুশূন্য করিবার সুবিধাজনক কৌশল আয়ত্ত করাও অপরিহার্য হইয়া উঠিল। এইরূপে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইতে ১৮৭৯ সালে



আলোক-বিচ্ছুরক প্রজেক্টর ল্যাম্প

সম্পূর্ণ নির্দোষ কার্বন বাতির আবির্ভাব ঘটে। ইহার পর ক্রমশ বিভিন্ন রকমের কার্বন বাতি নির্মিত হইতে আরম্ভ করে। গোড়া হইতেই এই অভিনব শিল্পের প্রতি বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। কার্বন বাতির সাফল্য দেখিয়া ইহার অধিকতর উন্নতির জন্য তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তাঁহাদের উৎসাহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিদ্যুৎ-শক্তি হইতে আলোক উৎপাদনের আরও অভিনব পন্থা উদ্ভাবিত হইল। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভন বোল্টন এবং তাঁহার সহকর্মীদের মিলিত প্রচেষ্টায় 'ট্যাণ্টেলাম'কে সূক্ষ্ম তারে পরিণত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হয়। ইহার ফলেই সাইমেন্স এবং হ্যাল্স্কি ১৯০৩ সালে নিম্নচাপের বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে কার্বন বাতি অপেক্ষা উজ্জ্বল আলো প্রদানকারী বাতি নির্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ছবিতে ১৯০৫ সালে প্রচলিত ট্যাণ্টেলাম বাতির সহিত ১৮৮২ সালে লেন ফক্স পরিকল্পিত কার্বণ বাতির সহিত তুলনা করিলেই উভয়ের পার্থক্য মোটামুটি উপলব্ধি হইবে।

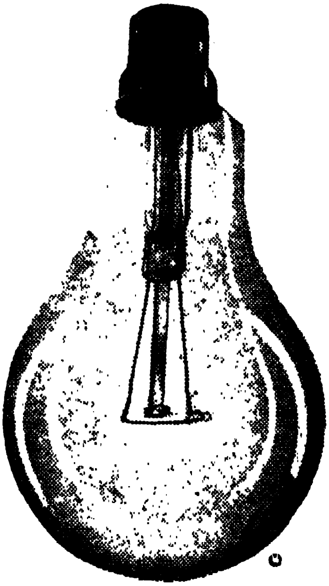
'ট্যাণ্টেলম্-ল্যাম্পের' আলোর ঔজ্জ্বল্য এবং অন্যান্য সুবিধা দেখিয়া তখন হইতেই অতি সূক্ষ্ম অথচ সুদৃঢ় ট্যাণ্টেলাম তার নির্মাণ করিবার প্রচেষ্টা সুরু হয়। কিন্তু টাংস্টেনের আলোক বিকিরণ ক্ষমতা আরও অধিক বলিয়া ইতিমধ্যে 'টাংস্টেন-ফিলামেণ্ট তৈয়ার করিবার চেষ্টাও চলিতে থাকে। অবশেষে উদ্বায়ী সংযোজক পদার্থের সহিত 'টাংস্টেনে'র গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া যান্ত্রিক কৌশলে সূক্ষ্ম 'টাংস্টেন-ফিলামেণ্ট' নির্মাণ সম্ভব হইল। এই ফিলামেণ্ট



৪০০ ওয়াটের উচ্চ চাপবিশিষ্ট মার্কারি ল্যাম্প্

অনেকটা ভঙ্গপ্রবণ হইলেও আলোর ঔজ্জ্বল্যের জন্য টাংস্টেন বাতিই সর্বাধিক প্রচলিত হইয়াছিল। ১৯০৬ সালে কুলিজ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় 'টাংস্টেন' হইতে নমনীয় অথচ সুদৃঢ় টানা তার প্রস্তুত করিয়া এই বাতির আরও উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু কিছুকাল জ্বলিবার পর 'টাংস্টেন বাতি'র কাচ গোলকের অভ্যন্তরে একটা কালো আস্তরণ পড়িতে দেখা যাইত। ১৯১৩ সালে ল্যাংমুইর পরীক্ষা করিয়া দেখান যে, অতিরিক্ত উত্তাপের ফলে টাংস্টেনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণিকা উবিয়া গিয়াই এইরূপ কালো আস্তরণ সৃষ্টি করে। তিনি বায়ুশূন্য কাচ গোলকের মধ্যে নিষ্ক্রিয় গ্যাস ভরিয়া দেখিলেন—তাহাতে ফিলামেণ্ট তত দ্রুত উবিয়া যায় না; অধিকন্তু তাহার স্থায়িত্ব এবং আলোর ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া তিনি আরও দেখিতে পাইলেন যে 'ফিলামেণ্ট'কে একটানা না করিয়া সূক্ষ্ম স্প্রিং-এর আকারে জড়াইয়া দিলে অল্প শক্তি ব্যয়ে অধিকতর আলো পাওয়া যাইতে পারে। এই সকল তথ্য আবিষ্কৃত হইবার পর প্রথম কাচ গোলকের মধ্যে নাইট্রোজেন গ্যাস ভর্তি করা হইত। তারপর দেখা গেল, নাইট্রোজেন অপেক্ষা আর্গন গ্যাস এ বিষয়ে অধিকতর কার্যোপযোগী। কাজেই ১৯১৫ সাল হইতে আর্গন বাতিরই সর্বাধিক প্রচলন দেখা যাইতে লাগিল। ইহার পর ক্রিপ্টন গ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা হওয়ায় আর্গনের পরিবর্তে ক্রিপ্টন ব্যবহৃত হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ল্যাংমুইর পরিকল্পিত "কয়েল্ড্-কয়েল" ফিলামেণ্টের প্রচলন আরম্ভ হয়।

কেবলমাত্র 'ফিলামেণ্টের' মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-স্রোত পরিচালিত করিয়াই যে আলোক উৎপাদন করা যাইতে পারে তাহা নহে। ১৯০০ সালে কুপার হিউইট পারদ বাষ্পের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-স্রোত পরিচালিত করিয়া মার্কারি ভেপার ল্যাম্প নামক এক প্রকার বৈদ্যুতিক বাতি উদ্ভাবন করেন। ১৯১৬ সালে মুর, কার্বন-ডাই অক্সাইড-টিউব এবং ১৯২০ সালে ক্লড, নিয়ন-টিউব উদ্ভাবন করিয়া বিদ্যুৎ-শক্তিকে বিভিন্ন রকমের আলোক উৎপাদনে নিয়োজিত করেন। এক সময়ে উচ্চ চাপের বিদ্যুৎ-শক্তি সাহায্যে জাইস্লার, ক্রুক্স্, হিটর্ফ এবং অন্যান্য অনেকের উদ্ভাবিত বিচিত্র আলোক উৎপাদক টিউব পরীক্ষা প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হইত। ইহা হইতেই পরবর্তীকালে মার্কারী ভেপার ল্যাম্প প্রভৃতি ডিস্চার্জ-টিউবের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছিল। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় তড়িৎ-শক্তি পরিচালিত



কয়েল্ড্ কয়েল ল্যাম্প্

করিয়া বিভিন্ন ঔজ্জ্বল্যের পারদ বাতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। আজকাল মার্কারি-প্রোজেক্সন-ল্যাম্পই আর্ক-ল্যাম্পের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। বৈদ্যুতিক আলোর ইহাই শেষ উৎকর্ষ নহে, অদূর ভবিষ্যতে হয়তো ইহার আরও বিস্ময়কর উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে।

লঘু-গুরু

অ · কৃ · ব

জগতে গুরু আছে বলিয়াই লঘু আছে, লঘু আছে বলিয়াই গুরু আছে; লঘু, লঘু বলিয়াই গুরু গুরু এবং গুরু গুরু বলিয়াই লঘু লঘু। অর্থাৎ জগতে লঘু না থাকিলে যেমন গুরুর গুরুত্ব বোঝা যাইত না, গুরু না থাকিলেও তেমনি লঘুর লঘুত্ব বোঝা যাইত না। অপর পক্ষে ইহাও সত্য যে, লঘুতেও যেমন গুরুত্ব আছে, গুরুতেও তেমনি লঘুত্ব লুকাইয়া আছে, শুধু ঠিকমত ধরিতে পারা চাই।

*　　*　　*　　*

কথাটা ধরিতে পারিলেন না? মনে করুন আপনার কাছে যে ব্যাপারটি নিতান্তই লঘু, আমার কাছে ঠিক সেই ব্যাপারটিই অত্যন্ত গুরু হইতে পারে। সরকার বাহাদুরের যদি কোন বাবদে কর্পোরেশনের কাছে কয়েক লক্ষ টাকা ট্যাকস্ বাকী পড়ে, তাহা হইলে সেটা কর্পোরেশনের পক্ষে গুরু ব্যাপার, সরকার বাহাদুর ব্যাপারটাকে যতই লঘু বিবেচনা করুন না কেন।

*　　*　　*　　*

লক্ষ লক্ষ লোককে মরণের মুখে অম্লানবদনে ঠেলিয়া দিয়া তাহাদের প্রাণের মূল্যে যাহারা নিজেদের ট্যাঁক বোঝাই করেন, তাঁহাদের কাছে এই লক্ষ লক্ষ লোকের তিলে তিলে মৃত্যু এবং তাহাদের মৃতদেহ লইয়া শকুনি ও শৃগালের মহোল্লাস লঘু ব্যাপার, কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে ব্যাপারটি সম্ভবত লঘু নহে।

*　　*　　*　　*

আমার কেমন একটা থাপ্‌ছাড়া স্বভাব—কেন এরূপ হইল, ভগবান জানেন—লঘু ব্যাপারের গুরু দিক এবং গুরু ব্যাপারের লঘু দিকটা দেখিয়াই আমি আনন্দ পাই। এবং এই কারণেই "লঘু-গুরু" সাইন্-বোর্ড টাঙাইয়া আমার রেস্তোরাঁয় লঘু ব্যাপারেব গুরুত্ব এবং গুরু ব্যাপারের লঘুত্ব পরিবেশন করিতেছি।

*　　*　　*　　*

অত্যন্ত গুরু ব্যাপারকে যাঁহারা অত্যন্ত লঘুভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহারা দার্শনিক মহাপুরুষ, আমাদের নমস্য। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, সাধারণ লোকে—এ যুগের এবং এ দেশের লোকেরা বেশীরভাগই সাধারণ—এই মহাপুরুষদিগকে ভুল বুঝিয়া নিন্দা, এমন কি গালাগালি পর্যন্ত করিয়া থাকে।

*　　*　　*　　*

এই সেদিনের মহামন্বন্তরের কথাই ধরুন না কেন। এই মন্বন্তরটি মানুষের গর্বের বিষয়; কেননা ইহা সৃষ্টি করিতে মানুষই পারিয়াছিল, ভগবানের সাহায্য দরকার হয় নাই। প্রধানত যাহাদের কৃতিত্বে ইহা এরূপ ভয়াবহ রূপ ধারণ করিতে পারিয়াছিল, তাঁহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইয়াও যেরূপ দৃঢ়মুষ্টিতে ও অবিচলিত মনে মন্বন্তরটি পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহাতে চারিদিকে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গিয়াছিল। লক্ষ লক্ষ মৃত্যুপথযাত্রী যখন অনাহারে হাহাকার করিতেছে, ঠিক তখনই লক্ষ লক্ষ মণ খাদ্যদ্রব্য ইঁহারা অসাধারণ নিষ্ঠা ও দক্ষতার সহিত নানাস্থানে পচাইয়াছিলেন। অগণিত দেশবাসীর মৃত্যু চোখের সামনে দেখিয়াও ইঁহাদের হৃদয় বিচলিত হয় নাই, কারণ ইঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, জীবন ও মৃত্যু আসলে একই জিনিসের এ-পিঠ আর ও-পিঠ মাত্র; আত্মা অমর, মূঢ় মানুষ যাহাকে মৃত্যু বলিয়া ভুল করে, তাহা আসলে জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া নূতন বসন পরিধান করা মাত্র। অতএব মৃত্যু দেখিয়া অভিভূত হওয়াটা কিছু নহে।

*　　*　　*　　*

এতগুলি লোকের মৃত্যু বৃথা হয় নাই। অসংখ্য লোকের মৃত্যু অল্পসংখ্যক লোকের ট্যাঁকের অবস্থার প্রচুর উন্নতির কারণ হইয়াছে। এই অল্পসংখ্যকের দল ভাবিয়া দেখিলেন, "এই লোকগুলি আজ না হোক্ দুদিন বাদে ত মরিবেই; দুদিন পরে না মরিয়া দুদিন আগে মরিলে যদি ইহারা আমাদের ব্যাংক-ব্যালান্স-গুলি ফাঁপাইয়া দিয়া যাইতে পারে, তবে তাহাতে আপত্তির কারণ কি? ছোঃ! যত সব বাজে সেণ্টিমেণ্ট্।" এরূপ ভাবিয়া তাঁহারা বাজে সেণ্টিমেণ্টের ধার না ধারিয়া টাকা কামাইবার দিকে মন দিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে আদর্শ সাধনা। ইঁহারাই আদর্শ তপস্বী।

*　　*　　*　　*

অল্পদিন হইল ইঁহাদের সাধনার নূতন পর্যায় আরম্ভ হইয়াছে, সাধারণ মানুষ ইহার নাম দিয়াছে বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ। টাকা খরচ করিয়াও লঘু বস্ত্র পাওয়া তো দূরের কথা, গুরু বস্ত্রও পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। লজ্জা-নিবারণের বস্ত্রের অভাবে বহু স্থানের মহিলারা বাড়ির বাহির হইতে পারিতেছেন না। কোনও স্থানে বস্ত্রাভাবে মহিলার আত্মহত্যার সংবাদ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে সম্ভবত এই প্রথম। বস্ত্রালয়গুলির সম্মুখে বস্ত্র-পিপাসু জনতার যে দৃশ্য দেখিতেছি, তাহা এ জীবনে ভোলা সম্ভব হইবে না। কোনো সভ্য দেশে এরূপ ব্যাপার হওয়া সম্ভব, একথা স্বপ্নেও কখনও কল্পনা করিতে পারি নাই। এখন বুঝিতেছি ধনপতির প্রিয় বুলি "সম্ভব অসম্ভব হবে, অসম্ভব সম্ভব হবে" নিছক পাগলের প্রলাপ মাত্র নহে। এরূপ অঘটন যাঁহাদের কৃতিত্বে ঘটিতেছে, তাঁহারা ধন্য। তাঁহারা নিজদিগকে এ ব্যাপারে পৃথিবীতে "pioneer" (সর্বপ্রথম) বলিতে পারেন।

ইঁহারা মনে মনে বলিতেছেন, "হে মূঢ় জনসাধারণ! তোমরা বস্ত্র জিনিষটাকে এত অনাবশ্যক গুরুত্ব দিতেছ কেন? দেখ, আব্রু-টাব্রু সব বাজে, তোমরা 'Back to nature' নীতি অবলম্বন কর প্রকৃতিতে ফিরিয়া যাও। তাহা হইলেই যে বস্ত্র তোমাদের লজ্জা নিবারণ করিত, তলে তলে তাহার অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়া আমাদের একটু ইয়ে হয়।"

ইঁহাদের 'ইয়ে' বেশ ভালভাবেই হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর বেশীদিন চলিলে সোণার বাঙলায় বেশ একটা গুরু রকমের দিগম্বর সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হওয়ার খুবই সম্ভাবনা। ইঁহারা সম্ভবত সেই ফিকিরেই আছেন এবং তাহার ফলে বাঙলা দেশে একটা কীর্তি রাখিয়া যাইবেন।

কিন্তু জনসাধারণের স্মৃতিশক্তি বড় দুর্বল। বর্তমানের কথা ভবিষ্যতে তাহারা হয়তো ভুলিয়াও যাইতে পারে। সেজন্যই আমার মনে হয়, বর্তমানের স্মৃতিটাকে মর্মর-নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভে বাঁচাইয়া রাখার জন্য অবিলম্বে চাঁদা তোলার ব্যবস্থা করা উচিত। বাঁচিয়া যাঁহারা পাথর হইয়া আছেন, মরিয়াও তাঁহারা যেন পাথরে বাঁচিয়া থাকেন, দেশব্যাপী চাঁদা তুলিয়া তাহার ব্যবস্থা করা দেশবাসীর অবশ্য কর্তব্য।

ধনপতি কহিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। ঐ যে কথায় বলে: 'ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, তিন থাক্‌তে নয়'—সেটা এঁরা খুব ভালভাবে উপলব্ধি করেছেন। তিনের কোনোটাই এঁদের নেই। হেন কাজ নেই, যা করতে এঁদের ঘৃণা, লজ্জা বা ভয় হয়; চোখের সামনেই তো দেখ্‌তে পাচ্ছো। সুযোগ হাতে পেলে কি করে' তার ঘোলো আনা রস নিঙ্‌ড়ে বার করতে হয়, এঁরা তার আদর্শ দেখিয়ে গেলেন, অর্থাৎ যাচ্ছেন। দেশ জুড়ে এঁরা যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন, তাতে বাহাদুরী আছে বই কি!" কহিলাম—"হ্যাঁ, এঁরা যা করে' তুলেছেন, তা একেবারে অভাবিতপূর্ব ব্যাপার। আগে কেউ ভাব্‌তেই পারে নি—"

ধনপতি বাধা দিয়া কহিল, "একজন অন্তত পেরেছিলো। অতীত থেকে কোন্ দূরবীন চোখে লাগিয়ে আমাদের বর্তমানটাকে দেখেছিলো জানি নে, কিন্তু দেখেছিলো। এই দেখনা তার প্রমাণ আমার কাছেই আছে।"

বলিয়া ধনপতি তাহার পকেট হইতে একটি বহু পুরাতন ময়লা এবং জীর্ণশীর্ণ হস্তলিখিত পুঁথি বাহির করিল। মলাটে লেখা "ভবিষ্যদ্দর্শন"। লেখকের নাম ধাম যেখানটায় হয়তো লেখা ছিল, সেখানটা বিচিত্র আকারে পোকায় কাটা। পুঁথির ভিতরের পাতাগুলিও অক্ষত অবস্থায় নাই। ধনপতি একটি পৃষ্ঠা খুলিয়া কহিল, "পড়"। পড়িলাম এবং পড়িয়া অবাক হইলাম। যাহা পড়িয়া অবাক হইলাম তাহার খানিকটা নীচে তুলিয়া দিতেছি:

"একদা ঘুমের ঘোরে পরম গোপনে
দর্শন করিনু এক আশ্চর্য স্বপনে।
সোনার বাঙলায় যেন সোনার বাঙালী
সহসা কাপড় লাগি' হৈয়াছে কাঙালী,
দুই হাতে বক্ষে মারি' সঘনে চাপড়
কান্দিয়া কহিছে শুধু 'কাপড়! কাপড়!'
অন্দরে আন্ধারে বসি' কান্দিতেছে ন্যারী,
বাহিরিতে নারে বিনা পিন্ধনের শাড়ী।
যতই বসন আসে হাজারে হাজারে
ঢুকিয়া অদৃশ্য হয় শ্রীকৃষ্ণ-বাজারে
সেথা হৈতে শুরু হয় কৌশলে পালান
গোপন সুড়ঙ্গ-পথে বাহিরে চালান।"......

ইহার পরে খানিকটা পোকায় কাটা এবং খানিকটা লেখা এত অস্পষ্ট যে পড়া যায় না। তাহার পর কতিপয় মহাশয় ব্যক্তির কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে নিম্নলিখিত রূপ:

"কর্ণেতে তুলার ঠুলি, পৃষ্ঠে কুলা বাঁধা,
মুখেতে আধেক কথা, মনে মনে আধা,
মগজে ঘুরিছে শুধু মুনাফা মুনাফা,
অন্য সব চিন্তা ধামায় আছে চাপা।
প্রচুর ক্ষমতা বিধি দিলা যেই হাতে
সে হাতে টানিছে ঝোল্ নিজ নিজ পাতে।
মুচকি হাসিয়া কহিছে পরস্পরে
'ভরুক না দেশ দিগম্বরী দিগম্বরে,
বসন বসন করি' করুক চীৎকার,
আমাদের লক্ষ্য করি' হানুক ধিক্‌কার।
কর্ণেতে সহিবে ভাই, ভরে যদি পেট,
সময় থাকিতে লও ভরিয়া পকেট।"......

উদ্ধৃতি এ পর্যন্তই থাকুক। কবিতাটা সম্পূর্ণ পড়িয়া দেখিতে যদি কোন পাঠক বা পাঠিকা কৌতূহলী হইয়া থাকেন তো তাঁহাকে ধনপতির শরণাপন্ন হইতে অনুরোধ করিতেছি।

উক্ত কবিতাটির কবি কে জানি না। যিনিই হন না কেন, লঘুছন্দে তিনি এমন চমৎকারভাবে একটি অতি গুরু ব্যাপারের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়।



নিশ্চয়ই বাসেন। যুবকদের পক্ষে দুঃসাহসিকতা ভালো না বাসাটাই অস্বাভাবিক। কিন্তু আপনি হয় তো ভাববেন ভারতের উদ্যমশীল যুবকদের করবার মতো কীই বা আছে। উত্তর দেওয়াও কঠিন নয়,—তারা আই. এ. এফ.এ যোগ দিতে পারে। এই চমৎকার কাজে যুবকেরা তাদের উদ্যম দেখাবার যথেষ্ট সুযোগ তো পাবেই, তা' ছাড়া নিজেদের ব্যক্তিত্ব গঠনেও সাহায্য পাবে। ভবিষ্যতে উন্নতি করতে হলে নেতৃত্ব করবার ও নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করবার ক্ষমতা থাকা চাই, উদ্যোগী হওয়া চাই। আই. এ. এফ.এর সুশিক্ষায় থেকে সমরোত্তর ভারতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন।

যুদ্ধের পর কী করবেন তা' ঠিক করবার সময় এখনই!

• ভারতীয় বিমানবাহিনীর অফিসারেরা যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করবেন তার সাহায্যে ভবিষ্যতে বেসামরিক জীবনে ভালো কাজ তাঁরা সহজেই পাবেন।

• যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন গভর্নমেন্ট অনেক চাকরি নিজেদের হাতে রাখবেন। যাঁরা এখন যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন কেবল তাঁরাই পরে এ সব চাকরি পাবেন।

• এখন থেকেই বন্দোবস্ত চলছে যাতে যুদ্ধপ্রত্যাগত কর্মপ্রার্থীরা গভর্নমেন্টের খরচে তাঁদের ইচ্ছে মত কাজ শিখতে পারেন।

• যাঁরা য়ুনিভার্সিটির পড়া ছেড়ে কাজে যোগ দিয়েছেন তাঁদের জন্য যুদ্ধের পর শিক্ষাসংক্রান্ত অনেক সুবিধের বন্দোবস্ত আছে, এর সাহায্যে তাঁরা যুদ্ধের পর আবার পড়া শুরু করতে পারবেন। এ সম্বন্ধে নিজের নিজের য়ুনিভার্সিটি থেকে বিস্তারিত খবরাখবর পাবেন।

আই. এ. এফ.এ প্রবেশ যোগ্যতা: ভালো স্বাস্থ্য, সুস্থ দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি এবং বয়স ১৭॥ বছর থেকে ২৮ বছর। প্রচুর পরিশ্রমের ক্ষমতা থাকা চাই। আর চাই ভালো সাধারণ শিক্ষা ও ইংরিজিতে ভালো লিখতে ও বলতে জানা।

এই কুপনটি কেটে নিয়ে আপনার কাছাকাছি জি. ডি. (পাইলট) রিক্রুটিং অফিসারকে পাঠালে তিনি আপনাকে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ও ভারতীয় বিমানবাহিনীর কাজ সম্বন্ধে বিস্তারিত সর্ত ও বিবরণ পাঠাবেন।

নাম ______________________

ঠিকানা ______________________

____

____

কুপনটি আপনার কাছাকাছি জি. ডি. আর. ও.কে পাঠিয়ে দিন
আই. এ. এফ. জি. ডি. (পাইলট) রিক্রুটিং অফিসার—কলকাতা
১৪ ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট;



নারী লোক

সেকালের বাংলার মেয়ে

শ্রীসরলাবালা সরকার

শ্রীমতী রাসসুন্দরী

বর্তমান যুগকে অনেকে প্রগতির যুগ বলেন; আবার অনেকের মতে এই যুগ উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বার্থপরতা, বিলাসিতা ও পরানুকরণের যুগ। তাঁহারা একাল ও সেকালের তুলনা দিতে গিয়া বিশেষ করিয়া সেকালের বাঙলার মেয়ে ও একালের বাঙলার মেয়েব মধ্যে কত যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা যেভাবে বর্ণনা করেন, তাহাতে সেকালের মেয়েদের গুণ ও একালের মেয়েদের দোষই বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। তাঁহাদের সেই বর্ণনার ভিতর কিছু কিছু সত্য অবশ্য আছে, যেমন বিলাসিতার দিক দিয়া এই কয়টি কথা অস্বীকার করা যায় না যে, সেকালে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ গৃহের গৃহিণী, কন্যা ও বধূগণ এখনকার দিনের মেয়েদের অপেক্ষা বহুগুণে শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারিতেন। তাঁহারা শীতের প্রত্যূষে নদীতে স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে বড় বড় কলসী ভরিয়া জল আনিতেন, ধান ভানিতেন, যাঁতায় ডাল ভাঙ্গিতেন এবং বহুলোকের জন্য রন্ধন প্রভৃতি এমন অনেক পরিশ্রমের কার্য করিতেন, যাহা এখনকার দিনের মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা করিতে পারেন না। তখনকার দিনে মোটা ভাত ও মোটা কাপড়েরই চলন ছিল; হীরা-মুক্তার গহনা দূরে থাকুক, অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীরা সোনার গহনাও বেশী পরিতেন না, বেশীর ভাগ রূপার গহনাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতেন। হাতের শাঁখা দুগাছিই ছিল সধবাগণের সকল গহনার ভিতর শ্রেষ্ঠ গহনা। সেমিজ, সায়া, ব্লাউজ ও বডিস প্রভৃতির কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারিতেন না। জোলার বা তাঁতির হাতে-বোনা সাড়ীতেই তাঁহাদের লজ্জা নিবারণ হইত।

একান্নবর্তী পরিবারে শান্তি ও অশান্তি উভয়ই ছিল। ঝগড়া-বিবাদ যে হইত না এমন নয়, কিন্তু তাঁহাদের সংসার ছিল কেবল স্বামী ও স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি—আর দাসীচাকর লইয়া নয়, বহু পরিবারের একত্রে আত্মীয়তা বোধের এক নিবিড় বন্ধনের সংসার। এই সংসারের যিনি গৃহিণী তাঁহার দায়িত্ব যে কত গুরুতর ছিল, এখনকার দিনে আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। একই পরিবার, বাল, বৃদ্ধ, যুবা, সক্ষম, অক্ষম, রুগ্ন ও সবল, আত্মীয়, দূর সম্পর্কের আত্মীয় অথবা অনাত্মীয়, আশ্রিত বহু নারী ও পুরুষের আশ্রয়স্থল ছিল। দাসদাসী ও কৃষাণ-মজুরগণকেও এই বৃহৎ পরিবারভুক্ত বলিয়াই ধরা হইত। গৃহিণীকে এই বিশাল পরিবারভুক্ত প্রত্যেকের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে এবং তাঁহাদের বয়স, অবস্থা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইত। শাসন, পালন, শিক্ষা প্রদান, গুরুজনকে মর্যাদাদান ও তাঁহাদের সেবা বিষয়ে এবং পরিবারস্থ সকল ব্যাপারেই তাঁহাকে অবহিত হইতে হইত। এক কথায় এইরূপ পরিবার-পরিচালন একটি বিশাল রাজ্য পরিচালনের তুল্যই কঠিন দায়িত্বপূর্ণ কার্য ছিল।

সেকালে বাঙলার নারীরা নিরক্ষরা ছিলেন, কলহপ্রিয়াও ছিলেন। সভ্যতা ও ভদ্রতা সম্বন্ধে তখনকার ধারণা এখনকার ধারণার সহিত অবশ্য মিলিতে পারে না। শিল্পনিপুণতা তখন একভাবের ছিল, এখন অন্যরূপ হইয়াছে। কালানুযায়ী ও আর্থিক সমস্যার সংঘাতে এইভাবে বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে এই সকল পরিবর্তনের ভিতর কতটা ভাল বা কতটা অহিতকর সে সম্বন্ধে বিচার করিব না। সেকালের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীর জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করাই আমাদের এই প্রবন্ধের বিষয়।

এই প্রবন্ধে যাঁহার জীবনী আমরা আলোচনা করিব তিনি ১২১৬ সাল চৈত্র মাসে পাবনা জেলার অন্তর্গত পোতাজিয়া গ্রামে কোন এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার সময়ে বাঙলা দেশে মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইবার প্রথা একবারেই ছিল না, বরং মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে বিধবা ও দুর্ভাগ্যবতী হয়, অনেকেরই এইরূপ বিশ্বাস ছিল। অথচ এই মহিলাটি নিজ প্রযত্নে কেবল যে লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিলেন, তাহা নয়, "আমার জীবন" নামে একখানি পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। ১৩১৩ সালে এই পুস্তকের কোন কোন অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে গৃহীত হইয়াছিল।

এই গ্রন্থখানি যখন দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয়, তখন স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে এখানে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে পুস্তকখানির কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবেঃ—

"এই গ্রন্থখানি একজন রমণীর লেখা, শুধু তাহা নয়, একজন ৮৮ বৎসর বয়স্কা বর্ষীয়সী প্রাচীনা রমণীর লেখা। তাই বিশেষ কুতূহলী হইয়া আমি এই গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্ত হই।* * *

"ইঁহার জীবনের ঘটনাবলী এমন বিস্ময়জনক এবং ইঁহার রচনায় এমন একটি সরল মাধুর্য আছে যে, গ্রন্থখানি পড়িতে বসিয়া শেষ না করিয়া স্থাগিদ রাখা যায় না।* *

"ইঁহার আত্মজীবনী পড়িয়া বুঝা যায় যে, ইনি একজন আদর্শ রমণী। যেমন গৃহকর্মে নিপুণা, তেমনি ধর্মপ্রাণা ও ভগবদ্‌ভক্তা। শৈশবে ইনি অতিশয় ভীরু-স্বভাবা ছিলেন। সেই সময় ইঁহার জননী ভয়-নিবারণার্থে ইঁহাকে একটি অভয়মন্ত্র প্রদান করেন। সেই অবধি সেই অভয় মন্ত্রটি অক্ষয়কবচরূপে তাঁহাকে চিরজীবন রক্ষা করিয়াছে। তাঁহার মা বলিয়াছিলেন, ভয় হইলেই দয়ামাধবকে ডাকিও। শোকে, তাপে, ভয়ে, বিপদে এই মন্ত্রটিই তাঁহাকে চিরদিন সান্ত্বনা ও শক্তিদান করিয়াছে।* *

"লেখাপড়া শিখিবার তাঁহার কোন সুবিধা ঘটে নাই। তখনকার দিনে স্ত্রীলোকের লেখাপড়া দোষের মধ্যে গণ্য হইত। তিনি আপনার যত্নে বহু কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। ইঁহার ধর্মপিপাসাই ইঁহাকে লেখাপড়া শিখিতে উত্তেজিত করে। নভেল নাটক পড়িতে পারিবেন বলিয়া নহে, 'চৈতন্য ভাবগত' পড়িতে পারিবেন বলিয়াই তাঁহার লেখাপড়া শিখিবার জন্য এত আগ্রহ।

"আমার জীবনী" পাঠে বুঝা যায়, ইঁহার ধর্ম অনুষ্ঠান আড়ম্বরে পর্যবসিত নয়, ইঁহার ধর্ম জীবন্ত আধ্যাত্মিক ধর্ম।

জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় ইনি ঈশ্বরের হাত দেখিতে পান, তাঁহার করুণা উপলব্ধি করেন, তাঁহার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া থাকেন। এক কথায় তিনি ঈশ্বরেতেই তন্ময়। এরূপ উন্নত ধর্মজীবন সচরাচর দেখা যায় না।* * *

"লেখিকার জননী তাঁহাকে ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা এইরূপ—'আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা! দয়ামাধব দালানে থাকিয়া কেমন করিয়া আমরা যে মাঠে কাঁদিতেছিলাম তাহা শুনিতে পাইলেন? মা বলিলেন,—তিনি পরমেশ্বর, তিনি সর্বস্থানেই আছেন। এজন্য শুনিতে পান। তিনি সকলের কথাই জানেন।* * তাঁহাকে যে যেখানে থাকিয়া ডাকে, তাহাই তিনি শুনেন। বড় করিয়া ডাকিলেও তিনি শুনেন, মনে মনে ডাকিলেও তিনি শুনেন। তিনি সকলেরই ভালবাসেন, তিনি সকলেরই পরমেশ্বর।"

জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর ভূমিকার শেষে লিখিয়াছেন "এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে থাকা আবশ্যক। এমন উপাদেয় গ্রন্থ অতি অল্পই আছে।"

গ্রন্থকর্ত্রীর নাম শ্রীমতী রাসসুন্দরী। হাইকোর্টের উকীল স্বর্গীয় কিশোরীলাল সরকার যিনি ঠাকুর 'ল' লেকচারার ছিলেন এবং "এ ডাইং রেস, হাউ ডাইং?", "হিন্দু সিস্টেম অব্ মরাল সায়েন্স", "হিন্দু সিস্টেম অব রিলিজিয়াস্ সায়েন্স", "হিন্দু সিস্টেম অব্ সেল্ফ্ কালচার" প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার এক পুত্র। তাঁহার তৃতীয় পুত্র রায় বাহাদুর দ্বারকানাথ সরকার কৃষ্ণনগরের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। তাঁহার পৌত্রেরা সকলেই কৃতবিদ্য। সুপ্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তার সরসীলাল সরকার, যিনি সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন, তিনিও তাঁহার এক পৌত্র।

"আমার জীবন" পুস্তকে আমরা পাই যে শৈশবে ও বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত ভীরুস্বভাবা ছিলেন। এই ভয় কেবল নিজের বিপদের জন্য নয়, বেশীর ভাগ স্থলেই অন্যের যদি বিপদ হয়, এই তাঁহার দারুণ ভয়। তাঁহার মা বলিয়াছিলেন, যে সব ছেলেমেয়ে দুষ্টামি করে, অন্যের উপর অত্যাচার করে, তাহাদের ছেলেধরা ধরিয়া লইয়া যায়। এই জন্য যদি কোন ছেলেমেয়ে তাঁহার উপর অত্যাচার করিত, অকারণে তাঁহাকে প্রহার করিত, তখন তিনি চেঁচাইয়া কাঁদিতে পারিতেন না, কেবল নীরবে চোখের জল ফেলিতেন, পাছে ছেলেধরারা জানিতে পারিয়া তাহাদের ধরিয়া লইয়া যায়। তিনি অত্যাচারিত হইয়াও কাঁহারও নামে নালিশ করিতেন না; পাছে আবার সেজন্য তাহাদের গুরুজন তাঁহাদের আচরণ জানিতে পারিয়া তাহাদের শাস্তি দেন। এই যে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর দোষী-নির্দোষনির্বিশেষে একান্ত সমবেদনা, ইহা তাঁহার চিরজীবন একভাবেই ছিল।

তাঁহার আর একটি স্বভাব ছিল আত্মপ্রচার-বিমুখতা। তাঁহার জীবনীতে আমরা পাই যে, তিনি পিতামাতার অতি আদরের কন্যা ছিলেন। এজন্য বাড়িতে কোনদিন কেহ তাঁহাকে কোন কাজ করিতে দিত না, কিন্তু তাঁহার এক পাড়িতা গ্রাম সম্পর্কীয়া খুড়িমার বাড়িতে বেড়াইতে গিয়া তাঁহাকে অপারগ দেখিয়া তিনি গোপনে তাঁহার সমস্ত কাজ করিয়া দিতেন, এমন কি ক্রমশ রন্ধন পর্যন্ত করিতে শিখিয়া সে বাড়ির সকলের জন্য রন্ধন করিতেন, অথচ ইহা তাঁহাদের বাড়ির কেহই জানিত না। সকলে মনে করিত, ঐ বাড়িতে গিয়া তিনি খেলা করিয়া দিন কাটান। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৯।১০ বৎসর। পরে ঘটনাক্রমে সকলেই তাঁহার এই গোপন সেবার কার্য জানিতে পারিল। তখন তিনি অপরাধীর ন্যায় নতমুখে মায়ের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন, মা এই ব্যাপারের জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন না বরং আদরই করিলেন।

তিনি শিল্পকুশলা ছিলেন। পাথর কাটিয়া লতাপাতা-অঙ্কন, পাট দিয়া কারুকার্যময় শিকা প্রস্তুত করা এগুলি খুব ভালই পারিতেন, আবার মাটি দিয়া নানারূপে মূর্তি গঠন করিতেও পারিতেন। এ কার্যে তিনি এমন নিপুণা হইয়াছিলেন যে, যাহা দেখিতেন, তাহাই অবিকল গড়িতে পারিতেন। একবার একটি মাটির সাপ প্রস্তুত করিয়া তাহার গায়ে রং দিয়া, রং শুকাইবার জন্য খাটের নীচে রাখিয়াছিলেন। এ ঘটনাটি তাঁহার বিবাহের পর তাঁহার শ্বশুর বাড়িতে ঘটিয়াছিল। ঐ সাপটি এমন অবিকল সাপের মত হইয়াছিল যে, একজন লোক তাহা দেখিয়া বাহির বাড়ি হইতে অনেক লোক ডাকিয়া আনিয়া লাঠি সড়কীর সাহায্যে সাপকে মারিতে গেল। এই ঘটনায় তিনি এমন লজ্জা পাইয়াছিলেন যে, মাটী দিয়া পুতুলগড়া একেবারেই ছাড়িয়া দিলেন।

তিনি এত সরল ছিলেন যে, তাঁহার মা যাহা বলিতেন, একান্তভাবে তাহা বিশ্বাস করিতেন। মা বলিয়াছেন, বিপদে পড়িলে দয়ামাধব (বাড়ির বিগ্রহ) বলিয়া ডাকিলে তিনি আসিয়া উদ্ধার করেন। ইহা তাঁহার একান্ত বিশ্বাস হইয়াছিল। তাঁহার পিত্রালয়ে এক রাত্রে বাড়িতে আগুন লাগিল। সেই সময় তাঁহাদের তিন ভাইবোনকে একটি ফাঁকা মাঠে আনিয়া রাখিয়া বাড়ির লোকেরা যখন জ্বলন্ত ঘরগুলি হইতে জিনিসপত্র বাহির করিতে ব্যস্ত ছিল, তখন আগুনের শিখার দারুণ উত্তাপ, ঘরের বাঁশ প্রভৃতি ফাটিবার শব্দ ও লোকের ক্রন্দন ও কোলাহল শুনিয়া তাঁহারা ভয় পাইয়া দৌড়িয়া পলাইতে লাগিলেন। তাঁহারা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ও কাঁদিতে কাঁদিতে নদীর ধার ধরিয়া ছুটিতেছিলেন, ক্রমে এক শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থান তখন একেবারেই নির্জন, চারিদিকে শবের বিছানা, বাঁশ, কাঠ ও অঙ্গার প্রভৃতি ছড়াইয়া রহিয়াছে। ভাই বোনের মধ্যে একটি ভাই তাঁহার অপেক্ষা কিছু বড় ও আর একটি তাঁহার ছোট।

তাহার বড় ভাই বলিলেন, "এযে দেখছি মড়া-পোড়ানোর সব জিনিস"। সেই কথা শুনিবা মাত্র তাঁহার দারুণ ভয় হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জননীর সেই উপদেশ স্মরণ হইল যে "বিপদে পড়িলেই দয়ামাধবকে ডাকিবে।" তখন তিন ভাইবোনে কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিতে লাগিলেন, দয়ামাধব! দয়ামাধব! দয়াময়! দয়াময়!"

নদীর জল বেশি ছিল না। এ পারের গ্রামে আগুন লাগিয়াছে দেখিয়া ওপারের গ্রামের কয়েক জন হাঁটিয়া নদী পার হইয়া এপারে আসিয়া তাঁহাদের দেখিতে পাইল। তাহাদের একজন বলিল, "ওরে, রায় মহাশয়ের বাড়ি আগুন লাগিয়াছে, এ বুঝি তাঁহাদের বাড়ির ছেলেমেয়ে কাঁদিতেছে।" তাহাদের কয়েকজন তাঁহাদের কাছে আসিয়া, "ভয় নাই, ভয় নাই," বলিয়া তাঁহাদের তিন ভাইবোনকে কোলে করিয়া যেখানে বাড়ির সকলে তাঁহাদের না দেখিতে পাইয়া কাঁদাকাটি করিতেছে, সেখানে তাঁহাদের পৌঁছাইয়া দিল। তাঁহার আত্মীয়েরা হারানিধি ফিরিয়া পাইয়া তাঁহাদের কোলে লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহারা হারাইয়া যাওয়াতে বাড়ির কোন জিনিসপত্রই বাহির করা হয় নাই, প্রায় সমস্তই পুড়িয়া গিয়াছিল।

ঐ রাত্রে তাঁহারা একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে রহিলেন। পরদিন বাড়িতে আসিয়া দেখিলেন পোড়া জিনিস রাশি রাশি স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। বেগুন গাছে বেগুন, কলাগাছে কলার কাঁদি পুড়িয়া রহিয়াছে। লেখিকা নিজ জীবনীতে লিখিয়াছেন, "এই সব পোড়া জিনিসপত্র দেখিয়া আমার মনে ভারী আহ্লাদ হইল। আমি হাঁড়ি ও ভাঁড় প্রভৃতি লইয়া খেলা করিতে লাগিলাম। আমাদের বাড়িতে যে দয়ামাধব বিগ্রহ আছেন তাঁহার সেবায় প্রতিদিন পরমান্ন ভোগ হয়; ভিটা পুড়িয়া গেলে পোড়া ভিটায় বসিয়া পরমান্ন খাইতে হয় আমাদের দেশে এই একটি নিয়ম আছে, তদনুসারে আমাদের সব ভাইবোনকে পরমান্ন খাইতে দেওয়া হইল। পরমান্ন খাইতে খাইতে আমার ছোট ভাই বলিল, 'এ পরমান্ন দয়ামাধবের প্রসাদ।' তাহার কথা

শুনিয়া আমি বলিলাম, 'হাঁ দয়ামাধব আমাদের বড় ভালবাসেন। কাল রাত্রে তিনি আমাদের কোলে করিয়া বাড়ি আনিয়াছেন।' ইহ শুনিয়া ছোট ভাই বলিল, 'ছি, দিদি কি বলিলে? দয়ামাধব কি মানুষ? তাঁহার মুখে কি দাড়ি আছে? ওতো, মানুষ আমাদের কোলে করিয়া আনিয়াছিল।' 'কিন্তু দাড়ি থাকিলে কি হইবে, মা যে বলিয়াছেন ভয় পাইলে দয়ামাধবকে ডাকিও। তাইতো আমি তাঁহাকেই ডাকিয়াছিলাম, মানুষকে তো ডাকি নাই।' ছোট ভাইয়ের কথা শুনিয়া আমার চোখে জল আসিল। মা আসিয়া ছোট ভাইয়ের মুখে সকল কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম না, মা কেন হাসিতেছেন। * * * পরে মা আমাকে বুঝাইয়া বলিলে বুঝিতে পারিলাম যে দয়ামাধব আমাদের কান্না শুনিয়া ঐ মানুষটিকে পাঠাইয়াছিলেন, সেই আমাদের বাড়ি আনিয়াছে।"

তিনি এত সরলা ছিলেন যে বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত "বিবাহ" ব্যাপারটি যে কি, তাহা মোটেই জানিতেন না। স্নানের ঘাটে গিয়া লোকে বলাবলি করিতেছে শুনিলেন, "এ মেয়েটি যে পাইবে সে কৃতার্থ হইবে। কতজন সম্বন্ধ নিয়া আসিতেছে, দিলে তো এখনই লইয়া যায়।" শুনিয়া তিনি একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। বাড়ি গিয়া যখন জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা কেহ যদি আমাকে চায়, তুমি কি আমাকে দিয়া দিবে।" এ কথা শুনিয়া মা "ষাট্ ষাট্" বলিয়া মেয়ের মাথায় হাত দিলেন, কিন্তু কন্যা দেখিলেন মায়ের চোখে জল আসিয়াছে, এবং বুঝিলেন যে "দিয়া দিবার" কথাটির ভিতর কিছু সত্য আছে।

এই "দিয়া দিবার" চিন্তায় তিনি ভাবনায় ও ভয়ে একেবারে মৃতপ্রায় হইলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমার মন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল, কিছুই ভাল লাগে না, আমি কাহারও সঙ্গে কথাও কহি না, কোনও কাজও করি না, দিন রাত কেবল মনে মনে পরমেশ্বরকে ডাকিতাম, আর সকল সময়েই আমার চোখে জল পড়িত।"

বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণাই ছিল না, এই "দিয়া দিবার" ব্যাপারের সহিত বিবাহের যে কোন যোগ আছে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। সুতরাং বিবাহ হইবে শুনিয়া আহ্লাদিতই হইয়াছিলেন। "বিবাহ হইবে, বাজনা বাজিবে, সকলে হুলু দিবে, দেখিব। বিবাহের পূর্ব দিবস অলঙ্কার, লাল সাড়ি প্রভৃতি দেখিয়া আমার ভারী আহ্লাদ হইল।" কিন্তু যাত্রার সময়েই বিপদ বাধিল। সে সময়ের যে করুণ বর্ণনা তাহা উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বাড়িয়া যাইবে সুতরাং এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম।

বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ি ও বধূর কর্তব্য পালন। শ্বশুরবাড়ি গিয়া অবগুণ্ঠনাবৃতা বধূ "দিনরাতই মনে মনে পরমেশ্বরকে ডাকিতাম। তাঁহার সঙ্গেই যা কিছু কথা হইত।"

শ্বশুরবাড়ির বর্ণনায় তিনি লিখিয়াছেন, "ঐ বাড়িতে নয়জন চাকরাণী ছিল, তাহার মধ্যে ঘরের কাজ করা একজন, আর আটজন বাহিরের লোক।" প্রথম প্রথম নূতন বধূরে কোনও কাজই করিতে হইত না, পরে ক্রমশঃ তাঁহার উপর সমস্ত সংসারের ভার আসিয়া পড়িল। "শাশুড়ী ঠাকুরাণী সান্নিপাতিকের পীড়ায় দৃষ্টিহীন হইলেন তখন তাঁহার নিজের প্রয়োজনীয় কর্ম পর্যন্ত আমাকে করিতে হইত, অধিকন্তু ঐ সংসারের সমুদায় কাজের ভারও আমার উপরেই পড়িল। * * * ঐ সংসারটি বড় কম নহে, দস্তুর মতই আছে। বাটিতে বিগ্রহ স্থাপিত আছেন, তাঁহার সেবাতে অন্নব্যঞ্জন-ভোগ হয়। বাটীতে অতিথি, অভ্যাগত ও পথিক সতত আসিয়া থাকে, তাহাদিগকে বাটীর মধ্য হইতে সিধা দেওয়া হয়। এদিকে রান্নাও বড় কম নহে। চাকর চাকরাণী প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ জন বাটীর মধ্যে ভাত খাইত, তাহাদের দুই বেলাই রন্ধন করিয়া দিতে হইত। বিশেষতঃ ঠাকুরাণী চক্ষুহীন হইয়াছেন, তাঁহার সেবা সর্বোপরি।" * * সেকালে এখনকার মত চিকণ কাপড় ছিল না। মোটা মোটা কাপড় ছিল, আমি সেই মোটা কাপড় পরিয়া বুক পর্যন্ত ঘোমটা টানিয়া ঐ সকল কার্য করিতাম।"

সংসারে তাঁহাকে যে কি পরিমাণ পরিশ্রম করিতে হইত তাহা ভাবিলে আশ্চর্য বোধ হয়। অথচ এত পরিশ্রম করিয়াও তাঁহার স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল। তিনি "আমার জীবনে" লিখিয়াছেন যে "প্রাতঃকালে এ সমুদায় কাজ আরম্ভ করিয়া রাত্রি দুই প্রহর পরে কাজের শেষ হইত। কিন্তু ইহাতে আমার বিরক্তি বোধ হইত না। এই প্রকারে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সংসারের সমুদয় কাজ ক্রমশঃ আমা হইতেই সমাধা হইতে লাগিল। তখন আমার বয়ক্রম চৌদ্দ বৎসর মাত্র।"

এত কাজের মধ্যেও লেখাপড়া শিখিবার প্রবল বাসনা অহরহঃ তাঁহার মনে জাগ্রত ছিল। তিনি লিখিয়াছেন—"আমার অদৃষ্টক্রমে তখন মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখিত না। তখনকার লোক বলিত, 'কলিকাল' উপস্থিত হইয়াছে, তাই মেয়েরাও বুঝি লেখাপড়া শিখিয়া পুরুষের কাজ করিবে। * * এখন মেয়ে—রাজার কাল হইয়াছে, দিনে দিনে বা আরও কত দেখিব। এখন যেমত হইতেছে, ইহাতে আর ভদ্রলোকের জাতি থাকিবে না।"

দশ পাঁচ জন মিলিয়া একস্থানে বসিয়া (ইঁহারা প্রায় সকলেই স্ত্রীলোক) এই প্রকার আলাপ হইত, ঐ সকল কথা শুনিয়া, আমার অত্যন্ত ভয় হইত। আমার মনের কথা প্রকাশ করা দূরে থাকুক, মনের কথা কেহ জানিবে বলিয়া ভয়ে প্রাণ কাঁপিত। এমন কি যদি একখানা লেখা কাগজ দেখিতাম, তাহাও লোকের সম্মুখে তাকাইয়া দেখিতাম না। কিন্তু সর্বক্ষণ একমনে পরমেশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতাম হে পরমেশ্বর তুমি আমাকে লেখাপড়া শিখাও, আমি লেখাপড়া শিখিয়া পুঁথি পড়িব।"

লেখাপড়া শিখিবার ইচ্ছার মূলে ছিল একটি ঘটনা। তাঁহার পিত্রালয়ে তাঁহার বালিকা বয়সে তাঁহার পিতার আদরের সন্তান বলিয়া পিতা তাঁহাকে আনিয়া মাঝে মাঝে পাঠশালায় বসাইয়া রাখিতেন। তাঁহার সমবয়স্কা বালিকারা তাঁহাকে নিরীহ জানিয়া প্রায়ই তাঁহার উপর অত্যাচার করিত। তিনি কখনও সে সম্বন্ধে অভিযোগ না করিলেও ক্রমে যখন ইহা সকলে জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহার পিতা ঐ সকল দুষ্ট প্রকৃতি বালিকার সঙ্গ হইতে বরং, দিনের বেলায় ছেলেদের পাঠশালায় তাঁহাকে বসাইয়া রাখা ভাল মনে করিতেন। সেই পাঠশালায় একজন শিক্ষয়িত্রী ছেলেদের প্রাথমিক পাঠ দিতেন। শিক্ষয়িত্রীকে লেখিকা "মেম" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তিনি কোন খৃষ্টান মহিলা হইবেন। যাহা হউক, দিনের পর দিন তিনি স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া খড়িতে লেখা অক্ষর ও বানান প্রভৃতি দেখিতেন এবং সেই অক্ষরগুলি যেন তাঁহার মনে মুদ্রিত হইয়া গেল। তাহার পর বাড়িতে আগুন লাগিয়া যখন পাঠশালা ঘর পুড়িয়া গেল, তখন হইতে পাঠশালাও বন্ধ হইয়া গেল।

সেই অবধিই তাঁহার অবচেতন মনে বিদ্যা-পিপাসা সংগুপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোন উপায়ই তিনি দেখিতে পাইলেন না।। বিবাহ হইল, বধূরূপে শ্বশুরবাড়িতে গেলে ক্রমশ সংসারের গুরুভার তাঁহার উপর পড়িল। দিনরাত্রির মধ্যে অবসরমাত্র নাই, অথচ লেখাপড়া শিখিবার ইচ্ছা নিয়তই মনের মধ্যে রহিয়াছে। অতি ভীরু ও নম্র স্বভাব বশত গুরুজন ও পরিজনের সর্বদাই বশবর্তিনী হইয়া থাকিতেন, কিন্তু লোকনিন্দার ভয়ও তাঁহার এই প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে দমন করিতে পারিল না। পরমেশ্বরে তাঁহার দৃঢ় নির্ভর, তাই তাঁহার মনে আশা ছিল যিনি অঘটনও ঘটাইতে পারেন, তাঁহারই কৃপায় একদিন তাঁহার এই বাসনা পূর্ণ হইবে।

এইভাবে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর গত হইল, ইতিমধ্যে তাঁহার কয়েকটি সন্তানও জন্মগ্রহণ করিল। একদিন তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যেন তিনি চৈতন্যভাগবত পুঁথি পাঠ করিতেছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "ঐ স্বপ্ন দেখিয়া আমার মন এককালে আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইল। আমি জাগিয়াও চোখ বুজিয়া বার বার ঐ স্বপ্নের কথা মনে করিতে লাগিলাম, আর আমার জ্ঞান হইল, আমি যেন কত অমূল্য রত্নই প্রাপ্ত হইলাম।"

চৈতন্যভাগবত পুঁথি তিনি কখনও দেখেন নাই, সুতরাং চেনেন না। ঐ বাড়িতে অনেক পুঁথি আছে, সেগুলি তুলট কাগজে লেখা পুঁথি। হয়তো সেই-সব পুঁথির ভিতর শ্রীচৈতন্যভাগবতও থাকিতে পারে, কিন্তু থাকা না থাকা তাঁহার পক্ষে সমান। যে পুঁথি তিনি চিনেন না, তাহা তিনি খুঁজিয়া বাহির করিবেন কিরূপে এবং যদি খুঁজিয়া পান, তবে পড়িবেন কিরূপে, তাঁহার যে অক্ষর পরিচয়ই হয় নাই।

কিন্তু তাঁহার একমাত্র ভরসা ভগবানের দয়া। স্বপ্ন দেখিবার পর হইতে তিনি মনে মনে অবিরত ভগবানকে বলিতে লাগিলেন, "যদি স্বপ্নে পুঁথি পড়াইলে, তবে ঐ পুস্তকখানি আমাকে চিনাইয়া দাও। ঐ শ্রীচৈতন্যভাগবতখানি আমাকে দিতেই হইবে, তুমি না দিলে আমি তাহা কিরূপে পাইব?"

ইহার পর এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। তাঁহার বড় ছেলেটির তখন আট বৎসর বয়স। তিনি রাঁধিবার ঘরে রান্না করিতেছেন, এই সময় শুনিলেন, তাঁহার স্বামী ছেলেকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "বিপিন আমার চৈতন্যভাগবত এখানে থাকিল, আমি যখন নিয়া যাইতে বলিব, তখন তুমি লইয়া যাইও।"

কর্তা বাহিরে যাইবামাত্র তিনি তাড়াতাড়ি শয়নঘরে গিয়া দেখিলেন, সেই চৈতন্য-ভাগবত রহিয়াছে। স্বপ্নে যে পুঁথি দেখিয়াছিলেন, ঠিক সেই পুঁথি। কাঠের আড়িয়ার মলাটে নানা চিত্র, তাহার ভিতর সুতা দিয়া গাঁথা গ্রন্থের পত্রগুলি। গ্রন্থখানি তখন তিনি নাড়িয়া চাড়িয়া ভাল করিয়া দেখিলেন ও ছবিগুলি বেশ করিয়া চিনিয়া রাখিলেন। পরে সুযোগ বুঝিয়া পুঁথি খুলিয়া একটি পাতা আস্তে আস্তে খুলিয়া লইলেন। কিন্তু পাতাটি রাখিবেন কোথায়, কেহ যদি দেখিতে পায়, তাহা হইলে না জানি কতই নিন্দা হইবে। তখন ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিলেন, রান্না ঘরে রাঁধিবার যে কাঠ থাকে, তাহার ভিতর পাতাটি লুকাইয়া রাখিবেন। তিনি লিখিয়াছেন, "সেই পাতাটি যে কখন দেখিব তাহার সময় নাই। রাত্রে পাক-শাক মিটিতেই ভারী রাত্রি হইয়া পড়ে। আবার ঐ সকল কাজ মিটিতে না মিটিতেই ছেলে-পিলেগুলি জাগিয়া উঠিয়া বসে, তখন তাহাদের লইয়াই পড়িতে হয়। কেহ বলে ক্ষিদে পাইয়াছে, কেহ প্রস্রাব করিবে, কেহ বলে মা কোলে নাও, আবার কেহ বা অকারণে কান্না আরম্ভ করে। সকলকেই শান্ত করিতে হয়, ইহার পর রাত্রি অধিক হইয়া পড়ে, সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর চোখে নিদ্রা আসে, লেখাপড়া করিবার আর সময় থাকে না। তাহার পর একজন না শিখাইলে কি করিয়া অক্ষর চিনিব? উহার ভিতর যদি বা দু একটি অক্ষর মনে পড়িল, কিন্তু সবগুলি মনে পড়ে না, আবার যুক্তাক্ষরও আছে।* * *

"তখন আমার বড় ছেলেটি তালপাতে লিখিত। আমি তাহার লেখা একটি পাতা লুকাইয়া রাখিলাম। ঐ পাতাটি একবার দেখি, আবার ভাগবতের পাতাটিও বাহির করিয়া উহার সহিত অক্ষর মিলাই; আর ছেলেবেলায় যে অক্ষর খড়িতে লেখা দেখিয়াছিলাম তাহাও মনে মনে স্মরণ করি, এই প্রকারে দিনরাত পড়ার বিষয়ই স্মরণ করিতাম এবং ভগবানের কৃপায় মনে মনে চিন্তা করিয়া করিয়া পাতাখানি একরূপ পড়িতে পারিলাম, পরে তাঁহার সাহায্যে অন্য পাতাগুলিরও ক্রমশ অর্থবোধ হইতে লাগিল। এইভাবে যখন আমি ভগবানের দয়ায় পড়িতে শিখি, তখন আমার বয়স পঁচিশ বৎসর, আমি তখন চারিটি সন্তানের জননী।"

ইহার পরে কিভাবে ক্রমশ তিনি ছাপার অক্ষর পড়িতে এবং লিখিতে শিখিলেন তাহারও বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থে আছে। বাহুল্য ভয়ে এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

এই মহিলার জীবনীতে আমরা একটি বিষয় পাই, সেটি ভগবানের প্রতি জ্বলন্ত বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই সংসারপথে সকল সময়ে তাঁহাকে সার্থকতার পথে চালিবার শক্তি দান করিয়াছে। তাঁহার জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনাও ঘটিয়াছে, কিন্তু তিনি একান্ত নিরভিমান ছিলেন। যাহা কিছু ঘটিতেছে, সকলের ভিতরেই ভগবানের ইচ্ছা ও তাঁহার কৃপা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতেন।

তিনি অনেকগুলি কবিতা রচনা করেন। কবিতাগুলি সুলিখিত ও আন্তরিকতা-পূর্ণ। এখানে তাঁহার রচিত দুই-একটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম।

"জন্মিয়া ভারত ভূমে মজিয়া মোহের ঘুমে
হেলায় হারাই চিরদিন।
না পাই উপায় তার, ওহে প্রভু বিশ্বাধার
দয়া কর আমি অতি দীন।
তুমি প্রভু বিশ্বময়, তুমিই উদয়, লয়,
শুদ্ধ তত্ত্ব কে জানে তোমার?
কে করিবে বর্ণন পঞ্চমুখে পঞ্চানন
অনন্ত না পায় অন্ত যাঁর।
নানা ধর্ম-শাস্ত্র যত কোরাণ পুরাণ কত,
করে তব তত্ত্ব নিরূপণ।
তোমার কৌশল-ধারা তবু নাহি জানে তারা
অন্ধ নেত্রে বিরাট দর্শন।
চরাচর ত্রিসংসারে কে তোমা জানিতে পারে
তুমি যদি না জানাও নিজে,
অবলা অক্ষমা নারী আমি কি জানিতে পারি
ভিক্ষা মাগি তব পদাম্বুজে।
আমার এ দেহ-প্রাণ, সকলি তোমার দান,
এই মাত্র ভরসা আমার;
দিয়াছি চরণে ভার, কর বা না কর পার,
তুমি ভিন্ন আছে কিবা আর।"

তাঁহার রচিত একটি গান এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

"দেখো যেন ডুবে না তরী,
এ ভবসাগরে তুফান ভারি।
মন, হুঁসিয়ারে থেকো, অনলসে জেগো
গুরু-বস্তু-ধন যতনে রেখো,
নিজে থেকো দ্বারে হইয়া দ্বারী।
রাসসুন্দরীর চিত সতত চঞ্চল
করে টলমল, যেন পদ্মপত্রে জল,
শ্রীগুরু-কৃপায় পার যদি পায়,
নিজে যদি হন পারের কাণ্ডারী।
এই ভবসাগরে তুফান ভারি।"

তাঁহার রচিত আর একটি কবিতার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম। কবিতাটি বাঙলা দেশে ম্যালেরিয়ার আবির্ভাব উপলক্ষে রচিত হইয়াছিল।

রাগিণী ধানসী—তাল খেমটা
রামদিয়ায় ১২৮০ সালের জ্বর বর্ণনা

"হায় হায়, হচ্ছে রামদিয়াতে জ্বরের মালখানা;
সন ১২৮০ সালে কার্তিক মাসে যায় জানা।
জ্বরের এম্নি যে রীতি যার বাড়ি যেটি—
ক্রমে ক্রমে শয্যাগত হচ্ছে সকলটি।
আবার ভিন্ন দেশের লোক আসিলেও
অমনি পড়ে বিছানা।
সে জ্বরের ভঙ্গী বুঝা ভার হল কি এবার
রোগীদের ভাব দেখিয়ে লাগছে চমৎকার।
মলাম গেলাম শব্দ মুখে,
'মা বাবা' বই বলে না।
তাহে পোহায় না রাতি, একি দুর্গতি,
ঘরে ঘরে হাত ধরিয়ে দেখছে পার্বতী।
যার মরছে,কাঁদছে বসে,ঔষধপত্র মেলে না।"

শিকার স্মৃতি

শ্রীভুপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ (সুসঙ্গ)

শিকার আমার 'পেশা' নয় তবে 'নেশা' বটে। এই খেয়ালের বশবর্তী হইয়া অনেক দিন পশুপক্ষীর পিছনে বনে জঙ্গলে কাটাইয়াছি। প্রৌঢ় বয়সে অনেক সময়ই যখন বিগত জীবনের খতিয়ান করিবার ইচ্ছা জাগে, তখন শিকারের পিছনে কাটান দিনগুলিকে কেবল অপচয়ের কোঠায় স্থান দেওয়া চলে না মনে হয়। বনে-জঙ্গলে কাটান দিনের দুই চারিটা ছবি জীবন স্মৃতিপটে এমন স্পষ্ট হইয়া আঁকা আছে যে, মনে হয় কালের প্রভাব তাহার কোনও পরিবর্তন ঘটাইতে পারে নাই। পূর্বে হয়ত সেই সকল ঘটনা মনে নানা বিচিত্র অনুভূতির খোরাক যোগাইয়াছে, এখন সেই সব ঘটনার স্মৃতি মনে উদিত হইলে, প্রাণী-জগতের লীলা-রহস্য সম্বন্ধে নানা জিজ্ঞাসা জাগে। এমন কোন কোনও বিষয়ে নিজের জ্ঞানে মীমাংসা না পাওয়ায় যোগ্য ব্যক্তির নিকট উত্থাপন করিয়া তাহার সদুত্তর পাওয়ার ইচ্ছা হয়।

জীবজগতের লীলাভঙ্গির যে দুইটি হৃদয়গ্রাহী চিত্র দেখিয়াছি, তাহা হইতে কোনও তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায় কি না, সেই উদ্দেশ্য লইয়াই দুই দিনের দুইটি বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিষয় লিখিতে চেষ্টা করিব,—একটি পাখীর এবং অপরটি হরিণীর। বর্তমান নিবন্ধে আপাত দৃষ্টিতে পাখীর প্রেমের এবং হরিণীর স্নেহের দুইটি চিত্র দিব। ইতর প্রাণীর ভিতর মনুষ্যসুলভ জটিল বৃত্তির অস্তিত্বের বিচার ভার বৈজ্ঞানিকের। তথ্য হইতে তত্ত্ব উদ্ঘাটনের কোনও সাহায্য হয় কি না তাহার বিচার তাঁহারাই করিবেন।

পাখীর প্রেম

প্রায় পঁচিশ বছর হইতে চলিয়াছে, তখনও যৌবনের আনন্দে শরীর-মন চঞ্চল, বৃত্তিনিচয় সদা জাগরণোন্মুখী। গারো পাহাড়ের অন্তরের অমৃতরস বাহিনী স্বচ্ছতোয়া সোমেশ্বরীর ধার দিয়া পাহাড়ের পদপ্রান্ত পর্যন্ত প্রায়ই সকাল সন্ধ্যায় ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইবার সময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মোহে আবিষ্ট হইয়া উঠিতাম। আজও পূর্ব-পশ্চিম ব্যাপিয়া ধনুর মত অর্ধবৃত্তাকারে উত্তরে দিগ্বলয় ঘিরিয়া গারো পাহাড় ঘনশ্যাম বনে ঢাকা তেমনই দাঁড়াইয়া আছে; দূরে নীল পাহাড়ের আকাশ-ছোঁয়া সুবিন্যস্ত শ্রেণী, মধ্যে রজত শুভ্র নদী উচ্ছল কলতানে লীলারঙ্গে তেমনই চলিয়া আসিতেছে—স্নিগ্ধরূপ! প্রাতে ও সন্ধ্যায় নানা বর্ণচ্ছটায় আকাশ, জল, পাহাড়ের রূপমাধুরীর স্পর্শে চিত্ত অপার্থিব অনুভূতিতে ভারাক্রান্ত হয়। কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়, এ সৌন্দর্য যেদিন প্রাণে সাড়া দিবে না সেদিন যেন দেহে প্রাণের স্পন্দন লোপ পায়। "So be it when I shall grow old, or let me die!"

সোমেশ্বরী পর্বত-দুহিতা, তাহার প্রকৃতি অনেকটা আদরিণী বাঙ্গালী মেয়ের মত—একেবারে ভাবপ্রবণ! পাহাড়ের আবহাওয়ায় তার তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া হয়। পাহাড়ে একটু বর্ষা হইলেই নদীর দুই কূল ভাসিয়া যায়, তার দুর্নিবার উচ্ছলিত উদ্দামতায় আশে পাশের সমতটে বিপর্যয় ঘটে, পাহাড়ের বর্ষণও ফুরায়, নদীও শান্ত ভাব ধারণ করে; তখন মিশ্রির দানার মত চর ভাসিয়া উঠে, বালির তট ঘিরিয়া স্নিগ্ধ কুলুনাদে লীলাভঙ্গে নাচিয়া খেলিয়া নদীর জল বহিয়া যায়।

যতদূর মনে হয়, তখন জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সময়। নদীর ঘাটে ঘাটে দুই একটা কোঁদা নৌকা (dugout) বাঁধা আছে। কোথাও বা বাঁশের অথবা কাঠের 'চাপ' (অর্থাৎ ভেলা) বাঁধা আছে। ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়ার সময় এক সন্ধ্যায় মাঝ নদীতে একটা চরের ধারে কয়েকটা Curlew (স্থানীয় ভাষায় "চৌরস"—এক-প্রকার সুখাদ্য পক্ষী) ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখিলাম। আজ মনে হইতেছে, তখন নিছক শিকারীর দৃষ্টি লইয়া না দেখিয়া জ্ঞান পিপাসা লইয়া দেখিলে হয়ত ইহাদের স্বচ্ছন্দ বিহারের ভিতরই নানা প্রয়োজনীয় তথ্যের আভাস পাইতাম। শিকার করার পূর্ণ আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সেইদিন সঙ্গে বন্দুক না থাকায় শিকারীর রক্ত-পিপাসা অতৃপ্ত রহিল।

এখানে সেই বালুর চর ও তার আবেষ্টনীর একটা বিবরণ দেওয়ার আবশ্যকতা বোধ করিতেছি। পাহাড়তলী হইতে এই স্থানটি প্রায় দেড় কিম্বা দুই মাইল দক্ষিণে। আমি যেখানে ঘোড়া লইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম সেটা নদীর পূর্ব পার, এখান হইতে নদীর অপর তীর প্রায় আধ মাইল বিস্তৃত। পশ্চিম তীরে একটি গ্রাম, গ্রামের উত্তরেই একটি পত্রবিরল প্রকাণ্ড বটগাছ নদীর পারেই একটা উন্মুক্ত স্থানে মৌনী সন্ন্যাসীর মত দাঁড়াইয়া আছে। পরদিন যখন বন্দুক লইয়া নদীর ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তখন সান্ধ্য-সূর্য রক্তিমাভ হইয়াছে, অস্তরাগের শেষ মহিমা প্রচার করিয়া সূর্যদেব মেঘাবরণে অস্ত-গমনোন্মুখ, আকাশের মেঘ রক্তবহুল কিরণচ্ছটায় রঞ্জিত হইয়া এক অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়াছে, তার আভামণ্ডিত পর্বত-শ্রেণীর কি মোহনরূপই না ফুটিয়া উঠিয়াছে। বটগাছটির প্রচ্ছদপটে এক খণ্ড বিরাট কালো মেঘের মাথায় সূর্যকিরণ পতিত হইয়াছে, মেঘখণ্ড পাহাড়ের গায়ে যেন ঠেকিয়া আছে।

চারিটি পাখী আজিও সেই বালির চরে ঘুরিতেছে। জলের উপর সূর্যের রক্তকিরণ পতিত হওয়ায় সব লাল হইয়া গিয়াছে। এই মোহন আবহাওয়ার প্রভাবেও মন শান্ত হয় নাই, রক্ত-পিপাসায় মনের মধ্যে তাণ্ডব চলিয়াছে। আহারের অযোগ্য কোনও পক্ষী মারিবার জন্য মন নিশ্চয়ই এ ভাবে উন্মত্ত না হইয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের শান্ত প্রভাবে প্রভাবিত হইত। শিকারের উন্মাদনার পিছনে কি স্বার্থবুদ্ধি জড়িত হওয়াতেই হত্যার গ্লানিও উপেক্ষিত হয়? এই ব্যাপারে অবচেতন স্তরে কোন্ বৃত্তি সক্রিয় হয় তাহা মনস্তাত্ত্বিকের বিচার্য।

একটা কোন্দা নৌকায় জল পার হইয়া অতি সন্তর্পণে চরে নামিলাম। ধীরে অতি ধীরে গুপ্ত ঘাতকের মত অগ্রসর হইতেছি। তখনও পাখীর মধ্যে আসন্ন বিপদের কোনও আভাস মাত্র প্রকাশ পায় নাই। আমার অসতর্ক মুহূর্তে নিশান করিবার সময় বন্দুকটা কিছু বেশী নড়ানর ফলে একটা পাখীর দৃষ্টি সন্দিগ্ধ ভাবে আমার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তখনই আশঙ্কায় সে দ্রুত নদীর কিনারায় তটভূমি ধরিয়া পলায়নপর হয়, সঙ্গীরাও তাহার অনুসরণ করিল। কালবিলম্ব করা শিকারীর অনুচিত বোধে গুলী করিলাম, ধোঁয়া সরিয়া গেলে দেখিলাম দুইটি পাখী উড়িয়া যাইতেছে—একটি অদ্ভুত শব্দ করিয়া আহত পাখীর উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতেছে। আহত একটি পাখী তখনও তটভূমিতে ছটফট করিতেছে। আহত পাখীটিকে দৌড়াইয়া ধরিতে গেলাম, কিন্তু নিকটে যাওয়ার আগেই আঘাতের প্রথম চোট সামলাইয়া পাখীটা এক পা, দুই পা করিয়া হাঁটিয়া চলিল; ক্রমশ বেশ দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। তাহার একটা ডানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—উড়িবার শক্তি নাই। বন্দুক ফেলিয়া পলায়নপর পাখীর পিছনে ছুটিলাম, কিন্তু

কিছুতেই তাহাকে ধরিতে পারিতেছি না। এই অবস্থায় কখন যে সন্ধ্যার অন্ধকার সমস্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, তাহার খেয়াল আমার ছিল না; ফলে পাখীটাকে ধরা সম্ভবপর হইল না। এই ভাবে হতোদ্যম হইয়া যখন বন্দুক কাঁধে করিয়া ফিরিতেছি, তখন শুনিতে পাইলাম একটা curlewর তীব্র ডাক। বুঝিলাম সে তখনও অন্ধকারে সংগীকে ডাকিতেছে। সান্ধ্য-বাতাসে শিকারের উত্তেজনা চলিয়া গিয়াছে, তাই পাখীর ডাক তখন মর্মস্পর্শী করুণ আর্তনাদের মত বোধ হইয়া চিত্ত ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজিও যখন সেই দিনের স্মৃতি মনে জাগে তখন অন্তর কেমন বিহ্বল হইয়া উঠে।

এইখানে কাহিনীটি শেষ হইলে অনেক প্রশ্নই উঠিত না। ইহার পরদিন পুনঃ মোহগ্রস্তের মতই নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম। সঙ্গে বন্দুক ছিল না, শিকারীর উন্মাদনার পরিবর্তে গত সন্ধ্যার স্মৃতির বেদনায় চিত্ত অবসন্ন ছিল। পশ্চিমাকাশে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য তেমনই বর্ণজাল ছড়াইয়া দিগ্বলয়ে ডুবিয়া যাইতেছিল, পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে রং বেরং ও আলোছায়ার খেলা—নদীর ভিতর দিয়া কোন আপন-ভোলা মাঝি নৌকায় পাল তুলিয়া গান গাহিয়া চলিয়াছে, বটগাছটা তেমনই মহাশূন্যে হাত মেলিয়া নির্বাক দাঁড়াইয়া আছে—শান্ত, স্নিগ্ধ আবেষ্টনী। সহসা বহুদূর হইতে বাতাসে ভাসিয়া আসিল curlewর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। মন অস্থির হইয়া উঠিল। দিনশেষে বিয়োগ-ব্যথাতুর পক্ষীর ক্রন্দনের সমাবেশ বিচিত্র বোধ হইল। বাতাসে শব্দ ক্রমশ স্পষ্টতর হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে বটগাছের দিক হইতে উড়িয়া আসা curlewর ছায়া-মূর্তি ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া দেখা দিতে লাগিল। সঙ্গিহীন একটি মাত্র পাখী, উড়িয়া আসিতেছে, মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ণ মর্মভেদী শব্দ। পাখীটা উড়িতে উড়িতে, গত সন্ধ্যায় যেখানে সংগী আহত হইয়াছিল, অবিকল সেই স্থানের উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া ঘুরিতে লাগিল—মধ্যে মধ্যেই ক্রন্দনের শব্দ—দুই একবার সেই স্থানে বসিবার চেষ্টা করিয়া, বুঝি বা বিফল মনোরথ হইয়াই, ডাকিতে ডাকিতে পূর্বাকাশে মিলাইয়া গেল। কিন্তু বহুক্ষণ বাতাসে তাহার যে শব্দ ভাসিয়া আসিয়াছে, তাহা তাহার ব্যথাভারাক্রান্ত ক্রন্দনের মতই বোধ হইতেছিল।

ইহার পর প্রতি সন্ধ্যায় কিসের অলঙ্ঘ্য আকর্ষণে ঘটনাস্থলে আমাকে টানিয়া লইয়া যাইত। প্রত্যহই সেই একলা পাখী একই ভাবে, একই সময়ে পশ্চিম হইতে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করিতে করিতে উড়িয়া পূবের দিকে চলিয়া যাইত। এই ঘটনার স্মৃতি চিত্তকে নানা ভাবে বহুদিন আলোড়িত করিয়াছে। বয়োধর্মে ব্যক্তিগত অনুভূতির দিকই প্রথমে প্রবল ছিল, কিন্তু কালক্রমে এই বিষয়ে নানা প্রশ্নের উদয় হইয়াছে।

বিজ্ঞানীর অনুসন্ধিৎসা তখন মনে জাগে নাই, সুতরাং এই প্রবন্ধে উল্লিখিত তথ্য হইতে বিশেষ জ্ঞানী কোনও তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে পারিবেন কি না জানি না। তবে এই ঘটনায় যে সব প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১। পাখীর যদি স্মৃতির উৎপাত নাই থাকে, তবে ক্রমান্বয়ে অন্ততঃ ৫।৬ দিন পর্যন্ত একক পক্ষীর এইভাবে সেই স্থানে আসিবার অর্থ কি? যদি কেবলমাত্র অভ্যাসের বশবর্তিতাই একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে আর দুইটি পাখীও কেন আসিল না?

২। এই সময়টা অনেক পাখীরই mating season; curlew সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ; তথাপি মনে হয়, ইহা কি ইতর প্রাণী জগতের যৌনবৃত্তির আকর্ষণের একটা দৃষ্টান্ত?

তত্ত্বদর্শীর বিচারে যাহাই স্থির হউক না না কেন, অন্তর বলিতে চায়, প্রেমের বন্ধন বোধ হয় পক্ষী জীবনেও ক্ষেত্র-বিশেষে সাধারণ সীমারেখা অতিক্রম করে।

হরিণের স্নেহ

প্রায় চল্লিশ বৎসর হইয়া গিয়াছে, —সুসঙ্গের চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্যের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তখন এখানে কত হাতী দেখিয়াছি ২।৩ মাইলের ভিতর গভীর অরণ্যানী দেখিয়াছি। এখন হাতী ক্বচিৎ দেখি, বনানীও লুপ্তপ্রায়। যখন তখন হাতী চড়িয়া শিকারে যাওয়া পরিবারের সমর্থ ব্যক্তিদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। হাতীতে হাওদা ব্যবহার করা হইত না, কারণ দেওয়া হইত, খাঁচায় বসিয়া শিকার মেয়েদের পক্ষেই শোভন। হাতীর গদিতে চড়িবার ভঙ্গীর কথা মনে আছে, হাতীকে বসাইয়া কেমন অবলীলাক্রমে প্রৌঢ়রাও লম্ফপ্রদান করিয়া গদিতে উঠিতেন। সমস্ত ব্যাপার পুরুষোচিত সামর্থ্যের পরিচায়ক ছিল। ইদানীং হাতী চড়িতে স্ত্রী পুরুষ সকলেই সিঁড়ি (ladder) ব্যবহার করেন। পূর্বস্মৃতির প্রেরণায় কেহ দৈবাৎ লাফাইয়া হাতীতে উঠিতে গেলে তাঁহার বিড়ম্বনার এক শেষ হয়। তখনকার দিনে বড়দের কোমরে চাদর বাঁধা থাকিত, বালকগণ তাহাই ধরিয়া বসিয়া থাকিত।

আমি......কাকার কোমরে বাঁধা চাদর ধরিয়া শিকারে চলিয়াছি। হাতীতে শ্বেত ছত্রধারী এক ভৃত্য। ভৃত্য ও কাকার মাঝখানে আমি আছি। শিকারী কাকা একাই, সঙ্গে ১০।১২টি হাতী। দুর্গাপুর (সুসঙ্গের অপর নাম) হইতে প্রায় পাঁচ মাইল পূর্বে রাজনগর (রঘুনাথপুর) নামক জঙ্গলের দিকে শিকার হইবে। কোন্ দিক দিয়া কিভাবে গিয়াছি, অনেক দিনের কথা, ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু বেশ মনে আছে, কোথাও জঙ্গলের মাঝে দুই একটা ছোট গ্রাম ভিন্ন আর সবই বনে ঢাকা। 'কাঁচর' মহিষের (অর্থাৎ cross bred between wild bulls and half bred cows) বাথান এবং হাতীর পিলখানা বিলের ধারে জঙ্গলের নিকট ২।১টা দেখিয়াছি। উত্তরের নিবিড় বনে ঢাকা বাঁকা পাহাড়ের শ্রেণী আজিও তেমনই দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু সেই জঙ্গল, মহিষের বাথান এবং হাতীর পিলখানা এখন দেখা যায় না। খাল-বিলগুলিরও বহু রূপান্তর হইয়াছে।

শিকার ভূমিতে আসিয়া হাতীর শ্রেণী পাহাড়মুখী হইয়া অর্ধ বৃত্তাকারে জঙ্গল ভাঙিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। মাঝখানে শিকারীর হাতী। আবছা স্মৃতিতে মনে পড়ে, সেদিনকার শিকারের জঙ্গল কাশ বন, খুব বেশী উঁচু নয়, একটা হাতী হইতে অপর হাতী স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। হাতীগুলি সর্বদা কান ও লেজ নামাইয়া শুঁড় দিয়া ঘাস টানিয়া খাইতে খাইতে পট্ পট্ শব্দে জঙ্গল ভাঙিয়া অগ্রসর হইতেছে, মধ্যে মধ্যে শুঁড় তুলিয়া 'বকরা টানিতেছে' (অর্থাৎ আঘ্রাণ লইতেছে)। কখনও কাদা জল পাইলে শুঁড় দিয়া টানিয়া লইয়া গায়ে ছিটাইতেছে, কখনও বা মুখবিবরে শুঁড় ঢুকাইয়া ঘাম টানিয়া শরীরে ছিটাইয়া দিতেছে। মাহুতগণ প্রায় সময়ই "মাইল", 'দেলেমারু', 'বরি' প্রভৃতি শব্দে হাতীর আবশ্যক কর্তব্যের প্রতি অবহিত হইতে নির্দেশ করিতে করিতে চলিয়াছে। হঠাৎ আমাদের হাতীটা শুঁড় গুটাইয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া মাটিতে আঘাত করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ কর্ণযুগল বিস্ফারিত করিয়া মাথা উঁচু করিয়া টানিয়া সচকিত ক্ষিপ্রতায় অগ্রসর হইয়া চলিল। মুহূর্তে সকলে প্রস্তুত হইয়া উঠিল। কাকার নির্দেশক্রমে সম্মুখে জঙ্গলের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম জোরে হাওয়া খেলিয়া গেলে যেমন বনের উপর ঢেউ খেলিয়া যায়, সম্মুখে বনের খানিকটা জায়গায় সর্পিল গতিতে ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে; একটু দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেই দেখি, পাখীর মত ক্ষিপ্রগতিতে পলায়মানা এক হরিণী লাফাইয়া লাফাইয়া চলিয়াছে। শুনিলাম ইহা একটি 'বারশিঙ্গা' জাতীয় হরিণী। হরিদ্রাভ বাদামী রং, শির-দাঁড়ায় কালোয় সাদায় ফুটি এবং গায়ে অস্পষ্ট সাদা ফুটি, প্রায় একটা ছোট

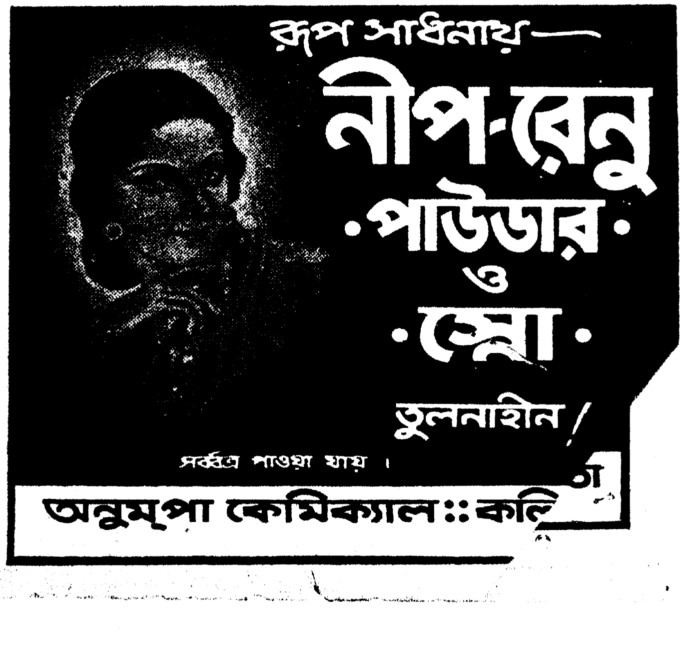
ঘোড়ার মত আকার হইবে। কি ক্ষিপ্রগতি, কি সাবলীল সচলতা।

তড়িৎ প্রবাহের মত সমস্ত হাতী ও হাতীর মাহুতের মধ্যে একটা উন্মাদনার সাড়া পড়িয়া গেল। সমস্ত হাতী বেগে চলিল, শিকারী ও মাহুতে সমস্তেই এক দৃষ্টিতে হরিণীর গতি অনুসরণ করিতে লাগিল। হরিণী প্রায় একশত গজ একটানা দৌড়াইয়া পুনঃ অভিরাম গ্রীবা ভঙ্গিমায় কাণ দুইটা ইতস্তত নড়াইতে নড়াইতে, আমাদের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। কেবল তাহাই নহে, ঘোড়ার 'দুলকি' দৌড়ের মত ধীরে ধীরে ক্রমশ হাতীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এইভাবে আসিতে আসিতে প্রায় ত্রিশ গজ দূরে আসিয়া একেবারে নিশ্চল হইয়া, গলা টানিয়া দাঁড়াইয়া রহিল হাতীর দিকে অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া। সম্মুখে বিপদ, ইহা কি তাহার পশুবুদ্ধি নির্দেশ করিয়া দেয় নাই? কাকা বন্দুক নামাইয়া লইলেন, বলিলেন, "এটাকে শিকার করিব না, নিশ্চয় এর বাচ্চা, হাতীর lineএর পিছনে রহিয়া গিয়াছে। অজ তোমাকে একটা মজা দেখাইব।"

হাতীগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে যথারীতি আগাইয়াই চলিয়াছে, একটি হস্তী হইতে অপর হস্তীর ব্যবধান কুড়ি হাত মাত্র হইবে। এইভাবে হরিণীর খুব নিকটবর্তী হওয়ায় সে পুনরায় সম্মুখে কতকদূরে দৌড়াইয়া গিয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল, ধীরে ধীরে হাতীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এইরূপে দুই তিনবার করার পর একবার প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটিয়া হাতীর ব্যূহভেদ করিয়া পিছনে, যেখানে তাহাকে প্রথম দেখা গিয়াছিল, সেইখানে চলিয়া গেল।

হাতীর শ্রেণীর মুখ ঘুরাইয়া হরিণীর দিকে অগ্রসর হইবার আদেশ হইল। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই দেখা গেল মাতা শাবকসহ বড় জঙ্গলের দিকে লাফাইয়া লাফাইয়া ছুটিয়া পালাইতেছে। এবার আর ফিরিয়া দাঁড়ায় না—কিন্তু দৌড়াইতে দৌড়াইতেও অপূর্ব ভীতি-চকিত দৃষ্টিতে শিকারীর দিকে সেই তাকান ভুলিবার নয়। ছোট জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইবার সময় ফাঁকে ফাঁকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাতা ও শাবকের ভয়ত্রস্ত পলায়নের সেই দৃশ্য মানসপটে ছবির মত আঁকা হইয়া আছে। এই ছবি কালপ্রভাবে আজিও অম্লান আছে।

কেন হরিণী আপন জীবন বিপন্ন করিয়াও এভাবে সন্তানের সহিত মিলিত হইল, এই চিন্তা করিতে গিয়া কোনও মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি নাই। প্রাণের মায়াই যদি মনুষ্যেতর প্রাণী-জগতে প্রধানতম বৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চিত মৃত্যুভয় উপেক্ষা করিয়া সন্তানের প্রতি এই আকর্ষণ অতি বিচিত্র মনে হয়।" কেহ হয়ত বলিবেন ইহা Instinct of preservation of speciesএর একটা দৃষ্টান্ত। এই ক্ষেত্রেও বলিব, বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে যাহাই কেন না ধরা পড়ুক, আমাদের অন্তর বলিতে চাহিবে বিশ্ব-জননীর সৃষ্টিপালনী লীলার ইহাও একটা প্রকাশ। হয়ত ইহাও মায়ামুগ্ধ চিত্তের ভ্রম!—তাহাই কি?



বাংলায় বস্ত্র-সঙ্কট

বাঙলা দেশের সর্বত্র কাপড়ের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। কাপড়ের অভাবে কোন কোন স্থানে লজ্জা নিবারণ করা সম্ভব হইতেছে না বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গত ৫ই মার্চ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্যসচিব স্যার আজিজুল হক বলেন যে, বাঙলায় লজ্জা নিবারণের বস্ত্র না পাইয়া স্ত্রীলোকের আত্মহত্যার সংবাদ তিনি অবগত আছেন।

কলিকাতা

কলিকাতায় কাপড়ের অভাবের দরুণ যে শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা অবর্ণনীয়। সহরের যে সকল দোকানে কণ্ট্রোলের কাপড় বিক্রয় করা হইতেছে, সেই সকল দোকানের সম্মুখে প্রত্যহ বস্ত্রক্রয়েচ্ছু নরনারীর বিরাট সমাবেশ দেখা যাইতেছে। হাজার হাজার নরনারী ঘণ্টার পর ঘণ্টা কণ্ট্রোলের দোকানের সম্মুখে সুদীর্ঘ লাইনে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাপড় ক্রয় করিতেছে এবং কাপড় না পাইয়া অধিকাংশ লোককেই হতাশ হইয়া ফিরিতে হইতেছে। এই নিদারুণ বস্ত্রসংকটে ইতিকর্তব্য নির্ধারণকল্পে গত ১০ই মার্চ কলিকাতায় "নিখিল বঙ্গ বস্ত্রসংকট দিবস" প্রতিপালিত হয়। এই উপলক্ষে কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রায় ১০।১২ হাজার নরনারীর এক বিরাট জনসভা হয়। কাপড়ের দারুণ সংকটের উল্লেখ করিয়া একজন বক্তা বলেন যে, কোন অঞ্চলে কাপড়ের অভাবে স্ত্রীলোকেরা সংবাদ-পত্রের কাগজ ব্যবহার করিতেছে। বস্ত্রসংকটের প্রতিকার দাবী করিয়া সভায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বাঁকুড়া

বাঁকুড়া, ২৮শে ফেব্রুয়ারী—বাঁকুড়া জেলায় কাপড় দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। রাজগ্রামে একটি অনাথ ছেলে শ্মশান হইতে মৃতের কাপড় লইয়া গায়ে জড়াইয়া রাখে। সকলের, বিশেষ করিয়া মেয়েদের লজ্জার হাত হইতে বাঁচা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

বিষ্ণুপুর, ৩রা মার্চ—বিষ্ণুপুর মহকুমায় বস্ত্রের দুষ্প্রাপ্যতা লাঘবের কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথও মিলিতেছে না। বহু লোক বস্ত্রাভাবে বিবাহোৎসব স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইতেছে।

পাত্রসায়ের, ২৮শে ফেব্রুয়ারী—বস্ত্রাভাবের দরুণ এই থানার কয়েকস্থানে চট পরিধান করার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

দিনাজপুর

দিনাজপুর, ৫ই মার্চ—এই শহরে ও গ্রামাঞ্চলে বস্ত্রাভাব অত্যন্ত তীব্র হইয়াছে। বস্ত্রাভাবে গরীব ও মধ্যবিত্ত নরনারীর পক্ষে লজ্জা নিবারণ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

পাবনা

পাবনা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী—পাবনা জেলা-ব্যাপী বস্ত্রাভাব তীব্রভাবে দেখা দিয়াছে। কিছু বস্ত্র পৌঁছিয়াছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষের বণ্টনের অব্যবস্থার দরুণ জনসাধারণ কোন বস্ত্রই পাইতেছে না।

সিরাজগঞ্জ, ২রা মার্চ—গত কয়েকমাস হইল মহকুমার সর্বত্র কাপড়ের দারুণ দুর্ভিক্ষ চলিতেছে এবং জনসাধারণের বিষম কষ্ট হইতেছে।

মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর, ২৭শে ফেব্রুয়ারী—বহরমপুর শহরে ভয়ানকভাবে বস্ত্রসংকট দেখা দিয়াছে। পল্লী হইতে যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহা আরও ভয়াবহ। পল্লীর হাট-সমূহে মিল-বস্ত্র মিলে না। অনেকে গৃহে অতি ছিন্ন বস্ত্রে বা অর্ধ-নগ্ন অবস্থায় কোনক্রমে দিনাতিপাত করিতেছে।

জিয়াগঞ্জ, ৩রা মার্চ—জিয়াগঞ্জ ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তথা সমগ্র লালবাগ মহকুমায় বস্ত্রাভাব চরম অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। বিবাহ, শ্রাদ্ধ এমন কি মৃতের সৎকারের জন্য অধিক মূল্য দিয়াও বস্ত্রাদি সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার।

ময়মনসিংহ

টাঙ্গাইল, ২৫শে ফেব্রুয়ারী—সম্প্রতি টাঙ্গাইলে দারুণ বস্ত্রাভাব দেখা দিয়াছে। মাঝে মাঝে যে চালান আসে, তাহা জনসাধারণের চাহিদা পূরণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কাপড়ের দোকানগুলি খালি দেখাইতেছে।

মুক্তাগাছা, ২৫শে ফেব্রুয়ারী—বস্ত্রাভাবের প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনার জন্য অদ্য মুক্তাগাছায় এক বিরাট জনসভা হইয়া গিয়াছে।

সরিষাবাড়ি, ২৮শে ফেব্রুয়ারী—সরিষাবাড়ি বন্দরে এবং পার্শ্ববর্তী বাজারগুলিতে ধুতি ও শাড়ী পাওয়া যায় না। কিন্তু চোরাবাজারে প্রায় দ্বিগুণ মূল্য দিলে গ্রামবাসিগণ দুই-একখানা কাপড় পাইয়া থাকে।

সেরপুর টাউন, ১লা মার্চ—সম্প্রতি এখানে বস্ত্রসংকট চরমে পৌঁছিয়াছে। গত ৫।৬ মাস যাবৎ মিলের কাপড় বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় কিছুই বাজারে পাওয়া যাইতেছে না।

ঢাকা

ঢাকা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী—পলাশ ও নিকটবর্তী গ্রামসমূহের তাঁতিগণ সূতার অভাবে কাপড় বুনিতে না পারিয়া বেকার হইয়া বসিয়া আছে; উহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান নাই। ধুতি-শাড়ী চারিমাস যাবৎ



কলিকাতায় কাপড়ের দোকানের সামনে মেয়েদের ভিড়

বাজারে নাই। বস্ত্রাভাবে স্ত্রীলোকগণ ঘরের বাহিরে আসিতে পারে না।

ঢাকা, ১২ই মার্চ—সূতার অভাবে নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় ১৫০০০ তাঁতের কার্য বন্ধ আছে; ফলে ৭৯০০০ তাঁতি আজ বেকার হইয়া পড়িয়াছে।

বরিশাল

বরিশাল, ২৫শে ফেব্রুয়ারী—বরিশাল শহরে কাপড়ের অভাব চরম আকারে দেখা দিয়াছে। প্রত্যহ টেক্সটাইল কণ্ট্রোলারের অফিসে শত শত লোক টিকিট কিনিবার জন্য ভীড় করিতেছে।

বাখরগঞ্জ জেলার শোলক মেডিক্যাল রিলিফ কেন্দ্রের ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি উত্তর বাখরগঞ্জের পল্লীঅঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, উক্ত অঞ্চলে দারুণ বস্ত্রাভাব উপস্থিত হইয়াছে। তরুণীগণ সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে, এরূপ বীভৎস দৃশ্যও উক্ত অঞ্চলে বিরল নহে।

রংপুর

রংপুর, ২৮শে ফেব্রুয়ারী—এক মাসের ঊর্ধ্বকাল রংপুর টাউনে ১০ গজ ধুতি ও সাড়ী এবং সাদা কাপড়ের বড়ই অভাব দেখা দিয়াছে। স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথও ১০ গজ পাওয়া যাইতেছে না।

ডোমার, ৯ই মার্চ—ডোমার অঞ্চলে দীর্ঘদিন যাবৎ কাপড়ের সংকট তীব্রভাবে জনসাধারণকে পীড়া দিতেছে। বিবাহ, মৃতের সৎকার, শ্রাদ্ধ, এমনকি সাধারণ লজ্জানিবারণও আজ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

বগুড়া

বগুড়া, ১লা মার্চ—বগুড়া শহরে এবং পল্লীঅঞ্চলে বস্ত্রাদি পাওয়া যাইতেছে না।

যশোহর

যশোহর, ২রা মার্চ—যশোহরে বস্ত্রসংকট ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। বস্ত্রসংকটের সমাধানের জন্য গতকল্য গান্ধী পার্কে একটি বিরাট জনসভা হয়।

মেদিনীপুর

মেদিনীপুর, ২৩শে ফেব্রুয়ারী—মেদিনীপুর জেলার শহরগুলিতে এবং মফঃস্বলে কাপড়ের অভাব বিশেষভাবে দেখা দিয়াছে।

নদীয়া

কুষ্টিয়া, ২৬শে ফেব্রুয়ারী—গতকল্য এখানে ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যালের সভাপতিত্বে বস্ত্রসঙ্কট সমাধানকল্পে এক বিরাট জনসভা হইয়া গিয়াছে।

কুমারখালি, ১৬ই মার্চ—কুমারখালি বাজারে কিছুদিন যাবৎ কাপড়ের অভাব ভীষণ মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলাগণ শ্লীলতা এবং লজ্জা নিবারণে নিরুপায় হইয়া বিশেষ প্রয়োজনেও গৃহের বাহির হইতে পারিতেছে না।

বীরভূম

সিউড়ী, ২৮শে ফেব্রুয়ারী—জেলার কোন দোকানেই কোনপ্রকার ধুতি সাড়ী পাওয়া যাইতেছে না। এমন কি স্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ও বাজার হইতে উধাও হইয়াছে।

রামপুরহাট, ২৮শে ফেব্রুয়ারী—কিছুদিন যাবৎ রামপুরহাট অঞ্চলে কোনরূপ কাপড় কিনিতে পাওয়া যাইতেছে না।

রাজসাহী

নাটোর, ২৮শে ফেব্রুয়ারী—নাটোর শহরে ও মফঃস্বলে দারুণ বস্ত্রাভাব দেখা দিয়াছে। স্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় শহরে টিকেট প্রতি বাড়ি-পিছু ১ খানা করিয়া দেওয়া হয়, তাহাও সকলে পায় না।

খুলনা

সাতক্ষীরা, ৭ই মার্চ—সাতক্ষীরা সহরে দারুণ কাপড়ের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। কোন কাপড়ের দোকানে মিলের কাপড় পাওয়ার উপায় নাই। গবর্ণমেণ্ট হইতে পারমিট দিয়া যে স্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় দেওয়া হইতেছে, অভাব ও প্রয়োজনের তুলনায় এত নগণ্য যে তাহা উল্লেখ না করিলেও চলে।

বীরভূম

বোলপুর, ৮ই মার্চ—বোলপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে রকমভাবে কাপড়ের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, এইপ্রকার কিছুদিন চলিলে লজ্জা-নিবারণ করা দুঃসহ হইয়া উঠিবে।

জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি, ৯ই মার্চ—জলপাইগুড়িতে কাপড়ের অভাব গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। জেলার পল্লীঅঞ্চলের সংবাদে প্রকাশ, মৃতদেহ সৎকারের জন্য অত্যাবশ্যক যে-কোন প্রকারের নূতন বস্ত্রের অভাবে বিনাবস্ত্রে এবং পুরাতন বস্ত্রে কার্য সমাধা করিতে হইতেছে। পরিধেয় বস্ত্রের অভাবের ত কথাই নাই।

মালদহ

মালদহ, ১১ই মার্চ—বস্ত্র-সঙ্কট দিন দিন গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। সহরের বাজারে মিলের ধুতি, শাড়ি পাওয়া একরকম অসম্ভব, মফঃস্বলের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

ত্রিপুরা

হাজিগঞ্জ, ১০ই মার্চ—বর্তমানে হাজিগঞ্জ বাজারে বস্ত্রের অভাব ভীষণ হইতে ভীষণতর অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাজারে মিলের কোন ধুতি বা শাড়ি পাওয়া যাইতেছে না।

২৪ পরগণা

নৈহাটি, ৫ই মার্চ—শহর ও শহরতলীর গ্রামাঞ্চলে বস্ত্রের অভাব গত বৎসরের অন্ন-সঙ্কটের মত ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। বস্ত্রাভাবে কুলবধূ ও কন্যাদের মর্যাদারক্ষা দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ধমান

কাটোয়া, ৫ই মার্চ—লোকে বস্ত্রাভাবে বাহির হইতে পারিতেছে না। মিলের ধুতিও নাই, শাড়ি ত' বহুপূর্ব হইতেই পাওয়া যাইতেছে না। এমনকি বিবাহাদিতে ও শ্রাদ্ধাদিতেও ঠিকমত বস্ত্র পাওয়া যাইতেছে না।



কন্ট্রোলের কাপড়ের দোকানের সম্মুখে পুরুষদের সমাবেশ



চিত্রজগতে সময়ে সময়ে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এমনি অদ্ভুত মনোবৃত্তির পরিচয় দেন যা সমগ্র শিল্পটাকেই লোকের নজরে ছোট খেলো করে তোলে। এর একটা তাজা উদাহরণ হ'চ্ছে 'অভিনয় নয়' ছবিখানির পরিবেশক-প্রদর্শক-প্রযোজকরা। ব্যাপার হ'চ্ছে, 'অভিনয় নয়' ছবিতে পতিতালয়ে হুল্লোড়ের বেশ খানিকটা দৃশ্য থাকায় বাজারে ছবিখানির দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে এই বলে যে, পরিবারের সবায়ের সঙ্গে বসে ছবিখানি দেখা যায় না। সমালোচক ও সাংবাদিকরা এই দৃশ্যকে কি চোখে দেখতেন বলতে পারি না, কিন্তু কর্তৃপক্ষ—এ ক্ষেত্রে ছবির পরিবেশক, প্রদর্শক ও প্রযোজক তিন পক্ষই এই স্থির নির্ণয়ে উপনীত হন যে, সাংবাদিক ও সমালোচকেরা ঐ দৃশ্যটিকে কিছুতেই বরদাস্ত করবে না, তার বিরুদ্ধে গালাগালি করবেই। সুতরাং তাঁরা সাংবাদিকদের যখন ৬ই মার্চ বেলা আড়াইটার সময় প্রদর্শনীতে নিমন্ত্রণ করেন, তখন ঐ দৃশ্যটিকে বাদ দিয়েই ছবিখানি দেখানো সাব্যস্ত করেন। কর্তৃপক্ষের একজন অবশ্য সমালোচকদের কাছে স্বীকার করেন যে, পতিতালয়ের একটি প্রসঙ্গ যা লম্বায় প্রায় পাঁচশো ফিট ছিল, তা দর্শকদের মনঃপূত না হওয়ায় তাঁরা বাদ দিয়েছেন, এবং এতদ্ব্যতীত তিনি বলেন যে, ঐ দৃশ্যটার জন্যে মহিলা শ্রেণীতে আগে লোক হ'চ্ছিল না, এখন বাদ দেওয়াতে মহিলারাও ভীড় করতে আরম্ভ করেছেন। ঐ ব্যক্তির বলার ঢঙে সমালোচকরা ধরে নিলেন যে, ছবিখানি মুক্তিলাভের পর লোকে আপত্তি করা মাত্রই তাঁরা দৃশ্যটি বাদ দিয়েছেন। আসল কথা কিন্তু ঐ প্রসঙ্গটি বাদ দেওয়া হয়েছিল শুধু সাংবাদিকদের দেখাবার বেলাতেই এবং ঠিক তার পরের প্রদর্শনীতে আবার তা জুড়ে দেওয়া হয়; আজও তা দেখানো হচ্ছে। আমরা অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, 'অভিনয় নয়'এর ঐ তিন পক্ষ এই ধাপ্পাটা কাকে দিলেন আসলে এবং দেবার দরকারই বা দেখলেন কোথায়? একটা বিষয় তো স্পষ্টই তাঁরা ধরিয়ে দিলেন যে, ছবির ঐ প্রসঙ্গটি এতই জঘন্য জিনিস যা দর্শকদের সামনে লুকিয়ে না হলে বের করা যায় না (চৌরঙ্গী অঞ্চলে Paris picture বিক্রীর মত আর কি!)। তাই এ কথা ধরে নিতেই হয় যে, কর্তৃপক্ষ জানতেন ঐ দৃশ্যটি জনগণের মনে ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে আসবে; নইতো সমালোচকদের কাছে বাদ দেবার কি মানে হয়? এবং নিষিদ্ধ, বিশেষ করে নীতি বিগর্হিত জিনিষের ওপর মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির সুযোগ নিয়ে দু'পয়সা কামিয়ে নেওয়াই যে বর্তমান ছবির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিন পক্ষের নীতি সেটা তাঁরা খোলাখুলিভাবেই বলে দিয়ে গেলেন। সবায়ের কথা বাদ দিয়ে আমরা পরিচালক শৈলজানন্দকেই প্রশ্ন করছি, প্রগতিশীল লেখক সঙ্ঘের (ফ্যাসি-বিরোধী লেখকদের নামান্তর) সভাপতিরও কি এই নীতি? হ'লে উত্তম, সে ক্ষেত্রে প্রগতিশীল (!) লেখকদের প্রগতিমূলক চিন্তাধারার স্পষ্ট ছবি একখানা পাওয়া যায় তাহ'লে।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

প্রভাত ফিল্মসের 'চাঁদ' এই সপ্তাহে সেন্ট্রালে মুক্তিলাভ করেছে। এর প্রধান ভূমিকায় আছেন বেগম পারা, সিতারা আর প্রেম অদীব। এ সপ্তাহের অপর মুক্তি হচ্ছে নিউ সিনেমা ও গণেশে ন্যাশন্যাল পিকচার্সের 'যওয়ানী', যার ভূমিকায় আছেন সুরেন্দ্র, হাস্ন বানু ও জ্যোতি।

আসছে সপ্তাহে প্যারাডাইস, দীপক, উত্তরা ও আলেয়াতে একযোগে কারদার প্রডাকসন্সের সামাজিক চিত্র 'জীবন' মুক্তিলাভ করবে। এর ভূমিকায় আছেন মেহতাব, ওয়াস্তী, নির্মলা, আনোয়ার; সফিয়া, রাজকুমারী শুক্লা ও বদরীপ্রসাদ।

বিবিধ

নিউ টকীজের হ'য়ে বড়ুয়া 'পহচান' নামে হিন্দী ছবিখানি তুলছেন তার নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে অশোককুমার বম্বে থেকে এসে পড়লে আশ্চর্য হবেন না যেন। নায়িকার ভূমিকায় অবশ্য যমুনাই থাকবেন। ছবিখানির ভারতীয় স্বত্ব ইতিমধ্যেই আহমেদাবাদের মিঃ মিস্ত্রী কিনে নিয়েছেন।

* * *

'তকরার'এর পর আর্ট ফিল্মসের পরবর্তী ছবিখানি পরিচালনা করার ভার পেয়েছেন হীরেন বসু। তাঁরই লেখা কাহিনী এই ছবিখানির নাম হয়েছে 'কাজরী'।

* * *

পাঞ্চোলি পিকচার্সের তিনখানি ছবি—শিরী ফরহাদ, কৈসে কহুঁ ও আর একখানি মোট ৩৬ লাখ টাকায় বিক্রী হয়েছে, আর প্রভাত ফিল্মসের তিনখানি ছবি চাঁদ, লাখারাণী ও 'হাম এক হায়' বিক্রী হয়েছে ৩৫ লাখে।

* * *

এবারে প্রযোজক হবার পালা দুর্গা খোটের। বর্তমান স্বামী রসিদের সহযোগীতায় পরোলোকগত স্বামীর সঙ্গে একত্রে স্থাপিত নটরাজ সিনেটোনকে আবার খাড়া করার চেষ্টা করছেন। ছবির লাইসেন্সের জন্যে দরখাস্ত পাঠানো হয়েছে এবং এদের এই প্রচেষ্টার পিছনে রয়েছেন হিন্দুস্থান চিত্রের মালিক রুসি মিস্ত্রী।

* * * *

মধু বোস, শোনা গেল, আই এফ আই'র কাজে ইস্তফা দিয়ে স্বাধীনভাবে চিত্র-প্রযোজনায় রত হয়েছেন।

* * *

বম্বাই চিত্রে বাইজী চরিত্রের খ্যাতনামা অভিনেত্রী বৎসলা কুমটেকর গত সপ্তাহে পরলোকগমন করেছেন। কিছুদিন ধরেই তিনি হৃদরোগে ভুগছিলেন। প্রথমে গ্রামোফোন ও রেডিও মারফৎ তিনি গায়িকা হিসেবে নাম করেন, তারপর ছবিতে তাঁর খ্যাতি বেড়ে যায়। অসুস্থ সত্ত্বেও তিনি বম্বের অন্তর্বর্তী এক গ্রামে জলসাতে যান এবং সেখানে পানাহার মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অল্পকালের মধ্যেই মারা যান। অবস্থা এমনি হয় যে, শবদাহের লোক পর্যন্ত অভাব হয়—শেষে কোন এক থিয়েটার দল সৎকার করে।

* * *

সেন্ট্রাল সিনে কর্পোরেশন নামে বম্বেতে কাঁচা ফিল্ম তৈরীর একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এদের মূলধন এক কোটি টাকা, তার কর্ণধাররা হচ্ছেন এম বি বিলিমোরিয়া, অম্বালাল প্যাটেল এবং আরও জনকয়েক ব্যবসাদার।

* * *

প্রযোজক-পরিচালক জহুর রাজা তাঁর পরবর্তী ছবি 'ক্লিওপেট্রা'র নাম ভূমিকায় অভিনয় করার উপযোগী যে কোন সুন্দরীকে ত্রিশ হাজার টাকা দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

* * *

গলা ধার দিয়ে 'খাজাঞ্চী', 'খানদান' প্রভৃতি পাঞ্চোলি পিকচার্সের ছবিগুলিকে যে গায়িকা সফল করে তোলেন সেই শামসাদ বেগম এখন বম্বেতে। সম্প্রতি 'চল চলরে নও জোয়ান'এ গলা ধার দিয়েছেন। এখন তাঁর দর গান পিছু হাজার টাকা, আর কমপক্ষে তিনখানি গানের কড়ার।

* * *

সেন্ট্রাল স্টুডিওর আলোক চিত্রশিল্পী রজনীকান্ত পাণ্ডে ও তস্য ভ্রাতা শব্দ যন্ত্রী চন্দ্রকান্ত পাণ্ডে সিনে-টেকনিসিয়ান এসোসিয়েশনকে আবার জাগিয়ে তোলার মানসে একটি চিত্র-প্রক্ষেপণ গৃহ নির্মাণ করেছেন, সেখানে অসাধারণ কৃতিত্বসম্পন্ন ছবিগুলি কলাকুশলীদের দেখানো হবে।



ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট দলের সিংহল যাত্রার প্রাক্কালে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি ডাঃ সুব্বারায়ন খুব জোর গলায় বলিয়াছিলেন,—"এই দল সিংহলের সকল খেলায় অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করিবে।" কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেই ভারতীয় দল এই পর্যন্ত সিংহলে যে কয়েকটি ম্যাচ খেলিয়াছে, তাহার একটিতেও অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারে নাই। একমাত্র অমরনাথ ব্যতীত ভারতীয় দলের কেহুই কি ব্যাটিং, কি বোলিং কোন বিষয়ে সিংহলবাসীদের চমৎকৃত করিতে পারেন নাই। কেন এইরূপ ফলাফল হইল, সঠিক বিবরণ না জানিলে বলা কঠিন। যতদূর মনে হয়, ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ সিংহলের জলবায়ুর সহিত নিজেদের মিলাইয়া লইতে পারিতেছেন না। তবে আশা আছে, শেষ খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড়গণ ভাল ফল প্রদর্শন করিবেন। ভারতীয় ক্রিকেট দল এই পর্যন্ত ৩টি খেলায় যোগদান করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটিতে ভারতীয় দল বিজয়ীর সম্মানলাভ করিয়াছে ও অপর দুইটি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে।

(১) প্রথম ভারতীয় ক্রিকেট দলের সহিত সিংহল ক্রিকেট এসোসিয়েশন দলের তিনদিন-ব্যাপী খেলা হয়। এই খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। ভারতীয় দলের অমরনাথ ও বিজয় হাজারীর ব্যাটিং দর্শনযোগ্য হয়। সিংহল ক্রিকেট এসোসিয়েশনের স্পিটেল ব্যাটিং ও বোলিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। স্পিটেল একা ১২৪ রাণ করিতে সক্ষম হন। খেলার ফলাফল:—

ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রথম ইনিংস:—২১৭ রাণ (অমরনাথ ৭৮, বিজয় হাজারী ৭০, জয়বিক্রম ৩২ রাণে ৩টি পিণ্ড ৬৭ রাণে ৩টি ও স্পিটেল ৫৭ রাণে ২টি উইকেট পান)।

সিংহল ক্রিকেট এসোসিয়েশনের প্রথম ইনিংস:—৭ উইঃ ৩৩২ রাণ (জয়বিক্রম ৮০, স্পিটেল ১২৪, ফার্নেন্ডো ৭৩, হাজারী ৬৮ রাণে ১টি উইকেট পান)।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের দ্বিতীয় ইনিংস:—২ উইঃ ১২৭ রাণ (সারভাতে ৪৫ রাণ নট আউট কিষেণচাঁদ ৩১ রাণ)।

(২) দ্বিতীয় খেলায় ভারতীয় ক্রিকেট দলকে সার্ভিসেস দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। খেলাটি দুইদিনব্যাপী হয়। ভারতীয় দল এই খেলায় ৭ উইকেটে জয়লাভ করিয়াছে। এই খেলায় মানকড় ব্যাটিং ও বোলিংয়ে সাফল্য-লাভ করেন। খেলার ফলাফল:—

সার্ভিসেস দলের প্রথম ইনিংস:—১৬৮ রাণ (হেইন ৮৮: মানকড় ১৫ রাণে ৪টি, অমরনাথ ৮ রাণে ২টি, এস ব্যানার্জী ২২ রাণে ২টি ও সি এস নাইডু ৩৭ রাণে ২টি উইকেট পান)।

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস:—২৫২ রাণ (মানকড় ৪৮, আর এস মোদী ৫৬, রঙ্গাচারী নট আউট ৪৫, ডিক্রেস্টা ৭২ রাণে ৬টি উইকেট পান)।

সার্ভিসেস দলের দ্বিতীয় ইনিংস:—৮ উইঃ ১৯৫ রাণ (সোলমন ৩৭ রাণ নট আউট)।

ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস:—৩ উইঃ ১১৮ রাণ (বিজয় মার্চেন্ট ৫৮ রাণ নট আউট)।

(৩) তৃতীয় খেলায় ভারতীয় দলের সহিত সিংহলের সম্মিলিত কলেজ স্কুলের একদিনব্যাপী খেলা হয়। এই খেলায় বিজয় মার্চেন্ট, বিজয় হাজারী ও সি এস নাইডু যোগদান করেন না। অমরনাথ ভারতীয় দলে অধিনায়কত্ব করেন। কলেজ দলের পক্ষে ১৫ জন ব্যাটিং ও ১৫ জন ফিল্ডিং করেন। খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। খেলার ফলাফল:—

সম্মিলিত কলেজ দল:—২১২ রাণ করুণারত্নে ৫৬, ওয়াস ২১; রামসিং ৪২ রাণে ৩টি, মানকড় ৩৮ রাণে ২টি, আর এস মোদী ২২ রাণে ২টি ও কিষেণচাঁদ ১৩ রাণে ২টি উইকেট পান)।

ভারতীয় দল:—৫ উইঃ ১৪৩ রাণ (সারভাতে ৫০, মুস্তাক আলী ২৪; সোখন ২৩ রাণে ২টি উইকেট পান)।

হকি

কলিকাতা হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ লইয়া তিনটি দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছিল। অনেকেরই ধারণা ছিল, মোহনবাগান দলই চ্যাম্পিয়ান হইবে। কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলা চলে, মহমেডান স্পোর্টিং দল চ্যাম্পিয়ান হইবে। এই দলের মাত্র একটি খেলা বাকী এবং সেই খেলায় পরাজিত হইবারও বিশেষ সম্ভাবনা নাই। মোহনবাগান অথবা পোর্টকমিশনার্স এই দুইটি দলের এখনও কয়েকটি খেলা বাকী আছে। সেই সকল খেলার ফলাফল কি হইবে, কেহই বলিতে পারে না। নিম্নে উক্ত তিনটি দলের বর্তমান অবস্থার তালিকা প্রদত্ত হইল:—

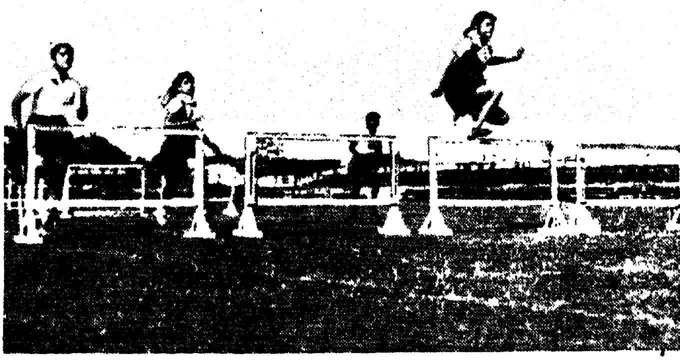
	খে	জ	ড্র	পঃ	পক্ষে	বিঃ	পঃ
মহমেডান	১৫	১১	৩	১	৩৪	৫	২৫
মোহনবাগান	১২	৮	২	২	৩১	৭	১৮
পোর্টকমিঃ	১০	৭	১	২	২৬	৯	১৫

বেটন হকি কাপ প্রতিযোগিতায় বাহিরের দল কয়েকটি খেলায় যোগদান করিয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। পরিচালকগণ শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতার সম্মান রক্ষার জন্য একটু চেষ্টা করিয়াছেন। ভবিষ্যতে আরও করিবেন বলিয়া আশা করি।

মুষ্টিযুদ্ধ

মুষ্টিযুদ্ধ বিষয়ে বাঙলার বালক ও যুবকগণ ক্রমশই উৎসাহ লাভ করিতেছেন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। স্কুল অফ ফিজিক্যাল কালচারের পরিচালকগণ পুনরায় আন্তঃ-স্কুল ও আন্তঃ-কলেজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে মন দিয়াছেন, ইহাও সুখের বিষয়। দীর্ঘদিন একটি প্রতিযোগিতা পরিচালনা করিয়া হঠাৎ বন্ধ করিয়া দীর্ঘদিন চুপচাপ থাকিলে প্রতিষ্ঠানের সুনাম অনেকখানি কমিয়া যায়। স্কুল অফ ফিজিক্যাল কালচারের এইজন্যই জনপ্রিয়তা কমিয়া গিয়াছিল। বর্তমানে তাঁহারা যেভাবে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাতে আশা হয় পূর্বের গৌরব তাঁহারা ফিরিয়া পাইবেন।

বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশনের বিরামহীন, একের পর এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতে দেখিয়া খুবই আশ্চর্য হইতে হয়। তবে বর্তমানে যেভাবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহার ভবিষ্যৎ ফল ভাল হইবে বলিয়া মনে হয় না। মানুষ মাত্রেরই বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। মুষ্টিযোদ্ধারাও মানুষ; সুতরাং তাঁহাদের বিশ্রামের প্রয়োজন আছে, ইহা কেন তাঁহারা ভুলিয়া যান? বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিলে অভিজ্ঞতা বাড়ে জানি, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা বাড়াইবার জন্য ঘন ঘন প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা আশা করি, উক্ত এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ এই বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া কর্মতালিকা প্রস্তুত করিবেন।



বেঙ্গল উইমেনস্ স্পোর্টস এসোসিয়েশন পরিচালিত অনুষ্ঠানের হার্ডল্ রেসের দৃশ্য

এ্যাথলেটিকস

এ্যাথলেটিক স্পোর্টের মরসুম শেষ হইয়াছে অথচ এখনও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, অনুষ্ঠানের বিরাম নাই। এইরূপভাবে দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যে স্পোর্টস অনুষ্ঠান করিবার কি সার্থকতা আছে বুঝি না। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য হইতে হয় যে, বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ ইহার প্রতিবাদ করেন না কেন? এসোসিয়েশন গঠিত হইয়াছে যাহাতে এ্যাথলেটিক স্পোর্টসের উন্নতি হয়; কিন্তু অসময়ে স্পোর্টস অনুষ্ঠান উন্নতির কিরূপে সাহায্য করিবে, আমাদের বোধগম্য হয় না। হয়তো তাঁহারা বলিবেন—"যাঁহারা অনুষ্ঠান করিতেছেন তাঁহাদের উপর বলিবার অধিকার আমাদের নাই। এই সকল অনুষ্ঠান আমাদের অনুমোদিত নহে।" এই কথা বিশ্বাস করিলেও, প্রতিবাদ করিবার অথবা ফলাফল সম্বন্ধে সর্বসাধারণকে জানাইবার তাঁহাদের অধিকার আছে, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

"দেশ"-এর নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬৷৹

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপঃ—

সাধারণ পৃষ্ঠা—১ বৎসরের চুক্তিতে

১০০ কলম ইঞ্চি ও তদূর্দ্ধ ৩৲ প্রতি ইঞ্চি প্রতিবার

৫০ কলম ইঞ্চি হইতে ৯৯ কলম ইঞ্চি ৩৷৹ প্রতি ইঞ্চি প্রতিবার

সাময়িক বিজ্ঞাপন—৪৲ টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতিবার

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জ্ঞাতব্য।

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

অমনোনীত লেখা ফেরৎ লইতে হইলে সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিবেন। লেখা পাঠাইবার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে যদি তাহা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে লেখাটি অমনোনীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অমনোনীত লেখা ছয় মাসের পর নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। অমনোনীত কবিতা টিকিট দেওয়া না থাকিলে এক মাসের মধ্যেই নষ্ট করা হয়।

সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক দিতে হয়।

সম্পাদক—"দেশ" ১নং বর্ম্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

শান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে ...জয় ... জাপানীদের সংকটকে ...য়ে ... নছে, এ আশংকা প্রকাশ ...রই ...রে এসেছি। ফিলিপাইনের ...ান বড় রকমের একটা বাধা দে... থা অনেকেই মনে করেছিলেন। ...ল-প.ইনের প্রধান দ্বীপ লুজন ...নী ম্যানিলা অধিকার করতেও মা...দের কোন প্রবল প্রতিরোধের সম্মু... হতে হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া... নি। ফিলিপাইনের যুদ্ধে এই ...নে নেওয়াকে যদি জাপানের মা...কে এড়িয়ে চলবার প্রচেষ্টা বলে করা যায়, তা হলে তা খুব অসংগত বলে মনে হয় না। অথচ জাপানকে আত্ম-রক্ষার জন্য চেষ্টা করতে হয়, তাকে একটা বড় যুদ্ধে মার্কিণ বাহিনী... সম্মুখীন হতে হবেই। এই প্রতিরোধের প্রয়োজন যদি ফিলিপাইনে হতো এবং যদি জাপানের সফলকাম হওয়া সম্ভ... তবে কতকগুলি সুযোগ সে পে... প্রথমত ফিলিপাইন ও তার দক্ষিণস্থ দ্বীপপুঞ্জের তৈল প্রভৃতি যুদ্ধের পক্ষে আবশ্যক উপকরণগুলি সে সহজেই স্বদেশে...নোর ব্যবস্থা করতে পারতো। কিন্তু ফিলি-পাইনে মার্কিন আধিপত্য স্থাপি...য়াতে ফিলিপাইনের সম্পদ থেকে সে বঞ্চিত হবেই, ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি ...দ্বীপের সম্পদ আহরণের পক্ষেও তার পদে বাধার সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয়ত ...ইনে পরাজিত হলে মার্কিণ সৈন্য... আর অগ্রসর হওয়ার পূর্বে অনেক ...রচনা করে অগ্রসর হতে হত। ...কে ফিলিপাইনের একটা প্রবল যু...পরে যদি জাপানের পরাজয় ঘটতো, ত... সেই পরাজয় ঘটাতে মার্কিন সমরশক্তির ক্ষতি হতো, তা পূরণ করে তার অগ্রসর হতেও অনেকটা সময় অতিবাহিত হতো। মনে রাখতে হবে আমেরিকাকে প্রায় ...০০ মাইল দূর থেকে এই যুদ্ধের ...রাহ বজায় রেখে যুদ্ধ চালাতে হয়েছে। ...াক আমেরিকার শক্তি সঞ্চয়ে যে সময় ...জন হতো, সেই সময়ের মধ্যে জাপানের পক্ষে দ্বিতীয় আত্মরক্ষা ব্যূহকে দৃঢ় ও ...লী করে তোলা সম্ভব হতো বলে ...য়। ফিলিপাইন অতি সহজে অধিকৃত হ...তই মার্কিন সৈন্যেরা এত অল্প সম...ধ্যে আয়োজিমা দ্বীপে অবতরণ করি... হয়েছে। আয়োজিমাতে জাপানীরা ...ল ভাবে প্রতিরোধ করছে সত্য, কিন্তু ...ধ্যে যুদ্ধ তাদের ঘরের কাছে চলেছে। আয়োজিমা থেকে খাস জাপান দ্বীপ...জর দূরত্ব মাত্র ৭৫০ মাইল। তা ছাড়া ...ধ্যে

সংবাদ প্রসঙ্গ

মার্কিন বাহিনী আরও অগ্রসর হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। রয়টার খবর দিয়েছে যে, মার্কিন সৈন্যেরা রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জের ওকিনাওয়া দ্বীপে অবতরণ করেছে। এখান থেকে খাস জাপানের দূরত্ব মাত্র ৩৫০ মাইল। এছাড়া মাঝে মাঝেই মার্কিন অতিকায় বিমানগুলির আক্রমণে জাপানী শহরগুলি বিধ্বস্ত হয়েছে। প্রতিপক্ষকে ঘরের কাছে অগ্রসর হতে দিয়ে বাধাদানের নীতি বর্তমান কালের যুদ্ধের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলেই মনে হয়। অন্তত জার্মান বা জাপানের বিরুদ্ধ যুদ্ধে যদি আকস্মিক পরিবর্তন তাদের অনুকূলে কিছু না ঘটে, তাহলে এ মত পরিবর্তন করার কোন প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না।

সম্প্রতি আমেরিকার এসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদ দিয়াছেন যে, জাপানের প্রধান মন্ত্রী বলেছেন, জাপানীরা সাইপান ও আয়োজিমা পুনরধিকারের জন্য পাল্টা আক্রমণের ব্যবস্থা করছে। কারণ তাঁর মতে এই দ্বীপগুলি পুনরধিকারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রতিপক্ষকে কোথাও প্রবেশ করতে দিয়ে সেখান থেকে অপসারিত করবার প্রচেষ্টা অপেক্ষা পূর্ব থেকে প্রবেশে বাধা দেওয়া সহজতর বলে আমাদের মনে হয়। অন্ততঃ সহজ বুদ্ধিতে আমাদের তাই মনে হয়। সামরিক প্রয়োজনে এর উল্টো নীতি অনুসরণের প্রয়োজন হয়েছিল কিনা—যুদ্ধের ভবিষ্যৎ গতি ও প্রকৃতি না দেখে সে সম্বন্ধে কিছু বলা সংগত হবে বলে মনে হয় না। এছাড়া উক্ত সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান আরও একটি সংবাদ দিয়েছে। তা হল এই যে, জাপানীরা হ্যাংকোর উত্তর-পশ্চিমে এক জায়গা থেকে ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে চীনে এক নূতন আক্রমণ আরম্ভ করেছে। সংবাদদাতা মনে করেন, দক্ষিণ হোনান ও উত্তর হুপে প্রদেশের গমশস্য দখল, বিমানক্ষেত্র ধ্বংস, পিপিন-হ্যাংকো রেলপথে চীনা আক্রমণের আশংকা দূর করা আর মাঞ্চুরিয়ার সমরোপকরণ দক্ষিণ রণক্ষেত্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করা এই আক্রমণের উদ্দেশ্য। এই সংবাদ প্রতিষ্ঠান আরও জানিয়েছেন যে, জাপ ইম্পিরিয়াল হেডকোয়ার্টার থেকে যে ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছে তাতে দাবী করা হয়েছে..., সম্প্রতি

জাপ সাগরে জাপানীরা আমেরিকার ৫টি বিমানবাহী জাহাজ, দুটি যুদ্ধ জাহাজ, তিনটি ক্রুজার ও অন্যান্য ৮টি জাহাজ ডুবিয়েছে। তা ছাড়া তারা নাকি ১৮০টি মার্কিন বিমান ভূপাতিত করেছে। তাদের নিজেদের খোয়া গেছে ১৫০টি। তাছাড়া জাপানের প্রধান মন্ত্রী দেশরক্ষী স্বেচ্ছা-বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করেছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। সংবাদে প্রকাশ, তিনি বলেছেন, শত্রু আমাদের দ্বারে আঘাত হানছে। আমরা বর্তমানে যে দারুণ সংকটের সম্মুখীন হয়েছি, আমাদের জাতির ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

এইসব সংবাদ থেকে মনে হচ্ছে, জাপানীরা দেরীতে হলেও সংকট সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে এবং সংকটকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। এ চেষ্টায় যে কতটা সাফল্য লাভ করবে বলা মুস্কিল। কারণ জাপানের সামরিক শক্তির নির্ভরযোগ্য কোন তথ্যই প্রায় পাওয়া যায় না। তবে যুদ্ধক্ষম জনশক্তির যে তার অভাব হওয়ার কথা নয়, তার আভাস আমরা দু-এক সপ্তাহ আগেই দিয়েছি। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধে শুধু জনবলই যথেষ্ট নয়। নৌবল, বিমানবল এ যান্ত্রিক যুদ্ধের সাজসজ্জার পরিমাণ ও উৎকর্ষের উপরে এ যুগের যুদ্ধের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। এসব দিক দিয়ে জাপানের সামর্থ কিরূপ তা জানা যায় নি। প্রশান্ত মহাসাগরে ফিলিপাইনের যুদ্ধে যে জাপান মার্কিন নৌশক্তিকে কোন বড় রকমের যুদ্ধে ব্যাপৃত করেনি, তাতে জাপ নৌশক্তির সামর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। মণিপুরের যুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের এবং ব্রহ্ম যুদ্ধে ক্রম-পশ্চাদপসরণের কারণও জাপানের বিমান-শক্তির সামর্থ ন্যূনতার পরিচায়ক বলে অনেকে মনে করেন। ব্রিটেন ও আমেরিকা যখন ইউরোপে এক মহাযুদ্ধে ব্যাপৃত, তখনই যদি জাপান মার্কিন সমর শক্তির সম্মুখীন হতে সাহসী না হয়, তা হলে
ইউরোপীয় যুদ্ধান্তে সে স্থলে ব্যাপৃত
সমরশক্তির কিছু অংশও পূর্বাঞ্চলে প্র... কলকাতা।
হলে জাপানের পক্ষে তা প্রতিরোধ
অসম্ভব হবে। বার্লিনস্থিত জাপদূত
মাঞ্চুরিয়া ও পিকিনের কতকাং... ...তা, ঢাকা,
আর সমস্ত অধিকৃত স্থান ... ইছাপুর,
আমেরিকার হাতে ছেড়ে ...গাঁ, বোয়ালমারী,
করে মিত্রপক্ষের কাছে নারায়ণগঞ্জ ও
উপস্থিত করেছিলেন বলে রোজপুর।
ওপরের আলোচ্য বিষয়...
দেখলে ত... একেং ডাইরেক্টর—মিঃ এস, আর দাশ।

গঙ্গোত্রী

সুবোধ ঘোষ

(২১)

সূর্যাস্তের আভায় ডাঙার বুক লাল হয়ে গেছে। উৎসবের আনন্দে জনতা পথ ধরে চলছিল। বন্দী জনতার মনেপ্রাণে ও শরীরের কোন ক্লান্তির চিহ্ন ছিল না। নিজের ছন্দে দুলে দুলে তারা এগিয়ে চলেছে। সাজসজ্জার ও অস্ত্রশস্ত্রের আড়ম্বরের চাপে ও কেতাদুরস্তী চালে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল পুলিসরা।

সবার পেছনে চলেছিল কেশব আর মাধুরী। দুজনে মন খুলে গল্প করছিল। দেখে মনে হয়, এই ঘটনার বৈচিত্র্যের মধ্যে তারা দুজনে একটা নিভৃত ঠাঁই বেছে নিয়েছে। হয়তো গল্প করার জন্যই তারা দুজনে পিছিয়ে আছে, সবার সংগে এরা দুজনেও এক হয়ে আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই স্বরাজের প্রতিজ্ঞা ছাড়া এদের নিশ্চয় ভিন্ন একটা প্রতিজ্ঞা আছে: এই দেশের ডাকের আহ্বান ছাড়া, আর একটা আহ্বান আছে। কেশব ভট্চাযের বিমর্ষ মুখে যে আজ এত তৃপ্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, চোখের দৃষ্টিতে যে এত আনন্দের চাঞ্চল্য জাগছে, সে কি শুধু দেশজোড়া চাঞ্চল্যের একটি অংশ? আজ এই মুহূর্তে কেশবের মনে কি ভিন্ন কোন সুরের হাওয়া লাগছে না?

মাধুরী মাঝে মাঝে বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। পথ চলার ক্লান্তি আছে। নিশ্চয় এটা একটা কারণ। কিন্তু তা ছাড়া কি আর অন্য কোন কারণ নেই? পরমুহূর্তে উৎফুল্ল উঠছে মাধুরী, জীবনে যে পথ তৈরী বহু কামনায় ও বহু আকাঙ্ক্ষায়, থে হঠাৎ আজ ঘটনার আশীর্বাদে হয়ে গেছে, মাধুরীর জীবনের এক ছলনার ইংগিতে ভুল ছিল, সেই ভুল থেকে রেহাই রী। মাধুরীর মন আজ ার, কোন সংকোচ ও র না। স্বরাজের হয়ে, এক জটিলতায় মিশে যেতে চলেছে। এর জন্য প্রস্তুত ছিল না মাধুরী, কিন্তু ঘটনার আবির্ভাব প্রমাণ করিয়ে দিল যে, পথ চিনতে পারলে সাথী চেনা যায়। পথ ভুল না করলে সাথীকে ভুল হয় না।

কেশব বললো—তুমি বড় জব্দ হয়ে গেলে মাধুরী।

মাধুরী—তার প্রমাণ?

কেশব—আমার পাশে পাশে আজ তোমাকে চলতে হচ্ছে, যা ভয় করেছিলে, তাই হলো।

মাধুরী—ঠিক গুছিয়ে বলতে পারলে না কেশবদা। যা ভরসা করতে ভয় হচ্ছিল, তাই হলো।

কেশব—আজ আর ফাঁকি রেখে কিছু বলো না মাধুরী।

মাধুরী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। শান্ত স্বরে বললো—একটু মিথ্যে আছে কেশবদা, কিন্তু তার জন্য আমার আর কোন ভয় নেই। সেটা আমার জীবনের শাস্তি।

কেশবের মুখ ক্ষণিকের জন্য বিষণ্ণ হয়ে উঠলো।—একটু মিথ্যে আছে?

মাধুরী—হ্যাঁ।

কেশব—শুনে খুসী হতে পারলাম না, তবু তোমার প্রশংসা করছি।

মাধুরী—আমার একটা স্বার্থ আছে।

কেশব—কি?

মাধুরী—আমার ইচ্ছে করে, এবারও আমার পাঁচ বছরের জেল হোক্

কেশব—আর আমার?

মাধুরী—তোমার যেন জেলটেল না হয়।

কেশব—তাতে কি লাভ হবে তোমার?

মাধুরী—লাভ নয়, একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে।

কেশব—কিসের পরীক্ষা?

মাধুরী—মানুষের মনের, মানুষের হৃদয়ের, মানুষের বুদ্ধির, মানুষের চেহারার।

কেশব হেসে ফেললো—তুমি কি প্রতি শোধ নিতে চাইছ আমার ওপর?

মাধুরী—প্রায়শ্চিত্ত।

কেশব—এই পরীক্ষায় কি ফল আশা করছো তুমি?

মাধুরী হচ্ছে, তোমাকে এসে দেখবো...

কেশব— যে আমি এম-এ পাশ করেছি, থেকে একবার ফিরে এসেছি, ড় অফিসের ছোট সাহেব হয়েছি।..

মাধুরী ঠাট্টা বুঝতে পারছি কেশবদা। তুলনটা ঠিক হলো না। তুমি পাারে ফিরে এসে কি মাধুরীর ঃপতন দেখতে পেয়েছ?

কেশব ন নয় পরিবর্তন।

মাধুরী কি তাই মনে কর?

কেশব ার কারণ রয়েছে মাধুরী

মাধুরী আছে?

কেশব একটা সত্যি কথা আবার বলি, আাস হয় না, তুমি এই আন্দোল একটা আন্তরিক আগ্রহ দিয়ে এ

মাধুরী যোগ্য নই।

কেশব ব দিকে যোগ্য, কিন্তু এই কাজ থে র হৃদয় দূরে সরে আছে। ্য তুমি তোমার জীবনের কোন এ ঙ্কাকে পরীক্ষা করে দেখছো তোমার সেই আশা সফল হ

মাধু নিশ্চয় অনুমান করতে পারছো কাঙ্ক্ষাটা কি?

কেশ মুক্তি খুঁজছো।

মাধু?

কেশ ীবনের বহুদিন আগের একটা ক ভুলতে পারছো না, অস্বীক পারছো না। সেই প্রতিজ্ঞা তোমার ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাধু রে রইল। কেশব বললো—এই ক মার কিছু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে াধুরী। তোমার স্বরাজের প্রতিজ্ঞা াই আমার ভুয়ো মনে হয়।

মাধু তোমার অধিকার তো কেউ নি কেশবদা।

কেশ নেয় নি?

মাধু তুমিও বুঝতে পারছো, নইলে তুমি এত কড়া কথা আমাকে পারতে না। আমার সত মিথ্যা তোমাকে তো কোন বাধা দিচ্ছি বদা।

কেশ মিথ্যেটুকুই বা গোপন রাখছো তোমার মুখে শুনলেই খুশী

মাধু পাঁচ বছরে আমি অনেক কঠোর াক কেশবদা, তুমি সেটা বুঝতে না। জীবনের প্রতিজ্ঞাকে চাপা রি, জীবনের একটা মিথ্যাকে বাতিল পারবো না?

কে দ্বিতীয়বার ভুল করো না

মাধুরী। মিছামিছি জীবনে কতকগুলি যন্ত্রণা শুধু লাভ হবে, কোন স্থিতি পাবে না। চিরকাল ধরে বদলে যাওয়া উচিত নয়। পরিতোষকে আর বঞ্চনা করো না।

মাধুরী কেশবের দিক চকিতে তাকিয়ে মাথা হেঁট করে চলতে লাগলো। অনেকক্ষণ ধরে বোকার মত দুজনে শুধু হেঁটে গেলো। মাধুরী যেন একটু পিছিয়ে পড়তে পারলেই খুশী হয়। পাশে পাশে চলার দৃশ্য হঠাৎ একটা বিদ্রূপের ধিক্কারে যেন ছিঁড়ে গেছে।

মাধুরীই কথা বললো প্রথম—তুমি জান সে কথা?

কেশব—অজয়ের কাছে যেটুকু জানতে পেরেছি।

মাধুরী—অজয়দা কি সব কথা জানেন?

কেশব—তা জানি না।

মাধুরী—তাহলে আজ আর বিচার করতে বসো না কেশবদা, ভুল হবে।

কেশব—কবে বিচার করতে পারবো?

মাধুরী—যেদিন অভিযোগ সত্যি করে শুনতে পাবে, দেখতে পাবে, বুঝতে পারবে, সেইদিন।

মীরগঞ্জ পেঁছিতে এখনো দেরী আছে। মাধুরীর শরীর ও মন সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। এই শোভাযাত্রার মধ্যে যেন আর কোন শোভা নেই। এই মিছিলের উৎসাহের সুরে মাধুরীর মন আর সাড়া দিতে পারে না। নিতান্ত অকারণে একটা পৃথিবীর উল্লাসকে যেন অনুসরণ করে চলেছে সে। কেশবদার কঠোর কথাগুলির সত্যতা যেন এই দৃশ্যটির সঙ্গেই ছদ্মবেশ ধরে রয়েছে। কটি মিনিট আগে অস্তোন্মুখ সূর্যের রঙীন আলোকে পুলকিত মাঠের রূপ কত ভাল লাগছিল। এখন এই ছায়াবৃত স্নিগ্ধতার মধ্যেও যেন অসহ্য জ্বালা ছড়িয়ে রয়েছে। সেই ভাল-লাগার শক্তি যেন মনের ভেতর থেকে মুছে গেছে। কেশব ভট্চাযকে ঘৃণা করতে পারলে ভাল ছিল। কিন্তু এত বড় শক্তির সন্ধান কোথায়? পাঁচ বছর অদৃশ্য হয়ে থেকে, নির্বাসনের প্রতিটি মুহূর্ত শুধু বিগত দিনের এক প্রগল্ভ প্রতিজ্ঞাকে ধ্যান করে করে কেশব ভট্চায আরও কঠিন হয়ে গেছে। পাঁচ বছর ধরে মুক্ত জীবনের প্রসন্নতার মধ্যে প্রতিনিয়ত ভুল করে সেই প্রতিজ্ঞাকে শুধু শিথিল করেছে মাধুরী। তাই কি সে এত দুর্বল? নইলে কেশবের সঙ্গে তার জীবনের আর কি মিল আছে?

কেশব ভটচাযের কাছে এই স্বদেশীয়ানা বোধ হয় একটা হুজুগ ছাড়া আর কিছু নয়। তবু সে এসেছে। কেন? মাধুরীর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারে নি কেশব ভট্চায। মাধুরীর মনে পড়ে—কেশবদা এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে, তাই আহবানে, নইলে কেশব ভট্চায আসতো না; কিন্তু কেন?　ক্রমশঃ

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২০শে মার্চ—স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু ও স্যার জগদীশ প্রসাদ এক যুক্ত বিবৃতিতে বাঙলার নিদারুণ বস্ত্র-দুর্ভিক্ষে বড়লাটকে হস্তক্ষেপ করিয়া উহা রোধ করিবার জন্য এক আবেদন জানাইয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল এক ছাঁটাই প্রস্তাবের সাহায্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি ও বাঙলার সমুদয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইবার দাবী জানান।

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী গত রবিবার তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন।

২১শে মার্চ—ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বড়লাট লর্ড ওয়াভেলকে ব্যক্তিগত আলোচনার জন্য লণ্ডনে আহ্বান করায় তিনি বিমানযোগে লণ্ডনযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে বোম্বাইয়ের গভর্নর স্যর জন কলভিল বড়লাটের স্থানে এবং স্যার হেনরী ফলি নাইট বোম্বাই গভর্নরের কাজ করিবেন।

কলিকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে অসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী মিঃ এইচ্ এস সুরাবর্দী বলেন যে, ছয় সপ্তাহের মধ্যে সমগ্র বাঙলাদেশে বস্ত্র রেশনিং করা হইবে। তিনি বলেন যে, বর্তমানে বাঙলাদেশের জন্য যে পরিমাণ বস্ত্র বরাদ্দ করা হইয়াছে, তদনুযায়ী বৎসরে মাথাপিছু ১০ গজ কাপড় দেওয়া হইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অন্তরীণ সদস্যগণকে পরিষদে যোগদানের নিমিত্ত সুযোগ দান করিতে গভর্নমেণ্টের অক্ষমতার আলোচনার জন্য বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের পক্ষ হইতে উত্থাপিত ছাঁটাই প্রস্তাব পরিষদে ৫—৯৩ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

২২শে মার্চ—গতকল্য শেষ রাত্রে সিন্ধুর দুর্গাশাহী স্টেশনে একটি গুরুতর ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে। ফলে ২৫ জন নিহত ও ৩০ জন আহত হইয়াছে।

সীমান্তে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণে ধরিয়া লওয়া যায় যে, ভারতের সর্বত্রই কংগ্রেসের ১৯৪২ সালের নীতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে; কেন্দ্রীয় পরিষদে অদ্য এই যুক্তির উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার ফ্রান্সিস মুডি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত চান যে, নীতিগতভাবে ভারতের সর্বস্থান সম্পর্কেই কংগ্রেস দেশের শাসন-ব্যবস্থা অচল করিবার ও যাহারা কংগ্রেসের অনুবর্তী নহে তাহাদের উপর জুলুম করিবার নীতি পরিত্যাগ করিয়াছে।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে গভর্নমেণ্টের নিকট দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বনের এবং তত্রত্য ভারতীয় হাইকমিশনারকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দানের সুপারিশ করিয়া শ্রীযুত পি এন সপ্রুর এক প্রস্তাব বিনা ডিভিসনে গৃহীত হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বাজেটের "অতিরিক্ত ব্যয়" দফার আলোচনাকালে বিরোধী দল বলেন যে, গত দুর্ভিক্ষের সময় বাঙলাদেশে ৫০ লক্ষ নরনারী অনাহারের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মিঃ সুরাবর্দী উহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষে অনাহারের ফলে মৃত্যুসংখ্যা ৫০ লক্ষ নহে—মাত্র ৭ লক্ষ।

২৩শে মার্চ—আসামের সাদুল্লা মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন। বিরোধী দলের নেতা শ্রীযুত গোপীনাথ বরদলৈ ও শ্রীযুত রোহিণীকুমার চৌধুরীর সঙ্গে আপোষের ফলে স্যার সাদুল্লা অর্ধেকসংখ্যক অ-মুসলমান মন্ত্রিসহ মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। স্যার সাদুল্লা মন্ত্রিসভার সকল মুসলমান সদস্যই এই নূতন মন্ত্রিসভায় স্থান পাইয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বাঙলার দরুণ মাথাপিছু ১৮ গজ বস্ত্র বরাদ্দ করিবার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন করিবার জন্য বাঙলার গভর্নরকে অনুরোধ করিয়া তাঁহার নিকট একটি নিবেদন লিপি প্রেরণ করা হউক।

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, আগামী ১লা এপ্রিল হইতে ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, আফগানিস্থান এবং তিব্বতে (লাসা) প্রেরিতব্য প্রত্যেক সাধারণ টেলিগ্রাফের জন্য বর্তমান প্রচলিত হারের উপরে অতিরিক্ত চারি আনা এবং জরুরী টেলিগ্রাফের উপর আট আনা লাগিবে।

২৪শে মার্চ—১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় কার্পাস বস্ত্র এবং সুতা নিয়ন্ত্রণ আদেশের বিধানাবলী যাহাতে যথাযথ পালিত হয়, সেজন্য বাঙলা সরকার আরও দুইটি আদেশ জারী করিয়াছেন।

আসামের সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডলী অদ্য আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

২৫শে মার্চ—কলিকাতা পুলিসের এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ কলিকাতার অন্যূন ২৫০০টি বস্ত্রের দোকান তল্লাস করিয়া শীল করিয়াছে। এই ২৫০০ দোকানের অধিকাংশই বড়বাজার অঞ্চলে অবস্থিত।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ওয়ার ফ্রণ্টের লীডার স্যার এ এফ রহমান জলপাইগুড়িতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, উদার মতাবলম্বী ও সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন।

সেবাগ্রামে কর্মীদের এক সভায় মহাত্মা গান্ধী বলেন, নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘের গঠনমূলক কার্য ভিন্ন স্বরাজ স্বরাজই নয়।

২৬শে মার্চ—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ফাইনান্স বিল ৫০—৫৮ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

কলিকাতা পুলিসের এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ উত্তর কলিকাতার একটি বাটীতে হানা দিয়া উহার ভূগর্ভস্থ একটি স্থান হইতে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ২৬১ গাইট সুতা উদ্ধার করিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২০শে মার্চ—ব্রহ্ম—১৯শ ভারতীয় ডিভিসনের সৈন্য ফোর্ট ডাফারিন অধিকার করিয়াছে। ফোর্ট ডাফারিনের পতনের ফলে মান্দালয় সম্পূর্ণ অধিকৃত হইয়াছে। ৩৬শ ব্রিটিশ ডিভিসনের ভারতীয় সৈন্যগণ মোগকে প্রবেশ করিয়াছে।

২১শে মার্চ—জাপ রেডিও হইতে 'কুইসো দ্বীপের যুদ্ধের' সংবাদ ঘোষণা করিয়া বলা হইয়াছে যে, জাপ বিমানবহর ১৩।১৪ খানা মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে। উহাদের মধ্যে বিমানবাহী জাহাজও ছিল।

এডমিরাল নিমিৎসের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, আমেরিকান নৌবহর জাপ নৌবহর[illegible] করিয়া [illegible] খাস জাপ দীর্ঘকাল যুদ্ধে লিপ্ত [illegible] প্রভূত ক্ষতি করিয়াছে।

পশ্চিম [illegible] জার্মান রণাঙ্গন—মার্কিন সপ্তম আর্মি সা[illegible] এলাকায় [illegible] ব্রুকেন অধিকার করিয়াছে। সারব্রুকেন [illegible] হইয়াছে। [illegible] দুইটি স্থানে সার নদী অতিক্রম করা [illegible]

২২শে মা[illegible] পশ্চিম রণাঙ্গন—ফিল্ড মার্শাল কেসেলরিং সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন জার্মান বাহিনীর প্রধান [illegible] হইয়াছেন।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গন—জাপ হেডকোয়ার্টার্সের এক [illegible] নিউজ এজেন্সী ঘোষণা [illegible] তাহার উল্লেখ করিয়া জাপ নৌবহরটি খাস জাপানের [illegible] করিয়াছেন, যে মার্কিন [illegible] ছিল, উহা দক্ষিণ দিকে অদূরে হানা দিয়া [illegible] করিতেছে। জাপ বিমানবহর এই নৌবহর[illegible] উপর আক্রমণ চালাইয়া একখানা বিমানপোত বাহী জাহাজ নিমজ্জিত ও অপর একখা[illegible] ঘায়েল করিয়াছে।

২৩শে মার্চ—পূর্ব জার্মাণ রণাঙ্গন—লাল ফৌজ বুদাপেস্টের দক্ষিণ-পশ্চিমে ৬০ মাইল ব্যাপী রণাঙ্গনে এক নূতন আক্রমণ সুরু করিয়া ৪৪ মাইল অগ্রসর হইয়াছে এবং তাহারা জেকেসফারভার দখল করিয়াছে। মার্শাল কনিয়েভের বাহিনী উত্তর সাইলেসিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া চেকোস্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার সুপরিচিত স্থপতি এবং মহাত্মা গান্ধীর অন্তরঙ্গ বন্ধু হারম্যান ক্যালেনবাক পরলোকগমন করিয়াছেন।

২৪শে মার্চ—পশ্চিম জার্মান রণাঙ্গন—জার্মানী দখলের চূড়ান্ত পর্যায়ের সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারীর বাহিনী আজ রাইনের ভাঁটিতে ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়া স্থল, জল ও বিমানপথে আক্রমণ সুরু করিয়াছে। মণ্টগোমারীর সৈন্যগণ ডুইসবুর্গের ১২ মাইল উত্তরস্থ ভেজেল, আরও একটু উত্তর-পশ্চিমস্থ রীস এবং ভেজেলের পশ্চিমস্থ যান্তেন অঞ্চলে আক্রমণ চালাইতেছে। মিত্রসৈন্যের কয়েকটি দল ইতিমধ্যেই রাইনের পূর্বতীরে তিন মাইল পর্যন্ত অভ্যন্তরভাগে আগাইয়া গিয়াছে।

২৫শে মার্চ—পশ্চিম জার্মান রণাঙ্গন—মার্শাল মণ্টগোমারীর বাহিনী রাইনের অপর তীরে ২৫ মাইল হইতে ৩০ মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ব্রিটিশ ও মার্কিন বাহিনীর মধ্যে সংযোগ সাধিত হইয়াছে।

২৬শে মার্চ—পূর্ব জার্মান রণাঙ্গন—লালফৌজ হাঙ্গেরীর মধ্য দিয়া অস্ট্রিয়া অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। মার্শাল তলবুখিনের পুরোগামী সৈন্যদল ভিয়েনা হইতে ৯০ মাইল এবং অস্ট্রিয়ার সীমান্ত হইতে ৪৮ মাইল দূরে উপস্থিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গন—মিত্রবাহিনী কর্তৃক মিথা অধিকৃত হইয়াছে।

পশ্চিম জার্মান রণাঙ্গন—মিত্রবাহিনী ফ্রাঙ্কফুর্টের শহরতলীতে প্রবেশ করিয়াছে। মিত্রবাহিনী রাইন নদী অতিক্রম করার ১৮ ঘণ্টার মধ্যে ৪০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গন—জার্মান নিউজ এজেন্সীর টোকিওস্থিত সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, দুই হাজার মার্কিন সৈন্য খাস জাপানের ৩৫০ মাইল মধ্যে অবস্থিত রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জের ওকিনাওয়া দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে।

ভূতপূর্ব ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী আর্ল লয়েড জর্জ ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।